চল্লিশের দশকের চারজন কবির কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ

[আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান]

মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

অক্টোবর ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার কর্তৃক উপস্থাপিত 'চল্লিশের দশকের চারজন কবির কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ [আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান]' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেন নি।

(বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে আমি পিএইচ. ডি. কোর্সে নাম নিবন্ধন করি। আমার গবেষণার শিরোনাম 'চল্লিশের দশকের চারজন কবির কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ [আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান]'। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর, আমার শিক্ষাগুরু, শিক্ষাবিদ ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন আমার মানসপ্রবণতা, বাংলাদেশের কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ এবং আমার কর্মজীবনে কবিতার সঙ্গে গভীরতর সংশ্লিষ্টতার স্বরূপ অনুধাবন করে উক্ত শিরোনাম নির্ধারণ করে দেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর প্রেরণা ও নির্দেশনায় আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গবেষণা-কর্মে নিমগ্ন থাকতে পেরেছি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি অস্থির ও অসহিষ্ণু হলেও কবিতার সংস্পর্শে প্রশান্তি অর্জনে তিনিই আমার পথ-প্রদর্শক। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষ করে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণায় গতি সঞ্চার করেছে। তিনি সানন্দে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন এবং তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আমার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার গবেষণাকর্মে গতি সঞ্চার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদা এবং প্রফেসর ডক্টর বেগম আকতার কামাল। তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর আমার শিক্ষক-সহকর্মী ডক্টর খালেদ হোসাইন এবং প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডক্টর অনিরুদ্ধ কাহালি আমার অনুৎপাদনশীল ব্যস্ততায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তীক্ষ্ণ তিরস্কারে জর্জরিত করে আমাকে গবেষণাকর্মে নিমগ্ন হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমৃত্যু ঋণী থাকাই আনন্দের, অহঙ্কারের।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তীর বাসায় দুই বাংলার কবিতার পৃথক প্রবণতা বিষয়ক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা আমার কাব্যবোধে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কীভাবে কবিতার অন্তর ও অবয়বে পরিবর্তন এনেছে, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে বাংলাদেশের কবিতার গতি ও গন্তব্যকে প্রভাবিত করেছে, সে-বিষয়ে তাঁর অভিমত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর মাহবুবুল হকের সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, ততবারই তিনি আমার গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এমনকি টেলিফোনে কথোপকথনেও তিনি আমার কাজের খোঁজখবর নিয়েছেন। বাংলা প্রগতি-কবিতার নানা বিষয়ে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শিপ্রা সরকারের কাছে আমি পেয়েছি অশেষ স্নেহ। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও প্রেরণা আমার পরম প্রাপ্তি।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বই ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রফেসর ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রফেসর সৈয়দ আজিজুল হক, প্রফেসর সিরাজ সালেকীন, প্রফেসর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী এবং সহকারী অধ্যাপক তারিক মনজুর। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁদের সান্নিধ্যে আমার বেঁচে থাকার ভূগোল বদলে গেছে, যাঁরা আমাকে আলোকিত মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করেন, তাঁদের মধ্যে আমার অগ্রজ আব্দুস সালাম তালুকদার, মজিবর রহমান তালুকদার, বন্ধু প্রবীর দত্ত, আনোয়ারুল আজিম এবং আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রকৌশলী-দম্পতি মোঃ শাম্‌স আরাফাত ও নাহিদ ফারজানা শিশির অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে সদ্য পাশ করে কলেজে শিক্ষকতা করছেন সরকার সোহেল রানা,– যে আমার ছাত্র নয় বললে ভীষণ কষ্ট পায় এবং সে আমার ছাত্র এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে– তার অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে গবেষণাকর্মে নিমগ্ন থাকা আমার জন্য অনেক আরামদায়ক ছিল। গবেষণা-সংশ্লিষ্ট নানা কাজে যুক্ত করে তাকে কষ্ট দিতে পেরেছি– এটা আমার জন্য আনন্দের। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ, যাদের সঙ্গে আমি কবিতা-পাঠের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি এবং এখনো যাদের সান্নিধ্যে আমি কবিতার মতো প্রাণবন্ত হয়ে উঠি, এই গবেষণাকর্মে তারাও নানাভাবে অবদান রেখেছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালোবাসার, ঋণ স্বীকার কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয়।

আমার বিশ্রাম যাঁদের সংস্পর্শে কাজের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শাহ্ ইফতেখার আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পানুরাগী মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ রেজাউল আবেদীন, এনএসআই কর্মকর্তা মাহমুদ হোসেন পারভেজ জুয়েল অন্যতম। এঁদের কাছে ঋণী থাকার আনন্দ অপার।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এবং সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ-এর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কুদরত-ই-হুদাকে, যাঁরা কেবল গ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়েই নয়, সময়, শ্রম এবং বিশ্রামে আনন্দ সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণ স্বীকারের নয়।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের ওপর নির্ভর করেছি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার এবং আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিতীর্থ মানিকগঞ্জের গঙ্গারামপুর জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

সংসার ও ধর্ম দুটো বিষয়েই আমার অনাগ্রহ প্রবল হলেও, যিনি আমাকে সংসারধর্মে দীক্ষা দিতে গিয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, পাচ্ছেন এবং আমৃত্যু দুঃখ পাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তিনি নাশিদ নূর মিশু। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল-এর বাংলা বিভাগের প্রভাষক তিনি। আমার কোন রচনা তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েন না– কারণ তা পড়া যায় না, 'সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।'– কিন্তু অন্যের মুখে আমার কোন লেখা কিংবা গ্রন্থের প্রশংসা শুনলে তিনি খুশি হন। তাঁর অন্তহীন অনুপ্রেরণা ও শর্তহীন সহযোগিতায় আমার গবেষণাকর্ম আরামে ও আনন্দে সম্পন্ন হতে পেরেছে।

সৌমিক রেজা– আমার আত্মজ, যার 'র'-এর উচ্চারণ এখনো 'ল' অতিক্রম করে নি। ওর কণ্ঠে আমার নামের উচ্চারণ ও অর্থ বদলে যায়। গবেষণাকর্মে নিমগ্ন থাকার 'অজুহাতে' ওকে পর্যাপ্ত সময় দিই নি বলে ও আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কি-না, কে জানে!

সূচিপত্র

অবতরণিকা	৬
প্রথম অধ্যায় : চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : দেশ-কাল-পটভূমি	**৯**
দ্বিতীয় অধ্যায় : আহসান হাবীব	**২২-১৩৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ : জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিষয়-বৈচিত্র্য	৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকরণ	৮৯
তৃতীয় অধ্যায় : ফররুখ আহমদ	**১৩৯-২৪৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ : জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি	১৪০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিষয়-বৈচিত্র্য	১৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকরণ	১৯৫
চতুর্থ অধ্যায় : আবুল হোসেন	**২৪৬-৩২৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ : জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি	২৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিষয়-বৈচিত্র্য	২৫৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকরণ	২৮৬
পঞ্চম অধ্যায় : সৈয়দ আলী আহসান	**৩২৬-৪১৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ : জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি	৩২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিষয়-বৈচিত্র্য	৩৩৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকরণ	৩৭৪
উপসংহার	**৪১৪**
গ্রন্থপঞ্জি	**৪২৪**

অবতরণিকা

বিশ শতকের চল্লিশ দশকের বাংলাদেশ যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে, তার প্রভাব জীবনের সকল প্রান্তকেই অসহিষ্ণু ও অসংলগ্ন করে তুলেছে। বৈশ্বিক বাস্তবতার অভিঘাত কেবল এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই পাল্টে দেয় নি, এর অপ্রতিরোধ্য উত্তাপ বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিকেও ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'দারুণ অগ্নিবাণে' এদেশের মানুষের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, পুরো পৃথিবীর ভয়াবহ বিপর্যয়কে মনে রেখেও বলা যায়, তা নির্মম ও মর্মন্তুদ। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সেই ভয়াল দিনগুলোর ইতিহাস এদেশের মানুষ কালের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লিখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে দেশ-ভাগের প্রস্তুতি, রাষ্ট্রসংগঠনের যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত রূপরেখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের নামে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চল্লিশের দশককে রক্তপাত, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও আন্দোলনের দশক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই অস্থির ও অসুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় যাঁরা কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের কাব্যসাধনায় এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনিবার্যভাবেই স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে। একই বৃন্তে বিকশিত এই দশকের কবিবৃন্দের শিল্পচৈতন্যের গভীর প্রদেশে যে রক্তবৃষ্টি হয়েছে, তাতে অসংখ্য স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে একথা যেমন সত্য, তেমনি রক্তের স্পর্শে সিক্ত হয়েছে যে-সকল উর্বর মস্তিষ্ক, সময় সেখানে মহামূল্য ফসলও ফলিয়েছে। সেই ফসলে সঞ্চিত আছে সেকালের দুঃসহ দিনের দুরতিক্রম্য স্মৃতিপুঞ্জ। এই স্মৃতিপুঞ্জের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম, সাহিত্যিক মূল্য অপরিমেয়।

বাংলাদেশের চল্লিশ দশকের চারজন কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবুল হোসেন (জ. ১৯২২) ও সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) বিক্ষুব্ধ কালের সারাৎসারকে ধারণ করেই এই কালপর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবকে তাঁরা স্বীকরণ করেই কবিতা ও রাজনীতির মাঝখানে একটি স্বাস্থ্যকর ব্যবধান অক্ষুণ্ন রেখে শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত শিল্পকর্মেও তাঁরা গেঁথে দিয়েছেন দেশকাল অতিক্রমী মহত্তম শিল্পকলার সৌরভ ও সৌন্দর্য। মাটি ও মানুষের সন্নিকটে অবস্থান করেছেন তাঁরা। তাই তাঁদের শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয় জীবনসম্পৃক্ত নানা অনুষঙ্গের উজ্জ্বল অবভাস। কবিতার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁরা, যদিও তাঁদের কেউই পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রলোভনে কবিতার শৈল্পিক সংহতি ও সমৃদ্ধি বিষয়ে আপস করেন নি। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান– চল্লিশের এই চারজন কবির মানসগঠনে স্বকালের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেমন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে, তেমনি এই কালখণ্ডের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিও তাঁদের মননচৈতন্য নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল এবং প্রাকরণিক পরিচর্যার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের মাধ্যমে এই চারজন শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পসাহিত্যে প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার অন্তর্গত অনুভব ও উপলব্ধি ব্যক্তিত্বখচিত অবয়বে আত্মপ্রকাশ করলেও তাতে অনিবার্যভাবেই দেশকালের নানা চিহ্ন মুদ্রিত থাকে এবং স্বকালের সারাৎসারকে স্বীকরণ করেই একজন স্রষ্টার শৈল্পিক প্রয়াস কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে চায়। সমকালীন প্রেক্ষাপট কবির মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বলেই তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের গভীর প্রদেশে স্বকালের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বর্তমান অভিসন্দর্ভের 'চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : দেশ-কাল-পটভূমি' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে তাই আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনা নির্মাণে তাঁদের স্বকালের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং সংস্কৃতির নিয়ামক হিসেবে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের চল্লিশের দশকের চারজন কবি– আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের দৃষ্টিভঙ্গির গতি ও গভীরতা এবং কবিস্বভাবের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুধাবনের মাধ্যমে তাঁদের কবিতার বিষয় ও প্রকরণের প্রকৃতি ও প্রবণতা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে :

'জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টি' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে কবির সমগ্র জীবনের নানা পর্বে আলোক প্রক্ষেপণের মাধ্যমে তাঁর মানস-সংগঠনের মৌলসূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে কবির পারিবারিক পটভূমি ও শৈশব জীবন, কর্ম ও সাহিত্য জীবন, সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'বিষয়-বৈচিত্র্য'। এই পরিচ্ছেদে কবির কাব্যসাধনার গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্য ও অবলম্বনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রেম, প্রকৃতি, সময়-সমাজ-রাজনীতি, মধ্যবিত্ত মন, উদ্বাস্তুবোধ, ধর্মীয় অনুষঙ্গ, শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে কবির বৈষয়িক পরিমণ্ডলের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। উপরিউক্ত বিষয়সমূহকে কাব্যরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনার মাধ্যমে শিল্পস্রষ্টার কবিস্বভাবের স্বরূপ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচিত কবিবৃন্দের প্রত্যেকের কবিতায়ই ধর্মীয় অনুষঙ্গ এবং শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও এইসব অনুষঙ্গ যাঁদের মানস-সংগঠন এবং সাহিত্যকর্মের গতি-প্রকৃতি নির্দেশে অবদান রেখেছে, কেবল তাঁদের কবিতার বৈষয়িক আলোচনায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ এবং শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

'প্রকরণ' শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে কবির শিল্পকর্মের করণকৌশলের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য। এই পরিচ্ছেদে কবির আবয়বিক নিষ্ঠা ও নিরীক্ষার নানা দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কবিতার গঠনকৌশল ও শব্দ নির্বাচনে কবির মানসপ্রবণতা নির্দেশ করা হয়েছে; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার যেমন অনুপ্রাস, বক্রোক্তি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত ইত্যাদি নির্দেশ করে কবির শিল্পদৃষ্টির নানা প্রান্ত অনুসন্ধান করা হয়েছে; চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে কবির সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে; প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে কবির জীবনবোধ ও শিল্পস্বভাবের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে; পৌরাণিক অনুষঙ্গ কবির প্রয়াস কতটা সার্থক ও শিল্পসম্মত এবং মিথ নির্মাণ, নির্বাচন ও কবিতায় মিথিক আবহ সঞ্চারের মাধ্যমে কবির জীবনবোধের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে; এবং প্রাকরণিক আলোচনার শেষ পর্যায়ে কবির ছন্দভাবনা, কবিতায় বিবিধ ছন্দ প্রয়োগের কৌশলসমূহ, ছন্দ সংমিশ্রণের প্রয়াস ও প্রবণতা, গদ্যছন্দের গতি ও গভীরতা এবং কবিতার বিষয়ের সঙ্গে ছন্দের আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণে কবির শিল্পকুশলতা ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়েছে।

'উপসংহার' অংশে বর্তমান গবেষণাকর্মের সারাৎসারকে সূত্রাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতার বিষয় ও প্রকরণের নানা প্রান্তে আলোক প্রক্ষেপণের মাধ্যমে আলোচিত কবিবৃন্দের সৃষ্টিকর্মের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত প্রবণতাসমূহ এই অংশে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বোধ-ভাবনা ও অভিজ্ঞানকে সূত্রাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার বিষয় ও প্রকরণে কালজ প্রভাবজাত সাদৃশ্য এবং মানসসংগঠনের বৈচিত্র্যজাত স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চল্লিশের দশকের চারজন কবির সৃষ্টিকর্মে যুগধর্মের প্রভাব চিহ্নিত করার মাধ্যমে বৈষয়িক ও প্রাকরণিক প্রবণতা নির্দেশ করার ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সমগ্র জীবনের কাব্যপ্রয়াসকেই বিবেচনায় এনেছি। চল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের নানা চিহ্ন তাঁদের কবিতায় মুদ্রিত থাকলেও তাঁদের কাব্যপ্রয়াসে প্রস্তুতিপর্বের মানসপ্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও ফররুখ আহমদ ব্যতীত অন্য সকলেই গদ্যসাধনায় গৌরবদীপ্ত অবদান রেখেছেন। অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁদের কেউ কেউ উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। আলোচিত কবিবৃন্দের দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত, মানসপ্রবণতা, জীবনদৃষ্টি, কাব্যভাবনা ও শিল্পস্বভাবের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁদের বিভিন্ন গদ্যগ্রন্থের দ্বারস্থ হয়েছি, যদিও এই গবেষণাকর্মে তাঁদের মৌলিক কাব্যগ্রন্থসমূহকেই অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে আলোচিত আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থসমূহ– *রাত্রিশেষ* (১৯৪৬) *ছায়াহরিণ* (১৯৬২), *সারা দুপুর* (১৯৬৪), *আশায় বসতি* (১৩৮১), *মেঘ*

বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১), *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫); ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থসমূহ– *সাত সাগরের মাঝি* (১৯৪৪), *সিরাজাম মুনীরা* (১৯৫২), *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১), *মুহূর্তের কবিতা* (১৯৬৩), *হাতেম তা'য়ী* (১৯৬৬), *অনুস্বার* (১৯৯৫, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত); আবুল হোসেনের কাব্যগ্রন্থসমূহ– *নব-বসন্ত* (১৯৪০, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৭), *বিরস সংলাপ* (১৯৬৯), *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* (১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (১৯৮৫), *এখনও সময় আছে* (১৯৯৭), *আর কিসের অপেক্ষা* (২০০০), *রাজকাহিনী* (২০০৪), *কালের খাতায়* (২০০৮); সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যগ্রন্থসমূহ– *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৪৪), *অনেক আকাশ* (১৯৫৯), *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৯৬২), *সহসা সচকিত* (১৯৬৬), *উচ্চারণ* (১৯৬৮), *আমার প্রতিদিনের শব্দ* (১৯৭৪)।

কবিতায় বিষয়ের গতি ও গভীরতা অনুধাবনে যেমন কখনো কখনো এর করণকৌশলের কোন কোন দিকে দৃষ্টি দিতে হয়, তেমনি এর শিল্পরূপও কখনোই বিষয়-নিরপেক্ষ নয়। আধার ও আধেয়ের যোগ নিবিড় বলেই এর কোন একটির স্বতন্ত্র আলোচনায়ও অন্যটির উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই গবেষণাকর্মে বিষয় ও প্রকরণের স্বতন্ত্র আলোচনা উপস্থাপিত হলেও বিষয়কে বিশেষ অবয়ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আলোচিত কবিবৃন্দের কোন শিল্পবিবেচনা সক্রিয় থেকেছে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং করণকৌশলের আলোচনায়ও প্রসঙ্গত তাঁদের কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল বিবেচনা করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যগ্রন্থসমূহের মূলপাঠ (text) তাঁদের কবিতাসমগ্র থেকে গৃহীত হয়েছে এবং কবিতাসমগ্রের কিংবা রচনাবলির প্রকাশসাল, প্রকাশক, সম্পাদক ও সংস্করণ উল্লেখ করা হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে সংযুক্ত 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামে। গবেষণাপত্রে উদ্ধৃত মূলপাঠের সঙ্গে কবিতার নাম ও কাব্যগ্রন্থের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। কবিতার নামের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আহসান হাবীবের *ছায়া হরিণ* কাব্যের 'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা' শীর্ষক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হলে উদ্ধৃতি-শেষে লেখা হয়েছে ('প্রেম নারী মানুষ ঘোষণ'/*ছায়া হরিণ*)। কোন কবিতা নামের পরিবর্তে সংখ্যা দিয়ে নির্দেশিত হলে মূলপাঠের শেষে কবিতা-ক্রম উল্লেখ করা হলেও সে ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন প্রয়োগ করা হয় নি। আলোচিত কবিবৃন্দের রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হলে মূলপাঠ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশের 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামে সেই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

একই লেখকের রচনাসমগ্র কিংবা রচনাবলির বিভিন্ন খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি সংগৃহীত হলে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে লেখকের নাম, প্রকাশসাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে খণ্ড-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র দ্বাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'সাহিত্যধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি সংগৃহীত হলে উদ্ধৃতি-শেষে উল্লেখ করা হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৫/৫৬১) এবং 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশের 'সহায়ক-গ্রন্থ' উপশিরোনামে এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পরেই বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে সংকলনভুক্ত লেখকের নামের পাশে গ্রন্থের প্রকাশসাল ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে এবং 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশের 'সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ' উপশিরোনামে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং 'গ্রন্থপঞ্জি'র 'পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ' উপশিরোনামে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : দেশ-কাল-পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : দেশ-কাল-পটভূমি

কবির মনোভূমিই কবিতার জন্মস্থান এবং কবি-মনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হলেও এই সৃজনশীল মনের গড়ে ওঠা বেড়ে ওঠার যে বৃত্তান্ত তা দেশকাল-নিরপেক্ষ নয়, বরং তা গভীরভাবে কবির স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার মর্মে প্রোথিত। একজন কবিকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতার মন ও মর্জির মানদণ্ডেই নির্মাণ কিংবা নিরিখ করতে হয়– তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রকৃতি ও প্রবণতার আলোকেই খুঁজে নিতে হয় কিংবা বুঝে নিতে হয় তাঁর মৌলসত্তার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্যসূচক অভিজ্ঞানসমূহ। তবু কবি ও কবিতার আলোচনায় অনিবার্যভাবে কবির ব্যক্তিজীবনের নানা অনুষঙ্গে অবতীর্ণ হতে হয়। একজন সৃজনশীল মানুষের ব্যক্তিজীবন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৃত্তে আবদ্ধ নয় বলেই আমরা তাঁকে সময়ের দর্পণে দাঁড় করিয়ে নানা দিক থেকে তাঁর অবয়বটি পরখ করতে চাই, সমাজজীবনের বিচিত্র সম্পর্কসূত্রে তাঁর মানসপ্রবণতা চিহ্নিত করতে চাই, স্বকালের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় কবির স্বস্তি কিংবা অস্বস্তির ধরনধারণ সম্পর্কেও আমাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। পাঠকের এ আকাঙ্ক্ষা কেবল কবির দৈশিক পরিমণ্ডল পরিদর্শনেই পরিতৃপ্ত হয় না, এই সৃষ্টিশীল মানুষটিকে বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাও লক্ষ করা যায়। কবির এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের আদ্যোপান্ত অনুধাবনে পাঠকের এ প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে 'সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।' (২০০৬ : ৫/৩৩৯); কারণ অনুসন্ধিৎসু ও রসপিপাসু কাব্যপাঠককে জানতে হয় 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে' এবং এ বিষয়ে সম্যক অবগতির অভাবে কাব্যপাঠের গতিবিধি ভুল পথে ক্লান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক নানা অস্থিরতা ও অসুস্থতায় পরিকীর্ণ এবং এই অনাকাঙ্ক্ষিত-অপ্রত্যাশিত সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিভেদ-বিভক্তির ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের ব্যাকুল বাসনা, সুস্থ-সুন্দর-আলোকিত জীবনের স্বপ্ন-প্রত্যাশা। এই স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে কেবল উপলব্ধি, চিন্তা ও ধ্যানের ধূসর জগতে আবদ্ধ না রেখে তা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়ও প্রকাশিত হয়েছে এই দশকে। তাই পরাধীন বাঙালি বাস্তবের রক্তাক্ত প্রান্তর দেখে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে সাহসে বুক বেঁধে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে। 'অবিভক্ত বঙ্গে চল্লিশের দশক রক্তঝরা প্রতিবাদী আন্দোলনের দশক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলতারও কাল, বিশেষ করে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। সে সময় বাঙালি সমাজ যে রাজনীতি ধারণ করেছে তা ছিল দুই বিপরীতের টানাপোড়েনে অস্থির। তবে সংস্কৃতিচর্চায় দুই মেরুতে টান থাকলেও সেখানে প্রতিবাদী চেতনার উপস্থিতি ছিল প্রবল।' (আহমদ রফিক ২০১৩ : ১)। এই প্রতিবাদের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা অবিভক্ত বঙ্গের জীবনমানসে যে চিহ্ন রেখে গেছে, তা কবিতার অন্তর ও অবয়বকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। *কালান্তরের* 'লোকহিত' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যকে প্রয়োজনের প্রকাশ বলতে আপত্তি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু 'সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ'– এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন তিনি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১২/৫৮১)। জীবনানন্দ দাশ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ।' (২০০২ : ১৭)। রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে আত্মস্থ করেছেন চল্লিশের কবিরা, কিন্তু কাব্যচর্চায় জীবনানন্দের এই অভিব্যক্তিকেই যেন শিরোধার্য করেছিলেন তাঁরা। তাই চল্লিশের বাংলা কবিতার গতিবিধি চিহ্নিত করতে হলে সেই সময়ের জনজীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহেরও খোঁজখবর নিতে হয়।

চল্লিশের দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের প্রয়োজনে পূর্ববর্তী তিন দশকের কতিপয় ঘটনা এবং জনজীবনে এর অভিঘাত বিবেচনায় রাখা জরুরি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বিস্মৃত হওয়ার পূর্বেই বিপন্ন ও বিধ্বস্ত পৃথিবীকে লাভ করতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ অভিজ্ঞতা। এর অভিঘাত মানুষের চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা কবিতার পাঠ নিলেই তা অনুধাবন করা যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরও যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিহত করা সম্ভব হল না, তখন অনেক কবিরই কক্ষচ্যুতি ঘটল,

আপন স্বভাবকে জলাঞ্জলি দিয়ে, কবিতার ভাব ও ভাষার আত্মস্থ পথের পরিবর্তে ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করলেন তাঁরা এবং পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই একই গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন :

> প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা (১৯১৪) থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি (১৯৪৫) পর্যন্ত বছর তিরিশের সময় পরিসরে আমাদের এই বস্তুপৃথিবী যেমন তেমনি আমাদের কাব্যপৃথিবীও আমূল বদলে গিয়েছিল। দুই পাথরের সংঘর্ষে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি দুই মহাযুদ্ধের দুঃসময় বাংলা কবিতায় কিছু আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছিলো। বৈষয়িক পৃথিবীর দুঃসময় অনেক সময় শিল্পের জন্যে সুসময় হ'য়ে দেখা দ্যায়। তাই এই সময়েই আমরা পেলাম নবীভূত রবীন্দ্রনাথকে, নজরুল ইসলামকে, জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে-কে। ঐ তিরিশ বছরের পরিসর জুড়ে এতোজন প্রধান কবি কাজ করেছেন এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। (১৯৮৭ : ১২৭)

উপরিউক্ত কালখণ্ডের বাংলা কবিতায় সময় যে ফসল ফলিয়েছে, চল্লিশের কবিবৃন্দ তা কেবল ভোগই করেন নি, নিজেদের ভাণ্ডারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সতেজ থাকায়, তাঁরাও কবিতার গতিপথ জনতার দিকে ঠেলে দিলেন। এই পথনির্মাণেও আমরা চল্লিশের কবিবৃন্দকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপুষ্ট হতে দেখি। সেই সঙ্গে আরো কিছু ঘটনার অভিঘাত মনে রাখা দরকার, যা এই দশকের কবিদের দুঃসাহসী হতে অনুপ্রাণিত করেছে। '১৯৩০-এর এপ্রিল। বিপ্লবী সূর্যসেনের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক নানা-বয়সের সাহসী যোদ্ধার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই এবং পরে জালালাবাদ পাহাড়ে অসমযুদ্ধ এবং শহীদদের আত্মদানের পর মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি। দীর্ঘ অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু অনুরূপ আত্মদানের মহিমায় ভাস্বর (১৯৩১)। বাংলার আবহাওয়া তখন অনেকটাই বিপ্লবতাড়িত। এর আগে থেকেই স্বাদেশিকতার টানে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ এবং বিশের দশক থেকে সাম্যবাদী রাজনীতির অঙ্কুর যার প্রভাব সংস্কৃতিক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি।' (আহমদ রফিক ২০১৩ : ১)। রাজনীতি ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ়করণের এই প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের অবদানও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। রবীন্দ্র-জীবনের শেষ দশকের সাহিত্যকর্মের প্রবণতা সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃত অর্থেই ভারতবর্ষে, বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অন্যতম উদ্‌গাতা– আমাদের সাহিত্যে তিনিই প্রথম শান্তির সপক্ষে আবেগ-উদ্দীপ্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ-কবিতা ছড়া ও সঙ্গীত রচনা করে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রপথিক সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে উন্নীত করেছেন– তাঁর জীবনের শেষ দশক সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত, বোধ করি সর্বজনস্বীকৃত। ফ্যাসিবাদের বি-মানবিকতার থাবা থেকে বিশ্ব-সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই প্রগতিশীল ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নন্দিত। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৪ : ১০)

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও চল্লিশের কবিতা বিবেচনার মানদণ্ড স্বতন্ত্র হওয়া জরুরি হলেও– এবং ১৯৪১-এর ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেও– তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অনেক অনুষঙ্গই চল্লিশের কবিতার রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফর, রাশিয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি ও জনকল্যাণকর চেতনার প্রশস্তি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন এবং কৃষিখাতের উন্নয়নে রাশিয়ার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের এই বিবেচনা অবিভক্ত বঙ্গের প্রগতিশীল রাজনীতি ও সাহিত্যে গতি সঞ্চার করে এবং বিরোধী শিবিরে ব্যাপক বিতর্কের ঝড় তোলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের বার্তা প্রচারে অবিচল থাকেন। বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিও সমর্থন জানান তিনি, তাঁকে উৎসর্গ করেন *তাসের ঘর* নাটিকা।

তিরিশের দশকের আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ চল্লিশের রাজনীতিকে নাড়া দিয়েছে এবং এর প্রভাবে এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। 'জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখল (১৯৩৪), ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৫), একবছর পরই স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু– দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির সমর্থনপুষ্ট স্বৈরাচারী ফ্রাংকোবাহিনীর লড়াই গণতন্ত্রী স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে। রোঁমা রলাঁর উদ্যোগে ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত, মূলত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়।' (আহমদ রফিক ২০১৩ : ২)। ১৯৩৫-এর ২১ জুন অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কি এবং আঁরি বারবুসও ছিলেন এবং এই সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন আঁদ্রে জিৎ, ই. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্যাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্যাচি প্রমুখ। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মুলকরাজ আনন্দ। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৪ : ১১)।

এই সম্মেলনে গঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব রাইটার্স ফর দ্য ডিফেন্স অব কালচার এগনেস্ট ফ্যাসিজম'। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রীটের নানকিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত বৃটিশ ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বাড রীড, মন্টেগু স্ল্যাটার, ই. এম. ফর্স্টার, রজনী পাম দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, মুল্কুরাজ আনন্দ, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, ভবানী ভট্টাচার্য, কে. এস. ভট্ট, এস. সিংহ, এস. ডি. তাসীর প্রমুখ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, কিন্তু প্রস্তুতি পর্বে লন্ডনে গঠিত প্রগতিশীল লেখকদের সংঘ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৪ : ১২)। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহেরু। এ সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হলে, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সাজ্জাদ জহীরের উদ্যোগে ১১ জুলাই কলকাতার এ্যালবার্ট হলের কমিটি রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। 'এই শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এডভান্স) ও খগেন্দ্রনাথ সেন। এই সভায় সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-র সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে না পারায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গোর্কির এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।' (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ৬)। এই সংগঠনের কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হওয়ায় প্রগতিশীল মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে তা যোগ করে নতুন মাত্রা।

১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই স্পেনে ফ্যাসিবাদ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। মুসোলিনি ও হিটলারের সমর্থন-সহযোগিতায় সেখানে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ঘটে। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ৩ সেপ্টেম্বর রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ৫–৭ সেপ্টেম্বর ব্রাসেল্সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভারতের প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে পঠিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়, 'পৃথিবীর সম্মুখে আজ আতঙ্কের মতো আর এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সমুপস্থিত। ফ্যাশিস্ট স্বৈরতন্ত্র মাখনের বদলে কামান তৈরীতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে বিকশিত করছে সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক স্বরূপকে। ইতালী যেভাবে আবিসিনিয়াকে পদানত করল, তা সভ্যতা ও মানবতার উপাসক সকল মানুষকেই স্তম্ভিত করেছে।' (উদ্ধৃত, ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ৬-৭)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ ঐ বাণীতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

১৯৩৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের বাংলা শাখার প্রথম সাহিত্য সংকলন *প্রগতি*। অত্যাচার, নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে *প্রগতি* তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কমিউনিজম বা মার্কসবাদের কথা এ সংকলনে স্পষ্টভাবে না বলা হলেও প্রগতি-র লেখকদের মধ্যে কয়েকজন মার্কসবাদী লেখক ছিলেন। (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৪৪)। এই সংকলন প্রকাশের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যে 'প্রগতি' শব্দটি মার্কসীয় শিল্পাদর্শের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয় যা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। *প্রগতি*-তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখা বিবেচনা করে সমালোচক মাহবুবুল হক প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য ও প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে উপস্থাপন করেছেন : ক. সাহিত্য হবে দেশকাল ও সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; খ. সাহিতের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে থাকবে গণমানুষের জীবন; গ. সাহিত্যের মর্মবস্তুতে থাকবে সমাজের শুভত্বময় রূপান্তরের আদর্শ; গ. সাহিত্যে জীবন ও জগৎকে দেখতে হবে প্রগতিশীল বিশ্ববীক্ষার আলোকে। (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৪৫-৪৬)। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশগ্রহণ করেন মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী খ্যাতিমান সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযানের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। বি-মানবিকতার বিপক্ষে কবির অবস্থান এই পর্যায়ে আরো প্রবল হয়ে ওঠে। মানবিক বিপর্যয়ের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ প্রয়াস প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোক্তাদের চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

> আবিসিনিয়া-স্পেন-চীন-অস্ট্রিয়া-চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযান দেখে কবি যেভাবে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন, তাতে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, League Against Fascism And War, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিশ্ব-প্রস্তুতি কমিটি, সারা-ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি– এসব আন্দোলন ও সংগঠনের প্রত্যেকটিতেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা তাঁদের প্রতিটি উদ্যোগেই কবির সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করতেন। (১৯৯৪ : ৪৫-৪৬)

১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে হরিপুরা এবং ত্রিপুরায় অধিবেশন বসে। ত্রিপুরায় মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের কংগ্রেসী মহলে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আরো গতি সঞ্চারিত হয়। 'কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও সোমনাথ লাহিড়ী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রূপে কংগ্রেসকে বামমুখী করার কাজে সে-সময় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আর, বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন হয়ে ওঠে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রচারের প্রধান প্রবক্তা।' (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ১০)। এ পর্যায়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সদ্য পাশ করা তরুণদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। এর আগেই গোপাল হালদার ১৯৩৮ সালে কারাগার থেকে মুক্ত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তখন গোপাল হালদারের মতো অনেক বুদ্ধিজীবীরই আশ্রয়স্থল ছিল এই কমিউনিস্ট পার্টি। এ প্রসঙ্গে অজয় রায় লিখেছেন :

> বাংলার বন্দিশিবির ও ১৯৩৮ থেকে দীপান্তরের বন্দিরা একে একে বেরিয়ে আসছেন। যাঁরা মুক্তি পাচ্ছেন তাঁদের মাঝে গরিষ্ঠ অংশ বেরিয়ে আসছেন কমিউনিস্ট হিসেবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তখন ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্টের জোয়ার। বিশ্বের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা তখন এই ধারায় শরীক। (২০০২ : ২১০-১১)

১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়, গঠিত হয় সাংগঠনিক কমিটি। 'এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। উৎসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহ ও সংগঠন পরিচালনার দক্ষতায়, সোমেন চন্দ হয়ে ওঠেন সংগঠনের মধ্যমণি।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৯ : ২৩৬)। এর আগে, ১৯৩৫ সালে, প্রগতি লেখক সংঘের প্রস্তুতিকালে একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়, যাতে প্রগতিশীলতার স্বরূপ নির্দেশের প্রয়াস লক্ষ করা যাবে। দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত প্রগতি লেখক সংঘের ইশতেহারে বলা হয়েছে, 'যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।' (১৯৮৬ : ২৫০-২৫১)। প্রগতি লেখক সংঘের কার্যক্রম ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে কিছুটা স্তিমিত হলেও ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলের তরুণদের সংস্কৃতি-চর্চায় প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতেও লক্ষ করা যাবে মার্কসীয় মতবাদের প্রতিফলন। ১৯৪০-এর মাঝামাঝি গেণ্ডারিয়া হাইস্কুল মাঠে এই শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। রণেশ দাশগুপ্ত এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন এবং সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় সোমেন চন্দকে। (হায়াৎ মামুদ ১৯৮৭ : ৫১)। ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ করলে প্রগতিশীল বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, ২১ জুলাই গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ১৫ ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে ঘোষণা করে এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত মিত্র শক্তিকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকার প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হন।

সোমেন চন্দের এই মর্মান্তিক মৃত্যু ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৩ মার্চ প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই হত্যার প্রতিবাদে প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৯ : ২৪৯)। ২৮ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' নাম পরিবর্তন করে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' পরিণত হয়। ১৯–২০ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এই সংঘের প্রথম সম্মেলনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান করে যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, হবিবুল্লাহ বাহার এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে অমৃত রায়, শচীরাউত রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ভাষণ ও কবিতা পাঠ করেন। সেইসঙ্গে গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনে সমবেত জনগণকে উজ্জীবিত করা হয়।

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ব্যাপকহারে গ্রেফতার করতে শুরু করে। এই বিরূপ পরিবেশেই মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি দলগতভাবে আন্দোলনকে সচল, সংগঠিত ও সক্রিয় করে একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠন করে। ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, 'এই ইউনিট গঠিত হল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আগত প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী বিনয় রায়, জনযুদ্ধ পত্রিকা থেকে আগত বিশিষ্ট লেখক-সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুধী প্রধান আর কবি-সাহিত্যিক অনিল কাঞ্জিলাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে।' (২০০৩ : ১৮)। ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বে শহরে প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১৫–১৭ জানুয়ারি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও সমবেত হন প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্দীপনাময় ভূমিকা রাখতে। (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৫১)। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা চরম রূপ ধারণ করলেও বাংলা দেশের প্রগতিশীল চিন্তার ধারক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সক্রিয় থেকে দানবীয় শক্তির পরাজয়ের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। 'এই সময়কালে রচিত বাংলার সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সময়ের ক্ষতচিহ্ন তাঁদের প্রায় সবার লেখাতেই উপস্থিত। দুঃসময় যত ঘনীভূত হয়েছে, সুদিনের আশায় প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১৭)। কেবল চিন্তার দিক থেকেই নয়, সুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নেও অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ মন্বন্তর সংঘটিত হয়। 'মুনাফালোভী ব্যববসায়ীদের মজুত কৌশলে' সৃষ্ট এই মন্বন্তরে বিপুল-সংখ্যক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ভিক্ষের কারণ এবং জনজীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন :

> বিংশ শতাব্দীতে ঘটে গেছে দু'দুটি মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধ বয়ে আনে মহাবিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ক্ষতি। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) ফলে বাংলার মানুষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তারপর আমাদের সংস্কৃতি ও প্রগতি আপন গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯) প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বাংলার সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করল। যুদ্ধজনিত নানা সমস্যা বাংলার প্রেক্ষাপটকে দ্রুত বদলে দিতে থাকল। মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটল। নানাভাবে মানুষকে অর্থলোভী করে মানুষকেই মানুষের মারণযজ্ঞের হোতা করে তুলল। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ এল পঞ্চাশের (১৯৪৩ খ্রী.) মন্বন্তর। (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ৯)

মন্বন্তর চল্লিশের বাংলা কবিতায় স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে। সেই সময়ের সকল কবিকেই ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার এবং মর্মঘাতী মৃত্যু আহত করেছে এবং অসহায় মানুষের পক্ষে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ প্রসঙ্গে বিনতা

রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয় এ সময়কালের কবিদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। সেসময় প্রায় প্রত্যেক কবিই এ বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। কোন কবি করুণাঘন বিষণ্ণতায় দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ্ চিত্র ফুটিয়ে তুললেন, কোন কবি মন্বন্তর-স্রষ্টা মনুষ্য-ঘাতকদের তীব্র ক্ষোভে অভিযুক্ত করলেন, কেউ বা তাঁদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে প্রতিবাদী রূপ দিলেন, আবার কোন কবির কবিতায় ধ্বনিত হল সমবেদনাপূর্ণ আশার বাণী।' (১৯৯৭ : ১৬৬)। দুর্ভিক্ষ কেবল কাব্যবিষয় হিসেবেই গৃহীত হয় নি, এর ভয়াবহতাকে চিত্রিত করার ব্যতিক্রমী একটি ভাষাভঙ্গিও নির্মাণ করে নিয়েছেন সেকালের কবিরা। 'দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা বাংলা কবিতার রূপ ও রীতিতে নিয়ে এসেছিল এক বিবর্তন। দুর্ভিক্ষ না ঘটলে এই বিবর্তন এত তরান্বিত হতো কিনা সন্দেহ। যেমন সরাসরি কথা বলা, প্রতীকী তাৎপর্য, বিষয় ও শব্দ ব্যবহারে দুঃসাহসিক প্রবণতা এ সময়ের ফসল।' (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ৯৯)। তেতাল্লিশের মন্বন্তর চল্লিশের বাংলা কবিতাকে কেবল গণমুখীই করে নি, প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কবিতা কখনো কখনো লক্ষ্যভেদী অস্ত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধ বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সকল স্তরেই ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নড়ে ওঠে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতও । ট্রাম ধর্মঘট, রেল শ্রমিকদের আন্দোলন, অক্টোবরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস পালন, ডিসেম্বরে ব্রেথওয়েট-এর কারখানা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও মিছিল সহ বহুমাত্রিক বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালে দুই বাংলার বিপ্লব ও সংগ্রাম আরো প্রবল হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ধর্মঘট, মিছিল ও অবরোধে জনজীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এই বছরই ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই ও করাচীর নৌ-সেনা বিদ্রোহের প্রভাব জনগণকে সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। ১৬ আগস্টের মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটায়। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর রক্তের বন্যায় কলকাতার রাজপথ কলঙ্কিত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হয় সারা বাংলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভাগচাষীর মৃত্যুঞ্জয়ী তে-ভাগা আন্দোলন। কৃষক ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার জন্য অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন, দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা ও বাংলার কাকদ্বীপ-এর কৃষক বিদ্রোহের প্রবলতা প্রগতিশীল সাহিত্যিকদেরকে প্রভাবিত করেছিল। (১৯৯৬ : ৬১)। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকেই অধিকার-আদায়ের মিছিলে আহ্বান করেছে। মানুষের জীবনবোধকে তা যেমন নাড়া দিয়েছে, তেমনি প্রগতিশীল শিল্পচর্চায়ও তা যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রগতি-কবিতার গতি ও গন্তব্য নির্ধারণে উপরিউক্ত আন্দোলন-সংগ্রামের প্রভাব অনস্বীকার্য। কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো-বা পরোক্ষভাবে এই ঘটনাসমূহ প্রগতিশীল সাহিত্য-চেতনাকে শাণিত ও সমৃদ্ধ করেছে। এই বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ কাল-খণ্ডের গর্ভেই জন্ম নিয়েছে চল্লিশের সমাজসচেতন কবিবৃন্দ, যাঁরা কেবল প্রতিভা কিংবা পাণ্ডিত্যকেই কাব্যরচনার মূলধন করে 'ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো'র চেষ্টা করেন নি, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকেই কখনো কখনো বুকের রক্তেও রঞ্জিত হয়েছে তাঁদের কবিতা। সেই রক্তের ঋণ শোধবার যে-কোন প্রয়াসই বোধকরি ব্যর্থ হবে : যাঁরা তাঁদের বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন, সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানতে হবে সাহিত্য মানেই 'জীবনে জীবন যোগ করা'। 'কৃত্রিম পণ্যে'র বেসাতি করলে কালের গর্ভে বিলিন হওয়ার পথই কেবল প্রশস্ত হয়, কালোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টার স্বীকৃতি লাভের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

চল্লিশের দশকের দৈশিক এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটই কবিতার অন্তর ও অবয়বকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করেছে। এই দশকের কবিবৃন্দের মধ্যে সময়-সমাজ-রাজনীতিচেতনার প্রকাশ প্রবল হলেও এই চেতনাও ব্যক্তিভেদে ভিন্নতর পথসন্ধানে সচেষ্ট ছিল। তা-সত্ত্বেও সময়ের প্রয়োজনে তাঁরা কখনো কখনো একই মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন, যোগ দিয়েছেন জনতার মিছিলে। শিল্পের এই সমবায়ী স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের সংস্কৃতিচর্চার স্বরূপ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> সূত্রাকারে হলেও বলতে হয়, চল্লিশের দশকে সংস্কৃতিচর্চার প্রধান ঝোঁকটাই ছিল আদর্শভিত্তিক সৃষ্টিকর্মের এক সচেতন প্রয়াস। সেই চর্চা, এক সংঘবদ্ধ প্রয়াস তথা আন্দোলনের রূপ নয় শুধু, চরিত্রও অর্জন করেছে, যে চরিত্র প্রধানত ছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা-নির্ভর, সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রভাবে-জারিত। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কার্যকারণের দায়ে, এর বহিরঙ্গে ছিল এক ব্যাপক-ভিত্তিক মঞ্চের ঔদার্য, যেখানে শুধু নির্দিষ্ট আদর্শের কট্টর অনুসারীগণই জড়ো হননি, হয়েছেন সাধারণভাবে প্রগতিবাদী বা শান্তিবাদী বা উদার মানবিক চেতনার শিল্পী কবি সাহিত্যিকগণ। প্রধানত বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও অবক্ষয়ের ব্যাপকতায় সংবেদনশীল শিল্পীমানস সহজেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং মানবিক বোধের এক অন্তঃশীলা আবেগের প্রভাবে মানবকল্যাণের পক্ষে ও পশুশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আদর্শে গড়ে তোলা আন্দোলনের সাধারণ স্রোতে শামিল হয়। (আহমদ রফিক ২০১৩ : ৩)

উপরিউক্ত মন্তব্যে সমালোচক যে স্বাতন্ত্র্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা মুখ্যত 'সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের দান' এবং এতে লক্ষ করা যাবে 'নানা-বর্ণ, নানা-গোত্র ও নানা মতের অনুসারীদের এবং শিল্পকলার নানা শাখার কারিগরদের উপস্থিতি'। যদিও আমাদের বর্তমান আলোচনা এই দশকের কবি ও কবিতার প্রকৃতি ও প্রবণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

চল্লিশের প্রধান কবি হিসেবে যাঁরা স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের চেতনার সিংহভাগই রাজনীতি দ্বারা অধিকৃত। যদিও তাঁদের কবিতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখার চেষ্টাও কোন কোন সমালোচনায় লক্ষ করা যাবে, আমাদের বিবেচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিও বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত। চল্লিশের কবিরা রাজনৈতিক অনুষঙ্গের কাব্যিক রূপায়ণেই আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাঁদের এই প্রয়াস মূল্যায়নে ভিন্নতর মানদণ্ডের ব্যবহার অপরিহার্য। আধুনিকতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিচর্যা মানুষকে যে নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতার বিবরে বন্দি করে, সেই বিবরবাসী মানুষের পক্ষে এই দশকের কবিতার রসাস্বাদন সহজ নয়। "আধুনিক মানুষের মধ্যে ব্যক্তিচেতনাবোধ প্রবল এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজে বা রাষ্ট্রে কখনো-কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন সাকল্যবোধ ব্যক্তিচেতনাকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি-মানুষ তার আত্মচিন্তাকে কিছুটা হলেও দূরে সরিয়ে রাখে। এটি সে তার আত্মনিষ্ঠা থেকেই করে। কারণ, সে বুঝতে পারে সামূহিকতার পরিবর্তন তার ব্যক্তিগত জীবন যাত্রায়ও আনবে আমূল পরিবর্তন। যাপিত-জীবনের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহ তাকে প্ররোচিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন-প্রচেষ্টার দিকে ঝুঁকতে। এসব কার্যকলাপে সবসময় যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা প্রকাশিত তা-ও কিন্তু নয়। বরং 'বুদ্ধি-বিবেচনা'র প্রশ্ন তোলাই অনেক সময় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের জন্য এই ধরনের সময় বড়োই দুর্যোগের।" (সৌভিক রেজা ২০১৩ : ৬৩)। এই 'দুর্যোগে' দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকেন নি চল্লিশের কবিরা, বরং দুর্যোগময় দিনরাত্রির অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা সৃষ্টির আনন্দ সঞ্চয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। আহমদ রফিক যথার্থই বলেছেন, চল্লিশের কবিতার 'মূল চরিত্র এর উপকরণগত বৈশিষ্ট্য যেমন আত্মরতির পথ ধরে চলেনি, তেমনি গ্রহণ করেনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ গণ্ডির পাঠ'। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ গহ্বরে ডুবে যান নি এই দশকের কবিরা। আহমদ রফিক আরো লিখেছেন :

> সমকালীন যুগধর্মের প্রভাবে ও আন্তর্জাতিক চেতনার স্পর্শ নিয়ে সমাজচেতনা, কখনো-বা সংগ্রামী শ্রেণিচেতনা এ যুগের প্রধান কবিদের মানস পরিমণ্ডলে প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও অস্থিরতার কারণে সংবেদনশীল কবিমানসের সচেতনতা এমন একটি সাধারণ গুণগ্রাম অর্জন করেছিল যে সমকালীন বাস্তবতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক বিলাসিতা সম্বল করে কবিতা লেখা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজনীতি এদের চেতনায় এক আলোড়িত সত্য, যে সত্যের অনুভব তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে কবিতার মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করতে, চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে। (২০১৩ : ৫)

সমালোচকের এই মন্তব্য থেকে রাজনীতিবিমুখ সাহিত্যসমালোচকবৃন্দের সাহিত্যপাঠ ও মূল্যায়নের ব্যাকরণটি অনুধাবন করা সম্ভব। শিল্পসাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি এবং তা মানুষেরই জন্য। তাই এ দশকের কবিরা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন, মানুষের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে তাদের একজন হিসেবে আত্মপ্রকাশের সাধনা করেছেন।

চল্লিশের কবিতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে প্রগতিশীল রাজনীতির প্রভাব যেমন স্পষ্ট, সেইসঙ্গে অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপড়েনও কম দায়ী নয়। দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে স্বাস্থ্যসম্মত আন্তঃসম্পর্কের অনেক নজির থাকলেও একটা বিভাজন চিহ্ন মাঝে-মাঝেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এই স্পষ্টতর বিভাজন-রেখাটি রক্তেও রঞ্জিত হয়েছে কখনো কখনো। নানা সময়ে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সেই বিভাজন-রেখাই ভয়াবহ দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্ববাংলার আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপট এবং এই সময়ের সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বশীল ধারা সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন :

> তিন দশকের মধ্যবিত্তশ্রেণীর শক্তিশালী অংশই সামন্ত-শ্রেণীউদ্ভূত অথবা ঐ শ্রেণীর জীবনদর্শনে প্রতিপালিত। পাকিস্তান-আন্দোলন তাঁদের মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার যেমন আশা জুগিয়েছিল, তেমনি সক্রিয় রেখেছে সামন্ত-জীবনাগ্রহ। বুর্জোয়া-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ ক্ষমতায় ও নেতৃত্বে থাকলে অর্থনৈতিক সুবিধার সঙ্গে তাঁর হয়তো সংস্কৃতিকে সহজ সমীকরণ করতেন না। অবশ্য বুর্জোয়া জীবনাচরণ-সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় এই সময় ক্ষমতায় সক্রিয় ছিলেন। উপর্যুক্ত দুই শ্রেণী-আদর্শের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বলালিত একটি তৃতীয় অংশের অস্তিত্বও দুর্লক্ষ্য নয়। এই ত্রিধারা বিভক্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী তথা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীবৃন্দের পদচারণায় মুখর ছিল বিভাগ-পূর্বকালীন চিন্তাক্ষেত্র, সাহিত্য-প্রাঙ্গণ। (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫ : ৩৪-৩৫)

যে স্বপ্ন নিয়ে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, যথাসাধ্য সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতেও খুব বেশি সময় লাগে নি। সৈয়দ আকরম হোসেন লিখেছেন, '৪৭-এর পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা ও উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হল দেশীয় সামন্ত প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ও বৃহৎ বেনিয়া পুঁজির দ্বারা। পূর্ববাংলার সমাজবিকাশ হল রুদ্ধগতি। সামন্তশোষণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী বড় ধনিক বেনিয়াদের শোষণে ও শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে এবং ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কাঁচামাল ও বাজারের অনুকূলে পূর্ববাংলা গড়ে উঠলো আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজরূপে।' (১৯৮৫ : ৩৬)। অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়েছে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এবং দেশ-ভাগের ধর্মভিত্তিক বিবেচনার আড়ালে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল তা-ও তাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে দেশীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি প্রবল হয়ে ওঠে। তারই ফলাফল লক্ষ করা যায় দেশভাগ ও হিন্দুস্থান-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলও হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। এর অমানবিকতা ও অবৈজ্ঞানিকতাকে স্বীকার করে নিয়েও যে কথা বলা যায় তা হলো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণই ছিল এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কেই বিবেচনা করা হয় জাতিত্বের উপাদান রূপে। তবে এটিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে বেশিদিন লাগে না। বাংলা কবিতা তথা সাহিত্যেও তাঁর প্রতিফলন শুরু হয়। (জুলফিকার মতিন ১৯৯৯ : ৮৩)

দেশভাগ যে সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ফসল, সেই বিবেচনা থেকেই পূর্ববাংলার সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। হিন্দু মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক প্রতিপত্তির সমান্তরাল একটি ধারা সৃষ্টির প্রয়াস থেকেই মুসলমান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ধর্মশাসিত পুঁথির জগতে ঐতিহ্যের শেকড় অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। 'তাঁদের মুসলিম জাতিভিত্তিক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ যতটুকু না মুসলিম জীবন-চিত্রণ প্রয়াসজাত তার চেয়ে অধিক ছিল ধর্মগত সম্প্রদায়িক ও শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ মানসিকতাজাত।' (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫ : ৩৭)। এই প্রয়াস 'সমাজজীবনের প্রধান-দ্বন্দ্ব মূল-উত্থিত না হওয়ায় এবং প্রগতিশীল নয় বিধায়' তা পরবর্তী সাহিত্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছেন, '১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক সত্তার আনুকূল্যে মুসলমান মধ্যবিত্তের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ ঘটলো বাংলাদেশে। এবং আমাদের সাহিত্য প্রধানত এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজেরই শৈল্পিক অভিব্যক্তি। বস্তুত বাংলাদেশের কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই সমাজেরই বেড়ে-ওঠার ইতিহাস। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-নৈরাশ্য, স্বপ্ন-সম্ভাবনা গত তিরিশ বছরের কবিতার উপমায়, প্রতীকে, শব্দে সঙ্কেতে নানাভাবে উন্মোচিত।' (২০০১ : ৩৯৬)। 'বাংলাদেশের কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে' দেশভাগের প্রভাবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান অনস্বীকার্য

হলেও ধর্মভিত্তিক সাহিত্যসৃজনের যে প্রয়াস তাঁরা দেখিয়েছেন, তার অনুবর্তী না-হয়ে পরবর্তী পর্যায়ের অধিকাংশ সাহিত্যকর্মী ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে জীবনভিত্তিক সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন দেশের অর্থনীতির প্রধানতম নিয়ন্তা, তেমনি তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহেও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতার মনোদৈহিক পরিবর্তনে রাজনৈতিক প্রভাবজাত কয়েকটি সাংস্কৃতিক ঘটনার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। '১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যখন প্রকট হয়ে ওঠে, দেখতে পাই, শুধু রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীরাই নন, কবি-সাহিত্যিকরাও উদ্বেলিত হন ইসলামের আদর্শে, ধর্মীয় চেতনায়, স্বাধীন ও ইসলামিক রাষ্ট্রের কাঠামোয়।' (দাউদ হায়দার ১৯৮৫ : ছয়-সাত)। এ বছর পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় যার ভিত্তি ছিল ওই লাহোর প্রস্তাব। এই সংগঠন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি আদর্শভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুজীবুর রহমান খাঁ। এই সংগঠনের লক্ষ্য সম্পর্কে সাঈদ-উর রহমান পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্যবিবরণীর বরাত দিয়ে লিখেছেন :

> সোসাইটির লক্ষ্য ছিল 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানের সাহিত্যিক রূপায়ণ', পাকিস্তান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তানবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহত করা। সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বলতে এঁরা বোঝাতেন হিন্দুদের থেকে পৃথক থেকে মুসলমানদের জীবনভিত্তিক, ফারসী-উর্দু শব্দবহুল বাংলাভাষায় সাহিত্যরচনা করা এবং সংস্কার করে নতুন বাংলা ভাষা নির্মাণ করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম ছিল সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি। (২০০১ : ২৫)

এই সংগঠনের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে এবং পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, যার সভাপতির দায়িত্ব দেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং সৈয়দ আলী আহসান এই সংগঠনের সম্পাদক মনোনীত হন। এই সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে, ১৯৪৩ সালে। সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদে'র উদ্দেশ্য ছিল আইরিস লিটারেরি রিভাইভালের আদলে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা। 'যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের অতীত, ইসলামের ভাবাদর্শ এবং গ্রামীণ লোককাহিনীকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা।' (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৩ক : ১৭)। পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টিই কেবল নয়, এই আদর্শের ভিত্তিতে জীবনযাপনের তাগিদ থেকে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৮২-তে প্রকাশিত রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকীর *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ : তমদ্দুন মজলিস* গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের বরাত দিয়ে এই সংগঠনের গঠনতন্ত্রের চারটি উদ্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন সাহিত্যসমালোচক সাঈদ-উর রহমান :

> ক. 'কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়া' দূর করে 'সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন' গড়ে তোলা
> খ. 'যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক' সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়া
> গ. 'মানবীয় মূল্যবোধের ওপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা' করা
> ঘ. 'নিখুঁত চরিত্র' গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা। (২০০১ : ২৬-২৭)

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতায় আরো কিছু সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত লক্ষ করা যাবে, যদিও প্রতিটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পেছনেই শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি এবং এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে কখনো কখনো পূর্ব বাংলার সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিরোধের প্রমাণ মেলে। বাংলা ভাষার ওপর উর্দু ভাষার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকেই থেকেই শুরু হয়। '১৯৪৭-এর দেশবিভাগ বাংলা কবিতার আবহমান ধারায় স্থাপন করে এক রক্তাক্ত ছেদচিহ্ন– যা উপমহাদেশের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৩ : ৬৫)। '৪৭-পরবর্তী পূর্ববাংলার মানুষের ইতিহাস কেবল শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, যা এই বাংলার কবিতার ভাষাকেও দীর্ঘশ্বাস-ভারাক্রান্ত করেছে। শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বপ্ন-প্রত্যাশাও

জনমনে ধূমায়িত হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মঞ্চও তাই ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে এবং সেই প্রতিরোধের নানা চিহ্ন সে-সময়ের কবিতায় লক্ষ করা যাবে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'অধিকাংশ ছিল বেসরকারী উদ্‌যোগে এবং সেগুলোতে মতাদর্শের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সমস্যাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় সেগুলোর ভূমিকা রয়েছে, তাই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ৩৪)। এই সম্মেলন পূর্ব বাংলার কবিবৃন্দকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার। অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন, 'মূল সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। শিক্ষায় ও জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেন। বাংলা ভাষার সংস্কারে উৎসাহী না-হয়ে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার কাজে উদ্‌যোগী হতে তিনি সবার প্রতি আহবান জানান।' (২০০১ : ৩৫)। এই অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ভাষার ভিত্তিতে গভীর-ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে ঐতিহ্য রয়েছে, তাঁর বক্তব্যে তা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই বাঙালিত্বের সুমহান আদর্শ প্রোথিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর ১৯৯৫ : ১৪৯)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করা হয় *দৈনিক আজাদ* এবং তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র *সৈনিক* পত্রিকায়। 'তারও কারণ ছিল অবশ্য– পাকিস্তানীত্ব ও বাঙ্গালীত্বের বিরোধে শেষেরটির প্রতি তাঁর খোলাখুলি আনুগত্য প্রকাশ, পাকিস্তানী মহল সহজে মেনে নিতে পারেনি।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ৩৫)। ভাষার ওপর আঘাত হানার রাজনীতির আড়ালে যে গভীরতর ষড়যন্ত্র রয়েছে সে-সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৪৮ সাল বাঙালির আত্মজাগরণের প্রথম স্পষ্ট নজির স্থাপন করেছে। যে আঘাত মুসলিম মধ্যবিত্তের ভগ্নপ্রায় স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করেছে তা মুখ্যত পূর্ব-পাকিস্তানি শাসকচক্রের ভাষা-দখলের রাজনীতি। সৈয়দ আকরম হোসেন লিখেছেন, 'বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রতিবাদ করল ১৯৪৮-এ।' (১৯৮৫ : ১৬)। ভাষার বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণির ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার যে প্রত্যয় ঘোষণা করে পূর্ববঙ্গের বাঙালি সমাজ, পরবর্তী পর্যায়ে তা আমাদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই প্রতিবাদের অন্তর্গত অনুরণন কবিতার ভাষায়ই সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মানববিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবৃন্দের নানা সাংগঠনিক তৎপরতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ– এই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ, পাকিস্তান-আন্দোলন, দেশভাগ, ধর্মভিত্তিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে স্বতন্ত্র ধারা, কখনো আবার এক ধারার সাহিত্যস্রষ্টা অনায়াসে অন্য ধারায় সমর্পিত হয়েছেন। 'চল্লিশের কবিতা মূলত যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, সর্বোপরি জনমুক্তি ও শ্রেণি সংগ্রামের পথ ধরে চলেছে এবং প্রধানত প্রগতিবাদী কবি লেখকদের হাত ধরে।'– আহমদ রফিকের (২০১৩ : ৯) এই মন্তব্য যথার্থ, তবে মনে রাখা দরকার, প্রগতি কবিতা শীর্ষক এই কাব্যধারার মধ্যেও নানা উপধারার উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। এই সমবায়ী স্বাতন্ত্র্যই চল্লিশের বাংলা কবিতায় সংহতি-সংগতি-সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশক কবিতা ও পাঠকের দূরত্ব মোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'এই কাব্যিক যুগটি সমাজচেতনার এমন এক লৌকিক দ্বার খুলে দিয়েছিল যা বাংলা কবিতাকে বুঝতে শিখিয়েছে, কবিতা ডানাকাটা পরি নয়, নয় কেবলমাত্র শব্দ ও ধ্বনির উদ্দেশ্যহীন রূপময় নির্মাণ, যা নিতান্তই মস্তিষ্ককোষের খেয়ালি ব্যায়ামের স্বেদাক্ত ফসল।' (আহমদ রফিক ২০১৩ : ৭)। জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমেই তাঁরা পাঠকের সঙ্গে গভীরতর অন্তরঙ্গতায় আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। প্রগতিশীল ধারা এই দশকের কবিতার প্রধানতম প্রবাহ হলেও এই কালখণ্ডে রচিত কবিতার নিবিড় পাঠে আরো দুটি ধারার উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, 'চল্লিশের দশকের প্রথমে অখণ্ড, ও পরে খণ্ডিত, দুই বাংলার কবিতার প্রধান ধারা তিনটি : ১. সমাজচেতনার ধারা; ২. স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারা; এবং ৩. রোম্যান্টিক কবিতার ধারা।' (১৯৮৭ : ১২৮)। সমালোচক অবশ্য উল্লেখ করতে ভোলেন নি, 'সমাজ-চেতন কবিতার ধারাটি ছিলো এই সময়ের প্রবলতম কবিতার ধারা। এর আগে, এবং পরে, আর-কখনো বাংলা কবিতা এতো বেশি সমাজচেতনায় স্পৃষ্ট হয় নি। কথাটিতে অন্যভাবে বলা যায়, ঝাঁক বেঁধে এতো বেশি সমাজ-চেতন কবি বাংলা সাহিত্যে আর-কখনো আসেননি।' *পরিচয়*, *সাহিত্যপত্র*, *কবিতা* প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ-চেতন ধারার বিস্তার সহজতর হয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন মেলে আহমদ রফিকের বিবেচনায়। তিনি লিখেছেন, 'যদিও শেষ তিরিশে এর সূচনা তবু বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সমর সেন, বিমল ঘোষ, দিনেশ দাস প্রমুখ তিরিশের কবিকূল চল্লিশে এসেই কবিতায় উল্লিখিত গরিমা সংযোজন করেছেন। আর চল্লিশের প্রধান কবিদের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তারা এই দশকের কবিতায় সমাজতান্ত্রিক তথা শ্রেণিচেতনার সংগ্রামী গুণগ্রাম সঞ্চারিত করেছিলেন একটি বেগবান প্রগতিশীল কাব্যধারার সৃষ্টি সম্ভব করে তুলতে।' (আহমদ রফিক ২০১৩ : ৬)। চল্লিশের এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, গোলাম কুদ্দুস, মনীন্দ্র রায়, রাম বসু, চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, সানাউল হক প্রমুখ। দ্বিতীয় ধারাটি মূলত কাজী নজরুল ইসলামের অনুপ্রেরণায় বিকশিত হয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারাটির কেন্দ্রীয় উৎসে ছিলেন নজরুল ইসলাম। আধ্যাত্মিকতা নয়– ইসলাম ধর্মের বহিরাচারগুলি, ইতিহাস ও ভূগোল মূলত মুগ্ধ করেছিলো এঁদের। এঁদের প্রধান পত্রিকা ছিল 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী'। এই কবিগোষ্ঠীতে ছিলেন ফররুখ আহমদ, প্রথম পর্যায়ের সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, তালিম হোসেন, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম প্রমুখ।" (১৯৮৭ : ১২৮-২৯)। তৃতীয় রোম্যান্টিক ধারায় তিরিশের বুদ্ধদেব বসুই চল্লিশের কবিদের পথনির্দেশক ছিলেন। *কবিতা* পত্রিকার মাধ্যমে প্রসারিত এই ধারায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অশোকবিজয় রাহা, এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও ভিন্ন বিবেচনায় এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। তিনি এই দশকের আরো কয়েকজন কবির নাম করেছেন যাঁরা এই ত্রিধারার কোনটির সঙ্গেই ঠিক খাপ খায় না। তাঁর মতে, 'ঠিক কোনো দলে ফেলা যায় না এরকম দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত ও নিশ্চরিত্র কবিদের মধ্যে আছেন হরপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, আহসান হাবীব, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ইমাউল হক, মতিউল ইসলাম প্রমুখ।' (১৯৮৭ : ১২৯)। চল্লিশের কবিতার গতি ও গভীরতা বিষয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের এই শ্রেণিকরণে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত হলেও, বিভিন্ন ধারার কবিবৃন্দের কাব্যপাঠে অবতীর্ণ হয়ে আমরা লক্ষ করব, এই কালখণ্ডের এক ধারার কবিকে অনায়াসে অন্য ধারায় আসন প্রদান করা চলে। কারণ একই কবি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্র পথ-পরিক্রমণে আনন্দ লাভ করেন। তবুও একজন কবির সমগ্র রচনায় বিম্বিত প্রধান প্রবণতার আলোকেই তাঁর অবয়বটি পাঠকচৈতন্যে চিত্রিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকে যে কাব্যভাবনা ও শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে, তাতে পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে স্বীকরণের স্বাক্ষর যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাতে নিজস্ব নির্মাণের একটি নির্ভরশীল দিকনির্দেশনাও লক্ষ করা যায়। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই দশকের কবিরা আবির্ভূত, যে জল-হাওয়ায় লালিত-পল্লবিত-প্রসাধিত, তার নানা চিহ্নকে ধারণ করেই একটি অগ্রসর শিল্পপ্রত্যয় অন্বেষণে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। সবল-প্রবল-প্রদৃপ্ত

এই কাব্যসাধকদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবুল হোসেন (জন্ম ১৯২২) এবং সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। ঐতিহাসিক কারণেই এ অঞ্চলের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দীর্ঘশ্বাস-অভাব-অতৃপ্তির অভিঘাতে তাঁদের সৃজনভুবন ব্যক্তিচিহ্নিত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে উল্লিখিত কবিবৃন্দের আগ্রহ পরিচালিত হয়েছে তাঁদের নিজস্ব বিষয়ভাবনা ও নির্মাণশৈলীর অনুকূলে। এই সমাজসচেতন কবিবৃন্দ বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যদিও তাঁদের সমাজচেতনায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হবে এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কাব্যিক প্রয়োগেও তাঁরা স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছেন। অবশ্য কারো কারো রচনায় রোমান্টিক শিল্পঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যও অপ্রকাশিত থাকে নি। পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ কারো কারো কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। আবার আধুনিক জীবন ও কবিচেতনা দিয়ে মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা চিত্রিত করার প্রয়াসও লক্ষ করা যাবে। দোভাষী পুথির মধ্যে সাহিত্যাদর্শ আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন কেউ কেউ। উল্লিখিত প্রত্যেক সৃষ্টিশীল প্রতিভাই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পরবর্তী আধুনিক জটিল বিশ্বের গতিশীল জীবন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। সমকালীন ঘটনাবলি, ব্যক্তিক সংকট ও জৈবনিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁরা সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। দানবের হিংস্র থাবায় বিচ্ছিন্ন-বিদীর্ণ-বিপন্ন মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভাঙন-বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করলেও জীবনের সদর্থক প্রান্তই তাঁদের অন্বিষ্ট। নানা অবয়বে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সরব উপস্থিতি তাঁদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতা দিয়েছে। তাঁদের কবিতা থেকে মুক্তির কোন শাশ্বত ধারণায় উপনীত হওয়া সঙ্গত কারণেই অসম্ভব, কিন্তু শৃঙ্খলিত এবং নিপীড়িত মানবতার পক্ষে তাঁদের উচ্চারণ গুরুত্ববহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়ে ও প্রকরণে স্বাতন্ত্র্যের শত স্রোতস্বতী বহমান থাকলেও জলের মতোই সাধারণ-সমন্বয়ী এবং অনিবার্য ঐক্যসূত্র তাঁদের কবিতায় নিশ্চয়ই বিদ্যমান, যা অন্বেষণের মাধ্যমে চল্লিশের প্রধান কবিদের প্রবণতাসমূহ শনাক্তকরণ সম্ভব এবং এভাবেই বাংলা কবিতায় আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের অবদান স্বীকৃত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : আহসান হাবীব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি

একজন শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বে পরিভ্রমণের পূর্বে তাঁর শিল্পী বা স্রষ্টা হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করলে শিল্প বা সৃষ্টির অন্তর্গত ঐশ্বর্যের উষ্ণতায় আন্তরিক অবগাহন সম্ভব। বৃক্ষের পরিচয় যেমন ফলে, তেমনি শিল্পীকেও তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশের প্রকৃত পথটি রচনা করে নিতে হয়। ফলের সার্থকতা বৃক্ষের শাখায় অবয়বপ্রাপ্ত হলেও আমরা জানি, শাখার সজীবতায় শেকড়ের অবদান অনস্বীকার্য। সেই শেকড় মাটির গভীরে প্রোথিত হলে ফলের শরীরেও গভীরতর দীপ্তি ও তৃপ্তির রস-সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তাই রসগ্রাহী ও কৌতূহলী মানুষ কেবল সৃষ্টির অন্তর্গত সৌন্দর্য-সম্ভোগেই পরিতৃপ্ত হন না, সৃষ্টিকে অতিক্রম করে তার অন্তরমহলের নানা অনুষঙ্গে মনোযোগ নিবন্ধ রাখেন। একজন শিল্পস্রষ্টা জীবনের কোন দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করে আত্মখচিত নির্মাণে নিমগ্ন থাকেন এবং শিল্পের কোন প্রবণতায় সমর্পিত হয়ে জীবন ও শিল্পের সমান্তরালে নিজের পৃথিবী গড়ে তোলেন তার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চারের পাশাপাশি তাঁর স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতকেও বিবেচনায় আনতে হয়। 'Since every writer is a member of society, he can be studied as a social being. Though his biography is the main source, such a study can easily widen into one of the whole milieu from he came and in which he lived. It will be possible to accumulate information about the social provenance, the family background, the economical position of writers.' (Renewellek & Austin Warren 1985 : 95). তাই আহসান হাবীবের আন্তরিক উচ্চারণের গতিপ্রকৃতি, গভীরতা ও গন্তব্যের স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়োজনে প্রথমেই তাঁর মানসগঠন ও জীবনবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও চেতনালোকের প্রধান প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, কবির মানসভূমি তাঁর সমকালকে সোনার ফসলে পরিতৃপ্ত করেই অর্জন করে নেয় কালোত্তীর্ণ শিল্পসম্পদের সৌরভ ও স্বীকৃতি ।

পারিবারিক পটভূমি ও শৈশবজীবন

জন্ম যেখানেই হোক, শেষ পর্যন্ত কর্মের মধ্য দিয়েই একজন মানুষকে প্রকৃত ও প্রদৃপ্ত মানুষ হয়ে উঠতে হয়। সৃজনশীল মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কাজের মাধ্যমেই নিজের দাগ রেখে যেতে চান। তবু যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর জন্ম, তার কিছু চিহ্নও তাঁকে আমৃত্যু বহন করতে হয়। আহসান হাবীবের সৃজনবিশ্বেও নিশ্চয়ই তাঁর পারিবারিক বৃত্তের নানা অনুষঙ্গ শিল্পসংহতি লাভ করেছে। এই সৃজনশীল মানুষটির কৃতকর্মের মর্মে প্রবেশের প্রয়োজনেই তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার ও শৈশবের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামে ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি আহসান হাবীব জন্মগ্রহণ করেন। নয় সন্তানের জনক-জননী হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও জমিলা খাতুনের বড় সন্তান আহসান হাবীব। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে প্রভাব বা আধিপত্যের উৎস সঙ্গত কারণেই জমির আধিক্য। পিতামহের বিস্তর বিষয়সম্পত্তি থাকায় কবির পিতা প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে গ্রামের বিচার-সালিশের নেতৃত্ব দিতেন এবং আয়েশি-জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। অমিতব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী জীবনযাপনের কারণে হামিজুদ্দীন হাওলাদারের পরিবারে স্বচ্ছলতার স্রোত বেশিদিন প্রবাহিত হতে পারে নি। সহজ-সরল, স্বল্পভাষী ও সংসারী জমিলা খাতুনের সতর্কদৃষ্টি সত্ত্বেও আহসান হাবীবের সৌখিন পিতা পৈত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। উত্তরকালে কবির জীবনেও পিতার এই সৌখিন স্বভাবের ছায়াপাত লক্ষ করা যাবে। মায়ের সঙ্গে হাবীবের সম্পর্ক নিবিড় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও পিতাকে খুবই ভয় পেতেন তিনি। আহসান হাবীবকে হাকিম বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন পিতা। কিন্তু হাবীবের মনোযোগ ছিল সেইসব বইয়ের দিকে, যা পড়লে চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন গুরুজনেরা। আহসান হাবীবের ভাষায় : 'ছেলেকে হাকীম বানাবার আশায় স্বপ্নাতুর বাবা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকতেন। তাঁর কোনো হাত বা বাঁধানো বেতের ছড়িটি আমাকে স্পর্শ করেনি কোনোদিন। কিন্তু মুখে তিনি কতবার যে আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছেন তা আর গুনে বলতে পারবো না আজ।' (১৯৯৫ : ৩৪৬)। এ কারণেই বোধকরি পিতার সঙ্গে কবির মানসিক দূরত্ব কোনদিনই দূর হয় নি। পরিবারের প্রথম সন্তান

হওয়ায় মাতৃস্নেহ তিনি প্রভূত পরিমাণে উপভোগ করেছেন। এই স্নেহ ও সান্নিধ্যের কারণেই মায়ের ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবের প্রধান প্রবণতাসমূহ আহসান হাবীবের মানসগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সংসারধর্ম ও বিষয়কর্মে উদাসীন পিতার অবিবেচনাপ্রসূত ব্যয়ের কারণেই আহসান হাবীবের পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতায় নিপতিত হয়। অর্থকষ্টে কবির প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে পিরোজপুর সরকারি হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেও দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। আহমদ রফিক (১৯৯৫ : ৪৭৭) উল্লেখ করেছেন, ১৯৩৬ সালের সম্ভবত আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে চাকরির খোঁজে কবি কলকাতা পাড়ি জমান। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার অগ্রগতি না-হলেও ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন তিনি। পারিবারিক সংগ্রহ থেকে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কাব্য* সংগোপনে পাঠ করে যে আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আনন্দ তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশেও বোধকরি অবদান রেখে থাকবে। জনপ্রিয়, কালজয়ী ও প্রভাববিস্তারী বাংলা কবি-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি কবির ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় দেশি-বিদেশি যে-সকল লেখকের নাম যুক্ত হতে দেখি, তা থেকে কবির সাহিত্যানুরাগ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। একজন সমালোচক কবির প্রিয় লেখক-লেখিকাদের নামের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> হুয়ান রামোন হিমেনেথ, ডাবল্যু. এইচ. অডেন, সিলভিয়া প্লাথ প্রমুখ। বাংলাদেশের শামসুর রাহমান থেকে আবুল হাসান প্রত্যেকেই তাঁর পড়ার টেবিলে জায়গা করে নেন। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ন্যাথানিয়েল হর্থন, জাঁ পল সার্ত্রে ও আলবেয়র ক্যামু তাঁর আর তিনজন প্রিয় লেখক। জন স্টাইনবেকের প্রতিও তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। অনেক আগের আরেকজন লেখক মরিস মেটারলিঙ্কের নাম তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যায়। (তুষার দাশ : ১৯৮৫ : ১২৩-১২৪)

আহসান হাবীব বই পড়ার পাশাপাশি সিনেমা দেখার প্রতি উৎসাহী ছিলেন। কখনো কখনো তিনি একই ছবি একাধিকবার দেখতেন। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত রোকনুজ্জামান খান সম্পাদিত *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থের* 'একটি অসমাপ্ত সাক্ষাৎকার ও কিছু কথা' শীর্ষক রচনায় অনুপম হায়াৎ কবির সিনেমাপ্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি আহসান হাবীবের কবিসত্তার বাইরের এই দিকটি উন্মোচন করে 'লিরিক্যাল কবি' হিসেবে হাবীবের শিল্পীসত্তার অন্তর্গত কারণটি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রেডিওর জন্য আহসান হাবীব অনেক গান লিখেছেন। চলচ্চিত্র-পরিচালক মহিউদ্দিনের অনুরোধে সিনেমার গানও লিখেছেন কবি। 'মহিউদ্দিনের অনুরোধেই কবি আহসান হাবীব তাঁর পরিচালিত 'তোমার আমার' ছবির জন্যে গান লেখেন। এটি বোধকরি কবি আহসান হাবীবের প্রথম ও শেষ ছবি, যাতে তিনি গান লিখেছেন।' (অনুপম হায়াৎ ১৯৮৭ : ২১৮)। পরবর্তী পর্যায়ে হাবীবের কবিতার আলোচনায় আমরা লক্ষ করব, কলকাতা জীবনে প্রচুর দেশি-বিদেশি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর কবি-প্রতিভায়ও নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। ১৯২৯ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কবি প্রথম বরিশালের এক প্রদর্শনীতে 'গুলসানোভার' শীর্ষক নির্বাক ছবিটি দেখেন। এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি তাঁর স্বভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। এক ভাইয়ের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়ে তিন রকমের টিকিটের ব্যবস্থা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। আত্মসম্মানবোধের কারণে কবি কর্মজীবনেও নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। মাথা নত না-করার এই প্রত্যয় কবিচরিত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।

আহসান হাবীবের শৈশবস্মৃতি বলতে যা কিছু উল্লেখ করার মতো, তা তাঁর লেখকসত্তারই প্রস্তুতিপর্বের নানা ঘটনায় প্রোজ্জ্বল-প্রাণবন্ত। খেলাধুলায় তেমন আগ্রহ ছিল না তাঁর। *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা 'পরিক্রম ও অবস্থান প্রসঙ্গ'-এ কবি বলেছেন, 'কেন তখন খেলাধুলায় মন গেলো না, বেড়িয়ে বেড়ানো নয় কেন, কেন কবিতা লেখায় মন গেলো আজ সে কথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। বাড়িতে, মামাবাড়িতে পুরানা আমলের গদ্যপদ্য নানাধরনের বই, মধ্যযুগীয় পুথি, ভারতচন্দ্র, নজিবর রহমান আর মীর মশাররফ আর সেই সঙ্গে শেখ হাবিবর রহমানের অনুবাদ হাফিজ এই সব বই পড়তে পড়তে এক সময় বুঝি মনে হলো, আমিও কি পারি না।' (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ৩৪৫-৩৪৬)।

আহসান হাবীবের বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তা কিংবা কোন শেষ বিকেলের মনোরম পরিবেশ তাঁকে কবিতার দেশে নিয়ে গেছে। শৈশবের প্রকৃতি-সান্নিধ্য ও পাঠাভিজ্ঞতাই তাঁর অন্তরে সৃষ্টি-সুখের উল্লাস ছড়িয়ে দিয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

> শৈশবে কিছু পুথিপত্র এবং তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সাহিত্য; যেমন : আনোয়ারা, মনোয়ারা, মিলন মন্দির প্রভৃতি আমাদের বাড়িতেই ছিলো। এসব বই পড়তে পড়তে আমি সর্বপ্রথম নিজে কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করি। বয়স তখন ১২ কি ১৩। সম্ভবত প্রথম কবিতা লিখি ১৯২৮/২৯ সালের দিকে।
>
> তবে কি জানেন/শৈশব বা কৈশোরে কখন কিভাবে একজনের ভেতর যে এই প্রবণতা গড়ে উঠতে থাকে তা বোধ হয় কোনো কবিই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। একদিন হঠাৎ ইচ্ছে হলো কিছু লেখার চেষ্টা করি এবং সম্ভবত এভাবেই শুরু। যদিও সহায়ক কোনো না কোনো ব্যক্তি বা গ্রন্থ অথবা পরিবেশের প্রশ্নটিও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। (হোসেনউদ্দীন হোসেন ১৯৯৪ : ৭৫)

গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট আহসান হাবীবের শৈশবের লেখালেখি সম্পর্কে আহমদ রফিক (১৯৯৫ : ৪৭৭) জানিয়েছেন, 'মৃদুভাষী, আত্মমগ্ন ও ভাবুক প্রকৃতির' এই শিল্পস্রষ্টার লেখালেখি শুরু হয়েছে ছাত্রজীবন থেকে। রোকনুজ্জামান খান (১৯৮৭ : ৭০) এক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, আহসান হাবীব ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে ক্লাশের বাংলার শিক্ষক হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের ওপর রচনা লিখতে দিলে তিনি তা না করে হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের ওপর এক কবিতা লিখে শিক্ষককে জমা দিয়েছিলেন। বাংলা-শিক্ষক প্রথমে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হলেও এই তরুণের কবিপ্রতিভায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পিরোজপুর সরকারি হাই স্কুল বার্ষিকীতে কবির প্রথম কবিতা 'মায়ের কবর পাড়ে কিশোর' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। আহসান হাবীব তখন শুধু হাবীব নামে লিখতেন। এরপর দুটি লেখা প্রকাশিত হয় 'রিক্ত' এবং 'স্মৃতি' নামে। *শরিয়তে এসলাম* পত্রিকায় 'প্রদীপ' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। "ম্যাট্রিক পাস করার পর কলকাতার 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'কবিতা', 'পরিচয়', 'অলকা' ইত্যাদি পত্রিকায় আহসান হাবীবের কবিতা মুদ্রিত হতে থাকে।" (সরকার আমিন ২০০৬ : ২০)। বলা যায়, এই স্বল্পবাক ও আত্মলীন কবি লেখালেখির মধ্য দিয়েই তাঁর শৈশবের অভিব্যক্তিকে অন্যের নিকট প্রকাশ করার পথ খুঁজে নিয়েছিলেন।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

আহসান হাবীব কর্মজীবনের প্রায় পুরো সময়টাই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার জীবনসংগ্রামে তাঁর প্রথম অবলম্বন দৈনিক পত্রিকা। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত *দৈনিক তকবীর* পত্রিকায় মাসিক সতের টাকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন তিনি। "এরপর তিনি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক আজাদ, মাসিক বুলবুল, মাসিক সওগাত, শিশু সওগাত, দৈনিক কৃষক ইত্যাদি কাগজে বিভিন্ন দায়িত্বে কাজ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে এবং সেই সঙ্গে দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।" (আহমদ রফিক ১৯৯৫ : ৪৭৭)। '৪৭-এর দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং যুক্ত হন *দৈনিক আজাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী* এবং *সাপ্তাহিক প্রবাহ* পত্রিকার সঙ্গে। ঢাকার 'ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস'-এর সঙ্গেও কিছুদিন যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালে তিনি চাকরি নেন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় *দৈনিক বাংলা* নামে।

আহসান হাবীব *দৈনিক বাংলা*র সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তিনি অপরিসীম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন লেখককে তিনি কেবল লেখক হিসেবেই বিবেচনার প্রয়াস পেয়েছেন, বয়স কিংবা ক্ষমতার মানদণ্ডে সাহিত্য বিবেচনার মতো মানসিক দৈন্যকে প্রশ্রয় দেন নি। 'কোনো ধরনের সামাজিক পদ-মর্যাদা, লোক-ভয় কিংবা ব্যক্তিক সম্পকর্কে তিনি কখনো লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর কাছে যে কোন লেখকের যেকোন সাহিত্যপদবাচ্য উত্তীর্ণ রচনাই কেবলমাত্র গ্রাহ্য ছিলো। অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখকের লেখা তিনি ফেরৎ দিয়ে নতুন লেখা চেয়েছেন তাঁদের কাছে, অপেক্ষাকৃত তরুণদের লেখা পাল্টে দিতে বলেছেন।' (তুষার দাশ ১৯৮৮ :

৩৬)। লেখক হিসেবে তিনি নিভৃতে নিজের কাজ করে গেলেও সম্পাদক হিসেবে লেখক কিংবা লেখা শনাক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, লেখক সৃষ্টিতে তাঁর অবদান বাংলাদেশের অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকও অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা কয়েকজন লেখকের দৃষ্টিতে সাহিত্য সম্পাদক আহসান হাবীবের প্রতিকৃতি উপস্থাপন করতে চাই :

ক. লেখালেখির সকল ব্যাপারেই তাঁর কাছেই আমার হাতেখড়ি। তখনকার দিনে তাঁর কবিখ্যাতির কথা পুরোপুরি মনে রেখেই অপ্রাসঙ্গিক হলেও এটুকু বলতে হয় আমি শুধু তাঁর স্নেহধন্যই ছিলাম না, সব দিক থেকে তিনিই ছিলেন আমার যথার্থ অগ্রজ, এমনকি বাংলা বানানটুকুও আমার তাঁর কাছ থেকে শেখা। (মাহমুদুল হক ১৯৮৭ : ৮৫)

খ. ...অপূর্ব এক শিক্ষকতার ভূমিকা প্রকাশ পায় যেন এর ভেতরে, যেমন ক'রে প্রকৃতি শেখায় তার সন্তানদের। অনেক কাছে থেকে এগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। এসবের স্পর্শ পেয়েছি, সৌরভ পেয়েছি। (মাফরুহা চৌধুরী ১৯৮৭ : ১০৪)

গ. ...তাঁর যে সামাজিক যোগাযোগ ছিলো; তা একান্তভাবেই লেখক তৈরীর ব্যাপারে কিংবা ভবিষ্যত লেখক সনাক্তকরণের কাজে।... সম্পাদক অনেকেই হন, কিন্তু অনেকের মধ্যে দেখি ঘ্রাণশক্তির অনুপস্থিতি– কিন্তু হাবীব ভাইয়ের মতো একান্ত আবৃত মানুষও এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সফল। তাঁর রুচিতে দৈন্য ছিলো না; সম্ভাবনাহীন অলেখককে প্রশ্রয় দেননি। (সিকদার আমিনুল হক ১৯৮৭ : ১৭০)

ঘ. আজ বলতে দ্বিধা নেই, দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য-বিভাগ চালানোর কায়দা-কানুন আমি সেই সময়েই শিখি। এ-ব্যাপারে আমার শিক্ষক আহসান হাবীব। ...লেখা সম্পাদনা করা, ফটো এডেটিং, ডামি বানানো– নব্য কবি সাহিত্যিক, এমনকি ছিটগ্রস্তদের মোকাবেলা করা, সব ব্যাপারেই তিনি তালিম দিয়েছেন। (আবু কায়সার ১৯৮৭ : ১৭২)

ঙ. নবীন লেখকদের জন্য কী ভালোবাসা ছিল তাঁর, তা লিখে বোঝাবার মত নয়। যদি এদেশে 'শিক্ষক-সম্পাদক' বলে কারু নাম করতে হয় তবে তিনি আহসান হাবীব। (সেলিম আল দীন ১৯৮৭ : ১৭৮)

চ. ভালো লেখাই ছিলো আহসান হাবীবকে আনন্দিত করার অন্যতম মাধ্যম। কোন তরুণ কবির প্রথম লেখাটি ভালো লাগলে তিনি তা ছেপে দিতে দ্বিধা করতেন না। জানা যায় বহু ক্ষমতাধর ব্যক্তির কবিতা তিনি নির্দ্বিধায় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতেন। আর যেখানেই হোক, সাহিত্যের মান সম্পর্কে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম দৃঢ় এবং আপোষহীন মানুষ। (মাশুক চৌধুরী ১৯৮৭ : ১৮০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে কেবল আহসান হাবীবের সম্পাদকসত্তাই নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিসত্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কবি আল মাহমুদ ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে যাদুঘরে স্মরণসভায় প্রদত্ত ভাষণে যথার্থই বলেছেন, 'বলা যায় সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর আধুনিক। কারণ তিনি সব সময়ই শুদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন।' এই নিষ্ঠুর আধুনিকতার কারণেই বাংলাদেশের একটি দৈনিকের সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে আহসান হাবীব অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয় হলেও বিষয়বুদ্ধির দিক থেকে তিনি অনেকটা তাঁর পিতার মতোই ছিলেন। নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা 'কথাবিতান'-এর সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন তিনি, কিন্তু তাতে সফল হতে পারেন নি। সম্পদ অর্জনের কূটকৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল না। সহজ-নিরাপদ-নিরুদ্বেগ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। শিল্পসাহিত্যের অন্তর্নিহিত নির্যাস নিঙড়ে বের করার অপরিসীম শক্তি ছিল তাঁর। কিন্তু জীবনকে আরামে উপভোগের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, তা অর্জনের মতো চাতুর্য ছিল না তাঁর চরিত্রে। বিষয়-বুদ্ধি রপ্ত করার জন্য কোন প্রয়াসও দেখান নি তিনি। এক নির্মল ও নির্মোহ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আহসান হাবীবের কর্মজীবনকে কোন অর্থেই বর্ণাঢ্য বলা যাবে না। কর্মী হিসেবে তিনি পত্রিকার সাহিত্যপাতার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন আজীবন। 'নিজের সাহিত্য পাতার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে শেষ বয়সেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। একেবারে শেষের দিকে দৃষ্টিশক্তি যখন তাঁর প্রায় ক্ষীণ, সেই সময়ে সহকারী নাসির আহমেদকে হাসপাতালের বেডে শুয়েও যত্ন নিয়ে পাতা মেকাপের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।' (তুষার দাশ ১৯৮৮ : ৪০)। এই একটি কাজের

মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁর স্বকালের এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্য-সম্পাদকদের জন্য নিষ্ঠা ও সৃজনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তিনি।

আহসান হাবীবের সাহিত্যজীবন তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে কেবল সম্পর্কিতই নয়, বরং সমান্তরাল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে শৈশবেই; স্কুলজীবনের পাঠাভিজ্ঞতায় প্রাণিত হয়ে 'কিছু লেখার চেষ্টা' থেকে তিনি ক্রমাগত অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, সংযম ও সাধনার মাধ্যমে জীবনকে শিল্পের প্রতিস্পর্শী করে তুলেছেন। জীবিকার প্রয়োজনেই নানা ঘাটের জল খেয়েছেন তিনি। কর্ম ও কোলাহলের ক্লান্তিকর কালযাপন থেকে কেবল হলাহলই উঠে আসে নি তাঁর হাতে, শিল্পের সত্যকে অবয়ব দেওয়ার অভিপ্রায়ে অমৃতও আহরণ করেছেন তিনি। এক জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় তিক্ততার ছাপ হয়তো অপ্রকাশিত নয়, কিন্তু তাকে শিল্পের মর্যাদা দিতে গিয়ে সেই জীবনকে বিশাল প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে নির্মাণে নিমগ্ন থেকেছেন কবি। জীবনের কোন অভিজ্ঞতা ও অর্জনকেই তিনি অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অর্থহীন মনে করেন নি। শিল্পের দর্পণে নিজেকে দেখার যে দৃষ্টি লাভ করেছেন আহসান হাবীব, তা বিস্ময়করভাবে আন্তরিক এবং আত্মখচিত।

আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে, কলকাতার কমরেড পাবলিশার্স থেকে। কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে *ছায়াহরিণ* (১৯৬২), *সারা দুপুর* (১৯৬৪), *আশায় বসতি* (১৩৮১), *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) এবং *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১)। কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আহসান হাবীবের বক্তব্য, 'শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু।' ((১৯৯৫ : ৩৪৯)। *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫) দেখতে দেখতে এভাবেই কবি নিজের কবিতার কথা বলে যান।

আহসান হাবীবের প্রধান পরিচয় কবি হলেও সাহিত্যের নানা শাখায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ছোটদের জন্য ইতিহাসের বই লিখেছেন এবং অনুবাদ করেছেন, শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গল্প ও কিশোর উপন্যাস রচনা ও অনুবাদে অবদান রেখেছেন। জীবনী-গ্রন্থ এবং সাধারণ জ্ঞানের বইও তাঁর হাত দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বড়োদের জন্য কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও মনোনিবেশ করেছেন তিনি। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত এই শিল্পস্রষ্টা সাহিত্যচর্চাকে কখনোই জীবনধারণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন নি। 'স্বল্পভাষী আত্মমগ্ন ও স্পষ্টবাদী আহসান হাবীব জীবনভর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। লড়াই করেছেন পারিপার্শ্বিক দীনতার সঙ্গে। কখনো সে লড়াই ছিল আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধের কারণে। কিন্তু এসব বিষয়ে বরাবর ছিলেন অপ্রগলভ ও নির্বিকার, যদিও একটি সংবেদনশীল, অভিমানী মন আমৃত্যু বহন করে গেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়েই কবি আহসান হাবীব।' (আহমদ রফিক ১৯৯৫ : ৪৭৮)। দারিদ্র্য কাজী নজরুল ইসলামকে মহান করেছে বলে সগর্বে ঘোষণা করেছেন তিনি। আহসান হাবীবের সাহিত্যজীবনের মর্মে প্রবেশ করলেও আমরা লক্ষ করব, জীবনসংগ্রামের কষ্টকর অভিজ্ঞতা কবির অন্তরের স্পর্শে শিল্পসাহিত্যের ঐশ্বর্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

আহসান হাবীব তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছেন, লাভ করেছেন অনেক পুরস্কার। ১৯৬০-৬১ সালে অনুবাদের জন্য তিনি অর্জন করেন ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৮), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক (১৯৮১), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮২), আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪) ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনকে যুদ্ধের সমার্থক হিসেবেই বিবেচনা করেছেন আহসান হাবীব। এই যুদ্ধে তিনি অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেন নি। জীবনকে যিনি জয় করতে জানেন, তাঁর পায়ের কাছে এসে মৃত্যুরও মাথা নত হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহসান হাবীবের জীবনাবসান ঘটে।

সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি

কবিতার জন্য আহসান হাবীবের পথ-পরিক্রমা দীর্ঘ, দৃপ্ত এবং দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত জীবনের অপ্রাপ্তি কিংবা অতৃপ্তির জন্য আক্ষেপ করেন নি তিনি, কিন্তু কবিতায় নিজেকে নিবেদনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে আহত, রক্তাক্ত হয়েছেন। 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ'– জীবনানন্দ দাশের (২০০২ : ১৭) মতো করে এই কথা উচ্চারণ করেন নি আহসান হাবীব, কিন্তু তাঁর কবিতার সান্নিধ্যে এলে আমরা এই উপলব্ধিরই অনুরণন টের পাই। জীবনযাপনে তিনি যেমন অকৃত্রিম থাকার প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি শিল্পেও কৃত্রিমতার পসরা সাজাতে পছন্দ করতেন না। একজন কবিকে তাঁর জীবনীর মধ্যে অন্বেষণ না করে কবিতার সমীপবর্তী হওয়ার যে পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আহসান হাবীবের কবিতায় অবগাহন করতে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করি।

আহসান হাবীবের বেড়ে ওঠা ও সাহিত্যিক দীক্ষা গ্রহণের কালকে বিবেচনায় রেখে তাঁর ব্যক্তিস্বভাব ও শিল্পপ্রবণতার প্রকৃতি অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে আমরা দেখব, সেই সময়ে সুস্থ-সুন্দর-সদর্থক জীবন অন্বেষণের কাজটি সহজ ছিল না। ভারতীয় রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে আহসান হাবীবের প্রস্তুতিপর্বকে ক্রান্তিকাল বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> ইংরেজের পশ্বাচারী শাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য তখন অসহযোগ আন্দোলন, কুইট ইন্ডিয়া, খেলাফত আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাকার জাগৃতিমূলক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কবির বেড়ে-ওঠা। কলকাতাতেই তাঁর সৃষ্টি-জীবন ও সাংবাদিক জীবনের শুরু। সে সময়ের অন্তর্গত নানা কর্মকাণ্ডের দ্বান্দ্বিক অভিভূতি, তীর্যক ঢেউ, পরস্পর বিরোধী তরঙ্গাঘাত, সাম্প্রদায়িক পাপাচারিতা, অর্থনৈতিক মন্দা, পাকিস্তান আন্দোলন, আধুনিকতার মন্ত্রায়ন ও বিশ্ব মানবিকতা, বীভৎস মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি মারীমড়ক, মহামারী, রোগ-শোক-মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সৃষ্টিশীল চেতনাকে শাণিত করেছেন। তদানীন্তন এই নেতি-বাস্তবতার অভিজ্ঞতা তাঁর সামনে বিশাল ক্যানভাস নিয়ে উঠে এসেছে। (শোয়েব শাহরিয়ার ২০১২ : ১৮৫)

অনুধাবন করা সম্ভব, এই কালপর্বে নির্মিত মানসকাঠামোয় ইতিবাচক প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ সহজসাধ্য নয়। আহসান হাবীব তবু তিরিশের কবিতার নঞর্থক প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে স্বতন্ত্র শিল্পসত্যের দিকে ধাবিত হয়েছেন। কবির কাছে জীবন মানেই বেঁচে থাকার আশা এবং সেই বেঁচে থাকা হবে মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে স্বাস্থ্য ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচা। 'আহসান হাবীবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সহজ সরল পরিচ্ছন্নতা ছিল। আজীবন তিনি পরিচ্ছন্ন কবিতা লিখে গেছেন। চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যের নির্মাণ কৌশলে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় আহসান হাবীব ছিলেন সেই ক্রান্তিকালের অন্যতম প্রধান কবি।' (আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৯৮৭ : ১০-১১)। তিনি হিংস্রতার পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের অসহায়ত্বে আহত হয়েছেন এবং কিন্তু হাল ছাড়েন নি, অন্ধকারের মুখোমুখি হয়ে অপসৃত আলোর জন্য অপেক্ষা করেছেন।

আহসান হাবীবের জীবনবোধ, সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির প্রকৃতি অনুসন্ধানে তাঁর স্বকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের চিহ্ন যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে, তেমনি তাঁর ব্যক্তিচৈতন্যের অন্তর্গত অনুরণনও অনুভূত হবে। জীবনকে প্রতিকূল আবহে স্থাপন করেছেন তিনি, কিন্তু শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র হিসেবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ভঙ্গি, সুর ও বিষয়ে পরিবর্তন এনেছেন তিনি, কিন্তু সেই বদলে যাওয়ার মধ্যেও আহসান হাবীবের কণ্ঠস্বরের মৌল প্রবণতাটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। 'হাবীব তাঁর স্বাভাবিক স্বর বদলাতে চাননি। তাঁর বেলা যা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আপন প্রবণতাকে তিনি ভিন্ন পথে চালাতে চাননি, নিজের জমি আঁকড়ে থাকতেই চেয়েছিলেন। এখানেই হয়তো তাঁর বৈশিষ্ট্য।' (আবুল হোসেন ১৯৮৭ : ১৩)। আত্মখচিত কবিকণ্ঠ হওয়ার কারণেই হাবীবের সহজ-সাবলীল-স্বাভাবিক উচ্চারণের মধ্যে আমরা তাঁর সময়কে তীব্রভাবে উপস্থিত হতে

দেখি, কিন্তু তা শিল্পের ভূখণ্ডকে অধিকার করে না। কবিতার সঙ্গে আপস করে কালের যাত্রার ধ্বনিকে প্রকটিত করার মতো প্রগলভতাকে প্রশ্রয় দেন নি তিনি। শিল্পের জন্য যেটুকু সুন্দর-স্বস্তিদায়ক-স্বাস্থ্যকর, আহসান হাবীব তা অকপটে বিন্যস্ত করেছেন তাঁর কাব্যের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতায় সমাজসচেতনতার যে তীব্র স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, আহসান হাবীব তার সঙ্গে যুক্ত থেকেও নিজের কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মম অভিজ্ঞতা সেই সময়ের কবিদের জনসম্পৃক্ত হতে প্রাণিত করেছিল। চল্লিশের কবিতায় গণজাগরণের যে জোয়ার আমরা লক্ষ করি, ব্যক্তিস্বভাবের অনুগামী থেকেই আহসান হাবীব তাতে সাড়া দিয়েছেন। কবিবন্ধু আবু রুশ্‌দ্ মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর বিশেষ কবিকণ্ঠের কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বশীল উক্তি করতে সক্ষম হতেন।' (১৯৮৭ : ২৯)। সময়কে অনুকরণ বা অস্বীকার না করে স্বীকরণ করেছেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় কালের কোলাহল-প্রসূত অনুভবপুঞ্জ কালোত্তীর্ণ উচ্চারণ হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে। আহসান হাবীবের সাহিত্যপ্রবণতা ও শিল্পচৈতন্যের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য কবির সমকালের এবং পরবর্তী প্রজন্মের কয়েকজন শিল্পস্রষ্টার মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

ক. সামগ্রিক বিচারে আহসান হাবীব হয়তো সমাজ-সচেতন জীবনধর্মী কবি। আশা-নিরাশার সংশয়দোলায় তাঁর চিত্ত সততঃ দোলায়মান বলে মনে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির অন্তর্নিহিত বিরোধও তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। (আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৯৮৭ : ৮)

খ. ...আহসান হাবীবের কবিতায় আধুনিককালের বিফলতার জন্য অসম্পন্ন এবং দূরাশ্রয়ী একটি প্রতিবাদ আছে। আহসান হাবীবের কবিতায় কখনও এ প্রতিবাদ হারিয়ে যায়নি, কিন্তু কখনও তা তীব্র হয়ে ফেটে পড়েনি। ব্যক্তিগত জীবনের সংকোচ এবং বিনয় তার বক্তব্যকে শাসন করেছে যার ফলে তাঁর অনেক কবিতা শান্ত নিবেদনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে অথবা হয়তো ক্ষীণকণ্ঠের অসহায় উচ্চারণের মত। (সৈয়দ আলী আহসান ২০০১ : ১১৮)

গ. আহসান হাবীবের কবিতায় চল্লিশের কাব্যচেতনার মূল সুর নানাভাবে ধ্বনিত। স্বকাল-চেতনা তথা দেশকালের চেতনা তাঁর কবিমানসে কার্যকরী ছিলো বলেই তাঁর কবিতার বয়ান ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসানকল্পে যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ, তেমনি সমকালীন বিপর্যয় থেকেও দূরে সরে যায়নি। প্রসঙ্গত কিছু বহু পরিচিত শব্দাবলীর সার্থক প্রয়োগ চোখে পড়ে। যেমন উদ্ধত মুঠি, ইস্পাত কঠিন, মশাল, মিছিল, প্রতিরোধ, সীমান্ত, প্রতিজ্ঞা, পলাতক অন্ধকার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার একটি বিশেষ যুগ চরিত্রের আভাস আনে। (আহমদ রফিক ১৯৮৭ : ১১৪)

ঘ. আহসান হাবীব গ্রহণ করেছেন বিষয়বস্তু হিসেবে নজরুল-প্রেমেন মিত্র-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারাকে আর আঙ্গিক প্রকরণ-রুচি-বিন্যাসের ক্ষেত্রে নির্বাচন করেছেন ত্রিশের প্রধান ধারাকে। প্রথম ধারাটির ব্যাপক প্রভাব তাঁর চেতনাতে ক্রিয়াশীল ছিলো– তাই ত্রিশোত্তর প্রধান কবিদের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার কারণে জীবন-বিমুখীনতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জনের অতি-আর্তি ও হাহাকার আহসান হাবীবের কাব্যে সুপ্রকট নয়। (তুষার দাশ ১৯৮৫ : ৬-৭)

নিজের কাব্যভুবনের গতিপ্রকৃতি ও গন্তব্য এবং শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে আহসান হাবীবের বক্তব্যও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ব্যক্তিগত সৃজনবিশ্বের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করতে স্বস্তি বোধ করতেন না আহসান হাবীব। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান বা লেখালেখিতে কবির এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে কবি সারাক্ষণই লেখকবেষ্টিত থাকতেন। নানাজনের লেখা নিয়ে আলাপ আলোচনা ও মন্তব্য করতেন তিনি। কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে মুখ খুলতে বিব্রত বোধ করতেন। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) কাব্যের 'এখন প্রত্যহ ভোর' কবিতায় আহসান হাবীব সাক্ষাৎকারপ্রার্থীদের আবদার ও অত্যাচার এবং নিজের সম্পর্কে আলোচনায় অস্বস্তিবোধ করার বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন :

আমার কৈশোর আর যৌবনের
তথ্যাদি তালিকাভুক্ত করে নিয়ে বলে :
কবিতার নির্মাণ প্রসঙ্গে কিছু বলুন। যতই বলি,
আজ নয়, আরেকদিন হবে, বুঝতে পারি

ওরা সেই অনিশ্চিত আরেকটি দিনের ভরসা করে না, বরং
আরো প্রশ্নমালার আড়ালে
সুদূর শূন্যের ঘণ্টা নিপুণ কৌশলে ওরা অবিরত বাজায় এবং
আমাকে মন্ত্রের মতো শোনায়, শুনুন ঐ জয়ধ্বনি। আমি
জয়ধ্বনি চিনি না। কেবল হন্তারক ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাই তাই
ছুটতে চাই, ছুটে ছুটে সেই ঋদ্ধ সময়ের বুক
আঁকড়ে ধরে সাহসে দাঁড়াতে চাই। ('এখন প্রত্যহ ভোরে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীব নিভৃত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর কাছে স্বস্তিদায়ক মনে হয় নি। 'সারাদিন দর্শনার্থী অটোগ্রাফ সংবর্ধনা-সভার আহ্বান/ইত্যাকার রঙিন জালের/রুদ্ধশ্বাস অক্ষম কয়েদ আমি, প্রধান অতিথি আর/সভাপতির ফাঁদ চতুর্দিকে' –হাবীবের এই কাব্যাংশ থেকে তাঁর মানসগঠনের প্রবণতাটি আঁচ করা যায়। তাঁর লেখক হয়ে ওঠা, সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণা-সঞ্চারী নানা অনুষঙ্গ, নিজের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁর বিবেচনায় কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা কী হওয়া উচিত– সে-বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং দীর্ঘ মন্তব্য বোধকরি *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে মুদ্রিত 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' শীর্ষক রচনাটি। এছাড়া বিভিন্ন কবিতায় শিল্প ও জীবন প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েছে, যা থেকে আমরা তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারি :

ক. অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ
যারা পার ক'রে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
নিরাপত্তার পাল তুলে!
এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো–
পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড্ রোডের প্রান্তে
কেন না
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য! ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

খ. যুদ্ধ-হত্যা লুণ্ঠনের উল্লাসের মুখে
যে পৃথিবী শঙ্কায় আকুল;
আমি সেই পৃথিবীর সতর্ক সন্তান।
পিতামাতা ভাইবোন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জন নিয়ে
যদি কভু করে থাকি শান্তিময় গৃহের কামনা;
শপথ সে মৃত্যুজয়ী কামনার নামে–
গৃহে গৃহে শান্তি যার হয়েছে লুণ্ঠিত,
সেই দুঃস্থ পৃথিবীতে শান্তির ঘোষণা নিয়ে যাবে
আমার কবিতা আর গান। ('প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. তবুও তবুও
আমার অনৈক্য নেই তার সঙ্গে
যে বলে, যখন
দুর্ঘটনা পোড়ায় সমৃদ্ধ কোনো শিল্পাগার
(হয়তো অনন্য কোনো চিত্র যার
জুড়ি নেই, পুড়ে যাবে,
কালজয়ী শিল্পের স্বাক্ষর শেষ হবে)

তাকে পুড়তে দাও, তবু
তার আগে বাঁচাও বৃদ্ধকে যার সযত্ন লালনে
শিল্পাগার সুসজ্জিত ছিলো এত কাল
যে এখন অগ্নিকুণ্ডে আটক। মানুষ।
শিল্প মানুষের জন্য মানুষ শিল্পের জন্য নয়। ('শিল্প-মানবিক'/*আশায় বসতি*)

ঘ. আমি এক বিচলিত মানব-সন্তান একালের
আমাকে হাঁটতে হবে
দুটি পা রক্তাক্ত হবে
এ শরীর জ্বলতে থাকবে
চলতে চলতে তবুও আমাকে
একদা নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে হবে বলে
হাঁটতে হাঁটতে এগোতেই হবে।

('আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. আজ আমি বলি, অহংকার করেই বলছি, পরাক্রান্ত ক্ষুধাকে আমি কবিতার ওপরে হুকুম চালাতে দিইনি।...তবে এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারি, ক্ষুধাই সেই হননকারী শত্রু যে মানব জীবন থেকে কবিতাকামনা হরণ করে, তাকে কবিতাহীন নরকে অনবরত আছড়াতে থাকে। আরো বুঝতে পারি, অনির্বার ক্ষুধা মানুষই তৈরি করে মানুষের মধ্যে। এবং এই সময় থেকেই কবিতা আমার আক্রান্ত হতে থাকে ক্ষুধার হাতে, তার অর্থ কবিতা তার চরিত্র বদলাতে থাকে। ক্ষুধার সেই রাজ্যে কবিতা কিছু বলবার দায়িত্ব নিতে থাকে।
...সুধীজনদের কেউ কেউ বলেন, বলতে বলতে চালু হয়ে গেছে, আহসান হাবীব মৃদুভাষী কবি। কবিতায় মৃদুভাষিতা কি জিনিস আমি কিন্তু বুঝি না। ভালো কবিতা মন্দ কবিতা বুঝি, সার্থক রচনা আর অসার্থক রচনা বললে বুঝি। (১৯৯৫ : ৩৪৯-৩৫০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আহসান হাবীবের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পাদর্শের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানবতার প্রতিনিধি হিসেবে কবি মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রথম উদ্ধৃতিতে আহসান হাবীব নৈরাশ্য-পীড়িত মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্মারক হিসেবে কবিতাকে দেখতে চেয়েছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই প্রাপ্তির আনন্দকে কবি নানা উপমা চিত্রকল্পে রূপায়িত করেছেন। 'যে রাত্রি পাহাড়ের মতো অটল, অবিচল অর্থাৎ জাতীয় জীবনে যে পরাধীনতার অটল অন্ধকার, নিপীড়িত জাতিসত্তা শতাব্দীকালের অন্তহীন নাগপাশে আবদ্ধ, সেই পরাধীন জাতীয় জীবনের অন্ধকারময় অধ্যায়ের পতন ঘটেছে। আশাবাদী কবি মুক্তির আলোকময় দিগন্তের আভাস মনে মনে উপলব্ধি করেছেন এখানে। বিভাগ-পূর্ব ভারতের জনজীবনের মুখর স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিময় প্রাণপ্রবাহের উচ্ছলতা কবির অন্তরে যে প্রেরণা জুগিয়েছিলো, এই কবিতা তারই ফলশ্রুতি।' (হোসেনউদ্দীন হোসেন ১৯৯৪ : ১২)। রেড রোডে যে অন্ধকারকে অন্তর্হিত হতে দেখছেন কবি, তা যেন ছড়িয়ে যাবে জীবনের সকল প্রান্তে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে আমরা লক্ষ করি, কবিতাকে নিরীহ শিল্প হিসেবে দেখতে চান নি তিনি, তাঁর কবিতা 'দুঃস্থ পৃথিবীতে শান্তির ঘোষণা' নিয়ে যাবে– এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কবি *ছায়া হরিণ* (১৯৬২) কাব্যের 'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা' কবিতায় অনিন্দ্যসুন্দর কোন নারীর হৃদয়ের নামে শপথ করে বলছেন, 'যে পৃথিবী প্রেমশূন্য, মরীচিকা প্রেমের কল্পনা;/সেই পৃথিবীর প্রেমে আমি আজ উচ্ছ্বসিতপ্রাণ।' কবি দিন-রাত্রির শান্তি, স্বপ্ন আর বাসনার নামে বিপন্ন পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। বণিক-সভ্যতার সুসজ্জিত গণিকার ক্ষতচিহ্ন রেখে যাওয়া 'কুৎসিত কুটিল কামনার' নামে কবির প্রেম সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'নীড়হারা শান্তিহারা মানুষের বিশীর্ণ নয়নে,/দেহের কঙ্কালে তার/আর তার মনোরাজ্যে' তাঁর কবিতা মশালের মতো জ্বলে উঠবে– এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কবি। তিনি কবিতাকে 'সংগ্রামের অজেয় বিষাণ' করে অস্থির ও অসুস্থ পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে সামিল হতে চেয়েছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতেও আমরা লক্ষ করি, মানুষকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন

কবি। 'শিল্প মানুষের জন্য মানুষ শিল্পের জন্য নয়'– এই উচ্চারণে কবিত্বের প্রকাশ কতটা সে বিষয়ে হয়তো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু কবির শিল্পপ্রবণতার স্বরূপ অনুধাবনে এই উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। চতুর্থ উদ্ধৃতিটিতে কবির সদর্থক জীবনভাবনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। কবি 'এক বিচলিত মানব-সন্তান একালের', তবু সকল বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যয় ঘোষণা করেন তিনি। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬) কাব্যের 'আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে' শীর্ষক কবিতায় জীবনের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। কবি বিশ্বাস করেন, 'মানুষকে কোথাও না কোথাও যেতেই হয়/স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস তাকে/অবশ্যই গড়ে নিতে হয়/কোনোখানে।' পঞ্চম উদ্ধৃতিতে আহসান হাবীব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র্য-প্রসঙ্গে কথা বলেছেন, অভাবের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর কবিতারই বিজয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, 'বন্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহাযুদ্ধের দায়' কবিতায় ধারণ করে কীভাবে 'উত্তরতিরিশ কবিতার সমাজ সচেতন অধ্যায়ে নিজের সংলগ্নতা' আবিষ্কার করেছেন সে-বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এভাবেই আহসান হাবীব কবিতা ও জীবনকে একই সমতলে স্থাপন করে শিল্পের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে ব্যক্তিগত ক্ষত ও ক্ষতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

কবিতার সঙ্গে আহসান হাবীবের সংসারযাপন ছিল আন্তরিক এবং আরামদায়ক। তাই শিল্পের সত্যকে সংসারের নানা টানাপোড়নের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাকে কলুষিত করেন নি তিনি। শিল্পের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কবিব্যক্তিত্ব কবিতার চেয়েও মানুষকে ওপরে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় কবিকণ্ঠের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অন্তর্গত অভিব্যক্তি একাকার হয়ে যায়। 'সময়চেতনা, অতীত ও ঐতিহ্য সচেতনতা, সমাজ-সম্পৃক্তি, সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকারে সমর্পিত এক বোধ, ইতিহাসচেতনা, বৈশ্বিকবোধ, পুরাণ ব্যবহার, আধুনিকতার চেতনা– সবকিছু মিলিয়ে তিনি তাঁর আপন স্বাতন্ত্র্যখচিত আসনটি অনায়াসে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছেন। একজন আধুনিক কবির জীবনদর্শন তাঁর মধ্যে ছিলো– তাঁর ভিত্তি ছিল তাঁর স্বদেশ, আপনার গ্রাম ও মানুষ। এই স্বদেশ, গ্রাম ও মানুষ সময়মতো লাভ করেছে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট।' (তুষার দাশ ১৯৮৮ : ৬৮)। আহসান হাবীব কবিতার প্রাণরস আহরণ করেছেন তাঁর দেশ ও মাটি থেকেই। তাই তাঁর কবিতার সৌরভ সীমাহীন ও সর্বজনীন হতে পেরেছে।

আহসান হাবীব জীবনকে বেদনায় আচ্ছাদিত করে অন্তহীন হাহাকারে নিমজ্জিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। দুঃখ আসবে কিন্তু সেই দুঃখের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার নামই ব্যর্থতা, পরাজয়। কবি অশুভ শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার না করে মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথা বলেছেন এবং হতাশা ও অন্ধকার ভেদ করে মানুষের মনে আলোকিত দিনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। একটাই জীবন মানুষের। সেই জীবনকে সার্থক-সুন্দর-স্বাস্থ্যকর উপায়ে উদ্‌যাপনের নানা আয়োজনে সামিল হয়ে কর্মের মধ্য দিয়ে মর্মের শক্তিকে রূপ দেওয়ার প্রত্যাশার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে কবির জীবনদর্শন। আহসান হাবীবের কবিতা সেই জীবনদর্শনকেই শিল্পের সৌন্দর্য ও সংহতি দান করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিষয়-বৈচিত্র্য

একজন কবির সৃজনপ্রতিভার স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য-প্রভাব বিচারে কবিতায় বিম্বিত বিষয়ের গুরুত্ব কতটুকু তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু ভাষার প্রকাশপ্রবণতার অপরিসীম সম্ভাবনা নির্দেশে কবিতার বিষয়বস্তুর অবদান সম্পর্কে উদাসীন থাকার সুযোগ নেই। কবির জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার প্রকাশ বিশেষ কোন বিষয়ের আশ্রয়েই অভিনবত্ব লাভ করে। ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের মাধ্যমে একজন দূরদর্শী শিল্পী কেবল কবিতার প্রকরণ-কৌশলেই মনোযোগ দেন না, স্বপ্ন কিংবা কল্পনার মতো বিমূর্ত অনুভবকে বাস্তবের কোন ভিত্তির ওপর স্থাপন করেই তাকে পাঠকের বোধ ও বিশ্বাসের সীমায় নিয়ে আসতে চান। কবির অনুভব ও উপলব্ধির গভীরতা কবিতায় যেমন লাবণ্য সঞ্চার করে, তেমনি অনাঘ্রাত এবং অর্থময় একটি সম্ভাবনাকেও তা কল্পনাপ্রবণ পাঠকের সামনে মেলে ধরে। বিষয়ের ওপরই একজন কবির এই উপলব্ধির নির্যাস স্ফটিক-সংহতি লাভ করে।

আহসান হাবীবের কবিতার বিষয়–অন্বেষণে অবতীর্ণ হলে আমরা লক্ষ করব, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সন্নিহিত কোন বিষয়কেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন নি তিনি। আত্মগত অনুভবকে ধারণ করার প্রয়োজনে যে-কোন বিষয়ই তাঁর কবিতায় সমাদৃত হয়েছে। একজন জীবননিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে আহসান হাবীব মানবিক সত্তা ও সম্পর্কের সকল দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। দৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতিও উদাসীন ছিলেন না তিনি। দৃশ্য ও অদৃশ্যের মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমেই তাঁর কবিতা পাঠকের মর্মে প্রবেশ করে। তাঁর কবিতার যে সৌরভ ও সৌন্দর্য, তা কখনো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোন কল্পনায় অবসিত নয়। কবিতায় তিনি বাস্তবকে কল্পনার দিকে ঠেলে দেন না, অপরিসীম কবিত্বশক্তির প্রভাবে কল্পনাকে বাস্তবের দিকে টেনে আনেন। আহসান হাবীবের কবিতার বিষয়-আশয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগে এই উপলব্ধির স্বীকৃতি আবশ্যক যে, কবিতায় তিনি জীবনকেই শিল্পসংহতি দিয়েছেন।

প্রেম

মানব সম্পর্কের চিরন্তন অভিব্যক্তি হিসেবে যুগে যুগে প্রেম বিচিত্র অবয়বে সৃজনশীল মানুষের চৈতন্যে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমের ধারণা শাশ্বত হলেও কালে কালে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং যুগধর্মের প্রভাবে শিল্পেও তাঁর প্রকাশ পরিবর্তনের পথ ধরে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রেম কিংবা মানবিক সম্পর্কশূন্য মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সম্ভব নয়। তাই শিল্পসাহিত্যেও অনিবার্যভাবেই প্রেমের উত্তাপ অনুভূত হয়ে থাকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সহজিয়া গান, শাক্ত পদাবলী, বিদ্যাপতির কবিতা ও গান এবং বাউল সঙ্গীতে প্রেমের উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে, প্রেমকে দেখার ও প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি যুগ ও ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রেমের নানা অবয়ব চিত্রিত হলেও রবীন্দ্র-পরবর্তী শিল্পস্রষ্টাদের কাছে তা সাদরে গৃহীত হয় নি। ‘ঔপনিষদিক মানস এবং পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের শুদ্ধ-শুচিতার প্রভাবে’ বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় মানবিক প্রেমকে অতীন্দ্রিয় অভিব্যক্তি ধরা পড়ে। এই প্রেমে অধ্যাত্মভাবের প্রকাশ প্রধান হয়ে ওঠায় ঊনবিংশ শতকের তিরিশের প্রধান কবিরা তৃপ্ত হতে পারেন নি। ‘মনে হ’লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ’লো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।’ (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮১ : ১২৬)। এই মন্তব্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের সহযোদ্ধাদেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় দ্বিমুখিতা বা বহুমুখিতা লক্ষ করেছেন তিনি। সেই প্রেম ‘মানবিক অর্থে প্রেম, না ঐশ্বরিক অর্থে ভক্তি’, সে-বিষয়েই বুদ্ধদেব সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৩৩৮ : ২৫) মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ উনিশ ও বিশ শতকের কবি হলেও তিনি মূলত কালিদাসের কালেই জন্মগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের ‘কালীদাসীয় সাজ-সজ্জা ও প্রাচীন সৌগন্ধ্য’ বোধকরি অতুল গুপ্তকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রাণিত করে থাকবে। অমলেন্দু বসুর (১৩৭৯ : ১৯৫) বিবেচনায়ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় অবয়বের অভাব, ভাবলোকবাসী প্রেমের প্রকাশ ও মানসসুন্দরীর জন্য ব্যাকুলতা প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে

ইন্দ্রিয়ঘনতা ও মানবিক বৃত্তির পরিবর্তে 'দেবসুলভ সৌন্দর্য ও ব্যবহার' লক্ষ করেই 'রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শ এবং কাব্যাদর্শের আবহ থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল প্রেরণা' ও প্রত্যয়দৃপ্ত তিরিশের কবিরা অন্যরকম প্রেমের কবিতা লেখার প্রয়াস পেলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, সেই প্রেমের কবিতায় প্রধান হয়ে উঠল দৈহিক লাবণ্য ও দেহ-বাসনা চরিতার্থ করার আর্তি ও আকুলতা।

রবীন্দ্রোত্তর প্রেমের কবিতায় দেহসর্বস্বতার অন্যতম কারণ হিসেবে তিরিশের কবিদের রবীন্দ্র-অতিক্রমী মানসতার অবদান থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার, সমাজতত্ত্বের নতুন পাঠ এবং মনস্তত্ত্ব-বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের নতুন চিন্তার প্রভাবও কম নয়। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

> আধুনিক কবিদের রচনায় দেহচেতনা প্রাধান্য পাবার অন্য কারণও বর্তমান। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠী যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রথম যৌবন অতিবাহিত করেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থার সাদৃশ্য নেই। উনিশ-শতকী জীবনের অখণ্ডতা ও স্থিতিবোধ প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতে হয়েছে খণ্ডিত ও বিচূর্ণিত। কালপ্রভাবে প্রায়-স্থির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ভাবনার ভেতরে উঠেছে প্রবল আলোড়ন, বিচলিত হয়েছে পূর্বতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। এই মানস-ভাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানের সব যুগান্তকারী আবিষ্কার। ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, ডারুইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় সাম্যবাদ, নব্য সমাজতত্ত্ব, ফ্রয়েডের অবচেতন-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব– এইসব বৈপ্লবিক আবিষ্কার সংবেদনশীল কবির মানসিক স্থিতিবোধে ভাঙন এনেছে। কাল-পরিপ্রেক্ষিতের এই পরিবর্তন কবির মনোভূমিতেও সূচিত করেছে পরিবর্তন। (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৫)

এই পরিবর্তনের পটভূমিতেই বাংলা প্রেমের কবিতায় তিরিশের কবিরা দৈহিক-সংরাগকে স্বাগত জানিয়েছেন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বাংলা কবিতার বিদ্যমান ধারায় চিত্রিত শারীরিক উদ্ভাসনকেও বিবেচনায় এনেছেন তাঁরা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, গোবিন্দচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার কবিতার শরীর নির্মাণে নারীদেহকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন এবং দেহকামনায় সমর্পিত যৌবনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রেম-সম্পর্কিত রোমান্টিকতার ধারণার পরিবর্তে প্রেমের দেহবাদী রূপে আকৃষ্ট হয়ে তিরিশের কবিরা কবিতার শরীরেও পরিবর্তন এনেছেন। সেই প্রেমে নারী ও পুরুষের প্রতি পরস্পরের সম্মান ও সম্প্রীতির ধারায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারেও অবদান রেখেছেন কেউ কেউ। এই পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টায় আহসান হাবীবের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

আহসান হাবীবের প্রেমভাবনা তিরিশের প্রদর্শিত পথে সমর্পিত নয়। রবীন্দ্রনাথের দেবসুলভ প্রেমনিবেদন তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত, আবার তিরিশের দেহসর্বস্বতাকেও সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন তিনি। তাঁর প্রেমের কবিতায় মানসিক স্নিগ্ধতা এবং শারীরিক শুদ্ধতা বিদ্যমান থাকায় তা পাঠকের অনুভূতিকে যেমন উদ্দীপিত করে, তেমনি তা শরীরেও অভূতপূর্ব শিহরন সঞ্চার করে। আহসান হাবীবের প্রেম সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত-সাবলীল ভঙ্গিতে তাঁর প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আড়ম্বরের অভাবই বোধকরি তাঁর প্রেমের কবিতায় ছড়িয়ে দেয় অনাস্বাদিত দীপ্তি। তাই প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত অভিব্যক্তিও পাঠকের কাছে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়। তাঁর প্রেমের কবিতায় মেয়েরা যে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে উপস্থিত হয়, তা প্রাকৃতিক আবহে পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ সহজ প্রণয়ের মতো সুন্দর তাঁর প্রেমিকার অন্তর ও অবয়ব। তাঁর প্রেমিকেরাও কবির মতোই দুর্বার বা দুঃসাহসী নয়, কিন্তু ভালোবাসতে পারার আনন্দে তারা আত্মহারা। আহসান হাবীবের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিতায় মনোনিবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো, কবির সমর্পণ সঙ্গীতের মতো অনুভূতির সমগ্রতাকে স্পর্শ করার অভিপ্রায়ে উচ্ছল-উজ্জ্বল-উদ্দীপ্ত হলেও বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে কোন অর্থেই তা সম্পর্কহীন কিংবা সঙ্গতিশূন্য নয়।

আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭)-এর কবিতাগুলিকে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন কবি– 'প্রহর', 'প্রান্তিক', প্রতিভাস' ও 'পদক্ষেপ'। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে কবি উল্লেখ করেন, বাংলা কবিতা সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে। *রাত্রিশেষ*-এর পর্যায়-বিভক্তি-প্রসঙ্গে কবির ভাষ্য : "যে আবেগ থেকে এর 'প্রহর' পর্যায় উৎসারিত তাকে অতিক্রম করে, ইতিহাসের অগ্রগমন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসবিমুখ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রান্তি থেকে তাই 'প্রান্তিক' পর্যায়ে দ্বিধান্বিত স্বাক্ষর। কিন্তু সমাজ মানসে ইতিহাস-চেতনার ব্যাপ্তি ব্যক্তিমানসে নতুন ইতিহাস যোজনায় অক্ষম নয়। আর ঐতিহাসিক অভিঘাত শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতায়ও নতুন আলোকসম্পাতে সক্ষম। এই বিশ্বাস আর এই অনুভবই 'প্রতিভাস' পর্যায়ের ক্রান্তিকালে 'পদক্ষেপ'-এর সূচনা করেছে শিল্পীমানসে।" (১৯৯৫ : ৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ দিনের নানা ঘটনা ও অভিঘাত এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে প্রতিভাত হলেও কবির প্রেমচেতনা এরই মধ্যে প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। এই গ্রন্থে দেশ ও মানুষের প্রতি কবির অন্তর্গত অনুভব-উপলব্ধি শিল্পসংহতি লাভ করেছে।

এই গ্রন্থের প্রেমের কবিতায় হাবীব তাঁর নায়ক-নায়িকাদের দেশকালের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করার প্রয়াস পেয়েছেন। যুদ্ধবাজ মানবতা-বিধ্বংসী পশুশক্তির নির্লজ্জ পদক্ষেপে কবির জন্মভূমির শান্তি যখন বিনষ্ট, তখনো কবি তাঁর স্বদেশের মৃত্তিকায় শেকড় বিস্তারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন : 'প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,/এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু।' (এই মন– এ মৃত্তিকা/*রাত্রিশেষ*)। এই বিপন্ন স্বদেশেরই একজন যুবক ফরিদের ছোট ছেলে আমজাদ। আমজাদের চোখে চোখ পড়েছিল এক কাশ্মিরী মেয়ের। আহসান হাবীব এই কাশ্মিরী মেয়েটিকে চমৎকার শিল্পসৌন্দর্যে নির্মাণ করেছেন। আমজাদ সেই মেয়েটির লাল ঘাগরা নিয়ে ম্যাজিক খেলার কথা ভাবে, বিনিময়ে সে মেয়েটিকে দেবে 'পুরো এক পয়সার সিগারেট'। আমজাদকে সে পাত্তাই দিতে চায় না। তবুও আমজাদের প্রেম অব্যর্থ, অপেক্ষমাণ। আহসান হাবীবের ভাষায় :

কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দুটি সাপের মতন,
কাশ্মিরী মেয়েটির দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো :
নখে তার বিষ–
মুখে বুলি নরম নরম :
বেইমান কুত্তা হায় তোম্।
কাশ্মিরী মেয়েটির নাজেহাল হাল!
পথের মোটর এক হোল বানচাল!
ফিরে গেলো দিন;
কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরা বিলীন,
হাসে তার চোখ
আমজাদ চেয়েছিল কিছুটা আলোক! ('কাশ্মিরী মেয়েটি'/*রাত্রিশেষ*)

আমজাদ, কাশ্মিরী মেয়ে, তার লাল ঘাগরা এবং পথে মোটর বানচাল হওয়ার মধ্যে আহসান হাবীব তাঁর সময়কে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। মেয়েটির কাছে আমজাদের প্রত্যাশা সামান্যই– 'কিছুটা আলোক'। কিন্তু তার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সেই মেয়ে। মানুষ হারিয়ে গেলেও তো আর প্রেম মিথ্যে হয়ে যায় না। তাই আমজাদের চিত্তে সেই কাশ্মিরী মেয়েটির নিয়ত উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করি আমরা।

'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' আহসান হাবীবের একটি অসাধারণ কবিতা যেখানে নিম্নবর্গের প্রেমযাপনের নানা আয়োজন ও আনুষ্ঠানিকতা ফুটে উঠেছে। রঙিন ঊষায় নীল আকাশের নীচে সবুজ তৃণে ঢাকা গড়ের মাঠে ঈদের আনন্দ যাপন করতে করতে এক যুবক তাঁর প্রিয়তমার জন্য অপেক্ষা করছে। 'কার্জন পার্কের মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো;/মাঠ থেকে ফিরে এসে/তোমায় লিফ্‌ট করবো।'– এই 'লিফ্‌ট করা' শব্দবন্ধে বিত্তবানদের প্রতি বিত্তহীনদের বিদ্রূপ লক্ষ করার মতো। দুজনের দেখা হবে, তাই পরস্পরের পোশাক কী হবে তাই নিয়ে কথা বলছে ছেলেটি। এই পোশাক-পরিকল্পনায় আর্থিক দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও এ থেকে যুবকের মানসিক বৈভব সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। হেঁটে যাওয়ার সময় 'আমার বাহুটা জড়িয়ে থেকো তোমার ডান হাতে।'– মেমসাহেবদের মতো করে এই হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছের মধ্যেও যুবকের ব্যক্তিগত বঞ্চনার ছবিটি ফুটে ওঠে। কেবল তো হেঁটে বেড়ালেই চলবে না, খেতেও হবে। ঈদের দিনে নাছারা খাবার খেতে চায় না সে, তাই ফারপোতে যাবে না তারা। কোথায় যাবে, কী খাবে এবং যুবকের টাকার উৎসই বা কী তা আহসান হাবীবের ভাষায় তুলে ধরছি :

আমরা যাব ছকু মিয়ার হোটেলে
বালুসাই, ছমুচা, খেজুর
যত খুশী খেয়ো। ভাবনা নেই পয়সা আছে অনেক।
বাপ দিয়েছে ছ'আনা
দুই রাত বিড়ি বেঁধে পেয়েছি এক টাকা দু-আনা। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

খাওয়া শেষ করে দুজনে মিলে রাস্তায় নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়ানোর পর সিনেমা দেখতে যাবে দুজন। আবার রিকশা করে ঘুরে বেড়ানো। প্রিয়তমাকে বুকের কাছে পাওয়ার কী চমৎকার পরিকল্পনা ছেলেটির। সিনেমা হলে জর্দা দেওয়া পান খাওয়ার পর মেয়েটি ছেলেটির বুকে মাথা রেখে খেল্ দেখবে, একসময় হয়তো ঘুমিয়েও যাবে সেই বাদশা'যাদী। ছেলেটির চোখেও ঘুম নেমে আসবে। বাসায় ফিরবে অনেক রাতে। মেয়েটি ফিরে যাবে তার ঝরোকায়। আর ছেলেটির ঠিকানা 'তিন নম্বর হাবু মিয়ার বস্তি'। এই প্রেম স্বপ্নের মতো সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবের কষাঘাতে জীর্ণ। বস্তিতে থাকা ছেলেটি ঝরোকার সেই বাদশা'যাদীর সঙ্গে সত্যি সত্যিই এই প্রেমের দৃশ্যে অবতীর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন না করেও বলা যায়, কবির চেতনালোকেই এই ছেলেটির বসবাস। তাই প্রেমের রোমান্টিক আবহ রচনার প্রশ্নেও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেন না।

রাত্রিশেষ-এর 'প্রতিভাস' পর্বে লরেন্স বিনিয়ন-এর কবিতার চারটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন কবি : 'মস্তিকের কোষে কোষে যুদ্ধ আর নির্মম বিরোধ,/কামনার বন্যাবেগে এ যুদ্ধ নির্মম প্রতিরোধ।/যুদ্ধ আর যুদ্ধ শুধু ক্ষীণাশ্রয় নেই হৃদয়ের,/ কোথাও আশ্রয় নেই পলায়নে মুক্তি নেই এর।' (১৯৯৫ : ৩২)। এই কবিতাংশের মূলভাব থেকে 'প্রতিভাস'ভুক্ত কবিতার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়কেই এই পর্বে শিল্পরূপ দিয়েছেন কবি। তাই উল্লেখ করার মতো কোন প্রেমের কবিতা এই গ্রন্থে নেই। তাঁর প্রেম এখানে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ ও দীর্ঘশ্বাসকে ধারণ করেছে। প্রেমের অন্তর্গত ঐশ্বর্যকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও শৈল্পিক দায়িত্ব সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন কবি।

ছায়া হরিণ (১৯৬২)-এর কোন কোন কবিতায় প্রেমের আভাস প্রতিভাত হলেও সেই প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে নর-নারীর সম্পর্কের আলোকে পাঠ করা যায় না। নারীর অবয়বে তিনি প্রায়শই তাঁর স্বদেশের মুখচ্ছবি এঁকেছেন। মা, মাতৃভূমি আর প্রেয়সী এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় একাকার হয়ে গেছে। *ছায়া হরিণ*-এর প্রথম কবিতা 'তোমাতে অমর আমি' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

মায়ের বুকের মতো পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।
লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের
সারা পথে; মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে
এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে।

ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর
আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা। ('তোমাতে অমর আমি'/*ছায়া হরিণ*)

আহসান হাবীবের 'সমগ্র সত্তায়' স্বদেশ কীভাবে প্রোথিত, উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব। কবিতাটিতে 'মা, দয়িতা, এবং স্বদেশ এই ত্রয়ীসত্তা এক সাথে এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে, ঘনীভূত হয়ে একক সত্তায়

পরিগণিত হয়েছে।' (শোয়েব শাহরিয়ার ২০১২ : ১৮৬)। দেশ ও মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা তাঁর কাছে 'আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মত'। এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি অনুভব করেছেন 'মায়ের মুখের ভাষা প্রেয়সীর মুখের কবিতা' কীভাবে আত্মার গভীরে গিয়ে একই তন্ত্রীতে আলোড়ন তোলে। এই গ্রন্থের 'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা' কবিতায় আমরা লক্ষ করি, 'অনিন্দ্যসুন্দর কোনো নারী' আর 'সেই নারীর হৃদয়' স্পর্শ করেই স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার শপথ গ্রহণ করছেন তিনি । নিজের কবিতাকে 'অজেয় বিষাণ' করে এই 'পৃথিবীর বুকে প্রেম আর হৃদয়ের/এবং প্রেমিক মানুষের পত্তনের শপথ এবার' আহসান হাবীবের। কবির প্রেম এভাবেই ব্যক্তিগত বৃত্ত অতিক্রমের মাধ্যমে দেশ-কালের প্রেক্ষাপট স্বীকরণ করে সমগ্রতায় সমর্পিত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : 'আহসান হাবীবের কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উষ্ণ মানবিকতার সাথে রোমান্টিকতার শান্ত মেজাজ আবার সচেতনতাবর্জিত নয়।' (আহমদ রফিক ১৯৮৭ : ১১৫)। এই সচেতন রোমান্টিক আবহের কারণেই পৃথিবীর অস্থির-অশান্ত-অসুস্থ মানুষের জন্য কবির প্রেম-ঘোষণা প্রিয়তমার হৃদয়ের স্পর্শে প্রবল-প্রখর-প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে :

> অনিন্দ্যসুন্দর কোনো নারী
> আর সে নারীর হৃদয়ের নামে,
> শপথ প্রেমের নামে,
> শপথ শান্তির নামে,
> পৃথিবীর শান্তিহারা মানুষের নামে। ('প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা'/*ছায়া হরিণ*)

'যৌবনে জীবনে তুমি' কবিতায়ও আহসান হাবীব স্বদেশকে আপন করে পেতে যেমন রক্ত দেওয়ার কথা বলেছেন, তেমনি 'প্রিয়জন/অতি প্রিয় জীবনের সব সুধা/আর আনন্দের বিনিময়ে' অর্জিত জন্মভূমির জন্য গর্ব অনুভব করেছেন। সামগ্রিক অর্জনে ব্যক্তিক অভিলাষ ত্যাগ করার মধ্যেও প্রেমের গৌরবই ঘোষিত হয়। কারণ ত্যাগের বস্তু মহিমান্বিত না হলে মহৎ অর্জনে উদ্দীপিত হওয়া সম্ভব নয়। আহসান হাবীব এই উপলব্ধি থেকেই ব্যক্তিগত উপভোগের বৃত্ত ভেঙে প্রেমকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেন।

আহসান হাবীব *সারা দুপুর* (১৯৬৪) কাব্যেও স্বকালের দুঃখ ও দীর্ঘশ্বাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এই গ্রন্থেও ব্যক্তিক প্রেম তথা মানসী-প্রিয়ার সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ ও আর্তি অনুপস্থিত। 'পুতুল' কবিতায় কবি যাকে প্রাণের পুতুল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, সেই পুতুলের সর্বাঙ্গেও স্বকালের নানা চিহ্ন মুদ্রিত। 'এসো সঙ্গী হই' কবিতায় নতুন নদীর তীর ঘেঁষে যার হাত ধরে হেঁটে বেড়াতে চান কবি, তাকেও একান্তে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আবেগ-বিহ্বল কথাটি খুলে বলেন না। প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে কবি যে পথে ঘুরে বেড়ান, সেখানে বর্ণনাতীত বেদনার চাপ চাপ রক্ত যেন ছড়িয়ে আছে। তাই তাঁর দয়িতাকে তিনি অন্য আকাশ, নতুন দিগন্তের দিকে টেনে নিয়ে যান যেখানে দুজনের বেদনার সঙ্গে আরো অনেকের দুঃখদাহ থেকে মুক্তির প্রত্যাশা ও ব্যাকুল বাসনা চরিতার্থ করার ছবি আঁকবেন কবি :

> তোমার আমার আর তার সব বাসনাকে এসো
> সহজে চিত্রিত করি এসো সেই দিগন্তে
> যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই
> সবার ইচ্ছের অনুরূপ,
> অমর যেখানে
> তোমার আমার আর সকলের প্রাণের ভাস্বর! ('এসো সঙ্গী হই'/*সারা দুপুর*)

'তোমার জন্যে' কবিতায় আহসান হাবীব যাকে 'মুক্ত দিনের আলোর রাজ্যে রাণী' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, সেই রানীকেও মানসী-প্রিয়ার অবয়ব নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হতে দেখি না। এখানেও জননী, দয়িতা ও স্বদেশের সম্মিলনে কবি তাঁর প্রেমের জন্য বিস্তৃত পরিসর রচনা করেছেন। কবি যার জন্য শঙ্কামুক্ত দিন আর স্বপ্নিল রাতের আকাশ রেখে যেতে চান, যার এলোখোঁপায় 'একটি অমর স্বপ্নশপথ রেখে যাবো' বলে বুকের ভেতর আশা জাগিয়ে রাখেন, তা শেষ পর্যন্ত স্বদেশভাবনায় সমর্পিত বলেই মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আশায় বসতি (১৩৮১) কাব্যগ্রন্থে আহসান হাবীব কখনো কখনো স্মৃতির সমুদ্রে নোঙর করেছেন। সেই সমুদ্রের কোন কোন ঢেউ কবিচৈতন্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রেমের খণ্ড খণ্ড ছবি। 'কাহিনী নিরন্তর' কবিতায় ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে হাবীব অনুভব করেছেন, এই যার পায়ের চিহ্ন পড়বে বলে অপেক্ষা করেছেন কবি, সেই আলোর পথে সে আর ফিরে আসবে না। কবির অন্তর থেকে নেমে আসা যে নদীর কথা এই কবিতায় বিধৃত, সেই নদীতে কবি একাই সারাদিন সারারাত উজান ঠেলে চলেছেন। কবির যখন 'বন্ধুহীন একলা পথে ফুরায় বেলা', তখন ভানুমতির খেলায় নিমগ্ন হতে হতে তাঁর মনে পড়ে :

আদ্যিকালের একটি মেয়ে সেই যে মেয়ে
ঘাটের পাশে কলসী রেখে রইলো চেয়ে
রইলো চেয়ে
পারুল গেলো চম্পা গেলো বকুল শেফালী যায়
চৈতী খরা রোজ দুপুরে ধুলো ওড়ায়...
সেই যে ছেলে একলা ছেলে ফেরে না হায়। ('কাহিনী নিরন্তর'/*আশায় বসতি*)

সুদূর অতীতের একটি মেয়ে এখনো কবির অন্তর-উৎসারিত নদীর ঘাটে জল নিতে এসে আড়চোখে তাকায়। আর যে ছেলেটি এই মেয়ের জল ছুঁয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকেও তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই 'হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে' স্মৃতির কুসুম কুড়াতে গিয়ে আহসান হাবীব নিজের শৈশব ও যৌবনকে এক ঝলক দেখে নেন। 'ডাক' শীর্ষক কবিতায় কবি যৌবনের ভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি সহসা ঘুম থেকে জেগে দেখেন, আশেপাশে কেউ নেই, 'বাইরে ওরা এক জাগ্রত মিছিল আজ/জাগ্রত মিছিল/এখন জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোলে,/সমুদ্রজোয়ারে প্রাণ সমর্পিত/বজ্রঝড়ে সমর্পিত বুক।' ('ডাক'/*আশায় বসতি*)। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের যে ছবি কবি এখানে অঙ্কন করেছেন, সেই প্রতিরোধের মিছিলে তাঁর প্রাণের মানুষও বোধকরি উপস্থিত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রত্যাশার সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে জনস্রোতে মিশে গিয়ে 'দেশের আরশিতে' নিজের মুখ দেখার যে আনন্দ, সেই আনন্দই এই কবিতায় প্রতিভাত। আহসান হাবীবের এই কবিতাটিতে প্রেম আত্মলীন মানুষের স্বার্থসর্বস্বতায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাধিরূপে নয়, বরং বিপ্লবের দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে চিত্রিত। 'আত্মরতি-ঊর্ণার আড়াল' ভেঙে জনজোয়ারে সামিল হওয়ার আহ্বানে কবির প্রেম এই কবিতায় লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা :

কড়ির ওপরে কড়ি সাজাবার শখ ছিল যার
এখন মিছিলে।
কালো অন্ধকার গর্তে ছিলো যার রুপোর কারখানা
এখন মিছিলে।
শেষ রজনীর ক্লান্ত নূপুরের বুকে যারা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো
এখন মিছিলে
এখন মিছিলে দেখো বিচিত্র মুখের সমাবেশ
সব মুখে একই আভা।
চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখো
মিছিলের সবার মুখে। ('ডাক'/*আশায় বসতি*)

কবির প্রিয় মানুষদের মিছিলে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর চৈতন্যে প্রবাহিত পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। মিছিলের সৌন্দর্য কবির মনে আশার সঞ্চার করেছে। 'বৈরী সময়ের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি প্রিয় মানুষের মুখটিকে প্রেরণা হিসেবে দেখতে পান। তিনি সেই ভালোবাসার কথা বলেন যা সবার জন্য ভালো বাসার নিশ্চয়তা এনে দেবে। কবির চোখে তাই প্রেম কেবল ব্যক্তিগত অনুভবের দোসর হয়ে থাকে নি, সমগ্র মানবের জন্য শান্তি ও স্বস্তির বার্তাবাহক তাঁর প্রেমের কবিতা।' (তারেক রেজা ২০০৯ : ২৭)। প্রসঙ্গত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *ফুল ফুটুক* কাব্যের

'সুন্দর' শীর্ষক কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়, যেখানে তাঁর দয়িতা জনস্রোতের অংশ হিসেবে সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। দমকা হাওয়ায় আঁচলের উড়ে বেড়ানো কিংবা 'বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম' যখন তার মুখে মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছিলো, তখনো তা কবিকে প্রাণিত করে না। এমনকি আকাশ উদ্ভাসিত করে দেওয়া হাসির মধ্যেও বিশেষ কিছু খুঁজে পান না কবি। জনস্রোতে মিশে গিয়েই কবির দয়িতা বিশেষ হয়ে ওঠে :

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল

যখন তোমাকে আর দেখা গেল না–

তখনই

আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে। (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০০৩ : ১/১৪৩)

আহসান হাবীবের *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬) কাব্যের কোন কোন কবিতায় কবির দয়িতার ছায়াপাত লক্ষ করা গেলেও সেই ছায়ার ভেতরে যে-কোন মানুষের মুখচ্ছবিই কল্পনা করে নেওয়া যায়। 'কড়ি গুনতে গুনতে' কবিতায় টাকার হিসেবে মগ্ন যে মানুষটি খেয়ায় ওঠার কথাই ভুলে যায়, কিংবা নদীই যাকে রেখে ছুটে যায় তার ধরাছোঁয়ার বাইরে, তার মধ্যে প্রিয় মানুষটির হিসেবী মনের বঞ্চনার ছবি কল্পনা করে নেওয়া যায়। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন আবেগের প্রাণঢালা উচ্ছ্বাস। তার অভাব এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। তাই খেয়ায় উঠতে না পারা কিংবা নদীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে ভালোবাসা না-পাওয়ার অভিব্যক্তিও প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। 'কোনো কোনো শেষ রাত্রে' কবিতায়ও আমরা একজন অধরা মানসীকে কল্পনা করে নিতে পারি, যে দ্রুতগামী ট্রেনের মতো হুইসিল বাজিয়ে কবিকে অস্থির করে দূরে হারিয়ে যায় :

কোনো কোনো শেষ রাত্রে
        তুমি আর চেনা সেই রেলগাড়ি নও...
নীলিমা মলিন চাঁদ তরল আঁধার চরাচর
তুলে নিয়ে
কোনো কোনো শেষ রাত্রে
                তুমি সেই অলৌকিক হুইসিল বাজিয়ে
ক্রমাগত চলে যাও ডেকে ডেকে যাও
ইচ্ছে হয় যাই
আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ('কোনো কোনো শেষ রাত্রে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

'মনীষা মনীষা ব'লে' কবিতায় কবি এবং আরো অনেকে বটের ছায়ায় যার জন্য অপেক্ষায় আছেন সেই মনীষার মধ্যে বাইজান্টাইন, নাইলের সবুজ, 'আলেকজান্ডার কিংবা তৈমুরের পশ্চাদ্ধাবন', 'অথবা সজ্জিত বেঞ্চ মুখোমুখি টীকা ভাষ্য ব্যাখ্যা আর মুখর ভাষণ' লক্ষ করলেও এই উচ্চারণের মধ্যে গভীরতর প্রেমের প্রতিভাস টের পাওয়া যায়। এই মনীষার জন্যই কবি হাইড পার্কে, পল্টনে 'দীর্ণ ক্ষোভ বিদ্বেষ অথবা অহমিকা' নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের চিহ্ন বুকে ধারণ করেও মনীষার মধ্যেই কবি অন্বেষণ করেন ভালোবাসার মতো কোন নির্ভরতার শেষ অবলম্বন :

মনীষা কি পারমাণবিক?
ন্যাপাম? অথবা
মনীষা কি নীলাকাশ নিসর্গ অথবা কোনো স্থিরচিত্র
অভয় এবং নিশ্চয়তা,
ভালোবাসা নামে কোনো নিশ্চিত নিলয়? ('মনীষা মনীষা ব'লে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০) কাব্যে বিপন্ন সময়ের নানা চিহ্ন সত্ত্বেও কোন কোন কবিতায় কবির মানসী-প্রিয়ার মুখ ভেসে উঠতে দেখি। সেই মুখের চারপাশে হয়তো হিংস্র হায়েনাদের যাতায়াত লক্ষ করা যাবে, তবু ভালোবাসার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার প্রত্যয় সেখানে প্রতিভাত। কবি তাঁর প্রিয় মানুষটির জন্য যে উপহার-সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন, পাঠক হিসেবে আমাদের সবার অধিকারই সেখানে স্বীকৃত। তবু ভালোবাসার মানুষটির কাছে ঋণ স্বীকার করেই সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হতে হয়। 'আমি আছি' কবিতায় রুদ্ধশ্বাস বাস্তবতায় নিজেকে আবিষ্কার করেন কবি। কিন্তু এই প্রতিকূল সময়ের সঙ্গে লড়াই করেই তিনি গন্তব্যের দিকে ধাবিত হন। কবি তাই তাঁর প্রাণের মানুষটিকে অরণ্য নদী কিংবা নক্ষত্র দিয়ে আবাহন করেন। কবির ব্যক্তিগত ফুল-পাখি-চন্দ্রিমার সবটুকু দিয়ে সেই মানুষটির কাছে যেতে চান, যে কবির অস্তিত্বে গাঁথা। এই মানুষের সঙ্গে কবির মাতৃভূমিও বোধকরি একই বৃন্তে বিকশিত হয়েছে, তাই ভালোবাসার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ব্যাকুলতায় কবিকণ্ঠে যে আর্দ্রতা অনুভূত হয় তা অভূতপূর্ব, অনন্য :

আজন্ম তোমার সঙ্গী, স্বপ্নেও আছি সংগ্রামেও আছি
আমি সঙ্গে থাকি তাই সঙ্গীত-সভায় বাজে করতালি
সঙ্গে থাকি সামনে থাকি তাই রুদ্ধ উৎসব-তোরণ
কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ব্যাকুলতা আমাকে ছোঁবে না। আর্তিতে পাবে না।
তোমার ঘরেই দেখ কেমন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছি
এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তুমিই এ কথা
জেনে নিলে জানবে তুমি কে কোথায় আছি। ('আমি আছি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় দ্রুতগামী সময়ের গতিবিধি বোঝাতে বারবার ট্রেনের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। ভালোবাসার কথা বলতে বলতে সময় কীভাবে নাগালের বাইরে চলে যায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি 'ট্রেন' কবিতায়। কবিতাটির মর্মে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পের ছায়াপাত লক্ষ করেছেন একজন সমালোচক :

> 'ট্রেন' কবিতাটি পড়তে গিয়ে মনে পড়ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শৃঙ্খল' গল্পটির কথা। ভালোবাসা থেকে মানুষের ঘৃণা অর্থাৎ ভালোবাসার উল্টোপিঠে কেবলমাত্র জাজ্বল্যমান ঘৃণাই স্বাভাবিক। এ'কথাটিই কবি চমৎকারভাবে এখানে তুলে ধরেছেন। ভালোবাসাকে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না– কিন্তু তার মধ্য থেকে যখন উঠে আসে ঘৃণা, তখন মানুষ হয়ে যায় 'শৃঙ্খল' গল্পের নায়ক-নায়িকা। ভালোবাসাবাসির ব্যাপারটা যখন পাশাপাশি থেকে সম্ভব হয়েছে এবং এগিয়ে দিয়েছে দু'টি জীবনকে, সুতরাং ঘৃণা করার জন্যে চাই পরস্পরের কাছাকাছি থাকা এবং প্রতিমুহূর্তের ঘৃণা দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে একদার ভালোবাসার মানুষকে করা হচ্ছে ঘৃণা। ভালোবাসার যে অচ্ছেদ্য-বন্ধন মানুষের কাম্য– সেটি ঘৃণার দুর্বিষহ শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয়– তখনি তাকে বলা হয় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস– এটার মাধ্যমেই মানুষের ঘটে ইবসেনীয় ট্র্যাজেডী, বেঁচে থাকার নামে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাকে নিতে হয় মেনে। (তুষার দাশ : ১৯৮৫ : ৯৭)

ভালোবাসার কথা, ভালোবাসার মহিমার কথা এবং ভালোবাসায় যে অপার্থিব আনন্দ আছে সেই কথা বলতে বলতে কবির আনন্দ যখন জোনাকির মতো চারপাশকে আলোকিত করছিল, তখনই প্রবল ঘৃণার হুইসিল বাজিয়ে রাতের ট্রেন ছুটে যায়। তারপর আবার কবি 'ভালোবাসা ভালোবাসা বলে চীৎকার' করে ওঠেন। সেই চীৎকারধ্বনিতে ভোরের বাতাস, মধ্যাহ্নের রোদ, গোধূলির রক্তিমাভা যখন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেয় তখন স্টেশনের শেষ বাতিটিও নিভে যায়। বিপন্ন সময়ের হাতে মানুষের সুকুমার বৃত্তির বৈনাশিক পরিণতির কথা বললেও কবি উদ্বিগ্ন হন না। সময়ের হাতে বিপর্যস্ত মানুষই সময়কে নিজেদের ইচ্ছের অনুকূলে রাঙিয়ে তুলবে। গতি ও গন্তব্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যয় এখানে ট্রেন-প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমহীন জীবনের 'গতিহীন যতিপাতময়' অভিজ্ঞতার ট্র্যাজিক দিকটিই এখানে ট্রেনের বিষয়ে নিরুদ্বিগ্নচিত্ততার আড়ালে প্রতিভাসিত হয়েছে। 'তাই 'ভালোবাসার ভস্মস্তূপের দিকে তাকিয়ে' কবি শেষ ট্রেনের অপেক্ষা না করে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখোশ উন্মোচনের কথা ভাবেন। কবি ভালোবাসার কথা বললেও ভোলেন না, ভালোবাসার জন্য দুঃখের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তাই 'কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে' কবিতায় কবি ঘোষণা করেন : 'আমি তোমাদের ভালোবাসার কথা শোনাবো/ভালোবাসা, তাই আঘাতের কথা আমি তোমাদের

শোনাবো।' আহসান হাবীব 'গিলগামেশ কাহিনী' কবিতায়ও ভালোবাসার খোঁজে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলেছেন। ক্লান্ত হয়ে কবি যখন নিজের দিকে তাকান, তখন অনুভব করেন, ভালোবাসাই তাঁর জন্য পথ চেয়ে আছে। কবির অন্তরাত্মাই হয়তো বলে : 'ফিরে যাও, ফেরার পথেই/ভালোবাসা অপেক্ষায় আছে।' ('গিলগামেশ কাহিনী'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)। 'সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে' কবিতায় কবি শৈশবের এক রানীবালার কথা স্মরণ করেছেন, যার হাত ধরায় ঝড়ের বেগে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল মেয়েটি। কবির চোখ দিয়ে শৈশবের সেই প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটি এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক :

আর একটু এগিয়ে এসো
ঐ দেখো ঈশ্বর গায়েনের সেই সুপুরি বাগান
ওখানে দুপুর বেলায় একদিন
তুমি রানীবালার হাত ধরেছিলে
রানী এক ঝটকায় তোমার হাত ছাড়িয়ে
ছুটে গিয়েছিলো ('*সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে*'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীব বারবার ভালোবাসার দিকে হাত বাড়ালেও দুঃসময়ের প্রবল ঝড় এসে সেই হাতকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। 'রে কিশোর' কবিতায় কবি তাই কিশোরের বুকে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে দেন। এই কিশোরের চোখে 'বানানো আন্ধার/তীক্ষ্ণ বল্লমের মত ছুঁড়ে দিয়েছিল যে দুর্জন'– কবি তাকে চেনেন। নদী, নারী এবং শস্য মাঠ চিনে নেবার আগেই সেই শত্রুকে চিনে নেওয়ার পরামর্শ দেন কবি। তাই সমস্ত সংসার যখন ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে, তখন প্রেমের কথা কিংবা প্রেমিক অর্জুনের কথা ভাবার আগে বীর অর্জুনের কথাই মনে পড়ে কবির। 'টান' শীর্ষক কবিতায় কবি তাই বলছেন :

ধনুকের ছিলার মতন
টানটান হয়ে আছে নদী ও নীলিমা
শস্যক্ষেত সুপারি বাগান, পাশে
আদিগন্ত নদীর কিনার।

সমস্ত সবুজ আভা
মানবিক সম্পর্ক এবং প্রেমে টান লেগে আছে
টানটান ধনুকের ছিলার মতন টান চরাচরে
অলক্ষ্যে টঙ্কার :
চতুর্দিকে কারা ডাকে : অর্জুন! অর্জুন!! ('টান'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এই উদ্ধৃতাংশ থেকে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি, প্রেমিক অর্জুনের চেয়ে যোদ্ধা অর্জুনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন কবি। কারণ, অশুভ শক্তির কাছে প্রণত হয়ে ব্যক্তিগত ভালোবাসায় মগ্ন থাকার মধ্যে মনুষ্যত্বের যে অপমান, তা কবি কিছুতেই মেনে নিতে চান নি। সময়ের কাছে সমর্পিত না হয়ে সময়কে বদলে নেওয়ার মধ্যেই প্রেমের প্রকৃত প্রকাশ ঘটে বলে মনে করেন কবি। তাই ভালোবাসার হাতকে কর্মীর হাত হিসেবে দেখতে চান তিনি। কবিকে পেতে হলে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, মাটির কাছাকাছি হয়ে মহিমান্বিত জীবনের আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য থাকতে হবে। যেখানে মাটি ও মানুষের বন্ধন নিবিড়, সেখানেই কবির সমর্পণের আনন্দ। সেই আনন্দ-নিকেতনে কবি আগন্তুক নন, প্রেমে ও প্রত্যয়ে সকলের স্বজন হিসেবে কবি স্বাপ্নিক নিয়মে এই বাংলার জল-কাদায় অবস্থান করেন, আর কবির ভাষায়, 'এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা–/সারা দেশে।' 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় প্রেমিক কবি পাঠকের চৈতন্যে নিজের ঠিকানা লিখে দেন এইভাবে :

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে

লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।

আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক। ('আমি কোনো আগন্তুক নই'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীবের প্রেম-বিষয়ক অভিব্যক্তির গতি, গভীরতা ও গন্তব্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ লক্ষ করা যাবে তাঁর *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১) কাব্যের কবিতাসমূহে। বইটির প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র থেকে কবির মানসী-প্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চল্লিশের দশকের হাজরা রোডে থাকা সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বইটি উৎসর্গ করলেও কবি ভোলেন না সুলেখার ছোটবোন শ্রীলেখার কথা। সুলেখার উদ্দেশ্যে কবি লিখছেন : 'আপনার ছোট বোন শ্রীলেখাকে কিছু বলবেন কি বলবেন না সে ভাবনা আপনার। আর আমার স্ত্রীকে যা বলবার আমিই বুঝিয়ে বলবো। অবশ্য এত কথা যখন উঠছেই তখন কৈশোরের জোবেদা, নূরজাহান, রমলা আর প্রথম যৌবনের সেই সরুচেন শ্যামলাঘাড়, আর সেই যে কলেজের পথে প্রায় নিত্যসঙ্গী নাম না জানা শ্যামাঙ্গিনী এরাই বা... ।' (১৯৯৫ : ২৯৯)। কবির প্রেম এভাবেই নানা পাত্রে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে স্বাগত জানিয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতেও এই উৎসর্গপত্রের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি। এই ব্যাখ্যা কবির প্রেমের দর্শনকেও দূরসঞ্চারী করে তুলেছে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

> প্রেমের স্বভাবে আছে একজন যাযাবরের বাস এবং এই সত্যটি আমরা প্রায়শ অস্বীকার করি। কৈশোরিক আবেগটাবেগ বলে তুচ্ছ জ্ঞান করি একদিকে প্রবলতর অতীতকে অপরদিকে বর্তমানটি থাকে কখনো আত্মপ্রতারণা, কখনো পলায়নপরতার কবলে। 'তুমিই জীবন তুমিই মরণ।' ঘোষণা করে একদিকে একজনের সামনে নতজানু যখন, তখনো কখনো কখনো দু-কাঁধের পাশ ঘেঁষে 'পাখির নীড়ের মতো দু'টি চোখ জ্বলতে-নিভতে দেখা যায়। আসলে আমরা অতীতকে কখনো মুছে ফেলি না এবং তার পরেও সারা জীবনই সময়ে অসময়ে প্রেমে পড়ি আর একজনকে না একজনকে সারা জীবন ভোলাতেই থাকি। (১৯৯৫ : ৩০০)

কবির এই স্বীকারোক্তি থেকে তাঁর প্রেমিকাদের পরিচয় যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতার প্রেরণাসঞ্চারী মানসীরা তাঁর মনের গভীরে যে অক্ষয় আসন রচনা করেছে সে-সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্রের শেষ বক্তব্যটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই : "উৎসর্গ যখন এক নয় আর 'কার প্রাপ্য কাকে দিই' এই যখন ভাবনা তখন থাক না এ বই সেই নাম করা নাম না করা সকলের জন্যেই।" তাঁর প্রেমের কবিতায় অতীত-বর্তমানের নানা স্মৃতি ও সম্পর্কের মেলবন্ধন প্রগাঢ় বলেই ভবিষ্যতের আবেগকেও তা ধারণ করতে সক্ষম। 'নাম করা নাম না করা সকলের' উদ্দেশে কবির *প্রেমের কবিতা* উৎসর্গ করা সেই অর্থে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রেমের কবিতা কাব্যের কবিতাগুলোকে দুই উপশিরোনামে ভাগ করেছেন কবি– 'দীপ্রদুপুর/রক্তিম বিকেল' এবং 'তারো আগে/প্রথম প্রহর'। 'নামকরণেই আছে জিজ্ঞাসা, সিদ্ধান্ত ও অনুভূতির উত্তর; একটি বাস্তবের মুখোমুখি অপরটি স্মৃতিকল্পনায় ভারাতুর।' (ঊষা গওহর ২০১২ : ২২৭)। আশা ও নৈরাশ্যের বাইরে সুখ-দুঃখের অতীত কিছু অভিজ্ঞতা নম্র সূর্যালোকের মতো কবিকে বিহ্বল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতাই কবি 'ভালোবাসা নাম' কবিতায় প্রণয়ের মূর্তি ধারণ করেছে। ভালোবাসার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন নেই কবির, তবুও প্রেমের স্পর্শ নিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখে কেউ। কবি তাকে স্বাগত জানান এবং 'তার অলৌকিক করতল' কবির বুকের ওপর ন্যস্ত হয় :

সৌরভ আলো আর আনন্দ আমি ঘরময় সাজিয়ে নিলাম।
এবং সাজিয়ে নিতে নিতে
সে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে
আমার হৃদয় ছুঁয়ে ফেললো।

এবং সে আমার সমস্ত হৃদয় গ্রাস করে নিতে নিতে
আকাশে মেঘের গর্জন শুরু হলো
বাতাসের মত্ততা প্রবলতর হলো
তীব্র বিষের স্রোত আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে
আমার কক্ষের বাইরে ধাবিত হলো। ('ভালোবাসা নাম'/*প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের দয়িতা নিকটবর্তী হলে বাইরের পৃথিবীতে বিরূপ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। তীব্রতর প্রেম যখন বিষের মতো কবিকে গ্রাস করে, তখন আকাশের মেঘের গর্জন কবির অন্তর্গত অস্থিরতারই প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়। প্রেমের বিষাক্ত ছোবল কবিকে অন্তর্মুখি না-করে বাইরের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কম্পিত চরাচরের মধ্যে কবি শুনতে পান মজ্জমান পৃথিবীর আর্তনাদ আর তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষের দেয়াল-দরোজা চুরমার হয়ে যখন বাতাসে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, কবি তখন অনুভব করেন, 'আমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে/বিধ্বংসী বাতাসের বুকে মিশে যাচ্ছি।' সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও কবির অবয়বহীন পরিচয়হীন আদিম হাহাকার চলতে থাকে। এই হাহাকারের মধ্যেই বোধকরি স্মৃতির বসবাস। কবি এমন একজনের জন্য অপেক্ষা করেন যে এই ছিন্নস্মৃতির মালা গেঁথে কবির গলায় পরিয়ে দেবে। কিন্তু সময়ের থাবা সর্বত্রই সচল। তাই সেই স্মৃতিজাগানিয়া এখন 'স্মৃতিহরণের উদ্যোগে নিরন্তর'।

'কে কেমন আছে' কবিতায় আহসান হাবীব সেকাল-একালের মেলবন্ধনে স্মৃতির কুসুম ফোটাতে ব্যস্ত। কবির সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনে ঈর্ষাকাতর কেউ কেউ কষ্টের আগুনে পুড়ে যায়। 'পৃথিবীতে কে কেমন আছে কেউ তা জানে না'– কবির এই উপলব্ধির আড়ালে জেগে ওঠে মানুষের অন্তর্গত অসুখবিসুখের অপ্রকাশিত বৃত্তান্ত, সেইসঙ্গে বালকস্বভাবের একজন যে 'জ্বলন্ত পেরেক একটি তুলে নিয়ে অর্বাচীন আবেগে/নিজের বুকে বিঁধিয়ে গোলাপ গোলাপ বলে নৃত্য করে/দু'একবার তারপর থেমে যায়, তারপর জ্বলতে থাকে!' ('কে কেমন আছে'/*প্রেমের কবিতা*)। 'পরিস্থিতি' কবিতায় কবির মানসী-প্রিয়ার দৈহিক লাবণ্যের অনেক কিছুই আজ কেবল স্মৃতির গহ্বরে বিহ্বলতা ছড়ায়। রেশমি চুলের লাবণ্য, কাঁধের মৃদু আভাস, বাঁকা চিবুক– সবকিছুই কবির ক্ষুধাতৃষ্ণা হরণ করেছে। 'খড়ের বেগুনী চটি/লাল টিপ/ আধখোলা পিঠ/রূপালি ঘামের কুচি'– এইসব কবির ঘুম ও জাগরণের অনুভূতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> প্রেম এখানে তীব্র ও আগ্রাসীরূপে আবির্ভূত। ব্যক্তিত্বের বিশেষ ভঙ্গির কারণেও হতে পারে। আহসান হাবীবকে সময় ও সমাজভাবনায় বেশ পরিশীলিত ও নিম্নকণ্ঠ হিসেবেই পাই কিন্তু প্রেমের উচ্চারণে ব্যতিক্রম। কামনা এখানে স্পষ্ট, রক্তমাংস নিয়ে আবির্ভূত; কামনা ও বিরহ সম্মিলিতভাবে প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছে। তবে তা সৌন্দর্যের প্রতি অভিনিবেশ হিসেবে বিবেচনা করলে চুলের গোছা, নত কাঁধ, বাঁকানো চিবুক, লাল টিপ, আধখোলা পিঠ নিয়ে দৈহিক থাকে না, বেদনার অংশভুক্ত হয়। বস্তু ও বস্তুর অনুভূতি এক নয়, প্রেমিক হৃদয়ের সংবেদনার ধর্মে এই প্যারাডক্সটিও বিগলিত হতে পারে, জন্ম দিতে পারে নতুন বোধ। এই বোধই দেহকে দেহাতীতে উত্তীর্ণ করে, ঘৃণাকে পরিণত করে ভালোবাসায়। (ঊষা গওহর ২০১২ : ২২৫)

তাই আহসান হাবীব যখন অন্তর্গত দর্পণের দিতে তাকান, যৌবনের উত্তেজনা কৈশোরের বাসনাবিহীন স্মৃতি তাঁকে তাড়িত করে। দরোজা খোলার দিকে তাঁর মন নেই, কে আসে কে যায় তারও খেয়াল নেই তাঁর। অতীতের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠায় চোখ রেখে কবি একজন বালকের সঙ্গে বোঝাপড়ায় মনোনিবেশ করেন :

আরশিতে ফেরালে মুখ
মনে হয় আমি
হারানো বালক এক
কোথাও অচেনা
স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি
নামহীন গোত্রহীন ঠিকানাবিহীন। ('পরিস্থিতি'/*প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতায় আমরা বারবার এই 'নামহীন গোত্রহীন ঠিকানাবিহীন' মানুষের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। স্মৃতির ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে এই ঠিকানা হারানোর আনন্দ কবি তাঁর পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান। স্মৃতি মানুষের সচলতাকে প্রভাবিত করলেও স্মৃতির হাত ধরে বিশেষ কোন গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব কি-না, এই প্রশ্ন কবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতিকে নেড়েচেড়ে দেখার সুখটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না তিনি। আত্মবিস্মরণের মাধ্যমেও মানুষ আত্মপ্রত্যয়ের নতুন দিগন্তে পৌঁছে যায় কখনো কখনো। তাই এই ঠিকানাহীনতার নাম হতে পারে নতুন পৃথিবীর প্রাণবান মানুষ হিসেবে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার অনাক্রু উচ্চারণ।

'একবার বলেছি তোমাকে' কবিতা থেকে আহসান হাবীবের প্রেম-নিবেদনের প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে। কবি কাউকে একবার প্রেম নিবেদন করলে আর সেই কথা ফেরাতে পারেন না। সময়ের বিবর্তনে সেই ভালোবাসার স্থান দখল করে নেয় ঘৃণা। তখন একসময়ের প্রিয় মানুষটির সান্নিধ্যও অসহ্য মনে হয়। দয়িতার উষ্ণ নাভিমূল থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে 'তীব্র সাপিনীর তরল নিশ্বাস'। কবি ইচ্ছে করলেও সেই দৃষ্টির ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন না। কারণ একবার তাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পরিবর্তিত বাস্তবতায় নায়িকা সম্রাজ্ঞীর বেশ ধারণ করে, আর কবি নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তার সামনে। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও কবির ভাষায় তাঁর এই উপলব্ধির উপস্থাপন জরুরি :

সম্রাজ্ঞীর বেশে আছো। নতজানু আমি
দাসানুদাসের ভঙ্গি করপুটে, দেখি
তোমার মুখের রেখা অবিচল, স্থির জজ্ঘা তোলে না টঙ্কার
তুমি পবিত্রতা পবিত্রতা বলে
অস্পষ্ট চীৎকার করো, তুমি
কেবলি মালিন্য দেখো, অশ্লীলতা, ক্রমান্বয়ে ঘৃণা
ক্রোধ বাড়ে, উত্তেজনা বাড়ে
নামে উষ্ণ জলস্রোত। তুমি
এইভাবে প্রবল ঘৃণায়
আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে অহঙ্কার রাখতে চাও অটুট। তবুও
পৃথিবীতে আছে কিছু মানুষের অবস্থান, তারা
অপমানে ধন্য হয়
উপেক্ষায় ঋজু
তারা স্বভাব কাঙাল! যদি
একবার বলে তবে ফেরাতে পারে না। আমি
ফেরাতে পারি না। আমি
একবার বলেছি, তোমাকে আমি ভালোবাসি। ('একবার বলেছি তোমাকে'/*প্রেমের কবিতা*)

এরপরও ভালোবাসা-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না কবি। 'ভালোবাসা! সে কেমন, কোন দীপ্র স্বর্গীয় প্রতাপ/যার মৃত্যু নেই/জন্মান্তর নেই?'– এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই কবি অন্যতর ভালোবাসায় জড়িয়ে যান। জড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সময়ও গড়িয়ে যায় নিজস্ব নিয়মে। তাই না-পাওয়ার বেদনাকে মহিমান্বিত করার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কবি। 'যে পায় সে পায়' কবিতায় তাই কবিকে বলতে শুনি– 'তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।' ভালোবাসা না পেলেই এর অন্তর্গত ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয় মানুষ। তাই ফিরিয়ে দিলেও ফিরে যাওয়া যায় না, 'না না বলে ফিরিয়ে দিলেই' কবি 'ঘাতক পাখির ডাক' শুনতে পান চরাচরময়। ভালোবাসার জন্য সম্ভ্রম, সম্পদ– সবকিছু বিসর্জন দিয়ে না-পাওয়ার অভিজ্ঞতা কবিকে পৌঁছে দেয় উপলব্ধির নতুন প্রান্তে :

সব ফেলে
তোমার পায়ের কাছে অস্তিত্ব লুটিয়ে দিয়ে

তোমাকে না পেলে, জানি
যে পায় সে পায় কি অমূল্য ধন। (‘যে পায় সে পায়’/*প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের একটি অসাধারণ প্রেমের কবিতা ‘তুমি’। ছয় লাইনের এই কবিতাটিতে প্রেমিক কবির যাত্রাপথ ও গন্তব্যের ধরন-ধারণ সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অবশ্য এই কবিতাটিতে দুজনের দুটি পথ একই দিকে বেঁকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় আমরা দুই ভিন্ন পথের দুইজন মানুষকে চকিত একসঙ্গে মিলিত হতে দেখি, তারপর দুজনার পথ ভিন্ন গন্তব্যে প্রবাহিত হয়। এই কবিতায় একই গন্তব্যে দুজন এগিয়ে গেলেও ভুল পথে ক্লান্ত হওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু উপস্থিত। তাঁর দয়িতার সঙ্গে তখনই দেখা হয়, যখন কবি নিজের দরোজায় এসে দাঁড়ান। এই কবিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের একটি গান ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/তাই হেরি তায় সকল খানে’-এর অংশবিশেষ স্মরণ করা যায় :

আমি তার মুখের কথা শুনব ব’লে গেলাম কোথা,
শোনা হলো না, হল না–
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥ (১৯৭১ : ১/২১৬)

রবীন্দ্রনাথের এই গানে ঈশ্বর বা জীবনদেবতার প্রসঙ্গ উচ্চারিত হলেও *সোনার তরী* কাব্যের ‘বৈষ্ণবকবিতা’র ‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’ (২০০৬ : ২/৪২)– এই ভাষ্য বিবেচনায় রেখে কবির অন্তরে মানসী-প্রিয়ার উপস্থিতি কল্পনা করে আহসান হাবীবের ‘তুমি’ কবিতার মর্মে প্রবেশের চেষ্টা করা যেতে পারে। কবির দয়িতাও প্রকৃত অর্থে কবির মর্মের নায়িকা হিসেবে তাঁর অন্তর অধিকার করে আছে। তাই নিজের দরোজায় এসেই আহসান হাবীব তাঁর প্রিয়জনের সান্নিধ্য অনুভব করেন :

আমার একটাই গন্তব্য ছিলো, তুমি।
তোমারও গন্তব্য আছে তাই
বারবার তোমাকে হারাই
ভুল পথে ক্লান্ত হই, নিজের অজ্ঞাতে বারবার
নিজের দরজায় এসে দাঁড়াই, এবং
আমার একটাই গন্তব্য থাকে, তুমি। (‘তুমি/*প্রেমের কবিতা*)

‘হায় মালিনী’ কবিতায় আহসান হাবীব ভালোবাসা-বিষয়ে আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও পাপ সম্পর্কে নতুন বিবেচনা তুলে ধরেছেন। কবির মতে, মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিকে প্রাণিত করে উপেক্ষায় সরে দাঁড়ানোর মধ্যেই পাপের আবাস। কিংবা স্বতঃস্ফূর্ততার সৌন্দর্যকে হরণ করে সহসা কাঁধে আঁচল টেনে দেওয়ার মধ্যেই কলুষিত চিন্তা ডালপালা বিস্তার করে। মানুষের মনোভূমিতেই যে প্রতিনিয়ত পাপ জন্ম নিতে থাকে সেই কথাই বলেছেন কবি। অন্তরের আকর্ষণকে অবজ্ঞা করে সুন্দরেরা কেবলই বিত্তের কাছে পরাভব স্বীকার করে। ভালোবাসার টানে যে যুবক দয়িতার হাতে ফুল তুলে দিতে চায়, তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মালিনীরা কেবলই বিকিকিনির হাটে কড়ির মূল্যে ফুল বিলিয়ে দেয়। ফুলের রাজ্যে কোন পাপ নেই বলেই কবি মালিনীর সঙ্গে ঘরবাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু পাপের অজুহাত দিয়ে তাঁর মালিনী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এভাবেই ভালোবাসার মানুষেরা সুন্দরের আহ্বানকে উপেক্ষা করে অসুন্দর আগ্রাসী পৃথিবীর কাছে পরাজিত হয়।

আহসান হাবীব ভালোবাসাকে অনায়াস-অধিকারের বিষয় হিসেবে দেখতে চান। কাউকে নিজের করে নেওয়ার জন্য বিশেষ কোন আয়োজনে বিশ্বাস করেন না তিনি। তাই হয়তো পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাস করেও দুজনের মধ্যে কথা বিনিময় হয় না। সম্ভাবনাকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে স্বস্তি পান না কবি। প্রেমের কবিতায় তিনি যেমন নাটকীয় আবহ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন, তেমনি কোন কোন কবিতার নামকরণেও তিনি এঁকে দিয়েছেন নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনার ছাপ। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

'দোতলার ল্যান্ডিং
মুখোমুখি ফ্ল্যাট
একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়'

একটি কবিতার নাম। ইচ্ছে করেই আমরা এই নামকরণের অসমতল আবহটিকে অক্ষত রেখে দিলাম। নাটকীয় সংলাপে এই কবিতার শব্দাবলি গ্রথিত। শাহানা, যার ডাক নাম শানু, তার সঙ্গে মাহবুব হোসেনের কথা হয় সেই দিন, যেদিন শানুরা বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কেউ কারো কাছে মনের কথাটি খুলে বলে নি কোনদিন। অথচ কী গভীরভাবেই দুজন দুজনকে দেখেছে। শুধু দেখাই নয়, দুজনের ব্যক্তিগত বৃত্তান্তও দুজনের জানা। ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে বলে মেয়েটির পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার খবরটিও এই বিদায়ের দিনে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করে মেয়েটি। পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় সেই কবে শানুর পায়ে আঘাত লেগেছিল সেই খবরটিও মাহবুব ভোলে নি। সন্ধে বেলা পড়াশোনা করলে চোখের ক্ষতি হবে বলে– এইভাবে না পড়ার পরামর্শ দিচ্ছে মাহবুব। আর মাহবুবের দিকে মেয়েটির দৃষ্টি কেমন ছিল? 'হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই।'– এ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত আমরা দেখে নিতে পারি। কিন্তু মাহবুব আর শাহানা বেশিক্ষণ তাদের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, শানুদের মালপত্র সব রিক্সায় উঠে গেছে। সেটা বোধকরি বড়ো বাধা নয়– 'আপনার মা আসছেন। মা ডাকছেন, যাই'– এই শেষ সংলাপেই এই নাটকের যবনিকা টানতে হয়েছে তাদের। এই যে দুই হৃদয়ের গভীরদেশে ভালোবাসার এক অদৃশ্য বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, এই ভালোবাসার কী নাম দেওয়া যায়? এই উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব :

> একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি–
> তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্‌গুনী ॥
> কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
> তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি ॥
> যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
> চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে। (১৯৭০ : ২/৫০৫)

শব্দের সীমা অতিক্রম করে নৈঃশব্দ্যের মতো যে ভালোবাসা দুটি মানুষকে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছে, তা রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই অতলস্পর্শী। এই গানের মধ্যে 'একটুকু ছোঁওয়া' লাগার প্রসঙ্গ থাকলেও শানু ও মাহবুবেব মধ্যে সেই ব্যাপারটিও অনুপস্থিত। কিন্তু শানুর এই চলে যাওয়ার মধ্যে এই কথা বলে যাওয়ার বিষয়টি বোধকরি অনুপস্থিত নয় যে, মাহবুবকে সে ভালোবাসে। দূরত্ব দুজনের প্রেমকে গভীরভাবে অনুধাবনের একটি সুযোগই হয়তো তৈরি করে দিল। এভাবেই আহসান হাবীব ভালোবাসার অন্তর্গত সৌন্দর্যকে স্পর্শের অতীত রেখেও বর্তমান ও ভবিষ্যতে ছড়িয়ে দিতে চান।

'ডিসেম্বর ১৯৭৭' কবিতায় আহসান হাবীবের ব্যক্তিগত সংসারযাপনের সুখস্মৃতি চিত্রিত হয়েছে বলে মনে হয়। দাম্পত্যপ্রেমের উষ্ণতায় কবিতাটি প্রাণবন্ত। কাছের মানুষকে কিছুদিনের জন্য দূরে রেখে যে বিচ্ছেদের বহ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন কবি, তারই শৈল্পিক প্রকাশে কবিতাটি ভিন্নতর মাত্রা লাভ করেছে। 'সাজানো বাগানে' কবিতায় প্রতিভাসিত হয়েছে কবির ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খল জীবনের আনন্দ উপভোগের বার্তা। নিয়মের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছের স্রোতে ভেসে বেড়ানোর কথা বলছেন কবি। কবির কাছে সালেহা বড়ো বেশি সাজানো গোছানো। তাই সালেহাকে ভালো লাগে না তাঁর। কবির মন চলে যায় বাসবীর দিকে। বাসবীও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না তাকে। তাই নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হয় রুবিনা। সালেহাকে কবি বলছেন, 'বাসবী, রুবিনা ওরা কেমন উজ্জ্বল অনিয়ম।' এই অনিয়মের নজিরও উপস্থাপন করেছেন কবি। 'বাইরে আমি কোনোদিনই চা খাই না' বলে রুবিনা যখন সাজ্জাদকে টেনে নিয়ে চা-খানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয়, কবির মন্দ লাগে না। কবি সেকালের সালেহার পাশে একালের রুবিনা-বাসবীকে বসিয়ে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বাসবীর মিথ্যাচারের পাশে সালেহার স্বাভাবিকতার ছবিটি খুবই

সুন্দর, মনোরম। কবি রুবিনা-বাসবীদের বিশৃঙ্খল কালযাপনের প্রশংসা করলেও কবিতার অন্তর্গত অনুরণনটি আমরা যদি কান পেতে শুনি তাহলে অনুভব করব, সালেহার জন্যই কবি তাঁর মর্মের গভীরে অমল আসন রচনা করেছেন :

কখনো হয়ো না তুমি অবিশ্বাসী
সেই কবে থেকে
বিশ্বাসে অটল অভ্যেসে সুস্থির। সালেহা, তোমার
অভ্যেসের দেয়ালে সাজানো এই মলিন বীণার
শিথিল পুরনো তারে কি করে বাজাবে তুমি যথেচ্ছ সঙ্গীত? ('সাজানো বাগানে'/*প্রেমের কবিতা*)

এই যথেচ্ছ সঙ্গীতের জন্য কবি খুবই উদ্গ্রীব– এমন দাবি করার মতো কোন ইঙ্গিত এই কবিতায় নেই। কবির ব্যক্তিগত জীবনের যে ছবি আমাদের জানা, তার সঙ্গে সালেহাকেই সহজে মিলিয়ে নেওয়া যায়। তবু তিনি সময়ের চিহ্নকে ধারণ করে একালের অন্যরকম জীবনযাপনের কথা কবিতায় তুলে ধরেন।

'দৃশ্যান্তরে' কবিতায় 'সংসারের জনৈক নায়কে'র হাতে কবি দেখতে পান রিল্‌কের গোলাপ। হাতে গোলাপ কিন্তু কোন সংলাপই মনে করতে পারছে না সে। নিষিদ্ধ গোলাপের মোহই কি তাকে বাক্‌রুদ্ধ করে দিয়েছে? পৃথিবীতে এই গোলাপের যাতায়াত কিছুতেই বন্ধ হবে না। 'হায়, সেই ঘাতক গোলাপ/এখনো সে পৃথিবীতে রয়ে গেলো এমন অম্লান।'– এই দৃশ্য কবিকেও বিহ্বল করে দেয়। যে ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, সেই ভালোবাসার কাছে সংসারের বিধিবিধান, সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা সঙ্গত কারণেই তুচ্ছ হয়ে যায়। কবিও বোধকরি সেই দুঃসাহসী গোলাপের কাছেই ফিরে যেতে চান :

মোহিনীকে মুগ্ধ করে কাছে ডেকে নেয়,
নিবেদনে সার্থকতা দিতে চায় গোলাপকে। কাঁটায়
বিদ্ধ হয়ে, অনন্য মৃত্যুর মহিমায়
আরো কিছু গোলাপ এবং
কাঁটায় সমৃদ্ধ করে যেতে চায় পৃথিবীর নাটক মহল। ('দৃশ্যান্তরে'/*প্রেমের কবিতা*)

'দীপ্রদুপুর/রক্তিম বিকেল' পর্বের শেষ কবিতা 'সেই পাখি সেই প্লাবন'-এর মর্মে কবি গেঁথে দিয়েছেন সেকাল-একালের দ্বৈরথ। সেকালের নায়িকারা একালের পোশাক ও প্রগলভতা নিয়ে কবির সামনে উপস্থিত হয়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে কবির বেড়ে ওঠা। সেই সময়ে কবির দয়িতার 'কোকোলামাখা চকচকে চুলে বেণী ছিলো/দু'হাতে সোনার রুলি ছিলো/লম্বা ঝুলের ফ্রক ছিলো/নতুন কেনা চেক শাড়ি কখনো কখনো।' ('সেই পাখি সেই প্লাবন'/*প্রেমের কবিতা*)। কবি তখন তাঁর দয়িতার দিকে তাকিয়ে 'ক্রোধ এবং ভালোবাসার পার্থক্য' বুঝতে না পারা দৃষ্টিতে আশঙ্কা ও উদ্বেগে দিন কাটাতেন। যৌবনের উদ্দাম দিনগুলোতে বিশেষ কারো মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের নানা আয়োজনে ব্যস্ত থাকার সেই দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে কত কথাই আজ মনে পড়ছে কবির। কাউকে ভালোবাসার আনন্দে কিংবা কারো ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ায় স্বপ্নে কবির 'মাঝের সিঁথি ডান দিকে চলে গেলো/গলার বোতাম খুলে গেলো/শার্টের কলার পেছন দিক থেকে খাড়া হয়ে গেলো।/পায়ের স্যান্ডেল বারম্বার ছিটকে গেলেই অবিলম্বে/পৌঁছনো যায়/এ রকম মনে হতে লাগলো।' এই কবিতায়ও কবির প্রিয় মানুষটি 'মিলি বকুল আয়েশা কুসুম এমনি অনেক নামে' শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেম–অনুষঙ্গে কবি স্মৃতির হাত ধরে ঘুরে বেড়ালেও স্মৃতিকে তিনি একালের আবহে নতুনভাবে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বয়সের চিহ্ন কবির সারা শরীরে আঁচড় কাটলেও যৌবনের দিনগুলোতে ধুলো জমতে দেন নি কবি। তাই তাঁর মনে হচ্ছে সেই তিরিশের দশকের নায়িকারাই কেবল পোশাক বদলে নিয়ে কবির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ঊনষাটে পা দেওয়া আহসান হাবীবের পক্ষে যৌবনের অন্যরকম উপস্থাপনে এদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। তাই কবি আক্ষেপ করে বলছেন :

তবু কেন এলে তুমি, এই অসময়ে?
তোমার সেই পনেরো
আমার তো এখন সতেরো নয়। ('সেই পাখি সেই প্লাবন'/*প্রেমের কবিতা*)

সময়ের কাছে একরকম করে নতজানু হতেই হয়। ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও সময় মানুষকে বদলে দেয়। এই বদলে যাওয়ায় মনের অসম্মতি থাকলেও স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে কাটতে মানুষ একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেই ক্লান্তিকর দিনেই মানুষ অক্লান্তভাবে স্মৃতির কাছে গচ্ছিত রাখা ঐশ্বর্যে অবগাহন করতে চায়। এই অবগাহনে আনন্দ থাকলেও সেই আনন্দ দুঃখের হাত ধরেই বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়। আহসান হাবীব এই আনন্দ-বেদনার যুগলছবিই সেকাল-একালের আবহে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'তারো আগে/প্রথম প্রহর' পর্বের কবিতায়ও আমরা কবির এই স্মৃতিমগ্নতার স্বাক্ষর লক্ষ করব। 'প্রেমের কবিতা'য় আমরা সুকন্যা নামের একজন মেয়ের সঙ্গে কবির মানবিক সম্পর্কের গতিবিধি চিত্রিত হতে দেখি। এই নামের কোন মেয়ের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কারণ কবি সেই কন্যাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন : 'এ নাম তোমার নয় তুমি এ নামের মেয়ে তবু'। কোথায় আছে এই সুকন্যা নামের মেয়েটি? অনায়াসে বলা যায়, কবির অন্তরে। কবির মানসীপ্রিয়াকে এই সুকন্যার আড়ালে নিজের ইচ্ছের রঙে উপস্থাপনের চেষ্টা এই কবিতায় বিধৃত। সুকন্যা কবির মানসসুন্দরী নয়, মানসপ্রিয়া। তাই তাঁর কল্পনার সবটুকু এই নামের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন কবি। এই নাম কবির হৃদয়ে সঞ্চার করে বন্যার আবেগ। শ্রান্ত অপরাহ্নে শ্রাবণের মেঘ হয়ে কবির অন্তরে উপস্থিত হয় এই সুকন্যা। কবি অনুভব করেন, এই নামের আড়ালেই তাঁর মানসপ্রিয়া তার 'পাখির মতো বুক' কবির অন্তর্গত ঐশ্বর্যের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়।

'নীল খাম' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় আহসান হাবীব তাঁর মানসপ্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘযাত্রার অনাবিল অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। ব্যস্ত শহরের অগণিত মানুষের ভিড়েও বিশেষ একজনের জন্য আন্তরিক অপেক্ষার সেই রঙিন দিনগুলোতে ফিরে গেছেন কবি। ভালোবাসা কিংবা ভালোবাসার মানুষ কীভাবে একজন স্রষ্টার ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সৃষ্টিশীল প্রত্যয়ে সর্বজনীন আবহ সঞ্চার করে এই কবিতায় আমরা তারই প্রতিভাস লক্ষ করি। রূপকথার নায়কের মতো হাজার হাজার ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধারে অভিযান চালানোর কথাই যেন বলছেন কবি। এই অভিযান এখনো ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত নয়। তাই আমরা দুজনের মাঝে শুনি এই আন্তরিক ও উষ্ণ কথোপকথন :

নত চোখ তুলে তাকালে যখন আমি বললাম, 'এসেছি।'
তোমার অধর কেঁপে কেঁপে গেল, বলে গেল, 'ভালোবেসেছি।'
তোমার মন জানতো, আমি যাবো।
তাই মনের রঙ লেগেছে তোমার শাড়িতে,
রক্ত পলাশের রঙ।

আমি জানতাম তুমি কি বলবে।
নতুন সূর্যোদয়ের সুর আছে তোমার কণ্ঠে,
সেই সুর আজ তুমি শোনাবে আমায়
আমি জানতাম। ('নীল খাম'/*প্রেমের কবিতা*)

রূপকথার নায়িকার মতোই কবির দয়িতা কবিকে বলছে, 'এ মালা তোমার'। কিন্তু এই গল্প এইভাবে বেশিদূর অগ্রসর হবে না। অন্য এক রাজকুমারের উপস্থিতিতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। তবুও কবির অন্তরে অবস্থান করবে এই রাজকুমারী। অনেক অনেক দিন পর এই গল্পের নায়কের কাছে একটি চিঠি আসবে সেই রাজকন্যার কাছ থেকে। নীল খামে। সেই চিঠির সমস্ত শরীরেই তো সেই রাজকন্যার স্পর্শ লেগে আছে। কত কথাই তো লেখা থাকতে পারে এই চিঠিতে। হয়তো নায়কের মতোই সে লিখবে, কীভাবে মেয়েটির অন্তর অধিকার করে আমাদের পরাজিত নায়ক জয়ের সিংহাসনে বসে আছে। কিন্তু তার কিছুই নেই সেই চিঠিতে। অনেক কথার মধ্যে শেষের কথাটির দিকেই দৃষ্টি দিলেন কবি। প্রথম পরিচয়ের সেই দিনের কথা মনে করে তার মনে কোন শিহরন নেই, বরং সেই ছেলেমানুষীর কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে তার :

তুমি লিখেছো,
সেদিনের সেই বিকেলের কথা মনে করে

কী যে তোমার হাসি পাচ্ছে।
কত অর্থহীন কত বাজে কথার জাল বুননি।
মনে হলেই তোমার হাসি পায়।
জানো রাজকন্যে,
আমি হেসেছি!
তোমার চিঠি পড়ে হেসেছি আমিও।
কী দুরন্ত কী দুর্বার সে হাসি!
সে হাসির দমকায়
আমার চোখের সামনে
একটা আকাশ ছোঁয়া মিনার যেন ধসে গেল। (‘নীল খাম’/*প্রেমের কবিতা*)

বাস্তবের করাঘাতে অনেক সুন্দর সুখকর স্মৃতিও কখনো কখনো ধসে যায়– এই হল এই কবিতার প্রতিপাদ্য। স্মৃতির দেশে সদাজাগ্রত সেই রাজকন্যাটির শেষ চিঠি ‘নীল খামে’র নায়কের সাজানো বাগানকে তছনছ করে দিয়েছে। অতীতকে অন্তরে পুষে রাখার মধ্যেও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ যখন প্রাপ্তির অভিঘাতে বিধ্বস্ত হয়, তখন কষ্টের সীমা থাকে না। সেই কষ্টকেই কবি আকাশ ছোঁয়া মিনারের ধসে যাওয়ার রূপকে চিত্রিত করেছেন।

‘কান্না’ কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির মৌল বক্তব্যই এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় বিধৃত : ‘ প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরেনি।’ প্রেমে প্রাপ্তির যে আনন্দ, আহসান হাবীব সেই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বিপরীতে অপ্রাপ্তির দীর্ঘতর বেদনাসিক্ত আনন্দকে বিপুল আয়োজনে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ‘মিনতি’ কবিতায়ও হাবীব ভালোবাসাহীন স্মৃতির ঊর্ণাজালে ভালোবাসার প্রহর গণনার কথা বলেছেন : ‘ভালোবাসা নাই,/ভালোবাসা নিয়ে চাও কি বুনতে/আত্মরতির ঊর্ণায় আঁকা খেয়ালের জাল?/গুনতে কি চাও কত অভাজনের ভাঙলো কপাল?’ (‘মিনতি’/*প্রেমের কবিতা*)। ‘ঘুম’ শীর্ষক কবিতার মর্মে বসে আছেন রিজিয়া নামের একজন মেয়ে। রিজিয়ার চোখে নানাভাবে ঘুমের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন কবি। ‘ব্যারাক’-এর মধ্যেও আহসান হাবীব একজনকে রাজকন্যে করে স্মৃতি অথবা স্বপ্নের জাল বিস্তার করেছেন। সেই তামাটে রঙ মেয়ের চোখে ইশারা খুঁজতে খুঁজতে কবি পৌঁছে যান কয়লা খনিতে, যেখানে জীবন ‘ময়লা ঘামের গন্ধে’ যন্ত্রণাযাপনে ব্যস্ত। কবির আনন্দ এই যে, এই কয়লাখনির মেয়েটির হাতে এবং কবির হাতে একই বোঝা, একই ব্যারাকে দুইজন রাত্রিযাপন করে এবং দুজনের স্বপ্নই ছেঁড়া মাদুরে বসে অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ। ‘আয়ুষ্মতী’ কবিতায় কবি প্রেমকে বিরূপ বাস্তবতায় অবলোকনের অভিজ্ঞতায় চিত্রিত করেছেন। এখানে দয়িতার সঙ্গে কবির দেখা হয় বন্য অন্ধকারে, ‘মুমূর্ষু দীন জীবনের পথের ধারে’ এবং ‘তৃষিত দিনের রুদ্ধ দ্বারে’। ‘দৈনন্দিন ঘূর্ণি হাওয়া’, ‘শিশুসূর্যের দগ্ধচিতা’, ‘সূর্য-প্রহার-দগ্ধ দিনের বিদগ্ধতা’– এইসব বিমানবিক বাস্তবতায় কবি অচরিতার্থ প্রেমের প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন।

আহসান হাবীব ‘আরো এক মেয়ে’ কবিতার নামকরণের মধ্যেই আরো অনেক মেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রেমের বর্ণিলতাকে ধারণ করার জন্য কবি বিচিত্র-রূপে বিভিন্ন নায়িকার মধ্যে তাঁর কল্পনাকে বিস্তৃত করে দেন। তাঁর কবিতায় ‘একই অঙ্গে এতো রূপ’-এর বিপরীতে বিচিত্র অঙ্গ-সৌরভে প্রেমের শাশ্বত অবয়বটিকে চিত্রিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ‘আরো এক মেয়ে’র সঙ্গে কবির মানসভ্রমণ ‘পৃথিবীর মাঠ বন কত পথ প্রান্তর পেরিয়ে/একটি নিবিড় কথা কামনার তনুরূপ নিয়ে’ সেই দয়িতার তনুর তীরে শিবির বাঁধার স্বপ্নে বিহ্বল। এই আশ্রয়ে কবি তাঁর মানসপ্রিয়ার হৃদয় স্পর্শের অভিপ্রায়কে অর্থবহ করে তোলেন। এই মেয়েকে কবি শয্যার সঙ্গিনী ভাবতেও কুণ্ঠিত নন। কবি দম্ভভরেই উচ্চারণ করেন– ‘তোমাকে সহজ করে চিনি!’ এই চেনাজানার পালা শেষ করেই কবি অন্য এক মেয়ের কথা বলেন যাকে ইচ্ছের অনুকূলে যে-কোন নামে ডাকা যায়। এই আহ্বানের কোন উত্তর অবশ্য মেলে না। তবু সেই অনামিকার আর্তসুর নিভৃতে কবির হৃদয়ে তুফান তোলে। কল্পনার সেই মেয়ের আড়ালে হারিয়ে যায় বাস্তবের ‘মসৃণ গ্রীবা, স্বেদসিক্ত মৃদু কটিবাস’।

Dhaka University Institutional Repository

আহসান হাবীবের এই দুই নারী-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*র অমিত রায়ের মানসভূমির ছায়াপাত হয়তো লক্ষ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মানসের প্রতিভূ হিসেবে অমিত রায়কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিমানুষের দৃশ্যমান ও দৃশ্যের অতীত– এই দুই ভুবনে আলোকসঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। অমিত রায় কেতকী ও লাবণ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের ধরনটাকে রূপক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, নইলে, তার ভাষায়, এই বক্তব্যের রূপ চলে যাবে, কথাগুলো লজ্জিত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ অমিতের মুখ দিয়ে কেতকী ও লাবণ্যের সম্পর্কের দ্বৈরথকে একই বৃন্তে বিকশিত করার চেষ্টা করছেন এইভাবে :

> কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল– প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৫/৫৬১-৬২)

প্রতিদিনের প্রয়োজন ও প্রয়োজনের অতীত অসীমতায় মানুষের আসা-যাওয়ার এই অভিব্যক্তি আহসান হাবীবের ‘আরো এক মেয়ে’ কবিতায় ভিন্নমাত্রায় উদ্ভাসিত। কবি একথা বলতেও ভোলেন নি, দৃশ্যাতীত সেই মেয়ে বাস্তবের মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সে মেয়ের মানসভূমিও এই মেয়েরই দান। তবু কবি তাঁর ব্যক্তিগত দিঘির জন্য ঘড়ায় তোলা জলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সহজ সুন্দর শয্যার সঙ্গিনীর কাছে এই নতজানু অবস্থার জন্য কবির কোন আক্ষেপ নেই, বরং ‘আরো এক মেয়ে’র উপস্থিতি কবির সংসারযাপনকে অর্থবহ করে তোলে :

> সে আমার মনের মতন।
> মন দিয়ে তারে পাই ঘিরে আছো তুমি সেই মন
> তনুময় প্রেম দিয়ে।
> তার কাছে ততটুকু চাই
> মনের মাধুর্য দিয়ে যতটুকু গড়ে নিতে পাই।
> তুমি তার প্রতিনিধি মেয়ে
> তুমি যা পার না দিতে তার কাছে তাই পাই চেয়ে
> সে মেয়ে আমার গড়া যত বড় রচনা আমার
> তোমায় আমায় ঘিরে ততখানি অধিকার তার।
> তুমি তার অধিকার নিজ হাতে কেড়ে নিতে পারো
> এমন ক্ষমতা নেই। তাই তুমি মাঝে মাঝে হারো! (‘আরো এক মেয়ে’/*প্রেমের কবিতা*)

এভাবেই আহসান হাবীব *প্রেমের কবিতা* কাব্যে প্রেমকে নানাভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রেম ও প্রেয়সীর কোন ধ্রুব-অবয়ব হয়তো তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু প্রেমের বিচিত্র দর্পণে জীবনকে দেখার একটি আত্মখচিত দর্শন আহসান হাবীবের কবিতায় বিদ্যমান। ভালোবাসার জন্য হাতের মুঠোয় প্রাণ নেবার মতো দুঃসাহস দেখান নি কবি, কিন্তু ভালোবাসাকে অবজ্ঞার হাত থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস আন্তরিক– একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করা সম্ভব।

আহসান হাবীবের *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫) কাব্যেও প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবন অনুপস্থিত নয় এবং মাঝে মাঝে সেই ফাঁদে আনন্দের সঙ্গেই পা দিয়েছেন কবি। এই কাব্যের অনেক কবিতায় প্রেম এসেছে স্বদেশের প্রতি কবির গভীর অনুরাগের স্মারক হিসেবে, আবার কোন কোন কবিতায় ব্যক্তিক সম্পর্কের গতিবিধি বোঝাতেও প্রেমের আবহে জীবনের অন্তর্গত অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি। ‘ভালোবাসা অন্বিষ্ট’ কবিতায় হাবীব ভালোবাসার জোরে তাঁর অন্তর-উৎসারিত এক নদীকে জনস্রোতের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চান। কবিতাটিতে কবি ভালোবাসাকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নাটকীয় আবহে সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভালোবাসার কথায় ওপারের সারিবদ্ধ তালগাছ এবং নদীর তরঙ্গ আন্দোলিত হলে কবির মনে ভয় জেগে ওঠে এবং তখনই ‘ভালোবাসা নদীর জলে ডুবতে ডুবতে বললো/তবে আমি যাই।’ কবি জানেন, ভালোবাসার জন্য সংক্ষিপ্ত কোন পথ নেই। নিঃশঙ্ক চিত্তেই ভালোবাসা তার পাখা বিস্তারের অবকাশ পায়। তাই কবির মনে যখনই ভয় উঁকি দেয়, তখনই ভালোবাসা পালিয়ে যায়। তাই

ভালোবাসাকে তীব্রভাবে আকড়ে ধরার জন্য নিজেকেই আঘাত করতে উদ্যত হন কবি। এই আঘাতই কবিতাটিতে ঘৃণার রূপকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'প্রিয়তমাসু' কবিতাটিতে আহসান হাবীব দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন। নিরন্ন মানুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির কাছে ভালোবাসা কীভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, এই কবিতায় সেই মর্মঘাতী দৃশ্যেরই অবতারণা করেছেন কবি। এই কবিতাটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের নিশ্চয়ই সুকান্ত ভট্টাচার্যের *ছাড়পত্র* কাব্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার কথা মনে পড়বে :

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা–
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। (সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৯৭ : ৫৫)

আহসান হাবীব কবিতার মতোই নন্দিত অনুভবের ফুল নিয়ে প্রেয়সীর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। হাতে হাত রেখে আংটি পরানোর প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন কবি। কিন্তু কবির প্রেয়সী তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর। তার চাই ভাত। তার দয়িতা তখন আংটি চায় না, ভাতে দু'হাত ভরে দেওয়ার কথা বলে। সাগরের তীরে ঘুরে বেড়ানো, খোলা আকাশের নিচে মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের আহ্বান এখন অর্থহীন, কারণ রাতে ঘুমোবার জন্য একটি পাতার ঘর হলেই সে এখন খুশি। গজমতির হারের বদলে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, ময়ুরপঙ্খী নায়ের পরিবর্তে খেয়া পারের কড়ি চাই এখন তাঁর দয়িতার। কবির স্বপ্নভঙ্গের এই দুঃসহ ছবির আড়ালে আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাহাকার মূর্ত হতে দেখি :

তোমাকে আমার রাণী করে নেবো এই সাধ ছিলো
তোমাকে আমার ঘরণী বানাবো এই সাধ ছিলো
মনে সাধ ছিলো সঙ্গিনী হবে সখের মেলায়
তুমি মেতে গেলে কালো অঞ্চলে
ভাত কুড়োবার মরণ খেলায়! ('প্রিয়তমাসু'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

এই নিরন্ন মানুষেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই 'তোমার আমার' কবিতায়। জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে চারদিকে চন্দনের সারি দিয়ে মহল বানান কবি। সেই রঙ্গিলা পালঙ্কে দয়িতার সঙ্গে রাত্রিযাপনের স্বপ্ন কবির অধরাই থেকে যায়। সরোবর কেটে ঘাট বাঁধলেও সেই ঘাটে কবির মানসপ্রিয়ার 'সোনা সোনা মাজ্ঞা মাজ্ঞন' ইচ্ছেও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অতৃপ্তিজনিত আক্ষেপের আড়ালে আমরা হাভাতে মানুষের হাহাকার শুনতে পাবো :

বুনিলাম তুলিলাম   তোমার উঠোনে
তোমার মরাইয়ে পড়িল তালা
ভাত নাই ভাতুড়ি নাই   সোনার অঙ্গ হইলো ছাই
আমার নারীর হাড়-মাংস কালা। ('তোমার আমার'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি কখনোই যাপিত জীবনের অন্যবিধ বিষয়-আশয় থেকে বিচ্ছিন্ন কোন নিরীহ আবেগের উচ্ছল উপস্থাপনা নয়, বরং তা সময়-সমাজ-সমকালের প্রেক্ষাপটে তাঁর অন্তর্গত অনুরণনেরই সংহত উৎসারণ। 'বস্তুত আহসান হাবীবের রোমান্টিক উপলব্ধি তাঁর দেশকাল-চেতনার পরিপূরক, তাঁর প্রেমানুভূতিও এই উৎস থেকেই নিজস্বতার পথ খুঁজেছে।' (মাসুদুল হক ২০০৮ : ৬৭)। তাই তাঁর প্রেমিক-প্রেমিকারা মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই প্রেমকে পরাণের গহীনে স্থান দিয়ে জীবনে গতিসঞ্চারের চেষ্টা করে। কবির পূর্বসূরি হিসেবে বিশ শতকের তিরিশের কবিরা প্রেমের যে আদর্শকে শিল্পে ও জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আহসান হাবীব তাঁর প্রেমের সারবত্তা সংগ্রহে তাঁদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহ দেখান নি। তাঁর প্রেমের কবিতায় শরীর উপেক্ষিত হয় নি, কিন্তু শরীরসর্বস্ব প্রেমের শৈল্পিক আড়ম্বরকেও স্বাগত জানান নি তিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রেম যে দেহাতীত ও স্পর্শাতীত অবয়ব নির্মাণ করে জীবনদেবতার আভাস রচনা করে, আহসান হাবীব সেই পথেও অগ্রসর হন নি। প্রেমকে তিনি জীবনের অনিবার্য অংশ হিসেবেই জীবনধারণের অন্যবিধ অনুষঙ্গের মতো তার গতিবিধি অনুধাবনে

মনোযোগ দিয়েছেন। কবি নিজেই বলেছেন, 'শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু। এক শ্রেণির মানুষের কৃত্রিম জীবন তৃষ্ণা তাদের নীচ জীবনাচরণের প্রতি ব্যঙ্গবাণ– এই সব।' (১৯৯৫ : ৩৪৯)– সমগ্রভাবে কবিতার বিষয় সম্পর্কে আহসান হাবীবের এই বক্তব্য যেমন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতায়ও এই সব বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতার শুদ্ধ উচ্চারণে– মৌলিক বাস্তববোধ ও বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রবল উপস্থিতির অভিজ্ঞান উঠে আসে। এক ধরনের নির্জনতা, একাকিত্ব ও মগ্নচেতনার আশ্রয়-গ্রহণ করেও তাঁর কবি-মানস চলমান জীবনচেতনার বোধকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। প্রথম কবিতাগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* থেকে শেষ কবিতাগ্রন্থ *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*-এ কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অর্থাৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশকাল, সমাজ-চেতনা ও সর্বোপরি প্রেমের উপলব্ধির মধ্য থেকে তিনি জীবনের গভীর সত্য অনুধ্যান করতে চেয়েছেন, নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। (মাসুদুল হক ২০০৮ : ৬৬)

তাই আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতার নিবিড় পাঠে আমরা লক্ষ করব, নিছক প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়েও কবিতার মানুষজনকে সমাজসংসারের নানা টানাপোড়নের মধ্যে ফেলে দিয়ে কবি তাদের অনুভব বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন।

দেহ ও মনের সামঞ্জস্যবিধানেই প্রকৃত প্রেমের প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়– আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতার আলোকে তাঁর প্রেমভাবনা-বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কবির *প্রেমের কবিতা* কাব্যগ্রন্থের বাইরে আমরা তাঁর প্রেমভাবনার যে-সকল দৃষ্টান্ত এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি, প্রেম সেখানে জীবনের অন্যবিধ বিষয়ের সমান্তরালে উপস্থাপিত। তাই প্রেমের কবিতায়ও অনিবার্যভাবেই দেশ ও মানুষের অনেক সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। কবির প্রেমচেতনার মৌল প্রবণতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাঁর *প্রেমের কবিতা*ভুক্ত কবিতাবলি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হলেও সেখানেও আমরা নানা অনুষঙ্গে কবির স্বকালের নানা ঘটনার অনুবর্তন লক্ষ করেছি। প্রেমকে তিনি শ্রমবিমুখ মানুষের মানসিক বিকার হিসেবে না দেখে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের জীবনের সজীবতা ও সচলতার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আহসান হাবীবের কবিতায় বিম্বিত প্রেমের আরতি সেই অর্থে জীবনেরই আরতি।

প্রকৃতি

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ বিচিত্র সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। এই সম্পর্কসূত্র আত্মসচেতন শিল্পচৈতন্যে সৃষ্টি করে অনাস্বাদিত অনুরণন। একজন সংবেদনশীল শিল্পস্রষ্টার কাছে প্রকৃতি কেবল জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবেই বিবেচিত হয় না, প্রকৃতির সান্নিধ্যে তিনি জীবনের সীমা অতিক্রম করে অসীম সৌন্দর্যলোকে অনুপ্রবেশের পথটিও খুঁজে নেওয়ার প্রয়াস পান। মানুষ কেবল প্রকৃতির কাছাকাছি কিংবা পাশাপাশি অবস্থান করে না, প্রকৃতির মধ্যেই তার জীবনাকাঙ্ক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। তাই 'সংবেদনশীল ব্যক্তিপ্রতিভা বস্তুবিশ্ব, মানববিশ্ব ও পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ অনুভব করে। যে পার্থিব আবেষ্টনীর সঙ্গে সে গভীরভাবে যুক্ত, প্রকৃতি তার একটি বড়ো অংশ।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ১৩৭)। মানবমনে এই বৃহৎ অংশের প্রভাব সর্বদা দৃশ্যমান নয় বলেই তা অদৃশ্য শক্তির মতো মানুষের অন্তর্জগতকে অনবরত আলোড়িত ও আলোকিত করে। সেই অর্থে প্রকৃতি ও জীবনের বিচ্ছিন্ন আলোচনা বিশেষ কোন গন্তব্যে পৌঁছায় না।

বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ করব, সকল যুগের শিল্পস্রষ্টারাই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে তাঁদের সৃজনভাবনাকে বিশেষ মাত্রায় উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করেছেন। যুগধর্মের প্রভাবে কবিতায় প্রকৃতির অবস্থান কিংবা অবদানও পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতায়ও প্রকৃতি স্রষ্টাভেদে ভিন্ন রূপ নিয়ে শিল্পের অনিবার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সকল শাখায়ই প্রকৃতির বহুবর্ণিল অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির কবি হিসেবে স্বীকৃত জীবনানন্দ দাশের কাছে প্রকৃতি নতুন ও অনাস্বাদিত অবয়ব-অনুভবে ধরা দিয়েছে।

তিরিশের প্রত্যেক কবিই তাঁদের পরিবেশ-প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যকে শিল্পে ধারণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আহসান হাবীব প্রকৃতির প্রাচুর্যে তাঁর কবিতার কল্পতরুকে সজীবতা ও সমৃদ্ধি দিয়েছেন।

আহসান হাবীব পল্লি-প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছেন। পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামের আকাশ-বাতাস-মাটি-মানুষের সংস্পর্শেই গড়ে উঠেছে কবির মানসভুবন। শৈশবের দিনগুলোতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খেলাধুলা কিংবা আড্ডায় মেতে ওঠার চেয়ে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি বসে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হতেই অধিকতর স্বস্তি পেতেন কবি। প্রকৃতির কাছে তিনি নিজেকে মেলে ধরতেন। এ প্রসঙ্গে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' শীর্ষক অবতরণিকায় তাঁর সরল স্বীকারোক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। মিছিল-বেয়নেট-টিয়ার গ্যাস-গোলাগুলি ইত্যাকার রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে অনেক দূরের এক গ্রাম শংকরপাশার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এবং সেখানে একজন বালকের কবি হয়ে ওঠা সম্পর্কে আহসান হাবীব বলছেন :

> কবিরাজ বাড়ির পূর্বদিকে ধানক্ষেতের বুকের ওপর দিয়ে লোকাল বোর্ডের যে সরু রাস্তা আর চারদিকে তাকালে দেখা যায় যে নারকেল সুপারীর ভরা সবুজ, কবিতা সেইখানে ছিলো। মাঠ পেরিয়ে পশ্চিম দিকে ঝিমঝিমে ফুফাদের বাড়ির পেছনে সবুজ ডালপালার আড়ালে সূর্য যখন রক্তমাখা গায়ে স্থির হয়ে নেমে যেতে থাকতো, কবিতা সেখানেই তখন মাখামাখি। এই সময়ে যে সরু রাস্তাটির ওপরে তৈরি হতো হাফিজপড়া এক কিশোরের হাতে ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা। গভীর মেজেন্টা রঙের মধ্যে ডুবে যেতে ইচ্ছে করতো এক কিশোর কবির। এইভাবে শুরু। (১৯৯৫ : ৩৪৫)

কবিজীবনের এই সূর্যোদয় থেকে আহসান হাবীবের সারাদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে আমরা মোটামুটি আঁচ করতে পারি। প্রকৃতির পৌরোহিত্যে কবি হয়ে ওঠা হাবীবের কবিতায় প্রকৃতি নানাভাবেই তার অবস্থান কিংবা উপস্থিতি জানান দেবে, এটা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। 'কেন তখন খেলাধুলায় মন গেলো না, বেড়িয়ে বেড়ানো নয় কেন, কেন কবিতা লেখায় মন গেলো', তার উত্তর খুঁজে পান নি কবি। কিন্তু তাঁর মানসচৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি, তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রাণিত করে যে, প্রকৃতির বুকে প্রতিনিয়ত যে সৃষ্টির খেলা চলতে থাকে, তারই বৃষ্টিতে কবির হৃদয়ভূমি উর্বরতা লাভ করেছে এবং সময় সেখানে সোনার ফসল ফলিয়েছে।

আহসান হাবীব যখন কোন কবিতায় আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন কিংবা তাঁর শৈশব-যৌবনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়েছেন, সেখানেও পিরোজপুরের প্রকৃতি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'আমার যাওয়া হয় না' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যে স্কুলে তিনি লেখাপড়া করেছেন তার চারপাশের সবকিছুই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। প্রকৃতির এই সান্নিধ্য তাঁকে কেবল সৃজনভাবনায়ই নিমগ্ন রাখে নি, কখনো কখনো তা কবির অন্তর্গত বেদনা প্রকাশের বিস্তৃত পরিসর সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই রাতের অন্ধকারে খেলার মাঠে প্রাণ খুলে কান্নার স্মৃতি এখনো কবিকে বিহ্বল করে তোলে :

> শহর পিরোজপুর
> সরকারী স্কুলের খেলার মাঠ
> পশ্চিমে প্রশাসকদের বাড়িঘর
> পুবে স্কুল-বাড়ি, সামনে বাগান, তার সামনে পুকুর
> উত্তরে আদালত কাছারী
> দক্ষিণে উকিল-মোক্তার ইত্যাদি
> মাঠে রাত ন'টার অন্ধকার পাথরের মতো ভারি
> সেই মাঠের মাঝখানে দু'হাঁটুতে জোড়াহাত
> তার ওপরে কপাল
> আমি একদিন কেঁদে ছিলাম। ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যের 'দোহাই তোমার' কবিতায় আহসান হাবীবের প্রকৃতি-চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করার মতো। নিসর্গের অকৃত্রিম পরিচর্যায় বেঁচে থাকি আমরা। তাই নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে জীবনকে অস্বীকার করা। কবির মতে, নিসর্গই 'তোমার-আমার ভুবন' :

আমরাই নিসর্গ আর নিসর্গই আমরা সব
আমরা নিসর্গে বাঁচি
নিসর্গে নিঃশেষ!
এই তাল তমাল দেওদার আমাদের
তুমি আমি
তাদের জড়িয়ে আছি
এ তোমার-আমার ভুবন! ('দোহাই তোমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যের 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় আহসান হাবীব আত্মপরিচয়ের যে ঘোষণাপত্র রচনা করেছেন, সেখানেও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সংযোগের কথাই প্রবল প্রত্যয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কবিতায় কবির স্বদেশ-ভাবনা যেমন সুপ্রকাশিত, তেমনি প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গে আপন অস্তিত্বের সংহত প্রকাশ প্রশংসনীয়। প্রকৃতির পুত্র হিসেবেই তিনি তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে কিংবা প্রকৃতিকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বাংলাদেশের হৃদয়কে স্পর্শ করার অভিপ্রায় থেকেই কবির এই আত্মখচিত উচ্চারণ। কবি জানেন, কারো হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশের পথটি আন্তরিক প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত না হলে সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায় :

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই। ('আমি কোনো আগন্তুক নই'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

শিল্পসাহিত্যে প্রকৃতি তার নানা অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। এই উপস্থিতি সর্বদাই যে স্বতন্ত্র-সত্তায় উদ্ভাসিত এমন নয়, শিল্পীর অন্যবিধ অভিজ্ঞতার শিল্পিত উপস্থাপনেও প্রকৃতির শরণ নিতে হয়। ব্যক্তিপ্রতিভার বিশেষ প্রবণতার কারণেই একই বস্তু বা উপলব্ধি তাঁদের সৃষ্টিকর্মে ভিন্নতর আবহ সঞ্চার করে। সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অন্তরের স্পর্শে জগতের সকল কিছুর মধ্যেই ব্যক্তিত্ব আরোপিত হতে পারে। 'সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোন পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি– নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্তি না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১২/৪৮১)। প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ যখন কবির উপলব্ধির অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে, তখন তা প্রকৃতির মধ্যে বিস্তৃত থেকেই পরিতৃপ্ত হয় না, পাঠকের অন্তরেও সঞ্চার করে অনাস্বাদিত অভিব্যক্তি। সাহিত্যে প্রকৃতির অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে আরো কয়েকজন শিল্পস্রষ্টা ও সমালোচকের বিবেচনা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. কাব্য, চিত্র এবং ভাস্কর্য, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে বিষয়বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডার পেয়ে থাকে। কবি বা শিল্পী প্রকৃতির কোনো সুন্দর বস্তু দেখে মুগ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তু তার মৌলিক সৃষ্টির বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। (সাধনকুমার ভট্টাচার্য ২০০২ : ৯৮)

খ. এ-বিষয়ে এটুকু বলা যেতে পারে যে মানবজীবনে ঘটনাস্রোত যেমন বাস্তব, তেমনি বাস্তব ঋতুরঙ্গ, গাছপালা, জল, মাটি, আকাশ, তাদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের মতো সত্য; প্রকৃতিকে বাদ দিলে, তাই, জীবনের স্বরূপটাকেই খণ্ডিত করা হয়, বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হতে পারে না। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ৩০)

গ. প্রকৃতিকে কাব্যে সাহিত্যে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্যকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি– ক) বৈচিত্র্য সৃষ্টি, খ) প্রেক্ষিতরূপে প্রকৃতির ব্যবহার, গ) মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গ। আধুনিক দৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রকৃতি চিত্রণের গুরুত্বই সর্বাধিক। (বরুণকুমার চক্রবর্তী ২০০৩ : ১০৪)

ঘ. প্রকৃতি কবিতার অন্যতম উপাদান। কবির চারপাশ প্রকৃতিবেষ্টিত, তা গ্রামীণ বা নগরপ্রকৃতি, যাই হোক না কেন। প্রকৃতির প্রবল প্রতিবেশিতার তাপ এমন কি, স্বল্প সংবেদনশীলরাও সাধারণভাবে অনুভব করেন; কবির স্পর্শকাতরতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। বহির্জাগতিক প্রকৃতি সাধারণভাবে নিশ্চেতন ও নির্জীব– তার উপস্থিতিতে কোনো বিশেষ বাণী বা অর্থের সৃষ্টি হয় না। আধুনিক কবি এই সাধারণ প্রকৃতিতে আরোপ করেন বিশেষ গুণ বা অবস্থা। এর ফলেই প্রকৃতি বিভিন্ন কবির কাছে পায় বিভিন্ন আয়তন বা মাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক কবি আত্মিক সমীকরণসূত্রেই আবদ্ধ; কবির ব্যক্তিগত অনুভবের সূত্রে প্রকৃতির রূপান্তর সাধিত হয়, তাঁর চৈতন্য ও মনোভাবের রূপান্তরের সঙ্গে প্রকৃতিতে আরোপিত হয় রূপান্তরের সত্তা। (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ১৪৬)

ঙ. প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্বয় ও সংযুক্তি আন্তঃমানবিক সম্পর্কের মতোই সত্য। সংবেদনশীল শিল্পিচৈতন্য নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে গভীর বন্ধনে থাকে যুক্ত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গড়ে ওঠে আত্মিক সম্পর্ক। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৯ : ৪৯)

প্রকৃতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করলে আহসান হাবীবকে প্রকৃতি-অন্তঃপ্রাণ কবি হিসেবে পাঠ করা যায়। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় একটি কবিতাও বোধকরি তিনি লেখেন নি, যেখানে প্রকৃতি বিচ্ছিন্নভাবে তার স্বরূপ উন্মোচনের সুযোগ নিয়েছে। আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় প্রবলভাবে উপস্থিত এবং এই উপস্থিতি কবির স্বকালের নানা অনুষঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জীবনের খণ্ডিত উপস্থাপনে আগ্রহী নন তিনি। 'বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট'নের প্রয়োজনেই আহসান হাবীব চারপাশের সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়েই শিল্পসৃজনে স্বাতন্ত্র্য-অন্বেষী হয়েছেন। মানবিক সম্পর্কের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তার একাত্মতা– আহসান হাবীবের সমগ্র কাব্যযাত্রা বিবেচনায় রেখেই এ কথা বলা যায়।

আহসান হাবীব 'বিকলপক্ষ পাখির মতো/বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান' অবস্থায় তাঁর কবিতার যাত্রা শুরু করেছেন। *রাত্রিশেষ*-এর যে কবিতাটি আহসান হাবীবকে পাঠকের নিকটবর্তী করায় উজ্জ্বল অবদান রেখেছে তার নাম 'এই মন– এ মৃত্তিকা'। এই কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপন্ন পৃথিবী প্রতিভাত হলেও সেই পৃথিবীতে প্রকৃতিও কবির মতোই বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রেমহীন বন্ধুর দেশের বাসিন্দা হলেও মৃত্তিকার সঙ্গে গভীরতর সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেছেন কবি। প্রকৃতির মলিন অবয়ব এখানে কবির অন্তর্গত অস্থিরতার রূপকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে :

ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।
তবু প্রত্যহ পীত অরণ্যে শেষ সূর্যের কণা,
মনের গহনে আনে বারবার রঙের প্রবঞ্চনা। ('এই মন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)

এই নীড় বাঁধবার বাসনা 'এই অধ্যায়' কবিতায়ও প্রকাশ করেছেন কবি। সেখানেও প্রকৃতি আপন স্বরূপে উদ্ভাসিত হতে পারে নি। চাঁপার বনে যে চৈত্রের মুখ দেখেন তিনি, তাও বেপথুমানা। এমন কি মাধবীলতার বন্ধনও শিথিল মনে হয়েছে কবির : 'নীড় বাঁধবার মায়া এল আকাশে!/মাটির বুকে রঙ লেগেছে আজ।/চাঁপার বনে বেপথুমানা চৈত্র;/মাধবীলতার বাঁধন হয়েছে আলগা।' ('এই অধ্যায়'/*রাত্রিশেষ*)। এই অসুস্থ সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে কবি পেছন ফিরে তাকান, দেখেন পঁচিশটি বছর পার করে এসেছেন তিনি। 'রেনকোট' শীর্ষক কবিতায় স্মৃতির জানালা খুলে কবি বিগত দিনের প্রাকৃতিক আবহে নিজেকে নেড়েচেড়ে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। সময়কে পাঠ করার অভিজ্ঞতা সুখকর নয় বলেই কবির নৈঃসঙ্গ্যের দোসর হিসেবে তাঁর ঘরের জানালাটিকে নির্বিকার মনে হয়েছে :

পঁচিশটি বর্ষা ত পেরিয়ে এলাম
দেখে এলাম
কত অন্ধকার অরণ্যশীর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

কালো মেঘের অন্ধকারে ছাওয়া,
দেখলাম
কত ঝরঝর বর্ষা
কত নিঃসঙ্গ জানালার
ইতিহাস পড়লাম
আমার নির্বিকার জানালায়! (‘রেণকোট’/*রাত্রিশেষ*)

স্বকালের বিকৃত বিশ্বব্যবস্থার ছবি আঁকতে গিয়ে কবির পরিচিত পরিমণ্ডলেও তাঁর মানসলোকের ছায়া পড়েছে। তাই কবি ‘শ্যামল ঘন অরণ্যে সূর্যের অভিশাপ’ শুনতে পেয়েছেন, বাড়ির কাছের পুষ্পিত বৃক্ষের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন ‘নির্মম জঠরের উত্তাপ’। তাই, ‘মদিরগন্ধ ঘন মৃত্তিকা তলে/নিয়ত তীক্ষ্ণ তির্যক ফলা চলে,/অতল সাগরে অলোকের সুর কভু ভোলায় না মন,/হেথায় নয়নে শুক্তি এবং স্বচ্ছ মীন-নয়ন।’ (‘দিনের সুর’/*রাত্রিশেষ*)। মানুষের স্বার্থপরতার ভয়াল রূপটি এখানে প্রকৃতির বৈরী আচরণের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের চেতনার রঙেই মনোরম হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মানুষের মনের গভীরতলে যখন দুষিত চিন্তার প্রস্রবণ প্রবাহিত হতে থাকে, তখন প্রকৃতির দিকে চেয়ে ‘শান্তির ললিত বাণী’ বর্ষণের ইচ্ছে জাগে না। তাই হাবীবের কবিতায় প্রকৃতি বারবার তার স্বভাবের বিপরীত অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে :

ক. কোনো এক অরণ্যের মাঝখান থেকে
কোনো একদিন
এসেছিলো নাগরিক নিমন্ত্রণ;
নিমন্ত্রণ এসেছিলো ভর ক’রে স্বপ্নের ডানায়। (‘বিয়ে’/*রাত্রিশেষ*)

খ. আজকের বসন্ত দগ্ধ হবে
কালকের রৌদ্রদাহে।
কিন্তু
মাটির বুকে ঘুমিয়ে থাকবে
তার বীজ
নববসন্তের জন্মকামনায়। (‘অস্তপারের আকাশকে’/*রাত্রিশেষ*)

গ. এবার শরৎ রাত্রি স্বপ্ন নয়– এনেছে সঙিন
লুণ্ঠিত স্বর্ণের শীষে যে স্বপ্ন রঙিন
কেঁদে মরে– মৃত্তিকায় মিশে যায় ধীরে;
এবার শরৎ রাত্রি উদ্‌যাপিত হবে আঁখি নীরে। (‘শরৎ’/*রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের *রাত্রিশেষ* কাব্যের ‘প্রতিভাস’ পর্যায়ের একটি অসাধারণ কবিতা ‘একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ’। এই কবিতায় তিনি ভয়াবহ বর্তমানের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য উজ্জ্বল অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, হাবীবের কথায় প্রবহমাণ নদীর কলস্বর বিশেষ অনুভবের দ্যোতক হিসেবে উপস্থাপিত। তাই সেই নদীর উৎস অনুসন্ধানে প্রকৃতির চেয়ে কবির মানসভূমি পরিভ্রমণই স্বাস্থ্যকর মনে হয়। তবু প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবেই আমরা এই নদীর জল ছুঁয়ে দেখতে চাই। একটি পুরনো নদী আর মধুমতী মাঠের কাছে এসে কবি অনুভব করছেন, ‘এখানে সবুজ ঘাসে/ঘুম আর ঘুম/ছিলো এককালে।’ কোন এককালে এই নদী-তীরের হলুদ ফুল কবিকে বিমোহিত করত। পরিচিত আম্রকাননে ঘুঘুর ডাক শুনে কোথায় যেন হারিয়ে যেতেন কবি। সেই আমের বীথি এখনো আছে, কিন্তু ‘ঘুঘুর শান্ত ডাক নেই।/নেই সেই ঘুম আজ/নেই সেই ঘাসের গালিচা,/ধূসর মাটির বুকে ধরেছে ফাটল।’ (‘একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ’/*রাত্রিশেষ*)। কবি ভাবছেন, যেন হাজার বছর ধরে বয়ে যাওয়া ঝড়ে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এখানে ঘুমের ছায়া নেই, স্বপ্নের দোলা নেই, কেবল দস্যুর নখের আঘাতে রক্তাক্ত কিছু দৃশ্যপট এখনো বর্তমান। ‘এখানে আকাশ-ছোঁয়া/এইসব মাটির সীমানা/ ঘেরা ছিলো বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে।’– এই স্মৃতি কেবলই দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেয়। সবুজ মাঠে এখনো সোনার ফসল ফলে, কিন্তু সেই ভালোবাসা আজ আর কোথাও খুঁজে পান না

কবি। তাঁর মনে পড়ে, দীঘির পাশে একচালা ঘরের সেই কাজেম বয়াতির কথা, যে এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে। কবির পঁচিশ বছরের পরিচিত গ্রাম 'স্টবিয়াই নগরীর মত' ঢেকে গেছে। কবির এই পল্লিভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। কারণ, 'অনেক মানুষ ছিলো মরেছে অনেক।/সেই সাথে মরে গেছে তারো চেয়ে বেশি–/শতাব্দীর গ'ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম।' ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)। দুঃসময়ের ভয়াল থাবা গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কীভাবে হরণ করেছে, এই কবিতায় তারই প্রতিভাস লক্ষ করা যায়।

আহসান হাবীব প্রকৃতির সঙ্গে কিংবা প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন বলেই তাঁর ব্যক্তিক অভিব্যক্তির ছায়াপাতে প্রকৃতিও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতি এখানে তাঁর ভাষায় কথা বলেছে, তাঁরই মতো করে সময়ের ক্ষতচিহ্ন বুকে ধারণ করে দুঃখের গান গেয়ে উঠেছে। কবি ও প্রকৃতির অভিজ্ঞতা একই বৃন্তে বিকশিত হয়ে কবিতা স্বকালের প্রতিকৃতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. এবার আবার সেই দিন!
সেই ঝরা পলাশের দিন!
তবুও মাটিতে জাগে মৃদুগন্ধ কামনার ভার
তাই নিয়ে হৃদয়ে অসহ্য প্রয়াস বার বার
বাসা বাঁধবার! ('ঝরা পলাশ'/*রাত্রিশেষ*)

খ. ছিন্ন পালকের ছায়া দেখা দেয় কখনো আকাশে,
তার পাশে রৌদ্র-পীত পৃথিবীর ঘাসে
বিকেলের সোনারাঙা রোদেলা মিলায়
ভেঙে পড়া আকাশের গায়। ('প্রদক্ষিণ'/*রাত্রিশেষ*)

গ. হে আকাশ হে অরণ্য
তোমাদের মাঝখানে কতবার কত না প্রাচীর
বেঁধেছে হৃদয়;
তবু বারবার সমুদ্রের তীর
সহসা তরঙ্গ হানে
ছুঁয়ে যায় আকাশের কোণ,
আবার সে পুরনো স্বপন
ভাঙে সে প্রাচীর আর জাগায় বিস্ময়,
আবার সমুদ্রতীরে সেই ঝড় বয়।
সেই ঝড় দোলা দেয় অশোকের বনে!
সেই ঝড় ঝড় আনে গগন-গহনে! ('হে আকাশ হে অরণ্য'/*রাত্রিশেষ*)

ছায়া হরিণ কাব্যে আহসান হাবীব প্রকৃতির অনুষঙ্গে তাঁর জন্মভূমির প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। স্বদেশের মুখ তাঁর কবিতায় নানা রূপকল্পে উদ্ভাসিত। কবির চেতনায় দেশ কেবল মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সীমায় আবদ্ধ নয়। দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের জল-স্থল ও আকাশের সবকিছুকেই হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় এবং সেই অনুভবের সমগ্রতাকে কর্মের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে হয়– এভাবেই আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় নিজেকে আঁকতে চেয়েছেন। কবি যখন বলেন, 'মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই/দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের/আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।' ('তোমাতে অমর আমি'/*ছায়া হরিণ*), তখন কবিতায় বিধৃত এই প্রকৃতি কেবল প্রকৃতি হিসেবেই বিবেচিত হয় না, প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে স্বদেশের মুখই গভীরতর আবহে আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' কবিতায় আহসান হাবীব স্মৃতির ভেতর দিয়ে সমৃদ্ধ দেশের পল্লি-প্রকৃতির কাছে প্রণত হয়েছেন। 'সোনামুখী নারকেলের শাখায় শাখায়/আর দুধ-সুপুরির বনে' এখনো বঙ্গোপসাগরের হাওয়া খেলা করে কিনা জানতে

চান কবি। জোয়ারের জলে মুখ দেখে যে সোনালি রোদ, তাও কবির চৈতন্যে ঝলক দিয়ে ওঠে। এই কবিতায় কবি প্রকৃতি ও মানুষের মনোহর মেলবন্ধনের ছবি এঁকেছেন। তাই ঢেঁকির পাড়ে ক্লান্ত হয়ে আসা একজন মেয়ের কথা মনে পড়ে কবির, যে 'ঘুম পেলে/পা নামিয়ে–/হেলির পাতায় বোনা নরম পাখায়/কিছু হাওয়া খেয়ে,/তার পরে,/পুকুরের ঘাটের শেষে/গলাজলে বুক রেখে' ('জল পড়ে পাতা নড়ে'/*ছায়া হরিণ*) জীবনের অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তির জন্য শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং তার চোখের জল পুকুরের জলের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। এই ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষেরা কবির চিরচেনা স্বজন। প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা এই জীবন থেকে কবি অনেক দূরে সরে এসেছেন এবং ভুবনের ঘাটে ঘাটে নোঙর করে অনুভব করেছেন, অতীতের তীর হতে ভেসে আসা দীর্ঘশ্বাস কবির বুকের কাছে কেবলই আছড়ে পড়ে এবং কবির 'হৃদয়ের এ-কুল ও-কুল দু'কুল ভেসে যায়'। নিচের উদ্ধৃতিদ্বয়ে স্মৃতিমগ্ন কবির চোখে পল্লিজীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যেতে পারে :

ক. এখনো কি মাঝে মাঝে
বিকেলের ঘুঘুর ডাকে বুক ভরে কান্না পায়
মনে হয়–
সুমুখের মাঠ-বন পেরিয়ে
যে নদী বয় তার বুকে
শপ্ শপ্ বৈঠার আওয়াজ;
আর পাখির ডানায় মন ভর দিয়ে
ভরা গাঙে উড়ে গিয়ে
এখনো কি সেই মুখ খোঁজ করে,
ঘরে ফেরা দিনের আবেগ
যার সারা মুখে টলোমলো আর
আঠারো বৈশাখ পার,
দেখেনি যে মুখ? ('জল পড়ে পাতা নড়ে'/*ছায়া হরিণ*)

খ. রাত্রিশেষ!
কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল–
ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।

শিশির সন্নত ঘাসে মুখ রেখে শেষের কান্নায়
দু'চোখ ঝরেছে কার,
পরিচিত পাখিদের পায়
চিহ্ন তার মোছেনি এখনো,
আছে এখনো উজ্জ্বল–
কান্নায় মাধুরীটুকু ঘাসে ঘাসে করে টলোমল। ('শীতের সকাল'/*ছায়া হরিণ*)

আহসান হাবীব প্রকৃতির অনুষঙ্গে তাঁর অন্তর্গত অনুধ্যানকে অবয়ব দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতি কবির ইচ্ছের রঙকেই অঙ্গে ধারণ করে কবির চেতনায় গতিসঞ্চার করেছে। কবির অভিজ্ঞতার স্পর্শে প্রকৃতি সপ্রাণ-সজীব সত্তায় পরিণত হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন, 'যদিও এখনো/ফুল ফোটে পাখি গায়/আর/এখনো ভোরের রোদে সোনা ঝরে;/ঝরেছে যেমন/হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীতে।' ('সেই নেই'/*ছায়া হরিণ*), তবুও মানুষের অন্তর্গত অসুখ-বিসুখের ছায়াপাত সেখানে স্পষ্ট। বালক বয়সের প্রকৃতিমুগ্ধতার ঘোর থেকে আহসান হাবীব কখনো মুক্ত হতে পারেন নি। কবির মধ্যে মুক্তির জন্য বিশেষ কোন আকুলতাও চোখে পড়ে না। বরং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হতে হতে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পাঠ করার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করেছেন কবি। ফুল-পাখি-জল-নদী-মাটি-ঘাস-গাছ আহসান হাবীবের কবিতায় ঘুরেফিরে আসে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তারা পুরনো চেহারা পাল্টে নতুন অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়। কবির বারান্দায় প্রতিদিন যে পাখিটি সামান্য রুটির লোভে ঘোরাফেরা করে এবং গান শোনায়, সেই পাখিটিও কবির অনুভূতিতে ঈর্ষার

আগুন ছড়িয়ে দিয়ে যায় : 'ঘাসের শিশিরে মুখ ধুয়ে উড়ে যায়/ঈর্ষার আগুন কিছু রেখে যায় সকালের রোদে।' ('ঈর্ষার আলোকে আমি'/*ছায়া হরিণ*)। এই আগুনে কবির সৃজনপ্রতিভা প্রাণিত হয়। তাঁর নির্জনতা প্রকৃতির উপস্থিতিতে প্রদৃপ্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই প্রকৃতি কবির অনুভবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

আহসান হাবীবের কবিতায় প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও কবিমানসের প্রবণতা প্রকাশের অনুকূল আবহ রচনায়ই তা সর্বাধিক শিল্পসংহত। কবির চেতনার রঙে পরিচিত পরিমণ্ডলের বস্তুসমূহ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠায় তাঁর বাণী প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধনে অর্থবহ ব্যঞ্জনা ও অভিনব মাত্রা লাভ করেছে। তাই তাঁর কবিতার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল কবির মুক্তির আনন্দেরই প্রাণবন্ত প্রতিনিধি হিসেবে ধ্বনিত হয়, তা হয়ে ওঠে তাঁর অস্তিত্বের শিল্পিত স্মারক। বাতাসের স্পর্শের লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ফুলের ক্ষণস্থায়ী জীবন যেন কবির জীবনার্থেরই প্রতীক। কবির নিসর্গের কবিতায় ফুল নিজের জীবনের অপ্রাপ্তি এবং অতৃপ্তির জন্য আক্ষেপও করে কখনো কখনো। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

ক. কখনো সন্ধ্যায়
বকুলশিউলির কুঁড়ি গন্ধ দেয়।
কখনো পাখির
প্রসন্ন কণ্ঠের সুধা ঢেউ তোলে
জানি না কখন
পুরনো নদীর স্রোতে পা ডুবিয়ে বসেছি নির্জনে। ('যখন বিরতি'/*ছায়া হরিণ*)

খ. শিউলি কি বকুল কি পদ্মকলি ভোরের পাখিরা
যখন ডানার ঘুম ঝেড়ে আসে নিমন্ত্রণে
আমিও তখন
তাকাই
তাকিয়ে দেখি একটি অমর আত্মা! ('যৌবনে জীবনে তুমি'/*ছায়া হরিণ*)

গ. নির্জন নদীর তীরে অপরাহ্নে ঘাসফুলে
সোনার ফসলে
চোখ রেখে, যে হৃদয় তোমাকে দেবার
কথা ছিল– সে আজ হাটের পণ্য।
হাটে হাটে নগরে বন্দরে
সে হৃদয় বিজ্ঞাপিত আজ । ('অন্যদিন'/*ছায়া হরিণ*)

ঘ. মুঠোমুঠো আমরা ছড়াবো সারা মাঠে
সঙ্গে তার কিছু মেধা আর কিছু প্রতিভা ছড়াবো
অজস্র ফসলে যারা এই সব অমর আত্মাকে
অন্ন দেবে
এবং বিশ্রাম দেবে রৌদ্র আর ছায়ার মিছিলে। ('ফুটবে ফুল'/*ছায়া হরিণ*)

সারা দুপুর কাব্যেও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে আবর্তিত হয়েছেন আহসান হাবীব। শৈশব-যৌবনের প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা কবির অনুভূতির নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চার করেছে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মৃতির হাত ধরে বর্তমানে পৌঁছে যায়। নাগরিক জীবনের দুঃসহ দিনের ধূসরতা থেকে মুক্তির জন্যই কবির এই স্মৃতি-রোমন্থন। 'অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস/ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ'– রবীন্দ্রনাথের (২০০৬ : ৫/৫৬৩) এই উপলব্ধিরই অনুরণন যেন হাবীবের কবিতায় শোনা যায়। তবে কবির ব্যথিত আত্মা অতীতের তীর থেকে আনন্দও আহরণ করেছে। তাই জোয়ারের জল, ভরা নদী, ভোরের পাখি প্রবাসের নীড় ছেড়ে অম্লান অতীত কবির অন্তরে এসে আসন রচনা করে। কবির কল্পনার পাখি যখন 'জোয়ারের জলে/গা ধুয়ে ভোরের রোদে ডানা ঝাড়ে/তুলে নেয় ঘাসের নরম নম্র

কণা থেকে' ('উত্তীর্ণ প্রহরের গান'/*সারা দুপুর*), কিংবা যখন 'বন্দরের ঘাটে/পশারীরা একে একে সব নৌকো ভাসায় জোয়ারে', তখনো 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান' গাইতে গাইতে কবির বাস্তবের ঘাটে ফেরা হয় না।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "আমরা যাকে প্রকৃতি বলি, তা নির্বিশেষ ও বৈচিত্র্যহীন। আকাশ সর্বত্রই এক; সব দেশেই প্রান্তর, পাহাড়, উপত্যকা একইভাবে গঠিত। যা মানুষের সৃষ্টি, শুধু তারই সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন 'দেশ' বলে চেনা যায়– যেমন ভাষা, স্থাপত্য, লোকাচার।" (১৯৬৬ : ২০৩)। আহসান হাবীবের আন্তরিক স্পর্শে তাঁর কবিতায় বিম্বিত প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বিশেষ এবং বৈচিত্র্যময়, যা তাঁর আত্মখচিত শিল্পচৈতন্যেরই স্মারক। তাই কবি যখন বলেন, 'হিমে ও বর্ষায়/সূর্যের প্রহরা পাই,/প্রশান্তি চাঁদের;/নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের/পরিচর্যা পাই নিত্য/জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে।' ('শেষ সন্ধ্যা– প্রথম ঊষা'/*সারা দুপুর*), তখন প্রকৃতি-অনুষঙ্গে কবির জীবনার্থ অন্বেষণের অভিপ্রায়ই প্রতিভাত হয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে কবি অবগাহন করলেও 'শেষ সন্ধ্যা– প্রথম ঊষা' কবিতায় প্রকৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং প্রকৃতির নানা প্রান্ত থেকে আলোক সঞ্চারিত হওয়ায় কবির আত্মখচিত অনুভব নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। যাপিত জীবনের ক্লান্তি মুছে ফেলার জন্য কবি বারবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে চান, যেখানে সহজ আনন্দে সময়কে উদ্‌যাপন করা যাবে। 'মন বলে' শীর্ষক কবিতায় কবি যখন বলেন, 'মন বলে যাই/ছায়ার মিছিলে হেঁটে শান্তি নেই;/যাই ফিরে যাই/যেখানে মানুষ মাঠ পথ পাখি পলাশ বকুল/আরণ্য বর্ষার জলে পাশাপাশি গা ধোয়/এবং/আদিম নদীর স্রোতে মানবশিশুরা/খেলা করে' ('মন বলে'/*সারা দুপুর*), তখন কবির স্বকালের অস্থিরতা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। 'প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরেনি' বলে যে আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে তাঁর প্রেমের কবিতায়, প্রকৃতি প্রসঙ্গেও বোধকরি একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কবি জানেন, ইচ্ছে করলেই আর সেই জলের সঙ্গে মিতালি করার সুযোগ তিনি পাবেন না। সেই নদীও আগের মতো আবাহন করবে না কবিকে। তবুও ইচ্ছেকে বুকে আগলে রাখার আনন্দ কিংবা দুঃখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না তিনি। আরো কয়েকটি কবিতাংশ বিবেচনা করা যাক যেখানে কবির প্রকৃতি-চিন্তার পরিস্ফুটন লক্ষ করা যাবে :

ক. আমার
সব গেছে, ঘাটের ময়ূরপঙ্খী গেছে আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে
এখন বসে না কাক; তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার;
আমি আছি এই নদী আর এই নদীর কল্লোলে
কান পেতে নির্ভয়; কেননা তুমি আজো পাশে আছো জানি
এ মাটির অকৃত্রিম সন্তান। ('এই ঝড়ে অন্ধকারে'/*সারা দুপুর*)

খ. তোমার জন্য এই আকাশের
গাঢ় নীলের প্রাচুর্য
আর সকাল বেলার শিশিরধোয়া
সবুজ ঘাসের স্পর্শটুকু
আর সময়ের সমুদ্রপার অলস-মধুর
মুক্ত করে রেখে যাবো,
সেই আশাতে– ('তোমার জন্যে'/*সারা দুপুর*)

গ. রক্তপলাশের বুকে তাকে তুমি দেখো না, চেয়ো না
দূরের সমুদ্রনীল দিগন্ত যেখানে
দু'টি একটি পাখির পাখায়
শেষসূর্য ছড়ায় সোনার কুচি যেখানে মেঘের
বুকের সমস্ত ঝড় ঢেকে রাখে গোধূলির রঙ ('সূর্যসঙ্গ'/*সারা দুপুর*)

আহসান হাবীবের *আশায় বসতি* কাব্যে কবির স্বকাল, স্বসমাজ ও স্বদেশের ভেতর-বাহির নানা অবয়বে উদ্ভাসিত হলেও প্রকৃতির সঙ্গে গভীরতর সম্পর্কসূত্রেই তা শিল্পসংহতি লাভ করেছে। শহুরে সভ্যতার রক্তশূন্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি। জীবিকার প্রয়োজনে শহরে অবস্থান করলেও জীবনের প্রয়োজনে কবির মন বারবার ফিরে গেছে পল্লি-প্রকৃতি ও জনপদে। বাস্তবের আক্ষেপ ও অচরিতার্থতাকে তিনি স্মৃতি ও কল্পনার দানে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। বণিক-বুদ্ধির বিমানবিক বিস্তারে অসহায় শুভবোধ কেবলই মুক্তির আশায় অপেক্ষা করেছে। সেই অপেক্ষার ছাপ এই গ্রন্থের নামকরণেও লক্ষ করা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি মানুষকে অবাধ ও উন্মুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই কাব্যে প্রকৃতি এসেছে সেই মুক্ত মানবিক বোধের প্রেরণা-সঞ্চারী অনুষঙ্গ হিসেবে।

আশায় বসতি কাব্যের প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের প্রধান অবলম্বন নদী এবং সেই নদীও বর্তমানের জলে পরিতৃপ্ত নয়। অতীতের বুক থেকে উঠে আসা এই নদীর জলে তিনি তাঁর শৈশব ও যৌবনের ঝিনুক কুড়াতে চেয়েছেন। এই নদীকে কেবল প্রবহমাণতার প্রতীক হিসেবে দেখলে আহসান হাবীবের সৃজনবিশ্বের জোয়ার-ভাটা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে না। স্রোতের বিপরীতে এগুতে না পারলে মানুষ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। আহসান হাবীবের মাঝিকে তাই উজান স্রোতে নৌকা চালাতে দেখা যায়। প্লাবনের পর সমতলে জমে থাকা পলি ফসলের পুষ্টি জোগায়। সেইসঙ্গে নদীর বিধ্বংসী ভূমিকাও বিবেচনায় রাখা দরকার। যে নদী বাগানের ফুলকে পরিতৃপ্ত করে, সেই নদীই আবার কৃষকের স্বপ্নের ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে উৎপাদনশীল মানুষের কাছে নদী নানা অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়। নিচের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করি :

ক. তোমার কী মনে পড়ে সেই ছোট্ট নদীটি, যে নদী
আমরা দুপুরে নিত্য প্রচণ্ড দুপুরে
হাতে হাত বেঁধে সাঁতরে পারাপার হয়েছি এবং
জোয়ারের জল কিছু তুলে এনে ছড়িয়েছি প্রত্যহ বাগানে? ('সেই নদীটি'/*আশায় বসতি*)

খ. নদীর পথে সেই যে গেলো সখের নেয়ে
সাঙ্গ হলো সারাটা দিন একলা বেয়ে
উজান বেয়ে!
দিন গেলো আর রাত গেলো তার উজান ঠেলে।
হয়ত ভরা নদীর মাঝে বৈঠা ফেলে
ঠায় বসে তার কাটছে বেলা উজান ঠেলে। ('কাহিনী নিরন্তর'/*আশায় বসতি*)

গ. তোমার এই মাঠ তোমার এই নদী
ফসলে ফুলে জলে নতুন নিরবধি,
মুগ্ধ স্বজনের আসরে আঙিনার
শোনাও গান তার। ('সামনে ধু ধু নদী'/*আশায় বসতি*)

ঘ. থাকে বৈরী বাতাসের মুখোমুখি। উথালপাথাল
নদীর নিঃসীম বুক। সারিসারি ঘাটের নৌকোয়
জ্বলে না মশাল; জ্বলে সারা বুকে ব্যাপ্ত পারাপারের বাসনা। ('বৈরী বাতাস, অতঃপর...'/*আশায় বসতি*)

আহসান হাবীব কবিতায় বারবার বাগানের কথা বলেন। ফুলের প্রতি কবির ভালোবাসা প্রশ্নাতীত, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য-কীর্তনের চেয়ে ফুল ফোটানোর প্রয়াসকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কবি যখন বলেন, 'গোলাপের গন্ধ আমি ভালোবাসি।/রজনীগন্ধার/সুকোমল উষ্ণতার উমে আমি/সামান্য শয্যায়/শুয়ে থেকে অনায়াসে পারাপার হতে পারি/অদৃশ্য অথৈ কোনো নদীর তুফান।' ('শিল্প-মানবিক'/*আশায় বসতি*), তখন ফুল ও নদীর যৌথ প্রযোজনায় জীবননাট্যের চমৎকার কিছু দৃশ্যপট আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখি। কবি অনায়াসে 'চাঁদ কিংবা তারার বন্দরে/রাজ্যপাট বেঁচে দিয়ে' তার বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারেন ফুলের সৌরভ এবং এবং ফিরে যেতে পারেন তাঁর ভালোবাসার চাঁদ তারার বন্দরে। ফুলের সার্থকতার পেছনে প্রকৃতির আরো নানা উপাদান জড়িত।

পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ফুলের শরীরেও আঁচড় কেটে যায়। তাই ফুলকে কেবল সৌন্দর্যের আধার হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। ফুল আত্মপ্রকাশের প্রতীক হিসেবেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৫/১৭৯)

তখন ফুলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠে। চৈতন্যের উজ্জ্বল উৎসারণে ফুল সুন্দর হয়ে ওঠে– এই উপলব্ধি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু চৈতন্যকেও পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা শাণিত করে তুলতে হয়। আহসান হাবীব সেই প্রত্যয়, পরিশ্রম ও সাধনার দিকটিকে বাগানের অনুষঙ্গে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। হাবীবের কবিতায় 'বাগানে'র তাৎপর্য চিহ্নিত করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'আহসান হাবীব একটি বাগান চেয়েছিলেন। কথারা তাঁর জন্য বাগান হয়ে ওঠে, নিবাস বাগান হয়ে যায়। এ বাগান সম্পন্ন অতি অবশ্যি, সেখানে সুরুচি ও সৌন্দর্য থাকবে স্বচ্ছন্দ, হৃদয়াবেগের অনুশীলন ঘটবে প্রতিনিয়ত।' (১৯৮৭ : ৬৩)। বাগানের সঙ্গে জানালার যোগাযোগের দিকটাও আহসান হাবীবের কবিতায় উপেক্ষিত হয় নি। জানালা আলো ও বাতাসের অবাধ গতায়াত নিশ্চিত করে। অর্থাৎ ভেতর ও বাহিরের মেলবন্ধন রচনায় জানালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বন্ধ জানালা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ রচনা করে। তাই কবি দরজা জানালা খুলে দিয়ে ভোরের বাগানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কথা বলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বাগান-ফুল-জানালার যৌথতায় উদ্ভাসিত কবিচৈতন্যের পরিচয় তুলে ধরা যাক :

ক. জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও
দেখতে দাও আজ
ভোরের বাগানের
সারাটা বুক জুড়ে
নতুন কারুকাজ। ('স্বগত'/*আশায় বসতি*)

খ. হাতের আঙুল তার এঁটে নিয়ে চতুর জানালা
কি নিখুঁত সাফল্যে রেখেছে তাকে ঝুলিয়ে, এবং
সারা ঘরে সংসার বাগান বাঘ পাখি
আর আলো আর অন্ধকার
ফুল আর সাপে মিশ্রিত এক দুর্বোধ্য চীৎকার। ('পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি'/*আশায় বসতি*)

গ. 'ফুলের এমন শোভা দেখিনি;
এমন বিচিত্র ফুলের রঙে উজ্জ্বল বিকেল দেখিনি।'
ক'জন শহুরে নবীন যুবা একদা বিকেলে
ছমাইল সাতমাইল পথ পাড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের
একটি ছোট কুঁড়েঘর সামনে রেখে, আর তার সামনের বাগানে
চোখ রেখে বললে এই কটি কথা এবং বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে
দেখে সেই ফুল। ('ফুলের এমন শোভা'/*আশায় বসতি*)

মেঘ ও চৈত্রের সন্নিধান যে বিরোধাভাস রচনা করে, *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের নামকরণে তার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। চৈত্রের দাবদাহে বৃষ্টির অপেক্ষায় প্রহর গোনার প্রতিভাসও এই কাব্যের এই নামকরণে অপ্রকাশিত নয়। বিরূপ সময়ের অবসানকল্পে কবির সুদৃঢ় আশাবাদ এখানে শিল্পসংহতি লাভ করেছে। এই কাব্যেও প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে কবির প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার দিনগুলি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়েছে। কবির উদ্বাস্তু মনের প্রতিকৃতি

নির্মাণেও আমরা প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ করব। কবি দেখেন, 'মগডালে সুনীল পাখি সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমায়', সেই একই গাছের তলায় তিনি একটি ন্যাংটো শিশুর অনিশ্চিত জীবনের ছবি আঁকেন, যে শিশু মায়ের উদোম পিঠ বাজিয়ে গান গেয়ে ওঠে। এই গন্তব্যহীন শিশুর আনন্দযাপনের পাশেই অন্য এক দৃশ্যের অবতারণা করেন কবি : 'দিশেহারা কাঠবেড়ালী একবার মগডালে যায়/আর একবার গাছের তলায়/ছটফট ছোটাছুটি/ছুটে ছুটে প্রাণান্ত তবুও/আপন নিবাস খুঁজে খুঁজে কোথাও মেলে না।' ('এক দুই তিন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)। এই কবিতাটিতে ঘরহীন মানুষের অস্থির জীবনের প্রতিভাস রচনায় এই ছটফটে কাঠবেড়ালির উপস্থিতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আহসান হাবীব দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চান। আকাশে মেঘ করলে কিংবা হাতে কোন কাজ না থাকলে এই যাওয়ার ইচ্ছে আরো তীব্রতর হয়। কিন্তু যাওয়া হয় না তাঁর। দাম্পত্যকলহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, 'বারো বছরের ছেলেটি যখন তার নিজের ভাষায়/ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর বক্তৃতা করে, তখন/অথবা বড় সাহেবের ধমকধস্ত' ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*), তখন খুব যেতে ইচ্ছে করে তাঁর। এই যেতে না-পারার কারণ হিসেবে তিনি উপস্থিত করেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সময় এবং 'জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন'। তিনি এই অবরুদ্ধ সময়ের শেকল ছিঁড়ে কিছুতেই বের হতে পারেন না। পিরোজপুর শহরের প্রাকৃতিক আবহে ঘুরে বেড়ানো কিংবা রাতের অন্ধকারে স্কুল-মাঠে একান্তে কান্নায় ভেঙে পড়ার স্মৃতি তাকে কেবলই টানতে থাকে, কিন্তু বর্তমানের সুদৃঢ় বন্ধন তিনি কিছুতেই ছিন্ন করতে পারেন না। তাই 'আমার যাওয়া হয় না' বদলে নিয়ে তাঁকে বলতে হয়, 'আমাকে যেতে দেয় না'। যেতে না-পারার কষ্ট ভুলে যাওয়ার আগেই তাঁকে বলতে শুনি, 'ফিরতে হবে'। কোথায় ফিরবেন তিনি? শহুরে জীবনের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকে খুঁজে নিতে হবে আপন ঘাট ও ঘরবাড়ি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের পাড়ে এসে সমুদ্রের উৎস সন্ধানের অভিপ্রায়ও পাঠককে সেই শেকড়ে ফেরার কথাই মনে করিয়ে দেয় :

ক. ফসল কুড়াতে হলে ফিরতে হবে এই পথে আসতেই হবে
মাছরাঙা বসিয়ে ডালে তুমি নীল মাছের আশায়
ইট কাঠ লোহা আর বারান্দার টবের উৎসবে
লীন হলে, জানবেই না কোথায় কখন চলে যায়
সাজানো নৌকার পাল, চলে যায় সারি গেয়ে দাড়ি
জানবে না কোথায় আছে তোমার আপন ঘাট আছে ঘরবাড়ি। ('ফিরতে হবে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

খ. এখন, এখানে এই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের পাড়ে এলে
স্থির কালো জলে
ছলছল আওয়াজ ওঠে
প্রবল বাতাস বয়
চলে যাই উৎসের উৎসবে। ('এই তীর্থে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যেও আহসান হাবীব উৎসে ফেরার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। এই উৎসের পরিচয় প্রকাশে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন কবি। 'আবহমান' কবিতায় কবি গনগনে আগুন ও ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেন বৃষ্টিপতনের উৎসব। তারপর 'রৌদ্রভুক সবুজ আর হলুদ সর্ষেক্ষেত' পার হয়ে আলেফ মুনশী ও তার মেয়ে সখিনার মুখ দেখেন 'আর তার ভাত-বঁড়শির করুণ ফাৎনায় চোখ রেখে/খালেক নিকিরির নৌকো সিমলার খাল পার হয়ে যায়।' ভুবন কামারের কারখানা, লক্ষ্মণ মুচির একচালা ঘর এবং মতি সওদাগরের মুদি দোকান পার হয়ে তিনি পৌঁছে যান লালাবাবুর হাটে। কবি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান, 'খালেকের হাতে তখন সরু আর মোটা দু'টি শনের রশি/স্বপ্নের মতো আবেশে কাঁপতে থাকে,/কেবলই কাঁপতে থাকে এবং তারপরেই নদীর নাম নীলমণি।' কবিতাটিতে হাবীব জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষের ছবি আঁকলেও তা নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গেই মূর্ত হয়েছে :

রোদবৃষ্টিতে মাখামাখি আকাশের নিচে সন্ধ্যা আসে একসময়
একসময় রাত নামে
স্বপ্ন আরো গভীর হ'য়ে যায় চাঁদ এবং নক্ষত্রের ভেজা গায়ে।

রাত বাড়তে থাকে। ('আবহমান'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

'যাবার আগে' শীর্ষক কবিতায় কবি আত্মকথনের ভঙ্গিতে পল্লি-প্রকৃতির সঙ্গে নিজের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরেছেন। ভোরের রোদ পোহাতে পোহাতে যতদূর ইচ্ছে চলে যাওয়ার জন্য যে কিশোরকে প্রাণিত করছেন কবি, সে তো কবির কৈশোরক অভিজ্ঞারই প্রতিভাস। পুরনো কাঁথায় ঘুমানো, 'মার রাত্রে ঢেকে রাখা গরম উনুন' এবং ঘর ছেড়ে বাইরে এসে শিশিরে পা ডুবিয়ে ইচ্ছের অনুকূলে চলে যাওয়ার এই আহ্বান কবির প্রাণেই প্রতিধ্বনি তুলছে। 'পারঙ্গম একজন' কবিতায় রাখাল, বটের ছায়া, ভরা কলসী, নীল শাড়ি, রুপোর ঝুমকো–এইসব অনুষঙ্গেও প্রকৃতি-সান্নিধ্যের আভাস পাওয়া যায় :

ক. দু'পাশে ধানের শীষে শিশির টলমল, তুই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবি, তুই
দু'হাতে সবুজ টিয়ে ওড়াতে ওড়াতে
যা সেই নদীর ঘাটে যা
যে নদী প্রত্যহ যায় নিঘাট সমুদ্রে যায়
ফিরে আসে ঘাটে। ('যাবার আগে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

খ. তুমি খুব রাখাল রাখাল বলো
তুমি খুব বটের ছায়ার কথা বলো
জোয়ারের জলে বাসা কদম ফুলের কথা বলো
ভরা কলসী নীল শাড়ী রুপোর ঝুমকোর কথা
তুমি খুব বলো। ('পারঙ্গম একজন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

'নীল নক্সা' শীর্ষক কবিতায় আমরা দেখি, আহসান হাবীব 'পাখির উড়াল দেখতে-দেখতে' অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। সেই তালিকায় আছে কর্দমাক্ত জল, ভাঙা সাঁকো, পোড়া নিসর্গ, শূন্য বাসন, দীর্ঘ মাঠ, ভাঙা লাঙল, মহা সড়ক ইত্যাদি। এই দেখার মধ্যে গতিসঞ্চারের জন্য নদী ও নৌকোর কথা বলেন তিনি। কবি তখন লক্ষ করেন, 'নদীর সমস্ত নৌকো এখন সামনের দিকে এগুচ্ছে'। তখন সমস্ত এলাকার ধূসরতা মুছে যায় জলজ কল্লোলে এবং পুনর্বাসনশিল্পীদের তৎপরতা চোখে পড়ে কবির।

আহসান হাবীব *প্রেমের কবিতা* গ্রন্থে প্রকৃতি-অনুষঙ্গে প্রেমকে নানা মাত্রায় উদ্ভাসিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতি সেখানে প্রেমের অনুভূতি কিংবা অনুরণনকে গভীরতর করার সহায়ক শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির প্রেম সম্পর্কিত আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে আমরা প্রকৃতি-প্রসঙ্গেও দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধানে আমরা এই গ্রন্থের কবিতাসমূহ থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে বিরত থেকেছি। প্রেম ও প্রকৃতির সংযোগ নিবিড় বলেই এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় বিধৃত প্রকৃতি-অনুষঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ অর্থের দ্যোতক হিসেবে চিত্রিত নয়, বরং প্রেম ও প্রকৃতি সেখানে পরস্পরের পরিপূরক।

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ কাব্যেও আমরা কবিকে আপন নিবাস-অন্বেষণে তৎপর হতে দেখি। তাই তিনি উড়ন্ত পাখির কাছে প্রশ্ন করে ঠিকানা জেনে নিতে চান। পথের বাতাস, এমনকি নিঃসঙ্গ নদীর কাছেও তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ান : 'শেলফে সাজানো মননের সঙ্গে স্বজন/সুখে বসবাস/হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন/কোথায় নিবাস?' ('বসবাস নিবাস'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)। এই আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের মধ্যে কবির অনিকেত মানসতার প্রকাশ স্পষ্ট। 'রূপান্তর' কবিতায় আহসান হাবীব আবার ফিরে গেছেন শৈশবের পল্লিপ্রকৃতির কাছে। সেখানে ঘুঘুর ডাক, বাঁশের সাঁকো, গঞ্জের মেলা– আরো নানা অনুষঙ্গ উপস্থিত। বুনো ঝাউয়ের সঙ্গে হাওয়ার অলৌকিক খেলার কথা মনে পড়ে কবির, আবার গ্রামের মাটির সোঁদাল গন্ধ নিঙড়ে নিয়ে লাঙল চালায় যে কৃষক, তার সঙ্গে একাত্ম হতে চান তিনি। শৈশবে যে পাথরখণ্ডে বসে একদিন সূর্যাস্ত দেখেছিলেন, সেই পাথরটিকেও কবি ভোলেন নি। এইসব প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ থেকে অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু স্মৃতির সাম্রাজ্যে তিনিই অধীশ্বর, সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার

কারো নেই। বিপন্ন সময়ের কাছেও পরাস্ত হয় না মানুষের স্মৃতি। আর সেই মানুষটি যদি হন আত্ম-অন্বেষী এবং সৃজনশীল, তাহলে তাঁর অন্তরের স্পর্শে অন্তরঙ্গ স্মৃতিপুঞ্জের নবজন্ম সাধিত হতে পারে :

ক. ...এবং সন্ধ্যায়
রঙিন বাঁশের বাঁশি হাতে নিয়ে
তৃপ্ত পাখ-পাখালির ঘরে ফেরা পাখার আওয়াজে
কান রেখে ঘরে ফিরে এলে
মাটির শানকিতে
কলার পাতায় সেঁকা বেলে মাছ ঠাণ্ডা ভাত আর কিছু নুন
সামনে রেখে
মা তার উদাস হয়ে যেতো। ('রূপান্তর'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

খ. বুনো ঝাউ হাওয়া পেলে অলৌকিক আলো আর ছায়া
এতল বেতল নাচে এবং হঠাৎ
স্খলিত তারার মতো
বাঁশঝাড় পার হয়ে যায়। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

গ. এই শুভ্র মাঠে এই মাটির সোঁদাল গন্ধ
এই স্নিগ্ধ পথরেখা কার,
কে দেয় পাহারা আর
কে বৈশাখে মাঠের পানিতে নিত্য
ভোর থেকে মধ্যদিন চালায় লাঙল? ('স্বজনদের কথা'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

ঘ. শৈশবে এই পাথরখণ্ডে বসে
আমি সূর্যাস্ত দেখতাম
রাখাল এই পথে ঘরে ফিরতো
আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতো
এই বিকেল আমার সঙ্গে যাবে না। ('যাবো না'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীবের কবিতা-প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি অভিমত উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান : "প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, ...নানা আলাপ-আলোচনা ছাড়াও কবিতা নিয়ে আলোচনা হত। তিনি আহসান হাবীবের কবিতার প্রশংসা করতেন। বলতেন, 'সর্বত্র যখন বিক্ষোভ তখন আহসান হাবীবের মৃদু এবং লঘু স্পন্দন আমাকে আনন্দ দেয়। তিনি কবিতার যে নিভৃতলোক নির্মাণ করেছেন সেখানে বিশ্রামের শান্তি আছে।" (উদ্ধৃত, সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৭ : ৩২)। আমাদের বিবেচনায়, এই মন্তব্যের 'বিশ্রামের শান্তি' শব্দবন্ধটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রৌদ্রতপ্ত পথিক ক্লান্তি দূর করতে বৃক্ষের ছায়ায় বসে শরীর জুড়িয়ে নেয়। কেবল শরীর কেন, বৃক্ষের উপস্থিতি মানুষের মনেও প্রশান্তি এনে দেয়। প্রকৃতির নিবিড় পরিচর্যায় ক্লান্তি নিবারণের যে প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান, আহসান হাবীবের কবিতায়ও প্রেমেন্দ্র মিত্র তারই অনুরণন অনুভব করেছেন। 'স্বপ্নের রাজপুত্তুর' আহসান হাবীব সম্পর্কে ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন যখন বলেন, 'এদেশের আকাশ, মাটি, ফুল, পাখি, নদী সবকিছুর জন্যে কবি আহসান হাবীবের হৃদয়ের টলমলে পুকুরে ভালোবাসার একটি শাদা হাঁস সব সময় সাঁতার কেটেছে তিরতির ঝিরঝির। তার কবিতার শরীরে কান পাতলে সে শব্দ কলকলিয়ে ওঠে।' (১৯৮৭ : ৩০৯)– তখনো আমরা সেই 'বিশ্রামের শান্তি'রই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আহসান হাবীবের কবিতায় নিসর্গের উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণে একালের বিদগ্ধ পাঠকও সেখানে 'দুপুরের শুনশান নিরবতা' অনুভব করেন এবং 'জ্যোৎস্না রাতের রুপোলী আলোর ঝিকিমিকি' দেখতে পান।

বাংলা কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই পল্লি-প্রকৃতি নানা অবয়বে উপস্থিত। কবিচৈতন্যের প্রবণতা অনুযায়ী যুগে যুগে গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশের বিচিত্র রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। পল্লি-জননীর কোলে বেড়ে ওঠা কবিব্যক্তিত্বের সৃষ্টিকর্মে গ্রাম এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। আর যাঁরা শহরে জন্মেছেন, তাঁরাও স্নিগ্ধ-শ্যামল গ্রামবাংলার রূপে মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছেন।

শহুরে জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের খোলা মাঠে নিঃশ্বাস নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন নাগরিক কবিরা, কখনো বা শিশির-ভেজা ঘাসে খালি পায়ে হেঁটে প্রশান্তি খুঁজেছেন কেউ কেউ। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হলেও জীবনজীবিকার টানে যাঁরা শহরে বাস করেন, তাঁদের গ্রামে ফেরা মানে ঘরে ফেরার সুখ; আর আদ্যপান্ত শহুরে কবির গ্রামে যাওয়া মানে ভ্রমণের আনন্দ। এই দুইয়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই পরিমাপযোগ্য নয়। তাই কোন কোন কবিকে পল্লির প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর কেউ কেউ হয়ে ওঠেন নাগরিক কবি। এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকেও কোন কোন কবি গ্রামকে কবিতায় তুলে ধরেন। সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের গ্রাম প্রকৃত অর্থে একটি সৃজনশীল অনুষঙ্গ। তাই পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকে প্রসারিত করেই একজন কবির গ্রামকে বিবেচনা করতে হয়।

আহসান হাবীবের কবিতায় গ্রাম এসেছে স্মৃতিমগ্নতার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে। শৈশবের গ্রামকে তিনি আপন চেতনার রঙে তাঁর কবিতায় মেলে ধরেছেন। তাঁর কবিতার গ্রামকে বুঝতে হলে তাঁর মানসগঠনে গ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে খবর নেওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রেও আমাদের শরণ নিতে হবে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের 'পরিক্রম এবং অবস্থান' শীর্ষক মুখবন্ধের। এই মুখবন্ধেই কবি উল্লেখ করেছেন, 'দারিদ্র্য, দুর্ভাবনা, উৎসাহ, পুরস্কার, ভালোবাসা আর স্বপ্ন এই সব নিয়ে আমার যে পিরোজপুর তাকে ছেড়ে এসেছি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু মর্মমূলে সেই যে সে গেঁথে গিয়েছিলো সুখের দুঃখ আর দুঃখের সুখ হয়ে সে কিন্তু আজো ঠিক তেমনি আছে।' (১৯৯৫ : ৩৪৮)। এই যে গ্রামের কথা বললেন আহসান হাবীব, নিশ্চয়ই শৈশবে ঠিক এইভাবে গ্রাম তাঁর চোখে ধরা দেয় নি। কীভাবে ধরা দিয়েছিল তা বলাও বোধকরি অসম্ভব। তবে এটুকু বলা যায় যে, গ্রামের প্রাকৃতিক আবহ তাঁর মনের বিরাট অংশ অধিকার করে নিয়েছিল। এই অধিকারের দলিলপত্রই পরবর্তী জীবনে বারবার নেড়েচেড়ে দেখেছেন কবি। এই দেখার সুখ উত্তরকালে কবিকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, বর্তমানের যে কোন আঘাতেই তিনি পল্লিমুখি হয়েছেন। এই পল্লিপ্রবণতা তাঁর কবিতায় শহুরে নিষ্ঠুরতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে কিন্তু গ্রাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কষ্টও তাতে অপ্রকাশিত থাকে নি। সামগ্রিকভাবে আহসান হাবীবের গ্রামকে অবিরাম প্রশান্তির উজ্জ্বল অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আহসান হাবীবের মানসগঠন আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, জীবিকার প্রয়োজনে অল্প বয়সেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। এই কলকাতাই বোধকরি কবিকে অধিকতর পল্লিমুখি করে তুলেছে। কলকাতা-জীবনের অস্বস্তি থেকে মুক্তির জন্যই তিনি বারবার গ্রামের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। তাঁর গ্রাম কল্পনায় ধরা দিলেও তিনি সেই গ্রামকে রোমান্টিক অনুষঙ্গ হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। তাই তাঁর কবিতায় গ্রামের বাস্তব পরিস্থিতি প্রকাশিত। তিনি যখন শহরের বৈরী বাস্তবতা থেকে মুক্তির অবলম্বন হিসেবে গ্রামের প্রসঙ্গ আনেন তখন তাঁর গ্রাম সুন্দর এবং মনোহর। অবশ্য এই মনোহারিত্বে যখন যুদ্ধের হাওয়া লাগবে, আমরা দেখতে পাবো, কবিতায় তিনি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যলালিত গ্রামের মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছেন।

আহসান হাবীব গ্রামকে তৃপ্তিদায়ক স্মৃতিকাতরতায় উপস্থাপন করলেও তাঁর দেখা গ্রামকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে নিতে পারি। জীবনানন্দের কবিতায় যে গ্রাম চিত্রিত তা একান্তভাবেই জীবনানন্দীয়, বাস্তববুদ্ধির দ্বারা সেই গ্রামকে আবিষ্কার করা অসম্ভব। প্রসঙ্গত স্মরণ করি একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> কবি...জীবনানন্দীয় নিসর্গের চিত্ররূপময়তার আকর্ষণ কাটিয়ে 'আবহমান বাংলার' ছবি নতুন করে আঁকেন। গ্রামীণ নিসর্গের রূপময় প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ মানুষের কঠিন জীবন-সংগ্রামের ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রোমান্টিক চিত্রলতার মত 'সামান্যার সোহাগ' দিয়ে চিরন্তনীর অভাব মেটাতে' রাজি হন না কবি। তাই কৃষিনির্ভর নদীমাতৃক গ্রাম বাংলার দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার এমন সব ছবি আঁকেন যেখানে কৃষক থেকে কামার, কুমোর, মাঝি, কিংবা ধানভানা মহিলাদের ছবিও ভিড় করে আসে। রোমান্টিক চালচিত্রের বিপরীত আলোয় এরা যেন দুঃস্থ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মিছিল। (আহমদ রফিক ১৯৯৫ : চৌদ্দ)

আহসান হাবীব গ্রামকে সামগ্রিক অর্থে দেখতে চেয়েছেন। কেবল নিসর্গের বর্ণনায় পরিকীর্ণ নয় তাঁর গ্রাম। তিনি যখনি গ্রামের কথা বলেছেন তখনি গ্রামের মানুষের মুখচ্ছবি তাতে মুদ্রিত করে দিয়েছেন। পর্যটকের চোখে দেখা গ্রাম তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। যুগ যুগ ধরে প্রান্তের প্রতি কেন্দ্রের যে অবজ্ঞা ও অবহেলা, তারই প্রভাবে গ্রামের মানুষ আজ

অন্নবস্ত্রের অভাবে কাতর। অথচ এরাই শহরের মানুষের পেটের ভাত জোগায়। আহসান হাবীব এই প্রবঞ্চিত জীবনের মর্মে প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছেন।

কবিতায় প্রকৃতি-অনুষঙ্গের অবিরল উপস্থিতির মৌলসূত্র আহসান হাবীবের ব্যক্তিস্বভাবেই সংস্থাপিত। বিনয়ী, নির্বিরোধ, স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ এই মানুষটি নিজেকে আড়াল করার কাজটি আমৃত্যু সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। প্রবল জনস্রোতেও কবি নিজের চারপাশে একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে নিতেন এবং নিবিড় নৈঃসঙ্গ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। কেবল প্রকৃতির কাছেই তাঁর প্রকাশ ছিল সহজ-স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত। 'তিনি জীবনকে ভালোবাসতেন খুব, ভালোবাসতেন প্রকৃতিকে। জীবনকে গোছাতে চেয়েছিলেন, সাজাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির রূপ দর্শনের জন্যে উদগ্র বাসনা ছিল তাঁর।' (মাফরুহা চৌধুরী ১৯৮৭ : ১০৮)। আমরা সেই বাসনারই ব্যক্তিত্বখচিত প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর কবিতায়। জীবন ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে আহসান হাবীবের কাব্যভুবন।

সময়-সমাজ-রাজনীতি

শিল্পসাহিত্যে ব্যক্তিপ্রতিভার চেতনা ও সংবেদ স্বকালের পটভূমিতে সংহত হয়েই কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। মহৎ সৃষ্টির আবেদন দেশকাল-নিরপেক্ষ হলেও তাতে অনিবার্যভাবেই স্রষ্টার সমকালীন সমাজজীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। তীব্র স্বকালমগ্নতা থেকেই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিচৈতন্যের কাল-অতিক্রমী অভিজ্ঞান অর্জিত হয়। সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত ব্যক্তিমাত্রই সংবেদনশীল এবং স্বকালসচেতন। এমনকি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি কেবল সময় ও সমাজের প্রকৃতি কিংবা পরিবর্তনের একজন দ্রষ্টা নন, বিদ্যমান এবং বদলে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থার হৃৎস্পন্দনের একজন নিবিড় পাঠকও তিনি। এই পাঠাভ্যাস থেকে সঞ্চিত সম্পদেই নির্মিত হয় তাঁর সৃজনবিশ্ব।

একজন ব্যক্তিত্বচিহ্নিত শিল্পস্রষ্টা সময় ও সমাজের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর শিল্পকর্মকে সর্বকালের ও সর্বমানবের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সামগ্রী করে তোলেন। কিন্তু সেই স্রষ্টার অন্তর্ভুবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাঁর সমকালীন জীবন, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল। একজন কবি সমাজের অভ্যন্তর থেকেই সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করে অন্তরের উষ্ণতায় তাকে শিল্প করে তোলেন। রফিকউল্লাহ খান যথার্থই বলেছেন, 'ব্যক্তির যে আত্ম-উন্মোচন কবিতার উদ্দেশ্য, তা ব্যক্তির আত্ম-সামাজিককিরণেরই নামান্তর। কবিতা এই আত্ম-উন্মোচনের শিল্পসম্মত একটি প্রক্রিয়া।' (১৯৮৯ : ৯)। সর্বকালের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বই বিশ্বনাগরিক এবং আধুনিক। কিন্তু এই বৈশ্বিকচিন্তা ও আধুনিক-মানসতার বোধ সময়-সমাজ-স্বদেশের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের অন্তরঙ্গ অবলোকনেই তাঁর চৈতন্যে জন্ম লাভ করে। সময় ও সমাজের সঙ্গে 'এই সংযোগ কবি তাঁর চেতন ও অবচেতন মানসে অনুভব করেন এবং যেহেতু তিনি বিশ্বেরই নাগরিক, ফলে তাঁর রচনায় বিশ্বমানব-চৈতন্যের নির্বাধ রূপায়ণ ঘটে। সমকালীন বিশ্ব ও সমাজ-অভিঘাতস্পৃষ্ট ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্বসংকট কবির রচনায় রূপায়িত হয়।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ১৮৮)। সময়ের সকল অভিঘাতকেই তিনি স্বাগত জানান না কিংবা সমাজ-রাষ্ট্রের সকল আলোড়নের কাছেই তিনি প্রণত হন না; কিন্তু সেইসব অভিঘাত-আন্দোলনকে স্পর্শ করেই তিনি পরিণত ও পরিস্ফুট হন। তাই যে-কোন সফল শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বে পরিভ্রমণের সময় আমরা তাঁর 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শুনতে পাই।

সৃজনশীল মানুষ যে-কোন সময়ের সাধারণ জনতার চেয়ে অধিকতর সংবেদনশীল বলেই তাঁর কালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে তিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সেই সক্রিয়তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। সাহিত্যস্রষ্টার চেতনার সদাজাগ্রত মাঠে কালপ্রবাহে যে ফসল ফলে, তাতে সময়ের চিহ্ন সর্বদাই যে সপ্রকাশ্য এমন নয়, কিন্তু ফসলের বুকের গভীরে তার অনুরণন অনিবার্য এবং অলঙ্ঘনীয়। প্রতিভাবান এবং যুগোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টারাও তাঁদের সৃষ্টিকর্মে দেশকাল ও যুগধর্মের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁদের সৃজনবিশ্বেও তার স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁদের কেউ-কেউ এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্যের অন্তর ও অবয়ব নির্মাণে দেশকাল ও যুগধর্ম কীভাবে অবদান রাখে সে-বিষয়ে আমরা কয়েকজন শিল্পস্রষ্টার মন্তব্য উপস্থাপন করছি :

Dhaka University Institutional Repository

ক. যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, একথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।...আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ, শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি, আমি তার থেকে কিছু যদি আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই। ...কবির কাব্যের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৪/৭৯২)

খ. বর্তমানই লেখকের উপজীব্য; ভবিষ্যতে যদি কোন আলো তিনি ফেলতে পারেন, সে-আলো বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিহত হ'য়েই; নিজের কালকে তিনি যদি ভালোরকম বুঝে থাকেন তা'হলেই তাঁর লেখায় হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ধরা পড়বে। শেষ বিচারে মানতেই হবে যে লেখকের ধর্মই সমকালীনতা। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ৮)

গ. সাহিত্য যেন একটি ফুলের গাছ। কোন এক বিশেষ বাগানের মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে গাছটি তার ফুলের সৌরভ বিস্তারিত করে দেয় সীমাহীন আকাশের দিকে। কিন্তু প্রাণরস সে আহরণ করে তার সেই বাগানের মাটি থেকেই। সাহিত্যের সৌরভও তেমনি সার্বজনীন, চিরকালীন এবং সীমাহীন; কিন্তু তারও প্রাণরস আসবে এক বিশেষ দেশ ও কালের মাটি থেকেই। এই 'মাটির' সঙ্গে যোগ না থাকলে সাহিত্য প্রাণহীন হতে বাধ্য। (মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ১৯৬৭ : ২৫)

ঘ. A poet is nothing if not sensitive to his environment : when he feels all round him the blood begining to circulate again and the heart beating more strongly, it will be strange if this does not communicate itself to his verse. (C. D. Lewis 1947 : 26)

আহসান হাবীব নিজেও কবিতায় সময় ও সমাজের উপস্থিতি-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, যার স্বাক্ষর তাঁর কবিতা এবং কবিতা-সম্পর্কিত নানা আলোচনায় লক্ষ করা যায়। 'সাধারণভাবে সমাজান্তর্গত মানুষই তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়। তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে তিনি অবলম্বন করেছেন কবিতা-রচনায়, অথচ লক্ষ্যযোগ্য, একই দৃষ্টিতে ও একই ভঙ্গিতে তিনি সর্বদা বিষয়ের পরিচর্যা করেননি।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ২১৫)। সমাজের মানুষকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন বলেই তাতে সমাজের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহেরও ছায়াপাত ঘটেছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজ ও ব্যক্তি একটি রেখায় এসে মিশেছে।' (১৯৮৮ : ১৯)। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন 'আমাদের সমাজে সমাজচেতনাসম্পন্ন কবির সংখ্যা কম। যে-ক'জন আছেন তাদের মধ্যে...আহসান হাবীব নাম করবার মতো।' (১৯৯৫ : ৪৭৪)। আহসান হাবীব সমাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি বলেই বোধকরি মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'আহসান হাবীবের সমাজচেতনা মোটের উপর শিল্পগত ব্যাপার', কিন্তু সমাজচেতনাকে শিল্পরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা-বিষয়েও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর সৃজনকর্মে অনুপস্থিত নয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নিজের কবিতা নিয়ে কথা বলতে স্বস্তি বোধ করতেন না আহসান হাবীব। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বা তাঁর কবিতা নিয়ে বিশেষ কোন আয়োজন বা আড়ম্বরে অস্বস্তিবোধ করতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে আনওয়ার আহমদ লিখেছেন, 'আমার প্রস্তাব ছিল– হাবীব ভাইকে নিয়ে আমি কবিতাপত্র, কিছুধ্বনির একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তাঁর একটাই কথা...আমার জীবদ্দশায় নয়, আমি যেদিন থাকব না, সেদিন যা খুশী কর, আমার বলার কিছু থাকবে না।' (১৯৮৭ : ২৯৮)। প্রচারবিমুখ আহসান হাবীব নিজের কবিতা নিয়ে খুব কম কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*-এর ভূমিকায় বর্ণিত মন্তব্যই গদ্যে লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে আমরা মনে করি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এর বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন 'বণ্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহাযুদ্ধের দায়' ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং 'উত্তরতিরিশ কবিতার সমাজ সচেতন অধ্যায়ে নিজের সংলগ্নতা' এভাবেই আবিষ্কার করেছেন তিনি। আহসান হাবীবের কবিতায় স্বকালের প্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্ন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার তীব্রতা তিনি অনুভব করেছেন কাব্যচর্চার সূচনা পর্বে। অতঃপর যে সকল সামাজিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তাঁর কাব্য প্রবাহের সময়কালে ঘটেছে

> তা হচ্ছে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি। (বিশ্বজিৎ চৌধুরী ১৩৯৮ : ৫৩)

প্রথম কাব্যগ্রন্থের যে বৈষয়িক পরিমণ্ডল, তা থেকে আহসান হাবীব কখনোই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হন নি। সময় ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের প্রকাশপ্রবণতায় যদিও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু যে কালখণ্ড ও সমাজকাঠামোয় নির্মিত হয়েছে তাঁর মানসভূগোল, সেই সময় এবং সমাজজীবনের অন্তর্গত অনুরণনকে কবিতায় ধারণ-প্রক্রিয়ায় তাঁর চেষ্টা ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। সময়ের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন নি তিনি। প্রবহমাণ সময়ের চরিত্র ও চলনে যে নতুনত্ব এসেছে, তার সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিষয় ও প্রকরণকলায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। নিচের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর সময়চেতনা ও সমাজসংলগ্নতার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

> আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, সময়ের এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি হার মানতে চাই না কখনো। আর সময় এগোতে এগোতে ভাষা থেকে কিছু কিছু ক্ষয়ে যাওয়া শব্দ ফেলে রেখে যায়, সামনে থেকে তুলে নেয় কিছু উজ্জ্বল নতুন শব্দ। ভাষা প্রকরণ থেকে কিছু পুরনো ভঙ্গি মুছে যেতে থাকে, গড়ে ওঠে কিছু তীক্ষ্ণতর নতুন ভঙ্গি। সময়ের সঙ্গে থেকে থেকে কবি যদি সময়ের শেষ সীমায় অবগাহন করেন পাঠককেও থাকতে হবে তার কাছাকাছি। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ৩৫০)

আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এর পর্যায় বিভাজনের মধ্যেই তাঁর কালসচেতন শিল্পচৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের রচনাকাল ১৯৩৮−১৯৪৬ এবং এই কালখণ্ডের চরিত্র বিষয়ে তাঁর মন্তব্য : 'বাংলা কবিতা যখন সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে', তার স্বাক্ষর এই কাব্যে উপস্থিত। এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস', 'পদক্ষেপ'− এই নামকরণের যৌক্তিকতা বিষয়ে কবির বক্তব্য :

> যে আবেগ থেকে এর 'প্রহর' পর্যায় উৎসারিত তাকে অতিক্রম করে, ইতিহাসের অগ্রগমন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসবিমুখ শ্রান্তি থেকে তাই 'প্রান্তিক' পর্যায়ের দ্বিধান্বিত স্বাক্ষর। কিন্তু সমাজ মানসে ইতিহাস-চেতনার ব্যাপ্তি ব্যক্তিমানসে নতুন ইতিহাস যোজনায় অক্ষম নয়। আর ঐতিহাসিক অভিঘাত শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতায়ও নতুন আলোকসম্পাতে সক্ষম। এই বিশ্বাস আর এই অনুভবই 'প্রতিভাস' পর্যায়ের ক্রান্তিকালে 'পদক্ষেপ'-এর সূচনা করেছে শিল্পীমানসে। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ৩)

সময় ও সমাজের সঙ্গে কবির এই সম্পৃক্ততার স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হলেও তা কাব্যের শৈল্পিক অবয়বকে প্রতিহত করতে পারে নি। 'কবিতাকে রাজনৈতিক বক্তৃতা করে তোলার পক্ষপাতী' তিনি নন 'বরং কবিতা হোক রাজনৈতিক মঞ্চের বিশুদ্ধ প্রেরণা'− এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন তিনি। 'দিনগুলি মোর' কবিতায় যখন 'যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত', তখন তাঁর অন্ধ চোখ আলোকিত দিনের কামনায় ঊর্ধ্বে তাকিয়ে থেকেছে এবং তাঁর চৈতন্যের অশ্ব পথ চলতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। দুঃসহ দিনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু শর-খাওয়া হরিণ শিশুর আর্তনাদের মধ্যে মুক্তির প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশাও জাগিয়ে রেখেছেন :

> দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,
> চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন!
> দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে
> শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ। ('দিনগুলি মোর'/*রাত্রিশেষ*)

'এই মন− এ মৃত্তিকা' কবিতায় বিপন্ন সময় ও বিদীর্ণ সমাজের দীর্ঘশ্বাসই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। এখানে আলোকিত দিনের পলায়নবার্তা ঘোষিত হলেও 'আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া' কবির আশা জাগানিয়া উচ্চারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 'দিন এলো আর দিন গেলো তার চিরচেনা পথ ধরে,/অনেক সূর্য আর বহু মেঘ সেই পথে গেলো ঝ'রে' ('এই মন− এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)− এই চরণদ্বয়ে চলমান সময়ের পায়ের শব্দ যেমন শোনা যায়, তেমনি তার পায়ের চিহ্নও এতে ধরা পড়েছে। 'আজকের কবিতা'য় সময়ের উপস্থিতি প্রবল এবং সমাজদেহের ক্ষতস্থানগুলোও

কবির কথার আড়ালে হারিয়ে যায় নি। যে বিপ্লবযুগের ছবি এঁকেছেন কবি, সেখানে বিপ্লবের মুখ কীভাবে মুখোশের মধ্যে মিলিয়ে যায়, সেই কথাও বলেছেন :

তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক–
গানের পাখিরা নাম সই করে নীচ লিখে দেয় রাজনীতিক
থাকতে কি চাও নির্বিরোধ?
রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক। ('আজকের কবিতা'/*রাত্রিশেষ*)

এই কবিতায় চল্লিশের প্রগতি-কবিতার অনুরণন স্পষ্ট। সৌখিন রাজনীতির ডামাডোল সমাজ-পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখবে না– এই উপলব্ধি কবির রাজনৈতিক বিবেচনাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনের ছায়াপাত কবির স্বকালমগ্নতারই স্বাক্ষর বহন করে।

'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' কবিতার পোশাকটি প্রেমের হলেও কবি এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই দগ্ধদিনের দুঃসহ স্মৃতি। যুদ্ধের দিনগুলিতে নিম্নবর্গের মানুষকেই বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কবি এই কবিতায় সেই শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের কথাই ভালোবাসার আবহে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। "শুধু সমাজ-সম্পৃক্তি নয়, সমাজের নীচের তলার মানুষও তাঁর কাব্যে এসেছে, যেন কবি অঙ্গীকারাবদ্ধ সমাজের মানুষের প্রতি, তাদের জীবন ও জীবন-যাপনের প্রতি। 'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' কবিতায় আমরা সেইসব মানুষদের পাই।" (তুষার দাশ ১৯৮৫ : ৯)। এই কবিতার নায়ক তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে খেতে যাবে সস্তা দামের ছকু মিয়ার হোটেলে এবং খাবার শেষ করে ছেলেটি ফিরবে 'তিন নম্বর বস্তির হাবু মিয়ার বস্তি'তে। কবির মানসভ্রমণ কখনোই সময় ও সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই প্রেমের কবিতায় নায়কের দুর্দশার কথাও তিনি বলতে ভোলেন না।

'কনফেশান' কবিতায় হাবীব মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে তুলে ধরেছেন। 'আমাদের দুইমুখো মন'– এই উচ্চারণ চল্লিশের প্রগতি-কবিতার ধারাকেই মনে করিয়ে দেয় এবং সমাজসংলগ্ন কবির এই অনুভূতি তাঁর স্বকালের সমাজ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিততে আমাদের সামনে মেলে ধরে। 'দিনের সুর' এবং 'অপঘাত' কবিতার নামকরণের মধ্যেই সময়-সমাজের নানা চিহ্ন পরিস্ফুট।

'প্রান্তিক' পর্যায়ের কবিতায়ও কবি সময়কে নানাভাবে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতায় যেন 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'–এই রবীন্দ্র-অনুভবেরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন কবি। কবি দেখেছেন 'লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ আঁখির প্রসাদ/অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।' কবি কায়কোবাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত 'অস্তপারের আকাশকে' কবিতায় ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গে আহসান হাবীব তাঁর স্বকালকে চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাস মানুষকে বারবার সতর্ক করে দিলেও ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়ার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে সেই কথা বলেছেন কবি। কবির ভাবলোকে 'যে অবিনশ্বর ইতিহাস কথা কইছে' তাতে কর্ণপাত না করার বিপদ সম্পর্কে তিনি সচেতন। অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসের কাছে কবি তাঁর অহঙ্কারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেছেন এবং 'উদয়-তোরণের নতুন সূর্য' যে বার্তা বয়ে আনে তাকে প্রণতি জানানোর কথা বলেছেন। 'সেতু-শতক' কবিতায় যুদ্ধবাজ পরাশক্তির বিমানবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কবির উচ্চারণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই হিংস্রতার কারণেই কবির 'নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার'। পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে সন্নিহিত করে যুগে যুগে যুদ্ধ কীভাবে মানুষের ঘুম হরণ করে নিয়েছে, কবি সেই ছবি এঁকেছেন :

দুই শতাব্দী ঘুম কোন্ দস্যু করেছে হরণ!
কলঙ্কের কালিমায় কোন দস্যু হেনেছে মরণ!
সেই মৃত্যু দ্বারে দ্বারে হেনে যায় অশান্ত আঘাত,
আমার মৃত্যুরে দাও জীবনের তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত! ('সেতু-শতক'/*রাত্রিশেষ*)

'প্রতিভাস' পর্যায়ে কবির সময় ও সমাজ-নিরীক্ষা আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ রূপে ধরা দিয়েছে। 'সৈনিক' কবিতায় কবির অভিজ্ঞান বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। সেই দুর্দিনে কবি সবাইকে সৈনিক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা নয়, জীবনযুদ্ধের নির্মমতাই সেখানে প্রধানরূপে প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত ফজলুল হক সৈকতের একটি মন্তব্য স্মরণীয় :

> এ দুর্বিষহ জীবন-যাপন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের তন্ত্রীতে চেতনায় যে প্রবল অনুভূতির স্বাক্ষর এঁকেছে তাই চিত্রিত হয়েছে আহসান হাবীবের কবিতায়। সমাজের সঙ্গে, সমাজের মানুষের সঙ্গে, সামাজিক বোধের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক এবং এ সম্পর্ক আজন্ম লালিত। কবিতায় তাঁর সামাজিক অনুভূতি এসেছে সচেতনতার প্রচ্ছন্ন মায়ায় আবদ্ধ হয়ে। সামাজিক সংকটে জীবনের গাতায়াতকে তিনি যুদ্ধ ভেবেছেন। (২০০২ : ৩২)

যারা প্রতিনিয়ত সঙিন উদ্যত রেখে মানুষকে ভয় দেখায় তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নির্বেদ মানুষের যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে কবির অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে এই কবিতায়। দুর্দিনের থাবা থেকে বাঁচাতে গৃহিণীরা তাঁদের প্রিয়মানুষদের 'দুগ্ধপোষ্য শিশুসম' লুকিয়ে রাখে, কিন্তু বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে তাদের দাঁড়াতেই হয় 'কিউ'য়েতে :

> মাসান্তের মাসোহারা অর্ধেক বিলিয়ে দেই
> একটি বস্ত্রের বিনিময়ে,
> কলম-কাগজ কেনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে
> খোকাদের যেতে দেই ব'য়ে!
> বিনয়ী মেষের মত সন্ধ্যাবেলা একে একে
> সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।
> 'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে (রোমান্টিক নাম বটে)
> আমরা কিউ' হয়ে যাই! ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

'একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ' কবিতায় আহসান হাবীব স্মৃতির ভেতর দিয়ে পল্লি-প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সেখানে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনজীবনের ছবিই ধরা পড়েছে। তাই সেখানেও 'শূন্য মাঠ/চলে না পথিক,/প্রেতের ডানার তলে,/দুঃস্বপ্নে দীর্ঘ রাত কাটে।' ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)। যুদ্ধের পরিণতি হিসেবে আসে দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয় 'শতাব্দীর গ'ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম'। 'হাসি' কবিতায় যুদ্ধবাজ মানুষের হাসির নির্লজ্জ ও কুৎসিত দিকটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। তাই সেই হাসি কবিকে 'তীক্ষ্ণ চাবুক মারে' এবং সেই সঙ্গে 'আরো অনেককে'। 'কয়েদী' কবিতায়ও বিপন্ন দিনের ছবি স্পষ্ট, তবে এই কবিতায় কবি উত্তরণ-প্রত্যাশায় উদ্দীপিত হয়েছেন : 'আছে সেই অনাগত দিন/হাতে আছে সেই সূর্য-পরিক্রমা স্বপ্ন রঙিন।' বিপন্ন সময়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মানে তো নিজের চারদিকে কয়েদখানা রচনা করা। কবি এই কয়েদখানা ভেঙে মানুষকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান।

'পদক্ষেপ' পর্যায়ের কবিতায় আহসান হাবীবের আশাবাদী উচ্চারণ আরো তীক্ষ্ণতর হয়েছে। 'ঝরা পলাশ' কবিতায় পরাশক্তির 'নির্লজ্জ হৃদয়ে' যখন 'বাসনার সোনা' ছায়া ফেলেছে, তখন কবির 'নতুন বাসার আশা তবু চিত্তে করে আনাগোনা'। তাই কবি ইতিহাসের পরম্পরা থেকে শিক্ষা নিয়ে 'ইস্পাত-কঠিন এক দিন রচনার' স্বপ্ন দেখেছেন। "নৈরাশ্য, হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, একাকীত্ব, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রূপ দিতে দিতে কবি এই 'পদক্ষেপ; পর্যায়ে এসে রীতিমতো ধনাত্মক (positive) ও আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।" (তুষার দাশ ১৯৮৫ : ১২)। তাই তিনি মানুষকে দুঃখের দীর্ঘ নদীতে নিয়ে গেছেন এবং আত্মপ্রত্যয়ী মাঝির মতো তাদের মনে তীরের প্রত্যাশা জাগিয়ে রেখেছেন। সময়ের কাছে নতজানু না হওয়ার এই অভিজ্ঞতাও সেই বৈরী সময়ের কাছ থেকেই লাভ করেছেন কবি। সময়-সমাজ-রাজনীতির অবক্ষয়ী দৃশ্যের পাশেই কবি সাজিয়ে রাখেন জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রত্যয়ী উচ্চারণ :

> ক. সে আগুন ধূমায়িত পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড তলে!
> এ আগুন আসে যায় পরিচিত পথে
> মধ্যদিনে এ আগুন দেখা দেয় এই রাজপথে,

এই চেনা আগুনের পুরনো ছায়ায়
আরেক আগুন এসে আশা রেখে যায়! ('আগুন'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আজ হতে
দুর্বহ পাপের বোঝা দিনে দিনে লঘু করিবার
প্রতিজ্ঞা আমার! ('স্বাক্ষর'/*রাত্রিশেষ*)

গ. এই মৃত্যু পথে পথে রেখে যায় মৃত্যুহীন নাম,
এই মৃত্যু রেখে যায় মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রাম
সংঘবদ্ধ জীবনের। ('মৃত্যু'/*রাত্রিশেষ*)

'রেড রোডে রাত্রিশেষ' কবিতাটিতেই আহসান হাবীবের উত্তরণ-উন্মুখ অভিজ্ঞান স্ফটিকসংহতি লাভ করেছে বলা যায়। পুরো কাব্যের মৌল প্রবণতাকে তিনি এই কবিতায় সূত্রাবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিকলাঙ্গ সময়ের গর্ভজাত অন্ধকারকে দু'হাতে সরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাকুল বাসনাই এই কবিতার মর্মে গেঁথে দিয়েছেন কবি। 'রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে', কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় *কাল মধুমাস* কাব্যের 'এদিকে' কবিতায় যেমন বলেন, 'ভোর হবে। তাই অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় ॥'(২০০৩ : ২/১৩১), তেমনি আহসান হাবীবও উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেছেন। আহসান হাবীবের 'এ প্রতিজ্ঞা অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর মুখ দেখার প্রতিজ্ঞা, আলোহীন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে অবাধ, উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার আরেক নাম। (তারেক রেজা : ২০০৯ : ১৭)। তাই কবি লক্ষ করেন, 'রেড্ রোডের দু'পাশে/তীক্ষ্ণ চোখ জ্বালিয়ে/অন্ধকার শয়তানের পাহারা' এখন মুমূর্ষু রুগির মতোই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মানবসভ্যতার শত্রু পরধনলোভী শয়তানের চেহারায় এতো দিনের যত্নে গড়া যে লাবণ্য, তাতে ফাটল দেখতে পান কবি, আর 'তার ফাটলে বুঝি শেষ রাত্রির কান্না'। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ,
যারা পার ক'রে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
নিরাপত্তার পাল তুলে!
এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো–
পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড্ রোডের প্রান্তে
কেন না
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য। ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

এই নতুন সূর্যের জন্য এদেশের নিরন্ন মানুষকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবি তাদের ত্যাগের মহিমা এই কবিতায় ধারণ করেছেন। যে কোন মহৎ অর্জনের জন্যই মানুষকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে মানুষ একসময় চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। তাই কবি সেই মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, যারা বিরুদ্ধ সময়কে প্রতিহত করে কাঙ্ক্ষিত দিনের দিকে ধাবিত হতে পারে। কবিতাটি সম্পর্কে হোসেন উদ্দিন হোসেনের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> যে রাত্রি পাহাড়ের মতো অটল, অবিচল অর্থাৎ জাতীয় জীবনে যে পরাধীনতার অটল অন্ধকার, নিপীড়িত জাতিসত্তা শতাব্দীকালের অন্তহীন নাগপাশে আবদ্ধ, সেই পরাধীন জাতীয় জীবনের অন্ধকারময় অধ্যায়ের পতন ঘটেছে। আশাবাদী কবি মুক্তির আলোকময় দিগন্তের আভাস মনে মনে উপলব্ধি করেছেন এখানে। বিভাগপূর্ব ভারতের জনজীবনের মুখর স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিময় প্রাণপ্রবাহের উচ্ছলতা কবির অন্তরে যে প্রেরণা জুগিয়েছিলো, এই কবিতা তারই ফলশ্রুতি। (১৯৯৪ : ১২)

রাত্রিশেষ কাব্যে আহসান হাবীব তীব্রভাবে স্বকালমগ্ন। রফিকুল ইসলাম (১৯৭১) *আধুনিক কবিতা*-র ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, "যে আবেগ থেকে আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষে'র অনেকগুলি কবিতা উৎসারিত তা হলো সমাজ সম্পৃক্তি বোধ, ত্রিশোত্তর কবিতার যা একটি প্রধান ধারা।" অস্থির সময়ের বিপন্ন বাস্তবতাকে তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের অন্তর্গত অসুখের বয়ান কাব্যিক অবয়বেই আহসান হাবীবের কবিতায় উপস্থাপিত। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে স্বার্থমগ্ন মানুষের ভূমিকা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের প্রয়োজনে সুবিধাবাদী মানুষ কীভাবে নিজেদের রঙ বদলে নিয়ে ক্ষমতার নিকটবর্তী হয়, সেই দৃশ্যও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়।

আহসান হাবীব *ছায়া হরিণ* কাব্যেও বিকলাঙ্গ সময়ের বিক্ষুব্ধ মানসতাকে কবিতায় ধারণ করেছেন। সময়ের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর শিল্পের আয়ুধ। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলি ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কালখণ্ডে রচিত। 'সমসাময়িক যুগ ও যুগযন্ত্রণার বিষাক্ত ছোবলের চিহ্ন'যুক্ত *ছায়া হরিণে*র বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> এই কবিতাগুলি সেইসময়ের রচনা যখন সুকুমার মূল্যবোধের উপর রক্তাক্ত হাত রেখেছে বণিক সভ্যতা। অবক্ষয়ে, ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, জোতদারের শোষণে, ক্লেদে ও কদর্যতায় সমাজ ছিল আবিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ও নবতর স্বাধীনতার পর নানাবিধ জটিলতা, কাব্যচেতনায় স্বাক্ষর রেখেছিল– এ কাব্যের কবিতাগুলো সেই অস্থির সময়ের জীবনভাষ্য। (দিলারা হাফিজ ২০০২ : ৩৪)

বর্তমানের অসুস্থ সমাজ-প্রতিবেশ তাঁকে আহত করেছে বলেই তিনি বারবার ফিরে গেছেন সমৃদ্ধ অতীতের কাছে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'ভাঙাচোরা দেয়ালের স্তূপাকার পুরনো ইঁটের/ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের।' ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)। এই ভাঙাচোরা যন্ত্রণার জঞ্জাল সরিয়ে তিনি নতুন নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। সময়ের কাছ থেকে নানা বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে 'প্রেমে ও সংগ্রামে' জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চান কবি। বর্তমানকে রূপায়ণের প্রয়োজনেই তিনি ঐতিহ্যের শরণ নেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলে সময় মানুষকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দেয় না। সময়কে বুঝতে হয় এবং সময়ের গভীরে ডুব দিয়েই খুঁজে নিতে হয় শিল্পের নানা অনুষঙ্গ :

> কুড়িয়ে যা পাই
> তাই নিয়ে নিত্য নব জীবন বানাই।
> সামান্য যা পাই তাই অসামান্য আবেগে অশেষ
> তার সাথে জীবনের শ্রান্তিহীন এই পরিবেশ
> রৌদ্রদগ্ধ দিন আর অরণ্যের ছায়ার প্রসাদ
> রাত্রির আকাশ ঘিরে জেগে থাকে চাঁদ;
> আশা জাগে ভাষা পাই মনে পাই গভীর আশ্বাস।
> লিখি ইতিহাস
> আগামী দিনের এক পৃথিবী প্রাচুর্যের গান। ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)

'ক্রান্তিকাল' কবিতায় আহসান হাবীব যুদ্ধবিধ্বস্ত সময় ও সমাজের ক্ষত ও ক্ষরণ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি যখন মধ্যরাতে রাজপথে পরিত্যক্ত নারীদেহ আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর মনে হয়, এই নারীই একদিন এই পৃথিবীর নায়িকা ছিল। বণিক-সভ্যতা কীভাবে মানুষকে পণ্যে পরিণত করে, কীভাবে নারীদেহের লাবণ্যকে টাকার বিনিময়ে অধিকার করে নেয় এবং প্রয়োজন শেষে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, সেই ছবিই এই কবিতায় বিধৃত। কবি যখন বলেন, 'একদিন এই নারী ইতিহাস-বিন্যাসের ভার/নিয়েছিল নিজ দেহে,/পৃথিবীর সঙ্গীত-সভার/যে নারী সম্রাজ্ঞী ছিলো/অন্ধকার রাত্রির প্রহরে/আজ দেখি সেই নারী রাজপথে আর্তনাদ করে।' ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)– তখন অসুস্থ সময়ের বিকৃত মানুষের মিছিলই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। লোভ-লালসায় পরিকীর্ণ পৃথিবীর ছবি এই কবিতায় ধরা পড়েছে। হাবীব যে পৃথিবীর কথা বলছেন, সেখানে মানুষ মানুষের জন্য নয়; আত্মস্বার্থ ও বিলাসী জীবনযাপনের জন্য মানুষ বন্য

হয়ে উঠেছে। এই অন্ধকার পৃথিবীর ভ্রষ্ট মানুষগুলোই শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন ও জীবিকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বাস্তবতাকে কবি এক বিপন্ন নারীর রূপকল্পে তুলে ধরেছেন :

লালসার পাশব লুণ্ঠন
ঘটে গেছে। অতঃপর এই নারী খুলেছে গুণ্ঠন
জনহীন রাজপথে অন্ধকারে ক্লান্ত দুই হাতে
আর তার সাথে
সভ্যতা-নারীর হাটে দেখি শত আকুঞ্চিত ভাল
ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল। ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

'ইতিহাস-বিন্যাসের পথে' কবিতায় আহসান হাবীব আঠারোশো সাতান্নর ঝড়ের কথা বলেছেন এবং সেই ঝড়ে মানুষ ও ঘরবাড়ি, অরণ্য ও পশুপাখির বিপন্নতার ছবি এঁকেছেন। এই ঝড়ের আবহে তিনি তুলে ধরেন তাঁর সময়ের জনমানুষের জীবনের দুর্দশার ছবি। 'চরিতাখ্যান : নববর্ষ' কবিতায়ও নববর্ষের নানা উদ্‌যাপনের পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেন মানুষের দুর্দশার চিত্র। এই কবিতায়ও আমরা একজন নারীর মুখ দেখতে পাই, যার দেহ মৃত্যুর মতন শীতল : 'কুৎসিত কর্কশ তার নগ্ন হাত/মুখে তার মরীচিকা-রঙ/কোনো এক মায়াবিনী নারীর মুখের,/বুকে তার মরুতৃষ্ণা?' এই মরুতৃষ্ণা এখানে নারীর কামনা-বাসনার প্রতিরূপ নয়, বরং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের প্রতীক। তাই যখন কবির 'দুয়ারে প্রশ্নের ঢেউ ভেঙে পড়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে', তখন কবি সময়ের বহমানতার দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন, সময় চলে গেলেও রেখে যায় 'বৎসরের প্রান্তে কিছু কথা আর গান'। কে কবে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারই হিসেব মেলাতে চান কবি। অপেক্ষার ইস্পাত-কঠিন দিনের সৌরভ কবির চোখে ধরা পড়ে এইভাবে : 'আর সেই দিনের মহিমা/মহত্তর বাণী তার, রাত্রিদিন পীড়নের সীমা/পথে ও প্রান্তরে আজো ব্যাপ্ত করে।' তিনি অঙ্কন করেন নববর্ষের নানা আয়োজনের অসারতা এবং লক্ষ করেন, ধূসর জীবনের দুর্বহ বোঝা কাঁধে নিয়ে 'কে যায় কে আসে'। এই আসা-যাওয়ার পথের ধারে বসেই আহসান হাবীব বিপন্ন মানুষের মর্মঘাতি বেদনার চলচ্ছবি দেখেন।

'হক নাম ভরসা' আহসান হাবীবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেখানে চিঠির আদলে কবি সাধারণ মানুষের দুঃসহ দিনের ছবি এঁকেছেন। হুজুরের কাছে কবির যে নিবেদন এই কবিতায় বিধৃত, তাতে শ্রমশোষণের ছবি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কীভাবে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করছে, কবি সেই কাহিনি বয়ান করেছেন। পত্রলেখক জীবনের সাতান্নটি বছর যে মাটিতে কাটিয়েছেন, যে মাটির সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক সেই মাটির সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। ক্ষুধার রাজ্যে যে পৃথিবী কঠিন কর্কশ গদ্যময় হয়ে ওঠে, সেই পৃথিবীতে যন্ত্রণাকাতর মানুষের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মতো পাশবিক প্রবণতায় ক্ষুব্ধ কবি বলছেন, জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের মাধ্যমে জমিদারের সঙ্গেও সব হিসেব চুকে গেছে। আহসান হাবীবের ভাষায় :

যখন সব চুকিয়ে দিয়ে এসেছি, তখন
আর কি কারণ
ভয় করে কথা কই
আমি তো এখন আপনার প্রজা নই,
আর ত আপনার মাখা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

কেবল হতাশা ও জীর্ণ জীবনের কথাই বলেন নি কবি, এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। এই কবিতাটি সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য : "তাঁর কবিতার মহম্মদ তালেবালি কথা বলে সাফ সাফ, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের পরে 'হক নাম ভরসা' করে জমিদারকে সে জানিয়ে দেয় 'আপনার মাখা তামাক খাই না/নিজে খাই কোথাও যাই না' তবে ভয়টা কিসের? এ কথাটা কবিও বলেন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভঙ্গিতে।" (১৯৮৭ : ৬৭)। প্রলেতারিয়েতের নিজের জীবন ছাড়া হারানোর কিছু নেই বলেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা বলেন তিনি। পুরনো লাঙল আর কাস্তে শানিয়ে নিয়ে 'আবার জিগরফাটা রক্ত দিয়ে লাল' নিশান বানানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

'আমাদের জিন্দিগীর শান কেড়ে' নেয়ার মতলব করে যারা, তাদের গর্দান কাটার উপযুক্ত ঢাল তলোয়ার প্রস্তুত করেন কবি : 'এখন/ আমরা, কজন,/পুরনো মরাই কাটা সারাবো এবং/পুরনো লাঙল এনে দিতে হবে রঙ/সং সেজে বসে থাকা সাজে না, কারণ বেলাশেষ।' ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষের ছবি সংবলিত 'তেরশ' একান্ন সাল, বারোই আষাঢ়' তারিখে লেখা এই পত্রের লেখক আমানীর পাড়ের মহম্মদ তালেবালি। এই কবিতাটিকে সামনে রেখে কবির 'ছহি জঙ্গেনামা' কবিতাটি পাঠ করা যেতে পারে। এখানেও পুথির আদলে কবি যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের কথা বলেছেন।

'পুনর্বাসন' কবিতায়ও চিত্রিত হয়েছে সময় ও সমাজের ভেতরের ভাঙাচোরা অবস্থা। তবে এই কবিতায় মানুষের জীবনের দুর্দশা থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন কবি। তিনি উপলব্ধি করেন, 'বহু লক্ষ অন্ধকার রাতকে পেরিয়ে/ নাইলের প্রান্তরে এসে ভোর হলো।/ মনে হলো সকালের সূর্যের সোনায়/ আরেকটি অপরূপ রঙ্ লেগে আছে।' ('পুনর্বাসন'/*ছায়া হরিণ*)। নীড় হারা মানুষের এই বিপন্ন বাস্তবতার কারণ চিহ্নিত করেছেন কবি : 'আমাদের বহু নীড় লালসার বে-আইনী হানায়/জ্বলে গেছে! আমরা উদ্বাস্তু তাই।' পুরনো পৃথিবীর জীর্ণতা মুছে নিয়ে কবি নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা' কবিতায় আহসান হাবীবের মানসপ্রবণতার মৌল প্রবণতা সংহত রূপ পেয়েছে। এখানে সময়-সমাজ-রাজনীতি সবকিছুই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কবি বলছেন 'যুদ্ধ-হত্যা লুণ্ঠনের উল্লাসের মুখে/যে পৃথিবী শঙ্কায় আকুল;/আমি সেই পৃথিবীর সতর্ক সন্তান।' ('প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা'/*ছায়া হরিণ*)। তিনি তাঁর কবিতাকে বিপন্ন পৃথিবীতে শান্তির দূত হিসেবে পাঠাতে চান। বণিক সভ্যতার বীভৎস রূপটি এই কবিতায় তুলে এনেছেন কবি। 'কুৎসিত কুটিল কামনার' বিষে নীল হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে বসে কবি আত্মমগ্ন প্রেমের কবিতা লিখতে চান নি। তিনি তাঁর কবিতাকে 'সংগ্রামের অজেয় বিষাণ' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। নারী, নারীর হৃদয়, প্রেম, শান্তি এবং 'পৃথিবীর শান্তিহারা মানুষের নামে' কবির এই শপথ কবিতাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। 'যৌবনে জীবনে তুমি', 'পারাপার', 'অন্যদিন', 'শুক্লপক্ষের গান' ইত্যাদি কবিতায়ও কবির স্বকালকে আমরা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হতে দেখি। সমাজের অন্তর্গত অসুস্থতা ও অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কবি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রত্যয়ের প্রকাশও এখানে লক্ষ করা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্টার রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলেন নি, কিন্তু অসাম্যের কদর্য রূপটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

আহসান হাবীব *ছায়া হরিণ* কাব্যে বিপন্ন মানুষের ছবি আঁকলেও সুন্দর ও আলোকিত দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই 'এমন মানুষ যার নিবিড় যোগ রয়েছে দেশকালের সঙ্গে, সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে প্রতিনিয়ত আপন অস্তিত্ব রক্ষায় উন্মুখ। এই অস্তিত্বের বোধে মানবিক অনুষঙ্গ আর দেশচেতনার কথা তাই খুব সহজেই চলে আসে তাঁর কবিতায়। সেই সঙ্গে তিনি উপজীব্য করে তোলেন সেই আধুনিক মানুষকে যে মৌলিক অর্থেই উৎকেন্দ্রিক, নিজের প্রকৃত অবস্থান থেকে উন্মুলিত।' (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৩ : ২৭৩)। হাবীবের কবিতায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণের যে প্রত্যয় উচ্চারিত হয় তা দিনবদলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অভপ্রায় থেকে উৎসারিত।

ছায়া হরিণ কাব্যে চল্লিশের কবিতার সমাজসংশ্লিষ্ট ধারার প্রভাব স্পষ্ট। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলা এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় এখানে কাব্যিক অবয়বে উপস্থাপিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি কখনো কখনো পুঁজিপতি-মহাজন-জমিদারদের বিমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন উচ্চস্বরে। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও কবির সময়-সমাজ-রাজনীতি সচেতনতারই পরিচয় বহন করে, কারণ তাঁর স্বকালের কবিরা এভাবেই কবিতায় মানুষের মর্মবেদনাকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং কবিতাকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সারা দুপুর কাব্যেও আহসান হাবীব সময় ও সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থেকেছেন। এই কাব্য সম্পর্কে মধুসূদন চক্রবর্তী (১৯৮২) মন্তব্য করেছেন যে, জীবনকে যেমন তিনি বুঝতে চেয়েছেন তেমনি তার সংগ্রামকে উপলব্ধি করেছেন তিনি, সংগ্রামের বিভিন্নতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার স্বাক্ষর স্পষ্ট বলেই তা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সপ্রতিভ থেকেছেন। এই বিবেচনায় হাবীবের কবিতায় সমাজ-সম্পৃক্ততার ধারা বহমানই থেকেছে বলেই উল্লেখ করেছেন মধুসূদন। শোষণ ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের কষ্টের কথা এই কাব্যেও নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় প্রাচীন গ্রীক ধনাঢ্য ব্যক্তি মিডাসকে সামনে রেখে আহসান হাবীব মানুষের অর্থলোলুপতার ভয়াবহতাকে চিত্রিত করেছেন। ধনের দেবতা বাক্কাসের অনুগ্রহে মিডাস যা স্পর্শ করে তাই স্বর্ণ হয়ে যায়। এই অর্থলোলুপ মিডাস তার পুত্র-কন্যাকেও স্পর্শের মাধ্যমে স্বর্ণে পরিণত করে। 'এই পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করে আহসান হাবীব ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সর্বগ্রাসী চিত্র তুলে ধরেছেন।' (তারেক রেজা ২০০৯ : ২৯)। 'এসো সঙ্গী হই' কবিতায় অসুস্থ সময়ে অসহায় মানুষের আর্তনাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই অসুস্থতাই শেষ কথা নয় বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন হাবীব। তাই তিনি সকলের বাসনাকে নতুন দিগন্তে চিত্রিত করার কথা বলেন 'যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই/সবার ইচ্ছের অনুরূপ'। 'নতুন কবিতা'য়ও এই উত্তরণের প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন কবি। তিনি ভালোবাসাকে দুঃসময়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন :

> একতাল নরম মাংসপিণ্ড যদি
> ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে হাওয়ার নখরে
> আর তার অবোধ আর্তনাদ
> যদি ভেঙে দেয়
> পুরনো কবিতার ছন্দ
> সে মুহূর্তে তাকে তোমার ভালোবাসাই করুক জয় ('নতুন কবিতা'/*সারা দুপুর*)

সময় কীভাবে কবিতার প্রকরণকলায়ও পরিবর্তন সূচিত করে আহসান হাবীব এই কবিতায় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'তারা দু'জন' শীর্ষক কবিতায়ও হাবীব সময় ও সমাজের অন্তর্গত ভাঙাগড়া কাব্যদেহে পরিবর্তন আনে বলে উল্লেখ করেছেন। 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান' কবিতার নামকরণের মধ্যেই রয়েছে নতুন দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। 'এই ঝড়ে অন্ধকারে' কবিতাটিকে ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরি' কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়। আহসান হাবীব ঝড়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে 'এ মাটির অকৃত্রিম সন্তান'কে মানুষের কাছাকাছি থাকার কথা বলেছেন। এই কবিতার তুমি মাঝি না নৌকার যাত্রী তা স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এমন একজন মানুষকেই চিত্রিত করেছেন কবি। কিংবা বলা যায়, কবি নিজের সঙ্গেই কথোপকথনের মাধ্যমে নিজের অন্তর্গত শক্তিকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। আত্মবোধনের এই উচ্চারণ পাঠককে আলোকিত দিনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নিচের উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করা যাক :

> তুমি যদি ভেসে যাও, অস্তিত্ব আমার
> তবে কোন্ আশ্বাসের মৃত্তিকায় ভর দিয়ে দাঁড়াবে, আত্মার
> এ শিখায় বলো কার পরিচর্যা প্রেমের প্রাণের
> আমাকে নতুন কোনো বাসভূমি নতুন মাটিতে
> রচনার ইঙ্গিতে নতুন এবং প্রখর কোনো
> প্রতিভার স্পর্শ দেবে বলো? ('এই ঝড়ে অন্ধকারে'/*সারা দুপুর*)

'শেষ সন্ধ্যা– প্রথম ঊষা' কবিতায় কবির সময়-সমাজভাবনা চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতায় কবি সময়ের সঙ্গেই কথা বলেছেন। সময়কে কিছুতেই থামানো যায় না, সে আপন গতিতে অগ্রসর হয়। মানুষ কেবল তার জীবনের সামান্য সময়টুকুতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার সাক্ষি হয়ে থাকে। এই এক জীবনেই সময় মানুষের কাছে নানাভাবে ধরা দেয়। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য এইসব যেন সময়েরই নানা বিভাজনের নাম। এই বিভাজিত সময়কে আমরা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে একটি অখণ্ড অবয়ব দিতে চাই এবং এই অখণ্ডতার শিল্পবিশ্ব নির্মাণের দোহাই দিয়ে

পৃথিবীর সমান বয়সী হয়ে উঠতে চাই। আহসান হাবীব যখন বলেন, 'তুমি কাল। অনন্ত কালের/সঙ্গী নই আমি, তবু তার সঙ্গীদের/সঙ্গীতসভায় নিত্য জেগে রবো/মুগ্ধপ্রাণ আমি।' ('শেষ সন্ধ্যা– প্রথম উষা'/*সারা দুপুর*)– তখন তাঁর শিল্পিসত্তার অমরতাই ঘোষিত হয়। 'মন বলে' কবিতায় কবি মিছিলকে বিচিত্র অবয়বে অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই মিছিল অস্থির সময়ের রূপকল্পে কবিকল্পনায় ধরা দিয়েছে। 'কান্না নেই', 'আশা রাখি মনে' কবিতায়ও কবি স্বকালের জীর্ণতা অতিক্রম করে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছেন।

'আলো-আঁধারের দর্শন' কবিতায় আহসান হাবীব প্রগতিপন্থী মানুষের সামনে এগিয়ে চলার প্রবল প্রত্যয়কে রক্ষনশীল মানসিকতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ যখন বলে 'আশা সে তো মরীচিকা', তখন আশাবাদী মানুষের উচ্চারণ, 'আশাই জীবন, জীবনের শ্রী'। কবি আশাবাদী তারুণ্যের কণ্ঠে শুনতে পান আলোর আবাহন বার্তা। কারণ তারা বিশ্বাস করে, আশায় ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত 'জীবনের দার্শনিক ভাষ্য'। কবি বলেছেন, যারা সামনে এগিযে যেতে ভয় পায় তাদের সামনে মৃত্যু অপেক্ষা করছে, আর যারা সময় ও সমাজের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হয় তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবনের হাতছানি :

> আমাদের মধ্যে একজনের গলা শোনা যায়–
> যে তার হাতের বইটি আরো শক্ত করে
> চেপে ধরেছে হাতের মুঠোয়
> সে বলে : ওদের চোখের দিকে যদি
> তাকাতে তোমরা পারতে–
> আলো ওদের চোখে,
> কি উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল তার শিখা।' ('আলো-আঁধারের দর্শন'/*সারা দুপুর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় বারবার আলোর প্রবেশ লক্ষ করি। আলোর পথযাত্রী হিসেবে তিনি অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলেন। 'সে আসে', 'তোমার জন্যে' এবং 'সূর্যসঙ্গ' কবিতায়ও এই আলোর পথযাত্রীদের আবাহন করেছেন কবি।

আহসান হাবীব *সারা দুপুর* কাব্যের একাধিক কবিতায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিষয় ও প্রকৌশলে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার কথা বলেছেন। সমাজ-সম্পৃক্তির ধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। মানুষের কথা বলতে গিয়েই তিনি মানুষের শেকড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তাদের জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গও সেইসঙ্গে বিবেচনায় এনেছেন কবি। সময় ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেহেতু অবিচ্ছেদ্য, সেহেতু হাবীবের কবিতায় মানুষের দুর্দশার বর্ণনায় আমরা সময় ও সমাজকে প্রবলভাবে উপস্থিত দেখতে পাই।

আশায় বসতি কাব্যে আহসান হাবীব আশাভঙ্গের কথাও শুনিয়েছেন। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হন নি তিনি। গ্রন্থভুক্ত কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে গ্রন্থের মুখবন্ধে কবি বলেছেন, 'দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই [কাব্যগ্রন্থের] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।' (১৯৯৫ : ১৪৫)। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ছায়াপাত এই গ্রন্থে স্পষ্ট। পূর্ববর্তী কবিতাসমূহের ধারাবাহিকতায় মানুষ এবং সমাজের চলমান সমস্যার দিকেও মনোযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছেন তিনি। তবে এই গ্রন্থের অনেক কবিতায় আমরা লক্ষ করব, একান্তভাবেই তাঁর আত্মকৃত অনুভবের অনুরণনকে তিনি কবিতা করে তুলছেন। নিজের দিকে ফিরে তাকানোর প্রবণতায় কবিতা শিল্পঋদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহুজনের কণ্ঠস্বরে যে সংঘচেতনার প্রকাশ ঘটে, তা অনেকাংশে এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। 'নৈঃশব্দে নিহিত আমি' কবিতার নামকরণেই আছে ব্যক্তিগত বিবরে ডুব দিয়ে নিজেকে নির্মাণ কিংবা আত্ম-অবলোকনের ইঙ্গিত। 'আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই' বলে এই গ্রন্থের যাত্রা শুরু হলেও সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আমরা অনেক কবিতায়ই লক্ষ করব। *আশায় বসতি*র আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা চিহ্নিত হতে পারে, তা হল স্মৃতিমগ্নতার আধিক্য। এই গ্রন্থের কবিতায় তিনি স্বকালের চেয়ে সেকালের দিকে অধিকতর পক্ষপাত দেখিয়েছেন মনে হয়। এই

সেকালে ফেরার মধ্যেই একালের অস্থিরতার নানা পরিচয় পরিস্ফুট। 'স্বগত' কবিতায় তিনি যে জানালা দরজা খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান, চোখের সামনের কালো পর্দা সরানোর কথা বলেন, সেখানেও সময়-সমাজ-রাজনীতি অনুপস্থিত নয়। 'দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূতটাকে' তিনি আর তাঁর দরোজায় দেখতে চান না, মুক্ত হাওয়ায় বসে রোদের আরশিতে মুখ দেখতে চান তিনি। এই মুক্ত হাওয়ার সঙ্গে সহজেই কবির স্বাধীন দেশের স্বপ্নকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। 'ভোরের বাগানের/সারা বুক জুড়ে/নতুন কারুকাজ' করা একটি স্বপ্নের নামই বোধকরি বাংলাদেশ। 'মিছিলে অনেক মুখ' কবিতায়ও মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের কথা বলেছেন কবি :

মিছিলের মুখ দেখো
দেখো তার সারা মুখে দেখো
দেশের আত্মার আভা;
দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ
আর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো। ('মিছিলে অনেক মুখ'/*আশায় বসতি*)

এই মিছিলের অন্যরূপ ধরা পড়েছে আহসান হাবীবের 'ডাক' শীর্ষক কবিতায়। কবি তাঁর চারপাশের মানুষের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেন, 'জাগ্রত মিছিল/এখন জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোলে,/সমুদ্রজোয়ারে প্রাণ সমর্পিত/বজ্রঝড়ে সমর্পিত বুক।' স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সবাই মিছিলে গেছে। এখানেও কবি দেখেছেন, মিছিলের সবার মুখে চিত্রিত দেশের চূর্ণ আভা জ্বলছে। 'আমাকে দাও' কবিতায় কবি 'ক্ষুধার অন্ধকার থেকে মুক্ত' হতে চাচ্ছেন। এই অন্ধকার, এই ক্ষুধাও পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের সুরভিসন্ধির কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'নাটক : পার্শ্বচরিত্র : নায়ক' শীর্ষক কবিতায় কবি যখন বলেন, 'আমরা নতুন কোনো নায়কের অপেক্ষায় আছি', তখন সেই নায়কের মুখচ্ছবিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। 'কাব্য-সভায়' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'সভায় ধ্বনিত হবে আলোকিত আত্মার কাকলি', তখনও আমরা মুক্তিকামী বাঙালির অন্তরের কথারই অনুরণন শুনতে পাই।

আশায় বসতি কাব্যে আহসান হাবীবের বক্তব্য অনেক বেশি পরোক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত মৃদু। সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে সচেতন-সংবেদনশীল কবিবৃন্দ দেশকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে রচিত কবিতায় ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এই সময়ের কবিতায় বক্তব্য উপস্থাপনে রূপকের আধিক্য যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি স্বদেশের মানুষের মুক্তির বাসনাকে রূপকথার আশ্রয়েও তুলে ধরেছেন কেউ কেউ। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতায় আহসান হাবীবের বক্তব্য ও প্রকরণে এসেছে নতুনত্বের ছোঁয়া। কিন্তু মানুষের মুক্তির প্রত্যয় থেকে সরে যান নি কবি। মানুষকে ধারণ করেন বলেই মানুষের পরিবেশ-প্রতিপার্শ্বও হাবীবের কবিতায় মুদ্রিত হয়ে যায়।

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যে আহসান হাবীবের স্মৃতিমগ্নতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পল্লি-প্রকৃতির কোলে রেখে আসা শৈশবকে নেড়েচেড়ে দেখার জন্য তিনি বারবার ফিরে গেছেন মাটির টানে। এই টানের মধ্যদিয়েই তাঁর স্বদেশভাবনার নানা পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। এই কাব্যের সময় ও সমাজভাবনাকে আমরা তাই কবির স্বদেশভাবনারই অন্যরূপ হিসেবে দেখতে চাই। 'দোহাই তোমার' কবিতায় বৃক্ষনিধনের যে কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে স্বার্থান্বেষী মহলের স্বদেশের সৌন্দর্য হননের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে পাঠ করা যায়। বৃক্ষ যেভাবে ফুলে-ফলে মানুষকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি ছায়া দিয়ে মানুষের ক্লান্তি দূর করতে অবদান রাখে। জন্মভূমিও মানুষকে মায়ের স্নেহে লালন করে। তাই এই দুর্গত বৃক্ষের মধ্যে আমরা স্বদেশের ছবি ফুটে উঠতে দেখি।

আহসান হাবীব 'সার্চ' শীর্ষক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে একজন কিশোরের অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনা সদস্যদের চোখের সামনে সদম্ভে হেঁটে চলা এক কিশোরের মনের শক্তিকে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি। মানুষের সাধারণ গতায়াতকে বাধাগ্রস্ত করে পথিকের দেহ তল্লাশি করার মাধ্যমে বিব্রত করার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। 'কুছ নেহি? বোমাওমা? সাচ্ সাচ্ বাতাও, নেহিত...' এই পঙ্ক্তিতে পাকিস্তানের বর্বর সেনাদের আচরণ ধরা পড়েছে। কবি যে কিশোরের কথা বলেছেন তার মনে কোনো ভয় নেই : 'নিজেই নিজের হাতে শার্টের প্যান্টের সব পকেট

ওল্টায়' সে। তারপর অনুমতি মিললে নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায় ছেলেটি। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ নানাভাবে অবদান রেখেছে। নানাবয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। কবি এই কবিতায় একজন কিশোরের হৃদয়কেই মহত্তম অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন :

> বুকের গভীরে
> মহত্তম সেই অস্ত্র যার
> দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
> ধ্বনি যার অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভি :
> স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা!
>
> আর সেই প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুকে
> লুকিয়ে সন্তর্পণে ধীর পায়ে
> অনন্য কিশোর তার
> সঠিক গন্তব্যে যায় হেঁটে। ('সার্চ'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

'স্বাধীনতা' কবিতায় কবি স্বাধীনতার আনন্দকে শব্দের মালায় গাঁথতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা কবির কাছে 'আলোকিত অস্তিত্বের আভা'। কবি সবাইকে মুক্তির আনন্দ উপভোগের আহ্বান জানান। এই স্বাধীনতাকে কবি গোলাপ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যে গোলাপ কবির অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'খোকন ফেরেনি' কবিতায় যে খোকনের কথা বলা হয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না তার মায়ের বুকে, কারণ সে জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। এই একজন খোকনের মাধ্যমে কবি বাংলা মায়ের লক্ষ সন্তানের আত্মদানের কথা স্মরণ করেছেন।

আহসান হাবীবের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতেও সময়-সমাজ-রাজনীতির নানা ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কিন্তু উপরে আলোচিত গ্রন্থগুলোকে আমরা যেভাবে সময়ের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পৃক্তির প্রমাণ পাই এবং বিক্ষুব্ধ সময়কে কবিতায় ধারণ করার প্রবল প্রয়াস লক্ষ করি, তা পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কমে এসেছে। ধীরে ধীরে কবির আত্মমগ্নতার মাত্রা বেড়েছে এবং কবিতায় জীবনের অন্তর্গত অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন কবি। স্বাধীন বাংলাদেশে নানা ঘটনার প্রভাব তাঁর কবিতায় নিশ্চয়ই লক্ষ করা যাবে, কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত হয়েছে নানা কবিতায়। সেই প্রতিক্রিয়ার আগুনে তিনি নিজেই দগ্ধ হয়েছেন, সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠেন নি। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধেই কবির কলম অধিকতর সাহস ও সক্রিয়তা দেখিয়েছে। আহসান হাবীব কখনোই সময়-সমাজ-স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত তাঁর যে ভ্রমণ, তা সময়ের হাত ধরে সম্পন্ন হয়েছে বলেই কবিতায় অনিবার্যভাবেই সমাজজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক আহমদ রফিক লিখেছেন :

> চল্লিশের রাত্রিশেষে যে যাত্রার শুরু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও চলমানতার অবসান ঘটে না। এই ঋজু আদর্শ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কী চিরায়ত প্রয়োজনে তাঁর কবিতায় এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যায়। তাই গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার আহ্বান ইত্যাদি জনমানসের প্রয়োজনে নদীও ঢেউ তুলে সামনে এসে দাঁড়ায়, বিপর্যস্ত মনুষ্যত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে : দেখি নদী বয়ে যায় দেশময়। শৈল্পিক সততা কোনো শিল্পীকেই দেশজ ঐতিহ্যের সাথে ছিন্নমূল অবস্থায় দেখতে চায় না। চায় না স্বদেশ ও স্বকাল চেতনার সাথে বিচ্ছিন্নতার পথে চলতে। এই বাস্তব সত্যের পরিচয়ই সেই চল্লিশের দশক থেকে আহসান হাবীবের সর্বাধুনিক কবিতাবলীতে পাওয়া যায়। (১৯৮৭ : ১১৭)

আহসান হাবীবের কবিতায় সময়ের উপস্থিতির ধরন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিবর্তিত হলেও স্বকালের সঙ্গে কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি। আহমদ রফিক যথার্থই বলেছেন, 'সমাজচেতনার শিকড় যে তার শিল্পী সত্তার গভীরে প্রথম থেকে অবস্থান নিয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল তার কবিতাই সেই প্রমাণ বহন করে। এমন কি শেষ বয়সের চিন্তাভাবনা ও লেখালেখিতেও দেশ কাল ও সমাজচেতনার প্রতিভাস স্পষ্ট।' (১৯৯৫ : ষোলো)। শ্রেণিবিভক্ত

সমাজের কদর্য রূপটিকে তিনি যেমন কবিতায় তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজ-পরিবর্তনে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে– এই কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন কবি।

রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন সমাজের সুস্থ-স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রতিহত করে, তখন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাও আহসান হাবীবের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। কবিতায় তিনি মানুষকেই নানা অবয়বে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন বলে মানুষের জীবনে সমাজ-রাজনীতির প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান নি। যে কালের আবর্তে গড়ে উঠেছে তাঁর মানসভূগোল, তাঁর প্রভাব এড়িয়ে কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়– এই উপলব্ধিই তাঁকে আমৃত্যু সময়-সমাজ-রাজনীতি সম্পৃক্ত রেখেছে। তাই সময় ও সমাজকে আঁকড়ে ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহসান হাবীবের কবিতার পৃথিবী।

মধ্যবিত্ত মন

শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে মানুষকে জীবিকা-নির্বাহের বিচিত্র পথে পরিক্রমণ করতে হয়। এই পরিক্রমণের মধ্যদিয়েই প্রতিটি শ্রেণির চরিত্র চিহ্নিত হয়ে যায়। বিত্তবানের হাতে নিম্নবিত্তের শোষণের ধরন বিভিন্ন হলেও জীবিকার প্রয়োজনে নিম্নবিত্তের কার্যপরিধি যতোটা বিস্তৃত মধ্যবিত্তের ততোটা নয়। মধ্যবিত্ত শ্যামের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে, আবার কুল রাখার ব্যাপারেও তাঁদের অস্থিরতার অন্ত নেই। তাই প্রতিনিয়ত মানসিক টানাপোড়নে রক্তাক্ত হয় মধ্যবিত্তের মানসভুগোল। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় মধ্যবিত্তের এই দোদুল্যমান অবস্থা নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রগতি-কবিতার প্রধান অবলম্বনই এই মধ্যবিত্তের চরিত্র চিহ্নিত করা এবং এই বিত্ত ভেঙে বাইরে এসে পরিচ্ছন্ন জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এই যুগধর্মের প্রভাব চল্লিশের সকল কবিকেই অল্পবিস্তর আচ্ছন্ন করেছে। আহসান হাবীবের কবিতায়ও এই মধ্যবিত্তকে আমরা নানাভাবে উপস্থিত হতে দেখি।

মধ্যবিত্তের যে দোদুল্যমানতার কথা বলা হল, তা কোন আরোপিত ব্যাপার নয়। এই প্রবণতা মজ্জাগত বলেই তা থেকে মুক্তির প্রয়াসকেও তীব্র হতে হয়। কিন্তু ইচ্ছে বা চেষ্টার তীব্রতা দিয়ে কি অন্তর্গত প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় লাভ করা সম্ভব? দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা সমর সেনের নাম নিতে পারি, যিনি প্রগতি-কবিতার অন্যতম প্রধান হয়েও স্বীকার করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কথা : 'আমার গণ্ডি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।' (১৯৭৮ : ৩৩)। এই কাটিয়ে উঠতে না-পারার জন্য দুঃখ করেন নি কবি, বরং সত্যকে প্রকাশ করতে পারায় স্বস্তি বোধ করেছেন। আহসান হাবীব এই মধ্যবিত্তেরই প্রতিনিধি। তাই তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিজেকে দিয়েই তিনি অনুভব করেছেন, এই শ্রেণি স্বপ্ন ও বাস্তবের ব্যবধান ঘোচাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হোঁচট খায়। এ বিষয়ে আহসান হাবীবের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে *রাত্রিশেষ* কাব্যের 'কনফেশান' কবিতায় :

আমরা কবিতা লিখি 'প্রোলেটারিয়ান'।
রক্তে ও মজ্জায় শা'জাহানী স্বপ্ন।
সিথানে শিথিলবাহু জঠরে আগুন,
বনেদী মনের বনে ডানা মেলে কবুতর নাচছে।

আমাদের উলঙ্গ বক্ষের
আমাদের ঘুণধরা পাঁজরের
চারপাশে অহরহ ওড়ায় অনেক ধূলি
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আরবী ঘোড়ার।
জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান। ('কনফেশন'/*রাত্রিশেষ*)

মধ্যবিত্তের 'ভেতর ও বাহিরে'র ব্যবধান কোনদিন দূর হয় না বলেই তারা অনেক বেশি অস্থির-অশান্ত। লাল মাটির কালো পিচের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাওয়াই আগুনে দগ্ধ হয় তারা, কিন্তু 'বুকে তার ঝকঝকে উড়ন্ত শেভ্রোলে কার'। এই গাড়ির রেখে যাওয়া ধুলো আর কয়লার মাঝে ঘুরপাক খায় মধ্যবিত্তের কাটা মাথা। যে চেয়ারে বসে মধ্যবিত্তের শিল্পচর্চা, তার হাতল ভাঙা হলেও কলমের মুখ দিয়ে সাম্রাজ্য জোড়া দেবার দম্ভোক্তি প্রকাশিত হয়। ধার করা ভাবকে তারা যে ভাষায় ব্যক্ত করে, সেই ভাষায়ও যথেষ্ট সাবলীলতা নেই। কিন্তু তাদের 'ওপাশের কামরায় ঘড়ির

সোনার চেন করে চক্চক্'। মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণে আহসান হাবীবের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়েছে এই কবিতার শেষ দিকে :

আমাদের দুইমুখো মন।
একমুখে উদ্ধত বন্ধকী জীবনের সুবিপুল ঋণ।
তারিপাশে ভাঙাচোরা আধপোড়া ইঁটের গাঁথুনি।
আকাশেতে সেতু বাঁধবার। ('কনফেশন'/*রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের দৃষ্টিতে এই হল মধ্যবিত্ত। এক অর্থে তিনি নিজেও এই বিত্তেরই একজন। তাই এই চরিত্রচিত্রণে তিনি নিজের দিকেই হয়তো মনোযোগ নিবন্ধ রেখেছেন। 'আহসান হাবীব নিজেকে সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত চরিত্র হিসেবেই অবলোকন করেছেন। পেশাগত জীবনে নিরাপদ থাকার স্বার্থে তাঁকে কখনো-কখনো স্বভাববিরোধী কাজও করতে হয়েছে। ১৯৬৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের চল্লিশজন লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন আহসান হাবীব।' (সরকার আমিন ২০০৬ : ২৬)। সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে গিয়ে তিনি বাধ্য হয়েই এই কাজ করেছেন। পরবর্তী জীবনে এর জন্য অনুতাপও করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে। মধ্যবিত্তকে তাঁর জীবনধারণের জন্য আপস করতেই হয় কখনো কখনো। আপসহীনতা শব্দবন্ধে যে শক্তি ও দীপ্তি আছে জীবিকার প্রয়োজনে তার অধিকার প্রায়শই হাতছাড়া হয়ে যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির। 'কনফেশান' কবিতায় আহসান হাবীবের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত। তাঁর কাব্যগ্রন্থের আরো কিছু কবিতায় আমরা খুঁজে পাবো এমন অনেক নিদর্শন, যা আমাদেরকে মধ্যবিত্তেরই মানসিক দৈন্য ও দ্বিধার কথা মনে করিয়ে দেবে।

আহসান হাবীব কোন কোন কবিতায় সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান চিহ্নিত করেন, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা। কখনো কখনো মানসিক বৈকল্য বা দ্বিধান্বিত অবস্থা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, মধ্যবিত্তের সীমানা অতিক্রম করে সংগ্রামী জীবনে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেন। আবার অন্যের সুখে ঈর্ষাকাতর মধ্যবিত্তকে কবিতায় তুলে ধরেন কবি। অন্তর্গত সত্তা বা প্রবৃত্তিকে আড়াল করে বাইরে ভালোমানুষী ভাব দেখানোর মধ্যেও মধ্যবিত্তের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাক :

ক. তবু বর্ষার দিনগুলি
একটি আক্ষেপ রেখে গেছে
জীবনের থমকে যাওয়া পদক্ষেপের প্রান্তে!
কতবার
জীবনে কত বর্ষায়
এক একদিন।
বর্ষণক্লান্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে
হঠাৎ এ কথা মনে হয়েছে :
একটা রেনকোট যদি থাকতো আমার! ('রেণকোট'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আকাশে উধাও বাহু ফিরেছে এবার,
এবার মাটির বাসা জানায়েছে
তার নির্মম মমতা–
ত্রিশঙ্কু মনেরে হেনে শঙ্কাহীন করেছে ক্ষমতা। ('স্বাক্ষর'/*রাত্রিশেষ*)

গ. পাখির জীবন কভু সংসারে পাবো না
পাখির মতন সুখ-স্বাধীনতা মানুষের ভাগ্যে লেখা নেই
যত ভাবি ততই হৃদয়ে
ঈর্ষার আগুন জ্বলে
মনে হয় সংসারের সীমা
ঈর্ষার প্রাচীরে ঘেরা! ('ঈর্ষার আলোকে আমি'/*ছায়া হরিণ*)

Dhaka University Institutional Repository

গ. সব সাজ খুলে ফেলি
রাজা কিম্বা উজীরের অথবা ভাঁড়ের
বিচিত্র টুপিটি দূরে রাখি।
ঘাসের শিশিরে
মুখের সমস্ত রঙ তুলে ফেলি নিপুণ দু'হাতে। ('যখন বিরতি'/*ছায়া হরিণ*)

ঘ. মন বলে যাই যাই
কি আশ্চর্য
তবু থেমে যাই
ছায়াদের সঙ্গী হয়ে–
অনুগতপ্রাণ
অতিথিগৌরবে নিত্য নিষিদ্ধ সরাই
সন্ধ্যার প্রদীপে ঢালে
আরো কিছু সুরা। ('মন বলে'/*সারা দুপুর*)

ঙ. আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো মসৃণ সদয় দীর্ঘ মই
আমার আয়ত্তে নেই। নেই
রৌপ্যাধারে সবুজ পানের খিলি তাই
তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই কিছু পৃথিবীতে, আমি
পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ
উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত। এক
নিরীহ সংসারী আমি, নির্বিবাদী আর
জীবনে তেমন কোনো চমকপ্রদ দর্শনের অভিমান নেই। ('নৈঃশব্দে নিহিত আমি'/*আশায় বসতি*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা মধ্যবিত্তকে বিচিত্র চরিত্রে উপস্থিত হতে দেখি। সমর সেন '২২শে জুন' কবিতায় মধ্যবিত্তকে দু-নৌকায় পা দিয়ে চলার কথা বলেছেন। 'বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর' খেয়ে জীবননির্বাহের প্রয়াসকে মধ্যবিত্তের চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন কবি। আহসান হাবীবের কবিতায় বিধৃত মধ্যবিত্তও সুবিধাবাদী চরিত্র হিসেবেই চিত্রিত। তবে তাঁর মধ্যবিত্ত তাদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়াস দেখান। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি মধ্যবিত্তের সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই কবিতার নায়ক বৃষ্টিস্নাত দিন এলেই ভাবে একটি রেনকোট হলে বেশ হতো। এইভাবে পঁচিশটি বর্ষা কেটে গেলেও রেনকোট কেনা হয় নি তার। এই কবিতায় দারিদ্রের ছবি স্পষ্ট হলেও এই নায়ককে নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি ভাবার সুযোগ নেই। কারণ যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশার সেতু রচনা করেছেন কবি, তা একমাত্র মধ্যবিত্তেরই দোলাচল-উপযোগী। উদ্ধৃতি খ-এর 'ত্রিশঙ্কু' মধ্যবিত্তের সবচেয়ে সার্থক রূপক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক* (১৯৪০)-এর প্রথম কবিতা 'সকলের গানে'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মধ্যবিত্তের দোলাচলতার পরিচয় দিতে গিয়ে পৌরাণিক 'ত্রিশঙ্কু'র সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া যে-কোন আন্দোলন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার অন্যতম শর্ত। কিন্তু মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী চরিত্র প্রায়শই দোটানায় পড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এই হতবুদ্ধি মধ্যবিত্তের অন্তরেও সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, নতুন দিনের এই যাত্রায় হাতে হাত রেখে এগিয়ে না গেলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য সম্ভব নয়। তাই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় বাধার দেয়াল ভাঙার আহ্বান :

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পকে চেনা–
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে, (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০০৩ : ২১)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত আত্মমগ্ন, ভীরু। তাই ঘরে ও বাইরে কোথাও স্বস্তি পায় না তারা। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর এই মনোবৃত্তি সুভাষকে ব্যথিত করেছে। ফলে পৌরাণিক রাজা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতার রূপকল্পেএই স্বার্থসন্ধানী মানুষকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। পৌরাণিক অনুষঙ্গ হিসেবে আমরা জানি, কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে সূর্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা ব্যর্থ হয়। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের স্মরণ নিলেও শেষরক্ষা হয় নি তার। আহসান হাবীব 'স্বাক্ষর' কবিতায় ত্রিশঙ্কু মনকে শঙ্কাহীন করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাহসের সঙ্গে হাজার জনতার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজপথে নামলেই শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি মিলবে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কোন যাত্রাপালা উপভোগের গল্পের আড়ালে মানুষের মুখোশ উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে। এই মুখোশ খুলে ফেলার মাধ্যমে কবি মূলত মধ্যবিত্তের ভেতর-বাহিরের ব্যবধান মুছে ফেলার কথা বলেছেন। কেবল স্বপ্ন-কল্পনা বা যাত্রাপালায় রাজা-উজীর সেজে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে না। চাই মুখের রঙ মুছে নিয়ে সত্যিকার মানুষ হিসেবে দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও সেই ত্রিশঙ্কু-অবস্থারই রূপায়ণ লক্ষ করি। তাই যাই যাই করেও মিছিলে যাওয়া হয় না মধ্যবিত্তের। ছায়াদের অনুগামী হয়ে নিষিদ্ধ সরাইয়ের সুরায় ডুব দিয়ে জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে মধ্যবিত্ত। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সময় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মকৃত বিবরে ডুব দিয়ে আরামযাপনের কথা বলা হয়েছে, যা মধ্যবিত্তেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই বলেই আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কোন রকমে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে হয় তাকে। এই চমকহীন দর্শনহীন জীবনের মধ্যে গ্লানিও কম নয়। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ হয়ে কখনো কখনো আত্মধিক্কারও প্রকাশ করতে দেখি এই ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন মধ্যবিত্তকে। পরার্থে জীবনকে ব্যয় করতে না পারার নামই যে মনুষ্যত্বের অবমাননা, এই উপলব্ধিও বোধকরি কবিতাটির মর্মে ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি। মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্র আহসান হাবীবের শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে অধিকমাত্রায় উদ্ভাসিত। তাঁর *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য : 'মধ্যবিত্ত জীবনপ্রবণতায় ফেলে আসা অতীত, নস্ট্যালজিয়া, কৃতার্থপরতার আহ্বান– এসব আছে এ কাব্যে।' (শহীদ ইকবাল ২০০৮ : ১২৬)। বিশেষ করে এই কাব্যের 'আমি কোনো আগন্তুক নই' শীর্ষক কবিতায় মধ্যবিত্ত-চেতনার অন্তর্গত অনুরণনটি পাঠককে পল্লবিত করে।

আহসান হাবীব মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণে ব্যঙ্গের আশ্রয় নেন নি। সাধারণ বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এই শ্রেণিকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। চল্লিশের প্রগতি-পন্থী কবিরা তীব্র ব্যঙ্গবাণে মধ্যবিত্তকে রক্তাক্ত করে তার অন্তর্গত সত্তার ঘুম ভাঙাতে চেয়েছেন। আহসান হাবীব সেই পথে যান নি। 'ধিক্কার নেই, ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয়নি, সত্য সেখানে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করছে।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৭ : ৬৪)। এর কারণ বোধকরি এই যে, তাঁর কবিতায় কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেই। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তাঁর যে প্রয়াস তা রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষা থেকে উৎসারিত নয়, মানবিক মূল্যবোধপ্রসূত। তিনি মানুষকে মিছিলে আহ্বান করেন কিন্তু সেই মিছিলে কোন রাজনৈতিক শ্লোগান উচ্চারিত হয় না। মিছিলের মুখগুলোর মধ্যে সুন্দর আগামীর আভা আবিষ্কার করেন কবি, মিছিলে যেতে না-পারার কষ্ট প্রকাশ করেন কখনো কখনো, কিন্তু সেই আভা বা কষ্টের মধ্যে রাজনীতি নেই, যা আছে তা হল মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ।

আহসান হাবীবের কবিতায় চিত্রিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিবান এবং সুস্থ জীবনের প্রতি অধিকতর আগ্রহী। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন : 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই অংশের প্রতিনিধি তিনি যার আকর্ষণ আছে সংস্কৃতিতে, রুচি আছে আর আছে স্বপ্ন।' (১৯৮৭ : ৬৩)। আহসান হাবীবের কবিতায় যে মধ্যবিত্তকে আমরা মুদ্রিত হতে দেখি, তাদের মধ্যে নিরীহ ও নির্বিঘ্ন জীবনের প্রতি প্রবল পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। দিনবদলের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তারা, কিন্তু সংগ্রামী হয়ে উঠতে চান না। এই মনোভঙ্গির কারণেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণি বরাবরই অস্থির ও অশান্ত। আহসান হাবীব এই মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং কখনো কখনো আত্মকৃত বিবর বা খোলস ভেঙে বাইরে আসার কথা বলেছেন।

উদ্বাস্তুবোধ

গতির মাধ্যমেই মানুষের প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে। চলিষ্ণু জীবনের দিকেই আমাদের প্রবল পক্ষপাত। এই ছুটে চলা কিংবা ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বের গৌরব ও সৌরভ সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। এই চলমান জীবনে খ্যাতির আশা যেমন দীপ্যমান, তেমনি ক্ষতির আশঙ্কাও অনুপস্থিত নয়। তবু জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে হঠাৎ মন কেমন করে, ফেলে আসা অতীত তখন মনের অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। 'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি'– এই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণের সারবত্তা স্বীকার করেও বলতেই হয়, 'পশ্চাতের আমি'র কাজ কেবল সম্মুখে ঠেলে দেওয়াই নয়, কখনো কখনো সে প্রবলভাবে পেছনের দিকেও টানে। যে টানে সেও জানে, সেখানে ফেরার সকল দরোজাই বন্ধ হয়ে গেছে। এই ফিরতে চাওয়ার আনন্দ এবং ফিরতে না-পারা বেদনা থেকেই বোধকরি মানবচৈতন্যে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম।

আহসান হাবীবের কবিতায় পেছন ফিরে তাকানোর তীব্র ইচ্ছের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই অতীত-অন্বেষাও তাঁর বিপন্ন বর্তমান থেকেই উৎসারিত। জীবিকার প্রয়োজনে অল্পবয়সে তিনি নিজ গ্রাম শঙ্করপাশা ছেড়ে কলকাতা চলে গেছেন। কলকাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নি। তিনি যুদ্ধ করেই নিজের জন্য একটু নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছেন। পেয়েছেন, আবার হারিয়েও ফেলেছেন। তাঁকে খুঁজতে হয়েছে নতুন ঠিকানা। বারবার ঠিকানা বদলের কারণেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক প্রবল উদ্বাস্তুবোধের, যা তাঁর কবিতায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল দিনগুলোতে তিনি কলকাতায় টিকে থাকার সংগ্রাম করেছেন, মারী ও মড়কের ভয়াবহতা তাঁকে স্পর্শ করেছে, মুদ্রাস্ফীতির কবলে ভেঙে পড়া অর্থনীতির প্রভাবে তিনিও নাজেহাল হয়েছেন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আশঙ্কা ও উদ্বেগে কালাতিপাত করেছেন। '৪৭-এর দেশভাগ আবার তাঁকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু এদেশেও কোন স্বস্তিদায়ক জীবনের সন্ধান পান নি তিনি। পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবে তাঁকে নিজ দেশেও পরবাসীর মতো বাস করতে হয়েছে। আহসান হাবীবের এই বাস্তুত্যাগী মানসতার জন্য এইসব অনুষঙ্গও কম দায়ী নয়।

আহসান হাবীবের কবিতা তাঁর অন্তর্গত অনুভব-উপলব্ধিরই শিল্পস্মারক। তাই বাস্তবজীবনে বারবার বাসাবদলের এই অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকেও ছুঁয়ে গেছে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, 'তার লেখা পড়ে বারম্বার মনে হয়েছে আমার যে, তিনি বাসা খুঁজছেন।' (১৯৮৭ : ৬২)। এই বাসা খোঁজার চেষ্টা ও খুঁজে না-পাওয়ার আক্ষেপ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় মুদ্রিত। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে' শীর্ষক কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কোথায় যাবেন, কোন পথে যাবেন তা যদিও স্পষ্ট নয়। কেউ বলেও দিচ্ছে না তাঁর গন্তব্যের কথা। কিন্তু গন্তব্যে তাঁকে পৌঁছাতেই হবে : 'পথ না পেলেই পথ ছেড়ে দেব?/এই দাপাদাপি/এই অস্থিরতা সার হবে?/আমি কি কোথাও পৌঁছবার মত আলো/পাবো না জীবনে?' ('আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)। অনিকেতবোধ থেকে উৎসারিত এই অস্থিরতাকে আরো তীব্রতা দিয়েছে তাঁর 'সুশোভন স্বাধীন শৈশব'। 'গুরুজন এবং সমুদয় মহদাশয় প্রতিবেশী'দের মতামত ও পরামর্শ উপেক্ষা করলেও এই বয়সে এসে কবি উপলব্ধি করেছেন 'বয়ে যাওয়া এ জীবনে বড়ই ভয়ঙ্কর/এবং জবাব কিছু দেবার দায়িত্ব এ বয়সে/আঠারো উনিশ কিংবা পঁচিশ ছাব্বিশে...।' কবি জানেন, একজন মানুষ তার জীবনযাপনে পাথর, গাছ কিংবা বাড়িঘরের মতো নিশ্চল থাকতে পারে না। মানুষকে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতেই হয়। চলমান জীবনে গন্তব্যহীনতার বিপদ সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই যত দ্রুত সম্ভব নিজের ঠিকানায় পৌঁছাতে চান কবি :

> মানুষকে কোথা ও না কোথাও অবশ্যই যেতে হয়
> কোনো এক নিশ্চিত গন্তব্যে তাকে যেতে হয় বলে
> এই অস্থিরতা এই অক্লান্ত ভ্রমণ। আমি
>
> হাঁটতে হাঁটতে যখনই যন্ত্রণা আর
> উদ্বেগে রক্তাক্ত দু পা
> চারদিকে ছুঁড়তে থাকি, বলি
> হে পৃথিবী, পৃথিবীর হে শ্রদ্ধেয় গুরুজন, আমি

কোথাও না কোথাও অবশ্যই যেতে চাই
বসতে চাই
এবং বিশ্রাম চাই
আপন আবাসে।

এই খররৌদ্রময়
জ্বলন্ত ময়দানে আমি
আর হাঁটতে পারি না এমন দিশেহারা... ('আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীব অনুভব করেন, ঘরে ফেরার পথে প্রতিবন্ধকতার অন্ত নেই। যেতে চাইলেই মধ্যপথে থামিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে, 'নিশ্চল পাথর কিংবা/প্রাণহীন খেলার পুতুল' বানিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। হাবীব নিজেকে একালের এক বিচলিত মানব-সন্তান হিসেবে সামনে এগিয়ে যান। যারা নানা প্রলোভনে কবিকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই পথ থেকে তিনি ফিরবেন না। কারণ, 'স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস তাকে/অবশ্যই গড়ে নিতে হয়/কোনোখানে।' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, আহসান হাবীবের কবিতার 'সর্বত্র একটা চলমানতা ধরা পড়ে। নদী, পথ, ট্রেন গন্তব্য, ঠিকানা– এরা কতবার কতভাবে এসেছে তাঁর লেখায়। তার মেঘ বলে চৈত্রে যাবো। বারবার বলেন তিনি যেতে হবে।...যাচ্ছেন কোথায়? আবাসের খোঁজে।' (১৯৮৭ : ৬২-৬৩)। এই আবাস-অন্বেষণের অভিপ্রায় থেকেই তিনি বারবার পল্লি-প্রকৃতির শরণ নিয়েছেন এবং শহুরে জীবনের বিপর্যস্ত বর্তমানকে তিনি টেনে নিয়ে গেছেন উজ্জ্বল অতীতে।

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যেরই 'এক দুই তিন' শীর্ষক কবিতায় আমরা আহসান হাবীবের অনিকেত মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করি। এখানে তিনি রূপকের আশ্রয়ে আবাসহীনতার বেদনা উপস্থাপন করেছেন। আত্মকৃত আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর সেই ঘরে আর আগের মতো প্রবেশ করা যায় না। কবি এই ফিরতে না-পারার দীর্ঘশ্বাসকে ভাঙা আয়নার রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন :

শেষ বেলা বাড়ি ফিরে দেখি সেই আয়না পড়ে আছে
খান খান
ভাঙাচোরা টুকরোয় বিম্বিত
করুণ রক্তাক্ত মুখ
হাত-পা ভাঙা
একটি বয়স্ক অবয়ব। ('এক দুই তিন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এই ভাঙা আয়নার রূপকল্পে কবির বিদীর্ণ আত্মারই প্রতিভাস মুদ্রিত হয়েছে। কবি লক্ষ করেন, 'মগডালে সুনীল পাখি সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমায়', আর সেই গাছের তলায় এক উলঙ্গ শিশু মায়ের উদোম পিঠকে বাদ্যযন্ত্র করে নেচে নেচে গান গায়। এই শিশুর গানও আমাদেরকে অনিকেত মানুষের অনিশ্চিত জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বাস্তুহীনতার বেদনা এই কবিতার শেষাংশে আরো স্পষ্ট হয়েছে একটি কাঠবেড়ালীর অস্থির ছোটাছুটি ও নিবাস-খোঁজার চেষ্টায় :

দিশেহারা কাঠবেড়ালী একবার মগডালে যায়
আর একবার গাছের তলায়
ছটফট ছোটাছুটি
ছুটে ছুটে প্রাণান্ত তবুও আপন নিবাস
খুঁজে খুঁজে কোথাও মেলে না। ('এক দুই তিন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এই কাঠবেড়ালী আহসান হাবীবের অন্তর্গত উপলব্ধিকেই মূর্ত করে তুলছে। কবির অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তিকেই কাঠবেড়ালীর ব্যক্তিত্বে আরোপ করেছেন কবি। নিশ্চিন্তে নির্ভর করার মতো কোন আশ্রয় না থাকার কষ্টই এই কাঠবেড়ালির অস্থিরতার মধ্যে ধরা পড়েছে। সাহিত্যসমালোচক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই কবিতার অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন :

> ‘এক দুই তিন’ নামে ছোট একটি কবিতায় একটি দিশেহারা কাঠবিড়ালীর কথা বলছেন তিনি; যে কেবলি ওঠে আর নামে, অস্থির যে আপন নিবাস খুঁজে খুঁজে। কিন্তু হায়, কোথাও পায় না। নিরাশ্রয় গৃহীর এই মানসিকতা সে তো আমাদের প্রায় সকলেরই। আসলে আমাদেরই একজন তিনি। আমরা তো সেই মানুষই বটে, যার ‘সামনে পথ ঠিকানাবিহীন, নেই সম্পন্ন বাগান...চারপাশে।’ (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৭ : ৬৩)

আহসান হাবীব নিজেকে ‘এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ‘নূহের প্লাবনে পথ হারানো’ এই মানুষটি তো আপন নিবাস সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনে নিজের আরামদায়ক আবাসে ফেরার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এই আশ্রয়হীনতা তাঁকে আহত করেছে। যুদ্ধপ্রসূত অনিকেত ভাবনার প্রকাশও তাঁর কোন কোন কবিতায় লক্ষ করা যায়। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

ক. তবে কেন
আজ তবে ভুলবো কেন, বলো–
আমাদের বহু নীড় লালসার বে-আইনী হানায়
জ্বলে গেছে! আমরা উদ্বাস্তু তাই। (‘পুনর্বাসন’/*ছায়া হরিণ*)

খ. নীড়হারা শান্তিহারা মানুষের বিশীর্ণ নয়নে,
দেহের কঙ্কালে তার
আর তার মনোরাজ্যে
কে জ্বেলেছে নতুন মশাল; (‘প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা’/*ছায়া হরিণ*)

গ. তোমার চারপাশে খুন রাহাজানি
দেখো তীব্র রক্তস্রোত ধাবমান তোমার পশ্চাতে।
দাবাগ্নির মত জ্বলে নিরন্নতা
নগ্নতা বাজায় ডঙ্কা
চতুর্দিকে আদিম নিনাদ, দেখো
ত্রিভুবন কাঁপে। তুমি
অস্থির খাঁচার দাঁড়ে বারম্বার স্থির হতে চাও
চতুর্দিকে অস্থিরতা বাড়ে। (‘থাকো মধ্যম সারিতে’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

ঘ. ডাকলে কেউ আসে না যাবার মত কেউ নেই, এই
একাকী নিঃসঙ্গ আমি একলা বাতাসের বুক উথালপাথাল
এই ভয়াবহ শূন্যতার বুকে আমি কেবল কান্নায় ভেঙে
ঝুলে থাকবো আরো কতকাল!
কতকাল নিরুদ্দেশ সঙ্গীকে বারবার ডেকে
তুলবো দীর্ণ হা-হা স্বর ঝাউয়ের শাখায়, আরো
কতকাল শূন্যতা পাহারা দেবো! (‘ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

ঙ. শেলফে সাজানো মননের সঙ্গে স্বজন
সুখে বসবাস
হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন
কোথায় নিবাস? (‘বসবাস নিবাস’/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আহসান হাবীবের উদ্বাস্তু মনের আর্তি ধরা পড়েছে। কবি কখনো কখনো বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবকে নিবাস-হারানোর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, আবার কখনো-বা জীবনযাপনের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে ঠিকানা ভুলে যাওয়ার বেদনাকে শব্দবন্দি করেছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে মানুষকে আশ্রয়হীন করার জন্য যারা দায়ী তাদের ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি। কবি বলেন ‘যারা বলে,/আমাদের নীড় নেই/যে ইতিহাস সাক্ষী তার/মুক্তি নেই তাদের’। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে এই বিপন্ন মানুষকেই অবলম্বন করেছেন কবি। তবে এখানে নীড় রচনার প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিপন্ন সময়ের পটে মানুষকে স্থাপন করে কবি তাদের অন্তর্গত

অস্থিরতার রূপায়ণ করেছেন : 'মধ্যমঞ্চে হতবাক তুমি এক অস্থির পুরুষ। তুমি/দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য/কেবলি পালাতে চাও/কোথায় পালাবে?' ('থাকো মধ্যম সারিতে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)। এই অস্থিরতাও কবির অনিকেতমানসজাত বলেই মনে হয়। খাঁচায় বন্দি মানুষের মর্মের বেদনা যেমন এই উদ্ধৃতিতে চারুকৃত, তেমনি খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজস্ব নিবাসে ফিরে যেতে না-পারার বেদনাও এতে ধরা পড়েছে। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নিঃসঙ্গ মানুষের হাহাকার মুদ্রিত। নিঃসঙ্গতা থেকেও মানুষ উদ্বাস্তুভাবনায় নিমজ্জিত হতে পারে। মানুষ যখন কাছের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যখন শূন্যতা তাকে পাহারা দিয়ে রাখে, তখন ঘরে প্রবেশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এই রুদ্ধতার বেদনাই এই কবিতায় ধারণ করেছেন কবি। এই কবিতায় প্রকৃতির সান্নিধ্যবঞ্চিত কবির দীর্ঘশ্বাসও লক্ষ করার মতো, যা তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যে নিমজ্জিত করেছে। 'মেট্রোপলিটন মনের যান্ত্রিকতায়, কারখানা আর অটোমোবাইলের চাকায় বন্দি আধুনিক মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে ক্রমে দূরে চলে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা মানবচিত্তে সৃষ্টি করলো নিঃসঙ্গতার অনুভব।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৯ : ৪৯)। এই নিঃসঙ্গতাই মানুষকে উদ্বাস্তুবোধে আক্রান্ত করে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবির নিবাস-অন্বেষার আন্তরিক প্রয়াস চিত্রিত হয়েছে। এই কবিতায় হাবীব উড়ন্ত পাখির কাছে, পথের বাতাসের কাছে, নিঃসঙ্গ নদীর কাছে ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। কবির নিজের ঘর আছে ভাবলেও একান্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'কোথায় নিবাস?', তখন তাঁর উদ্বাস্তু মনের হাহাকারই সেই দৃশ্যমান ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে, যে ঘরে তিনি বাস করেন কিন্তু তার মালিক তিনি নন। এভাবেই কবির অনিকেত মনের বিচিত্র অনুভব কবিতার শরীরে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়।

আহসান হাবীবের উদ্বাস্তুবোধের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল স্বাক্ষর লক্ষ করি *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের 'আমি কোনো আগন্তুক নই' শীর্ষক কবিতায়। কবির অন্তর্গত অনিকেতবোধকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। কবির মনের গভীরে নীরবে-নির্বিঘ্নে বাসা বেঁধে আছে যে বাস্তুহারা জীবনভাবনা, সেই বাসা ভেঙে দেওয়ার জন্যই কবিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হয়, 'আমি কোনো আগন্তুক নই'। আজীজুল হক এই কবিতা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "...অপরিচয়ের অনাত্মীয়তার ব্যবধান কত মর্মান্তিকভাবে সম্পন্ন হলে তবে চিৎকারে গলায় রক্ত তুলে অসহায়ের মতো বলতে হয়, 'খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই, আমি কোনো আগন্তুক নই'। খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা এ-ভাবে অন্যতম কবি-প্রেরণায় পরিণত।" (১৯৮৫ : ৪১)। এই অস্তিত্বহীনতার বোধই শিল্পিমনে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দেয়। আহসান হাবীব এই কবিতায় বিস্মিত ঘোষণাপত্র উচ্চারণের সময় তিনি প্রাকৃতিক-পরিমণ্ডলকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করেন। এমনকি যে ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁর কবিতায় সাদরে গৃহীত হয় নি, সেই ঈশ্বরের নামেও শপথ করেন তিনি। এই সাক্ষী ও শপথের তালিকা যতোই দীর্ঘ হয় ততোই কবির দীর্ঘশ্বাস দৃপ্ত ও দৃশ্যমান হতে থাকে। নিচের কবিতাংশটুকু পাঠ করা যাক :

> আসমানের তারা সাক্ষী সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
> নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
> সাক্ষী এই জারুল, জামরুল, সাক্ষী
> পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
> মাছরাঙা আমাকে চেনে
> আমি কোনো অভ্যাগত নই
> খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
> আমি কোনো আগন্তুক নই। ('আমি কোনো আগন্তুক নই'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এই ঘোষণাপত্রে স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে কবির সম্পর্কের নিবিড়তা প্রকাশ পেলেও জীবনযাপনের প্রয়োজনেই এইসব উজ্জ্বল অনুষঙ্গের কাছাকাছি তিনি নেই। 'এক গভীর বিশ্বাস থেকে আহসান হাবীব পৃথিবীকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। এই বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলো রোমান্টিক কবির মতো বিস্ময়কাতরতা। কিন্তু জীবিকা অন্বেষণের অভিযাত্রার প্রতিটি ধাপে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন, তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছে অনিশ্চয়তায় ও বিষাদে, তবু তিনি ভেঙে পড়েননি, দুঃসহ কদর্যতার কাছে নত হননি।' (সরকার আমিন ২০০৬ : ২৭)। তাই আহসান হাবীব স্মৃতির

Dhaka University Institutional Repository

হাত ধরে অতীত-আবাসের নানা অনুষঙ্গ নেড়েচেড়ে দেখতে চান। আজ নেই কিন্তু একদিন ছিল– এই কথা তিনি সগর্বে জানান দিতে চান। তিনি 'খররৌদ্র জলজ বাতাস মেঘক্লান্ত বিকেলের' পাখিদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা বলেন। 'কার্তিকের ধানের মঞ্জরী', 'তার চিরোল পাতার টলমল শিশির' এবং 'জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা নিশিন্দার ছায়া'র সঙ্গে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি ''অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী/তার ক্লান্ত চোখের আঁধার' চেনেন, এমন কি 'জমিলার মা'র/শূন্য খা খা রান্নাঘর' ও 'শুকনো থালা'র সঙ্গেও তিনি পরিচিত। কবি বলছেন, বৈঠায় লাঙলে মাটিতে তাঁর হাতের স্পর্শ ও সুবাস লেগে আছে। কবির অস্তিত্বে গেঁথে আছে ধানের ক্ষেত, সরু পথ ও ধু ধু নদী। তাই তাঁকে কিছুতেই আগন্তুক বলা যাবে না। কবির অস্তিত্বের অংশ হিসেবে যা কিছু হাজির করেন তিনি, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনেই এসবের সঙ্গে বিচ্ছেদ রচিত হয়েছে। এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা থেকেই তাঁর উদ্বাস্তুবোধ রূপ পেয়েছে।

আহসান হাবীব কবিতায় জীবনের নানা অনুভব ও অভিজ্ঞতাকেই রূপায়িত করেছেন। মানুষের অনুভবের জগতকে যেমন তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন, তেমনি দৃশ্যমান পৃথিবীর নানা অনুষঙ্গকেও তিনি চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাব্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। মানবিক সম্পর্কের অতলস্পর্শী ঘটনাপ্রবাহ কবির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত বুননে কবিতা হয়ে উঠেছে। প্রেম ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় যাপিতজীবনের আনন্দ-বেদনাকে প্রকাশ করেছেন তিনি। সময় ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি স্বকালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিবিধ প্রসঙ্গে নিজের উপলব্ধির সারাৎসারকে শব্দবন্দি করেছেন। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে নির্মিত হয়েছে তাঁর মানসভুবন, সেখানে অনিবার্যভাবেই সমাজকাঠামোর বিভাজন-বিভক্তির ছায়াপাত ঘটেছে। তাই তাঁর কবিতায় শ্রেণিচৈতন্যের প্রভাবও অনুপস্থিত নয়। কবির ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যেও তাঁর স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তাই তাঁর উদ্বাস্তুবোধের গভীরেও আমরা তাঁর সময়ের পদধ্বনি শুনতে পাই। আহসান হাবীবের কবিতা তাঁর যাপিতজীবন থেকে উৎসারিত বিচিত্র ও অনাস্বাদিত অভিজ্ঞানেরই আত্মখচিত অনুরণন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকরণ

সৃজনশীল ব্যক্তিচৈতন্যের অন্তর্গত অনুভব ও উপলব্ধি সংহত ও সুবিন্যস্ত হলে তবেই তা লাভ করে শিল্পের সম্মান ও স্বীকৃতি। স্রষ্টার আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে নান্দনিক অবয়বে উপস্থাপনের প্রয়োজনেই তাঁকে প্রকরণ-কৌশলে পারদর্শী হতে হয়। শিল্পসাহিত্যে কেবল সংবেদনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার ভাব বা বক্তব্য-বিষয়েই দ্রষ্টা বা পাঠকের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকে না, শিল্পীর অভিব্যক্তি, চিন্তা ও কল্পনা কীভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, সেই দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। সেই অর্থে যে-কোন শিল্পকর্মই বিষয় ও শৈলীর পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কের প্রগাঢ়তায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই শিল্পসাহিত্যের সার্থকতা নিরূপণে একজন সহৃদয়হৃদয়সংবেদী রসপিপাসু কিংবা নিবিষ্ট সমালোচক শিল্পকর্মের অন্তর ও অবয়ব উভয় দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

আহসান হাবীবের কবিতার ভাবগত ঐশ্বর্যের অভিনবত্ব অনুধাবনের প্রয়োজনেই তাঁর করণ-কৌশলের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কারণ তাঁর চয়িত শব্দাবলি প্রকরণকৌশলের গুণেই কবিতা হয়ে উঠেছে। 'শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতা– বা যে-কোনো শিল্পের– বিচার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে; কেননা শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে তা নয়, উপরন্তু একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনো পাঠকের চোখে দুষ্য। এই কারণে কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।' (বুদ্ধদেব বসু ১৯৯৭ : ৮৬)। 'সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবি' হিসেবে আহসান হাবীবও কবিতার করণ-কৌশল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কবির অন্তর্গত নন্দনভাবনা প্রচলিত শব্দসমূহকেই বিশেষ ভাব ও অর্থের দ্যোতক হিসেবে পাঠকের প্রাণে অনাস্বাদিত অনুভব সঞ্চার করে। পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে সংগৃহীত উপাদানে কবিতা সৃষ্টি হলেও কবিচৈতন্যের স্পর্শে তাতে সংস্থাপিত হয় অভিনবত্ব ও বিস্ময়। নির্বাচিত বক্তব্যকে লক্ষ্যভেদী করতেই আহসান হাবীব কাব্যদেহ নির্মাণে শৈল্পিক সংহতি নিশ্চিত করতে প্রয়াসী ছিলেন।

গঠনবৈশিষ্ট্য

আহসান হাবীব জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যেমন রূঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছেন, তেমনি তাঁর কবিতার ভুবনও সংক্ষুব্ধ সময়ের বিহ্বল বাস্তবতাকে স্বীকরণ করে নির্মিত। প্রগাঢ় সমাজসম্পৃক্তিই তাঁর কাব্যচৈতন্যের লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জনবহুল পৃথিবীতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। এই কোলাহলমুখর পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে বৈরী-হাওয়ার তোড়ে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছেন বারবার, তবু অন্তরের বিচিত্র ভাব ও রূপের সঙ্গে বাইরের বাস্তবকেও তিনি কবিতায় রূপায়ণে নিবিষ্ট থেকেছেন। 'ব্যক্তিজীবনের রূঢ়-তিক্ত অভিজ্ঞতা শৈল্পিক জীবনে কখনো কখনো গভীর অনুভবের জন্ম দেয়। সেই প্রত্যয়ী বৈশিষ্ট্যের পথ ধরেই ঐ তরুণের কাব্যচর্চা মাটির ভুবনে নির্ভরযোগ্য ভিত্ পেয়ে যায়।' (আহমদ রফিক ১৯৯৫ : নয়)। গণমানুষের আক্ষেপ ও আর্তনাদ, আকাঙ্ক্ষা ও অর্জনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদেরই একজন হিসেবে তিনি তাঁর অনুভব-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিয়েছেন। তাঁর কাব্যভাষায় নিরীক্ষার নানা চিহ্ন উপস্থিত থাকলেও কবিতাকে তিনি সাধারণের বোধের অতীত করে তুলতে চান নি। তাই তাঁর কবিতায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রাণের উপস্থিতি প্রবল। বিশ শতকের তিরিশের দশকের এক ঝাঁক প্রতিভাবান কবিব্যক্তিত্বের বহুদর্শী বোধ ও বিবেচনা থেকে আহসান হাবীব শিক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু ভাব ও ভাষার বুননে তিনি কলাকৌশলের জটিলতাকে প্রাণপণে পরিহার করেছেন। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে 'কবিকে ফিরতেই হবে স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে, জটিল কলাকৌশলে, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায়'– বুদ্ধদেব বসুর (১৯৯৭ : ৮৫) এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও আহসান হাবীব ফিরতে চেয়েছেন বহুসংখ্যক কর্মজীবীর দিকে এবং কাব্যভাষার ইঙ্গিতধর্মিতায় তিনি সূক্ষ্মতার চেয়ে তীক্ষ্ণতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কাব্যচিন্তায় জনসম্পৃক্তি ও কাব্যভাষার সরলীকরণের অনুপ্রেরণাও তিনি লাভ করেছিলেন স্বকালের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই :

> চল্লিশের সময়টাই ছিল নানামুখী হাওয়ার দাপটে অস্থির। একদিকে ভারতজুড়ে এক অসুস্থ রাজনীতির উন্মাদ তাল ঠোকাঠুকি এবং তার রক্তাক্ত প্রতিফলন, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

> দিয়ে স্বাদেশিকতা ও সামাজিক মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক যুদ্ধ-বিরোধী ও মানব কল্যাণ তখনকার আকর্ষণীয় রাজনৈতিক শ্লোগান। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তখন প্রগতিবাদী মতাদর্শভিত্তিক শিল্পসাহিত্যচর্চার উর্বর সময়। সংস্কৃতিচর্চার এমন এক সংঘবদ্ধ প্রগতিবাদী রূপ আর কোন দশকে এতটা তীব্রতা ও ব্যাপকতা নিয়ে দেখা দেয়নি। (আহমদ রফিক ১৯৯৫ : নয়)

এই সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা কেবল আহসান হাবীবের কবিতার বিষয় হিসেবেই গৃহীত হয় নি, কবির শব্দ ও বাক্যের গঠনকৌশলেও প্রভাব ফেলেছে। কবিতার যাত্রারম্ভে হাবীবের কোন কোন কবিতায় জীবনানন্দীয় আবহ ও রূপকল্পের প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও জীবনানন্দের অধরা মাধুরীর চেয়ে ধুলোর ধরার নিপতিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসই তাঁর কবিতায় প্রধানরূপে প্রতীয়মান। চল্লিশের প্রগতি-কবিতার প্রভাবও তাঁর কবিতার গঠনবৈশিষ্ট্য ও ভাষাবিন্যাসের গণমুখিতায় অবদান রেখে থাকবে। আহসান হাবীব প্রথম থেকেই কবিতায় ভাবের বিচূর্ণ অবয়ব নির্মাণের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের পক্ষপাতী। তিনি যখন ব্যক্তিক অনুভবকে কবিতায় ধারণ করেন, তাতে ভাবের ধারাবাহিক পরম্পরাকে অক্ষুণ্ন রাখেন; একইভাবে কাহিনি-বিন্যাসের মাধ্যমে অনুভবের কাব্যিক অবয়ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও চিন্তা ও কল্পনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিস্থাপনে আগ্রহী। *রাত্রিশেষ* কাব্যের 'কাশ্মিরী মেয়েটি', 'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় কাহিনি-বয়ানের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সহজ ও মর্মস্পর্শী শব্দবন্ধের শরণ নিয়েছেন, তেমনি 'দীপান্তর', 'কনফেশান', 'অস্তপারের আকাশকে', 'সৈনিক', 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি কবিতায় স্বকালের বৈরী বাস্তবতাকে অন্তর্গত অনুভবের সংমিশ্রণে এমনভাবে শব্দবন্দি করেন যাতে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা অনায়াসে পাঠকের উপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। শহীদ ইকবাল যথার্থই বলেছেন যে *রাত্রিশেষ*-এর আহসান হাবীব সম্পূর্ণভাবে নতুন হলেও সিদ্ধান্তহীন নন এবং এই কাব্যে কবির পরিবেশনার বলিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। (২০০৮ : ১১৬)। এই বলিষ্ঠতা প্রগতিপন্থী কবিদের কুললক্ষণ হিসেবে স্বীকৃত, যা আহসান হাবীব স্বকীয় কবিচৈতন্যের আলোকেই এই কাব্যে ধারণ করেছেন।

ছায়া হরিণ কাব্যে আহসান হাবীবের সমাজসংলগ্নতা যেমন তীব্রতর হয়েছে, তেমনি কবিতার গঠনবৈশিষ্ট্যেও যুক্ত হয়েছে জনসম্পৃক্তির নানা চিহ্ন। স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় দেশকে তিনি মায়ের আসনে বসিয়েছেন এবং এই মাকে তিনি অগণিত নিপতিত ও নির্যাতিত মানুষের মা হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মা ও সন্তানের সম্পর্ককে তিনি পাণ্ডিত্যের বাটখারায় না মেপে প্রেম ও স্নেহের আর্দ্রতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'তোমাতে অমর আমি', 'পুনর্বাসন', 'যৌবনে জীবনে তুমি', প্রভৃতি কবিতায় কবি জন্মভূমিকে নানা অবয়বে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই কবিতায় স্বদেশ, জননী ও প্রেয়সীকে একাকার করে দিয়েছেন কবি। "মাকে তথা স্বদেশকে চেনা যায় তাঁর কবিতায়, আমিত্বও প্রকাশিত। কৃতজ্ঞতা আছে 'আমাতে দিয়েছো তুমি শিল্পীর মহিমা'র মধ্যে। সেজন্য অভিন্ন সত্তায় প্রচণ্ডতা এলে বলেন 'মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা'। এবার প্রেয়সী, প্রেম– যেখানে কিছুই ভাজ্য নয়, বিশেষত যখন সত্য সবকিছু, সততার নিরঙ্কুশ রূপ তখন গৃহীত। খুব কাছে পৌঁছান আহসান হাবীব, অত্যন্ত উচ্চমনে, ঐ সময়ে চিহ্নিত স্বদেশকে; মাতা আর প্রেয়সীর সঙ্গে এক করে।" (শহীদ ইকবাল ২০০৮ : ১১৮)। *ছায়া হরিণ* কাব্যে হাবিবের ইতিহাস-অন্বেষার আধিক্য চোখে পড়ে। অতীত-ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত দিনগুলোর শরণ নিয়ে তিনি বর্তমানের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। এই ইতিহাসকে তিনি সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছেন। তাই শব্দচয়নে প্রচলিত ও পরিচিত পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন তিনি। 'জীবন', 'ক্রান্তিকাল', 'ইতিহাস-বিন্যাসের পথে', 'পারাপার', 'অন্যদিন' প্রভৃতি কবিতায় ইতিহাস-সভ্যতা-ঐতিহ্যের আলোকে কবি বর্তমানের বীভৎসতাকে তুলে ধরেছেন। এই কাব্যে কাহিনি-বয়নের নতুন ধরন বেছে নিয়েছেন তিনি। 'হক নাম ভরসা' কবিতায় তিনি চিঠির আদলে জমিদারের শোষণকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। এই চিঠির লেখকও একজন সর্বহারা মহম্মদ তালেবালি। আমানীর পাড়ের এই ভূমিহীন কৃষকের হৃদয়বিদারক দুঃখের বর্ণনায় তিনি ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। চাষের জমি ও বসতবাটি হারিয়ে নিজেকে স্বাধীন ভাবার মধ্যে তার দুঃসহ বেদনারই প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী* কাব্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের কথা হয়তো পাঠকের মনে পড়বে, যে জমিদারের ষড়যন্ত্রে সবকিছু হারিয়ে এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় : 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,/তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'

বিঘার পরিবর্তে।' (২০০৬ : ৪/৮৭)। আহসান হাবীব 'ছহি জঙ্গেনামা' কবিতায় পুথিসাহিত্যের শরণ নিয়েছেন। মধ্যযুগের বটতলার সাহিত্য হিসেবে যা সমালোচক ও শিল্পবোদ্ধাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় ম্লান ছিল এতকাল, আহসান হাবীব সেই পুথির কাঠামোকেই স্বকালের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের মর্মবেদনা উপস্থাপনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। হুজ্জত্ সরদারের মুখ দিয়ে তিনি অনায়াসে জানিয়ে দিয়েছেন :

জানতো কে এ লড়াই মানুষের নয়
হাওয়ানের হানাহানি। এ পৃথিবীময়
ছড়াবে আগুন এরা, লোভের আগুন।
বেকসুর মানুষেরা হয়ে যাবে খুন। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

*ছায়া হরিণে*র অনেক কবিতায়ই কবি শৈশবের গ্রাম-নদী-পাহাড়-অরণ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই স্মৃতিচারণেও প্রত্যেকের নিজের গ্রামটি পাঠকের চোখে ঝলক দিয়ে ওঠে। 'সমুদ্র অনেক বড়', 'একটি তামসিক মুহূর্ত', 'ফুল ফুটবে' প্রভৃতি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

সারা দুপুর কাব্যে আহসান হাবীবের প্রত্যয়ী উচ্চারণে কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে মনে হয়। তাঁর অভিব্যক্তি ও উচ্চারণে হতাশার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। এই কাব্যের কোন কোন কবিতায় কবির রোমান্টিক আত্মতা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ-রাজনৈতিক হতাশা থেকেই বোধকরি তিনি নিজের দিকে ফিরে তাকাতে চেয়েছেন। এই হতাশার প্রকাশ তাঁর স্বকালের প্রেক্ষাপটেই প্রকাশিত। 'তারা দু'জন' কবিতায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন : 'মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান/নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি/এবং পথের সব আলো নিবে গেছে/হৃদয়ে কেবল/বিপন্ন বিব্রত এক আর্শির ছলনা।' এই হতাশার ছাপ *সারা দুপুর* কাব্যের অনেক কবিতায়ই বিধৃত। বৈরী সময়ের কাছে কবির এই সমর্পণের সুযোগ নিয়েই তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে স্মৃতির শৈশব। 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় আবার তিনি কাহিনি-বয়নের প্রয়াস পেয়েছেন। পৌরাণিক 'মিডাস' এর অর্থলোলুপতার গল্প শুনিয়ে স্বকালের বণিকবিশ্বের কলুষিত দিকটি উন্মোচন করেছেন কবি। রূপক ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ বেড়েছে। প্রত্যক্ষ উপস্থাপনের পরিবর্তে পরোক্ষ প্রকাশে মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। তাই দুঃসময়কে বোঝাতে তিনি ঝড়ের পূর্বাভাস দেন ('এই ঝড়ে অন্ধকার'), প্রতিকূল পরিবেশে নিজের বেমানান অবস্থায় অতিথির প্রসঙ্গ টানেন ('অভ্যাগত'), পুঁজির বিকাশে বন্দিজীবনের অনুষঙ্গে জালের শরণ নেন ('জাল') এবং নতুন দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে সূর্যের সঙ্গী হয়ে ওঠেন ('সূর্যসঙ্গ')। 'কান্না নেই' কবিতায় কবি প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানকে আবেগঘন ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'কিছু কান্নার কুসুম দাও আমাকে!'– এই উচ্চারণে কবির অন্তর্গত রক্তক্ষরণ স্পষ্ট। তবুও তিনি আশায় বুক বাঁধতে চান এবং কবিতার নাম রাখেন 'আশা রাখি কেননা'। আশা ও হতাশার দোলায় কবির *সারা দুপুর* পরিকীর্ণ। তাই তিনি 'আলো-আঁধারের দর্শন' বুঝে নিতে চান। তারুণ্য ও বার্ধক্যের মুখোমুখি অবস্থান এই কবিতায় চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। কবি সঙ্গত কারণেই তারুণ্যের অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। 'তোমাকে মৃত জেনে' কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যীয় কাহিনীর নায়ক আবু হোসেনের মুখ দিয়ে মূলত একালের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কথাই বলেছেন তিনি। বাদশা হারুন-অর-রশীদের আমলে আবু হোসেন একদিনের বাদশা হয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল মানুষের অন্তহীন সমস্যার মীমাংসা একদিনে অসম্ভব। শব্দ ও বাক্যের গঠনকৌশলকে যথারীতি সহজ ও বোধগম্য রেখেই প্রতীকের আশ্রয়ে স্বকালকে ধারণ করে কবিতার বক্তব্যে সংহতি দিয়েছেন কবি। এই কাব্যে আহসান হাবীব কবিতায় বক্তব্যের চেয়ে শৈল্পিক সংহতির দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। "সারাদুপুর' কাব্যগ্রন্থে যাত্রা শুরু করেছেন সমাজ-সম্পৃক্তি ছেড়ে শিল্পের জগতের দিকে। এখানে তিনি কেবল প্রতীক-রূপক ইত্যাদি আশ্রয়ী।" (তুষার দাশ ১৯৮৫ : ২৪)। ফলে কবিতার গঠনবৈশিষ্ট্যে যুক্ত হয়েছে ভিন্নমাত্রা। এই কাব্যের শব্দ ব্যবহারে কবি অনেক বেশি সচেতন এবং বাক্য গঠনেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অদৃশ্য অনুভবই এই কাব্যের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আশায় বসতি*। এর নামকরণের মধ্যেই স্বাধীনতার আনন্দ-আস্বাদনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। নতুন ও আলোকিত দিনের স্বপ্নে বিশ্বাসী কবি আবার সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন। কিন্তু ততদিনে কবি মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাই 'আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই' বলে কাব্য শুরু করেছেন তিনি। এই কাব্যেও স্মৃতিমুগ্ধ কবির অতীত-অন্বেষণের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। মানুষ ও শিল্পের দ্বৈরথে মানুষকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তিনি। 'শিল্প-মানবিক' কবিতায় 'আমি চাঁদ তারার বন্দর ভালবাসি' বলার পরই তিনি বলেছেন, 'শিল্প মানুষের জন্য মানুষ শিল্পের জন্য নয়'। কবির শিল্পদৃষ্টির পরিণতির ছাপ এই কাব্যে স্পষ্ট। কিন্তু ভাষার সারল্যকে পরিহার করেন নি তিনি। এই কাব্যে আত্মকথনের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। অন্তর্গত অনুভবের চিত্রায়ণে কবির ভাব ও ভাষার সন্নিবেশ এখানে অনেক বেশি নান্দনিক অবয়বে ধরা পড়েছে। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যেও শিল্পের দাবি আদায়ে কবির তৎপরতা কবিতার ভাষায় নতুন মাত্রা দিয়েছে। গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যাকুলতা এই কাব্যে দৃশ্যমান। এই কাব্যে ব্যক্তি আহসান হাবীবকে আমরা নানা অবয়বে উপস্থিত হতে দেখি। সমাজ ও সময়কে তিনি এখন পাঠ করছেন অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে। মানুষের সমস্যার কথা এই কাব্যেও উপস্থিত। 'সমীপেষু' কবিতায় আমরা লক্ষ করি পৌরসভার সভাপতি মহোদয়ের কাছে জনসাধারণের সমস্যার সমাধান চেয়ে আবেদনপত্র রচনা করছেন কবি। বয়সের কারণেই বোধকরি স্মৃতিচারণের মাত্রা বেড়েছে। বিশেষ করে শৈশবের পিরোজপুরের নানা স্মৃতি এই কাব্যে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতাকে শব্দের মালায় গেঁথে নিজের আনন্দ প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ করি 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতায়। এই আনন্দ কবির ব্যক্তিক অনুভবের শিল্পস্মারক হলেও কবির বুননকৌশলের গুণে স্বাধীনতার আনন্দ সাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। বারবার শব্দের কথা বলেন কবি। এই শব্দ কবির কবিতারই সমার্থক হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কবি নিজের কবিতার অন্তর্গত শক্তিকেই নিজের মতো করে বুঝে নিতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধে নিহত সৈনিকের কথা এসেছে নানা কবিতায়। মায়ের অপেক্ষা আর দেশের জন্য আত্মদানের মহিমাকে কবি চমৎকার শৈল্পিক সংহতি দিয়েছেন।

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যে আহসান হাবীব আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যন্ত্রসভ্যতা মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবলই বিত্তের পেছনে ছুটতে শেখায়। এই ছোটাছুটির বেদনা এই কাব্যে ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে কবির রোমান্টিক প্রেমচেতনা। কিন্তু কবির প্রেমিকারা বর্তমানের আলো-বাতাসে স্বস্তিবোধ করে না। প্রেম আছে কিন্তু সেই প্রেম অতীতের তীর হতে কেবলি দীর্ঘশ্বাস হয়ে ভেসে আসে। 'ব্যাধি' শীর্ষক কবিতায় কবি যে বিনয়ী শিল্পীর কথা বলেছেন, তা যে তিনি নিজেই সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সভামঞ্চে আহসান হাবীব স্বস্তিবোধ করতেন না। কিন্তু পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে কবিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মূল্য দিতেই হয়েছে, বসতে হয়েছে সুসজ্জিত মঞ্চে। শিল্পীর হাতে যখন একটি শিশু ফুল ও পদক তুলে দেয় তখন কবির অনুভূতি প্রকাশের সময় তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে যান :

> শিল্পী এবার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে
> অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন : আজ এই মুহূর্তে
> আমি এক মারাত্মক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত,
> 'বিনয়' সেই ব্যাধির নাম। ('ব্যাধি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

সাধারণের সঙ্গেই নিজের উপলব্ধি ভাগ করে নিতে চেয়েছেন কবি। তাই তাঁর কবিতায় ভাষায় নেই কোন জটিলতা। এমন কি উপমা রূপক নির্মাণের ক্ষেত্রেও জীবনঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন কবি। কবিতার ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন কবি। 'তুমি খুব রাখাল রাখাল বলো/তুমি খুব বটের ছায়ার কথা বলো/জোয়ারের জলে ভাসা কদম ফুলের কথা বলো/ভরা কলসী নীল শাড়ী রূপোর ঝুমকোর কথা/তুমি খুব বলো?' ('পারঙ্গম একজন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)– এই উচ্চারণ এতো বেশি স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর রাখাল-বটের ছায়া-জোয়ারের জল-ভরা কলসী নীল শাড়ি-ঝুমকো লতা এতো বেশি লোকজজীবনঘনিষ্ঠ যে পাঠকের চোখে একটি মনোরম ও আরামদায়ক ছবি ভেসে ওঠে। 'কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে' কবিতায় তিনি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের যে সকল

চিত্রকল্পের কথা বলেন, তা থেকে তাঁর শব্দ ও বাক্য সংগঠনে জনসম্পৃক্তির ধরনটি বোঝা যায়। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের সারাদেহেই গঠনকৌশলে আহসান হাবীবের এই সরলতার স্বাক্ষর স্পষ্ট।

প্রেমের কবিতা কাব্যে আহসান হাবীবের প্রেম নিবেদন ও প্রেমের স্মৃতি উদ্‌যাপনের ধরন এতো বেশি ঘরোয়া ও লোকজীবননির্ভর যে তাতে কবির অন্তর্গত অনুভবের সরলতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি উপস্থাপনের মধ্যেও জটিলতা পরিহারের চেষ্টা চোখে পড়ে। হাবীব আমাদের দেখিয়েছেন, কত সহজে ভালোবাসার কথা বলা যায় এবং কত আনন্দের সঙ্গে প্রত্যাখ্যানকে স্বাগত জানানো যায়। 'তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।/তুমি ভালো না বাসলেই ভালোবাসা জীবনের নাম'– এই উচ্চারণে ভাষার সরলতা সত্ত্বেও প্রেমের গভীরতায় ভাটা পড়ে নি। তিনি দেখিয়েছেন, প্রেম না থাকলেও প্রেমের জন্য মানুষের অপেক্ষা ও দীর্ঘশ্বাসের অন্ত নেই। 'কান্না' কবিতায় তাই তাকে বলতে শুনি, 'প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরেনি।/তুমি নেই তবু তোমাকে পাওয়ার বাসনার সোনা ঝরেনি।' কবি তাঁর প্রেমিকার সামনেও পাণ্ডিত্বের চেয়ে প্রাণের উষ্ণতাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেন। এই প্রাণের স্পর্শেই তাঁর গঠনকৌশলে গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ কাব্যের নামকরণেই কবির অন্তর্গত রক্তক্ষরণের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। এখানে প্রেম আছে, কিন্তু সেই প্রেম প্রাপ্তির প্রত্যাশারহিত, স্মৃতি আছে কিন্তু সেই স্মৃতি আনন্দ না ছড়িয়ে কবিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে। এখানেও নিজস্ব নিবাস খোঁজার চেষ্টা চোখে পড়ে। রূপকথার নাম করে কবি শোনান যাপিতজীবনের নানা অভাব ও অসঙ্গতির কথা। 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় প্রেমিকার হাতে ফুল তুলে দেওয়ার ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে যায়, কারণ ততোদিনে বাস্তবজীবনে কঠিন আঘাতে প্রেমিকা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহেই গলদঘর্ম হচ্ছে। প্রেমিকা যখন 'ভাত কুড়োবার মরণ খেলায়' মেতে ওঠে, তখন ফুল, আঙটি, সাগরের তীর, আকাশের চাঁদ– এইসব রোমান্টিক অনুষঙ্গের কোন মূল্য থাকার কথা নয়। এই কাব্যে আমরা কবিকে 'না বাউল, সংসারীও নয়' রূপে দেখতে পাই। কিন্তু স্বদেশের প্রতি কবির টান তীব্রতর হয়ে বলে মনে হয়। তাই 'যাবো না' কবিতায় তাঁকে বলতে হয়, তাঁর স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই। কারণ, কবির মতে, 'প্রস্তুতি বড় কষ্টের/আমার কোনো প্রস্তুতি নেই।' এভাবেই কবি ভাব ও ভাষাকে সমন্বয় করেন, দৈনন্দিন কথোপকথনের ধরনটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।

আহসান হাবীব বর্ণনা ও গল্প বলার ধরন থেকে ক্রমশ সরে এসে ভাবকে বিবিধ রূপকল্পে সংহতি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বিস্তৃতির জায়গা দখল করে নিয়েছে নানা প্রতীকী শব্দবন্ধ। তত্ত্বের আশ্রয়ে কবিতা লেখায় আগ্রহ দেখান নি আহসান হাবীব। জীবনকে রূপায়িত করার প্রয়োজনেই তাঁর গঠনবৈশিষ্ট্যে জনসম্পৃক্তির প্রভাব স্পষ্ট। শেষ পর্যায়ে কবি শিল্প ও জীবনের সম্পর্ককে নানা রূপকল্পে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং জীবনের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। কবির আন্তরিক অনুভব এবং কবিতায় ধারণকৃত অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য টের পেয়েছেন তিনি। তাই শব্দের সঙ্গে কবি আরো নিবিড় সম্পর্কে জড়াতে চেয়েছেন। এই সান্নিধ্যের উষ্ণতাই আহসান হাবীবের গঠনকৌশলের প্রধানতম কুললক্ষণ।

শব্দ

কবিতা শব্দের মাধ্যমেই স্রষ্টার অন্তর্গত অনুভবকে পাঠকের প্রাণে পৌঁছে দেয়। একজন আত্মসচেতন কবি শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত করেন অনাস্বাদিত অনুরণন, যা পরিচিত শব্দের শরীরে দ্যুতি ও গতি সঞ্চার করে। সৈয়দ আলী আহসান ব্যাখ্যা করেছেন যে, কবিব্যক্তিত্বের স্পর্শে শব্দ তার নির্জনতা ভেঙে লাভ করে অর্থ-শক্তি এবং এই শক্তি ধ্বনির মাধ্যমে বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে। (১৯৮৯ : ২২)। এমনকি কবিতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণের চেষ্টায়ও আমরা শব্দকেই সর্বাগ্রে বিবেচনার প্রয়াস দেখি। শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাসেই যে নির্মিত হয় কবিতার দেহ এবং এই দেহের গভীরেই সুপ্ত থাকে কবিপ্রতিভার অভিজ্ঞতার নির্যাস– এ বিষয়ে আমাদের বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ মোটামুটি একমত হয়েছেন। কখনো কখনো শব্দকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমেও কবিতা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিশৃঙ্খলাও প্রতিভাবান কবির পরিকল্পনাপ্রসূত। কবিতাকে পাঠক বা সমালোচক যেভাবেই পাঠ, বিশ্লেষণ বা

মূল্যায়ন করেন না কেন, সেখানে শব্দের উপস্থিতি এবং কখনো কখনো এর আধিপত্যও সুপ্রকাশিত। তাই একজন কবির আত্মখচিত শিল্পদৃষ্টি ও প্রকরণকলায় শব্দের স্বরূপ ও স্বভাব চিহ্নিত করার প্রয়োজনতা অস্বীকার করা যায় না। আহসান হাবীবের শব্দচেতনার প্রকাশ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় লক্ষ করা যায়। তাঁকে শব্দেশ্বরবাদী হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু শব্দের হৃদ্‌পিণ্ডেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার সারাৎসার ঢেলে দিতে চেয়েছেন। আহসান হাবীবের কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক. শব্দের বাগানে যাই
বলি, কিছু ফুল দাও
ভ্রমর-সঙ্গীত
দাও কিছু... ('শব্দ ফুল নীলিমা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

খ. দু'চোখে
প্রজ্ঞার আগুন যেন
কণ্ঠস্বর যেন
স্বর্গীয় সংকেতে ঋদ্ধ শব্দাবলি ছড়ায় দু'পাশে। ('আমার সন্তান'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

গ. শব্দের মালায় আমি তোমাকে গাঁথতে চাই– স্বাধীনতা! তুমি
ঘরে-বাইরে এমন উলঝলুল নৃত্যে মেতে আছো, কি আশ্চর্য
আমার কলম
কিছুতেই তোমাকে যে ছুঁতেও পারে না। ('স্বাধীনতা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঘ. এখন আমার শব্দাবলি
বুকের মধ্যে গুমরে থাকা শব্দাবলি
পথের পাশে আলোর মালা।
আমার আর্ত শব্দাবলি বোবা বুকের বাইরে এখন
সুনীল আলো জ্বালিয়ে রেখে এখন আমায় দেখাচ্ছে পথ
বাড়ি ফেরার পথ দেখাচ্ছে। ('এখন আমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীব কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বিশেষ কোন নিয়মনীতি বা মানদণ্ডকে গুরুত্ব দেন নি। ভাবার্থকে লক্ষ্যভেদী করার প্রয়োজনীয়তাই তাঁর কাছে মুখ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আশায় *বসতি* কাব্যের 'ক্ষমাই প্রার্থনা' কবিতায় আহসান হাবীব ঘোষণা করেছেন : 'শব্দের কাঙাল আমি/কেবল নীরবে/একান্তে দাঁড়াতে পারি/এবং জানাতে পারি/আমার এ অক্ষমতা।' এই অক্ষমতা প্রকাশের মধ্যে কবির স্বভাবসুলভ বিনয় ধরা পড়লেও শব্দের সঙ্গে তাঁর সখ্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'এখন আমার' কবিতায় কবি বলেছেন : 'এখন আমার শব্দাবলি/ভাঙা ঘরের চাল ছেয়ে দেয়।' আহসান হাবীব কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে ভাঙ ঘরের চাল পর্যন্ত নিজের অনুভবকে বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন। একজন আধুনিক কবি ভাবকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনেসাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশি সকল শব্দকেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ভাষার বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতাকেই কবি একমাত্র মানদণ্ড মনে করেন। আধুনিক শিল্পস্রষ্টার কাছে ভাষা রূপের উপাদান হিসেবেই গৃহীত হয়ে থাকে। তবে সেই ভাবকে সাধারণ পাঠকের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে চান নি আহসান হাবীব। তাই ভাষাকে সরল ও গতিশীল করার দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। গদ্য-পদ্যের মিশ্রণকে তিনি তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। T. S. Eliot এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '...and I think that an interaction between prose and verse, like the interaction between language and language, is a condition of vitality in literature.' (Mcmlxvii : 152). কবিতার সঙ্গে গদ্যের মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশ শতকের তিরিশের দশকের কবিবৃন্দের প্রয়াসকে আহসান হাবীব সার্থকতার সঙ্গে স্বীকরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী তিরিশের কবিদের শব্দ-সচেতনতা সম্পর্কে বলেছেন :

> বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা।...শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।...নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ। (দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৯২ : ৩-৪)

আহসান হাবীবের কবিতায়ও আমরা তিরিশের কবিদের এই প্রবণতাসমূহের সাঙ্গীকরণ লক্ষ করব। তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই তিনি শব্দ-ব্যবহারে সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় তিনি এই ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। বিশেষ করে কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির সংযোগসাধনে তাঁর কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক. সারারাত গুঁতোগুঁতি, সারারাত মুখে মার মার
পরদিন দুপুরেতো মেলে পুরস্কার! ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আর তো আপনার মাথা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. বিজলি বাতির বোতাম টিপে আমি তৈরি হই
ওর মুখোমুখি হয়ে কিছু বলতে চাই; ('অভ্যাগত'/*সারা দুপুর*)

ঘ. বুদ্ধির চকমকি ঠুকে পথের মশাল
নিজেরাই জ্বেলে নেব, ('বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা'/*আশায় বসতি*)

ঙ. যেতে চাইলেই বলে,
এখন যুদ্ধটুদ্ধ চলছে
এখন জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

চ. তারপর সমস্ত সংসার কি আন্ধার, হায়রে বাজান। ('দাদাজান বলতেন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

ছ. মা নেই, বা'জান গেছে মেলায়, মেলায়
দেখে যান দেখে যান হুর পরীর নাচ'– বলে
সুন্দরালী সারারাত ময়ূর নাচায়। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আহসান হাবীবের কবিতায় কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। কবিতাকে সাধারণের কথনকৌশলের নিকটবর্তী করার জন্য তিনি অপ্রচলিত শব্দ পরিহার করেছেন এবং অভিধান-নির্ভরতা থেকে বাইরে থাকতে চেয়েছেন। ভাবনাকে তিনি শব্দের গাম্ভীর্য দিয়ে ভারী করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বাভাবিক শব্দ-বন্ধের আশ্রয়ে ভাব প্রকাশের কারণেই তাঁর কবিতার শরীরে নিরাভরণ সৌন্দর্যের দীপ্তি ধরা পড়েছে।

আহসান হাবীবের কবিতায় ইডিয়ম বা বাগধারার ব্যবহার বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। "কথ্যভাষার 'ইডিয়ম' বা বিশিষ্ট দেশজ রীতির ব্যবহার আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ-রীতি। ইডিয়ম ব্যবহারের ফলে ভাষায় সঞ্চারিত হয় সহজ স্বাভাবিকত্ব।" (মাহবুব সাদিক : ১৯৯১ : ৩০৩)। আহসান হাবীব ইডিয়মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কখনো সরাসরি কখনো-বা ইডিয়মকে ভেঙে তাতে তিনি নিজের ইচ্ছের অনুকূল আবহ সঞ্চার করেছেন। বাগ্‌-বিধির প্রয়োগে কেবল কবির শব্দ-সচেতনতাই প্রকাশিত হয় না, তাতে তাঁর জীবনভাবনারও প্রতিফলন ঘটে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> Idioms arise out of the contacts of daily life. They are the response of the human organism to the elements around it. They reflect the speed of life, the pressure of life, its very essance (Herbert Read 1950 : 55-56).

আহসান হাবীব ইডিয়মের এই শক্তিকে সার্থকতার সঙ্গে কাব্যরূপ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে লোককথা কিংবা লোককাহিনীর চূর্ণ অনুভবকেও তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির উপলব্ধির সম্মেলন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

ক. লিফ্‌ট্ ক'রব মানে
ওটা একটা কথার কথা।
আমরা হেঁটেই যাব। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

খ. জ্বি হুজুর একদিন এই দুই হাতে
লড়েছি এগারো হাত কুমীরের সাথে,
গাঙের কুমীর টেনে তুলেছি ডাঙায়
ভেঙেছি বাঘের মাথা এই বাম পায়। ('ছহি জঙ্গেনামা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. সহজে পাড়ের কড়ি গুণে দিয়ে
সেই ঢেউয়ে মত্ত এ জীবন; ('স্বজন'/*সারা দুপুর*)

ঘ. তিনি বোকার স্বর্গেই বাস করেন
একথা উপলব্ধি করেন অভিজ্ঞ মোত্তাকিম মুহূর্তেই ('রেখে যাবো'/*সারা দুপুর*)

ঙ. কাকের বাসায় রাখে না নিজের ডিম
অনায়াস-সন্তানের আশা নেই তার ('কাক-কোকিল'/*আশায় বসতি*)

চ. দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়! ('মায়ের ডাকের ছড়া'/*আশায় বসতি*)

ছ. চারপাশে রাক্ষসখোক্কস আর
ভূতপ্রেত বসিয়ে কেবল
আতঙ্কে চীৎকার করে ('যখন বিভ্রাট'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের কবিতায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার বহুল নয়, তবে বিচিত্র। তিনি যেমন ইংরেজি শব্দকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন, সেইসঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দকেও অবলীলায় কাব্যদেহে ধারণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে বিদেশি শব্দের ব্যবহার তেমন চোখে না পড়লেও ধীরে ধীরে তিনি কবিতার ভাবানুষঙ্গের প্রয়োজনেই বিদেশি শব্দভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। তাঁর কবিতা যত বেশি গদ্যভঙ্গির নিকটবর্তী হয়েছে ততই তাতে বেড়েছে বিদেশি শব্দের প্রভাব। বিশেষ করে মানুষের কথ্যভঙ্গিকে কবিতায় ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্য ভাষার শব্দকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। নাগরিক জীবনের বিবিধ অনুষঙ্গকে তিনি যখন কাব্যরূপ দিয়েছেন, তখন কথোপকথনে প্রযুক্ত বিবিধ বিদেশি শব্দকে তিনি অবলীলায় গ্রহণ করেছেন। সে-ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের আধিক্য লক্ষ করা যাবে। আবার কবিতার প্রকরণ-কলায় তিনি যখন অন্য কোন রূপ-এর শরণ নিয়েছেন তাতে প্রযুক্ত হয়েছে প্রচুর বিদেশি শব্দ। *ছায়া হরিণ* কাব্যের 'হক নাম ভরসা' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যেখানে চিঠির আদলে কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন কবি। জমিদারের শোষণ-নিপীড়নের বিস্তারিত উল্লেখ করে জনৈক মহম্মদ তালেবালি তেরোশ' একান্ন সালে জমিদারকে যে চিঠি লিখেছে, তাতে বিপুল-সংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি :

আদাব সালাম অন্তে সমাচার এই
যে, হুজুর কাল ফজরের অনেক আগেই
তামাম মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে
সহি-সালামতে
এসে নিজের বাটিতে পৌঁছেচি। এখন
সে কারণ
পত্রযোগে শতকোটি সালাম নিবেন
আর সবিশেষ সংবাদাদি পত্রে জানিবেন।

যখন জাহাজঘাটে নেমেছি,
তখন নিশিরাত্রি। মন
কিছুটা ঘাবড়ালো, তবু মালেকের নাম
নিয়ে যখন মাঠের মাঝে এসে নামলাম
দেখলাম আজব ব্যাপার,

বেশুমার
বাতি
আসমানের অতবড় ছাতি
ছেয়ে আছে। আজব রোশনাই
ডেকে কয় কিছু ভয় নাই। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটিতে আদাব, সালাম, সমাচার, হুজুর, ফজর, তামাম, মুরুব্বী, দোয়া, বরকত, সহি-সালামত, মালেক, আজব, বেশুমার, আসমান, ছাতি, রোশনাই প্রভৃতি-আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ থেকে কবির শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিপুলসংখ্যক বিদেশি শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও অভিধানের সাহায্য ছাড়াই পুরো কবিতাটির পাঠোদ্ধার সম্ভব। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু আরবি-ফারসি শব্দ : খোয়াব, মকসেদ, হাসেল, সাফ, বেয়াদবী, মাফ, গমগীন্, ফারাগ, নাজেহাল, মেহ্মানদারী, দাওত, বেদেরেগ, বেহ্তর, গোস্বা, কসম, শানাই, জিগরফাটা, গর্দান, জিন্দিগী, শান, আচম্বিতে, ফন্দি ইত্যাদি। একই কাব্যের ছহি 'জঙ্গেনামা' কবিতায়ও প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি। এই কবিতায় তিনি মধ্যযুগের পুথিসাহিত্যের প্রবণতাকে স্বীকরণ করেছেন। পুথিসাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আহসান হাবীবও এই ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করেছেন কবিতাটিতে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

জ্বি হুজুর, আমি সেই হুজ্জত্ সরদার।
জান নিয়ে বেঁচে আছি পাক-পরওয়ার
খোদাওন্দ করিমের করম ফজলে।
তবে কি না এলাহীর লানতের ফলে
হয়েছে এমন হাল। হাড়-মাংসহীন
আমি সেই খাক্সার হুজ্জত্ কমিন। ('ছহি জঙ্গেনামা'/ছায়া হরিণ)

এই কবিতাংশে আমরা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি। পুরো কবিতাটিই এ জাতীয় শব্দের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু আরবি-ফারসি শব্দ : একিন, ফখর, নেজার, মওত, ছিনা, বহর, আগ্, খোদা, ফরজন্দ, বেইমান, বে-এনসাফি, কবুল, ফিকির, নজর, শান, জিন্দিগী, ছবক, জবর, খবর, আছানক, তেজিয়ান, কাতার, গর্দান, আখের, দাদ, হাওয়ান, বেকসুর, ছতর, ইজ্জত, শরম, কাফন, আওলাদ, জারেজার, আজদাহা, গজব ইত্যাদি। আহসান হাবীবের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহেও আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। কিন্তু এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারে কবির মুন্সিয়ানার পরিচয় উপরিউক্ত কবিতা দু'টিতে মুদ্রিত হয়ে আছে বলেই আমরা মনে করি।

আহসান হাবীবের কবিতায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করার মতো। কবির ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দাবলি নাগরিক জীবনের রূপকল্প নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে তা মানুষের কথনভঙ্গির সঙ্গেও সম্পর্কসূত্র রচনা করেছে। কবির ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দও বিশেষভাবে তাঁর কবিতার ভাবানুষঙ্গের অনুগামী। তাই তাঁর কবিতার ইংরেজি শব্দকে আরোপিত মনে হয় না, বরং প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিতকে প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. 'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে (রোমান্টিক নাম বটে)
আমরাই 'কিউ' হয়ে যাই। ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আপনি ত' বেশ ব'লে বেড়ান
যা কিছু হোক থাকতে হবে 'জলি'। ('দ্বৈত'/*ছায়া হরিণ*)

গ. পূব পাশের রাস্তায় ই-পি-আর-টি-সি'র গর্জন
সাড়ে সাতটার জেট্ নামছে আকাশমাটি কাঁপিয়ে
পাশের বাড়ির আয়রণ্ডচুল মেয়েটি এইমাত্র

বাইরে বেরুলো,

এয়ারপোর্টে চাকরি তার।

একটা জিপ এসে থামলো দরজায়

আশরাফ সাহেব নেমে এলেন;

এক হাতে অলিম্পিয়ার বাক্স

আর অন্য হাতে টোস্টার। ('অভ্যাগত'/*সারা দুপুর*)

ঘ. আর তার দু'পকেটে ভ্যরাইটির টিকিটের বই–

অতিরিক্ত মই

একখানা। সারাদিন হোটেল-রেস্তোরাঁ। ('ডাবল কলাম'/*সারাদুপুর*)

ঙ. তোমার ক্যামেরার ফিল্ম যাকে তুলে নেবে

সে ত আমি নই ('আমাকে দাও'/*আশায় বসতি*)

চ. কেনাকাটা করেন না করছেন দেদার শপিং এবং শপিং তাই

দামটা শুধু জেনে নেন দাম কিছু কমাবার মত

বিনিথ্ ডিগনিটী কোন ছোট উক্তি মুখেই আনেন না

শুধু ছোট্ট করে বলেন ঠিক আছে তুলে দিন অতঃপর

ড্রাইভার ড্রাইভার রবে চীৎকারে মাথায় ওঠে হাট ('আসামী বিষয়ক'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ছ. মঞ্চের দু'পাশে দেখা যাবে দু'সারি মানুষ– ফ্রিজড্। ('দৃশ্য নির্দেশ'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

জ. কোথাও পড়ে না চোখে ব্লাডব্যাঙ্ক, অথচ প্রত্যহ

রক্ত নাও, রক্ত নাও বলে, দেখো সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়ায়

মানুষের রক্ত তবু অদৃশ্য সিরিঞ্জ বেয়ে যায় ('চিত্রমালা'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যের 'উনিশ কি বিশ' কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন কবি। সমালোচক মিজানুর রহমান খান বলেছেন, "গদ্যঢঙের ভাষা-বিন্যাস এবং সংলাপধর্মিতার গুণে এই কবিতাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সংলাপধর্মিতার কারণে মনে হয় যেন সমাজ-অভিজ্ঞ কেউ ক্রমাগত বর্ণনা করছে সমাজেরই 'সাধারণ মানুষ আর ভূঁই ফোড় উচ্চবিত্তের' চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।" (১৯৯১ : ২০৯)। রূপকধর্মী এই কবিতাটিতে কবি স্টেডিয়াম, ব্লেড, প্লাস্টিক ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের সঙ্গে কামিন, হয়রান, হেকিম, সওয়াল, নাজেহাল, আল্লার কুদরত, হাসেল, শুকরিয়া, মোকাম, হাজির, উজির, নাজির ইত্যাদি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আহসান হাবীব কবিতায় প্রচুর নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের চেয়ে স্থানবাচক বিশেষ্য বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এই প্রয়োগ-কৌশলে তাঁর কবিতা সময়-সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, যদিও স্বকালের সীমা অতিক্রমী অভিব্যক্তি তাতে অনুপস্থিত নয়। কয়েকটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য-যুক্ত পঙক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. ফরিদের ছোট ছেলে আমজাদ ('কাশ্মিরী মেয়েটি'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আমরা যাবো ছকু মিয়ার হোটেলে। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

গ. আমি যাবো তিন নম্বর হারু মিয়ার বস্তি ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

ঘ. এখনো নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার! (সেতু-শতক'/*রাত্রিশেষ*)

ঙ. ঐ ঘরে বাস করে কাজেম বয়াতী ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)

চ. মহাম্মদ তালেবালি, আমানীর পাড়, ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

ছ. দেয়ালে ভার্জিন মেরী, মোনালিসা/তারি মাঝখানে

তোমার কোমল দীপ্তি জয়নুলের তুলিতে অমর। (সম্রাট'/*ছায়া হরিণ*)

জ. বিলিয়ে নিঃশেষে কবে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস-এর পায়ে

প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের ('প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা'/*সারাদুপুর*)

ঝ. নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি ('তারা দু'জন'/*সারা দুপুর*)

ঞ. হায় আবু হোসেন তোমাকে মৃত জেনে
যদিও ঠকেছি, (‘তোমাকে মৃত জেনে’/*সারা দুপুর*)

ট. আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি (‘জাল’/*সারা দুপুর*)

ঠ. গগাঁ কিংবা ভ্যানগগের
কোনো মূর্ত বিষাদ আমাকে সঙ্গ দেয় (শিল্প-মানবিক’/*আশায় বসতি*)

আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি স্থানবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত :

ক. খানিকটা হেটে গিয়ে/মার্কুইস্ লেন ছাড়িয়ে
কিড স্ট্রীট পেরিয়ে/তারপর চৌরঙ্গি। (‘রেড্ রোডে রাত্রিশেষ’/*রাত্রিশেষ*)

খ. এখন নিবেছে আলো মিসরে ও দূর বেবিলনে! (‘পারাপার’/*ছায়া হরিণ*)

গ. ইমামগঞ্জের সব গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে হঠাৎ
কাজীর বিষণ্ন চোখ চলে গেলো দূরে বহু দূরে (‘রেখে যাবো/*সারা দুপুর*)

ঘ. মনীষা কি বাইজান্টাইন
নাইলের সবুজ? (‘মনীষা মনীষা বলে’/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. শহর পিরোজপুর
সরকারী স্কুলের খেলার মাঠ (‘আমার যাওয়া হয় না’/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

চ. কখনো পিরোজপুরে, খানজাহানে কাটিয়ে দু’দিন
পায়ে হেঁটে খুলনা যায়। (‘উনিশ কি বিশ’/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের কবিতায় নামবাচক এবং স্থানবাচক বিশেষ্য পদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে, কিন্তু কবির মানসপ্রবণতা অনুধাবনে উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহই আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট। নামবাচক বিশেষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ করি, কখনো তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকের নাম ব্যবহার করেছেন, কখনো ঐতিহাসিক চরিত্রের শরণ নিয়েছেন, কখনো-বা পৌরাণিক চরিত্রের আশ্রয়ে নিজের অনুভবকে শব্দবন্দি করেছেন। স্থানবাচক বিশেষ্য কখনো স্মৃতিমগ্নতার হাত ধরে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কখনো-বা কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার প্রয়োজনে স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আহসান হাবীবের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। কখনো তিনি বিশেষণের স্বাভাবিক ব্যবহার অক্ষুণ্ন রেখেছেন, কখনো বা বিসর্পিল বা বিসঙ্গত ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতায় ব্যঞ্জনা সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কবিতায় বিশেষণ ব্যবহার যে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে, রবীন্দ্রপরবর্তী কবিরা তাতে যুক্ত করতে চেয়েছেন নতুন ব্যঞ্জনা। আহসান হাবীরের কবিতায়ও বিশেষণ ব্যবহারের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। ‘বিশেষণ ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে বক্তব্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে মানুষ স্বভাবতই বিশেষণ প্রয়োগ করে। কবি-কল্পনায় যে ভাবের অঙ্কুরোদ্‌গম, পাঠকের চিন্তায় তারই বিস্তার ঘটে নানাবিধ উপমা ও বিশেষণের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, উপমাও সামগ্রিক বিচারে বিশেষণেরই বিস্তৃত রূপ।’ (তারেক রেজা ২০১০ : ৫১)। বিশেষণের ব্যবহার থেকে কবির মানসগঠনের ব্যাকরণটিও চিহ্নিত হয়ে যায়। বিশেষণ কবির অভিজাত মানসিকতার প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে। আহসান হাবীব বিশেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে কাব্যদেহে যে গতি ও দ্যুতি সঞ্চার করেছেন, তা বিশেষণকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* থেকে বিশেষণ-আশ্রয়ী কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে ধরছি :

ক. যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত। (‘দিনগুলি মোর’)

খ. কাশ্মিরী মেয়েটির তনু গোলগাল (‘কাশ্মিরী মেয়েটি’)

গ. কল্প কামজ কুমারী কন্যা জ্বলে প্রচণ্ড দিন শিখায় (‘আজকের কবিতা’)

ঘ. তীরবিদ্ধ দিনগুলি এ-মাটিতে চূর্ণ হয়ে ঝরে! (‘দ্বীপান্তর’)

ঙ. লাল মাটি, কালো পীচ্ শাদা নীল বালবের বুকে (‘দ্বীপান্তর’)

চ. তুমি পরেছ লাল টক্‌টকে একটা শাড়ি। (‘কোনো বাদশা’যাদীর প্রতি’)

ছ. জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান ('কনফেশান')

জ. জাগে অকুণ্ঠ অভিনয় আর চাতুরী লজ্জাহীন ('দিনের সুর')

ঝ. নতুন সূর্যের তীরে বিদ্ধ করে কুৎসিত মৃত্যুকে ('সেতু-শতক')

ঞ. তাদের বিকৃত সুর হৃদয়ের আনাচে-কানাচে। ('প্রদক্ষিণ')

ট. আবার উধাও পাখা সেই সব পুরনো পাখির। ('হে আকাশ হে অরণ্য')

ঠ. বন্ধুর পথের 'পরে রিখিলাম নাম, ('স্বাক্ষর')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহের নিম্নরেখ শব্দগুলি বিশেষ্যের শরীরকে বিশেষ ভাবে ও ব্যঞ্জনায় উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষণ ব্যবহারের ধরন থেকে একজন সৃজনশীল মানুষের মনোভাবের ব্যাকরণটিও অনেকটা আঁচ করা সম্ভব। গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে বিশেষণ ব্যবহারে বিশেষত্ব অর্জন অসম্ভব বলেই আমরা মনে করি। আহসান হাবীব শব্দশরীরে অনুভবের নির্যাস ঢেলে দিয়ে শব্দকে জীবন্তসত্তায় পরিণত করেন যা কবির অভিজ্ঞতারই শিল্পিত স্মারক হয়ে ওঠে। কারণ 'শব্দেরও চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৩ : ৮৫)। শব্দের অভিজ্ঞতা সৃজনপ্রতিভার সংস্পর্শে সংহত হয়ে অভিধানসম্মত অর্থের সীমানা অতিক্রম করে যায় বলেই কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশার চারপাশে কোন দেয়াল থাকে না। আমরা আহসান হাবীবের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কবির বিশেষণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :

নিষ্পাপ মূঢ়তা, ক্লান্ত দিন, অনন্ত জীবন, অমর মিনার, সোনামুখী নারকেল, ম্লান মুখ, শ্রান্তিহীন পরিবেশ, রৌদ্রদগ্ধ দিন, কুৎসিত কঙ্কাল, সভ্যতার চতুর দালাল, পাণ্ডুর কপাল, ভ্রষ্টনীড় হৃদয়, রৌদ্রপীত মাটি, দুর্মর পিপাসা, স্তব্ধবাক্ পাখি, মায়াবিনী নারী, ইস্পাত-কঠিন দিন, ভোরের উজ্জ্বলতনু বুক, আজব রোশনাই, জিগরফাটা রক্ত, সমুদ্রের কালো বুক, মানবিক তৃষ্ণা, সতর্ক সন্তান, দুঃস্থ পৃথিবী, কুৎসিত কুটিল কামনা, অজেয় বিষাণ, অনিন্দ্যসুন্দর নারী, বলিষ্ঠ বাহু, সোনামাখা বিকেল, অমর কবিতালোক, বিপুল ত্যাগের মহিমা, উজ্জ্বল মনীষা, আতশী নজর, অকৃত্রিম বাসনা, মুক্ত বুক সঙীন, আবিষ্ট আত্মা, হৃতদীপ্তি অথৈ বিশ্রাম, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্নতার জ্বালা, জ্যোৎস্না কণ্ঠ, বিষণ্ণ আলো, আদিম আবেগ (*ছায়া হরিণ*); দক্ষিণ হাওয়া, সোনামাখা ধান, নির্লজ্জ পিপাসা, নির্মল বাসনা, সুচতুর বরদাতা, বিশুদ্ধ সোনা, আটপৌরে দিন, সমুদ্রপ্রাণ আশা, প্রাচীনতম বিধাতা, অবিনশ্বর কবিতা, ছিন্ন-ভিন্ন হাওয়ার নখর, বাসনা-বিহ্বল চোখ, ঘাসের নরম নম্র কণা, প্রজ্ঞাবান গৃহস্থ, অনিকেত প্রেয়সী, বিস্মিত হৃদয়, নিবিড় সন্ধ্যা, সজীব অবুঝ পুতুল, ক্লিষ্ট হৃদয়, অবিকল হৃদয়, সরীসৃপ শরীর, প্রখর কোনো প্রতিভা, দুর্লভ পৃথিবী, গভীর নিঃসঙ্গতা, ডিসটেম্পার্ড দেয়াল, উজ্জ্বল ক্লান্তি, লাবণ্যের অশেষ বিস্তার, ক্লান্ত নদীতীর, বয়স্ক মালিক, দ্বিচারিণী জননী, দুর্বিষহ আশার মুকুল, ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ, মহৎ মধুর কান্তি, পরিত্যক্ত পুরনো বাগান, অবিনশ্বর জন্মভূমি, দুর্গম পথ, বিভ্রান্ত দিন, মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি, বালখিল্য মত্ততা, স্বনির্ভর আলোর জগৎ, অনভিজ্ঞ মনস্বিতা, উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল শিখা, শিশির ধোয়া সবুজ ঘাস (*সারা দুপুর*); মসৃণ সদয় দীর্ঘ মই, জীবনের আটপৌরে রঙ্গমঞ্চ, উদ্দাম অঙ্গভঙ্গি, সুসম্পন্ন ইতিহাস, উন্মাদ চীৎকার, আসন্নপ্রসবা অসংখ্য কাকের ডিম, দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূত, পীড়িত পাঞ্জা, মুগ্ধ স্বজন, অটল করতল, ঘরকুনো বেড়াল, অমলধবল পাল, নির্মম বিদ্রুপের ঘণ্টা, রক্তচক্ষু কোন এক কৃষ্ণশ্মশ্রু-সজ্জিত পুরুষ, দুর্বোধ্য চীৎকার, বুদ্ধির চকমকি, প্রজ্ঞার আলোকে চোখ উজ্জ্বল, অসীম সাহসে অটল বুক, অবিজ্ঞ সংসারী, গভীর গম্ভীর আর জ্বালাময় আবেগ, সমৃদ্ধ কারুকাজ, অস্থির ব্যাকুল প্রাণ, ব্যথিত প্রবীণ পথচারী, শ্বাসরুদ্ধ যৌবন, জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোল, বাস্তুহারা যৌবন, বিক্ষুব্ধ দর্শক, বেহেশতী বাদশাহী, আলোকিত আত্মা (*আশায় বসতি*); সুশোভন স্বাধীন শৈশব, বিচলিত মানব-সন্তান, স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস, দিশেহারা কাঠবেড়ালী, সুসজ্জিত বাগান, বিপুল ভবিষ্যৎ, কোলাহলমুখর হৃদকেন্দ্র, পরার্থপর সভ্য, সুতীক্ষ্ণ স্বর, নীলিমা মলিন চাঁদ আঁধার চরাচর, অলৌকিক হুইসিল, আস্তিনছেঁড়া গেরুয়ারঙ কামিজ, সারিবদ্ধ মাছ, বিজ্ঞাপন-বিশারদ সভ্যতা, সর্বগ্রাসী দানবনিনাদ, নিস্তরঙ্গ জলতল, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, যন্ত্রকম্পিত অচেনা বন্দর, জান্তব নিনাদ, গুলিবিদ্ধ হাজার করোটি, অটল প্রতিজ্ঞা, দুর্বার নৈঃশব্দ্য, ঝলকিত পিপাসার জল, বিচিত্র বেলুন, অপরূপ উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণ চাবুক, স্তব্ধ বাতাসের বুক, বিষণ্ণ বিমূঢ় কয়েকটি মানুষের মুখ, দানবাকার কলঘর, ক্ষিপ্ত পা, বিদীর্ণ মাটি, দুর্বোধ্য তিমির, অক্ষম আক্রোশ, প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুক, দীর্ণবুক দুঃখী মানুষ, উলঝলুল নৃত্য, লাল নীল সবুজ সমস্ত রঙ, এতল বেতল শব্দ, পরিপাটি বিছানা, অর্থহীন আস্ফালন, সবুজ ঝালর এই সজ্জিত নিসর্গ, প্রবল ঘৃণায় প্রাচীন প্রাচীন কোন গুহা, বিষণ্ন সভা (*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*); ধাবমান প্রাচীন হরিণ, অপরাজেয়

> প্রতিদ্বন্দ্বী স্মৃতিহরণ, গনগনে আগুন, অর্ধনির্মিলিত চোখ, পোহাতী তারা, অনবরত অবিরল স্বপ্নস্রোত, রঙিন উজ্জ্বল জামা, দমাদ্দম আওয়াজ, শাদা নীল অথবা সবুজ এমন কি ফ্যাকাশে হোক তার রং, জন্মান্ধ তুষার, দুর্বিনীত মাটি, অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা, সৌখিন উচ্চারণ, ঘর্মাক্ত শরীর ধুলো, অনুপম সৃষ্টি, সুসজ্জিত সুশ্রী শিশু, মারাত্মক ব্যাধি, অপার্থিব আনন্দ, উজ্জ্বল গন্তব্য, প্রকাণ্ড আলো, অস্থির পুরুষ, তীক্ষ্ণ বল্লম, দগদগে ঘা, অলৌকিক বাসগৃহ, শুকনো গোলাপ পচা আপেল, শূন্য ঝনঝন আওয়াজ, লাল নীল সবুজ কাগজ, পুরনো সংলাপ, ফুলের মলিন রেণু পুবের বাতাস, নিত্যক্রোধ প্রবল বিক্রম, স্খলিত নক্ষত্রের পোড়া গন্ধ, বিপুল সমাবেশ, অপূর্ব ভাটিয়ালীর কথা, বিশালকায় কালো ঘোড়া, টান টান শরীর, ভরা কলসী নীল শাড়ী রুপোর ঝুমকোর কথা, জয়নালের অলৌকিক বাঁশি, সূক্ষ্ম কৌশল, পরিতৃপ্ত দর্শকমণ্ডলি, উজ্জ্বল হলুদ আর রুপালি জলের রেখা, নিপীড়িত পিষ্ঠ, হৃষ্ট শবশাবকেরা, আর্তস্বর-শিহরিত এই রাত্রি, উথাল পাথাল মেঘ, দুর্বহতা দুর্ভার জীবন, উজ্জ্বল সান্নিধ্য, স্পর্ধিত বালক, কর্দমাক্ত জল ভাঙা সাঁকো, পোড়া নিসর্গ শূন্য বাসন নীল মাঠ ভাঙা লাঙল মহাসড়ক, বানোয়াট অন্ধতা, আবহমান শোভাযাত্রা, অনিশ্চিত আরেকটি দিন, হন্তারক ঘণ্টা, সাজানো শয়নকক্ষ, টানটান নদী, খররৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের পাখি, টলমল শিশির, শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা, স্নিগ্ধ মাটির সুবাস, সরু পথ ধু ধু নদীর কিনার, উধাও নদী, অবোধ বালক (*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*); ছোট নীল রেলগাড়ি, তীক্ষ্ণ হুইসিল, অনন্ত রেলপথ, ভগ্নসেতু পাহাড়ের ধ্বস, রক্তাক্ত হরিণ শিশু, অনন্ত সবুজ, অলৌকিক জোয়ার, সমৃদ্ধ মরাই, তুমুল বর্ষা, রঙিন বাঁশের বাঁশি, নিভন্ত উনুন, ধাবমান বৈরী বাতাস, দীর্ঘ পথ ভালোবাসার, জান্তব গর্জন, ঘেয়ো কুকুর, মুমূর্ষু বাঘ, ক্রুদ্ধযুবা বিভ্রান্ত যুবতী, সবুজ শস্যকণায় সমৃদ্ধ বুক, ক্লান্ত দেহভার, কি আশ্চর্য কি বিশাল রাত, পুরাতন বৃক্ষরাজি কি রকম টালমাটাল অস্থির বাতাস, চূর্ণ শিলা, বুনো ঝাউ, স্খলিত তারা, এতল বেতল নাচ, প্রসন্ন পাখির নীড়, খুঁটিহীন চালহীন আবাস, ঈশ্বরের গাঢ় কণ্ঠস্বর, সারিবদ্ধ স্নানার্থী, নিরঞ্জনা নদী, পঙ্গু-বিকৃত আমাদের চেতনা, অবিনাশী অস্ত্র, রক্তশূন্য মানুষ, স্তূপাকার পি এস পি, ভাসমান অথৈ নদী, আত্মমগ্ন সন্ত, আদিম বাগান, অলৌকিক আচ্ছাদন, অসহ্য কষ্টের হাসি, সফেদ চাদর, পৃথিবীর রক্তাক্ত শয়ান, নদীর জলে কালো কালো ছবি (*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)।

আহসান হাবীব শব্দ ব্যবহারে বিশেষ রক্ষণশীলতা পরিহার করেছেন। তাঁর বলার কথাটিকে বলিষ্ঠ করার প্রয়োজনকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সেই প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী ভাষা নির্মাণের দিকে যত্নশীল থেকেছেন। শব্দের শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। শব্দকে গ্রহণে তিনি যেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি শব্দের শরীরে নতুন অনুরণন সঞ্চারের দিকেও মনোযোগী ছিলেন কবি। তাই তাঁর কবিতার পরিচিত শব্দবন্ধই পাঠকের মনে অপরিচয়ের আবহ সঞ্চার করে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ঘরের দেয়ালে সুসজ্জিত শব্দমালা জুড়ে দিয়েছেন এবং সেখানে গড়ে উঠেছে অনুভব ও উপলব্ধি বিচিত্র এক সংগ্রহশালা। 'এতল বেতল শব্দাবলি এখন আমার গানের মালা'– *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'এখন আমার' কবিতায় কবির এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে, শব্দের সঙ্গে তাঁর সংসারযাপনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হয়েছে। এই স্বাস্থ্যসম্মত শিল্পসৌকর্যের সান্নিধ্যে এলে পাঠকচৈতন্যে যে অনুরণন সঞ্চারিত হয়, তা শব্দের সঙ্গে শব্দের গভীরতর সম্পর্কসেতুর ফল, যা উৎসারিত হয় আহসান হাবীবের আত্মখচিত শব্দ-শরীর থেকে।

অলঙ্কার

একজন কবির সৃজনবিশ্বে পরিভ্রমণকালে আমরা কেবল তাঁর সৃষ্টিকর্মেরই সান্নিধ্য লাভ করি না, অন্তরের গভীরদেশে সেই স্রষ্টার পায়ের শব্দ শুনতেও পাই। অর্থাৎ, কবিতার ভেতর দিয়ে কবির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সেতুবন্ধ রচিত হয়। সেই অর্থে কবির অনুভব-উপলব্দি কবিতা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা ঘরোয়া পরিমণ্ডল পরিত্যাগ করে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় অনুপ্রবেশ করে। আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সাজসজ্জার সম্পর্কের মতো কবিতার অলঙ্কার কেবল বহিরাঙ্গিক ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু নিজেকে অন্যের কাছে অনন্য কিংবা অসাধারণ হিসেবে উপস্থাপনের অভিপ্রায় থেকে কবিতায় অলঙ্কারের আবির্ভাব– এই দাবি আমাদের কাছে সঙ্গত মনে হয়। 'কবিতা যেহেতু জীবনাভিজ্ঞতারই বিশিষ্ট প্রকাশ, যা অন্যের জীবনভাবনাকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে রচিত, তাই কবিতাকেও অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হয়। অলঙ্কার মূলত মানুষের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসারই শিল্পিত প্রয়াস।' (তারেক রেজা ২০১০ : ৭৫)। তবে কবি ও কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে এই মতের সমর্থন মিলবে– এমনটি আশা করা অসম্ভব। অলঙ্কারহীন শব্দবন্ধের বিশিষ্ট বিন্যাস থেকেও সার্থক কবিতার জন্ম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৮ : ২০১) বলেছেন, 'আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা'। এই ভাষা নিঃসন্দেহে সাধারণ ভাষা নয়। কবির জীবনবীক্ষা ও শিল্পদৃষ্টির সারাৎসার তাঁর ভাষায় যে দীপ্তি সঞ্চার করে তার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা ও ভঙ্গির ব্যবধান সর্বত্রই প্রবল না হলেও অল্পবিস্তর ফারাক থেকেই যায়। একজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেয়া যাক :

> সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যশীল এবং হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা চিৎস্পন্দন। এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা– এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎস্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার।' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৬৩ : ৬)

কবিভাষার এই অসাধারণত্বকে আমরা অলঙ্কার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সাহিত্যসমালোচক অমরেন্দ্র গণাই কবিভাষার বিশেষ প্রবণতাকে রঙ ও সুর হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন : 'লৌকিক ভাষাই কবি-ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় আকর্ষণে কবি-ভাষায় রূপান্তরিত হয়। লৌকিক ভাষায় কেজো জগতের কাজ চলে বটে, কিন্তু যেখানেই আবেগের ঘনীভবন হয়, সেখানেই ভাষায় ধরে রঙ, ধরে সুর।' (১৯৮৪ : ১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলার কারণ হিসেবে বলেছেন, 'সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।' (২০০৬ : ১২/৪৭৩)। এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে আরোপিত অলঙ্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর মতে, ভাব ও ভাবনার প্রকাশকে বিশেষায়িত করার প্রয়োজনে যে অলঙ্কারের আবির্ভাব, তাই কেবল সাহিত্যের জন্য স্বাস্থ্যকর।

অলঙ্কারের আশ্রয়ে চিন্তা ও কল্পনাকে অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা থেকেও একজন কবির ব্যক্তিচিহ্নিত কবিপ্রতিভার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হতে পারে। কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগে মিতব্যয়িতা অপরিহার্য বলে মনে করতেন আহসান হাবীব। তিনি উপলব্ধি করেছেন, অলঙ্কার ভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা আর কাব্যদেহে স্বতন্ত্র স্বভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। আহসান হাবীব (১৯৮৩ : ১৭) ব্যাখ্যা করেন যে, অলঙ্কারের আধিক্য এবং উপমার যথেচ্ছ ব্যবহারে কবিতার প্রবহমাণতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং অপরিমিত অলঙ্কার-আশ্রয়ী কবিতার প্রগলভ উচ্চারণে সৃষ্টির অন্তর ও অবয়ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহসান হাবীবের কবিতায় অলঙ্কার-অন্বেষণের মাধ্যমে আমরা অলঙ্কার-বিষয়ে কবির পরিমিতিবোধ ও প্রকাশ-প্রবণতার স্বরূপ চিহ্নিত করতে চাই।

শব্দালঙ্কার

শব্দ বা ধ্বনি (sound)-ই যখন অলঙ্কারের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে অলঙ্কারশাস্ত্রে তাই শব্দালঙ্কার হিসেবে স্বীকৃত। এ অলঙ্কারের সার্থকতা নির্ভর করে পদ-ধ্বনি, বর্ণধ্বনি, কখনো-বা বাক্যধ্বনির ওপর। শব্দালঙ্কারে অর্থাসন্ধানের কোন গুরুত্ব নেই। শব্দ বা ধ্বনি পরিবর্তনে এই অলঙ্কার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। শব্দালঙ্কার ব্যবহারে কবিতার ভাষা সঙ্গীতময়তা লাভ করে।

অনুপ্রাস

কবিতায় অনুপ্রাসের উপস্থিতিতে প্রচল শব্দও প্রচণ্ড গতিময়তা লাভ করে, যার প্রভায় পাঠক-শ্রোতা সম্মোহিত হন। কবির বাণী কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশের কাজটি অনুপ্রাসের প্রভাবে সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। একই ব্যঞ্জনবর্ণ ও বর্ণগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বাক্যমধ্যে আবৃত হলে অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়। অনুপ্রাস ইংরেজি alliteration-এর সমধর্মী। বাংলায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস এবং ছেকানুপ্রাসই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। এছাড়া শ্রুত্যনুপ্রাস নামে এক প্রকার অনুপ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন কোন কোন আলঙ্কারিক। প্রকৃত অর্থে শ্রুত্যনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারীরূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন কবি আদ্যানুপ্রাস নামে আরেক প্রকার অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন। নরেন বিশ্বাসের (১৯৮৮ : ৪৯-৫০) মতে, কবিতার পাদান্তের সাথে পাদান্তের এবং চরণের শেষের

শব্দটির সাথে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দটির ধ্বনিসাম্য থাকলে তা অন্ত্যানুপ্রাস হিসেবে স্বীকৃত হবে। অবশ্য অমরেন্দ্র গণাই এই অলঙ্কারকে স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলতে রাজি নন। তাঁর মতে, 'অন্ত্যানুপ্রাস যেহেতু বাঙলা কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেকারণে অন্ত্যানুপ্রাসকে পৃথকভাবে অলঙ্কার রূপে নির্দিষ্ট করা অর্থহীন।' (১৯৮৪ : ৫)। বৃত্ত্যনুপ্রাস মূলত সমস্ত অনুপ্রাসেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক, কারণ এই অনুপ্রাসও একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলেই জন্ম লাভ করে। নরেন বিশ্বাস (১৯৮৮ : ৫১) বৃত্ত্যনুপ্রাসের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন– ক. একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ দু'বার ধ্বনিত হবে, খ. একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার ধ্বনিত, গ. ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে (বন>নব ধ্বনি সাদৃশ্য) মাত্র দু'বার ধ্বনিত এবং ঘ. যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ব্যঞ্জনগুচ্ছ বহুবার ক্রমানুসারে ধ্বনিত হবে। ছেকানুপ্রাসে দুই বা তার অধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা অযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়। শ্রুত্যনুপ্রাস বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারটি ধ্বনি এখানে সাদৃশ্যধ্বনি রূপে গৃহীত হয়। এমনকি কম্পনজাত ('র') এবং তাড়নজাত ('ড়') ধ্বনিও উচ্চারণসাদৃশ্যের কারণে শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করে। আদ্যানুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসের বিপরীত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানে চরণের প্রথম শব্দের সঙ্গে পরবর্তী চরণের প্রথম শব্দের ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হয়। আহসান হাবীবের কবিতা থেকে অনুপ্রাসের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

অন্ত্যানুপ্রাস

ক. নীল অরণ্যে এলো অপঘাত অকস্মাৎ
যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত ('দিনগুলি মোর'/*রাত্রিশেষ*)

খ. তনুর তনিমা ঘিরে আজ নেই হৃদয়ের ডাক
কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক। ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

গ. হয়তো ভরা নদীর মাঝে বৈঠা ফেলে
ঠায় বসে তার কাটছে বেলা উজান ঠেলে। ('কাহিনী নিরন্তর'/*আশায় বসতি*)

ঘ. ভোরের নদীর মোহনা শেষ
আরেক নদীতে নতুন ভোর
যতদূরে যাই তুমি অশেষ
পালে উদ্দাম নতুন জোর। ('যত দূরে যাই'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. দু'পাশে চীৎকার ওঠে, শোনা যায় পুরাতন শ্লোক :
হে বান্দা লজ্জিত হও, শান্ত হও, নত করো চোখ। ('সময় অসময়'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

বৃত্ত্যনুপ্রাস

ক. লাল মাটি, কালো পীচ্ শাদা নীল বালবের বুকে ('দ্বীপান্তর'/*রাত্রিশেষ*)
খ. পৃথিবীর পথে পথে দিয়ে যাই সহজে জাগিয়ে ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)
গ. সে চায় নতুন কোনো আশ্বাসের বাণী। ('সে আসে'/*সারা দুপুর*)
ঘ. শূন্যতাকে একমাত্র সত্য বলে রেখে যাবো দুয়ারে সবার। ('অসুখ'/*আশায় বসতি*)
ঙ. তুমি কিছু বিদ্রূপের হাসি রেখে অনায়াসে চলে যেতে পারো ('মুখের ছবি'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
চ. আজন্ম তোমার সঙ্গী, স্বপ্নে আছি সংগ্রামেও আছি ('আমি আছি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
ছ. ডাহুকের ডাক আর শিশিরের শব্দ তার স্বপ্নে তুলে নিতো। ('রূপান্তর'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

ছেকানুপ্রাস

ক. নীল রক্তের অভিশাপে ঘেরা জাগে নিপিষ্ট রিক্ত দ্বীপ। ('আজকের কবিতা'/*রাত্রিশেষ*)
খ. এখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি ('একটি মহৎ কবিতার খসড়া'/*ছায়া হরিণ*)
গ. ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার ('এসো সঙ্গী হই'/*সারা দুপুর*)
ঘ. দ্বৈত সুরের চতুর ভঙ্গি রঙ্গে ('দু'টি মানুষ একটি ঘোড়া'/*আশায় বসতি*)
ঙ. বর্ষাক্রান্ত দিগন্তে চেয়ে অপেক্ষায় বসে আছি ('বর্ষাবিষয়ক কবিতা : কায়সুলকে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
চ. তুমি সন্ধ্যার সিন্ধুপাখির ঘরে ফিরে আসার ভঙ্গি ('পাখিদের বলি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
ছ. কুঁড়ির গন্ধ অন্ধ আবেগে অনাদি কালের দহনে। ('কান্না'/*প্রেমের কবিতা*)

শ্রুত্যনুপ্রাস

ক. ব ভ : প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু। ('এই মন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)

খ. ত থ : জনহীন রাজপথে অন্ধকারে ক্লান্ত দুই হাতে
আর তার সাথে ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

গ. ড়. ঢ় : মহম্মদ তালেবালি, আমানীর পাড়
তেরোশ' একান্ন সাল, বারোই আষাঢ়। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

ঘ. ক খ : আসতে দাও হাওয়া
উঠুক ভরে বুক
রোদের আরশিতে
দেখতে দাও মুখ। ('স্বগত'/*আশায় বসতি*)

ঙ. দ ধ : ভেবেছিলাম তোর ঘরে তোর দুঃখে সুখে কাঁদি
তুই পাপ বলে দোর বন্ধ করে করলি অপরাধী। ('হায় মালিনী'/*প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের অনুপ্রাস-আশ্রয়ী উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর কবিতায় অনুপ্রাসের উপস্থিতি পাঠকের চোখে ও কানে স্বতন্ত্র অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ, তাঁর কবিতা অনুপ্রাস-ভারাক্রান্ত নয়, বরং অনুপ্রাসের অন্তর্গূঢ় বুননেই তাঁর কাব্যপঙ্ক্তি সঙ্গীতময়তা লাভ করে। তিনি কবিতায় ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির প্রয়াসকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করার পরিবর্তে কানের গভীরে প্রবেশের পথটিকে প্রদৃপ্ত করার কাজে লাগিয়েছেন বলেই প্রাণের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা সহজতর হয়েছে।

আহসান হাবীবের কবিতায় শব্দালঙ্কারের অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস-এর ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুকরণে অনেক কবিই সচেতনভাবে এইসব অলঙ্কার সৃষ্টির প্রয়াস দেখিয়েছেন। বিশ শতকের তিরিশের কবিরা সচেতনভাবে এইসব প্রসঙ্গ বরং এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় চল্লিশের কবিতায়ও এসবের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো নয়। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নিবিড় পাঠে অলঙ্কারশাস্ত্রের আরো কিছু অনুষঙ্গ যেমন– যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ইত্যাদির দু'য়েকটি দৃষ্টান্ত হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু তা আহসান হাবীবের কবিতার প্রকরণ-প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করবে না বলেই আমরা মনে করি।

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহের অর্থের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়। এই অলঙ্কারে শব্দধ্বনি অপ্রধানরূপে প্রতীয়মান, অর্থই এই অলঙ্কারে মুখ্য ও মৌলরূপে বিবেচিত। তাই একজন কুশলী শিল্পস্রষ্টা অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে সমার্থক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতায় অর্থালঙ্কারের আবেদন বহাল রাখতে পারেন। নরেন বিশ্বাস শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এইভাবে : 'শব্দালঙ্কারে শব্দ পরিবর্তনে অলঙ্কারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, অর্থালঙ্কারে অর্থ ঠিক থাকলে অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে। এবং এ মৌলিক আদর্শই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য সূচিত ক'রেছে।' (১৯৮৮ : ৬৫)। আহসান হাবীবের কবিতা থেকে অর্থালঙ্কারের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

উপমা

উপমা সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার। বিজাতীয় দুইটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে কবিকল্পনা চমকপ্রদ সংহতিপ্রাপ্তির ফলে উপমার সৃষ্টি হয়। এই উপায়ে প্রচুর অলঙ্কার সৃষ্টি সম্ভব হলেও সাধারণভাবে তা উপমা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন, 'পৃথক পৃথক জাতি বা শ্রেণীভুক্ত দুটি পৃথক উপাদানের মধ্যে কোনো ঐক্য, সংগতি বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে সব অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়, সেই সব অলঙ্কারের নাম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার।'

(১৩৬৩ : ৮৯)। উপমাই সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের প্রধান উপজীব্য যা কবিকল্পনাকে দান করে একটি দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা এবং এই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব কবির অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার ওপরই নির্ভর করে। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, 'কাব্যে শব্দ বা বাক্য একটি বিশেষ সংহতি এবং ধ্বনিবৃত্তির সাহায্যে বক্তব্যকে মুক্ত করে। যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উপমা একটি আশ্চর্য কৌশল।' (১৯৮৯ : ৬৪)। এই 'আশ্চর্য কৌশলে'ই সৃজনশীল ব্যক্তিচৈতন্যের অন্তর্গত অনুরণন অবয়বপ্রাপ্ত হয়। 'একজন কবি যখন মূর্ত এবং বিমূর্তের মেলবন্ধন রচনা করেন তখন পাঠকও কল্পনাপ্রতিভার অনুরণন অনুভব করেন এবং কবির সৃজনীশক্তির অংশীদার হিসেবে পাঠকের চৈতন্যের নানা দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উপমা অদৃশ্য এবং ইঙ্গিতকে ইন্দ্রিয়ের সীমায় নিয়ে আসে। ফলে কবির কল্পনাপ্রতিভার সঙ্গে পাঠকের উপলব্ধির যোগসূত্রটি দৃঢ়বদ্ধ হয়।' (তারেক রেজা ২০১২ : ১১৫)। সন্ধানধর্মিতা বা আবিষ্কারপ্রবণতাকে রোমান্টিকতার দাবি হিসেবে চিহ্নিত করে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'বিশ্বের আপাতবিদৃশ্য বস্তুরাশি– আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হ'য়ে থাকে– তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ।' (১৯৯৯ : ৫২)। কবিতায় একজন সংবেদনশীল শিল্পস্রষ্টার নিজস্ব পৃথিবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হলেও কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঠক আপন ভুবনের অজানা ও অধরা অভিব্যক্তিকেও স্পর্শ করেন। উপমা সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য : 'উৎকৃষ্ট উপমা যেন কবিগণের স্বাভাবিক বাক-ভঙ্গি– সে যেন ভাবের অলঙ্কার নয়, তাহার যথাযথ প্রকাশ– যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাকে ভাষায় চিত্রিত করিবার উপায়।' (১৮৭৯ : ৪৩)। কবিকল্পনার অন্তর্নিহিত আভিজাত্যের সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তা স্থাপনে উপমা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উপমা কবির প্রকাশকলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সরল এবং সাধারণ সাদৃশ্যের উল্লেখ থেকে কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য অন্বেষণে আগ্রহী। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে কাব্যলেখা বোধহয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। (১৩৮৪ : ৩৯৩-৯৪)

উপমার আশ্রয়ে কবির জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করে। একে কবিত্বের মানদণ্ড হিসেবে শনাক্ত করার প্রয়াসও অলঙ্কারশাস্ত্রে অনুপস্থিত নয়। প্রসঙ্গত কবি জীবনানন্দ দাশের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যিনি উপমাকেই কবিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আত্মগত উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের মাধ্যমে একজন শিল্পী কেবল দৃশ্যমান বস্তুকেই নয়, স্বপ্ন কিংবা কল্পনার মতো বিমূর্তকেও পাঠকের বিশ্বাসের সীমায় পৌঁছে দেন। উপমা কবির উপলব্ধির সারাৎসারকে স্ফটিক-সংহতি দান করে। উপমা কখনো কখনো কবির প্রকরণপ্রবণতার প্রকৃতি বা প্রতিকৃতিও চিহ্নিত করে। উপমা সম্পর্কিত উপরিউক্ত বিবেচনাসমূহ সামনে রেখে আহসান হাবীবের কবিতায় উপমার স্বভাব, প্রভাব ও প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে :

রাত্রিশেষ

ক. দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো ('দিনগুলি মোর')

খ. কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দুটি সাপের মতন ('কাশ্মিরী মেয়েটি')

গ. মেঘলার দিনে নোন্‌তার মত বিয়েটা নেহাৎ মন্দ নয়। ('বিয়ে')

ঘ. আমার আত্মার তৃষ্ণা অগ্নিপক্ষ বিহঙ্গের মত ('সেতু-শতক')

ঙ. পঁচিশ বছর ধরে চেনা সেই গ্রাম
ঢেকে গেছে স্টবিয়াই নগরীর মত। ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ')

চ. শাণিত খড়্গের মত হানে যদি বাসনার শব ('ঝরা পলাশ')

ছ. খসে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধসে ধসে পড়ছে। ('মৃত্যু')

ছায়া হরিণ

ক. প্রথম কান্নার মত ঝরে পড়া কুয়াশার জাল ('শীতের সকাল')

খ. মৃত্যুর মতন তার সারা দেহ শীতল ('চরিতাখ্যান : নববর্ষ')

গ. জীবন কেন মার খাওয়া এক বোবা পশুর মত
ছুটে পালায় অনেক দূরে যতই বলি তত! ('দ্বৈত')

ঘ. সেকান্দার শা'র মত ছিল মোর শান ('ছহি জঙ্গেনামা')

ঙ. পাখির ডানার মত
ছিল তার অসীম নীলিমা; ('অন্যদিন')

সারা দুপুর

ক. এখন তার সম্রাজ্ঞীর মতন মহিমা! ('পুতুল')

খ. আটপৌরে দিনের বকে নিয়ত সঙ্গীর মত/খুশি হই, ('এসো সঙ্গী হই')

গ. তাকে দেখি নিজের মনের আর্শিতে সকালসন্ধ্যা অনিকেত প্রেয়সীর মত! ('তারা দু'জন')

ঘ. হৃদয়ে জাগ্রত আছে অবিকল কৈশোরের মত/তার নাম প্রেম ('স্বজন')

ঙ. কেননা তাকেও দেখি দুঃখী মানুষের আত্মার মতই/নত ম্লান ('তার খুশি আমার')

চ. দেশ থেকে দেশান্তরে গতি তার অব্যাহত সম্রাটের মত। ('সে আসে')

আশায় বসতি

ক. সেই নদী দেখতাম ভাবতাম কোনো অপরূপ নর্তকীর মত ('সেই নদী')

খ. বিশ্রামের সব সুখ নদীর জলের মত গায়ে মেখে/ঘুমিয়েছে? ('সেই নদী')

গ. শ্বাসরুদ্ধ যৌবনের যন্ত্রণার নগ্ন আর্তস্বর
তার কণ্ঠে বেজে ওঠে চমকিত দর্শনের মত। ('সপক্ষে যদিও')

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো

ক. অশ্লীল সেসব শো-কেস মৃতদেহের মত/ক্রমাগত ফুলে উঠছে ('সমীপেষু')

খ. আবার ঠিক সেই রকম কাঁদছি
একজন সুখী রাজার মত। ('আমার যাওয়া হয় না')

গ. দর্পভরে ছড়ায় চারদিক আর দিনদুপুরে ডাকাতির মত সব
কারবার ঘটেই যাচ্ছে... ('আসামী বিষয়ক')

ঘ. অবিচল খুনির মতন দাঁড়াও ত দেখি ('হত্যাই উদ্দেশ্য যদি')

দু'হাতে দুই আদিম পাথর

ক. এই ফুলে এই মাছির গায়ে মাছির মতই লেপ্টে আছি। ('সারা দিন আমি')

খ প্রাচীন সন্তের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে তুই ('সারস')

গ. দুটি কদাকার জন্তুর মতো ক্ষুধার্ত চোখে
...ভালোবাসার ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ('ট্রেন')

ঘ. শীর্ণ সারিসারি হাত অগ্নিগোলকের মত
ছুটে আসে তোমার চারপাশে ('থাকো মধ্যম সারিতে')

ঙ. সেই রাতে নিশি পাওয়া এক গ্রাম্য কিশোরের মত
নেমে গিয়েছিলে
অন্ধকার নিশিন্দার নীচে ('পারঙ্গম একজন')

চ. থাকি সঙ্গে বয়সে কনিষ্ঠ এক বশংবদ বন্ধুর মতন। ('এখন প্রত্যহ ভোরে')

ছ. ধনুকের ছিলার মতন দ্যাখো টানটান হ'য়ে আছে
সমস্ত সংসার। ('টান')

প্রেমের কবিতা

ক. এ নামে তোমার চিত্ত সারা দেয় বাসনার মতো
এ নামে তোমাকে দেখি বসন্তের কবিতার মতো। ('প্রেমের কবিতা')

খ. বিবাগী চাঁপার গন্ধের মতো তোমার তোমার মনের সুরভী
আমার মনে রইল লেগে, ('নীল খাম')

গ. তবু এক আর্তসুর মাঝে মাঝে কাঁপে থরথর
কোনো এক বিরহিণী বন্দিনীর কান্নার মতন, ('আরো এক মেয়ে')

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

ক. সমস্ত অরণ্যে যেন উৎসবের বাঁশি বেজেছিলো
অনুপম আলোকসজ্জার মতো ('রূপকথা')

খ. এখন বার্ধক্য তার, সারা দেহে অজস্র ফাটল/দগদগে ঘায়ের মতো, ('নাইলের বৃক্ষটি')

গ. কি অব্যর্থ সাঁড়াশীর মতো/চেপে আছে নিজের গলায়। ('নাইলের বৃক্ষটি')

ঘ. বুনো ঝাউ হাওয়া পেলে অলৌকিক আলো আর ছায়া
...স্খলিত তারার মতো/বাঁশঝাড় পার হয়ে যায়। ('কোলাজ')

ঙ. কে এমন আত্মমগ্ন সন্তের মতন যায়/যায় ভেসে যায় ('স্বজনদের কথা')

আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত উপমা-আশ্রিত দৃষ্টান্তগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ করব, উপমা নির্মাণে কবির গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি ধরা পড়েছে। আহসান হাবীব কবিতায় উপমা-সৃজনে সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর কবিতায় উপমাবহুল পঙক্তির পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাই উপমার শ্রেণিকরণে আলঙ্কারিকবৃন্দ পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা, স্মরণোপমা– এই রকম নানা নামে অভিহিত করলেও আমরা এই শ্রেণিকরণ অনুযায়ী আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে সাধারণভাবে উপমা-আশ্রয়ী কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, কবির বক্তব্য উপমার আশ্রয়ে লাভ করেছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। কবির দেখা জগতের সঙ্গে তাঁর অন্তর্জগতের মেলবন্ধনে রচিত হয়েছে কাব্যিক অনুরণন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত অনেক উপমাকেই তিনি ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে দূরসঞ্চারী করে তুলেছেন। তাই তাঁর দেখা কেবল চোখের দেখা বা দৃশ্যকাব্যের অনুকৃতি নয়, কবির আন্তরিক অভিব্যক্তিতে তা দৃশ্যাতীত উপলব্ধির নির্যাস-নির্মিত প্রাণের কথা হিসেবে কবিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষা শব্দটির আভিধানিক অর্থ উৎকট জ্ঞান। এই অলঙ্কারে সৃজনপ্রতিভার কল্পনা বা অবাস্তব সিদ্ধান্তের সংশয়-আশ্রিত উচ্চারণ পাঠকের রসানুভূতিকে সজাগ করে তোলে। আলঙ্কারিক অমরেন্দ্র গণাই (১৯৮৪ : ২৭) ব্যাখ্যা করেন যে, প্রবল সাদৃশ্য থাকায় প্রস্তুত বা উপমেয়কে যদি অপ্রস্তুত বা উপমান বলে প্রবল সংশয় জন্ম নেয়, তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। অলঙ্কাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মাণোৎপ্রেক্ষা– এই দুই রকম উৎপ্রেক্ষার নাম করেছেন। বাচ্যোৎপ্রেক্ষায় সংশয়বাচক শব্দ যেমন– বুঝি, যেন, অনুভবি বা অনুভব করি, মনে হয়, গণি, জানি ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকে। প্রতীয়মাণোৎপ্রেক্ষায় প্রস্তুত বা উপমেয়কেই অপ্রস্তুত বা উপমান বলে সংশয় প্রকাশ পেলেও তাতে সংশয়বাচক শব্দ অনুপস্থিত। উৎপ্রেক্ষা কবির গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির শিল্পস্মারক হিসেবে স্বীকৃত। সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'শিল্পী যেমন তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধকে প্রত্যয়যোগ্য করেন, কবিও তেমনি চিত্তের অনুভূতির নিগূঢ়তাকে উৎপ্রেক্ষারূপে প্রকাশমান করেন।' (১৯৮৯ : ৬৪)। উৎপ্রেক্ষায় কবি যে সংশয়ের প্রকাশ ঘটান, সৃজনভাবনার ঐকান্তিকতায় তা অনেকাংশেই নিঃসংশয়ের আবহ বা আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। একজন কবি যদি অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ হন তাহলে তাঁর উৎপ্রেক্ষাও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞানের স্পর্শে ইঙ্গিতময়তা লাভ করে। আহসান হাবীবের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উৎপ্রেক্ষা-নির্ভর পঙক্তির দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে :

রাত্রিশেষ

ক. আমার নয়নে নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার ('দিনগুলি মোর')
খ. প্রথম প্রেমের পরিচয় ছিলো– যেন সে কুমারী মেয়ে ('এই মন– এ মৃত্তিকা')
গ. চারদিকে এর কৌটিল্যের কণ্টকময় বন ধূসর! ('আজকের কবিতা')
ঘ. আজকের জেগেছে হারানো সুরের কঙ্কাল/মনের ফাটলে প্রেত-প্রজনন হানছে, ('অপঘাত')
ঙ. 'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে/আমরাই 'কিউ' হয়ে যাই! ('সৈনিক')

ছায়া হরিণ

ক. শিশিরের টুপটাপ সঙ্গীতের সুরে
কাঁপায় তীরের দুটি বকুলের শাখা আর পাতা। ('সমুদ্র অনেক বড়')
খ. আজ মনে হয়,/রৌদ্রপীত মাটিতেও সে আকাশ নিরুদ্দেশ নয়, ('শীতের সকাল')
গ. মনে হলো সকালের সূর্যের সোনায়/আরেকটি অপরূপ রঙ্ লেগে আছে। ('পুনর্বাসন')
ঘ. ঈর্ষার আগুন কিছু রেখে যায় সকালের রোদে। ('ঈর্ষার আগুনে আমি')
ঙ. ...তোমার আত্মার অন্ধকারে/কে যেন হীরের কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে
ডাকো শোনো! ('যৌবনে জীবনে তুমি')
চ. ভোরের সূর্যের সোনা পৃথিবীতে/নীলোৎপল হৃদয়ের জন্ম দেবে; ('শুক্লপক্ষের গান')

সারা দুপুর

ক. তারার মালায় গাঁথা আছে তার তনুর তনিমা ('পুতুল')
খ. মনে হয় সব ঈর্ষা ভালোবাসা হবে ('তারা দু'জন')
গ. হঠাৎ মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান ('তারা দু'জন')
ঘ. মনে হয় শেষ শিখা সর্বশেষ ঝড়ে নিভে যাবে,.. ('এই ঝড়ে অন্ধকারে')
ঙ. আমি তাকে বন্দি করে রেখেছি আমার/ খুশির দেয়ালে ('তার খুশি আমার')
চ. ডিস্‌টেম্পার্ড দেয়ালের সারা গায়ে/একটি হাসি যেন ছড়িয়ে আছে। ('অভ্যাগত')
ছ. আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ! ('নজরুলকে মনে করে')
জ. মানব-মনীষা/সে তার দৃষ্টির তাপে উজ্জীবিত করে যায় যেন। ('সে আসে')

আশায় বসতি

ক. আমি কিছু মনোরম কথার কাঙাল। ('নৈঃশব্দে নিহিত আমি')
খ. সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন। ('নৈঃশব্দে নিহিত আমি')
গ. অতঃপর তাকে দেখি নির্জন পার্কের পাশে
করবীর ঝোপের সংলগ্ন কোনো মূর্তি যেন/চাঁদে মুখ। ('বাস নেই')
ঘ. আহা কি বিনয় তার, যেন তিনি শিষ্য আর আমরাই গুরু। ('বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা')
ঙ. যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের/অন্ধকারে আমরা ক'টি বিভ্রান্ত নাবিক। ('বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা')
চ. দেখো তার পায়ের রেখায়/দেশের প্রাণের বন্যা উচ্ছল উত্তাল। ('মিছিলে অনেক মুখ')
ছ. সব মুখে দেশের আত্মার/আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন। ('ডাক')

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো

ক. যেন এক বিনিপয়সার মেলায় দাঁড়িয়ে/মজা পায় ('আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে')
খ. আমি এক বিচলিত মানব-সন্তান একালের। ('আমার ত কোথাও না কোথাও যেতে হবে')
গ. দূরে নদী অনিঃশেষ/যেন গন্তব্য নেই কোনো। ('কড়ি গুনতে গুনতে')
ঘ. চিনি সেই একালের বিজ্ঞাপন-বিশারদ সভ্যতাকে। ('দোহাই তোমার')
ঙ. দুচোখে/প্রজ্ঞার আগুন যেন/স্বর্গীয় সংকেতে ঋদ্ধ শব্দাবলি ছড়ায় দুপাশে।

Dhaka University Institutional Repository

দেখে দেখে মনে হয় কোনো নব পয়গাম্বর যেন। ('আমার সন্তান')

দু'হাতে দুই আদিম পাথর

ক. মনে হলো স্বর্ণখচিত সেই আসন/সমগ্র দেশের আত্মাকে ধারণ ক'রে আছে। ('ব্যাধি')

খ. মেলার পুতুল যেন তুই, তোর সারাদিন এইভাবে যায় ('সারস')

গ. প্রাচীন সন্তের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে তুই
যেন অবিশ্রাম রাখিস অদৃশ্য হাত সময়ের বিপুল ঘণ্টায় ('সারস')

ঘ. আমি এই খা-খা মাঠশুকনো নদী ধূসর বনানী ('ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে')

ঙ. তুমি সারারাত উদ্দীপনার/উদ্দামতার সঙ্গী। ('একুশ')

চ. দুঃস্বপ্নের মতো যেন চেতনায় জাগে বারংবার/পাতা ঝ'রে যাওয়ার আওয়াজ। ('গন্তব্য ইথাকা')

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

ক. সমস্ত অরণ্য যেন উৎসবের বাঁশি বেজেছিলো
অনুপম আলোকসজ্জার মতো/ছিলো যেন নক্ষত্রনিচয়। ('রূপকথা')

খ. এখন প্রত্যহ দেখি গ্রাম প্রান্তে এসে দাঁড়ায়/ যেন সিংহ সদরোজায় অটল প্রহরী, যেন
অবিচল একাগ্রতা সারাদেহে ইস্পত কঠিন। ('রূপান্তর')

গ. পাতায় রক্তের ছোপ কীটের বসতি। ('নাইলের বৃক্ষটি')

ঘ. দু'চোখে আমার শুষ্ক মাঠে মাঠে নবতর ফসলের আলো। ('আর একটি আদিম')

ঙ. তোমার সমস্ত বুকে জ্বলে উঠবে ঈর্ষার আগুন। ('একদিন বিকেলে এসো')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা আহসান হাবীবের উৎপ্রেক্ষা-নির্মাণকৌশল অনুধাবন করতে পারি। তাঁর অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রান্ত উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। দৃশ্যমান জগতের নানা বিষয়কে উপলব্ধির প্রয়োজনে তিনি যেমন অদৃশ্যলোকের বিবিধ সম্মোহনকে শব্দবন্দি করেছেন, তেমনি অদৃশ্য অনুভবকে দৃশ্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃশ্য ও অদৃশ্যের সেতুবন্ধ রচনায় আহসান হাবীবের উৎপ্রেক্ষা-নির্ভরতা চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। তাঁর উৎপ্রেক্ষায় আবেগের চেয়ে চিন্তা ও মনীষার দীপ্তিই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। জীবনের গভীরতর অনুভবকে শিল্পের অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনেই তিনি উৎপ্রেক্ষার প্রগাঢ়তাকে কবিতায় ধারণ করেছেন। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে তিনি যে সংশয়ের আবহ ছড়িয়ে দেন, তাতে তাঁর চৈতন্যের উন্মীলন যেমন সহজতর রূপ পরিগ্রহ করে, তেমনি বর্ণিত ভাব বা বিষয়ের সঙ্গে কবির অনুভববিশ্বের অন্তররঙ্গতার পরিচয়ও তাতে প্রকাশিত হয়। কবির দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা ও অদৃশ্য অনুভবের সম্মিলনে সৃষ্ট উৎপ্রেক্ষা পাঠকচৈতন্যে অনাস্বাদিত অনুরণন সঞ্চার করে। আহসান হাবীবের কবিতার উৎপ্রেক্ষা কাব্যদেহে যে দীপ্তি ছড়িয়ে দেয় তা তৃপ্তিদায়ক এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

রূপক

প্রবল সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় ও উপমানের পার্থক্য উপেক্ষা বা অস্বীকার করার কল্পনা থেকে রূপকের সৃষ্টি হয়। উপমাতে যেমন উপমেয়ের প্রভাব বা উপস্থিতি সর্বত্রই উজ্জ্বল, তেমনি রূপকে থাকে উপমানের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য। আলঙ্কারিকেরা রূপককে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন– নিরঙ্গ, সাঙ্গ এবং পরস্পরিত। নিরঙ্গ-রূপকে একটি মূল প্রস্তুত বা উপমেয়ের ওপর অপ্রস্তুত বা উপমানের অভেদ আরোপিত হয়। সাঙ্গরূপকে বিভিন্ন অঙ্গসহ অঙ্গী বিষয় বা উপমেয়ের ওপর একইভাবে অঙ্গসহ অঙ্গী বিষয় বা উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়। অর্থাৎ, সাঙ্গ-রূপকে উপমেয়ের একাধিক অঙ্গের ওপর উপমানের একাধিক অঙ্গের ভেদহীনতা কল্পনা করা হয়ে থাকে। পরস্পরিত রূপকে একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপের কারণ হিসেবে দেখানো হয়। রূপকে রূপকে একটা কার্যকারণ ভাবের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এর নাম পরস্পরিত-রূপক।

Dhaka University Institutional Repository

রূপক কবিতার রূপ বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শব্দপ্রয়োগে কবির সংযত-সংহত প্রকাশ চরম হলেই রূপকের সৃষ্টি হয়। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোন ভেদ বা ব্যবধান স্বীকার না করায় কবির অভিব্যক্তি দূরসঞ্চারী মাত্রায় উন্নীত হয়। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> We might define metaphor summarily as the discovery of an illuminating correspondence between two objects but that too is inadequate for the subtleties of the process. (Herbert Read 1950 : 98)

রূপক-সৃজনের ক্ষমতা এবং রূপকের মৌলিকত্বের আলোকেই হার্বার্ট রীড কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। কবির রূপক নির্মাণকৌশল থেকে ভাষার ওপর তাঁর দখল অনুধাবন করা যায়। রূপকের সাহায্যে একজন কবি শব্দের আভিধানিক অর্থ-পরিধি অতিক্রম করে পাঠকের চৈতন্যে অন্যরকম আনন্দ সঞ্চার করেন। সমালোচক মাহবুব সাদিক যথার্থই বলেছেন :

> প্রকাশকলায় নৈপুণ্য অর্জন করতে হ'লে প্রথাবদ্ধ ভাষা-প্রয়োগরীতি অতিক্রম করা-ছাড়া কবির বিকল্প নেই। আধুনিক কবির ভাষা-প্রয়োগরীতি প্রথাগত কাব্যভাষাকে বার-বার অতিক্রম ক'রে যায়। প্রচলিত প্রকাশপদ্ধতি ও কাব্যভাষা অতিক্রম করতে গিয়ে কবি কখনো নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন, কখনো কাব্যে প্রচলিত শব্দের নতুন প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করেন, কখনো কবিতার ভাষাকে করেন রূপকাশ্রিত। (১৯৯১ : ৩৩৮)

আহসান হাবীব রূপক সৃষ্টিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রূপক কবিতায় ব্যবহৃত শব্দকে যেমন দীপ্তি দিয়েছে তেমনি কবিতার ভাবেও তা তৃপ্তিদায়ক রসসঞ্চার করেছে। উপমেয় ও উপমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কবির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সংহত অবয়ব যা পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকেও পল্লবিত করতে চায়। আহসান হাবীবের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু রূপক-আশ্রয়ী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

রাত্রিশেষ

ক. প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত ('দ্বীপান্তর')
খ. রক্তে ও মজ্জায় শা'জাহানী স্বপ্ন। ('কনফেশান')
গ. নির্লজ্জ হৃদয়ে তবু ছায়া ফেলে বাসনার সোনা ('ঝরা পলাশ')
ঘ. ইস্পাত-কঠিন এক দিন রচনার– ('ঝরা পলাশ')
ঙ. ক্ষণিকের সূর্য নয় মনের মিনারে। ('প্রদক্ষিণ')
চ. সেই সব স্বপ্নের বলাকা/মেলেছিল পাখা ('প্রদক্ষিণ')
ছ. ত্রিশঙ্কু মনেরে হেনে শঙ্কাহীন করেছে ক্ষমতা। ('স্বাক্ষর')

ছায়া হরিণ

ক. সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ, ('ক্রান্তিকাল')
খ. কিশোর চোখের সেই দৃষ্টির লাবণি ('সেই নদী')
গ. তোমার শ্রাবণ-চোখে/ আর একবার সে আদিম সকালের সূর্যের সঙিন ('পুনর্বাসন')
ঘ. ঈর্ষার আগুন কিছু রেখে যায় সকালের রোদে ('ঈর্ষার আলোকে আমি')
ঙ. আতশী নজর দেখে কেঁপেছে বেইমান, ('ছহি জঙ্গেনামা')
চ. নিতে পারো হৃতরক্ত হৃদয়ের ভস্ম কিছু; ('অন্যদিন')

সারা দুপুর

ক. অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে/ফুল তোলে ('পুতুল')
খ. হয়তো দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন; ('নতুন কবিতা')
গ. হৃদয়ে কেবল/বিপন্ন বিব্রত এক আর্শির ছলনা ('তারা দু'জন')
ঘ. পলাশপ্রসন্ন এই মাঠে মাঠে/ বৈকালিক ভ্রমণের ছদ্মনামে ('স্বরূপে মহিমা তার')
ঙ. মৃগনাভি-ছলনায় নিজেকেই নিজে মুগ্ধ ক'রে রেখেছো। ('হে বৈশাখ')

চ. বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি ('নজরুলকে মনে করে')
ছ. ক্ষুধার তিমির হেনে পৃথিবীর মৃত্তিকার কোল ('ডাবল কলাম')

আশায় বসতি

ক. অটল করতলে সহজে তুলে নাও/প্রাণের পাখোয়াজ ('সামনে ধু ধু নদী')
খ. দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবে আয়রে খোকন ঘরে আয়! ('মায়ের ডাকের ছড়া')
গ. হেঁটে গেলো অবিকল বালক-ভঙ্গিতে। ('আরশি')
ঘ. বাস্তুহারা যৌবনের ভার/বয়ে বয়ে কি যে ক্লান্ত, ... ('নাটক : পার্শ্বচরিত্র : নায়ক')
ঙ. নিজের বাগানে নিজে ক্রোধের আগুন/ছড়ায়,... ('কাব্য-সভায়')

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো

ক. যখন পথিক-সুজনকে ডেকে ডেকে
বললাম আমাকে কিছু ভালোবাসা দাও ('এক দুই তিন')
খ. চিনি সেই একালের বিজ্ঞাপন-বিশারদ সভ্যতাকে। ('দোহাই তোমার')
গ. যন্ত্রের যন্ত্রণা আর সর্বগ্রাসী দানবনিনাদ ('দোহাই তোমার')
ঘ. তোর বেলুনমত্ততা/কৈশোরেও গেল না। ('বেলুন')
ঙ. আমাকে আমার ফাঁদে বাঁধা জীবন-চক্রের
চারপাশে বীরত্বের মহড়ায় সারাটা জীবন ('আসামী বিষয়ক')

দু'হাতে দুই আদিম পাথর

ক. জন্মান্ধ তুষার ভেঙে সামনে যাই দেখি নীল সমুদ্রে তোমার
প্রমোদ-তরণী ভাসে। ('যতবার ভোর হলো')
খ. তাঁর অভিজাত গমনভঙ্গির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে/মন্ত্রমুগ্ধ জনসভা। ('ব্যাধি')
গ. বুকের পাথরে তুই সহজে রাখিস ধরে নিরবধি কাল। ('সারস')
ঘ. আশৈশব স্বপ্নের বন্দরে তুই যা। ('যাবার আগে')
ঙ. চিরোল নারকেল পাতায় শরীরভাঙা জ্যোৎস্নার কথা ('তুমি যখন বলো')
ছ. পাষাণ-অর্গল খুলে অভিষেক উৎসবের মালা তুলে নাও বুকে ('জলপাই পাতার বুকে')

প্রেমের কবিতা

ক. 'উৎসব-বাসবে যাও' বলে/সুখ বলে, যাই। ('সুখ')
খ. এমনকি ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপায় রেখেছো জ্বেলে/আলোর উৎসব ('ডুবে যাচ্ছি')
গ. আমি এই প্রস্তর-পুতুলে আর কতকাল ফুল দেবো/আরো কত কাল! ('নিষিদ্ধ বাগানে')
ঘ. ক্রুদ্ধ জ্যোৎস্না পোড়ায় নিসর্গলোক ('তুমি এলে, না এলেও')
ঙ. কথা কয় মৌনমূক হৃদয়ের স্তব্ধতা তোমার। ('প্রেমের কবিতা')
চ. ঝড়-খাওয়া মনে শান্তি আমার, ('ঘুম')

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

ক. চূর্ণশিলা বাতাসে কেমন
হালকার ধুলোর মতো উড়ে যাচ্ছে দেখো। ('আর একটি আদিম')
খ. যেতে হবে অন্য কোনো নিরঞ্জনা নদীর সন্ধানে। ('এইখানে নিরঞ্জনা')
গ. কে এমন আত্মমগ্ন সন্তের মতন যায় ('স্বজনদের কথা')
গ. তোমার সমস্ত বুকে জ্বলে উঠবে ঈর্ষার আগুন ('একদিন বিকেলে এসো')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে রূপক নির্মাণকৌশলী হিসেবে আহসান হাবীবের কৃতিত্ব ও কবিত্ব ধরা পড়েছে। অল্পকথায় চিন্তার গভীরতলস্পর্শী অনুভবকে শব্দবন্দি করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। কবি রূপকের শরণ নিয়ে কল্পনার রূপ ও লাবণ্যকে শব্দ-শরীরে গেঁথে দিয়েছেন। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সারাৎসারকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের মিতব্যয়ী-মানসতাই কবিকে রূপক নির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছে।

সমাসোক্তি

সমাসোক্তি-অলঙ্কারে বিষয় বা উপমেয়ের ওপর বিষয়ী বা উপমানের ব্যবহার আরোপিত হয়। ইংরেজি Personification বা Pathetic Fallacy-র সঙ্গে সমাসোক্তির কিছু মিল পরিলক্ষিত হলেও সমাসোক্তিকে Pathetic Fallacy-র সমধর্মী বলা যায় না। 'কারণ, বর্ণনীয় চেতন, অচেতন, মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী যাই হোক না কেন, তার ওপর যে-কোন বস্তুর স্বভাব আরোপ ক'রলেই সমাসোক্তি অলঙ্কার হ'তে পারে। অন্য দিকে Pathetic Fallacy ব'লতে বোঝায়,– অপ্রাণীর ওপর মানবীয় সংবেদনা বা অনুভবের আরোপ।' (নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৯৯)। তবে কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অচেতন পদার্থে সচেতন পদার্থের ধর্ম আরোপ করে সমাসোক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। 'সমাসোক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কবি তাঁর সক্রিয়তা-সচলতা-প্রাণবন্ততার প্রকাশ ঘটান। তিনি যে বস্তুর দিকে তাকান কিংবা যে বস্তু-বিষয়ে ভাবেন, তার নিষ্ক্রিয়তা টুটে যায়। তা যেন প্রাণ পেয়ে কবির ইচ্ছের অনুকূলে গান গেয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রাণ বস্তুকে প্রাণময় করে তাকে ব্যক্তিচৈতেন্য অভিষিক্ত করার অভিপ্রায় থেকেই কবিতায় সমাসোক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১০১)। সমাসোক্তি অলঙ্কার একজন কবির স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পনির্মাণকৌশল হিসেবেই স্বীকৃত হতে পারে। সমাসোক্তির আশ্রয়ে অচেতন পদার্থে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কবির অভিপ্রায় সংহত ও শৈল্পিক অবয়ব লাভ করে।

আহসান হাবীবের কবিতায় সমাসোক্তি কবিচৈতন্যের সারাৎসারকে সপ্রতিভ করে তুলেছে। তাঁর যে-কোন কাব্যগ্রন্থের নিবিড় পাঠে এই অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। সমাসোক্তি একজন কবির সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আহসান হাবীবের সমাসোক্তি-নির্মাণকৌশল অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

ক. বহু রজনীতে বহু চাঁদ এসে খেলেছে দীঘির জলে, ('এইমন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)
খ. গানের পাখিরা নাম সই করে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক ('আজকের কবিতা'/*রাত্রিশেষ*)
গ. আজকের জেগেছে হারানো সুরের কঙ্কাল/মনের ফাটলে প্রেত-প্রজনন হানছে, ('অপঘাত'/*রাত্রিশেষ*)
ঘ. মৌসুমী হাওয়ার বুক থরোথরো/তোমার দেশের? ('জল পড়ে পাতা নড়ে'/*ছায়া হরিণ*)
ঙ. এখন হৃদয় শুধু ভ্রষ্টনীড় হৃদয়কে নিয়ে খেলা করে। ('শীতের সকাল'/*ছায়া হরিণ*)
চ. জানি না পাখিরা কভু বিষণ্ন হয়েছে কি না কোনোকালে ('ঈর্ষার আলোকে আমি'/*ছায়া হরিণ*)
ছ. ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি/অমাবস্যা-হৃদয়ে আমার! ('নতুন কবিতা'/*সারা দুপুর*)
জ. কটাক্ষের ঝোড়ো হাওয়া কখন তুলেছে ঝড় এখানে। ('উত্তীর্ণ প্রহরের গান'/*সারা দুপুর*)
ঝ. নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের/পরিচর্যা পাই নিত্য ('শেষ সন্ধ্যা– প্রথম ঊষা'/*সারা দুপুর*)
ঞ. নৈঃশব্দের ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে/ঘুরিফিরি। ('নৈঃশব্দে নিহিত আমি'/*আশায় বসতি*)
ট. রক্তপলাশের বুক/ছড়ায় রক্তিম আশার আলোর স্রোত ('বৈরী বাতাস, অতঃপর...'/*আশায় বসতি*)
ঠ. দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ/অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো। ('মিছিলে অনেক মুখ'/*আশায় বসতি*)
ড. অজস্র অশেষ কথা ঝরে ঝরে যখন বকুলতল ভরে দিতো ('দোহাই তোমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
ঢ. চোখের অমল আলো কেড়ে খায় ফাঁপা বেলুনের/রঙিন কুয়াশা। ('বেলুন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
ণ. শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা ('সারস'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
ত. হাতের বৈঠায় ওঠে যৌবনের ছলাতছল সুর। ('এইভাবে উত্তরে দক্ষিণে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
থ. ভালোবাসা নদীর জলে ডুবতে ডুবতে বললো/তবে আমি যাই। ('ভালোবাসা অন্বিষ্ট'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)
দ. পৃথিবীর রক্তাক্ত শয়ান/এরকম বেডকভারে এইভাবে ঢাকা পড়ে থাকে। ('একদিন বিকেলে এসো'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীব সমাসোক্তির আশ্রয়ে তাঁর আত্মখচিত অভিজ্ঞতাকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কেবল নিষ্প্রাণ বস্তুকে সপ্রাণ ও গতিশীলই করেন নি তিনি, উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার, আচরণ বা স্বভাব আরোপ করে তাঁর উপলব্ধিকে অভিনবত্ব দান করেছেন। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, অপ্রাণীর ওপর মানবীয় সংবেদনা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টির আনন্দকে অসীম সৌন্দর্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে চেতনাসমৃদ্ধ প্রাণীর শরীরেও অচেতন বস্তুর স্বভাব আরোপ করেছেন তিনি।

অন্যাসক্ত

অন্যাসক্ত-অলঙ্কারে জড় বস্তু বা কোন বিমূর্ত বিষয়ের ওপর সপ্রাণ বা চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ আরোপিত হয়। অচেতন বা জড়বস্তুতে চেতনের ক্রিয়া আরোপের ফলে সমাসোক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু চেতনের ক্রিয়ার পরিবর্তে কেবল গুণাবলি জড়বস্তু বা বিমূর্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হলে অন্যাসক্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অন্যাসক্ত কবির উপলব্ধিকে প্রগাঢ় ও প্রাণবন্ত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শ্যামলী* কাব্যের 'আমি' কবিতায় বলেছেন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে। (২০০৬ : ১০/১৪৬)

কবির এই উপলব্ধির মধ্যেই অন্যাসক্ত-অলঙ্কারের শক্তি নিহিত রয়েছে বলে আমরা মনে করি। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের চৈতন্যের স্পর্শেই তাঁর দৃশ্যমান ও উপলব্ধ জগতের সবকিছু প্রাণ পেয়ে তাঁর ইচ্ছের রঙে রঙিন হয়ে উঠতে চায়।

অন্যাসক্ত অলঙ্কার কাব্যদেহে দান করে অসাধারণ দীপ্তি। আহসান হাবীবের কবিতায়ও প্রচুর অন্যাসক্তের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যাসক্ত-অলঙ্কার আশ্রয়ী কয়েকটি কাব্যপঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক. দু'নয়নে যার হিংস্র আগুন আজো জপি তার নাম ('এইমন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)
খ. রক্তে ও মজ্জায় শা'জাহানী স্বপ্ন ('কনফেশান'/*রাত্রিশেষ*)
গ. ঐতিহ্যের ডানা বেয়ে নামে/কী অতল সমুদ্র বিস্তার ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)
ঘ. কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল ('শীতের সকাল'/*ছায়া হরিণ*)
ঙ. যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই/সবার ইচ্ছের অনুরূপ, ('এসো সঙ্গী হই'/*সারা দুপুর*)
চ. মরা নদী/নির্জনতা। আজ/বিষণ্ন সন্ধ্যায় একা আমি। ('উত্তীর্ণ প্রহরের গান'/*সারা দুপুর*)
ছ. সেই মোহনবাহন/কি নির্মম বিদ্রূপের ঘণ্টা নেড়ে চলে গেলো দূরে বারবার ('বাস নেই'/*আশায় বসতি*)
জ. ঘরে মজলিসে বাইরে নতুন সজ্জে
দ্বৈত সুরের চতুর ভঙ্গি রঙ্গে। ('দু'টি মানুষ একটি ঘোড়া'/*আশায় বসতি*)
ঝ. তুমুল বিকর্ত আর উষ্ণ কফি?
নাকি কোনো প্রহসনপারঙ্গম পাটাতন? ('মনীষা মনীষা ব'লে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
ঞ. সারাটা বছর/এই অশ্ব মহাশয় কোথায় থাকেন ('ঈদ'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
ট. জন্মান্ধ তুষার ভেঙে সামনে যাই দেখি নীল সমুদ্র তোমার
প্রমোদ-তরণী ভাসে ('যতবার ভোর হলো'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
ঠ. অস্থির খাঁচার দাঁড়ে বারম্বার স্থির হতে চাও ('থাকো মধ্যম সারিতে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, অন্যাসক্ত অলঙ্কার আহসান হাবীবের কবিতায় স্বতন্ত্র অলঙ্কার হিসেবে প্রযুক্ত হয় নি। কবি তাঁর ভাবনাকে প্রকাশের প্রয়োজনে নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তুলতে জড় বা অপ্রাণিবাচক বস্তুর সঙ্গে

জুড়ে দিয়েছেন প্রাণির জন্য প্রযোজ্য কিছু বিশেষণ। হাবীবের কবিতায় আমরা দেখতে পাই, তিনি কখনো কখনো বিশেষণরাশির স্থান-পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত শব্দ-প্রয়োগে অসঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এই অসঙ্গতিও তাঁর অনুভূতির গভীরতর কোন সত্য বা গূঢ়ার্থকে মূর্ত করে তুলেছে।

আহসান হাবীব কবিতায় অলঙ্কার ব্যবহারে যত্নবান হলেও এ ব্যাপারে তাঁর পরিমিতিবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। কোন রকম অতিরঞ্জনকে তিনি তাঁর কবিতায় প্রশ্রয় দেন নি। তাই তাঁর শিল্পিত উচ্চারণ সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় পাঠকের বোধকে পল্লবিত করে। একজন কবি স্বভাবতই তাঁর কবিতার ভাষায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে চান। সেই অভিনবত্ব তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যদি তাতে কবির অন্তরের উষ্ণতা ছড়িয়ে থাকে। আহসান হাবীবের কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি, অলঙ্কার-প্রয়োগের ফলে তাঁর কাব্যদেহ অনাস্বাদিত দীপ্তি লাভ করেছে।

চিত্রকল্প

কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকের অনুভবের সার্থক সমন্বয়ে গড়ে ওঠে চিত্রকল্প। একজন কবি শব্দ-শরীরে তাঁর চৈতন্যের নির্যাস ঢেলে দিয়ে যে মানস-প্রতিমা নির্মাণ করেন, তা কবিব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠকের উপলব্ধিকেও পল্লবিত করে। কবির প্রাণের স্পর্শেই শব্দপ্রতিমা সজীব ও সরাগ হয়ে ওঠে। শব্দের গভীরে কবির মর্মমূল উৎসারিত অভিজ্ঞান শৈল্পিক অবয়ব লাভ করে বলেই তাতে স্রষ্টার জীবনদর্শন মূর্ত হয়ে থাকে। চিত্রকল্পের উপস্থিতিতে কবিতা লাভ করে সজীবতা ও সপ্রাণতা। C. Day Lewis বলেছেন, 'What the moderns look for in imagery, I suggest, is freshness, intensity, and evocative power.' (1968 : 40). চিত্রকল্পকে কবিতার মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে Stephen Spender বলেছেন, 'The image is the basic unit of poetry...' (1965 : 120)। "A Few Don'ts by an Imagiste." শীর্ষক প্রবন্ধে Ezra Pound বলেছেন, "An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time." (1976 : 18)। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম।' (১৯৮৪ : ৯)। চিত্রকল্পের প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দের মর্মকথাকে একজন গবেষক সূত্রাবদ্ধ করেছেন এইভাবে :

ক. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দচিত্র বা উপমানচিত্রকে চিত্রকল্পে উন্নীত হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়, তা হলো – উপমানচিত্রটিকে হতে হবে (১) সজীব বা প্রাণময়, (২) প্রগাঢ় অনুভবযুক্ত ও (৩) মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এই তিনটি শর্ত যখন একটি উপমানচিত্রে রূপায়িত হয় তখনই রচিত হয় পরিপূর্ণ চিত্রকল্প।
খ. চিত্রকল্পে কবি-মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অংশে লুকিয়ে থাকা অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ঘটে।
গ. কবির দার্শনিক অভিপ্রায়কে চিত্রকল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। (সরকার আমিন ২০০৬ : ১৩)

চিত্রকল্পকে অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা কাব্যদেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কোন কবিতা থেকে এই অলঙ্কারকে বিচ্ছিন্ন করা হলে কবিতার অস্তিত্বই অনেকাংশে বিপন্ন হয়ে পড়ে। 'চিত্রকল্প কবিতার কোন বাহ্যিক সজ্জা নয়, বরং কবির ভাব প্রকাশেরই অংশ। তাকে ছেঁটে ফেলে দিলেও কবিতার ভাবনা-বক্তব্য অক্ষত থাকবে, এমন ধারণা অসঙ্গত।' (চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম ১৯৮৬ : ৬১)। 'চিত্রকল্প কবির ইন্দ্রিয়বেদিতার ফসল, এবং পাঠকের পক্ষেও তা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়বেদ্য'– এই ধারণা পরিহার করে 'চিত্রকল্পকে ব্যাপক অর্থে অনুভূতি-নির্ভর' বলে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন সাহিত্যসমালোচক চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম। তাঁর মতে, 'কবির কোন একটি ইন্দ্রিয়-প্রসূত না হয়েও ধ্বনি ও পংক্তির বিন্যাসের মধ্যে কবির অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়ে উঠলে তা অবশ্যই চিত্রকল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে।' (১৯৮৬ : ৬১)। চিত্রকল্পকে কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিগম্য হিসেবে বিবেচনা করলে এর শক্তি বা পরিসর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। চিত্রকল্প অনুধাবনে পাঠকের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার ভূমিকাও কম নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

> মানুষ তো শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটা দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ, একথা মানা চলিবে না। চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে। (১৩৮৯ : ১২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে চিত্রকল্প অনুধাবনে চোখ ও মনের স্বাস্থ্যকর সম্মিলন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। চিত্রশিল্পের মতো চিত্রকল্পও পাঠকের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে নতুন অর্থমাত্রা যুক্ত করে। উপর্যুক্ত প্রবণতার আলোকে চিত্রকল্পের শক্তি ও সৌন্দর্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চিত্রকল্পই কবির আত্মখচিত কাঙ্ক্ষিত কল্পভূমি, যেখানে সম্ভাবনার প্রায় সবটুকুই মূর্ত হতে চায়। আহসান হাবীবের কবিতায় চিত্রকল্প অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে আমরা লক্ষ করব, তাঁর চিত্রকল্পে কেবল চিত্র ও কল্পনার বিবাহবন্ধনই সম্পন্ন হয় নি, তাতে জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকেই তিনি শব্দবন্দি করেছেন।

চিত্রকল্প-বিষয়ে আহসান হাবীবের ভাবনা *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের 'কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে' শীর্ষক কবিতায় চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। তিনি আত্মখচিত কিছু চিত্রকল্পের সমন্বয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা নির্মাণ করেছেন। সেখানে আছে 'স্থির জলে অস্থির পালঙ্ক', 'নক্ষত্রে ছাওয়া অলৌকিক বাসগৃহ', 'কয়েকটি পতনের চিত্র' এবং 'কিছু রক্তপাতের কাহিনী'। হত্যাকাণ্ডের ভয়াল বর্ণনার পাশে তিনি সাজিয়ে রেখেছেন মর্মঘাতী ধর্ষণের করুণ ও বীভৎস কাহিনি। আহসান হাবীব বলছেন :

তোমাদের আমি শেষরাত্রির পাখিদের কথা বলবো
অবিলম্বে দরজা খোলার কথা বলবো।
আমি তোমাদের শোনাবো
শাদা ভাতের উষ্ণতা আর সৌরভের কথা
আর হাওয়া বৈরী হওয়ার আগেই
ভাতের থালা সন্তর্পণে ঢেকে রাখার কথা জানাবো।
কিছু কিছু চিত্রকল্প আমার নিজস্ব সংগ্রহে আছে
শুকনো গোলাপ পচা আপেল
এই সব এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।
রক্তিম পেয়ালার পাশে বুনো মোষের ছবি আছে আমার সংগ্রহে
এসব তোমাদের জন্যে নয়। ('কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

কবির ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পরিভ্রমণ করতে করতে আমরা লক্ষ করি, নিশ্চিত নির্ভরতার একটি শান্তিময় গৃহের বাসনা তাতে স্পষ্ট। কিন্তু এই বাসনা চরিতার্থ করার পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তিনি রক্তপাতের কথা বলেন, হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের মতো বিমানবিক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। ক্ষুধাহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন কবি। সেই স্বপ্নের পথরোধ করে দাঁড়ায় যে পশুশক্তি, তার সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও আছে তাঁর। কিন্তু তিনি তাঁর পাঠককে শোনাতে চান ভালোবাসার কথা : 'আমি তোমাদের ভালোবাসার কথা শোনাবো/ভালোবাসা, তাই আঘাতের কথা আমি তোমাদের শোনাবো।' যে ভালোবাসা সহজেই আমাদের হাতে ধরা দেয়, সেই ভালোবাসা নয়, তিনি শোনাতে চান আঘাত-জর্জর প্রেমের গল্প। এভাবেই কবি তাঁর কবিতার চিত্রকল্পকে চিত্তের উষ্ণতা দিয়ে রাঙিয়ে দিতে চান। চিত্রকল্পের বিষয় বা মোটিফ অনুযায়ী আহসান হাবীবের কবিতায় চিত্রকল্পের অনুসন্ধান করলে লক্ষ করা যাবে, কতিপয় মোটিফ তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে, যা তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার মৌলপ্রান্তর উন্মোচনেও সহায়ক হতে পারে।

ঝড়কে অবলম্বন করে আহসান হাবীব চমৎকার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঝড়কে আমরা যেভাবে চিনি, কবির উপলব্ধির স্পর্শে তা ভিন্নতর অবয়ব লাভ করেছে। যে ঝড় সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে, জন্ম দেয় বিশালাকার ঢেউয়ের, কবি সেই ঢেউকে আকাশের কোণ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। কবির ঝড় স্বপ্নের পুরনো প্রাচীর ভেঙে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিস্ময়ের জগতে। ঝড় যখন অশোকের বনকে আন্দোলিত করে, কবি সেই আন্দোলনকে বলেছেন দোলা। ঝড় এখানে মানবীয় আচরণ লাভ করেছে যেন, তাই আলতো হাতে অশোকের বনকে নাড়িয়ে দেয় সে। সেই নাড়া কেবল গগন-গহনেই ঝড় তোলে না, কবির মনের গহীনেও অন্য রকম শিহরন ছড়িয়ে দেয়। কবি ঝড়কে এমনভাবে সৃজন করেন যা অনায়াসে আমাদের দৃষ্টির সীমায় পৌঁছে যায়, এমনকি ঝড়কে আমরা স্পর্শ করেও

দেখতে পারি। ঝড়ের বিধ্বংসী শক্তিকে কবি সৃজনশীল অবয়ব দিতে চেয়েছেন যা আকাশের কোণ, গহীন বন অতিক্রম করে মনের গভীরে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে :

তবু বারবার সমুদ্রের তীরে
সহসা তরঙ্গ হানে
ছুঁয়ে যায় আকাশের কোণ,
আবার সে পুরনো স্বপন
ভাঙে সে প্রাচীর আর জাগায় বিস্ময়,
আবার সমুদ্রতীরে সেই ঝড় বয়।
সেই ঝড় দোলা দেয় অশোকের বনে!
সেই ঝড় ঝড় আনে গগন-গহনে! ('হে আকাশ হে অরণ্য'/*রাত্রিশেষ*)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরের আগুনে বিহ্বল হয়ে বলেছেন, 'আগুনের কী গুণ আছে কে জানে।' (১৯৭১ : ৭)। আগুন নিয়ে খেলার বিপদ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েও এই আগুনের গুণে মোহিত হন নি এমন শিল্পস্রষ্টা নেই বললেই চলে। আহসান হাবীবও এই আগুন নিয়ে খেলেছেন। তিনি ধূলিময় রথে ও পরিচিত পথে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই আগুন কবির কাছে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আগ্নেয় জোয়ারে কবির পথের সীমা অসীমে গিয়ে মিলেছে। শুধু তাই নয়, কবির সিংহ দরোজায় এসে হানা দিয়েছে এই আগুন। পাঠক হিসেবে আমরা কবির আগুনের উত্তাপ যেমন টের পাই, তেমনি অনুভব করি, এই আগুন আমাদের দরোজায় এসেও দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দরোজা খুলে দিলেই যেন আগুনের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া সম্পন্ন হতে পারে। এই আগুনকেই আবার আহসান হাবীব ক্রোধের রূপকল্পে নির্মাণ করেছেন এবং ফোটাতে চেয়েছেন আগুনের ফুল। আগুন যখন ফুল হয়ে ওঠে তখন আগুনের পাপড়ি মেলা থেকে শুরু করে গন্ধের আবহও পাঠকচৈতন্যে সঞ্চারিত হয়। নিচের দৃষ্টান্ত দুটো লক্ষ করি :

ক. নতুন আগুন জ্বলে সে আগুন ধূলিময় রথে,
আলো দেয় কোনো এক নামজানা পথে।
ঘরে ঘরে সে আগুন নিমন্ত্রন রেখে যায় তার,
একদিন পথে আসে আগ্নেয় জোয়ার,
তারপর পথের সীমায়
সে আগুন হানা দেয় সিংহ দরোজায়! ('আগুন'/*রাত্রিশেষ*)

খ. প্রশমিত ক্রোধের আগুন
কখন ফোটাবে ফুল
ভঙ্গি আর ভণিতার বিচিত্র দেয়াল
ভেঙে যাবে ('কাব্য-সভায়'/*আশায় বসতি*)

'মৃত্যু' মোটিফ ব্যবহার করে আহসান হাবীব চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। অদৃশ্য মৃত্যুকে হাবীব দৃশ্যের সীমায় নিয়ে এসেছেন। তবে মৃত্যু কেবল জীবনের শেষ রেখা টেনে দেয় নি তাঁর কবিতায়, তা ঘরে ঘরে জীবনের উন্মাদনাও ছড়িয়ে দিয়েছে। এই কুশলী শিল্পস্রষ্টার কল্পনাপ্রতিভার জোরে আমরা মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাই, এমনকি পায়ের চিহ্নও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে শিকারীর চোখ ও দৈত্যকায় অজগরের পাঁজরের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি মৃত্যুর একটা দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য অবয়ব দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। শীতল দেহধারী একজন মানুষের বর্ণনায় কবি যখন মৃত্যুর শরণ নেন এবং সেই মানুষটির হিংস্রতাকে মৃত্যুর রূপকল্পে নির্মাণ করেন, তখন মৃত্যুকেও সেই হিংস্র মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি এবং টের পাই সেই মৃত্যুর কুৎসিত কর্কশ হাতের ছোঁয়া। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. কোনো কোনো মৃত্যু এসে হানা দেয় ঘুমের নগরে,
জীবনের উন্মাদনা দিয়ে যায় প্রতি ঘরে ঘরে,
রেখে যায় পদচিহ্ন। ('মৃত্যু'/*রাত্রিশেষ*)

খ. এদিকে আকাশে
কার শিকারী চোখের ছায়া জাগলো
দৈত্যকায় অজগরের পাঁজরে
তার দেহে লাগলো মৃত্যুর মোচড়। ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

গ. মৃত্যুর মতন তার সারা দেহ শীতল
এবং
কুৎসিত কর্কশ তার নগ্ন হাত ('চরিতাখ্যান : নববর্ষ'/*ছায়া হরিণ*)

জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতায় অনুভব করেছিলেন কীভাবে 'সমস্ত দিনের শেষে/শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে।' (১৯৯৮ : ১৫৩)। এই শিশিরের শব্দই আহসান হাবীবের কবিতায় সঙ্গীতের সুর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সঙ্গীত কেবল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কেই সচকিত করে তোলে নি, তা চোখের কাছেও তার আবেদন পৌঁছে দিয়েছে। তাই সঙ্গীতের সুর বকুলের শাখা আর পাতায় শিহরন তুলেছে। এখানেই শেষ নয়, শিশিরকে তিনি মুক্তোর অবয়ব দিয়েছেন। তাই ইচ্ছে করলেই এই শিশিরকে আমরা ছুঁয়ে দেখতে পারি, এমনকি বুক পকেটে লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব নয়। অন্য একটি কবিতায় আমরা দেখতে পাই, শিশিরের শব্দের সঙ্গীত দোল খাচ্ছে এবং এই দোলা তাকে পৌঁছে দিচ্ছে স্বপ্নের ভেলায়। শিশিরের মতো একটি ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে আহসান হাবীব কবিচৈতন্যের উষ্ণতা দিয়ে অসাধারণ চিত্রকল্প করে তুলেছেন :

ক. সামুদ্রিক ঝড় নয়
শিশিরের টুপটাপ সঙ্গীতের সুরে
কাঁপায় তীরের দুটি বকুলের শাখা আর পাতা।
শিশিরে মুক্ত শুধু। তাই নেব,... ('সমুদ্র অনেক ঝড়'/*ছায়া হরিণ*)

খ. সারারাত শিশিরের শব্দের সঙ্গীতে
দুলে দুলে ভেসে যেতো স্বপ্ন ভেলায়। ('রূপান্তর'/ *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

'ইতিহাস'-মোটিফ আহসান হাবীবের কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চিত্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইতিহাস মানুষের মননচৈতন্যের বিষয়। সময়ের প্রভাব ও পরিবর্তনকে ইতিহাস ধরে রাখে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তা পৌঁছে দেয়। এই ইতিহাস ধরাছোঁয়া বা দৃশ্যের অতীত হলেও আহসান হাবীব ইতিহাসকে নানা পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গে সমীকৃত করে মূর্ত করে তুলেছেন। ইতিহাসকে জীবন্ত করে উপস্থাপনের প্রয়াস হিসেবেই কবি এই মোটিফ অবলম্বনে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন বলে মনে হয়। তাই ভাঙাচোরা দেয়ালের পাশে পুরনো ইঁটের স্তূপের পাশে তিনি চিত্রিত করেন ইতিহাস-লাবণ্য। এই লাবণ্য কেবল টেরই পাওয়া যায় না, ইচ্ছে করলে এক ঝলক দেখে নেওয়াও সম্ভব। দু'হাতে পুরনো ইঁটের স্তূপ সরাতে সরাতে হয়তো হাতে উঠে আসে ইতিহাসের কোন উজ্জ্বল উপাদান। ইতিহাসের এই পুরনো কথা ও গান থেকেই জন্ম নেবে নতুন দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার গল্প– এই আশাবাদ থেকেই তিনি ইতিহাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আবার তনুর তনিমায় তিনি যখন হৃদয়ের আহ্বান শুনতে ব্যর্থ হন, তখনো তিনি অনুভব করেন 'কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক'। ইতিহাসের এই স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই কবি বুনে যান সরব ইতিহাসের নানা কাহিনি। রক্তের অক্ষরে ইতিহাস যখন স্বাক্ষর রচনা করে, তখন এই ইতিহাসের হাতে হাত রেখে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেওয়া কিংবা গল্প করাও বোধকরি অসম্ভব নয়। কবি আমাদেরকে নিয়ে যান সেই ইতিহাস-বিন্যাসের পথে যেখানে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বুকভাঙা কান্নায় ভেসে যাওয়া সম্ভব। ইতিহাসের বুকে মুখ লুকোলে ইতিহাসকে যেমন স্পর্শ করা যায়, তেমনি ইতিহাসের হৃদ্‌স্পন্দন শোনাও সম্ভব। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক :

ক. ভাঙাচোরা দেয়ালের স্তূপাকার পুরনো ইঁটের
ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের
মনে মনে। কী আবেগে দুহাতে সরাই
পুরনো ইঁটের স্তূপ, লিখে রেখে যাই

আরো কথা, আরো কিছু গান আর নতুন খেয়াল
বানাই নতুন ইঁট নতুন দেয়াল। ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)

খ. তনুর তনিমা ঘিরে আজ নেই হৃদয়ের ডাক
কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক। ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

গ. তবুও অনেক ঝড় বয়ে গেছে
রক্তের অক্ষরে পথে স্বাক্ষরিত বহু ইতিহাস;
আর সেই ইতিহাস-বিন্যাসের পথে
অন্ধকারে মুখ রেখে কান্নায় ভেঙেছে বহু বুক। ('ইতিহাস-বিন্যাসের পথে'/*ছায়া হরিণ*)

আহসান হাবীবের কবিতায় মোটিফ হিসেবে অন্ধকার নানা মাত্রায় উদ্ভাসিত। অন্ধকার সবকিছুকে আড়ার করে দিলেও কবির চেতনার স্পর্শে অন্ধকারের অন্তর্গত ঐশ্বর্য শব্দবন্দি হয়েছে। অন্ধকারকে দৃষ্টির সীমায় আবদ্ধ রাখেন নি কবি। অন্ধকারে হীরের কুচি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অন্ধকারকে যেমন আলোর সঙ্গে খেলা করতে দেখি, তেমনি অন্ধকারের ডাক শুনে আমরা সচকিত হই। ঝড়ের আকাশ থেকে একগুচ্ছ অন্ধকার তুলে নেওয়ার মধ্যে এই অন্ধকার মানুষের স্পর্শের সীমায় চলে আসে। আর প্রিয় মানুষের মেঘকালো খোঁপায় এই অন্ধকার যখন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, তখন ফুলের সৌরভও সহজেই পাঠকের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সচকিত করে তোলে। বিদ্যুতের পাপড়ির মধ্যে আলোর ঝলক ঘ্রাণ ছড়ালেও অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে মিলেমিশে অন্ধকার হয়ে ওঠে কবির আত্মখচিত উপলব্ধির উজ্জ্বল আধার। কবি যখন অন্ধকারকে পাথরের মতো ভারি করে তোলেন, তখন অন্ধকার কেবল উপলব্ধির সীমায় আটকে থাকে না, এর ওজন সম্পর্কেও আমাদের কল্পনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্ধকার মাঠের মাঝখানে একলা বসে নিজের নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করার মধ্যেও ধরা পড়েছে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার আভাস। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. দেখো দেখো তোমার আত্মার অন্ধকারে
কে যেন হীরের কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে
ডাকে শোনো! ('যৌবনে জীবনে তুমি'/*ছায়া হরিণ*)

খ. এখন ঝড়ের আকাশ থেকে
তুলে নেব একগুচ্ছ অন্ধকার,
আর পরাবো তোমার কালো মেঘমালা খোঁপায়;
তুমি খুশি হবে;
ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি
অমাবস্যা-হৃদয়ে আমার! ('নতুন কবিতা'/*সারা দুপুর*)

গ. মাঠে রাত ন'টার অন্ধকার পাথরের মত ভারি
সেই মাঠের মাঝখানে দু'হাঁটুতে জোড়াহাত
তার ওপরে কপাল
আমি একদিন কেঁদে ছিলাম ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

অন্ধকারের মতো আলোও আহসান হাবীবের কবিতায় চমৎকার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে। আলোর বৃত্ত যখন পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে চায়, তখন আলোর বৃত্তে পাঠকের অনুভূতির নানা প্রান্ত সচকিত হয়ে ওঠে। আলো কেবল দৃষ্টির সীমায় আবদ্ধ না থেকে এর ঘূর্ণনে আমাদের চিন্তা আবর্তিত হয় এবং ভালোবাসার ভস্মস্তূপ ভালোবাসাকে দর্শণেন্দ্রিয়ের কাছে সজাগ ও চৈতন্যের কাছে সরাগ করে তোলে :

প্রকাণ্ড এক আলোর বৃত্ত যখন
পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল...
আমরা আমাদের চারপাশে
ভালোবাসার ভস্মস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ('ট্রেন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

Dhaka University Institutional Repository

ওপরের উদ্ধৃতিটিতে আলো কবির অন্তরতম স্বদেশের স্বরূপ উন্মোচনের ইঙ্গিত দেয়। আলোর এই ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে কবির সৃজনবিশ্বের বিস্তৃতি মুদ্রিত হয়েছে বলে মনে হয়। ভালোবাসা অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও ভস্মস্তূপের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রেমহীন পৃথিবীর অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কেও আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

আহসান হাবীবের কবিতায় নদী কেবল জলের উৎস কিংবা প্রবহমাণ সময়ের প্রতিনিধি হিসেবেই উপস্থিত হয় নি, নদী কবির গতিশীল জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে। নদীর কল্লোলে কবির স্বপ্ন ঢেউ হয়ে উঠেছে, আবার এই নদীর জলে সূর্যের আলোকরশ্মি যে দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে, সেখানে রঙিন জীবনের প্রতিভাসও প্রকাশ পেয়েছে। নদী যখন ধনুকের মতো টান হয়ে থাকে, তখন জীবনের গান লাভ করে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। শস্যক্ষেত ও সুপারিবাগান পার হয়ে আদিগন্ত নদীর কিনারে পৌঁছে কবির মনে হয়, জীবনের জঞ্জাল ধুয়ে শুভ্র পৃথিবীর একজন প্রাণবান মানুষ হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠার পথে আরো অনেক দূর যেতে হবে তাকে। স্তব্ধতার কাছে নতজানু নদী চিত্রকল্প হিসেবে অসাধারণ। নদী কি কখনো নিশ্চল হয়। যে নদী চলৎশক্তিহীন তা তো মৃত। এই মৃত নদী জীবনের গতিহীনতার দিতে ইঙ্গিত করে। নতজানু নদীর দিকে তাকিয়ে পাঠকের মনে হয়, এই নদীর মতোই তো মানুষকে সময়ের কাছে এসে হার মানতে হয়। সময়কে কাজে লাগানোর তাগিদ থেকেই কবি এই পঙ্‌ক্তির জন্ম দিয়েছেন। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে :

ক. হিমে ও বর্ষায়
সূর্যের প্রহরা পাই, প্রশান্তি চাঁদের;
নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের
পরিচর্যা পাই নিত্য
জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে। ('শেষ সন্ধ্যা– প্রথম ঊষা'/*সারা দুপুর*)

খ. ধনুকের ছিলার মতন
টানটান হয়ে আছে নদী ও নীলিমা
শস্যক্ষেত সুপারি বাগান, পাশে
আদিগন্ত নদীর কিনার। ('টান'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

গ. নদী কি নিশ্চল! দ্যাখো সব নদী স্তব্ধতার কাছে
কি রকম নতজানু! ('উল্টোপাল্টা এইসব'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীবের কবিতায় নীলিমা বিচিত্র অবয়বে উপস্থিত। নীলিমার হাতে কবি তুলে দেন অন্ধকার এবং স্তব্ধতা। নীলিমা তখন প্রার্থনায় বসে ফুলের জন্য, শব্দের জন্য এবং ভ্রমরের জন্ম মন্ত্রপাঠ করে। নীলিমার বুকের অন্ধকারে শব্দ যখন ফলের মতো বিকশিত হয়, তখন কবির অন্তর্গত ভাবকল্পনা প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। তপস্যায় মগ্ন নীলিমাকে পাঠক কেবল উপলব্ধিই করে না, তাকে দেখা যায়, এমনকি নীলিমার হাতে হাত রেখে নিজেকেও নিবেদন করা যায় সৃষ্টির উৎসবে। নীলমার বুকের অন্ধকারে শব্দকে গেঁথে নেওয়ার বাসনায় কবির সৃজনবেদনা ধরা পড়েছে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে নীলিমার বুকের কাছে বসে এর উষ্ণতা ও সুবাসে আলোড়িত হওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয় :

ক. নীলিমা কি নিরবধি কাল
দু'হাতে আঁধার আর স্তব্ধতাকে তুলে নিয়ে
থাকে তপস্যায়
ফুলের, ফুলের মত শব্দের এবং ভ্রমরের? ('শব্দ ফুল নীলিমা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

খ. তখন শব্দকে আমি সুবিন্যস্ত ফুলের মতন
গেঁথে নিতে পারি
নীলিমার বুকের আঁধারে... ('শব্দ ফুল নীলিমা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

সময়ের কাছে হিসেব রেখে আমাদের সবাইকেই একদিন চলে যেতে হয়। কিন্তু চলে যাওয়া মানেই তো আর জীবনের যাবতীয় অর্জনকে দলে যাওয়া নয়। তাই সময়কে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে জাগে আমাদের। সময় যখন আমাদের

ভালোবাসার ভঙ্গির মধ্যে সন্দেহের আভাস রচনা করে, তখন সময়কে আমরা মানবীয় অবয়বে উপস্থিত হতে দেখি। সময়ের বুকে ভালোবাসার ঋদ্ধ অবয়ব প্রকৃত অর্থে সময়কেও আমাদের স্পর্শের সীমায় নিয়ে আসে। সময়কে ইচ্ছেমতো দীর্ঘ করে নেওয়ার ইচ্ছে বাস্তবসম্মত কি-না পাঠক সে প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। কেবল সময়ের কাছে নিজেকে খুলে দেয়। জীবনের যাবতীয় অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির জন্য কোন হাহাকার নেই কবির, কেবল ছবির মতো সময়কে চিত্রিত ও চিহ্নিত করার আনন্দে তাঁর মন ভেসে যেতে চায় । সময়ের ভয়াল প্রতিকৃতি নির্মাণের মধ্যেও চমৎকার শব্দ-প্রতিমা উদ্ভাসিত হতে দেখি। সময়ের বিপুল ঘণ্টায় হাত রাখার মাধ্যমে আমরা সময়কেই স্পর্শ করার আনন্দ লাভ করি। সময় থেমে নেই, তবুও সময়ের হাতেই আমরা বহমান জীবনের বিচিত্র আয়োজনকে তুলে দিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজাতে চাই। সময়ের ঘণ্টা কেবল সময়কে হাতের নাগালে নিয়ে আসার আবহ রচনা করে না, সময়কে দু'হাতে খরচ করার মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার আহ্বানও হয়তো শব্দবন্দি করতে চেয়েছেন কবি :

ক. ভালোবেসে দু'হাত বাড়ালে
সময় দেখে না তাকে সন্দেহের চোখে, তার
বুক জুড়ে মেলে দেয় ঋদ্ধ অবয়ব,
থাকে। আর ইচ্ছেমত সময়ের আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব। ('সময়-অসময়'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

খ. ভালোবাসার স্বপ্ন সুখ
সুখের সমস্ত ভাবনা পেছনে রাখিস, সারা
শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা। ('সারস'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

গ. যেন অবিশ্রাম
রাখিস অদৃশ্য হাত সময়ের বিপুল ঘণ্টায়, যায়
সময় অশ্রান্ত বয়, বয়ে যায় নদী... ('সারস'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় শব্দকে নানা অবয়বে নির্মাণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 'শব্দের বাগানে যাই/বলি, কিছু ফুল দাও/ভ্রমর-সঙ্গীত/দাও কিছু... ।' ('শব্দ ফুল নীলিমা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)– এই উচ্চারণে আমরা শব্দকে ফুলের মতো ফুটে উঠতে দেখি, তার সৌরভ ও গৌরবে আনন্দিত ও আলোকিত হই। একইভাবে 'শব্দের মালায় আমি তোমাকে গাঁথতে চাই– স্বাধীনতা! তুমি/ঘরে-বাইরে এমন উলঝলুল নৃত্যে মেতে আছো, কি আশ্চর্য/আমার কলম/কিছুতেই তোমাকে যে ছুঁতেও পারে না।' ('স্বাধীনতা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)– এই অভিব্যক্তি শব্দকে ধরাছোঁয়ার সীমায় নিয়ে আসে। কেবল শব্দই নয়, আহসান হাবীব নৈঃশব্দ্যের পৃথিবীকেও কবিতায় উপস্থিত করেন এবং নীরবতা লাভ করে অসাধারণ চিত্রকল্পের সম্মান। নিচের দৃষ্টান্তে দৃষ্টি দেওয়া যাক :

গোধূলির সমস্ত সিঁদুর যখন ধূসর হয়ে আসে আর
বনভূমি কাঁপিয়ে
বিশালকায় কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
ভয়াবহ নীরবতা যখন গর্জে ওঠে
আমি ভয় পাই। ('আমি তখন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীব আরো নানা মোটিফ অবলম্বনে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। চিত্রকল্প সৃজনে খুব বেশি শব্দ ব্যয় করেন না কবি। তাঁর কল্পনাপ্রতিভা শব্দের শরীরকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যেন শব্দই হয়ে ওঠে কবির চেতনবিশ্বের বিচিত্র অনুভব ও উপলব্ধির স্মারক। যা-কিছু স্পর্শের অতীত, কবির সৃজনীশক্তি তাকেও স্পর্শের সীমায় চলে আসে। একান্ত অনুভবনির্ভর অনুষঙ্গকেও তিনি অবয়ব দেন, যা তাঁর উজ্জ্বল কল্পনাশক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠে। বিপ্রদাশ বড়ুয়া যথার্থই বলেছেন :

> বাক্প্রতিমা নির্মাণে তিনি এমন কিছু চিত্র এঁকেছেন যা তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থ জুড়ে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে ব্যাপ্ত। যেমন আত্মা এবং আত্মার উদ্বোধন, অন্ধকার থেকে ঊষার আবির্ভাব, সমাসন্ন আগামী দিন, পিপাসার তৃপ্তি– আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আশা কিংবা চিরন্তনই একমাত্র উজ্জীবনী শক্তি।... তাঁর কবিতার বিষয় ও বাক্চিত্র, কবিতার চরণ, আবেগবাহী শব্দের পঙক্তি নিয়ে আমাদের উন্মন ও উন্মুখ করে, দীক্ষিত করে। (২০০৯ : ৩১)

কবির চিত্রকল্পের ভুবনে গভীর অভিনিবেশসহকারে পরিভ্রমণ করলে সমালোচকের উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। চিত্রকল্প কবির সহজাত শিল্পচেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি তাঁর দেখার ও উপলব্ধির জগতকে সজাগ ও সরাগ করে তুলতে চান বলেই চিত্রকল্প হয়ে ওঠে কবির আত্মপ্রকাশের উজ্জ্বল অনুষঙ্গ। নিচের দৃষ্টান্তসমূহ বিবেচনা করলে আহসান হাবীবের কবিপ্রতিভার স্বরূপ এবং তাঁর চিত্রকল্পনির্মাণকৌশল সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে :

ক. কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল–
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল। ('শীতের সকাল'/*ছায়া হরিণ*)

খ. আলোকিত একটি কামনা
চোখ মেলে উঠে এলো অরণ্যের ছায়ার আশ্রয়ে। ('পুনর্বাসন'/*ছায়া হরিণ*)

গ. তোমার আমার আর তার সব বাসনাকে এসো
সহজে চিত্রিত করি এসো সেই দিগন্তে
যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই
সবার ইচ্ছের অনুরূপ, ('এসো সঙ্গী হই'/*সারা দুপুর*)

ঘ. আমাদের বকুল-শাখারা
তখন কেমন এক অলৌকিক পাখি হয়ে
        পাখায় কেমন এক অলৌকিক আলো জ্বেলে
        আমাদের শোনাতো সঙ্গীত। ('দোহাই তোমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. রোজ সকালে রোদপোয়ানো ভঙ্গি থাকে শিরীষ ডালে ('সারা দিন আমি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

চ. অজেয় পায়ের চাপ রেখে যাই, দেখি
দুর্বিনীত মাটি তার দীর্ণ বুক মেলে দেয়
নামে স্রোত সবুজ সুধার; ('যতবার ভোর হলো'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

ছ. আমি এই পবিত্র শূন্যতা
ভোর হলে রৌদ্রে মেলে দেবো। ('শববাহকদের অপেক্ষায় একজন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

জ. মনে হয় লালনের অচিন পাখির পালকি
                বাতি জ্বেলে নিয়ে
কুষ্টিয়ায় ফিরে যায় খাঁচার সন্ধানে। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

ঝ. বিবাগী চাঁপার গন্ধের মতো তোমার মনের সুরভী
আমার মনে রইল লেগে, ('নীল খাম'/*প্রেমের কবিতা*)

ঞ.   পৃথিবীর রক্তাক্ত শয়ান
এরকম বেডকভারে এইভাবে ঢাকা পড়ে থাকে। ('একদিন বিকেলে এসো'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে চিত্রকল্প বিষয়ে আহসান হাবীবের বিবেচনার স্বরূপ অনুধাবন করা যেতে পারে। চিত্রকল্পকে তিনি কেবল মানুষের ইন্দ্রিয়ের সীমায় আবদ্ধ রাখেন নি, তা অনুভবের বিস্তৃত ভুগোলকেও স্পর্শ করেছে। কবি তাঁর কবিতার ভাষাকে কথ্যভঙ্গির সমীপবর্তী রাখতে চেয়েছেন বলেই তাঁর চিত্রকল্পও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিচিত্র অনুষঙ্গেই সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। আহসান হাবীবের চিত্রকল্প তাই কোন আরোপিত অলঙ্কার হিসেবে প্রতিভাত নয়, বরং তা কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই প্রোজ্জ্বল ও প্রদৃপ্ত।

প্রতীক

জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে একজন কবির ভাষা এমন এক সংহত অবয়ব লাভ করে যা তাঁর ব্যবহৃত শব্দের শরীরে দান করে অনাস্বাদিত অনুভব। ফলে কবিতার শব্দ লাভ করে আভিধানিক সীমা-অতিক্রমী শক্তি। পাঠকের কল্পনা-প্রতিভার কাছে সেই শক্তির উন্মোচন সর্বদাই যে পূর্ণাঙ্গ হবে কিংবা তা পাঠককে প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিতৃপ্ত করবে তা ভাবা যায় না। এই অতৃপ্তিও পাঠকমনে আনন্দের অভিব্যক্তি সঞ্চার করে। 'কিছু তার দেখি আভা।/ কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।'– রবীন্দ্রনাথের (১৯৭০ : ২১৫) এই গীতবাণীর মতোই

কবিতা পাঠকমনকে সংশয়মিশ্রিত শিহরন ছড়িয়ে দেয়। এই শিহরনকে নিপুণ ও সংহত অবয়ব দেওয়ার কাজটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে গিয়েই কবিতায় প্রতীকের সৃষ্টি।

প্রতীকের আশ্রয়ে কবির শিল্পচৈতন্যের ধরনটিও অনুধাবন করা সম্ভব। কারণ 'কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক কবি নিজেই ইচ্ছেমতো মনোভাবের বাহকরূপে বেছে নেন। বস্তু ও বাস্তবের অন্তর্নিহিত আত্মার সারাৎসার প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।...কবিতার কাছে আমরা চাই সেই রহস্য ও জটিল স্বপ্নময়তা, যা আমাদের স্বপ্নচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৭০)। আহসান হাবীবের কবিতার পাঠক হিসেবে আমরা জানি, তিনি কবিতায় জটিলতাকে পরিহার করেই স্বপ্নময়তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতীককে ফরাসি প্রতীকবাদী কাব্যান্দোলের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করার সুযোগ নেই। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বোদলেয়ার কিংবা এর প্রাণপুরুষ মালার্মের নিবিড় পাঠক সত্ত্বেও আহসান হাবীব স্বকালের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেই প্রতীক নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। র‍্যাঁবো, ভারলিন, এডগার এলান পো, হথর্ন, মেলভিন, এমার্সন প্রমুখ কবি তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রতীকের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কালোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টার মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেও আহসান হাবীব সেই প্রভাবের হুবহু অনুকরণের পথ পরিহার করে চলেছেন। তাই তাঁর প্রতীক যুগযন্ত্রণায় জারিত হয়ে এবং যুগের চিহ্নকে ধারণ করেও যুগোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

প্রতীকের সংজ্ঞার্থ নিরূপণের চেয়ে এর শক্তির স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। প্রসঙ্গত প্রতীক-বিষয়ে দুইজন সমালোচকের বিবেচনা উপস্থাপন করা যাক :

ক. প্রতীক এক বিশেষ অর্থের প্রতিনিধি নয়। প্রতীকের মধ্যে অনেক অকথিত, অপ্রকাশিত অর্থ যোগরূঢ় হয়ে থাকে। নর্তকী যেমন নাচের মানে কি বলতে পারে না; তা বলা যায় না বলে কষ্ট করে দেখাতে হয়; তেমনি প্রতীকও ব্যাখ্যার মধ্যে পেতে চেষ্টা করা ভুল। তাকে প্রতীকের মধ্যে প্রতীক হিসেবেই পেতে হয়। প্রতীক বলে না, বলতে চায়। কোন বক্তব্য নয়, বলার আগ্রহই তার ভাষা। (জগন্নাথ চকবর্তী ১৯৬৫ : ১৯৪-৯৫)

খ. প্রতীক সম্বন্ধে যা বলা চলে তা হলো এই, প্রতীকে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়। ...আসলে প্রতীক বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শন শুধু নয়, প্রতীক হচ্ছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি, সম্মিলন, একটি গভীর রহস্য, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনা। শুধু একটি অর্থ উদ্ধার করে প্রতীক বিশ্লেষণ চলে না।' (আহমদ কবির ১৯৯৫ : ৯৯–১০০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের মর্মকথা এই যে, কেবল অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে প্রতীকের শক্তি অনুধাবন সম্ভব নয়। এমনকি ব্যাখ্যার মাধ্যমেও প্রতীকের সবটুকু পাঠকের বোধের জগতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। 'প্রতীককে প্রতীক হিসেবে' দেখার যে পরামর্শ দিয়েছেন সাহিত্যসমালোচকেরা, এর দ্বারা প্রতীকের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনারই প্রমাণ মেলে। কবিতার বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই জানেন, 'প্রতীকের সাহায্যে অরূপ ও অতীন্দ্রিয় জগতকে চিত্রিত করা হয়। প্রতীক জাগতিক রূপময় ভাষার এমন এক অবয়ব নির্মাণ করে নেয় যা শব্দের প্রচলিত অর্থের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। চিন্তা ও কল্পনাকে দূরসঞ্চারী করতে ব্যর্থ হলে প্রতীকের প্রতীয়মান অর্থের উপলব্ধি অসম্ভব।' (তারেক রেজা ২০১০ ১৪৪)। সেই অর্থে প্রতীকের কাজ পাঠকের কল্পনাপ্রতিভার উন্মিলন। আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে আমরা লক্ষ করব, কবিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে তিনি কাব্যদেহে অনাস্বাদিত অনুরণন সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন।

আহসান হাবীবের কবিতায় চিতা প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। চিতার আগুনে পুড়ে নিজেকে নিঃশেষিত করা নয়, চিতার আগুন জ্বালিয়ে যারা শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভস্মিভূত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের আবহ রচনায় চিতা-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন কবি। জীবনের শেষ হিসেবে তিনি চিতা প্রতীকের ব্যবহার না করে এই আগুনে খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার প্রত্যয় উচ্চারণ করেছেন। কবি যখন ভস্মস্তূপের শরণ নেন, তখনো তিনি নীড় বাঁধার স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হন না। চিতা ও ভস্মস্তূপ আহসান হাবীবের স্বকালে প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রত্যয়কেও ধারণ করেছে বলে মনে হয়। নিচের দৃষ্টান্ত দুটো বিবেচনা করা যাক :

ক. যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত। ('দিনগুলি মোর'/*রাত্রিশেষ*)

Dhaka University Institutional Repository

খ. তাই বেদনার বহ্নিও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিড়
ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধলাম নীড়। (এই মন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)

পৌরাণিক অনুষঙ্গ হিসেবে শকুনি মানুষের মনে যে রূপকল্পের জন্ম দেয় তা হল শঠতা, স্বার্থপরতা ও বিবেকহীনতার আবহ। আহসান হাবীব তাঁর সময়ের কুটিল ও স্বার্থান্ধ মানুষকে শকুনির বংশধর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে কাব্যরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই শকুনি-প্রতীক খুবই তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। যখন কবির 'পায়ের তলায় শ্বাস ফেলে যায় হিংস্র কুটিল সরীসৃপ', তখন শকুনি বংশধরদের অশুভ তৎপরতায় বিপন্ন পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন কবি :

উর্ধ্বে আকাশ ম্লান মেঘের
নিম্নে অতল বন্যা এর–
বাস করে শত চানক্য শিশু শকুনির বহু বংশধর
এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না এখানে বেঁধো না বিরাম ঘর। ('আজকের কবিতা'/*রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীব কবিতায় বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রগতি-কবিতায় বহুল ব্যবহৃত কিছু প্রতীকের শরণ নিয়েছেন। প্রতীক হিসেবে সিঁড়ি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সিঁড়ি-প্রতীকে পাঠকচৈতন্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছবি জেগে ওঠে। আহসান হাবীব যখন সিঁড়ির নিচে সংজ্ঞাহীন পড়ে থেকে নিরাপদ সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর কথাই আমাদের মনে পড়ে। একইভাবে সাইরেন প্রতীকেও এই অস্থির সময়ের ছায়াপাত স্পষ্ট। চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল কবিরা বারবার সাইরেন ও সঙীন প্রতীক ব্যবহার করে স্বকালের অসুখ ও অস্থিরতার ছবি এঁকেছেন। এই দশকের একজন কবি হিসেবে সেই প্রগতি-কবিতার প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করেন নি। কঙ্কাল, মশাল, ইস্পাত, শাবল, ত্রিশঙ্কু– এইসব প্রতীকের মাধ্যমে কেবল বিধ্বস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের অন্তর্গত অস্থিরতাই চিত্রিত হয় নি, সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দোদুল্যমানতাও পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েছে। এই প্রতীকসমূহের ব্যবহার চল্লিশের কাব্যচেতনাজাত বলে উল্লেখ করে সমালোচক আহমদ রফিক জানিয়েছেন, 'স্বকাল-চেতনা তথা দেশকালের চেতনা তাঁর কবি মানসে কার্যকরী ছিলো বলেই তাঁর কবিতার বয়ান ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসানকল্পে যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ, তেমনি সমকালীন বিপর্যয় থেকেও দূরে সরে যায়নি।' (১৯৮৭ : ১১৪)। 'নতুন পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্নে কবিতার মুখশ্রী উজ্জ্বল করে তুলতে' এইসব প্রতীক ঠাঁই করে নিয়েছে আহসান হাবীবের কবিতায় :

ক. আমরা সিঁড়ির নীচে সংজ্ঞাহীন হয়ে গুণি
নিরাপদ ধ্বনির সময়! ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

খ. তোমরা রাখো না মনে, মোরা কভু ভুলি না সাইরেন ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

গ. আর কারার নির্মম অন্ধকার উপেক্ষা করেছি
মুক্ত বুক সঙীনের মুখে পেতে নির্ভয়ে
শুধু এক অকৃত্রিম বাসনায়। ('যৌবনে জীবনে তুমি'/*ছায়া হরিণ*)

ঘ. তনুর তনিমা ঘিরে আজ নেই হৃদয়ের ডাক
কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক। ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

ঙ. আছে শুধু হাতের মশাল
আছে এই নগ্নশির বিবর্ণ উলঙ্গ এই ভাল! ('কয়েদী'/*রাত্রিশেষ*)

চ. অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ছিন্ন করে যদি নেয় ভার
ইস্পাত-কঠিন এক দিন রচনার– ('ঝরা পলাশ'/*রাত্রিশেষ*)

ছ. কবে কোন প্রতিজ্ঞার ছলে
কে দিয়েছে কি আশ্বাস তারি মৃদু শিখার সম্বলে
এখনো হৃদয়ে জ্বলে তিতিক্ষার ইস্পাত-কঠিন
এই দিন। ('চরিতাখ্যান : নববর্ষ'/*ছায়া হরিণ*)

জ. গলায় চীৎকার নেই, একমনে বসে

Dhaka University Institutional Repository

লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়। ('যতবার এবং এবার'/*আশায় বসতি*)

ঝ. নির্মম মমতা–/ ত্রিশঙ্কু মনেরে হেনে শঙ্কাহীন করেছে ক্ষমতা। ('স্বাক্ষর'/*রাত্রিশেষ*)

বিপন্ন সময়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে আহসান হাবীব বারবার সাপের শরণ নিয়েছেন। কবির প্রয়োগকৌশল সাপকে দিয়েছে প্রতীকী তাৎপর্য। কবি যে অজগরের কথা বলেছেন এবং অজগরের মৃত্যুর মোচড়ের ছবি এঁকেছেন তা কবির অন্তর্প্রেরণায় গভীরতর অর্থের দ্যোতক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিপন্ন হরিণের রূপকল্পেও অসহায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস ধরা পড়েছে। নিচের দৃষ্টান্ত দুটো বিবেচনা করা যাক :

ক. এদিকে আকাশে
কার শিকারী চোখের ছায়া জাগলো
কয়েকটি রেখা এসে লাগলো
দৈত্যকায় অজগরের মৃত্যুর মোচড়। ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আমি
প্রস্তরে ছিলাম। আমি ধাবমান প্রাচীন হরিণ আর
হিংস্র পশুর চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ছিলাম ('আমি আছি'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় আলিফ-লায়লা প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের এক হাজার একরাত্রির গল্পের আবহে কবি সমকালীন জীবনবাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। বাদশা হারুন-অর রশীদের কালের 'একদিনের বাদশা' আবু হোসেনও হাবীবের কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। 'আবু হোসেন প্রতীকটিকে কবি ব্যবহার করেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তর-বাসনাকে রূপ দিতে। কেননা এই বাসনা কখনো লুপ্ত হয়না, সুপ্তই থাকে এবং থাকে অচরিতার্থ। এই উদগ্র বাসনাকে কবি যখন মৃত হিসেবে জানছেন, তখন মানুষের কোলাহলমুখরতার শব্দ তিনি পাচ্ছেন। কিন্তু আবু হোসেনের মৃত্যু নেই– নেই বলেই মানুষ ছুটছে অচরিতার্থ বাসনাকে রূপায়ণের জন্যে।' (তুষার দাশ ১৯৮৫ : ৩৬)। আবু হোসেনকে উপজীব্য করে মানুষের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়কে রূপায়িত করেছেন আহসান হাবীব :

ক. মনে পড়ে সেই আলিফ-লায়লা রাতের কাহিনী
হৃদয়ে জ্যোৎস্না কণ্ঠে কথার কলকিঙ্কিনী ('একটি মহৎ কবিতার খসড়া'/*ছায়া হরিণ*)

খ. হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে
অথবা তোমাকে আলিফ্লায়লার কোনো কল্পিত চরিত্র ভেবে;
হায় আবু হোসেন... ('তোমাকে মৃত জেনে'/*সারা দুপুর*)

বালখিল্য ঋষির তেজ ও তপস্যার আবহকে সামনে রেখে কাজী নজরুল ইসলামের কবিত্ব ও কৃতিত্ব উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছেন আহসান হাবীব। পৌরাণিক ঘটনা হিসেবে বালখিল্য ঋষির খর্বাকৃতি তাঁর সাধনার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কশ্যপঋষির পুত্রকামনায় আয়োজিত যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছিলেন বালখিল্যরা। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত *পৌরাণিক অভিধানে* বলা হয়েছে, 'খর্বাকৃতি ও দুর্বল বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে মাত্র একটি পত্র বহন করে আনবার সময় জলপূর্ণ গোস্পদে পতিত হন। এই দেখে ইন্দ্র এঁদের উপহাসপূর্বক লজ্ঘন করে চলে যান। এইরূপে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বালখিল্যরা অধিকতর শক্তিশালী এক ইন্দ্রের উৎপত্তির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই সংবাদ অবগত হয়ে ইন্দ্র কশ্যপের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বলেন যে, ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁকে আর একটি ইন্দ্র সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মার নিয়ম অমান্য করা হবে। তবে অন্য ইন্দ্র জন্মগ্রহণ না করে এক পক্ষিশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে। কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করে বালখিল্যরা সন্তুষ্ট হন।' (১৪০৮ : ৩৩৩-৩৩৪)। এই দুই পক্ষিশ্রেষ্ঠই অরুণ ও গরুড়। 'মহাভারতের আদি পর্বে বালখিল্যের তপস্যায় যে নিষ্ঠা ও সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রমাণ করে যে, দৃঢ় মনোবল ও লক্ষ্যে অবিচল থাকলে দৈহিক আকার সিদ্ধিলাভের অন্তরায় হতে পারে না।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১৮৪)। আহসান হাবীব এই তপস্যার আবহে কালোত্তীর্ণ প্রতিভা হিসেবে নজরুলের মহিমাকীর্তন করেছেন :

বালখিল্যমত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি
এবং ভেবেছি
আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ! ('নজরুলকে মনে করে'/*সারা দুপুর*)

মহাভারতের অর্জুনকেও প্রতীকী তাৎপর্যে চিত্রিত করেছেন কবি। অর্জুনের শরণ নিয়ে তিনি বিপন্ন সময়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি লাভ করতে চেয়েছেন। যোদ্ধা অর্জুনের কাছে ফিরে যাওয়া মানেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা। নিচের দৃষ্টান্তটি পাঠ করা যাক :

টানটান ধনুকের ছিলার মতন টান চরাচরে
অলক্ষ্যে টঙ্কার :
চতুর্দিকে কারা ডাকে : অর্জুন! অর্জুন!! ('টান'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিথকে সমন্বিত করে চমৎকার শিল্পসফল কবিতা রচনা করেছেন। প্রাচ্যের লোকপুরাণের নায়িকা রাধার সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রেয়সী-চরিত্র হেলেনকে গেঁথে দিয়েছেন কবি। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনকে কবি জাল হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং প্রেমের জালে আটকে যাওয়ার আনন্দকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। বিশেষ করে রাধা কিংবা হেলেনের চোখের সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর প্রেয়সীর চোখের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। 'সুন্দর চোখের মেয়েদের নাম' কেন মীনাক্ষী রাখা হয়, এতো দিনে বুঝতে পেরেছেন কবি :

টলমলে অমন সুন্দর চোখ
আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি
জানি, কেন তোমরা সুন্দর চোখের মেয়েদের নাম
মীনাক্ষী রেখেছো। ('জাল'/*সারা দুপুর*)

কবি কেবল হেলেনের চোখের আগুনে প্রেমের উষ্ণতাই অনুভব করেন নি, সেইসঙ্গে ট্রয়ের ধ্বংসযজ্ঞেরও আশ্রয় নিয়েছেন। চোখের আগুন কেবল প্রেমের আগুন হিসেবে থাকে নি, তা ট্রয় নগরীকে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মানুষের অতৃপ্ত প্রেমকেই কবি প্রজ্বলিত ট্রয়ের রূপকল্পে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করা যাক :

ট্রয়ের আত্মাকে আর হৃদয়কে জ্বালিয়েছে যে আগুন
তার সব দাহ দেহে তার শান্ত হতে পারে
আর তৃপ্ত হতে পারে ('তারা দু'জন'/*সারা দুপুর*)

প্রতীচ্য পুরাণের 'মিডাস' চরিত্রটিকে অন্তহীন লোভ এবং তার পরিণাম নির্দেশের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন কবি। সুরাদেবতা ডায়ানিসাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাজা মিডাস। ডায়ানিসাসের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন সাইলেনাস। এই সাইলেনাসকে একবার ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন রাজা মিডাস। এতে ডায়ানিসাস খুবই খুশি হন এবং এই কাজের পুরস্কার বা বর হিসেবে কিছু প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন রাজা মিডাসকে। "মিডাস অদ্ভুত এক বর চেয়ে বসলেন ডায়ানিসাসের কাছে। তিনি বললেন, 'আমি যা স্পর্শ করবো তা যেন সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যায়।' ডায়ানিসাস নির্বোধ মিডাসকে সেই বরই দিলেন।" (ফরহাদ খান ২০০১ : ১১৮)। মিডাস খাবার খেতে গিয়ে বিপদে পড়লেন। তাঁর স্পর্শে খাবারও সোনা হয়ে গেল। মিডাসের মিনতিতে ডায়ানিসাস এই বর ফিরিয়ে নিয়েছিল। লাগামহীন লোভ মানুষের জীবনে কী ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে, মিডাস প্রতীকের আশ্রয়ে আহসান হাবীব সেই কথাই তুলে ধরেছেন :

ক. প্রমত্ত মিডাস্ আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিনরাত্রী। ('প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা'/*সারা দুপুর*)

খ. তবুও মিনতি

মিডাসের কাহিনী ভুলো না। ('দোহাই তোমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

পশ্চিম-এশীয় মিথ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে প্রতীকী তাৎপর্য দিয়েছেন আহসান হাবীব। মুসলিম-মানসের অন্তর্গত রূপটিকেও তিনি কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন। তাই নূহ নবী ও তাঁর সময়ের প্রবল প্লাবনের কথা বারবার স্মরণ করেছেন কবি। অবিশ্বাসী মানুষের জীবনের নূহের প্লাবন যে ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছিল, আহসান হাবীব সেই ঘটনার আলোকে বিভ্রান্ত মানবজাতির একজন প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে ভেবেছেন নূহের প্লাবনে পথ হারানো 'এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান'। নূহের প্লাবন এখানে ধর্মীয় আবহ অতিক্রম করে লাভ করেছে প্রতীকী তাৎপর্য। বিপন্ন মানবজাতির সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করে কবি নূহের জগতে ফিরে গেছেন এবং সেই প্লাবনের ভয়াবহতার রূপকল্পে বিশ্বমানবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন :

ক. হঠাৎ মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান
নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি
এবং পথের সব আলো নিবে গেছে ('তারা দু'জন'/*সারা দুপুর*)

খ. দেখো তার চারপাশে প্লাবন
তার ক্লান্ত ঠোঁটে নূহের জাহাজ। ('বালক এবং পাখি'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীব কেবল নূহের প্লাবনকেই কবিতায় ধারণ করেন নি, আদিমানব আদমের কথাও তাঁর কবিতায় উপস্থিত। আদমের গন্দম ফল গ্রহণের কারণে বেহেশত থেকে বিচ্যুত হওয়ার রূপকল্পে কবি পৃথিবীর মানুষের মর্মঘাতী বেদনাভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম মানব আদমকে উদ্দেশ্য করে কবি যা বলেন, তা একালের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জন্যও সমান গুরুত্ব বহন করে :

সেই কতকাল– শিশু সূর্যের জাফ্‌রাণী রঙ্‌
তোমাকে জাগালো। আহা সেই তনু সুরের সারঙ্‌।
মনে পড়ে সেই মহৎ ভ্রান্তি গন্দম দানা;
আজো মনে আছে মোহময় সেই সুরের সাহানা। ('একটি মহৎ কবিতার খসড়া'/*ছায়া হরিণ*)

জীবনের শূন্যতাকে রূপ দিতে গিয়ে আহসান হাবীব বেলুন ব্যবহার করেছেন, যা কবিপ্রতিভার স্পর্শে লাভ করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। জীবনের হাটে হাটে সওদা করেও যখন শূন্যহাতে ঘরে ফিরতে হয়, তখন হতাশায় আচ্ছন্ন হয় মন। সেই হতাশাই বেলুন প্রতীকে ধরা পড়েছে। কেবল জীবনের হাটে বিকিকিনি কিংবা ভুবনের ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ানোই নয়, গন্তব্যের কথাও মানুষকে ভাবতেই হয়। এই গন্তব্যেরই দিকনির্দেশনা রচিত হয়েছে বন্দর প্রতীকের আশ্রয়ে। বেলুন ও বন্দর কবিজীবনের গূঢ়ার্থকে রূপায়িত করায় তা প্রতীকী মাত্রায় উদ্ভাসিত :

ক. অবুঝ শৈশবে তুই পিতার হাত ধ'রে
সেই যে বেরলি আর তুলে নিলি সখের বেলুন, তুই
ঘুরে ঘুরে সখের মেলায় ('বেলুন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

খ. বন্দরের ঘাটে
পশারীরা একে একে সব নৌকো ভাসায় জোয়ারে
তখন ফিরিনি। ('উত্তীর্ণ প্রহরের গান'/*সারা দুপুর*)

আহসানের হাবীবের কবিতায় আমরা বারবার পাখির উপস্থিতি লক্ষ করি। তাঁর কবিতায় পাখি কবির স্বপ্ন, কল্পনা ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এই পাখির আবহেই চিত্রিত হয়েছে কবির অনিকেত মানসতা। মুক্ত আকাশ স্বার্থান্বেষী মানুষের অপতৎপতায় বারবার কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়। তাই পাখির জন্য কবির যে কষ্ট, তা বিপন্ন মানুষেরই দীর্ঘশ্বাস-ভারাক্রান্ত অভিব্যক্তি। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি :

ভরা রোদে পাখা মেলে দেওয়া পাখিটা তখন বলে,
বড় দুঃখী– ওকে তুমি দুঃখ দিও না
মেঘেরা রোদ ভালোবাসে। ('রোদে-মেঘে'/*সারা দুপুর*)

বাগান আহসান হাবীবের কবিতার একটি বহুল ব্যবহৃত অনুষঙ্গ। বারবার কবি বাগানের কথা বললেও প্রত্যেক বাগানেই কবি ভিন্নধর্মী ফুলের সমাহার ঘটান। কবির জীবনাভিজ্ঞতার উষ্ণতায় তাঁর বাগানের ফুল হয়ে ওঠে একেবারেই নতুন এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। কবি যখনই জীবনকে নিজের ইচ্ছের অনুকূলে সাজাতে চেয়েছেন, তখনই জীবনকে বাগানের রূপকল্প হাজির করেছেন। তাই বাগান কবির পুষ্পিত জীবনেরই প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীতে যা কিছু দুর্লভ, কবি তাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বাগানে বন্দি করে রাখতে চান : 'আমার খুশিতে আমি তাকে বন্দি করে রেখেছি বাগানে/আমার বাগানে।' ('তার খুশি আমার'/সারা দুপুর)। এই বাগানের নিপুণ এবং একনিষ্ঠ মালি হিসেবে আহসান হাবীব হয়ে ওঠেন সুন্দর ও আনন্দের স্রষ্টা। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. অজ্ঞানকে জ্ঞানদান এবং
পরার্থে সময় কিছু অবশ্যই দেয়া চলে ভেবে
সকালেই হাসিমুখে দাঁড়ালেন বাগানের পাশে। ('রেখে যাবো'/*সারা দুপুর*)

খ. জোয়ারের জল কিছু তুলে এনে ছড়িয়েছি প্রত্যহ বাগানে? ('সেই নদী'/*আশায় বসতি*)

গ. নিজের বাগানে নিজে ক্রোধের আগুন
ছড়ায় ('কাব্য-সভায়'/*আশায় বসতি*)

ঘ. আমার বাগানে
সজ্জিত সম্পন্ন এই ফুলভারে নম্র নত
অস্তিত্বের উৎস এই আমার বাগানে
তোমার এ হন্তারক উপস্থিতি
চাই না চাই না। ('দোহাই তোমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. এবং বিশাল
জীবনের বাগানে বাগানে নীলপদ্মের বৈভব। ('বেলুন'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের কবিতায় আরো নানা অনুষঙ্গ প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কখনো তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রামের ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে আহত হয়েছেন এবং বর্তমানের শ্রীহীন গ্রামকে তিনি স্টবিরাই নগরীর রূপকল্পে নির্মাণ করেছেন। কবির স্বকালের অন্ধকারকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি কর্ডোভা আর গ্রানাডার বিপর্যস্ত বাস্তবতার শরণ নেন। নিজের প্রিয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণে আত্মত্যাগের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন ওমর খৈয়ামের কবিতার বোখারা আর সমরখনদ্‌কে। কুষ্টিয়ার লালন শাহের কথা এবং তাঁর গানের অচিন পাখির খাঁচায় আসা-যাওয়ার মতো সাহিত্যিক অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে তাকে প্রতীকী তাৎপর্য দান করেন। গৌতমবুদ্ধের অহিংস জীবনের কথা উল্লেখ করে কবি তাঁর স্বকালের হিংস্র রাজনৈতিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান। খু-ফুর সাম্রাজ্য কিংবা বেবিলনের মতো ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করে 'ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্ধকার নগ্নতা এবং ঘৃণা'র ভয়াবহতা চিত্রিত করেন, কখনো বা সমবেত কণ্ঠে স্বকালের বিনষ্টির প্রতিবাদ করেন কবি। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. পঁচিশ বছর ধ'রে সেই গ্রাম ঢেকে গেছে স্টবিরাই নগরীর মত। ('একটি ঐতিহাসিক কাহিনী'/*রাত্রিশেষ*)

খ. এখন কর্ডোভা আর গ্রানাডায় অন্ধকার নামে। ('পারাপার'/*ছায়া হরিণ*)

গ. আর তোমার ঐ চাঁদকপোলে
একটি কালো তিলের জন্যে
বোখারা আর সমরখনদ্‌কে
বিলিয়ে দেবার দুঃসাহসও
করব না আর। ('তোমার জন্যে'/*সারা দুপুর*)

ঘ. মনে হয় লালনের অচিন পাখির পালকি
বাতি জ্বেলে নিয়ে
কুষ্টিয়ায় ফিরে যায় খাঁচার সন্ধানে। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

ঙ. কেন না গৃহের দ্বারে অহিংস বৌদ্ধের তরবারি
মৃত্তিকার পিপাসায় জ্বলে! ('হে বাঁশরী অসি হও'/*রাত্রিশেষ*)

চ. খু-ফুর সাম্রাজ্যে আর
বেবিলনে জ্বেলে দিয়ে উৎসব নগরী, আমি
ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্ধকার নগ্নতা এবং ঘৃণা
এই সব নিয়ে
অবিশ্রান্ত হাঁটছি ('যতবার ভোর হলো'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

ছ. বেবিলেনের শূন্যোদ্যান ছুঁড়ে ফেলে মুক্তকাঁধ
এসো আমরা বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড়াই
এসো সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করি– না! ('উৎসবের আগের দিন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীব প্রতীকের মাধ্যমে স্বকালের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রতীক কাব্যদেহে যেমন লাবণ্য সঞ্চার করেছে, তেমনি কবিতার ভাষা লাভ করেছে অসাধারণ গতি ও দীপ্তি। আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক তাঁর কবিতাকে সংহতি দিয়েছে এবং কবির বক্তব্যকে করে তুলেছে দূরসঞ্চারী।

পুরাণ

প্রতিভাবান ব্যক্তিচৈতন্যে স্বকালের সঙ্গে সেকালের মেলবন্ধন রচিত হলেই তা অনাগতকালের পাঠকের প্রত্যাশাকে পল্লবিত করতে পারে। জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে শিল্পের অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনেই একজন শিল্পস্রষ্টাকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শরণ নিতে হয়। শিল্পসাহিত্যে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মূর্ত হলেও তাতে অনিবার্যভাবেই কালের চিহ্ন মুদ্রিত থাকে এবং কালচেতনা কবিপ্রতিভার একটি সাধারণ লক্ষণ হিসেবেই বিবেচনার দাবি রাখে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন, '...সময়-রূপ চতুর্থ আয়তনের মার্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যত ক্ষণ মিলতে না পারছে, তত ক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেই জন্যে প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।' (১৯৯৫ : ২০)। পৌরাণিক প্রসঙ্গে অবগাহন সেই অর্থে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনারই শিল্পিত প্রয়াস, যা সৃজনশীল ব্যক্তিমানসে সঞ্চার করে ভবিষ্যতকে স্পর্শ করার স্বপ্ন ও শক্তি । কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ সেই অর্থে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে প্রগাঢ় বন্ধন আবদ্ধ করে। মাহবুব সাদিক যথার্থই বলেছেন, 'সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সামসময়িক জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ-অভিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রার সংযোজন ঘটায়। ব্যক্তি–অভিজ্ঞতা পুরাণ-অভিজ্ঞানের সংযোজন-সমন্বয়ে সাহিত্য পায় শাশ্বত কালমাত্রা।' (১৯৯১ : ৩৯৫)। কালোত্তীর্ণ কবিতায় পুরাণের উপস্থিতি অনিবার্য না হলেও পৌরাণিক অনুষঙ্গের চিরন্তন অভিব্যক্তি কবির স্বকালকে স্বীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'পূরণ শব্দটি সম্ভবত পুরাণ শব্দের মৌলসূত্র সন্ধানে আমাদের সাহায্য করে। যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে।' (১৯৯১ : ৫০১)। কবিতায় পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা পুরাতনের সঙ্গে নতুনের ব্যবধান হ্রাস করার ক্ষেত্রেই কেবল অবদান রাখে না, তা কবির সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কেও দান করে নতুন মাত্রা। 'আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বন্ধন প্রগাঢ় হলেই সামনে এগিয়ে যাওয়া তাঁর জন্য সহজ হয়। তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবেন না, সবার সঙ্গে রঙ মেলানোর এই পথযাত্রায় তিনি শেকড়ের সুদৃঢ়তায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই শেকড়-ভাবনাই একজন সাহিত্যিককে পুরাণ অন্বেষায় অনুপ্রাণিত করে।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১৮১)। কবিতায় পুরাণের উপস্থিতি থেকে একজন কবির প্রকরণ-প্রবণতা চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা গেলেও পৌরাণিক আবহে তাঁর জীবনবীক্ষার ব্যাকরণটিও মুদ্রিত হতে পারে। কবিতায় পুরাণের ব্যবহার বিষয়ে শিল্পসমালোচকবৃন্দের বিবেচনা ও বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাক :

ক. পুরাণকথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ : ৩২)

খ. মিথ-পুরাণের প্রতি জগতের কবি-সাহিত্যিকদের আকর্ষণের প্রাথমিক কারণটি অবশ্য খুবই সহজবোধ্য। মিথ-পুরাণের কাহিনী যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকরা পরিবর্তিত এবং তাঁদের যুগ-চেতনায় বিবর্তিতভাবে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেন। যথার্থ মিথ-পুরাণের কাহিনীর অবিকল রূপ নিশ্চয়ই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় না,– তা পেতে

গেলে একজন পাঠককে ঐ জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় না নিয়ে, প্রাচীন সেই সব কথা-কাহিনীরই আশ্রয় নিতে হয়।... আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক, আধুনিক যন্ত্রযুগে অবিশ্বাস্য; অথচ আবহমান কাল ধরে মানব চেতনায় বদ্ধমূল ঐ মিথ-পুরাণের কাহিনীর আশ্রয়ে তার রসধারাকে তথ্য থেকে নিষ্কাশন ক'রে নিয়ে,– আধুনিক একজন কবি ও সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব কালের কাহিনীকে একটি দেশ-কালাতীত বিশ্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে চান,...স্বরচিত কাহিনীর আশ্রয়ে যে কাজ তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিলো না। (কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০ : ১-২)

গ. ...নিখিলব্যাপী পুরাণ-চেতনার গোপনতম কেন্দ্রে বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ শ্যামল পুরাবৃত্তই সক্রিয় হয়েছে। যখন প্রতীচী থেকে কোনো স্রোত আসে নি, তখন বাংলাদেশ ভারতপুরাণকে স্বকীয় অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবহার করেছিল।...আধুনিক কবির চেতনায় সমস্ত ভুবনপ্রদক্ষিণ একটি সাংকেতিক প্রতিশ্রুতি : জননী দুর্গার চারদিকে ঘুরে এসেই গজানন বিনায়কের চরিতার্থ বিশ্ববীক্ষণের মতো। এবং এই দেশের মাতা অথবা মাটিতেই বিশ্বময়ীর প্রসারিত আঁচল দেখতে অভ্যস্ত কবিরা ক্রমশ ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক পুরাণকে অনায়াসেই নিসর্গধর্মী দেশাত্মবোধে রূপান্তরিত করলেন। এ প্রক্রিয়াটি অনিঃশেষ বৈচিত্র্যে গতিশীল। (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২০১১ : ২৯৯-৩০০)

ঘ. In using the myth, in manipulating a continuous parallel between contemporaraneity and antiquity, Mr. joyce is persuing a method which others must persue after him. ... It is simply a way vof controlling, of ordering, of giving a shape and a significance to the immense panoroma of fitility and anarchy which is cotemporary history... Instead of narrative method, we may now use the mythical method, It is, I seriously beleive, a step toward making the modern world possible for art. (T. S. Eliot 1971 : 26)

ঙ. This consideration of the role of myth in great poetry of the past may throw some light upon the predicament of the poet and the unpromising estate of poetry in our non-mythological present. The poet of today--and by that I mean the poetic impetus in all of us today--is profoundly inhibited by the dearth of shared consequences of myth. (Philip Wheelwright 1976 : 265-266)

আহসান হাবীবের কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বকালের বৈরী বাস্তবতাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। প্রাচীন মিথকলার আশ্রয়ে বিপর্যস্ত বর্তমানকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। হাবীবের কবিতায় মিথকাহিনীর অবিকল উপস্থিতি অনুপস্থিত। পুরাণ-প্রসঙ্গের রূপান্তরের ফলে তাঁর কবিতা কাল–অতিক্রমী শিল্পের অবয়ব পেয়েছে। পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সীমারেখা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এমনকি পশ্চিম-এশীয় বা ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিও আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের ব্যক্তিত্বখচিত স্রষ্টারা যেমন তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে, তেমনি শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দের কালজয়ী সৃষ্টি থেকে অনেক মহৎ চরিত্রকেও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

প্রাচ্য-পুরাণ ব্যবহারে আহসান হাবীবের আগ্রহ ও সাফল্য চোখে পড়ার মতো। স্বকালের সমস্যা ও সংকটকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের জগতে ফিরে গেছেন। আবার সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ-নির্দেশের প্রয়োজনেও তিনি পৌরাণিক চরিত্রের শরণ নিয়েছেন। 'যাকে বলে বাস্তবিকতার আধার, তার মধ্যেও মিথিক জীবনরহস্য বা রোমান্টিক-চিত্তবৃত্তি কাজ করতে পারে। আবার যাকে বলা চলে অসম্ভবের কল্পনাবিলাস, অলৌকিকের রাজ্য, সেই মিথের জগতে এবং রোমান্টিক মননে থাকতে পারে চরম এমন কি নিষ্ঠুর বাস্তবিকতার প্রতিচ্ছবি... ।'– কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৮০ : ৫) এই বিবেচনা আহসান হাবীবের পুরাণ-আশ্রয়ী কবিতার মর্মার্থ অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে বলে আমরা মনে করি। তাঁর কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পুরাণ–আশ্রয়ী প্রতীকের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই পৌরাণিক অনুষঙ্গের উৎস অনুসন্ধানে না গিয়ে আমরা কেবল প্রাচ্য-পুরাণ নির্ভর কয়েকটি কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

ক. ঊর্ধ্বে আকাশ ম্লান মেঘের
নিম্নে অতল বন্যা এর–
বাস করে শত চানক্যশিশু শকুনির বহু বংশধর
এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না এখানে বেঁধো না বিরাম ঘর। (‘আজকের কবিতা’/*রাত্রিশেষ*)

খ. কেন না গৃহের দ্বারে অহিংস বৌদ্ধের তরবারী
মৃত্তিকার পিপাসায় জ্বলে! (‘হে বাঁশরী অসি হও’/*রাত্রিশেষ*)

গ. আকাশে উধাও বাহু ফিরেছে এবার,
এবার মাটির বাসা জানায়েছে তার
নির্মম মমতা–
ত্রিশঙ্কু মনেরে হেনে শঙ্কাহীন করেছে ক্ষমতা। (‘স্বাক্ষর’/*রাত্রিশেষ*)

ঘ. বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি (‘নজরুলকে মনে করে’/*সারা দুপুর*)

ঙ. নদী এবং নৌকোর গান গাইতে গাইতে
রুক্মিণী যখন ঘাটে নামলো
ঠিক সেই সময়ে রাজা এলেন, (‘রাত নয় দিন নয়’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

চ. টানটান ধনুকের ছিলার মতন টান চরাচরে
অলক্ষ্যে টঙ্কান :
চতুর্দিকে কারা ডাকে : অর্জুন! অর্জুন!! (‘টান’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

পশ্চিম এশীয় পুরাণের ব্যবহার আহসান হাবীবের কবিতায় খুব বেশি নয়। তিনি পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের স্বর্গচ্যুত হওয়ার কারণ হিসেবে গন্দম ফলের প্রসঙ্গ কবিতায় তুলে ধরেছেন। নূহের প্লাবনে ভেসে যাওয়া এক বিচলিত মানব-সন্তান হিসেবে নিজের বিপর্যস্ত বর্তমানকে কবতায় তুলে ধরেছেন কবি। নূহের প্লাবন হাবীবের কবিতাকে বারবার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যা কবির স্বকালের অস্থিরতারই দ্যোতক হয়ে উঠেছে :

ক. মনে পড়ে সেই মহৎ ভ্রান্তি গন্দম দানা; (‘একটি মহৎ কবিতার খসড়া’/*ছায়া হরিণ*)

খ. মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব-সন্তান
নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি (‘তারা দু’জন’/*সারা দুপুর*)

গ. দেখো তার চারপাশে প্লাবন
তার ক্লান্ত ঠোঁটে নূহের জাহাজ। (‘বালক এবং পাখি’/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীব প্রতীচ্য পুরাণ ব্যবহারেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভার্জিন মেরী ও মোনালিসা তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে দূরসঞ্চারী করে তোলে। সেইসঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুলের তুলির শরণ নিয়ে তিনি নিজের বিবেচনাকে কালোত্তীর্ণ অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রবল ধনলিপ্সু মিডাস এবং তাঁর বরদাতা বাককাসকে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটপ্রেক্ষায় স্থাপন করে ধনিক-সভ্যতার ভয়াবহতাকে তুলে ধরতে চান। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আসীসীয় মহাকাব্য ‘গিলগামেশ’-এর সাহায্যে কবি তাঁর চৈতন্যের শিল্পরূপ দিয়েছেন। গিলগামেশের মাধ্যমে কবি মৃত্যুহীন প্রাণের আবহ রচনা করেছেন। গিলগামেশের প্রেমে পড়েছিল দেবী ইশতার। কিন্তু গিলগামেশ এই নিবেদনে সাড়া না দেওয়ায় দেবী তাকে অভিশাপ দেয়। ইশতার ব্যাবিলনীয় ও ফিনিসীয় পুরাণে প্রেম ও যুদ্ধের দেবী হিসেবে স্বীকৃত। স্পার্টার অধিপতি আইকেরিয়াসের কন্যা এবং গ্রীকবীর অডিসিউসের পত্নী পেনিলোপী উদ্ভ্রান্ত মানুষের নির্মম পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসে অবিচল পেনিলোপীর উপস্থিতি কবির ইতিবাচক জীবন-প্রত্যয়েরও প্রতিভূ হয়ে ওঠে। মহাকবি হোমারের *ওডেসি* পাঠের অভিজ্ঞতাকেও আহসান হাবীব কাব্যনির্মাণকলায় কাজে লাগিয়েছেন। অডিসিউসের জন্য পেনিলোপীর প্রতীক্ষা স্বাধীন স্বদেশের জন্য পথ চেয়ে থাকা কবির মনোলোকের দ্যোতক হিসেবে অসাধারণ। এভাবেই আহসান হাবীব প্রতীচ্য পুরাণের অন্তর্গত শক্তি ও সৌন্দর্যকে আত্মপ্রকাশের সহায়ক হিসেবে কবিতায় ধারণ করেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক :

ক. দেয়ালে ভার্জিন মেরী, মোনালিসা
তারি মাঝখানে
তোমার কোমল দীপ্তি জয়নুলের তুলিতে অমর। (‘সম্রাট’/*ছায়া হরিণ*)

খ. কেটেছে কৈশোর
কৈশোরের আরাধনা কখন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষ কবে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস্-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস্ আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিন রাত্রি। (‘প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা’/*সারা দুপুর*)

গ. টলটলে অমন সুন্দর চোখ
আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি
জানি, কেন তোমরা সুন্দর চোখের মেয়েদের নাম,
মীনাক্ষী রেখেছো। (‘জাল’/*সারা দুপুর*)

ঘ. তবুও মিনতি/মিডাসের কাহিনী ভুলো না। (‘দোহাই তোমার’/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. প্রাসাদ জলসাঘর সরোবর এইসব ছেড়ে
বিধ্বস্ত খামার আর মলিন ফুলের রেণু
পার হয়ে আমিও একজন গিলগামেশ। (‘গিলগামেশ কাহিনী’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

চ. সারারাত পাখির প্রতীক্ষা তার
চারপাশে উধাও বাতাস
সারারাত স্মৃতির ভেতরে থাকে ভাসমান মাস্তুল এবং
সারারাত বুকের ভেতরে ভেতরে তবু, স্মৃতির ভেতরে
পেনোলোপি, পেনোলোপি, ইথাকা ইথাকা! (‘গন্তব্য ইথাকা’/*দু’হাতে দুই আদিম পাথর*)

ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ

ইতিহাস-প্রসঙ্গ আহসান হাবীবের কবিতায় নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত। নবাব সিরাজউদৌলার ঘাতক মীরণের তলোয়ার এখনো কবির চোখে ভেসে ওঠে। মীরণের উপস্থিতি ঘাতক-সময়ের বিপন্ন মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার সেকান্দার শাহের ঐশ্বর্যের কথার আড়ালে বাঙালির সমৃদ্ধ অতীতের ছবি ভেসে ওঠে। কর্ডোভা কিংবা গ্রানাডার অন্ধকারে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর প্রতিকূল বাস্তবতা চিত্রিত হতে দেখি। কবি অতীত-অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই ভয়াবহ বর্তমানের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি বারবার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চেয়েছেন। নিচের দৃষ্টান্তগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. ঘুম নেই নয়নে আমার,
এখনো নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার! (‘সেতু-শতক’/*রাত্রিশেষ*)

খ. আতশী নজর দেখে কেঁপেছে বেইমান,
সেকান্দার শা’র মত ছিল মোর শান। (‘ছহি জঙ্গেনামা’/*ছায়া হরিণ*)

গ. এখনো কর্ডোভা আর গ্রানাডায় অন্ধকার নামে! (‘পারাপার’/*ছায়া হরিণ*)

সাহিত্যিক-অনুষঙ্গ

আহসান হাবীবের কবিতায় সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। কখনো তিনি বিশেষ কোন সৃষ্টিকর্মের শরণ নিয়েছেন, কখনো-বা শিল্পী বা সাহিত্যিকের বিশেষ কোন প্রবণতার আলোকে ব্যক্তিগত বিবেচনাকে জোরালো করে তুলেছেন। সৃষ্টিশীল রচনার কোন কোন চরিত্রও আহসান হাবীবের ভাব প্রকাশে সহায়তা করেছে। কেবল বাঙালি সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যকর্মের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন নি কবি, বিশ্বসাহিত্যের একজন নিবিড় পাঠক হিসেবে তিনি

তাঁর পাঠাভিজ্ঞতাকে নিজের সৃজনবিশ্বের অনিবার্য অংশ করে তুলেছেন। তিনি *ছয়ফুলমুলক* আর *বদিউজ্জামাল* পাঠের কৈশোরকে ফিরে পেতে চান, *আলিফ-লায়লা* রাতের কাহিনির সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন এবং আবু হোসেনের আক্ষেপকে নিজের ব্যর্থতার অংশ করে তোলেন। তিনি *রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* পাঠের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের প্রেমচেতনার বৈসাদৃশ্য কিংবা বৈপরীত্ব চিত্রিত করেন। গগাঁ কিংবা ভ্যানগগের মহৎ সৃষ্টির কথা স্মরণ করেন তিনি, মরমী কবি লালনের গানের সঙ্গেও নিজের যোগসূত্রতা আবিষ্কার করতে চান। হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথের শরণ নিয়েই ক্ষান্ত হন নি কবি, তাঁর সৃষ্টিকর্মের চরিত্রসমূহকেও তিনি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. বিরাট জামাতে এসে দেখা দিয়ে যেত
'ছয়ফুলমুলুক' আর 'বদিউজ্জামাল'
বহু রাতে! ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)

খ. মনে পড়ে সেই আলিফ-লায়লা রাতের কাহিনী ('একটি মহৎ কবিতার শসড়া'/*ছায়া হরিণ*)

গ. হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে
অথবা তোমাকে
আলিফ্‌লায়লার কোনো কল্পিত চরিত্র ভেবে;
হায় আবু হোসেন... ('তোমাকে মৃত জেনে'/*সারা দুপুর*)

ঘ. একটি কালো তিলের জন্যে
বোখারা আর সমরখনদ্‌কে
বিলিয়ে দেবার দুঃসাহসও
করব না আর। ('তোমার জন্যে'/*সারা দুপুর*)

ঙ. গগাঁ কিংবা ভ্যানগগের
কোনো মূর্ত বিষাদ আমাকে সঙ্গ দেয় ('শিল্প-মানবিক'/*আশায় বসতি*)

চ. মনে হয় লালনের অচিন পাখির পালকি
বাতি জ্বেলে নিয়ে
কুষ্টিয়ায় ফিরে যায় খাঁচার সন্ধানে। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

ছ. হিমেনেথের গাধাটাকে জিজ্ঞেস করো :
চাঁদে ঝাঁপ দেবার কৌশল কী? ('হিমেনেথের গাধা'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীব পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে কখনো স্বকালের বিরূপ বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছেন, কখনো শিল্পীর মৃত্যুহীন জীবনের মহিমা কীর্তন করেছেন। আবার অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বর্তমানকে নির্মাণ করে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়কে রূপ দিতেও পৌরাণিক আবহের শরণ নিয়েছেন কবি। আহসান হাবীবের পুরাণ-ভাবনা, ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ এবং সাহিত্যিক উপাদান আশ্রয়ী কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষরও স্পষ্ট।

ছন্দ

কবিতার সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্কেরই অনুরূপ। কবিতায় আমরা ধ্বনি ও শব্দের বহুমাত্রিক সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ করি। কবিকল্পনা নিয়মে বাঁধা না পড়লে তাতে কবির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং তা পাঠকের চৈতন্যেও বিশেষ কোন প্রণোদনা সৃষ্টি করে না। কবিতার ছন্দ বলতে কেবল ধ্বনি ও শব্দের মিল বোঝায় না, তা ভাবের সঙ্গে শব্দের সুদৃঢ় বন্ধনেরও দ্যোতক। তাই কবিতার পাঠ অন্য সাহিত্যকর্মের মতো নয়, তাতে দৃশ্যমান ছন্দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পাঠকের পঠনকৌশলের মধ্যেই আমরা একটি ছন্দের আলোড়ন বা আন্দোলন টের পাই। কোন প্রতিভাবান গদ্যশিল্পীর রচনায় যখন এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়, তখন তাঁর গদ্য কাব্যিক অভিধা লাভ করে। তবে গদ্যে কাব্যিক অবয়বের অধিকতর উপস্থিতি পাঠকের বিরক্তির কারণ হওয়াও অসম্ভব নয়। একজন

শিল্পস্রষ্টার মননচৈতন্যের নির্যাস যখন কবিতায় বাঁধা পড়ে, তখন সেই বন্ধন থেকে উৎসারিত হয় মুক্তির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন :

> আমরা ভাষায় বলে থাকি কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। (১৯৭৬ : ৫০)

শব্দকে গতিশীল করতে ছন্দের অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তির কথা বলেছেন, তা আমাদেরকে শব্দের গতিশীলতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যে কোন সার্থক কবিতায়ই আমরা ছন্দের উপস্থিতি টের পাই। সফল কবিতা পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে লেখকের অভিপ্রায়ের মেলবন্ধন রচনা করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম।' (১৯৮৪ : ৪৭)। এই মেলানোর কাজকে মানুষের অনুভূতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতেই কবিকে ছন্দের শরণ নিতে হয়। 'ছন্দ সেই আলোকবর্তিকা যার স্পর্শে কবির সুসংযত ও সুপরিমিত শব্দসজ্জা কোমল, পেলব ও বেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, জড়তা-নিষ্প্রাণতা-নিষ্প্রভতা অতিক্রম করে শব্দ লাভ করে অপরূপ দীপ্তি ও ধ্বনিমাধুর্য।' (তারেক রেজা ২০১২ : ২১৩)। মনে রাখা প্রয়োজন, ছন্দের আবেদন আমাদের চোখের কাছে নয়, কানের সঙ্গেই তার যাবতীয় লেনদেন। একজন কবির ছন্দের কান নিখুঁত না হলে তিনি পাঠকের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে পারেন না। তাই কবিতার প্রকরণ অনুধাবনে ছন্দের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কবিতায় ছন্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে আমরা আরো কয়েকজন শিল্পসমালোচকের মন্তব্যের শরণ নিতে চাই :

ক. ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব – ছাড়া, বাঁধা, আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাঁদ, চাঁদোয়া। ছেঁড়ে বাঁধি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেঁড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের – ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য আনন্দ – কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।

ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার। (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ৪৬–৪৭)

খ. কাব্যভাষা আলাদা হয়ে যায় তার বিষয়ের জন্যে যেমন, তেম্নি তার শব্দব্যবহারের জন্যে, ছন্দের জন্যে। তখনই কাব্যভাষা– যখন আমাদের প্রতিদিনের নিস্তরঙ্গ সমতলের মধ্যেই একটি স্বাতন্ত্র্যের চূড়া জাগে, অনুভূতিতে লাগে কোনো বিশেষ রঙ বা রঙের সমবায়, অভিজ্ঞতার জমিতে পড়ে একটি বিশেষ রেখা বা রেখা মালা। কাব্যভাষা তখন গদ্যভাষা থেকে আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায় কনটেন্ট বা বিষয়ের জন্যে, আর তার ফর্ম বা রূপপ্রকল্পের জন্যেও। কবিতার রূপপ্রকল্পের এক প্রধান হাতিয়ার ছন্দ। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০১ : ৩-৪)

গ. ছন্দই কাব্যের প্রাণ; কাব্য-কবিতায় সুনিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত 'বেগবিকশিত ভঙ্গি'-ই হলো ছন্দ। ছন্দ নির্মাণকে একদিক থেকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে। শব্দকে কেন্দ্র করে কাব্য-কবিতার কারবার হলেও শব্দ ধ্বনিসমবায়ে গঠিত এবং ধ্বনিই হলো ছন্দের কেন্দ্রীয় উপাদান। ধ্বনি যদি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হয় তবে তাকে ছন্দরূপে অভিহিত করা হয়। পার্বতী-পরমেশ্বর যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তেমনি ছন্দও কবিতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বলা চলে ছন্দ ও কবিতা একাত্ম। (ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৩ : ১১)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে কবিতায় ছন্দের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সম্ভব। ছন্দের উপস্থিতি কবিতার ভাবকে ভারমুক্ত করে। আহসান হাবীব বাংলা কবিতার প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ছন্দের কাঠামোতেই কাব্যচর্চা করেছেন। ছন্দ-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন নি তিনি, কিন্তু প্রচল ছন্দের শরীরে তাঁর শব্দাবলি যে শিহরন সঞ্চার করেছে, তা থেকে অনায়াসে আহসান হাবীবের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যায়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

আহসান হাবীবের কবিতার প্রধান ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। বাংলা কবিতার প্রাচীন ছন্দ হিসেবে স্বরবৃত্তের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রমী আচরণ থেকে উদ্ভূত অক্ষরবৃত্তই এক সময় বাংলা কবিতার প্রতিনিধি-স্থানীয় ছন্দে পরিণত হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত বাংলার নিজস্ব ছন্দ হিসেবে স্বীকৃত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনিকে সাধারণত সংশ্লিষ্ট করে একমাত্রার মূল্য দেওয়া হয় এবং শব্দ প্রান্তস্থ ও স্বতন্ত্র যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দুইমাত্রার ধরা হয়। এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ থাকায় অধিকাংশ কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তাঁদের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আহসান হাবীবও এর ব্যতিক্রম নন। তিনিও এই ছন্দের পর্ব-বিন্যাসে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করেছেন। তাই ৮ ও ৬-এর প্রতিনিধিত্বশীল পর্ব-সজ্জাকে তিনি কখনো কখনো নিজের ইচ্ছে বা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর কবিতায় অসমপংক্তিক এবং মুক্তক অক্ষরবৃত্তও অনুপস্থিত নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. প্রত্যয়ের দিন নাই | প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ বিক্ষত ৮.১০
আশা ও আশ্বাস নাই, | প্রেম হেথা স্বভাব বণিক; ৮.১০
নির্মাংশ অস্থির পাশে | ভীড় করি কুকুরের মত, ৮.১০
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা | জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক ৮.১০
('দীপান্তর'/*রাত্রিশেষ*)

খ. কোথায় লড়াই হয় | রাজায় রাজায় ৮.৬
আশা ধানের মরাই মোর | খালি হয়ে যায়, ৮.৬
খালি হয়ে গেল মোর | চালভরা জালা ৮.৬
বন্ধক পড়েছে কবে | বাটি আর থালা ৮.৬
('ছহি জঙ্গেনামা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. উত্তরে যুবক বলে | তেমন কঠিন কিছু নয় ৮.১০
প্রথম প্রথম বটে | আমিও পেয়েছি কিছু ভয় ৮.১০
('উনিশ কি বিশ'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঘ. এ নামে তোমার চিত্ত | সাড়া দেয় বাসনার মতো ৮.১০
এ নামে তোমাকে দেখি | বসন্তের কবিতার মতো ৮.১০
('প্রেমের কবিতা'/*প্রেমের কবিতা*)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই আহসান হাবীব অধিকতর স্বচ্ছন্দে কাব্যচর্চা করেছেন। এই ছন্দের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ থাকায় নিজেকে প্রকাশের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তে নির্ভর করেছেন তিনি। তাঁর পর্ববিন্যাস-প্রক্রিয়ায়ও এই ছন্দের প্রচল রূপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কবি ৮.৬ এবং ৮.১০ মাত্রায় পর্ব সাজিয়েছেন– এমন কবিতার সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ার মতো। অক্ষরবৃত্তে আহসান হাবীবের অধিকার তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর সমবায়ে শিল্পসফল কবিতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

গদ্যছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই গদ্যছন্দ প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের হাতে গদ্যছন্দ আরো সক্রিয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করে। গদ্যছন্দে নির্মিত কবিতায় দৃশ্যমান ছন্দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পরিণত পাঠকের কানে এই ছন্দের আবেদন উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা ছন্দের নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে গদ্যছন্দে প্রতিপত্তি অর্জন অসম্ভব। মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে যতিনিয়ন্ত্রিত পয়ারের সীমানা অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্যেই বোধকরি গদ্যছন্দের জন্মরহস্য সুপ্ত ছিল যা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে প্রকাশ লাভ করে। আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন, 'গদ্য ও কবিতার মধ্যে প্রথম সেতু বেঁধেছিলেন মাইকেল।' (২০০১ : ৩৯)। গদ্য ও পদ্যের বিরোধ দূর করার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অভিপ্রায়কে মূল্য দিয়েছেন তিনি, যদিও গদ্যছন্দে কবিতা লেখায় আগ্রহ দেখান নি সুধীন্দ্রনাথ। পর্ব ও মাত্রার নিয়ন্ত্রণ থেকে কবিতাকে মুক্তি দিয়ে আবেগশাসিত পঙ্‌ক্তি রচনার মাধ্যমে বাংলা কবিতায় যে

সমৃদ্ধি এসেছে, তা অনেকাংশে গদ্যছন্দের দান। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, 'গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের পতন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ, সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।' (১৪০২ : ২৩১)। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা বাংলা কবিতাকে মানুষের কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গির সমীপবর্তী করতে চেয়েছেন। তাই গদ্যছন্দের সম্ভাবনাকে বহুদূর বিস্তৃত করেছেন তাঁরা। 'ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠী আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার ও পদ্যের বাকভঙ্গির মিথষ্ক্রিয়া ঘটানোর প্রচেষ্টায় যেমন নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি গদ্যছন্দচর্চায়ও নিয়োজিত ছিলেন।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৪৩৭)। প্রচল ছন্দের রীতি ও রহস্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে কেবল গদ্যছন্দের দৃশ্যমান ছন্দহীনতার প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে প্রথিতযশা ছান্দসিকবৃন্দ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি :

ক. গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দ বোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৬ : ১৯৮)।

খ. গদ্য কবিতা মানে একটা আত্মমন্থনের বিন্যাস নয় – একটানা স্বগতোক্তির উল্লাস নয়, গদ্য কবিতার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যক্তি বিশ্বের সঙ্গে বস্তুবিশ্বের একটা মোকাবিলা তার মধ্যে হয় এবং গদ্য কবিতা এই দিক থেকে ভালো আরো হতে পারে আমার মনে হয় এই কারণে... আমি লক্ষ করেছি যে গদ্য কবিতার মধ্যে প্রাত্যহিক কথ্যবুলি অনায়াসে আনা যায়... আর আত্মঅতিক্রান্তি হয় তারি মধ্যে একটা ছন্দ আছে... । (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯৯১ : ১৬৫)।

গ. গদ্যছন্দ একেবারেই নিয়মিত ছন্দের বাইরের জিনিশ, 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' ছন্দে রচিত। এর প্রাণ ছন্দস্পন্দ, যে-ছন্দস্পন্দ আবার প্রত্যেক কবির ব্যক্তিগত ও নিজস্ব। কারো কারো বিশ্বাস নিয়মিত ছন্দ বর্জিত হয়ে গদ্যছন্দ ভাবনা ও প্রকাশকে দ্যায় এক অতিরিক্ত শক্তি। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০১ : ৩৫)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে গদ্যছন্দের অন্তর্নিহিত ছন্দস্পন্দের কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং এই ছন্দস্পন্দের নাগাল পাওয়ার কাজটি সহজ নয়– একথাও স্পষ্ট। ছন্দের দেয়াল ভাঙার চেষ্টায় কবির ব্যক্তিগত বাড়ির সীমানা-প্রাচীর উপড়ে ফেলার বিপদ অনেক। তাতে কবির নিজস্ব নির্মাণটিকে শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৃশ্যমান দেয়াল অস্বীকার করেও একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির ভেতরে-বাহিরে একটি সূক্ষ্ম ছন্দের দেয়াল তৈরি করে নেন, যার মাধ্যমে আমরা তাঁর শিল্পভুবনটিকে চিনে নিতে পারি।

আহসান হাবীবের গদ্যকবিতায় আমরা কথ্যভঙ্গির উপস্থিতি টের পেলেও তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠে এই উপলব্ধি অসম্ভব নয় যে, এই কথ্যভঙ্গির মধ্যেই তিনি চমৎকার এক ছন্দস্পন্দ নির্মাণ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ শব্দসজ্জায় ও পঙ্ক্তিবিন্যাসে তিনি নতুনত্ব আনার প্রয়াস পেয়েছেন যা কবিতা ও গদ্যের সীমানা নির্দেশে সহায়ক হয়েছে। তাঁর গদ্যছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা খুব কম নয়। সৈকত আসগর আহসান হাবীবের গদ্যছন্দে রচিত কবিতার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। প্রসঙ্গত তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

> 'রাত্রিশেষ'-এর 'অস্তপারের আকাশকে', 'হাসি', 'সারা দুপুর'-এর 'তোমাকে মৃত জেনে', 'নজরুলকে মনে করে', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো'-এর 'সমীপেষু', 'কড়ি গুনতে গুনতে', 'বর্ষাবিষয়ক কবিতা : কায়সুলকে', 'আমার যাওয়া হয় না', দু'হাতে দুই আদিম পাথর'-এর 'আবহমান', 'অপেক্ষা', 'ট্রেন', 'রাত নয় দিন নয়', 'অজানা অন্বিষ্ট', 'মরা ফুলের ফাঁস', 'সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে', 'নীল নক্সা', 'উৎসবের আগের দিন', 'এখন প্রত্যহ ভোরে', 'প্রেমের কবিতা'-র 'সেই পাখি সেই গান' প্রভৃতি কবিতায় তিনি গদ্যছন্দের ব্যবহার করেছেন। (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ৭৪)

গদ্যকবিতায় আহসান হাবীবের আগ্রহের কারণ তিনি কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই তিনি জীবনের গভীরতর সত্যকে শিল্পের অবয়ব দিতে চেয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক. ফারপোতে আমরা যাবো না।
খোদার দিন।
আজ নাছারা খানা খেতে নেই।
আমরা যাবো ছকু মিয়ার হোটেলে।
বালুসাই, ছমুচা, খেজুর,
যত তোমার খুশি খেয়ো।
ভাবনা নেই পয়সা আছে অনেক।
বাপ দিয়েছে ছ'আনা
দুই রাত বিড়ি বেঁধে পেয়েছি এক টাকা দু-আনা। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

খ. কোথাও পড়ে না চোখে ব্লাডব্যাঙ্ক, অথচ প্রত্যহ
রক্ত নাও রক্ত নাও বলে, দেখো সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়ায়
মানুষের রক্ত তবু অদৃশ্য সিরিঞ্জ বেয়ে যায়
চলে যায়, কোথায় উধাও হয়ে যায়! আর
রক্তশূন্য মানুষ কেমন দেখো বীরদর্পে ফিরে যায় ঘরে। ('চিত্রমালা'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বসমূহের প্রতিটি অক্ষরে ধ্বনির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তাই এই ছন্দকে কেউ কেউ ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলে থাকেন। এই ছন্দে সর্বাবস্থায়ই বদ্ধাক্ষর দুইমাত্রার এবং মুক্তাক্ষর এক মাত্রার মর্যাদা লাভ করে। এই ছন্দকে মধ্যগতির ছন্দও বলা হয়ে থাকে। আহসান হাবীব মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। কবিতাকে কথনকৌশলের নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ তাঁর কবিতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি, কারণ তিনি মাত্রাবৃত্তেও সফলভাবে চলতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. ঝরা পালকের | ভস্মস্তূপে | তবু বাঁধলাম | নীড় ৬.৬.৬.২
তবু বারবার | সবুজ পাতার | স্বপ্নেরা করে | ভীড়। ৬.৬.৬.২
('এই মন– এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*)

খ. হেথায় শ্যামল | ঘন অরণ্যে | সূর্যের অভি|শাপ, ৬.৬.৬.২
পুষ্পিত শাখে | জ্বলে নির্মম | জঠরের উত্ | তাপ। ৬.৬.৬.২
('দিনের সুর'/*রাত্রিশেষ*)

গ. এ কোন্ ব্যর্থ | দিনযাপনের | দুঃসহতার ৬.৬.৬
ইতিহাস আজ | লিখেছে এখানে; | এ অন্ধকার ৬.৬.৬
কখন তোমার | চোখের সে আলো | করেছে হরণ! ৬.৬.৬
কোন্ পাপে বলো | এ নির্বাচন | করেছো বরণ। ৬.৬.৬
('একটি মহৎ কবিতার খসড়া'/*ছায়া হরিণ*)

ঘ. যত দূরে যাই | তুমি অপার ৬.৫
তোমাকে দেখার | অন্ত নাই ৬.৫
ভোরের নদীর | নীল বিথার ৬.৫
নদী নিরবধি | আজকে তাই। ৬.৫
('যত দূরে যাই'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. তোমার দু'হাতে | ফুল তুলে দেবো | এই ছিলো সাধ ৬.৬.৬
হাতে হাত রেখে | আংটি পরাবো; | এই ছিলো সাধ ৬.৬.৬
তুমি শুধু বলো, | ফুল নয়, চাই | ভাত দাও ভাত। ৬.৬.৬
আঙটিও নয়, | ভাতে ভরে দাও | আমার দু'হাত। ৬.৬.৬
('প্রিয়তমাসু'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

স্বরবৃত্ত ছন্দ

স্বরবৃত্ত বাংলা ভাষার আদিমতম ছন্দ হিসেবে স্বীকৃত। দ্রুত লয়ে পাঠযোগ্য এই ছন্দের ছড়া শুনতে শুনতেই আমাদের শিশুরা ঘুমায় এবং বেড়ে ওঠে। বলা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দের ছড়া-কবিতা শুনেই আমাদের শিশুদের ছন্দের কান তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কেও উচ্চাশা পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্যের প্রথম পর্বে খেয়ালের বশে নয়, প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে ছন্দ যা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ হিসেবে স্বীকৃত। সভ্যতার বিকাশে চাকার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি ভাষার বিকাশেও ছন্দের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা-বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে ভাষার দেনা পাওনা। (১৯৭৬ : ১৮৩)

আহসান হাবীবের স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে তাঁর দখল কয়েকটি কবিতা থেকেই অনুধাবন করা যায়। স্বরবৃত্ত বাংলার আদি ছন্দ যা ছড়ার ছন্দ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী অনেক কবির চেষ্টায় স্বরবৃত্ত ছড়ার সীমানা অতিক্রম করে গভীরতর ভাব-আশ্রয়ী কবিতার ছন্দের মর্যাদা লাভ করেছে। আহসান হাবীবের স্বরবৃত্তের কবিতাবলি পাঠ করলে আমরা লক্ষ করব, তিনিও জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকেই স্বরবৃত্ত ছন্দে গেঁথে দিয়েছেন, যা শিল্পসফল কবিতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. যতই বলি| জীবন তোমায় | বড়ই ভালো | বাসি, ৪.৪.৪.২
মিলেমিশে | এসো দু'জন | থাকবো পাশা | পাশি– ৪.৪.৪.২
জীবন কেন | মারখাওয়া এক | বোবা পশুর | মত ৪.৪.৪.২
ছুটে পালায় | অনেক দূরে | যতই বলি | তত! ৪.৪.৪.২
('দ্বৈত'/*ছায়া হরিণ*)

খ. আমি তখন | রই বা না রই ৪.৪
তুমি তখন ৪
মুক্ত দিনের | আলোর রাজ্যে | রাণী হ'য়ো ৪.৪.৪
('তোমার জন্যে'/*সারা দুপুর*)

গ. সেই আগেকার | চেনা গলায় | ডাকতে পারো | নাকি ৪.৪.৪.২
বলতে পারো | না কি ওকে ৪.৪
যেমন ছিলাম | হাজার বছর | আগে ৪.৪.২
এসো দু'জন | একই সঙ্গে | থাকি। ৪.৪.২
('ওকে ডাকো'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঘ. যতই বলি | আমার আমার ৪.৪
যতই চাই | ভেতর দিকে | এগিয়ে যেতে ৪.৪.৪
'হে'ইও' ব'লে ৪
দেয় ঠেলে দেয় ৪
বাইরে ঠেলে। ৪
('আমার আমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঙ. শব্দাবলি | এখন আমার ৪.৪
খোলা তোরণ ৪
খেলার উঠোন। ৪
('এখন আমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

মিশ্র ছন্দ

আহসান হাবীব একই কবিতায় একাধিক ছন্দের মিশেল ঘটিয়ে কবিতা রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ছন্দের এই চরিত্র ছান্দসিকদের বিবেচনায় মিশ্র ছন্দ হিসেবে পরিচিত। মিশ্র ছন্দ প্রয়োগের মাধ্যমে একজন কবি একই কবিতায় ভাব অনুযায়ী ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে কবিতার বক্তব্যকে আরো প্রবল ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। আহসান হাবীব বেশ কিছু কবিতায় মিশ্র ছন্দে উপলব্ধিকে অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক.	যে আকাশ ছিলো| হাতের মুঠোয় | জড়ানো	৬.৬.৩
	সে আকাশে জাগে| ভয়	৬.২
	মৌমাছি ডানা |ঘুম দিয়ে দিন |গড়ানো	৬.৬.৩
	সেদিন এখন |নয়...	৬.২ (মাত্রাবৃত্ত)
	অনেক মানুষ ছিলো | মরেছে অনেক	৮.৬
	সেই সাথে মরে গেছে | তারো চেয়ে বেশি–	৮.৬
	শতাব্দীর গড়ে ওঠা | এইসব গ্রাম	৮.৬ (অক্ষরবৃত্ত)
		(‘একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ’/*রাত্রিশেষ*)
ক.	অস্থিরতাকে | নিজেই করেছি |সঙ্গী	৬.৬.৩
	প্রত্যহ তবু | নালিশে নতুন | ভঙ্গি...	৬.৬.৩ (মাত্রাবৃত্ত)
	কোথায় শুরু | কোথায় শেষ | কি বা পুরস্ | কার।	৪.৪.৪.১
	জানতে যদি | চাও সে বলে, | ধার ধারি না | তার।	৪.৪.৪.১ (স্বরবৃত্ত)
		(‘দু’টি মানুষ একটি ঘোড়া’/*আশায় বসতি*)
ক.	তবুও তোমার| মনের কোণায় |হে মনোরমা	৬.৬.৫
	নীল আকাশের | রামধনু রঙ | হয়েছে জমা	৬.৬.৫
	কত সারঙের | কত সুর যেন | তোমার মনে–	৬.৬.৫
	আকাশ কাঁপায় | বাতাসে ঝাঁপায় | সঙ্গোপনে...	৬.৬.৫ (মাত্রাবৃত্ত)
	আমি যে তোমায় ভালো | বাসতাম সে কথা কি | তুমি জানতে,	৮.৮.৫
	শপথ করেও বলে| ছি তবু তো মানতে না। ...	৮.৮ (অক্ষরবৃত্ত)
	তুমি বললে, জানতাম।	
	কিন্তু তারো আগে রাজপুরীর সিংহদ্বার ভেঙেছে	
	সাতবর্ণের ঝালর উড়িয়ে আসছে আর এক রাজকুমার	(গদ্যছন্দ)
		(‘নীল খাম’/*প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের আরো কিছু কবিতায় আমরা মিশ্রছন্দের ব্যবহার লক্ষ করি। *রাত্রিশেষ* কাব্যের ‘রেড্ রোড়ে রাত্রিশেষ’ কবিতায় কবি অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। *সারা দুপুর* কাব্যের ‘তারা দু’জন’ কবিতায় কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে গদ্যছন্দ জুড়ে দিয়েছেন। স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মিশ্রণ দেখতে পাই *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের ‘সার্চ’ কবিতায়ও। কবিতাগুলোর নিবিড় পাঠে আমরা বুঝতে পারি, কবিতার গতি ও গন্তব্য অনুযায়ীই তিনি ছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা কবির ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যেরই স্মারক।

আহসান হাবীব ছন্দ নিয়ে তেমন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন নি, কিন্তু প্রচলিত ছন্দের পর্ববিভাজনের নিরূপিত কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছেন, কখনো কখনো যা তাঁর কবিতাকে কথ্যভঙ্গির নিকটবর্তী করে তুলেছে। কবিতা ও কথ্যভঙ্গির মধ্যে তিনি অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল তুলে দিতে চান নি। তাই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তের নিরূপিত পরিমণ্ডলে চলতে চলতেই কখনো-বা তিনি এই তিন ছন্দের শাসন উপেক্ষা করে গদ্যছন্দে প্রবেশ করেন, আবার গদ্যকবিতার শরীরে তিনি জুড়ে দেন নিরূপিত ছন্দের দোলা। বলা যায়, মিশ্র ছন্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিষয় অনুযায়ী ছন্দ নির্বাচনেও আহসান হাবীবের সাফল্য তুলনারহিত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : ফররুখ আহমদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি

একজন শিল্পস্রষ্টার প্রকৃত পরিচয় তাঁর শিল্পকর্মেই মুদ্রিত থাকে। তাঁর বলার কথাটি কলানৈপুণ্যে সুপ্রকাশিত না-হলে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর চলার পথটি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হয় না। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর সৃজনভুবনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করলেও সেই অনুষঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক আবহ প্রদানের মাধ্যমেই তা শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নির্ণয়ের বিচিত্র প্রয়াস সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, কবিতায় বিম্বিত জীবন কখনোই কবির ব্যক্তিজীবনের অনুপুঙ্খ উপস্থাপন নয়। ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবন– এই দ্বিবিধ ধারায় প্রসারিত জীবনের আলোচনায় একজন প্রতিভাবান কবি স্বভাবতই তাঁর কবিজীবনের প্রতি পক্ষপাত দেখান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁকে তাঁর ব্যক্তিজীবনে নয়, খুঁজবে হবে তাঁর শিল্পকর্মে, এবং– শিল্পকর্মের বিচিত্র শাখায় পরিভ্রমণ করলেও– কবিতাই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। তাই তাঁর কবিতার তলদেশে প্রবাহিত জলস্রোতেই 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা' বলেন তিনি, এবং সেই চারুকৃত কথামালাই হল তাঁর জীবনের প্রকৃত ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শে পরিতৃপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে তাঁর অনেক কবিতারই প্রকৃত কিংবা পূর্ণাঙ্গ পাঠ নির্ণয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিভিন্ন কবিতার জন্মবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহে পাঠককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই কবিতার অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনে আমরা কবির ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রান্তে দৃষ্টিপাত করি। এই দৃষ্টিপাতের ফল সর্বদাই যে সুখকর, স্বস্তিদায়ক কিংবা লক্ষ্যাভিমুখী হয়, তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। তবু এই চেষ্টার চোরাবালি পাঠককে প্রলুব্ধ করে। পাঠক হিসেবে আমরা জানি, সুখ স্বস্তি কিংবা পরিতৃপ্তি কাব্যস্রষ্টার অগ্রগমনকে স্তব্ধ করে দেয়, চলিষ্ণু জীবনের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হন তিনি। কাব্যপাঠে অতৃপ্তির অভিঘাত পাঠকের অন্তরেও আনন্দদায়ক অনুরণন সঞ্চার করে। কবিজীবনের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণকল্পে কবির ব্যক্তিজীবনে আলোকসম্পাদের প্রয়াস পাঠকের সেই অতৃপ্তি থেকেই উৎসারিত।

ফররুখ আহমদের ব্যক্তিগত কিংবা যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গে অবগাহন তাঁর শিল্পিজীবনের গতি, গন্তব্য ও গভীরতা অনুধাবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। কারণ কবিতা ও জীবনের সম্পর্কসেতু সুদৃঢ় করার প্রোজ্জ্বল প্রত্যয়েই তাঁর কবিতা বিশেষ, ব্যক্তিত্বখচিত। তিনি যে অনুভব, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ধারণ করেছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও পারিপার্শ্বিক সময়-সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। কবিপ্রতিভা কবিতার মতোই এক রহস্যময় ব্যাপার, যার পূর্ণাঙ্গ অনুধাবন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই রহস্যের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে কবির ব্যক্তিজীবনের প্রোজ্জ্বল প্রতিভাস, এবং সেই ব্যক্তিজীবনও সঙ্গত কারণেই তাঁর স্বকালের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে পরিকীর্ণ। 'ব্যক্তিপ্রতিভা কাল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিক সভ্যতা-সমাজ ও বৈশ্বিক পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে বলে তার সৃজনকর্ম যেমন এর সঙ্গে যুক্ত, তেমনি ব্যক্তিমানসও সৃজনশিল্পে অনিবার্যভাবে সংলগ্ন। ব্যক্তিমানসের আন্তর-বৈশিষ্ট্য ও চৈতন্যলোক শিল্পসৃষ্টিতে উপেক্ষিত নয়, বরং অহংকেন্দ্রিক [egocentric] প্রতিভার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত। কারণ, প্রতিভার চৈতন্যলোকেই তার বিশ্ববীক্ষার জন্ম।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ১)। তাই ফররুখ আহমদের কবিতার গভীরে প্রবেশের পূর্বে আমরা কবির 'জীবন, প্রত্নস্বভাব ও চেতনালোকের বিশিষ্ট প্রবণতা' চিহ্নিত করার মাধ্যমে কবির শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ অনুধাবন করতে চাই।

পারিবারিক পটভূমি ও শৈশব জীবন

ফররুখ আহমদ তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী এবং মাতা বেগম রওশন আখতার। ফররুখের পিতার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ফররুখ আহমদ। তিনটি কন্যা-সন্তানের পর ফররুখের জন্ম হওয়ায় পরিবারের অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর দাদা সৈয়দ আব্বাস আলী তাঁর নাম রাখেন ফররুখ, যার অর্থ সৌভাগ্যবান। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর, বদলির চাকরি হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করতে

হয়েছে। "মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ফররুখ ছিলেন সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাঁদের পরিবার ছিলো শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। পর-পর তিনটি মেয়ের জন্মের পর ফররুখের জন্ম হয়। রমজানের সময়ে ফররুখের জন্ম হয়েছিলো ব'লে তাঁর দাদী আদর ক'রে তাঁকে 'রমজান' ব'লে ডাকতেন। ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিলেন ফররুখ; দীর্ঘদিন দাদীই তাঁকে লালনপালন করেন।" (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ৩)। মাঝআইল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মধুমতি নদীর প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় বেড়ে উঠেছেন ফররুখ আহমদ। নদী যেমন আপন বেগে এগিয়ে চলে, কারো প্রতি বিশেষ মনোযোগ কিংবা কাউকে উপেক্ষা করে না, তেমনি ফররুখ আহমদও ছেলেবেলায় একটু উদাস, আপনভোলা প্রকৃতির ছিলেন। ফররুখের বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ এক স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'ফর্‌রুখ ছোটবেলায় আপনভোলা ছিলো। পথে চলতে চলতে সে মাথা নাড়তে নাড়তে যেতো। আবার রাত্রে বড় একটা ঘুমোতো না। সারারাত জাগতো প্রায়ই। ঘুম কম ছিলো ওর।...একদিন সকাল বেলায় ফর্‌রুখকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় গেল? পরে দেখা গেল, চৌকির তলায় মুর্গীর বাচ্চা দেখছে। 'কিরে, এখানে কি করছিস?' জিজ্ঞেস করায় ফর্‌রুখ বললো, মুর্গীর বাচ্চা দেখতে খুব ভাল লাগে।' আর একদিন দাদীজান সকাল বেলায় উঠে ওর বিছানা ভরা ভাঙা ডিম দেখতে পেলেন। 'হ্যা রে ডিম কোত্থেকে এল?' জবাবে ফর্‌রুখ বললো, 'পিঠের তলায় দিয়ে শুয়েছিলাম বাচ্চা ফোটাবার জন্যে।" (১৯৮৮ : ১৮)। এই যে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর প্রয়াস, তা ফররুখের ভবিষ্যৎ শিল্প-ব্যক্তিত্বের স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ব্যক্তিগত খোলস ভেঙে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ক্লান্তিহীন ছিলেন ফররুখ। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা লক্ষ করব, নিজের গভীরে ডুব দিয়ে আপন-ভোলা সেই ছেলেটির আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি।

ফররুখ আহমদের শিক্ষাজীবনের শুরু মাঝআইল গ্রামের পাঠশালায়। ফররুখের গ্রাম-সম্পর্কের এক দাদা মোল্লাজী আবদুস সামাদের কাছে বছর দুয়েক লেখাপড়া করেছেন তিনি। 'ফারসি-জানা এক মহিলা বাড়িতে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে মডেল এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতার তালতলা এলাকার ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে এই স্কুল অবস্থিত ছিলো। তারপর কিছুদিন পড়েন বালিগঞ্জ হাই স্কুলে।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ৩-৪)। এর পর তিনি খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এবং এই স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে ফররুখ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে তৃতীয় বিভাগে এই. এ. পাশ করেন। ফররুখ আহমদ প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরেজিতে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফররুখ স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নি।

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। বালিগঞ্জ স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন তাঁর শিক্ষক। খুলনা জেলা স্কুলে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবুল ফজল এবং আবুল হাশেম। ফররুখ আহমদ সম্পর্কে সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেছেন, "ফররুখকে কৈশোর বয়সে ছাত্র হিসেবে দেখেছি। তিনি একবার আমাকে, আমি কলকাতা যাচ্ছি শুনে হুইটম্যানের 'লীভস অব গ্রাস' এক কপি আনার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে তিনি শৈশব থেকে, কৈশোর বয়স থেকে কিভাবে কাব্য সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে তিনি নিজেকে ভবিষ্যৎ কবি জীবনের জন্যে তৈরী করেছিলেন। এবং তাঁর এ প্রস্তুতি যে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আদর্শনিষ্ঠা এবং জীবন-আদর্শকে তিনি জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।" (১৯৮৮ : ৩২৮)। সাহিত্যিক আবুল হাশেম ১৯৩৬ সালে বদলি হয়ে খুলনা জেলা স্কুলে আসেন। স্কুলের ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হলে ফররুখ আহমদের সৃজনপ্রতিভার পরিচয় পান তিনি। আবুল হাশেম লিখেছেন, 'ভারটা নিয়ে দেখি কাজটা তত সোজা নয়। একে তো পাঠ্য ছাড়া আর কিছু খোকাদের কলমের মুখে আসতেই চায় না, তার উপর আবার টোকাই বাছার বিপদ। ভারি ঝামেলায় পড়েছিলাম। এর মধ্যে একটা ছেলে এসে একটা লেখা হাতে দিল। ছেলেটাকে দেখতাম ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন মাস্টার সাহেবদের জব্দ করবার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকত, তখন সে বসে থাকত নির্বাক মুখে, বই মেলে, তার ডাগর চোখ দু'টি ঢেকে। লেখাটা পড়ে দেখলাম। চমৎকার লাগল। একটু ঘষামাজা করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। এই

ছেলেটিই হ'ল ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।' (১৯৮৮ : ৬)। স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং সিটি কলেজে ফররুখ আহমদ শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাকে। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় বুদ্ধদেব বসুর স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। কবিতার মাধ্যমেই প্রমথনাথ বিশীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন স্বল্পভাষী লাজুক প্রকৃতির ছাত্র ফররুখ আহমদ। এ বিষয়ে চমৎকার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ :

> একদিন বৃষ্টিতে ভিজে, ধুতি-পাঞ্জাবীতে রাস্তার কাদা মাখিয়ে তিনি [ফররুখ] কলেজের ক্লাসে এসে হাজির হন। পরনের কাপড় ভিজা ও কর্দমাক্ত ছিল বলে তিনি গিয়ে বসেন একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে। সেখানে বসেই সবার অলক্ষ্যে তিনি একটি খাতায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ক্লাস নিচ্ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। আচমকা তাঁর দৃষ্টি যায় ফররুখ আহমদের দিকে। তিনি চেয়ার ছেড়ে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে ধীর-পায়ে এগিয়ে যান ফররুখ আহমদের কাছে। অধ্যাপককে দেখে ফররুখ আহমদ খাতাটি লুকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর সন্ধানী-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে একজন নবীন কবির কাব্যপ্রয়াস। তিনি ফররুখ আহমদের কাছ থেকে খাতাটি চেয়ে নিয়ে যান। ঐ খাতায় লেখা ফররুখ আহমদের কয়েকটি সনেট পড়ে তিনি বিস্ময়-মুগ্ধ হন। এবং টিচার্স কমনরুমে গিয়ে অন্যান্য অধ্যাপকদের নাকি কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনান। অভিভূতকণ্ঠে অধ্যাপক বিশী বলেন যে তিনি একজন তরুণ সেক্সপীয়রকে আবিষ্কার করেছেন। (১৯৭৮ : ১৭১)

এই কবিতাগুলো বুদ্ধদেব বসুকেও অভিভূত করেছিল। এর কয়েকটি কবিতা বুদ্ধদেবের *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফররুখের প্রস্তুতিপর্বে এই কীর্তিমান ব্যক্তিত্ববর্গের সান্নিধ্য তাঁর মানসগঠনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। সত্যজিৎ রায়, ফতেহ লোহানী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ফররুখ আহমদের সহপাঠী। এঁদের সান্নিধ্যও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশে উজ্জ্বল অবদান রেখেছে।

মেধাবী ছাত্র ছিলেন ফররুখ আহমদ। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া কিংবা খেলাধুলা নিয়ে সময় কাটাতে ভাল লাগত না তাঁর। শামসুল হুদা চৌধুরী স্কুল-জীবনের ফররুখ আহমদের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'কলকাতায় বালিগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় ফর্‌রুখের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব। ফররুখ ছিলেন দারুণ মেধাবী ছাত্র। ক্লাশে প্রায়ই প্রথম হতেন ফর্‌রুখ।' (১৯৮৮ : ৬০)। কবি-কন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন, "অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে অনেকেই আব্বাকে 'দ্বিতীয় আশুতোষ' বলে আখ্যায়িত করতেন।" (১৯৮৮ : ২৮০)। কিন্তু কবিতার টানে ফররুখের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় ভাটা পড়তে থাকে। ফররুখের মামাতো ভাই সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন, 'ফররুখের প্রবণতা গেল কবিতার দিকে। তাঁর কলেজ বয়সে কবিতা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, একজন মেধাবী ছাত্র হারিয়ে গেল কবিতার তোড়ে। বালিগঞ্জ সরকারী স্কুলে ক্লাসের ফার্স্টবয় ফররুখের এই পরিণতির কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি আমার আব্বাকে ও সে স্কুলের হেড মাস্টার কবি গোলাম মোস্তফাকে।' (১৯৮৮ : ১১৪)। ফররুখের ঘনিষ্ঠজন এবং তাঁর শিক্ষকবৃন্দের সেই আক্ষেপ কিংবা দীর্ঘশ্বাস কবি ফররুখ আহমদ কতটা মোচন করতে পেরেছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ফররুখের অবদান ও অবস্থান নিশ্চিত ও চিহ্নিত হওয়ার পথে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার অমনোযোগ ও অস্পূর্ণতা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে নি।

শৈশব থেকেই ফররুখ আহমদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল। বই পড়ে যেমন আনন্দ পেতেন, তেমনি কল্পকাহিনি শুনেও পুলক বোধ করতেন তিনি। আবদুল মান্নান সৈয়দ শৈশবের ফররুখ আহমদ সম্পর্কে লিখেছেন, "শৈশবে দাদীর কাছে ফররুখ শুনতেন পুঁথির কাহিনী, 'তাজকিরাতুল আওলিয়া' এবং 'কাসাসুল আম্বিয়া'। ছোটবেলায় ফররুখ দুরন্ত ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে ভাবুকতা ও উদাসীনতা তাঁর মধ্যে কাজ করত। মাঠে কিংবা মধুমতী নদীতীরে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। জ্যোৎস্নারাতে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন। এই সবই তাঁর মধ্যে কবিতার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো, মনে হয়।' (১৯৮৮ : ১৬)। সমালোচক শৈশবের ফররুখ-চরিত্রে যে দুরন্তপনার কথা উল্লেখ করেছেন, তার প্রকাশ প্রবল ছিল– একথা বলা বোধকরি সঙ্গত হবে না, কিন্তু 'ভাবুকতা ও উদাসীনতা'র নানা দৃষ্টান্ত ফররুখের ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনে, যার সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক আবুল হাশেম। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা 'রাত্রি', যা পত্রস্থ হয় মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত *বুলবুল* পত্রিকায়, ১৯৩৭ সালে। খুব কাছাকাছি সময়ে মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত *মোহাম্মদী* পত্রিকায় 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশ পায়। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ২০৭)। একই বছরে *মোহাম্মদী*তে প্রকাশিত হয় 'অন্তর্লীন' শীর্ষক গল্প। ১৯৩৮ সালে 'ব্যায়ামশিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী' নামক একটি সচিত্র প্রতিবেদন *মোহাম্মদী*-তে প্রকাশিত হয়। কবি-দার্শনিক আল্লামা ইকবালের মৃত্যুতে কবি লেখেন 'স্মরণী' শীর্ষক কবিতা। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন–সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র *সওগাতে* প্রকাশিত ফররুখের প্রথম কবিতা 'আঁধারের স্বপ্ন'। ১৯৪১ সালে *মোহাম্মদী* এবং *সওগাতে* কোরআনের বেশ কিছু সুরার অনুবাদ 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহমদের প্রস্তুতিপর্বের এইসব সাহিত্যিক প্রয়াস তাঁর মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল, তাই-ই তাঁর পরবর্তী জীবনের নিরলস সাহিত্যসাধনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

ফররুখ আহমদ ১৯৪২ সালে খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ে উপলক্ষে 'উপহার' নামে একটি কবিতাও লেখেন ফররুখ, যা প্রকাশিত হয় *সওগাতে*র অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায়। ফররুখের স্ত্রীর ডাক নাম লিলি। 'লিলি' শিরোনামে একটি কবিতা *মৃত্তিকা* পত্রিকার বসন্ত ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'লিলি আহমদ' নামে ফররুখ আহমদের একটি কবিতা *সওগাতে* ছাপা হয়। ফররুখ জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখের পুত্র-কন্যাদের নামের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তা হল : সৈয়দা শামারুখ বানু, সৈয়দা লালারুখ বানু, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাহমুদ, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাসুদ, সৈয়দ মনজুরে এলাহী, সৈয়দা ইয়াসমিন বানু, সৈয়দ মুহম্মদ আখতারুজ্জামান [আহমদ আকতার], সৈয়দ মুহম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, সৈয়দ মুখলিসুর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ মুহম্মদ আবদুহু। (১৯৯৩ : ৭)। কবি হিসেবে যে ভাবুকতা ও ঔদাসীন্য কবির মধ্যে সক্রিয় ছিল, সংসারজীবনে তার প্রভাব তেমন পড়ে নি বলেই উল্লেখ করেছেন কবি-পত্নী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন। এক স্মৃতিচারণে তিনি উল্লেখ করেছেন, '[ফররুখ আহমদ] সংসার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে কখনও উদাসীন ছিলেন না। গৃহ-কর্তা হিসাবে, পিতা হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন সচেতনতার সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে– ওসব খবর সবসময়ই রাখতেন তিনি।' (১৯৮৮ : ৪৩)। বৈষয়িক ব্যাপারে উচ্চাভিলাষী ছিলেন না ফররুখ। তাই প্রাচুর্যের অভাব সত্ত্বেও ফররুখের পরিবারে প্রশান্তি বিরাজ করত।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

১৯৪৩ সালে কলকাতা আই. জি. প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদের কর্মজীবনের শুরু। পরের বছরই তিনি আই. জি. প্রিজন অফিসের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন কলকাতা সিভিল সাপ্লাই অফিসে। ১৯৪৫ সালে তিনি মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। এক বছর চাকরি করার পর পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৬ সালে তিনি জলপাইগুড়ির একটি ফার্মে যোগ দেন এবং অল্প কয়েকদিন সেখানে কাজ করেন। "এসব কোনো চাকরিই বেশি দিন করেননি, পরিষ্কার বোঝা যায় : তাঁর কবি-মানসের সঙ্গে খাপ খায়নি, 'মোহাম্মদী'র চাকরিটি ছিলো একমাত্র তাঁর উপযোগী, কিন্তু একটি ঘটনায় তার পথ রুদ্ধ হয়। সম্ভবত ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে ফররুখ 'মোহাম্মদী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন– লেখক হিশেবে অনেক দিন আগে থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি কবিতা 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ'-সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ নিজের নামে ছাপায় ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে তিনি 'মোহাম্মদী'র চাকরি ছেড়ে দেন।" (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ৮)। প্রবল আত্মসম্মানবোধ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে কর্মজীবনে বিচিত্র সব বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছেন ফররুখ। নিজের বিপদ হবে জেনেও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি তিনি।

ফররুখ আহমদ ১৯৪৮ সালে সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন, অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বেতারে। পরে তিনি নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ঢাকা বেতারই ছিল ফররুখ আহমদের স্থায়ী কর্মক্ষেত্র, আমৃত্যু তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফররুখ জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "বেতারে স্টাফ

আর্টিস্ট হিশেবে ফররুখ আহমদ দীর্ঘকাল 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা করেছেন। বেতারের প্রয়োজনে অসংখ্য গান, কথিকা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতবিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। নিজের ও অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। পুঁথি পাঠও করেছেন মাঝে-মাঝে। বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ প্রযোজনা করেছেন। বেতারে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি সৈয়দ আলী আহসান, কবি আবুল হোসেন, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি শামসুর রাহমান, কবি হেমায়েত হোসেন, গীতিকার নাজির আহমদ, কথাশিল্পী আশরাফ-উজ-জামান খান, কথাশিল্পী নাজমুল আলম প্রমুখ।" (১৯৮৮ : ১৪)। ফররুখ আহমদের কর্মজীবন ও কবিজীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কারণ চাকরির প্রয়োজনেও তাঁকে নানা সৃষ্টিশীল কাজে সম্পৃক্ত হতে হয়েছে। ঢাকা বেতারে ফররুখের কর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা থেকে বেতারের নিজস্ব শিল্পী ফররুখ আহমদের সঙ্গে সাহিত্যকর্মী ফররুখের পরিচয়ও অনুধাবন করা যাবে :

ক. তখন ঢাকা বেতারে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। আমি, ফতেহ্ লোহানী, নাজির আহমদ ও ফররুখ আহমদ। একত্রে কত না গল্প করেছি। তবে আমার সাথে ফররুখের অন্য সময়েও দীর্ঘক্ষণ গল্প চলত, রাস্তার ওপারে আবনের চায়ের দোকানে বসে।

ঢাকা বেতার তখন নাজিমুদ্দীন রোডে ছিল। ফররুখকে দিয়ে আমি জোর করে কত ধরনের গানই লিখিয়ে নিয়েছি। ফররুখ প্রথম দিকে লিখতে চাইত না। তবু আমার পীড়াপীড়িতে অনেক গানই সে লিখেছিল। আমি যতটুকু অনুভব করেছি, ফররুখ যেন তার প্রেমিক মনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ফররুখের মনটা ছিল প্রেমিকের। (আবদুল আহাদ ১৯৮৮ : ৩৮)

খ. কর্মজীবনে এসে আমি ফররুখকে আমার সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি। তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। নিজের জন্যে তাঁর কখনোই কিছু চাওয়ার ছিলো না। ইনক্রিমেন্ট কিম্বা প্রমোশন কোনো কিছুই তিনি দাবী করেন নি কখনো।

ফররুখের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিলো অপরিসীম। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে একটি কথা আমার মনে দাগ কেটে আছে। সাবেক আইয়ুব আমলে আমি যখন রেডিওর পরিচালক, তখন সরকারী খরচে ফররুখকে হজ্জে গমন এবং পরে তিনমাস মুসলিম দেশ ভ্রমণের আহ্বান জানানো হলো। আমি তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে মিষ্টি দাবী করলাম। ফররুখ কিছুক্ষণ নির্বিকার থেকে বললেন যে, আইয়ুব সরকারের খরচে হজ্জে যোগ দেবার ও মুসলিম বিশ্বভ্রমণের ইচ্ছাই তাঁর নেই। পরে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও তাঁকে রাজী করতে পারি নি। (শামসুল হুদা চৌধুরী ১৯৮৮ : ৬১)

গ. ...কেউ অভাব-অভিযোগের কথা জানালে ফররুখ ভাই যদ্দুর সম্ভব তার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। শিল্পীদের প্রতি ফররুখ ভাইয়ের দরদের সীমা ছিল না। তখনকার দিনে কোন কোন অফিসার শিল্পীদেরকে দু'চারটা কটু কথা না বলে পারতেন না– ফররুখ ভাই জানলে তার একটা কড়া জবাব অন্তত হত। (আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯৮৮ : ৬৮)

ঘ. মনে পড়ে, রেডিও-শিল্পীদের দাবী-দাওয়ার সেই সংগ্রামী দিনগুলোর কথা। রেডিও অফিস তখন নাজিমুদ্দীন রোডে। শিল্পীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম শুরু হল। কমিটির তিনি সভাপতি বা সম্পাদক কিছুই না– কিন্তু সকলেই জানত, এই সংগ্রামের পেছনকার মূল প্রেরণা তিনি। রেডিওর জাঁদরেল মহাপরিচালক বোখারী সাহেব করাচী থেকে ছুটে এলেন। হুমকি ও প্রলোভনের মুখে সংগ্রামের পিচ্ছিল পথ থেকে বহু অফিসার আর নেতাই ভেসে যাবার উপক্রম। কিন্তু রেডিওর একজন ক্ষুঁদে কর্মচারী– যিনি বুক টান করে দাঁড়িয়ে থেকে শিল্পীদের দাবি-দাওয়া অজেয় প্রমাণ করেছিলেন তিনি ফররুখ ভাই। (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ১১০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ঢাকা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট ফররুখ আহমদের ব্যক্তিত্বের বিভা যেমন পরিস্ফুট, তেমনি তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন থেকে শিল্পস্রষ্টা ফররুখের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুধাবন করা যায়। ঢাকা বেতারের সঙ্গে কখনোই সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি তাঁর। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বেতারের পনের জন স্টাফ আর্টিস্টের চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন ফররুখ আহমদ। ফররুখ আহমদের সঙ্গে এই ছাটাইয়ের তালিকায় ছিলেন সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল আহাদ প্রমুখ। সতের দিনের ধর্মঘটে শিল্পীদের পক্ষেই সিদ্ধান্ত এসেছিল– স্টাফ

আর্টিস্টদের দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে সবাইকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ফররুখ আবার চাকরিসংক্রান্ত ঝামেলায় পড়েন। বেতন-বিষয়ক জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ফররুখের এই ঝামেলার প্রতিবিধানে আহমদ ছফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দৈনিক *গণকণ্ঠে* প্রকাশিত প্রতিবেদনে আহমদ ছফা লেখেন :

> অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক, যাঁদের কোনো রকমের আদর্শবোধ নেই, চরিত্র নেই, সুবিধাবাদিতাই নীতি, আমরা জানি তাঁরা আজ ফররুখ আহমদের নামে দুটো সমবেদনার কথা কইতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন। তারপরেও আমরা মনে করি, ফররুখ আহমদ একজন বীর চরিত্রের মানুষ। একজন শক্তিমন্ত কবি। আমাদের সাহিত্য থেকে তাঁর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। এই সরকারের কাছে কবি ফররুখ আহমদের রুটি-রোজগারের পথ খুলে দিতে আবেদন করার কোনো সার্থকতা নেই। ...তাদের যদি বিবেক থাকতো, যদি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি প্রেম থাকতো, কবিকে বৃদ্ধ বয়সে উপোস করতে হতো না।
>
> আমরা কবি ফররুখ আহমদকে বাঁচাবার জন্যে, তাঁর পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে 'ফররুখ আহমদ সাহায্য তহবিল' গঠন করতে কবির অনুরাগীজন এবং দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতিপ্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখছি। (আহমদ ছফা ১৯৮৮: ৬৩৪-৩৫)

আহমদ ছফার এই 'তীব্র-তীক্ষ্ণ' প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাসে আবার ফররুখ ঢাকা বেতারের চাকরিতে পুনর্বহাল হন এবং তাঁকে বেতারের কমার্শিয়াল সার্ভিসের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ঢাকা বেতারে ফররুখ আহমদের এক সময়ের সহকর্মী ছিলেন কবি আবুল হোসেন। ১৯৫০-১৯৫৭ কালপর্বে ঢাকা বেতারের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ছিলেন তিনি। ফররুখ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে ফররুখ আহমদের কাজ ছিল গান লেখা, বিভিন্ন প্রোগ্রামে কণ্ঠ দেওয়া, আবৃত্তি করা।' (২০১০ : ২৯)। ফররুখের স্বকালের সহযোদ্ধা কবি আবুল হোসেন *এখনও সময় আছে* কাব্যে 'ফররুখ আহমদ' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছেন। এই কবিতায় ফররুখের দৈহিক অবয়বের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও চিত্রিত করেছেন কবি আবুল হোসেন। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করছি :

> তার ফুটবলের মতো চোখ দুটো যেন
> নীল আগুনের গোলা :
> জাল ছিঁড়ে এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে।
>
> তার ঠোঁটে ছিল ইস্পাত,
> সারা মুখে রক্ত ছড়ানো,
> শরীর তো নয়, বিদ্যুৎ,
> মেঘনাদের মতো গলার আওয়াজ।
> সে যখন রমনার রাস্তা দিয়ে
> বুক ফুলিয়ে হাঁটত,
> মনে হত
> একটা চিতা ফুর্তিতে
> লাফিয়ে যেতে যেতে
> শুন্যে মেঘের মধ্যে
> কখন মিলিয়ে গেল। (আবুল হোসেন ২০১০ : ২৭৫-৭৬)

ফররুখ আহমদ বেতারের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেই পরিতৃপ্ত হতেন না। বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নে প্রাণের টানেই নানা বিষয়ে সম্পৃক্ত হতেন তিনি। বিশেষ করে শিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনায় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পিবৃন্দকে তিনি যেমন সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানাতেন, তেমনি নতুন মুখের প্রতিও তাঁর মনোযোগের ঘাটতি ছিল না। শিশু শিল্পীদের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম

মমত্ব। খেলাঘর এবং মুকুল ফৌজের ক্ষুদে শিল্পীদের প্রতি ফররুখ আহমদের মনোযোগ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম এক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, খেলাঘরের পরিচালক ফররুখ আহমদ শিশুদের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'ফররুখ ভাই ও শিল্পী জয়নুল আবেদীন বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে মুকুল ফৌজের মাঠে আসতেন, সেখানে, কামরুল ভাই বা লতিফ ভাই যখন আমাদের গান করাতেন, তাঁরা বসে বসে শুনতেন। ফররুখ ভাইয়ের একাধিক গান তখন আমরা গাইতাম।' (১৯৮৮ক : ১৫৭)। ফররুখের কর্মজীবনের বৃত্তান্তে তাঁর কবিজীবনও অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। এই কাজ-পাগল মানুষটি সততা ও নিষ্ঠার কারণেই কর্মজীবনে নানা দুর্বিপাকে পড়েছেন। কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন তিনি। কর্মজীবনেও ফররুখ আহমদ আপসহীনতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

১৯৩৭ সালে *বুলবুলে* প্রকাশিত সনেট 'রাত্রি'র মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদের আলোকোজ্জ্বল সাহিত্যমঞ্চে আবাহন। তাঁরপর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। *বুলবুল-মোহাম্মদী-মৃত্তিকার* বুকে যে চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন ফররুখ, তা এতই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী ছিল যে, সেই সময়ের প্রভাবশালী প্রতিটি সাহিত্যপত্রিকাই ফররুখের দিকে হাত বাড়িয়েছে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় লিখেছেন, অজিত দত্তের *দিগন্ত* বার্ষিকীও ফররুখের কবিপ্রতিভায় অনেকবার আলোকিত হয়েছে। ভিন্ন ধারার সাহিত্য পত্রিকা– প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত *অরণি*, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকায়ও কবিতা লিখেছেন কবি। *স্বাধীনতা* পত্রিকারও লেখক ছিলেন ফররুখ আহমদ। হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় ফররুখের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাত সাগরের মাঝি*। প্রথম কাব্যেই ফররুখ আহমদ কবি হিসেবে সর্বমহলের স্বীকৃতি লাভ করেন। নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে এই গ্রন্থের আলোচনা-সমালোচনা। ফলে ফররুখের কাব্যসাধনায় আরো গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত হয় কাব্য-পুস্তিকা *আজাদ করো পাকিস্তান*। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩) এবং হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থ।

ফররুখ আহমদ শিশুদের জন্য লিখেছেন *পাখীর বাসা* (১৯৬৫), *হরফের ছড়া* (১৯৬৮), *নতুন লেখা* (১৯৬৯), *ছড়ার আসর* [১] (১৯৭০) প্রভৃতি। পাঠ্যবই রচনায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন ফররুখ। ১৯৫০ সালে *নয়া জামাত* শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-৯৪ কালপর্বে প্রকাশিত ফররুখের বিভিন্ন গ্রন্থের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন ফররুখ-জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ তা হল : *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৭৫), *হে বন্য স্বপ্নেরা* (১৯৭৬), *নয়া জামাত* (১৯৭৮), *ফররুখ-রচনাবলী* (১৯৭৯), *ইকবালের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮০), *চিড়িয়াখানা* (১৯৮০), *কাফেলা* (১৯৮০), *হাবেদা মরুর কাহিনী* (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), *কিস্‌সা কাহিনী* (১৯৮৪), *ফুলের জলসা* (১৯৮৫), *তসবিরনামা* (১৯৮৬), *মাহফিল* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (১৯৮৭), *ফররুখ আহমদের গল্প* (১৯৯০), *ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য* (১৯৯১), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯২) প্রভৃতি। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ৫৪৭)।

ফররুখ আহমদ সাহিত্যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি লাভ করেন প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স'। এই বছরই তাঁকে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত করা হয় এবং একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৬১ সালে সর্বস্তরের সংস্কৃতিসেবীদের উপস্থিতিতে ঢাকা হলে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। *হাতেম তা'য়ী* গ্রন্থের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। একই বছর তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ *পাখীর বাসা* ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭৭ সালে তাঁকে একুশে পদক (মরণোত্তর) এবং ১৯৮০ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। ফররুখ আহমদ ১৯৮৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন।

প্রতিকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেই ফররুখ আহমদকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। এই লড়াইয়ের নানা চিহ্ন শরীরে ও মনে ধারণ করেছেন তিনি। দুঃসময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গেই ফররুখ জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। 'সামাজিক ও দৈনন্দিন নানাবিধ কারণে' কবির শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং একসময় এই দৃঢ়চেতা মানুষটির মনের শক্তিতেও ভাঙন লেগেছে। ফলে কবির জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ফররুখ আহমদ ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি

ফররুখ আহমদের সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ অনুধাবনে আমাদের প্রধান অবলম্বন তাঁর সাহিত্যকর্ম। আমৃত্যু কবিতায় নিমগ্ন এই মানুষটি নিজের সম্পর্কে কথা বলতে স্বস্তিবোধ করতেন না। নিজের কবিতা কিংবা কাব্যবোধ নিয়েও কোন আলোচনা বা সাক্ষাৎকার প্রদান করেন নি তিনি। আপাদমস্তক ঐতিহ্যমগ্ন শিল্পস্রষ্টা হিসেবে তিনি নিজের শেকড়কে স্বদেশ ও স্বজাতির সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত করতে চেয়েছেন এবং শেকড়ের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আধুনিক জীবনচেতনা ও শিল্পপ্রকৃতিকে স্বীকরণ করেছেন তিনি, কিন্তু আধুনিকতার নামে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা কিংবা বিষণ্নতার পূজা করেন নি। যে অতৃপ্তি তাঁকে সৃজনশীল হয়ে উঠতে অণুপ্রাণিত করেছে, তার উৎস কবির অন্তর্লোকই, কিন্তু সেই অন্তর্জাত অচরিতার্থতার বেদনায় কবির স্বকাল অনুপস্থিত নয়। বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন, 'কবি– তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হ'তে পারেন না– তাঁকে হ'তে হবে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত, যে-অভাবের ক্ষতিপূরণ করে দৈব অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাটাই চিরকালীন।' (১৯৯৯ : ২৫)– তখন 'আধুনিক' ও 'অভাবগ্রস্ত' মানুষটিকে সমাজের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করার সাহিত্যিক রাজনীতিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদের অভাব বা অতৃপ্তি আধুনিক কিংবা চিরন্তন কি-না, সে-বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়েও একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, তাঁর কবিমানসের মৌল প্রবণতাই হল শিল্পকর্মের মাধ্যমে মানুষ ও সমাজের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে ঋদ্ধ হওয়া।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ফররুখ আহমদ প্রচারবিমুখ ছিলেন। সাহিত্য-সৃজনে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষ কোন ধারার প্রতি প্রবল পক্ষপাত দেখান নি। তাঁর স্বকালের প্রভাব-সঞ্চারী কোন সাহিত্যিক বিতর্কেও তাঁর সরব উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি না। আপাদমস্তক কবি ছিলেন তিনি। ফলে তাঁর গদ্যের গভীর থেকে কবির সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ অনুধাবনের সুযোগ নেই। 'গদ্যরচনায় উৎসাহী নন ফররুখ, গদ্য লিখেছেন তিনি অত্যল্প। তাঁর মানস কবিতার দ্বারা অধিকৃত, কবিতার প্রায় সমস্ত দেশে তিনি সফর করেছেন। তাঁর গদ্য-মানসতার প্রকাশ ঘটেছে ব্যঙ্গকবিতায়– অন্যত্র তিনি কবি, প্রকৃত কবি, ডানা-মেলা কবি।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৭২)। কবিতাই তাঁর চিন্তা ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রচারের একমাত্র অবলম্বন। *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যের দুটি কবিতা থেকে ফররুখ আহমদের কাব্যভাবনা ও শিল্পস্বভাব অনুধাবন করা সম্ভব। কবিতার কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী, কবিতা কীভাবে 'সমস্যাকীর্ণ এ জগতে' আলোকসঞ্চারে অবদান রাখতে পারে, স্বপ্ন ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় কবিতার 'ছন্দ ও তালে'র গুরুত্ব কতটুকু, মানুষের বিভ্রান্তি মোচনে কবিতা কীভাবে কাজ করতে পারে, ফররুখ আহমদের 'কবিতার প্রতি' শীর্ষক কবিতায় তা চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। কবিতার শক্তি ও সমৃদ্ধির যে সীমানা চিহ্নিত করেছেন ফররুখ, তাঁর সমগ্র কাব্যপ্রয়াসে আমরা তারই প্রতিফলন লক্ষ করি। 'কবির প্রতি' শীর্ষক কবিতায় সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণে একজন প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল কবির অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ফররুখ। কবির আবির্ভাবকে তিনি জিব্রাইলের মর্তে অবতরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফররুখ বিশ্বাস করেন, জিব্রাইলের আগমনে পৃথিবীতে যেমন আলোক সঞ্চারিত হয়, জিব্রাইল যেমন মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা বহন করে আনে, একজন প্রতিভাবান কবির সৃষ্টিও সেইভাবে মানব-মনের অন্ধকার দূর করে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করে। কবি অনুধাবন করেছেন, 'সংকট সংঘাত দ্বন্দ্বে' মানবসভ্যতায় অন্ধকার নেমে এসেছে। এই অন্ধকার ভেদ করে আলোকিত আগামীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে একজন কবিকে আলোকবর্তিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ফররুখ মনে করেন, কবিও সূর্যের মতো তাঁর শব্দের দ্যুতিতে মানুষের চেতনাকে শাণিত করতে পারেন। আমাদের বিবেচনায়, এই দুটি কবিতার মর্মবাণীতে ফররুখ আহমদেরই কবিমানসের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে। কবিতা দুটো পাঠ করা যাক :

ক. আর একবার তুমি খুলে দাও ঝরোকা তোমার,
আসুক তারার আলো চিন্তার জটিল উর্ণাজালে,
যে মন বিক্ষত, আজ জাগুক তোমার ছন্দে তালে
এখানে সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এস একবার।

পৃথিবীর প্রয়োজন করিনি কখনো অস্বীকার,
তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়,
যে পারে সহজে নিতে আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়
সংগ্রামের পথ রুদ্ধ কোন দিন হয় না তো তার।
আরক্তিম গোলাবের পাপড়িতে, গোধূলি ধূসর
হৃদয়ে জাগে যে স্বপ্ন, যে স্বপ্ন শিশুর মুগ্ধ চোখে,
তারুণ্যের কলগানে প্রতিক্ষণে যে স্বপ্ন সুন্দর
জাগায় রোমাঞ্চ তার অফুরন্ত প্রাণের ঝলকে

যে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মনে মোহমায়া আনে নিরন্তর
সে স্বপ্ন নামুক এই পথ-শ্রান্ত গোধূলি আলোকে ॥ ('কবিতার প্রতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

খ. বজ্র বিদ্যুতের বাসা যে আকাশ, তুমি সে আকাশে
সহজে নিয়েছ তুলি পাদপিষ্ট ধূলিকণিকারে,
তারার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত মহিমায় সাজায়েছ তারে
যে সত্তা অপরাজেয় তারে মূর্ত ক'রেছ বিশ্বাসে।
সংকট সংঘাত দ্বন্দ্বে শর্বরীর ঘনতম ত্রাসে
তোমার উদ্দীপ্ত বাণী ফিরিয়া এসেছে বারেবারে
যেমন প্রভাতসূর্য ফিরে আসে ঘন অন্ধকারে
যেমন পবিত্র আত্মা জিব্রাইল একা নেমে আসে।

অন্তহীন আকাশের ঘন নীল শামীয়ানা ছিঁড়ে
পাখার আঘাতে তার দুই পাশে তারকা ছিটায়ে
নেমে আসে, নেমে আসে হৃদয়ের ক্লান্ত হিমচ্ছায়ে;
অপূর্ব আনন্দ বার্তা নিয়ে তার সঙ্গীতের মীড়ে
মৃত্যু সমাকীর্ণ পথে জীবনের আনন্দ বিছায়ে
(অগণ্য বিহঙ্গশিশু যে সঙ্গীতে জেগে ওঠে নীড়ে) ॥ ('কবির প্রতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ফররুখ আহমদের *অনুস্বার* ব্যঙ্গ-কবিতার কাব্য। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ডে (১৯৯৫) *অনুস্বার* অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাব্যের কয়েকটি সনেটে তাঁর কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। জনবিচ্ছিন্ন কবিতার দিকে ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন তিনি। কবিদের বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের বিরুদ্ধে ফররুখ কলম ধরেছেন। আবার বিষয়ের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল 'আঙ্গিকের ফাঁকি গুঁজে' কৃত্রিম বাহবা' নেওয়ার প্রয়াসকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন তিনি। ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি কেবল সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতিকেই তুলে ধরেন নি, কবি ও কাব্যজগতের অসুখ-বিসুখ সম্পর্কেও ব্যঙ্গ-সনেট লিখেছেন তিনি। ফররুখ অনুভব করেছেন, কবিকেও কখনো কখনো ফুল ছেড়ে বেত্রদণ্ড হাতে তুলে নিতে হয়, কারণ, তাঁর মতে, 'গণ্ডারের চর্ম ভেদ করে শুধু শাণিত কুড়ুল'। মানবিক মূল্যবোধের জাগরণই ফররুখের কবিতার মর্মবাণী। কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

ক. কবিকে যখন হ'তে হয় কবিরাজ
মহাজন বাক্য মতে বাঁশী হয় বাঁশ;
(যেহেতু মসৃণ চিত্ত জাগে মোটা আঁশ
মিহি সুর-পরিবর্তে কর্কশ আওয়াজ)
তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে নিতে হয় হাতে বিপরীত
বংশদণ্ড (প্রচলিত বিদ্রূপের রীত্)
মালঞ্চের প্রান্তে তাই ঠাঁই পায় বাঁশ। ('ভূমিকা')

খ. কাব্যক্ষেত্রে শুরু হ'ল তীব্র উৎপাত
সংখ্যহীন ধেড়ে, লেংটে, বহু মর্দা আর বহু মাদী
কুম্ভীরাশ্রু চোখে এনে অনুভূতিহীন বুকে কাঁদি
কাব্যের পুরানো ঝাণ্ডা ক'রে দিলো পথে ধূলিসাৎ।
ব্যাপার বুঝি না দেখি ইঁদুরের দাঁতের আঘাত,
লাল নীল বহুবিধ অশুচি কাপড়, কীল চড়
হাউই, পটকা, শেল, হনুলুলু গাট্টার পাথর;
তুমুল কাণ্ডের মাঝে শেষ হ'ল দুঃস্বপ্নের রাত। ('ইঁদুর')

গ. পাণ্ডিত্যের খোঁটা পুঁতে ভেবেছিলে কায়েমী আসন
রেখে গেলে কবিতার রঙ্গমঞ্চে। মাথা করি হেঁট
আমরা ও-ক্ষেত্রে যারা নিতান্তই প্রোলেটারিয়েত
নীরবে নিলাম স'য়ে তোমার ও পণ্ডিতী তর্জন।
ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি নাই আর বিষম গর্জন
ওপড়ানো খোঁটা লোটে একপাশে হাসির টার্গেট
সিংহাসন অবলুপ্ত শূন্যোদর তোমার পকেট
প্রেরণা দেয় না আর; প'ড়ে থাকি হতাশ্বাস মন। ('পণ্ডিত্যাভিমানী কবির প্রতি')

ঘ. স্বগোত্রের পরিচয়, টক, মিঠে, নোনতা কিছুটা
সাড়ে সাঁইত্রিশ ভাজা সাত ঘাটে গলাধাক্কা খেয়ে
জীবনের অভিজ্ঞতা হয় কিছু সাচ্চা আর ঝুটা
শ্মশানে কাটাও রাত কাব্যকুঞ্জে ঠাঁই নাহি পেয়ে।
এ সব হ'ত না যদি মানবতা বুকের তলায়
কিছুটা আসন পেত; কবিতা ফুটিত সাহারায় ॥ ('অতি আধুনিক কবিকে')

ঙ. প্রচুর প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছি বোঝাতে কবিতা
কিছুতে বোঝোনি, তাই অগত্যা জোগাড় কবি গদা
তোমার ধাতব মর্মে স্থূলধর্মী গণ্ডারের মিতা
আপাত পৌঁছানো গেল (আশা করি পাব সফলতা)।
একান্ত বাস্তবধর্মী যে পৃথিবী নিবাস তোমার
যেখানে বাণিজ্য করো অতি বাধ্য রুপীয়ার দাস
যেখানে মনের স্বাস্থ্য অবলুপ্ত রোগ প্রেতাত্মার
সৌন্দর্যের ছায়া মুছে ঢাকিয়াছে সমস্ত আকাশ। ('অরসিকেষু')

ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির একজন নিবিড় পাঠক ছিলেন ফররুখ। সেই পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে যে পথ দেখিয়েছে, তাতে শিল্পের সম্ভাব্য সকল দাবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হলেও স্বীকার করতেই হবে, শেষ পর্যন্ত তা জীবনেরই পথ। সেই পথ অতীতের সঙ্গে বন্ধন রচনার কারণে কুণ্ঠিত কিংবা সঙ্কুচিত হয় নি, আবার বর্তমানের বিবিধ বিপর্যয় ও বিসঙ্গতির দায় না এড়িয়েই তা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখে। তাঁর কবিতায় আমরা যে আদর্শের অনুরণন লক্ষ করি, তা তাঁর কবিত্বের অনুকূল আবহ সঞ্চারে অবদান রাখলেও শিল্পের দাবি উপেক্ষা করে ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন নি কবি। কবিতার কাছেই সমর্পিত হয়েছেন তিনি। ফররুখ কবিতায় যে জীবনের রূপায়ণ প্রত্যাশা করেন, সেই কবিতা জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে না, বরং জীবনের কাছে প্রণত হয়েই তা শিল্পের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। কারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন শিল্পস্রষ্টাই জানেন, 'বিশেষ ধরনের রাজনীতি ও শাস্ত্রশাসিত ধর্ম কখনোই সাহিত্যের স্বভাব নয়। প্রাসঙ্গিক উপাদান মাত্র এবং গৌণ ভূমিকার অধিকারী। এই গৌণগুণ যদি মুখ্য গুণরূপে বিবেচিত হতে থাকে, তবে তাতে করে কবিকেই হাস্যকর করে তোলা হয়।' (জুলফিকার মতিন ১৯৯৬ : ৪৬)।

ফররুখ আহমদ ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্গঠন-পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে স্বকালের নানা সংঘাত-সংঘর্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ফররুখের এই প্রতিবাদের ভাষাই তাঁর কবিতা এবং সেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত।

বিশ শতকের তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই কবিতায় নিজেদের কণ্ঠস্বরকে বিশেষ ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার প্রত্যয়ে প্রদৃপ্ত ছিলেন তাঁরা এবং সেই প্রত্যয়ের শৈল্পিক প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্র-ভাণ্ডার থেকে অকাতরে দু'হাতে গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ফলে কবিতার এক ব্যতিক্রমী পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে প্রত্যেকের সমবায়ী প্রয়াস সত্ত্বেও নিজ নিজ কবিস্বভাব ও শিল্প-বিবেচনার আলোকে তাঁরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। চল্লিশের দশকে আভির্ভূত কবিবৃন্দও তিরিশের কবিতার বিষয় ও শৈলী থেকে ভিন্নতর কিছু সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন। এই প্রয়াসে কারো অবলম্বন হল মার্কসবাদী শিল্পচৈতন্যপ্রসূত প্রগতিশীল কাব্যধারা, কেউ কেউ আবার ধর্মীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন। কবিতায় প্রভূত পরিমাণে ধর্মীয় অনুষঙ্গের অনুবর্তন ঘটিয়ে মানুষের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পুরোনো পথগুলোর সঙ্গে একালের মানুষকে যুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন যাঁরা, ফররুখ আহমদ তাঁদেরই একজন। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ফররুখ। এই ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্য সন্ধানেই চল্লিশের দশকে পুঁথিসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন একদল শিক্ষিত লেখক ও কবি। ফররুখ আহমদ পুঁথিসাহিত্যের পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। এদিক থেকে তিনি একটি ব্যাপক প্রভাবও সৃষ্টি করেন।' (১৯৯৩ : ২২)। ফররুখের এই ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গে সেই সময় আরো অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ফররুখের সাফল্যের পাশে তাঁদের সৃষ্টিকর্ম উল্লেখ করার মতো উজ্জ্বল ও অভিনব হয়ে ওঠে নি। তার কারণ, ফররুখ তাঁর অন্য 'যে-কোনো বিশ্বাসের মতো এই ক্ষেত্রেও ছিলেন সৎ, বলিষ্ঠ, গভীর'। একজন গবেষক ১৯৫২ সালে অনুজ কবি আবদুর রশীদ খানকে লেখা ফররুখের একটি চিঠি উদ্ধার করেছেন, যেখানে ফররুখ লিখেছেন, 'আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আংগিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।' (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ : ১৯৯৩ : ২২)। ফররুখ আহমদ মুসলমানদের 'জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের' সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে আধুনিক জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির আলোকেই অবলোকন করেছেন এবং তারই নির্যাস থেকে নির্মাণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বখচিত সাহিত্যকর্ম। 'তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত মৃত উপকরণে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমাগত ব্যবহারের ভেতর দিয়ে শব্দ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলো। মোটকথা, ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন এলিয়টীয় অর্থে, তিনি নিজেই যেন আরব্য উপন্যাসের নায়ক,– সেই কল্প জগতের সম্ভাব্য অনুষঙ্গ যেন তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ। ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো, সন্তের মতো, কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের ভেতর উজ্জীবিত হয়েছেন তিনি।' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৮ : ৫০৩)। ফররুখ আহমদ যে জীবনবোধে উজ্জীবিত-উদ্দীপিত ছিলেন, সেখানে তাঁর জীবনাদর্শ এবং কাব্যাদর্শের স্বাস্থ্যকর সম্মিলন সম্ভব হয়েছিল বলেই অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বন্ধনের শক্তিকে স্বীকরণ করে তিনি বর্তমানের মুক্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এবং এই প্রত্যাশার রূপায়ণেই তাঁর কবিতা বিশেষ ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, মুক্ত ও বিকশিত বর্তমানই কেবল সার্থক-সুন্দর-স্বপ্নীল ভবিষ্যতের জন্ম দিতে পারে। ফররুখের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা থেকে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, যা থেকে কবির জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পবোধের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

ক. এ নয় জোছনা– নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর,
এ পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।
আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মস্তুল দেখে দিক করতালি,

তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে। ('সাত সাগরের মাঝি'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. রুগ্ন মনের আকাশ এখানে ছড়ায় মৃত্যুর হাওয়া,
দূর পাহাড়ের যাত্রীদলের বোঝা হ'ল আরো ভারী,
শ্বাপদের মাঝে তবু তারা করে মানুষের সন্ধান,
পাশবিকতার শিরে হানে তরবারী। ('এই সংগ্রাম'/*সিরাজাম মুনীরা*)

গ. কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,– শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী– পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,– ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর ॥ ('শায়েরে'র সংলাপ/*নৌফেল ও হাতেম*)

ঘ. আসুক ভোরের হাওয়া চেতনার তাপদগ্ধ বনে,
যে প্রভাত আনে বয়ে পরিপূর্ণ প্রাণের জোয়ার,
আলোর তাজিতে হেসে অনায়াসে হয় যে সওয়ার
মুক্তির সম্পূর্ণ স্বাদ স্পর্শে যার পাই ক্ষণে ক্ষণে। ('ভোরের গান'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, ফররুখ তাঁর কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের শরণ নিলেও তাঁর লক্ষ্য স্বকালের বিপন্ন মানুষের মর্মঘাতী বেদনার রূপায়ণ। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মানুষের হাহাকারে ক্ষুব্ধ তিনি। অসহায় ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নায় ভারী হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর। তাই তিনি আবার ছেঁড়া পালে জোড়াতালি দিয়ে বেদনার নদী পাড়ি দিয়ে সাম্যের পৃথিবীতে পৌঁছার স্বপ্ন দেখেন। উদ্ধৃতি খ-এ কবি যে আকাশ দেখেন, সেই আকাশতলে মৃত্যুর দম বন্ধ করা হাওয়ার হাহাকার। এই মৃত্যু-উপত্যকা মানুষেরই সৃষ্টি। তাই কবি শ্বাপদসংকুল স্বকালের বাস্তবতায় সেই মানুষের সন্ধান করেন যারা পাশবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। উদ্ধৃতি গ-এ কবি যে হাতেম তা'য়ীর মহিমা কীর্তন করেছেন, তাঁর অমলিন মনুষ্যত্বই কবির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ফররুখের কাছে, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের চেয়ে মানুষের গুরুত্ব অনেক বেশি। কবি তাই 'নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী' হাতেমের প্রতীক্ষায় থাকেন, যিনি 'ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে' আলোর দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ফররুখ আহমদও ভোরের হাওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন এবং এই ভোরকে তিনি মানবচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের চেতনালোক কলুষমুক্ত না-হলে বাস্তব পৃথিবীর কোন প্রভাতই 'পরিপূর্ণ প্রাণের জোয়ার' উপহার দিতে পারে না। এভাবেই ফররুখ আহমদ সেকালের অনুষঙ্গে স্বকালের বাস্তবতাকে চিহ্নিত করতে চান এবং বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথ-প্রদর্শনের শৈল্পিক প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

ফররুখ আহমদের কবিপ্রতিভার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে সমালোচকবৃন্দও ফররুখের শিল্পসাধনায় ধর্মাশ্রিত জীবন-চেতনার রূপায়ণকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কবিতার আলোচনায় এই উপলব্ধির প্রকাশ স্পষ্ট যে, তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননায় রক্তাক্ত হয়েছেন এবং ধর্মীয়-অনুষঙ্গের আবরণে এই বিপর্যস্ত বর্তমান থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেছেন। ফররুখ আহমদ মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ অতীত থেকে আলো সংগ্রহ করেছেন এবং সেই আলো তিনি ব্যবহার করেছেন বর্তমানের অন্ধকার মোচনের অনুপ্রেরণা হিসেবে। ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ ফররুখ আহমদের কবিস্বভাবের অনুকূল আবহসঞ্চারে কীভাবে অবদান রেখেছে, আমাদের কাব্যসমালোচকবৃন্দ তা চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফররুখ-বিষয়ে কয়েকজন সাহিত্যসমালোচকের মন্তব্য বিবেচনা করলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে :

ক. তিনি ছিলেন অস্থিমজ্জায় কবি। কবিতা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা তাঁর মনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারতো না। তাঁর সাহিত্য-চিন্তা, সংস্কৃতি-চিন্তা, সামাজিক-চিন্তা– এমন কি সব রকমের সংস্কারসাধনের উদ্যোগও ছিল কবিতাকেন্দ্রিক এবং কবিতানির্ভর। তাই কবিতাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উজ্জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসাবে। তিনি নিছক কলা-কৈবল্যবাদী ছিলেন না। সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকায়ও ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ১৯৭৮ : ১৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

খ. আমি পরিষ্কার বলতে চাই, ফররুখ আহমদকে ধর্ম যতোখানি উদ্বুদ্ধ করেছিলো, ততোখানি প্রেরণা জুগিয়ে ছিলো দেশ। লক্ষণীয়, প্রথম পর্যায়েই ফররুখ আহমদের জনজাগরণমূলক কবিতার চেয়ে সংস্কৃতিচেতন কবিতা অনেক পরিণত। জনজাগরণমূলক কবিতায় তিনি স্পষ্ট ও সোচ্চার কিন্তু স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতায় প্রচ্ছন্ন ও মুখচ্ছদব্যবহারকারী, অর্থাৎ, কবিতার অস্ত্রগুলি সেখানেই তিনি অনেক নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৮৭ : ১৩১)

গ. ফররুখ আহমদের প্রখর শুভবুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়ের নির্ঘুম চেতনা কোন অবস্থাতেই শিথিল হয় নি। অন্যদিকে সৌন্দর্যচেতনা ছিল তাঁর কল্পনাশক্তির অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই দুই-এর ভারসাম্য ছিল; দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যই, কিন্তু ভারসাম্যও ছিল, যে ভারসাম্য না থাকলে রচনা সার্থক কাব্য হয় না, প্রচারের দলিল হয়, নয়তো হয় বিশুদ্ধ কল্পনাচারী সত্তা। (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৮ : ৪৫৬)

ঘ. ঐতিহ্যবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক স্বস্তির জগৎ। আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কোরানে উল্লেখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৪ : ৪৫৬)

ঙ. কবির অস্থি মজ্জায় মিশে রয়েছে ইসলাম ধর্ম, জীবনাদর্শ ও ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি এক অবিচল আস্থা। এ আস্থা তাঁকে শক্তি দিয়েছে আপনার পথ চিনে নেবার। জীবনের গভীরে এই বিশ্বাসের স্থাপনা করে ফররুখ নির্দ্বন্দ্ব হতে চেয়েছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের জটিল পথে অগ্রসর হয়ে কোন সমস্যার জট ছড়াবার আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন নি। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ৩৫)

চ. তাঁর কবিতায় আধুনিক দ্বান্দ্বিক ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব প্রাত্যহিক বাস্তবতা উন্মোচনের পরিবর্তে আছে ঘনীভূত অস্তিত্বের, যূথবদ্ধ মানুষের অভিযাত্রার সংঘ আবেগ। শুভ ও মুক্তির লক্ষ্যে জাতির দুর্গম পথচলার কথাই তিনি ব্যক্ত করেন। এই ঘনীভূত অস্তিত্বটি হচ্ছে অবিকশিত বঙ্গীয় মুসলমানের, আবার অন্য অর্থে বৈশ্বিক মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাই তাঁর বিশ্বাসটি আন্তর্জাতিক চৈতন্যগত না হলেও বিশ্বজনীন মানবতা ও সাম্যের নির্যাসে ভরা। (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১৪)

দৃষ্টান্তসমূহে ফররুখের কাব্যের বৈষয়িক পরিমণ্ডল চিহ্নিত করার প্রয়াস যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি তাঁর শিল্পস্বভাবের মৌল প্রবণতাও উপরিউক্ত বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় মুদ্রিত। ফররুখের কবিত্বকে তাঁরা দেখেছেন কবির জীবনবোধেরই অনিবার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। সমালোচকবৃন্দ দেখিয়েছেন, ঐতিহ্য-চেতনার শৈল্পিক রূপায়ণ ফররুখের মজ্জাগত অনুষঙ্গ। সেকালের 'মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্যে'র পরিপ্রেক্ষিতে একালের জীবনবাস্তবতার চিত্রায়ণ কবির 'সাহিত্য-চিন্তা, সংস্কৃতি-চিন্তা, সামাজিক-চিন্তা'র যেমন স্মারক, তেমনি তা 'বিশ্বজনীন মানবতা ও সাম্যের নির্যাসে ভরা' এবং এই ধারায় ফররুখ আহমদের ঐকান্তিক প্রয়াস কবিব্যক্তিত্বের আত্মখচিত উষ্ণতায় বাংলা কাব্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ফররুখ আহমদের শিল্পসাধনায় এক নতুন জীবন ও জগতের প্রত্যাশা উচ্চকিত। যে ভাবকে আশ্রয় করে তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন, তাতে পুরাতনের নানা উপাদান নতুন অবয়বে উপস্থাপিত এবং এই উপস্থাপনার ভাষাও অভিনব। ফররুখ আহমদের ঐকান্তিক প্রয়াসেই এই নতুন ভাষা-কৌশলের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি। 'ফররুখ আহমদ সেই কবি যিনি তাঁর জাতিকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন, যিনি তাঁর ধর্ম ও মানবতার ধর্মকে ভালবেসেছিলেন।' (শাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৮৮ : ৫৩৭)। এই অনাবিল ও অকৃত্রিম ভালোবাসার শক্তিতেই তিনি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই অন্তহীন, অনাস্বাদিত ভালোবাসার শক্তিতেই ফররুখ আহমদের কবিতা তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শে অনুরক্ত পাঠক-চৈতন্যে অভিনব ও অনাস্বাদিত আবহ সঞ্চার করে। একইভাবে ফররুখ আহমদের সৃষ্টিকর্ম তাঁর জীবনাদর্শে আস্থাহীন পাঠকের জন্যও স্বস্তিদায়ক শিল্পসম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিষয়-বৈচিত্র্য

কবিতা পাঠের যে আনন্দ কিংবা বেদনা, তার সীমানা নির্ধারণের প্রয়াস যেমন প্রায়শ ব্যর্থ হয়ে যায়, তেমনি এর আত্মা ও শরীরের স্বতন্ত্র আলোচনাও অনেক সময় কবিতার সৌন্দর্যসংহারের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা কীভাবে পাঠক-হৃদয়কে পল্লবিত করে, তারও সুস্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সহজ কর্ম নয়। কত বিচিত্র উপায়ে কবিতার স্বরূপ, শক্তি ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন আমাদের বিদগ্ধ সাহিত্যসমালোচকবৃন্দ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কবিতা' নামক রহস্যময় সৃষ্টির প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখনো উন্মোচিত হয় নি। কবিতার এই ব্যাখ্যাতীত অনুষঙ্গকে কেউ দৈব-ব্যাপার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কেউ-বা চেতন-অবচেতনের নান্দনিক মিথস্ক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কবিতার জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে জীবনানন্দ দাশ যে প্রেরণার কথা বলেছেন, সেই প্রেরণাও বিষয়নিরপেক্ষ নয়। তাঁর মতে, 'নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়– আরো অনেককিছুর প্রয়োজন এবং সেসবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়।' (জীবনানন্দ দাশ ২০০২ : ৩৭)। কবির বুদ্ধি এবং 'আরো অনেককিছুর' সম্মিলনজাত প্রেরণায় যে কবিতার সৃষ্টি, তার সবটুকু অধিকৃত না হলে বিস্ময় প্রকাশ করা চলে না। কবি-সমালোচক হুমায়ুন আজাদ 'কবিতা কী ও কেনো'– এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে কবিতা-বিষয়ক এ যাবৎকালের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যসমূহের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ বিবেচনায় রেখে উল্লেখ করেছেন, কবিতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণের বিচিত্র প্রয়াস মূলত কবিতা-নামক শিল্পকর্মের রহস্যময়তাকেই স্বীকৃত দেয়। তাঁর মতে :

> কবিতার ধ্রুব সংজ্ঞা নেই, যদিও যুগে যুগে রচিত হয়েছে অজস্র সংজ্ঞা। সংজ্ঞার এ অজস্রতা জানায় যে কবিতা এক রহস্য, যার স্রষ্টা রহস্যময় মানুষ। রহস্যময় মানুষ এক রহস্য সৃষ্টি ক'রে তার নাম দিয়েছে কবিতা, কিন্তু তাকে মানুষ কোনোদিন পুরোপুরি বুঝে উঠবে না। বলতে পারি, এবং বারবার বলা হয়েছে, কবিতা ইন্দ্রজাল; কবিতা অন্তর ও আত্মার ভাষিক উৎসারণ; কবিতা আবেগ ও মেধার সারাৎসার। বলতে পারি কবিতা উৎকৃষ্টতম শব্দের উৎকৃষ্টতম বিন্যাস; কবিতা আবেগের প্রশান্ত পুনশ্চয়ন; বলতে পারি কবিতা অবিস্মরণীয় বাণী। বা উদ্ধৃত করতে পারি জীবনানন্দীয় রহস্যোক্তি যে 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ', এবং চিরকাল ধরে ভেবে যেতে পারি ওই 'একই জিনিস'টি কী? (হুমায়ুন আজাদ ২০০৫ : ৬১)

উপরিউক্ত বিবেচনা শেষে সমালোচক বলেছেন, কবিতার শারীরবৃত্তীয় বিশ্লেষণের একটা নির্ভরযোগ্য রূপরেখা প্রণয়ন সম্ভব হলেও 'অসুবিধা কবিতার আত্মা নিয়ে'। জীবনানন্দের একটি বিবেচনা অনুসরণে হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন, 'তবে আমরা সকলেই যেমন কবি নয়, কেউ কেউ কবি, তেমনি ছন্দ ও মিলবিন্যস্ত রচনামাত্রই কবিতা নয়, তার কোনোকোনোটি কবিতা। শুধু রচনার অবয়ব অনুসারে কোনো রচনাকে কবিতা আর তার রচয়িতাকে কবি বলে মেনে নিতে দ্বিধা জাগে।' (২০০৫ : ৬১)। যে ভিত্তির ওপর অবয়বের প্রতিষ্ঠা, তাই-ই কবিতার বিষয়। তবে বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণেও কখনো কখনো কবিতার আত্মা অধরাই থেকে যায়। অনেক সময়ই কবিতার বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কবিতার যতটুকু আমরা জানতে পারি এবং তাতে কবিতার সঙ্গে আমাদের যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, তার ওপর ভিত্তি করে কবিতার পাশাপাশি অবস্থান করা চলে কিংবা সুযোগমতো কবিতার হাত ধরে কিছুটা পথ পাড়ি দেওয়াও সম্ভব, কিন্তু কবিতার সঙ্গে সংসারযাপনের মাধ্যমে দীর্ঘপথ অতিক্রমণের জন্য আরো কিছু অব্যাখ্যেয় বিষয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে কবিতার পাঠককে 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদী' হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগ-হেতু কবিতার পাঠককে কবিতা-নামক রহস্যময় সৃষ্টির প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল, দূরদর্শী এবং সহনশীল হতে হয়। পূর্ববর্তী বাক্যের সহনশীলতা প্রকৃতপক্ষে কষ্টসহিষ্ণুতারই নামান্তর। এইসব অনুষঙ্গের আলোকে আমরা কবিতার পাঠককে একরকম চিনে নিতে পারি। কবিকে চেনারও বিচিত্র উপায় নির্দেশ করেছেন আমাদের সেকাল-একালের শিল্পসমালোচকবৃন্দ। 'কণ্ঠস্বর দিয়েই তো কবিকে চেনা যায়। সে স্বর যখন তার নিজস্ব হয়, তখনই তিনি কবি হয়ে ওঠেন।'– কবি আবুল হোসেনের (২০১০ : ৪১) এই মন্তব্যে একজন প্রতিভাবান কবির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত কণ্ঠস্বরের

প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে। ফররুখ আহমদের জীবনাদর্শই তাঁর কাব্যাদর্শের প্রধানতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে সক্রিয় ছিল। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ যদিও বলেছেন, 'কবিতাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন তার জীবনাদর্শ প্রচার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উজ্জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসাবে।' (১৯৭৮ : ১৭৩), কিন্তু ফররুখের জীবনবোধ তাঁর কবিতাকে প্রচারপত্র করে তোলে নি। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের বিবেচনা প্রণিধানযোগ্য :

> তিনি প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। ফররুখ আহমদ তাঁর বিশ্বাসকে প্রচারের জন্য কবিতা লেখেননি। তিনি তাঁর কবিতার ভাব ও রূপকল্পের মধ্যে বিশ্বাসকে অন্তর্লীন করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চেতনা ছিল অকৃত্রিম। ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠার সাহায্যে তিনি তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। ...কবিতার একটি সচেতন সীমা থাকে, সেই সীমা লংঘন করলে কবিতা বিনষ্ট হয়। ফররুখ আহমদ সেই সীমাকে কখনও লংঘন করেননি। অবিশ্বাসীও তাঁর কবিতা পাঠে মুগ্ধ হয়। তিনি তাঁর কবিতায় বিশ্বাসকে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং দুর্গম পথযাত্রায় বিচিত্র পৃথিবীর বিস্ময় এবং যন্ত্রণা তাঁর চিত্তকে অধীর করে তুলেছিল। (২০০১ : ১০৬)

একটি সুন্দর ও আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন ফররুখ আহমদ এবং সেই স্বপ্নপূরণের জন্য তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু ধর্মান্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার সংকীর্ণ গলিতে ঘুরপাক খান নি তিনি। ধর্মীয় মূল্যবোধ তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পাদর্শে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় নি, বরং তাঁর সামনে মেলে ধরেছিল মুক্তির আকাশ। জীবন ও জগতের সকল অনুষঙ্গকেই তিনি এই মূল্যবোধের সমান্তরালে স্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষের জীবনযাপনে ধর্মের প্রভাব প্রবল বলেই ধর্মীয় অনুষঙ্গের অবাধ ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নি তিনি। কিন্তু কাব্যচর্চার নামে ফররুখ ধর্মাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নেন নি, একনিষ্ঠভাবে কবিতারই সাধনা করেছেন। একটি বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ফররুখের কবিতার এই গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ফররুখের কণ্ঠস্বরের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনে এবার আমরা তাঁর কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দেব। ফররুখ আহমদের কবিতার আত্মার নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার বৈষয়িক সমৃদ্ধি কতটুকু সাহায্য করতে পারে, বর্তমান আলোচনায় আমরা তাও অনুধাবনের চেষ্টা করব।

প্রেম

পৃথিবীর সমগ্র মহৎ সৃষ্টির প্রধানতম প্রেরণা প্রেম। প্রেমের মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব উন্মোচিত হয়। একজন কবিকেও আমরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমেই চিনে নিতে চাই। কবির সঙ্গে এই চেনা-জানার ব্যাপারটিতে কবির প্রতি পাঠকের প্রেমের প্রকাশ যেমন স্পষ্ট, তেমনি পাঠকের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়োজনে কবিকেও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। কবিতায় আমরা জীবনসম্পৃক্ত সকল অনুষঙ্গেরই উজ্জ্বল আনাগোনা লক্ষ করি। জীবনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলেই কবিতায় আমরা প্রেমিক কবির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত অবয়বটি অনুধাবন করতে চাই। কবিতায় আমরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র রূপের শিল্পায়ন লক্ষ করি। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও এই সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস অনুপস্থিত নয়। তবে তাঁর কবিতায় নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণসম্ভূত রোমান্টিক যোগাযোগের চেয়ে মানুষের জীবন-রহস্য উন্মোচন এবং এই রহস্যাবৃত জীবনের শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কিত বিবেচনাই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। ফলে প্রেমের কবিতায় নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি প্রণত হওয়ার যে আবেগঘন উপস্থাপন প্রত্যাশা করি, ফররুখ আহমদের কবিতায় সেই প্রেমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত কিংবা স্বীকৃত হয় নি। কবিতায় তিনি যে প্রেমের বন্দনা করেছেন তা মুখ্যত মানবপ্রেম।

ফররুখ তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই ইসলামী আদর্শের শৈল্পিক রূপায়ণে মনোযোগ দিয়েছেন। ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রগাঢ়তাকেও তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছেন। সমাজস্বীকৃত সম্পর্কের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে এবং এই সম্পর্ক প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অনুমোদনের অপেক্ষা করে। বাংলা কবিতার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে একালের কবিতায় আমরা যে প্রেমের রূপায়ণ লক্ষ করি, তাতে সমাজ-অনুমোদিত নারী-পুরুষ সম্পর্কের চেয়ে বিধি-বহির্ভূত আকর্ষণের তীব্রতাই প্রাধান্য পেয়েছে, যদিও এই আকর্ষণে কখনো কখনো আধ্যাত্মিক আবহ সঞ্চারিত হয়েছে, কখনো-বা সমাজ ও জীবনের অসঙ্গতি রূপায়ণের প্রয়াস হিসেবেও নারী-পুরুষের পারস্পরিক

যোগাযোগের রূপকল্প উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব হলেও সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করার শক্তি মানুষ সমাজ-সম্পর্কের অন্তর্গত রসায়ন থেকেই রপ্ত করে। একজন সৃজনশীল মানুষও তাঁর প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতা থেকেই শিল্পিজীবনের রসদ সঞ্চয় করেন। ধর্মীয় মূল্যবোধে ফররুখ আহমদের সম্প্রীতি থাকলেও মানবিক মূল্যবোধের আলোকেই তিনি সেই ধর্মীয় অনুষঙ্গের সংহতি ও শিল্পায়ন প্রত্যাশা করেছেন।

সাত সাগরের মাঝি কাব্যে ফররুখ আহমদ সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতি চিহ্নিত করে তা থেকে মুক্তির যে পথ-নির্দেশ করেছেন, তাতে ইসলামী জীবনাদর্শের অনুবর্তন প্রাধান্য পেলেও, সামগ্রিক বিবেচনায় মানবপ্রেমই কবির প্রধান অবলম্বন। মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ে মানুষের মননচৈতন্যের সদর্থক অভিব্যক্তির যেমন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে, তেমনি নারী-পুরুষ সম্পর্কেও ফাটল ধরে এবং সৃষ্টি হয় আস্থাহীনতার সঙ্কট। এই সঙ্কট উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে ইসলামী ঐতিহ্যের শরণ নিয়েছেন। হাসান হাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছেন, 'ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক স্বস্তির জগৎ। আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কোরানে উল্লেখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।' (১৯৯৪ : ৪৫৬)। সমালোচকের এই মন্তব্যে ফররুখের কাব্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে যা কিছুর উল্লেখ আছে, তা কবির জীবনবোধ ও শিল্পচৈতন্যের অনুকূল আবহ সঞ্চারে অবদান রেখেছে মাত্র। প্রকৃত অর্থে ফররুখের কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কবির স্বকালের বিধ্বস্ত ও বিপন্ন মানবতা। তাঁর কবিতায় বিম্বিত ইসলামী অনুষঙ্গ কবির মানবিক শিল্পচৈতন্যের সহায়ক শক্তি হিসেবে সংস্থাপিত। মানুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম থেকেই তিনি মানুষের সমৃদ্ধ অতীত থেকে শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি সঞ্চয় করে বর্তমানের মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছেন। কবির এই প্রয়াস মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত। *সাত সাগরের মাঝি* কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ,
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে,
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে...
ভ'রে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি' সুরভি কোথা চ'লেছে একেলা, ('আকাশ-নাবিক')

খ. ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলীর বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে; ('বন্দরে সন্ধ্যা')

গ. হে প্রিয়া শাহেরজাদী! তুমি আজ কী অজ্ঞাত প্রেমে
জেগে ওঠো শঙ্কায়, লজ্জায়?
তোমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায়
নেকাব-প্রচ্ছায়? ('ঝরোকা'য়')

ঘ. আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা। ('আউলাদ')

ঙ. এবার তোর রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার। ('সাত সাগরের মাঝি')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কবির হাহাকার মূর্ত হতে দেখি। স্বকালের অস্বস্তি ও অস্থিরতার রূপায়ণে কবি 'আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কোরানে' সমর্পিত হলেও স্বকালের জীবনবাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি তিনি। প্রচণ্ড লোভ, প্রতিহিংসা ও ক্ষমতালিপ্সা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষের প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা তখন বৈরী সমাজকাঠামোর চাপে বিপন্ন বোধ করে। ফররুখের কবিতায় আমরা যে প্রেমচেতনার রূপায়ণ লক্ষ করি, তা আত্মস্বার্থসর্বস্বতায় সংকীর্ণ না হয়ে বরং মানবজাতির কল্যাণকামনায় মহিমান্বিত। ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেব-নিকেশ করে হাহাকার করেন না তিনি, বরং সবার জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবনের স্বপ্ন দেখেন। তাই যে প্রেম কবির দয়িতাকে সুন্দর করে তুলতে পারে তা ঝড়ের আঘাতে জর্জরিত। এই প্রতিকূল সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কবির মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে। কবি যে শাহেরজাদীর প্রেমে পরিতৃপ্ত হতে চান, সেই শাহেরজাদীও দুঃসময়ের দারুণ দাহে বিপন্ন বোধ করে, শঙ্কায় ও লজ্জায় তিনি প্রকৃত প্রকাশের আরাম ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন এবং তাঁর 'সকল প্রেম আবার লুকাতে চায় নেকাব-প্রচ্ছায়'। যেখানে অসহায় শিশুর কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, সেখানে ব্যক্তিগত প্রেম-নিবেদনের নান্দনিক প্রয়াসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। যে নারী তাঁর প্রেমিকা হতে পারত, যে নারীর হৃদয়ে রয়েছে স্নেহের নির্ঝর, সেই নারীকে কবি লুণ্ঠিতা, গণিকা হতে দেখেন। কবির 'রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার' প্রতিধ্বনি তোলে বলেই প্রেয়সীর করাঘাত সেখানে অর্থহীন হয়ে যায়। এভাবেই কবির প্রেম মহত্তর মানবিক মূল্যবোধের জাগরণে আস্থা রেখে আলোকিত আগামীর স্বপ্ন রচনা করে।

সিরাজাম মুনীরা কাব্যে ফররুখ আহমদ ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল অবলম্বনে ইসলামের সমৃদ্ধ অতীত তুলে ধরেছেন। এই কাব্য দুইটি পর্বে বিভক্ত : প্রথম পর্বের নাম 'সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা' এবং দ্বিতীয় পর্বের নাম 'খোলাফায়ে রাশেদীন'। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণের জন্য মুহম্মদের মানবিক গুণাবলির আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান কবি। একইভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহৎ মানবিক বৈশিষ্ট্য রপ্ত করার আহ্বানও এই কাব্যে উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে এই কাব্য রচিত হলেও মানুষের প্রতি প্রেমই এর মৌল বিষয়। মানুষের সেবা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের কথাই ব্যক্ত করেছেন কবি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত, এই কাব্যে সেই বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। *সিরাজাম মুনীরা*-র মৌলসত্য ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার নয়, বরং পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের করণীয় চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন কবি। হযরত মুহম্মদ মানুষকে ভালোবেসে এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছেন। মুহম্মদের নির্দেশিত পথেই জীবনযাপন করেছেন ইসলামের খলিফাবৃন্দ। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাঁরা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং মানুষের হৃদয়েও তাঁরা শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মুহম্মদের আবির্ভাব এবং চরিত্র চিত্রণে ফররুখ আহমদ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের শরণ নিলেও ধর্ম-প্রচারক মুহম্মদের চেয়ে মানুষ মুহম্মদের প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন তিনি। এই কাব্যে ফররুখ আহমদের প্রেম ধর্মীয় আবরণে উপস্থাপিত হলেও পরকালের সম্মোহন অপেক্ষা মানুষের একালের যাপিত জীবনের দুর্দশা লাঘবের প্রত্যাশাই এখানে উচ্চকিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. ধ'রেছো মুচির সূচ নিজ হাতে, ইঁট ব'য়ে তুমি হ'য়েছ কুলি
ইহুদীর কাছে মার খেয়ে হায় ভরালে কি ঐ ছিন্ন ঝুলি।
মানুষের লাগি, 'উম্মত লাগি' একী দানে ভরা পরাণপণ–
পরম প্রভুর কাছে দীনতায় একী সুন্দর সমর্পণ। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. দরদীর বুকে প্রেম-সমুদ্র! বিরাট স্নেহের সে কী পাথার।
নিল সে তনুতে সাপের ছোবল, নিল সে আঘাত, অত্যাচার!
সেই সমব্যথী হেসে নেয় দেহে বিষ-দংশন, বিষের চুম,
তার বিশ্বাসী কোলে বি-শ্রান্ত নবীজীর যেন ভাঙে না ঘুম! ('আবুবকর সিদ্দিক')

গ. দুর্গত জনগণের দরদী! বেছে নিলে সেরা পথ,
মাটির তখতে ব'সেছে তোমার সাম্যের খিলাফত,

Dhaka University Institutional Repository

আজো যেন দেখি জীর্ণ বস্ত্র মেলে ব'সে আছো একা
তোমার দিলের সেরা দৌলত্ ছিন্ন পিরানে লেখা। ('উমর-দারাজ দিল')

ঘ. মনে পড়ে : ধরণীর দুঃখ-দীর্ণ দুঃস্বপ্নের রাতে
প্রেমের পরম সত্য ব'য়েছিলে মরু সাহারাতে ... ('ওস্‌মান গণি')

ঙ. সবারে বেসেছে ভালো,– করেনি সে স্বজন তোষণ,
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তার ছিল না সঙ্কীর্ণ আবরণ; ('ওস্‌মান গণি')

চ. বৃদ্ধকে ঠেলে ফেলে দিয়ে যেতে বিবেক দিয়েছে বাধা
দুশমন্‌ও পায় তোমার নিকটে মানুষের মর্যাদা। ('আলী হায়দর')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, মুহম্মদ এবং পরবর্তী চার খলিফার মানবতাবাদী জীবনাদর্শকে ফররুখ আহমদ কাব্যরূপ দিয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের যে আদর্শ ইসলাম ধর্মে রয়েছে, কবি মনে করেন, সেই আদর্শে দীক্ষিত হলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। হযরত মুহম্মদ এবং খলিফাবৃন্দ মানবপ্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, ফররুখ সেই চেতনা ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। *সিরাজাম মুনীরা* কাব্যের অন্যান্য কবিতায়ও আমরা ফররুখের মানবতাবাদী কাব্যবোধের পরিচয় পাই। কবি প্রত্যাশা করেন, যারা মানবতার শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দেওয়ার প্রস্তুতি থাকতে হবে বলে মনে করেন কবি। ফররুখের জীবনাদর্শে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রকাশ স্পষ্ট হলেও তিনি অন্ধভাবে ধর্মীয় বিধানের প্রতি পক্ষপাত দেখান নি। একজন সমালোচক বলেছেন, 'যে-ইসলামকে তিনি চেয়েছেন পুনরুজ্জীবিত করতে, সে-ইসলাম অবশ্যই শাসক ও শোষকের প্রচারক্লিষ্ট জীর্ণ ধর্ম নয়। ব্যবসায়ের জন্যে নয়, নিপীড়ন তো নয়ই, ইসলামকে চেয়েছেন তিনি শোষণমুক্ত সমাজের নির্মাতা হিসেবে।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৮ : ৪৫৮)। শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, বরং প্রত্যাশার সফল বাস্তবায়নের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করার প্রত্যয়ও প্রকাশ করেছেন। কখনো আবার প্রেমিক-হৃদয়ের মহত্তম অনুভব পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারের প্রয়োজনে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান থেকে নায়ক-নায়িকাদের স্মরণ করেছেন কবি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ক. আজ সংগ্রাম নিজেকে চেনার,
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার
হাটের ভীড়ে,
সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।
ঋণ শুধবার দিন–
আজ সংগ্রাম নিজের সঙ্গে
নিজেকে চেনার দিন। ('আজ সংগ্রাম')

খ. প্রেমের জটিল পথে যাত্রা যার দীর্ঘ দিন হ'তে
সমান হ'য়েছে তার দৃষ্টি মুখে বাধার প্রাকার,
ফরহাদের প্রেম শিখা আনিয়াছে প্রিয়াকে আলোতে,
গোলাব ধরিতে বুকে প্রয়োজন ছিল এ কাঁটার। ('প্রেম-পন্থী')

গ. কোন সম্রাটের ধ্বজা দেখেনি এ জীবন অক্ষয়,
কোন প্রেমিকের বহ্নি জ্বলেনি এমন অনির্বাণ!
প্রেমের জোয়ার নিত্য করিয়া অযুত হৃদি জয়,
তুমি আছো একচ্ছত্র প্রেমিক চিত্তের সুলতান। ('সুলতানুল হিন্দ')

ঘ. তুমি এনেছো এ পাথরে পাহাড়ে শিরীনের সংবাদ;
ভাঙে ফরহাদের কুঠারের মুখে প্রবল বাধার বাঁধ। ('ইশারা')

দৃষ্টান্তসমূহে ফররুখ আহমদের মানবপ্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট। মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মহত্তম আদর্শের প্রতি কবির পক্ষপাত এখানে লক্ষ্যণীয়। ফররুখ মনে করেন, প্রকৃত প্রেমের মাধ্যমেই মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাঁর বিশ্বাস, প্রেমহীন জীবনের আসলে কোন মূল্য নেই। কিন্তু প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রস্তুতি না থাকলে মানবজীবনের সার্থকতা মেলে না। ফররুখ কখনো ধর্মীয় অনুষঙ্গের আড়ালে, কখনো কালোত্তীর্ণ প্রেমের কাহিনি অবলম্বন করে মানুষের মধ্যে প্রেমবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

নৌফেল ও হাতেম কাহিনিকাব্যেও ফররুখ আহমদ মানবপ্রেমের জয়গান গেয়েছেন। কাব্যের শুরুতেই 'কাহিনীর ইশারা' শীর্ষক কবিতায় কবি এই কাব্যের মর্মকথা মুদ্রিত করে দিয়েছেন। ইয়েমেনের শাহজাদা তায়ীপুত্র হাতেম মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। রাজসিংহাসন ছেড়ে সে মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য পথে নেমে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনের আরাম-আয়েশ বর্জন করার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে যে অক্ষয় আসন রচনা করেছে হাতেম, সেই আসন কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারবে না। তার প্রতিদ্বন্দ্বী নৌফেল শক্তি ও সম্পদের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। কবির ভাষায় : 'আরবে নৌফেল শাহা প্রতিদ্বন্দ্বী সে যশলিপ্সায়/বিলালো ভাণ্ডার, তবু পেল না যে সম্মান দাতার।/নেমে গেল প্রাণ তার অন্ধ হিংস্র রাত্রির ছায়ায়;/আশ্চর্য পন্থায় শাহা পেল শেষে মুক্তির দুয়ার।' ফররুখ আহমদ সেই 'আশ্চর্য পন্থা'র কাব্যরূপ দিয়েছেন এই গ্রন্থে। নৌফেল খাজাঞ্চিখানার দ্বার উন্মুক্ত করে 'যত রাহী, মুসাফির, সর্বহারা অনাথ, এতিম' সবাইকে উজাড় করে দিয়েও হাতেমের মতো খ্যাতিমান দাতার সম্মান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। নৌফেলের উদ্দেশ্যে মুর্শিদের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, মানুষকে ভালবেসে এবং মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই নিজের সম্মান অর্জন করতে হয়। মুর্শিদ বলছেন, 'মানুষের মান দিয়ে রাখো তুমি নিজের সম্মান'। একজন কাঠুরিয়ার দুঃখ দূর করার জন্য হাতেম নৌফেলের কাছে ধরা দিয়েছে। এই ধরা দেওয়ার কারণ ফররুখের ভাষায় উপস্থাপন করা যাক :

এসেছে সে নির্ভীক, দিলীর
প্রাণ বিনিময়ে তার, মজলুমের বেদনা মুছাতে;
এসেছে ঘুচাতে দুঃখ বঞ্চিত দুঃখীর। এসেছে সে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিষ্কম্প হৃদয়ে।... কে দেখেছে
এমন দারাজ-দিল কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে? (*নৌফেল ও হাতেম*)

হাতেমের এই আত্মদান নৌফেলের জীবনবোধকে বদলে দিয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন, শক্তি কিংবা ঐশ্বর্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। মানুষের ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র পথ ভালোবাসা। হাতেমের ত্যাগের মহিমা নৌফেলের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকেও বদলে দিয়েছে। হাতেমের উপস্থিতিতে নৌফেলের নবজন্ম হয়েছে। নৌফেলের উপলব্ধি ফররুখের ভাষায় :

বুঝেছি খ্যাতির মূল্য এতদিনে, বুঝেছি এখন
যে মানুষ প্রাণ দিয়ে করে যায় বিশ্বের কল্যাণ
কুল মখলুকের বুকে স্থান তার; দুনিয়া জাহানে
পায় সে বিপুল মান জীবনে অথবা মৃত্যুপারে।
'যেমনে শাহজাদা! ক্ষমা করো শত্রুতা আমার। (*নৌফেল ও হাতেম*)

ত্যাগের এই মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও হাতেম নিজেকে ইনসানের সামান্য একজন খাদেম মনে করে। কোন অহঙ্কার নেই তার। বিত্তের অহঙ্কার ত্যাগ করে মানবপ্রেমে দীক্ষিত হয়েছে সে। হাতেম আপন মনে কাজ করে গেছে। বিনিময়ে যে ভালোবাসা ও সম্মান সে পেয়েছে, তারও প্রত্যাশা ছিল না হাতেমের। সে কেবল তাঁর মানব জনম সার্থক করার চেষ্টা করেছে। নৌফেলের বোধোদয়ে পরিতৃপ্ত হাতেম তার জীবনবোধের মৌল সত্যটি তুলে ধরেছে। ফররুখ আহমদের ভাষায় :

সামান্য খাদেম আমি
ইন্‌সানের, তবু বলি, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যে হয় খিদমতগার মানুষের কিম্বা মখলুকের
হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পূজারী। যে মুমিন,
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;
হয় না সে নতশির আল্লা ছাড়া অন্য কারো কাছে।
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা সে নিজের,
অসত্যের ভারবাহী মরে সেই গুমরাহা প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় যদি খ্যাতি, অর্থ, স্বার্থের পিঞ্জরে।(*নৌফেল ও হাতেম*)

এভাবেই ফররুখ আহমদ নৌফেল ও হাতেমের কাহিনি অবলম্বনে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন। হাতেম নৌফেলকে নিয়ে গেছে 'প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে'। শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে হাতেম। মানুষের মনের মধ্যে আসন রচনার একমাত্র উপায়, মানুষের দুঃখ-শোকে নিজেকে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত থাকা। বিত্তের অহঙ্কার মানুষের মনে শত্রুতার জন্ম দেয়। সম্পদের পাহাড় মানুষে মানুষে দূরত্ব বৃদ্ধি করে। এই দূরত্ব মোচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন কবি। এই কাব্যের শেষ পর্যায়ে শায়েরের কণ্ঠে ফররুখ আহমদ তাই বলেছেন :

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,– শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী– পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, (*নৌফেল ও হাতেম*)

এই প্রাণ জাগানোর গানই গেয়েছেন ফররুখ। কাব্যারম্ভে কবি বলেছেন, 'বিগত দিনের স্বর্ণ এ রাত্রির নিকষে অম্লান/জাগায় ভোরের স্বর্ণ ক্লান্ত ক্ষণে উজ্জ্বল জরীন,/শ্রান্তির আঁধার চিরে ওঠে জেগে মানুষের গান।' বর্তমান জীবনের অন্ধকার থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী কবি 'বহু শতাব্দীর ঢেউ' পার হয়ে আসা গান অবলম্বনে একালের মানুষের মনে প্রেম জাগাতে চেয়েছেন। এই গান কবির কণ্ঠে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন কবি। সেই জীবনের উপযোগী যে গান, সেই গানের কথা ও সুরের প্রয়োজনে তিনি কখনো ধর্মীয় কাহিনির শরণ নিয়েছেন, আবার কখনো মধ্যপ্রাচ্যের কালোত্তীর্ণ গল্প ও ঘটনাসমূহে অবগাহন করেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মের মর্মে আমরা মানুষেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

মুহূর্তের কবিতা কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় আমরা ফররুখ আহমদের ব্যক্তিগত অনুভবের সংহত উপস্থাপন লক্ষ করি। এই গ্রন্থভুক্ত সনেটসমূহে কবির প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয়ও অস্পষ্ট নয়। তবে কবির প্রেম এই কাব্যেও 'তুমি-আমি'র মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। ব্যক্তিগত ভালো লাগার একটি নৈর্ব্যক্তিক অবয়ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কবি। মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণিকের ভালো লাগাও অর্থহীন নয়। 'ভুলে যাও দীর্ঘ শতাব্দীর/খতিয়ান, কাব্য এ মুহূর্ত শুধু, মুহূর্তের গান'– এভাবেই কবি ক্ষণিকের গান গেয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই গানে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্রতার স্বরূপও উন্মোচন করেছেন কবি। ফাল্গুনের আগমনে মানবহৃদয়ে যে প্রেমের শিহরন সঞ্চারিত হয়, তার সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্তনের একটা যোগাযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কবি। 'ফাল্গুনে' শীর্ষক কবিতায় ফররুখ আহমদ প্রকৃতিকেও পূর্ণ যৌবনা তন্বীর রূপকল্পে নির্মাণ করেছেন এবং এই তন্বীর 'বর্ণ, ফুল-গন্ধ ভার,/সবুজের আস্তরণে জীবনের অজস্র সম্ভার' কবির প্রেমিক হৃদয়কেও নতুন রূপ দিয়েছে। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিছ :

এখন তরুণী সেই প্রশাখার মত বাহু মেলে
একান্তে প্রতীক্ষমানা দয়িতার সাথে চায় মিল,
অরণ্যের শামাদানে প্রতীক্ষার মণিদীপ জ্বেলে
দেখে সে বিস্ময়ে চেয়ে সাজানো বনের মাহফিল।
হৃদয়ের সব সুর, অনুরাগ কণ্ঠে তার ঢেলে
এ নির্জন বনছায় গেয়ে যায় প্রচ্ছন্ন কোকিল ॥ ('ফাল্গুনে')

ওপরের উদ্ধৃতির তরুণী পাঠককে প্রকৃতিকন্যার কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, তেমনি হৃদয়ের নিকটতম মানুষটির ছবিও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'হৃদয়ের সব সুর, অনুরাগ' দিয়ে যে কোকিল বনের নির্জনতা ভেঙে দেয়, সে কোকিল হয়তো কবিহৃদয়েরই প্রতিনিধি। ফররুখ আহমদ *মুহূর্তের কবিতা*-য় এসে নিজের হৃদয়ের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন। হৃদয়ের কথা বলার ব্যাকুল বাসনায় এই কাব্যের কবিতাসমূহ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ *মুহূর্তের কবিতায়* কালোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টাদের রচনায় ব্যক্তিগত প্রেমের সমর্থন খুঁজেছেন। এই কাব্যে ফররুখ আহমদের নিজস্ব কোন নায়িকার সন্ধান মেলে না। কিন্তু মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পুথিসাহিত্যের নায়িকাবৃন্দ কবিচৈতন্যে প্রেমের আবহ সঞ্চার করেছে। লোককথা, লোকগাথা ও রূপকথার নায়িকাদের প্রতিও কবির আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কবি মূলত কালোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টাদের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তাঁদের নায়ক-নায়িকাদেরও স্মরণ করেছেন। 'আরিফ লায়লা', 'লোকসাহিত্যের নায়িকা', 'রূপকথা', রূপমুগ্ধ', 'তোমাকে জাগাবো', 'তুমি জাগলে না' প্রভৃতি কবিতার নায়ক-নায়িকারা কবির মৌলিক সৃষ্টি না হলেও এই নায়ক-নায়িকাদের মহত্তম ত্যাগের প্রতি ফররুখ আহমদের মনোভাব থেকে তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের উষ্ণতাও অনুভব করা যায়। কবি হাফিজের গজলের ভক্ত ছিলেন। প্রেমিকার জন্য ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হাফিজ, সেই ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হয়েছেন ফররুখ। পুথিসাহিত্যের মহত্তম স্রষ্টা শাহ গরীবুল্লাহর কবিতায় ইউসুফ জুলেখার যে প্রেম-কাহিনি যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে নতুন প্রেমের জন্ম দিয়েছে, ফররুখ আহমদ সেই কাহিনিকেও তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. সে নদী হারায়ে গেছে, তার সাথে তুমি আর আমি
নদীর স্বচ্ছতা ভুলে, ভুলে গিয়ে সেই সাবলীল
হৃদ্যতা : হৃদয় : পথ খরস্রোতে হ'য়েছি ফেনিল;
অজান্তে নিয়েছি পথ– যে সড়ক অজ্ঞাত বেনামী! ('বিগত')

খ. চেনা মানুষের মুখ, হাসি-কান্না, ভোরের নীহার,
মেহেদীর রাঙা রঙ যে অধ্যায় ক'রেছে উজ্জ্বল
'লাজ রক্ত' হয় কন্যা দেখে যার মুখের আদল
অথবা শাওন রাতে দুই চোখে অঝোর বর্ষার
ধারা নামে অনর্গল (নদী ভাঙে মাঠে কিনার); ('গাথা ও গান')

গ. এখনো বিস্ময়ে শুনি কাহিনী দীউয়ানা মদীনার,
অজস্র ধানের শীষে ফিরে আসে যখন আঘ্রাণ
জীবনের সহচরী ডোলে তুলে রাখে সেই ধান
প্রশান্তির তুলি মনে আঁকে ছবি উজ্জ্বল তারার। ('দীউয়ানা মদীনা')

ঘ. বোখারা সমরখন্দ বিকালো যে গালের তিলের
বদলে, ভাবের সাথে দেখালো যে ভাষার মিলন,
শা'নজরের শেষে 'নব বর-বধুর যেমন
পরিপূর্ণ সম্মিলন' – তনু, মন, মুগ্ধ হৃদয়ের,
প্রেমপন্থী সেই কবি জেগেছিল ভাগ্যে ইরানের,
মৃত্যুহীন বুলবুল ক'রেছিল মুখর কানন,
রুকনাবাদের পথ শুনেছিল সে কল কূজন;
সে গীতিকা ঠাঁই পেল তৃষ্ণাতপ্ত প্রাণে জাহানের। ('হাফিজ')

ঙ. ইউসুফের রূপ দেখে অপরূপ, মোহমুগ্ধ প্রাণে
যেমন সম্বিতহারা মিসরের সহস্র সুন্দরী
চেয়েছিল নিষ্পলক;– তৃষ্ণাতপ্ত কর্ণপুট ভরি
শুনিল কাহিনী তার বঙ্গভাষী মুগ্ধ কলতানে। ('শাহ গরীবুল্লাহ')

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদের প্রেমিক-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ‘তুমি আর আমি’ কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার অনুভবের দ্যোতক নয়, সেখানে কবির সঙ্গে সমগ্র মানবের হৃদ্যতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতি খ-এ লোকগাথায় নায়িকার রূপলাবণ্যের যে পরিচয় মুদ্রিত, তারই শরণ নিয়েছেন কবি। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মৈমনসিংহ গীতিকার দিওয়ানার মদিনার কাহিনি গ্রামীণ জীবনের আনন্দযাপনে কীভাবে ফিরে ফিরে আসে, সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এ প্রেমিক কবি হাফিজের যুগোত্তীর্ণ গজলের শরণ নিয়েছেন ফররুখ আহমদ। নায়িকার প্রতি হাফিজের যে প্রেম, সমগ্র মানবের হৃদয়ে হাফিজের সেই প্রেমেরই প্রতিধ্বনি শুনেছেন ফররুখ। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পুথিসাহিত্যের প্রতিভাবান স্রষ্টা গরীবুল্লাহর মহৎ সৃষ্টি *ইউসুফ জুলেখা*র কাহিনির শরণ নিয়েছেন। প্রেমের সৌরভ ও গৌরব কীভাবে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় বিস্তৃত হয়, কীভাবে ‘পুরাতন প্রেম নিত্যনতুন সাজে’ পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়কেও পল্লবিত করে, এই কবিতায় ফররুখ আহমদ সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ যে-সকল কবিতা থেকে সংগৃহীত, তার কোনটিই প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু প্রেমের শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি ফররুখ আহমদের স্বীকৃতি এতে প্রতিভাত।

হাতেম তা’য়ী কাব্যে ফররুখ আহমদ প্রেমিক হৃদয়ের দুঃখ-মোচনের জন্য হাতেমের আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তন করেছেন। প্রেমের উষ্ণতায় পল্লবিত হওয়ার পথে ত্যাগ স্বীকারের বিপল্প নেই। কিন্তু এই গল্পে ত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তৃতীয় পক্ষ, তা’য়ীপুত্র হাতেম। হাতেমের এই কর্মের প্রেরণাও প্রেমই, সেটা মানবপ্রেম। বলা বাহুল্য, মানবপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ হাতেমই ফররুখ আহমদের এই কাব্যের নায়ক। কিন্তু হাতেমের এই অভিযাত্রা তার নিজের জন্য নয়, প্রেমিক মুনীর শামীর মনোবাঞ্ছা পুরণই তার উদ্দেশ্য। হুসনা বানুর সাত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হাতেম একজন প্রেমিকের মনকে প্রশান্ত করতে চেয়েছে।

হুসনা বানুর মুখদর্শন না করেই মুনীর শামী তার প্রেমে পড়েছে। এমনকি হুসনা বানুও মুনীর শামীকে দেখে নি, কিন্তু তার প্রতি মুনীরের মগ্নতার খবর সে জানে। হুসনা বানু বলছে, ‘সে আশিক, সে প্রেমিক, চিনেছি তা মুখচ্ছবি দেখে’, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসে না সে, প্রশ্নের জবাব তাই চাই-ই। তবে মুনীর শামীর জন্য তার মনের যে জায়গা তৈরি হয়েছে, তার নাম নিশ্চয়ই প্রেম, তবে সে প্রেম করুণায় আর্দ্র। হুসনা বানু বলছে :

> শা’জাদা মুনীর শামী– খরজমের শাহার সন্তান,
> ছেড়ে এল তাজ-তখ্‌ত্‌, ছেড়ে এল দৌলৎ, ইজ্জৎ!
> জানায়েছি তাকে আমি জীবনের কঠিন শপথ।
> পহেলা সওয়াল শুনে চলে গেছে শরমে, লজ্জায়;
> তার ব্যর্থতার কথা লোকমুখে আজও শোনা যায়।
> শুনেছি মুনীর শামী বুকে বেঁধে তস্‌বির আমার
> দীউয়ানার হালে ঘোরে বনপ্রান্তে দিল বেকারার,
> খরজমের শাহ্‌জাদা কিন্তু আজ পথের ফকীর,
> জানি না এখনো কেন দেশে দেশে ঘোরে রাহাগির! (‘হুস্‌না বানুর স্বগতোক্তি’)

হুসনা বানুর এই বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ মেলে মুনীর শামীর কথকতায়। একটি ছবির গভীরে ডুব দিয়ে এক নারীর প্রেমে ঘরছাড়ার গল্প শুনিয়েছেন ফররুখ। মনের আয়নায় হুসনা বানুর ছায়া পড়েছে বলেই মুনীর শামীর মনে শান্তি নেই। তাদের মাঝখানের চেনা-অচেনার ভেদরেখা মুছে গেছে, দুজনই দুজনের কথা ভাবছে, কিন্তু কিছু প্রশ্ন এসে তাদের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। এই দেয়াল ভাঙার কাহিনি শুনিয়েছেন কবি। মুনীর শামীর মনের অবস্থা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে :

> যত দেখি সেই তস্‌বির তত আঁখি সজল,
> পাপড়ির মত খোলে হৃদয়ের রক্ত দল,
> ‘অচেনা’– আমার মন বলে তবু ‘সে চিরচেনা’:
> হৃদয়ের ঋণ আছে তার কাছে অশেষ দেনা।

Dhaka University Institutional Repository

হুস্‌না বানুর জানা ছিল নাম ঠিকানা তার
শুনেছি শিল্পী পটুয়ার কাছে বারম্বার।
'পাব কি পাব না'– ভাবি আমি যত রাত্রিদিন
আশা নিরাশায় স্বপ্ন আমার ব্যথা-বিলীন।('মুনীর শামীর কথা')

হাতেম তা'য়ী কাব্যে ফররুখ আহমদ আমাদের প্রেমের গল্প শুনিয়েছেন, কিন্তু এই কাব্যের প্রেমিক কিংবা প্রেমিকাকে আমরা সক্রিয় হতে দেখি না। মুনীর শামীর প্রেমে কোন খাঁদ নেই, কিন্তু প্রেমিকার হৃদয় জয় করার জন্য সে আগুন কিংবা জলে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস দেখায় নি। আবার হুস্‌না বানুও প্রেমিকের চেয়ে প্রশ্নের জবাবেরই প্রতিই বেশি মনোযোগী। এ কাব্যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্র হাতেম। মুনীর শামী এবং হুসনা বানুর প্রেমকে মিলনাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই হাতেমের এই আত্মদান এবং এর মাধ্যমে হাতেম মানবপ্রেমের অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবুও এই কাব্য প্রেমেরই কাব্য। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনস্পৃহার চেয়ে মানবপ্রেমের মহিমা কীর্তনের প্রয়োজনেই ফররুখ আহমদ হাতেমের সক্রিয়তার বিস্তৃত বর্ণনা হাজির করেছেন। মিলনাত্মক এই কাব্যের শেষ খণ্ডে প্রেম-বিষয়ে হাতেমের মন্তব্য থেকে প্রেমের শক্তি ও সমৃদ্ধি অনুধাবন করা যায় :

পৃথিবীর চেয়ে ঢের কিম্মতী যে হৃদয়ে জ্বলেছে
প্রেমের দুর্লভ আলো,– কি করে জানাবো মূল্য তার?
কি ক'রে জানাবো আমি মূল্য সেই কস্তুরী মৃগের
অশান্ত দহনে যার রক্তবিন্দু হয়েছে সুরভি
নাভিমূলে? কি জানাবো এক আশিক হৃদয়
জ্বালায়ে জীবন তার অনির্বাণ আতশী দহনে
মূল্য দেয় প্রাণের,– প্রেমের! মনে হল বারম্বার
– মহান প্রেমিক সেই, খরজমের তাজ-তখ্‌ত্‌ ছেড়ে
পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য মুছে ফেলে যে চলেছে তার
প্রিয়ার নির্দেশ মেনে সওয়ালের মৃত্যু-তিক্ত পথে। (*হাতেম তা'য়ী*)

হাতেমের এই বক্তব্যে তার মহানুভবতার পরিচয় স্পষ্ট। প্রেমের জন্য মুনীর শামী সুখ এবং ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেও প্রেয়সীর প্রশ্নের জবাব খোঁজা তার সাধ্যের অতীত। এই কাব্যে যে প্রেমের গল্প আছে, তা মিলনাত্মক হলেও সেই প্রেম হাতেমের আত্মদানের ফসল। হাতেম অনুভব করেছে, 'যার প্রেমে, মুহব্বতে প্রাণ পায় বঞ্চিত জীবন/পায় সে সাফল্য খুঁজে।' আর কাব্যের 'শেষ কথা' শিরোনামে ফররুখ আহমদ আমাদের জানিয়েছেন, 'মানুষের/প্রেম, প্রীতি অবরুদ্ধ যেন আর না থাকে জিন্দানে।' কবি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, 'শান্তি ও প্রেমের রাজ্যে খোলে যেন রহস্য-নেকাব।' ফররুখ আহমদের এই উপলব্ধির গভীরে আমরা তাঁর প্রেমিক-হৃদয়েরই উষ্ণতা অনুভব করি। পাঠক হিসেবে আমরা বুঝতে পারি, এই কাব্যে একটি গভীর প্রেমের গল্প শুনিয়েছেন কবি এবং এই প্রেম নর ও নারী পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণেই প্রাণবন্ত। কিন্তু এই কাব্যের সক্রিয় নায়ক হাতেমের দীর্ঘ অভিযানে শক্তি সরবরাহ করেছে মানবপ্রেম, পৃথিবীর সকল মানবের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার পরামর্শ দেয় হাতেম। যে প্রেম নর-নারীর হৃদয়ে সুখ ছড়িয়ে দেয়, সেই প্রেমের জন্যই হাতেমের এই আত্মদান এবং এই মানবপ্রেমের মহিমাকীর্তনই ফররুখের আহমদের জীবন ও শিল্পাদর্শের মৌল প্রেরণা।

প্রকৃতি

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব অনুভব করা কঠিন। তাই শিল্পসাহিত্যে মানুষের অন্তর্গত আনন্দ-আরাম কিংবা অসুখ-বিসুখের আলোচনায় আমরা প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করি। ফররুখ আহমদের কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতির প্রশস্তি নেই বললেই চলে। জীবনের বন্দনা করেছেন তিনি এবং তাঁর কবিতায় জীবনের সজীবতা, সরসতা কিংবা সক্রিয়তা প্রকৃতির আশীর্বাদমুক্ত নয়। ফররুখের কবিতা তাঁর জীবনাদর্শের সমান্তরাল শিল্পস্মারক। যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, সেই জীবনের মহিমাকীর্তনে জীর্ণ নয় তাঁর

কবিতা। এক 'মহত্তম আদর্শে'র টানে তিনি অতীত ইতিহাসের প্রকৃত পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করেছেন এবং সেই পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নতুন জীবনের স্বপ্ন নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবিতা মহত্তম জীবনাদর্শের সংকলনমাত্র নয়। মহৎ কবিতার স্রষ্টা হিসেবেই তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত। তাঁর কবিতায় বিধ্বস্ত ও বিপন্ন বর্তমান মুদ্রিত এবং সেই বৈরী বাস্তবতায় মানুষের জীবনে যখন ছন্দপতন ঘটেছে, তখন তা প্রকৃতির প্রাণেও আঘাত হেনেছে। অনেক ক্ষেত্রেই কবি প্রাকৃতিক অস্বস্তির রূপকল্পে মানুষের অন্তরের রক্তক্ষরণের ছবি এঁকেছেন। ফররুখের কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি তাই জীবনের স্বরূপ অনুধাবনেরই এক সদর্থক ও সংহত প্রয়াস।

ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। 'মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্যে'র শরণ নিয়ে তিনি কবিতায় আলোকিত জীবনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় আরব্য-উপন্যাস, ইরান ও কোরানের প্রকৃতি উপস্থিত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি যে কল্পনাপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে বাংলাদেশের প্রকৃতির ছায়াপাতও লক্ষ করার মতো। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে তিনি যে ফুল ফোটানোর চেষ্টা করেছেন, যে ফলের রসে তিনি পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছেন, সেই ফুল ও ফলের শরীরে আমাদের এই শ্যামল বাংলার সরস প্রকৃতিই পুষ্টি সরবরাহ করেছে। বাস্তবের জল-হাওয়ায়ই ফররুখের কল্পনা পল্লবিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে মনোনিবেশ করলে আমাদের এই বিবেচনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

সাত সাগরের মাঝি কাব্যে ফররুখ আহমদ মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কাব্যে আমরা বারবার সিন্দাবাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। তিনি বারবার সমুদ্রযাত্রার গল্প শোনান এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত বন্দরে নোঙর করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। আরব্য উপন্যাসের নায়ক সিন্দাবাদ প্রসঙ্গেই তিনি বারবার দরিয়ার কথা বলেন। 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় আমরা কবিকে সিন্দাবাদের সমুদ্র সফরের কাহিনি অবলম্বন করতে দেখি। ফররুখ আহমদ এই তিনটি কবিতায় সিন্দাবাদকে 'অতীতের কর্মচঞ্চল, প্রাণোচ্ছল, দুর্বার, দুর্দম, দুঃসাহসী মুসলমানের প্রতীকরূপে উপস্থিত করেছেন। সিন্দাবাদের প্রতীকী আধারে তিনটি কবিতায় তিনি প্রকৃতপক্ষে যে জীবনস্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা অতীতের গৌরবোজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল ও দুর্বার প্রাণাবেগের অধিকারী মুসলমানেরই জীবনালেখ্য।' (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ৫৬)। এই আলেখ্যে প্রকৃতির নানা অবস্থার রূপায়ণও লক্ষ করা যাবে। কারণ অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সিন্দাবাদকে প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে সিন্দাবাদের যে যাত্রা, তার মাধ্যমেই তার মানবিক প্রত্যয়ের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আব্‌লুস,
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে। ('সিন্দবাদ')

খ. দীর্ঘছন্দা নারিকেল শাখে মুক্তি উঠেছে বাজি
সরন্দিপের তীরে তীরে কোথা পাখিরা ধরেছে গান;
সিন্ধু ঈগল বালুচরে বুঝি নীড় করে সন্ধান
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ফেরে দরিয়ার শাদা তাজী। ('বা'র দরিয়ায়')

গ. ডাকে বাগদাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ,
মাহ্‌গির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল,
কোমল কুয়াশা স্নেহে যেথা মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ;
ঘরে ফেরবার সময় হ'য়েছে আজ। ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

উদ্ধৃতিসমূহে নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ উপস্থিত। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সিন্দাবাদের মন যেখানে হুশ হারিয়েছে তা 'ঘন সন্দল কাফুরের বন'। তার চোখে ঘুম নেমে এসেছে 'পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায়'। উদ্ধৃতি খ-এ সিন্দাবাদের মনে মুক্তির যে আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে, আমরা তার প্রকাশ লক্ষ করি 'দীর্ঘছন্দা নারিকেল শাখে'। পাখির গান শোনার জন্য

কবি আমাদেরকে 'সরন্দিপের তীরে তীরে' নিয়ে যান এবং সিন্ধু ঈগলকে আমরা বালুচরে নীড়ের সন্ধান করতে দেখি। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে খেজুরের শাখায় রাতের চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে। কোমল কুয়াশা যখন স্নেহে মাটিতে ফাঁদ নির্মাণ করে, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাঠকচিত্তকেও পল্লবিত করে।

ফররুখ আহমদ যখন মুসলমানদের দুর্দশার ছবি আঁকেন, সেই ছবিও প্রকৃতির পটেই নির্মিত হয়। একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে তিনি মনের রঙেই তাঁর চারপাশের সবকিছুকে রাঙাতে চেয়েছেন। তিনি যখন বিদ্যমান বাস্তবতায় অসহায় বোধ করেন, তখন সবকিছুর মধ্যেই তিনি সেই অসহায়ত্বের ছায়াপাত লক্ষ করেন। কেবল হতাশার কথাই ব্যক্ত করেন না কবি, অন্ধকার থেকে মুক্তির প্রত্যাশাও উচ্চারণ করেন তিনি। সেই মুক্তির আনন্দও প্রকৃতির শরীরে আলোক সঞ্চার করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. মেহেদির শাখে থোকা থোকা ফোটে ফুল,
পাতার আড়ালে জাগে দ্বাদশীর চাঁদ,
কোন্ নির্জন গোলাব শাখায় অশান্ত বুলবুল,
সুরের বন্যা, জ্যোছনা ভাসায় জোয়ারে রাতের বাঁধ;
মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানে শান্ত মুগ্ধ রাত,
গভীর আবেগে তোমার দু'চোখে শিশির-অশ্রুপাত,
ঘুমায় শ্রান্ত তূতী ঘুমায় নার্গিস আঁখি জাগছে কেবল যুথী;
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে। ('আকাশ-নাবিক')

খ. আলো, বাতাসের সাথী, তুফানের সওয়ার নির্ভীক
অন্তিম লগ্নের ছায়া দেখে আজ সে মৃত্যু-যাত্রিক, ('স্বর্ণ-ঈগল')

গ. এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী,
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ,
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি,
মৃত মাঠে দিয়ে যাবে সাহারার উদ্দাম আবেগ ॥ ('তুফান')

ফররুখ আহমদ মুসলমান সমাজের অশান্তি ও অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে মূল্যবোধের বিপর্যয়কে দায়ী করেছেন। তাঁর কবিতায় আমরা যে মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ লক্ষ করি, তা ধর্মীয় বিধিনিষেধের নিরিখে নির্মিত। ফররুখ সমাজজীবনে বিদ্যমান অস্থির ও অশান্ত অবস্থার অবসানকল্পে ইসলামী জীবনাদর্শে সমর্পণের পরামর্শ দিয়েছেন। কবির এই বিবেচনাসমূহকে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় সূত্রাবদ্ধ করেছেন এইভাবে : 'মুসলমানের অধঃপতন ও বর্তমান দুর্দশার মূলে রয়েছে ইসলামের শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং আত্মবিস্মৃতি। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ হচ্ছে, জীবন পুনরায় ঐ আদর্শ অনুধ্যান ও অনুসরণ করে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাওয়া।' (২০০৮ : ৫৫-৫৬)। এই আদর্শতাড়িত জীবনব্যবস্থার রূপায়ণে কবি বারবার প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই অনুভবের প্রকাশে প্রকৃতি তাঁকে কীভাবে সাহায্য করেছে, নিচের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে তা অনুধাবন করা যাবে :

ক. ঐ দেখো স্রোতে অরূপ আলোতে সূর্যতরী
তীক্ষ্ণ আলোর তুফানে ছিঁড়িছে এ শর্বরী,
এই কালো রাত জমাট-তুহিন হিম-অতল,
ছিঁড়ে চ'লে যায় আলোর ছোঁয়ায় গলানো জল। ('হে নিশান-বাহী!')

খ. চৈত্র-দগ্ধ পোড়া মাটি ম্লান,
নিষ্প্রভ নীল শূন্যাকাশ,
সেখানে জাগাও সাড়া সু-প্রবল
দাও আহ্বান পথ চলার; ...

সবুজের বন, কেতকীর বন

সে কি শুধু হবে মনসা-ঝোপ!
সেখানে কি তুমি জাগাবে না আর নিশান আমার?
সেখানে কি তুমি জেগেছ আবার নিশান আমার?
আউষ ধানের দেশে মদিনার রক্ত গোলাব
সকল আশার পূর্ণতা নিয়ে মেলবে কলাপ,
বন্য ঝড়ের বৈশাখী পাখা নিশান আমার
আধো চাঁদ আঁকা, হায় মেঘ ঢাকা নিশান আমার! ('নিশান')

গ. তোমার নিশান উড়ছে কোথায় নির্জন প্রান্তরে,
জনারণ্যের এখানে শূন্য পাখা,
নীড় ছেড়ে তার স্বপ্নের পাখী বহুদিন পলাতকা ('নিশান-বরদার')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, ফররুখ আহমদ আদর্শহীন জীবনের পরিণতি চিহ্নিত করলেও, এই অবস্থার অবসান প্রত্যাশা করেছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি আলোর সূর্যতরী দেখতে পাচ্ছেন যা রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন করে দেবে। কবি লক্ষ করেছেন, 'এই কালো রাত জমাট-তুহিন হিম-অতল' এবং এই অন্ধকার ভেদ করে কবি 'আলোর ছোঁয়ায় গলানো জলে' অবগাহন করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতি খ-এ কবি 'চৈত্র-দগ্ধ পোড়া মাটি'র বুকে আবার সবুজের সমারোহ প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, মরুর বুকে মনসার ঝোপই শেষ কথা নয়, সবুজ বনে শান্তির শ্যামলছায়া নেমে আসবে একদিন। সেখানে আউশধানের সমৃদ্ধি থাকবে, থাকবে 'সকল আশার পূর্ণতা'। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি নির্জন প্রান্তরের ছবি এঁকেছেন, জনহীন শূন্যতার হাহাকার নির্মাণ করেছেন, পলাতকা পাখির কথা বলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশার কথাই ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ফররুখ আহমদের দৃষ্টি কেবল সমৃদ্ধ অতীতেই নিবদ্ধ থাকে নি, বর্তমানের বৈরী বাস্তবতাও তাঁকে ব্যাকুল বিক্ষুব্ধ করেছে। মানুষের দুঃখ-বেদনায় নিজেও মর্মাহত হয়েছেন তিনি। তাঁর আহত আত্মার আর্তনাদে প্রকৃতির বুকেও কষ্টের কালো ছায়া নেমে এসেছে। প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের সীমাহীন লোভের করুণ পরিণতি চিহ্নিত করেছেন কবি। আত্মস্বার্থমগ্নতায় আচ্ছন্ন মানুষ গোলাপের পাপড়িতেও আবর্জনা ও কাঁদা ছড়িয়ে দিয়েছে। বিষাক্ত কামনার কালো ছায়ায় আকাশের প্রসন্নতাকেও গ্রাস করেছে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা গেছে গেছে শুধু 'অনেক ক্ষুধিত রাত্রি, আর বহু সামুদ্রিক পীড়া'। তাই অন্ধকারের হাহাকারে বিভ্রান্ত পথিকের গন্তব্যহীন যাত্রার ছবি এঁকেছেন তিনি :

ক. কোন প্রবৃত্তির কাছে আজ ওরা পড়িয়াছে বাঁধা?
গোলাবের পাপড়িতে ছুঁড়িতেছে আবর্জনা, কাদা
কোন শয়তান?
বিষাক্ত কামনা দিয়ে কে ভরায় আকাশের রঙিন খিলান? ('লাশ')

খ. অনেক ঝড়ের দোলা পার হ'য়ে এল সে নাবিক!
অনেক ক্ষুধিত রাত্রি, আর বহু সামুদ্রিক পীড়া
চঞ্চল করেছে তারে, অন্ধকারে হারায়েছে দিক, ('আউলাদ')

ফররুখ আহমদ আরব্য-উপন্যাসের প্রেমকাহিনির পাশাপাশি বর্তমান প্রেমহীন জীবনের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই মনুষ্যত্বহীনতার ছাপ তাঁর কবিতায় চিত্রিত প্রকৃতির বুকেও দুর্লক্ষ্য নয়। পুরনো প্রেমের গল্পে প্রকৃতির যে রূপ দেখেছেন কবি, বর্তমানের বৈরী বাস্তবতায় সেই প্রকৃতির জীর্ণ দশা দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তবুও আশায় বুক বেঁধেছেন তিনি। ডুবে যাওয়া চাঁদ, জানু পেতে থাকা পাহাড় আবার 'নতুন আকাশে জীবনের সুর' ছড়িয়ে দেবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন কবি। রাত্রির গাঢ় ঘন অন্ধকার একদিন মুছে যাবে, দক্ষিণ হাওয়ায় আবার সেই পুরনো প্রেমের গন্ধ নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেবে– ফররুখ আহমদের এই বিশ্বাসে কখনো ভাঙন ধরে নি :

ক. চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়
পাহাড় পেতেছে জানু,

Dhaka University Institutional Repository

নতুন আকাশে জীবনের সুর
জাগাও হাসিনা বানু। ('শাহ্‌রিয়ার')

খ. রাত্রি আজ গাঢ় ঘন! মন
দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে মুসাফির উজানী-পবন,
গন্ধ খুঁজে ফেরে। ('ঝরোকা'য়')

সাত সাগরের মাঝি কাব্যের 'ডাহুক' কবিতাটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এই কবিতায় ফররুখ আহমদের 'রোমান্টিক কবিচিত্তের মুক্তি-ব্যাকুলতা, অপূর্ণতার বেদনা, অতৃপ্তির সুর অপরূপভাবে প্রকাশ পেয়েছে।' (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ৫৬)। কবির অচরিতার্থতা কবিতাটিতে প্রকৃতির আশ্রয়েই সংহত হয়েছে। একটি ডাহুকের ডাক কবিকে প্রকৃতির বিচিত্র প্রান্তে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ডাহুকের ডাককে যদি গান ভেবে নেওয়া যায়, তবে তা বেদনারই গান এবং এই গানে ডাহুকের নয়, কবির বেদনাই মূর্ত হয়েছে। প্রকৃত বেদনার সংহত উপস্থাপন অসম্ভব বলেই প্রকৃতিতে ডাহুক যতটা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, মানুষ ততটা নয়। ডাহুককে যদি কবিচৈতন্যের প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করি, তবে আমরা লক্ষ করব, দুঃখকে নেড়েচেড়ে দেখার আনন্দই এই কবিতার প্রধান সুর। দুঃখের গভীর থেকে জীবনের আনন্দ আহরণের চেষ্টা করেছেন কবি। এই কবিতায় যে অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বার্তা বহমান, তা প্রকৃত অর্থে জীবনের সজীবতা-সচলতা-সক্রিয়তারই স্মারক এবং এর প্রকাশ প্রকৃতির আশ্রয়েই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বেদনায় বিধ্বস্ত কিংবা বিভ্রান্ত না হয়ে বরং কবি তা উদ্‌যাপনই করেছেন। তাই 'ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির' মধ্যে 'দীর্ঘ রাত্রি একা' যাপন করেন কবি এবং শুনতে পান ডাহুকের ডাক। এই ডাক কবিকে স্বপ্নভারাতুর করে তোলে, তিনি চলে যান 'গুলে বকৌলির নীল আকাশ মহলে'। এই ডাক কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, তারই চলচ্ছবি নির্মাণ করেছেন কবি :

ঘুমের নিবিড় বনে সেই শুধু সজাগ প্রহরী।
চেতনার পথ ধরি চলিয়াছে তার স্বপ্ন-পরী,
মন্থর হাওয়ায়।
সাথী তন্দ্রাতুর।
রাত্রির পেয়ালা পুরে উপচিয়া প'ড়ে যায় ডাহুকের সুর।
শুধু সুর ভাসে
বেতস বনের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ ক্ষ'য়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে। ('ডাহুক')

ডাহুকের ডাক কবিকে 'আকাশ-জমানো ঘন অরণ্যের অন্তর্লীন ব্যথাতুর গভীর সিন্ধুর' নিকটবর্তী করে তোলে। এমনকি এই ডাকে আকাশের নীল জ্যোৎস্নাও ম্লান হয়ে যায়। কবি পাখির সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন থাকেন। এই পাখি যেন কবিহৃদয়ের নিকটতম প্রতিবেশী। কিন্তু এর সঙ্গে জানাশোনার পর্বটি আজো সম্পন্ন হয় নি তাঁর। তাই নিজের মতো করে একটি পরিচয়লিপি নির্মাণ করেন কবি : 'হয়তো তোমাকে চিনি, চিনি ঐ চিত্রিত তনুকা,/বিচিত্র তুলিতে আঁকা/বর্ণ সুকুমার।' ডাহুকের সুর কবিকল্পনায় সুরায় পরিণত হয় এবং সেই সুরাপানে রাত্রির বুকেও যেন ব্যথা গুমড়ে ওঠে। ফররুখ আহমদও এই সুরাপানে ব্যক্তিগত বেদনার ভারে নত। তাই তাঁর পুরনো ক্ষত থেকে জেগে ওঠে চিরনতুন এক দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। 'সুগভীর সুরের পাখাতে' ভর করে কবি এমন এক দেশে চলে যান যে দেশ সূর্যেরও অজানা। 'অবাধ মুক্তির মত' ডাহুকের ডাক কবিকে মনে করিয়ে দেয়, কত বিচিত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের জীবন। কবি জানেন, মনের গভীরে মুক্ত পৃথিবী না থাকলে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র সৃষ্টির সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। তাই ডাহুকের পক্ষে মুক্তির আনন্দে অবগাহন সম্ভব হলেও মানুষ হিসেবে আমরা 'নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে/তনুমন করি যে আহত।' এই অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস কেবল কবিচিত্তেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে 'বেতস লতার তারে' এবং চাঁদও তখন প্রাচীন অরণ্যতীরে আত্মগোপন করে। তখন কেবল গাঢ় অন্ধকারে মুখোমুখি বসে ব্যক্তিগত বেদনার দর্পণে নিজেকে দেখার পালা :

বেতস লতার তারে থেকে থেকে বাজে আজ আবাসের বীণা;
ক্রমে তাঁর থেমে যায়,
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায়;
গাঢ়তর হ'ল অন্ধকার।
মুখোমুখি বসে আছি সব বেদনার
ছায়াচ্ছন্ন গভীর প্রহরে।
রাত্রি ঝ'রে পড়ে।
পাতায় শিশিরে...
জীবনের তীরে তীরে...
মরণের তীরে তীরে..
বেদনা নির্বাক। ('ডাহুক')

ওপরের উদ্ধৃতিটিতে গাঢ় অন্ধকারে মুখোমুখি বসার এই দৃশ্যে পাঠকের নিশ্চয়ই জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনকে মনে পড়বে। জীবনানন্দও হাজার বছরের পথপরিক্রমায় বনলতা সেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং দুজনের এই মিলনোৎসবে পৌরোহিত্য করেছিল অন্ধকার। জীবনানন্দের নায়কের চোখেও 'সবুজ ঘাসের দেশ' জীবনের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং ফররুখের কবিতায়ও আমরা সবুজের স্পর্শ অনুভব করি। 'বনলতা সেন' কবিতায় অন্ধকার প্রকৃতিতে আলোর প্রতিভূ জোনাকির উপস্থিতি ছিল :

তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। (জীবনানন্দ দাশ ১৯৯৮ : ১৫৩)

ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' কবিতায় হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার পর কোন ক্লান্ত প্রাণের গন্তব্যে পৌঁছানোর গল্প নেই। কিন্তু যে বেদনার তিনি রূপকার তার বয়স তো হাজার বছরেরও অধিক। কবির এই দুঃখ ও দীর্ঘশ্বাস পৃথিবীর সমান বয়সী এবং তিনিও এই ব্যক্তিগত বেদনার প্রতীকারহীন পথপরিক্রমায় প্রকৃতির সঙ্গেই একাত্ম হতে চেয়েছেন।

সিরাজাম মুনীরা কাব্যে ফররুখ আহমদ প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট নন বললেই চলে। আরবের মরুপ্রান্তরে হযরত মুহম্মদ এবং চার খলিফার জীবনযাপন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার নানা নিদর্শনই এই কাব্যের মর্মবাণী। মরুভূমিতে যে সকল বৃক্ষের সাক্ষাৎ মেলে, ফররুখের কবিতায়ও তাদের মেখা মেলে, কিন্তু এই কাব্যের চরিত্রসমূহ প্রকৃতির নয়, মানুষের নিকটবর্তী। 'পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে' 'শাহানশাহের মত' মুহম্মদ মুস্তফার আবির্ভাব এবং এর প্রভাবে বাতাসের শরীরেও শিহরন জাগে। মরুভূমিতে ঝড়ের যে রূপ, ফররুখ এই কাব্যে তা ধারণ করতে চেয়েছেন।

মুহম্মদের আগমনে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, তার কিছু প্রভাব প্রকৃতিতেও লক্ষ করার মতো। ফররুখ মুহম্মদকে আলোর পাখির রূপকল্পে নির্মাণ করেছেন। পাখির গান শুনে যেমন প্রকৃতি জেগে ওঠে, তেমনি মুহম্মদের কণ্ঠস্বরে মানুষের জাগরণ ঘটেছে। যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে মুহম্মদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাঁর চরিত্রচিত্রণে সেই প্রকৃতিরও শরণ নিয়েছেন কবি। ধর্ম-প্রচারের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাতে মানুষ যেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, তেমনি বৈরী প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে প্রকৃতির নানা প্রসঙ্গ এই কাব্যে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

লু' হাওয়ায় ওড়ে মরুর কাঁকর সূর্য-শিখায় ভয়ঙ্কর,
অগ্নিদাহন তোমার কোমল তনুতে হানে সে অগ্নিশর,
ঈশান কোণের ঝড় উড়ে আসে, সাথে ব'য়ে আনে মরুর ধূলি,
কিশোর কণ্ঠ জ্বলে পিপাসায়, জ্বলে ক্ষুধাতুর পাকস্থলী, ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

মুহম্মদের জীবনবৃত্তের নানা প্রান্তে দৃষ্টি দিয়েছেন ফররুখ আহমদ। প্রতিকূল পরিবেশে ধর্মপ্রচারে মুহম্মদ যে কষ্ট ভোগ করেছেন, তার উল্লেখে কবি মরুপ্রান্তরের নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ যেমন, খেঁজুর পাতা, বাবলা কাঁটা, জয়তুন পাতা,

'তারাভরা রাত, শুক্লা প্রভাত, বিদ্যুৎ ঝড়, বিপুল গতি' ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। মুহম্মদের আগমনকে কবি প্রেমহীন পৃথিবীতে প্রেমের আবির্ভাব হিসেবে দেখেছেন এবং প্রকৃতিও সেই প্রেমের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি : 'শুক্‌নো রুক্ষ বালু ভিজে ওঠে প্রেম-অশ্রুতে পূর্ণ বুক,/শিশির ভেজানো গোলাবী পাপড়ি চায় বুলবুলি চায় মাশুক'। এই কাব্যে গোলাপ ছাড়াও নানা মৌসুমী ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে।

সিরাজাম মুনীরা কাব্যের 'খোলাফায়ে রাশেদীন' পর্বেও আরবের রুক্ষ প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন কবি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বলতে আমাদের চোখে যে-রকম সবুজ-শ্যামল-বৃক্ষশোভিত প্রকৃতির ছবি ভেসে ওঠে, সঙ্গত কারণেই সিরাজাম মুনীরায় তা অনুপস্থিত। আরবের জনজীবনের সঙ্গে সেই দেশের প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড় বলেই খলিফাদের জীবন ও কর্মের বর্ণনায় কবিকে মরুপ্রান্তরের রুক্ষ প্রকৃতির শরণ নিতে হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আমরা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' পর্ব থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. খেজুর পাতায় এনেছো শুভ্র দিন,
ক্লেদক্ষুব্ধ সে তমসা পারায়ে প্রশান্তি অমলিন!
শান্ত আকাশে শান্তি পতাকা ওড়ে,
শাদা কবুতর পার হ'য়ে ঝড় প্রশান্ত নীলে ঘোরে। ('আবুবকর সিদ্দিক')

খ. জানি না কেমন ক'রে এ-মরুতে এল সে প্রাণের ঝড়,
নিমেষে ধরণী ছেয়ে নিল অম্বর,
ওড়ে কালো সিয়া জড়তার দুর্জয় কশাঘাতে,
আঁধার, ঊষর মৃত প্রান্তর কেঁপে শঙ্কাতে... ('উমর-দারাজ দিল')

গ. বসোরা গোলাব সেথা ফুটে ওঠে, ফেটে পড়ে রসাল আনার।
গুলমোহরের ছায়া, নার্গিস আনিছে বারবার ('ওস্‌মান গণি')

ঘ. গোলাবের গান বুকে পুরে নিয়ে উড়ে আসে বুলবুল
আঞ্জির শাখে লু-হাওয়া জাগায় শীষ,
মরু আফতাব হেসে ওঠে তার পথে দেখে ওয়েসিস্‌
প্রখর রশ্মিও ক্রমে তন্দ্রা স্বপ্নাকুল। ('আলী হায়দর')

ঙ. এই আকাশের মেঘাবরণের ফাঁকে
হাতছানি দিল তারা,
কোন দুর্গম তূর পাহাড়ের ডাকে
অসহন হ'ল কারা
হ'ল অসহন পশুদের কাছে জঘন্য পরাজয়;
শিলা দুর্গমে ওড়ে মানুষের আধো-চাঁদ অক্ষয়। ('এই সংগ্রাম')

ফররুখ আহমদ *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাট্যে প্রকৃতি ও মানুষের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নেই। নাটকের প্রধান চরিত্র নৌফেল ও হাতেমের সংলাপে তাঁদের মনোজগতের বিচিত্র অনুষঙ্গ মুদ্রিত হলেও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একাত্মতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রও হাতেমের মহানুভবতা ও নৌফেলের দাম্ভিকতা প্রকাশের সহায়তা করেছে মাত্র। ইয়েমেনের বাদশা হাতেমের দানশীলতা ও সেবাপরায়ণতার নানা নজির তাদের কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে। মহানুভব হাতেমের ত্যাগের দৃষ্টান্তে নৌফেলের বোধোদয় ঘটেছে। হাতেম নৌফেলের ভয়ে নয়, বরং ঐশ্বর্যের মোহ থেকে মুক্তির সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই বনের পরিচয় তার কোন কোন সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। বনের পশুদের ভয় পায় নি সে, কিন্তু অন্য কাউকে সেখানে দেখলে তার বিপদের কথা ভেবে তাকে লোকালয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. দেখেছি প্রান্তর প্রসারিত,
মরু, মাঠ, বিয়াবান, জনপদ দেখেছি অনেক;
চিনেছি অচেনা রাজ্য, কখনো আরণ্য-অন্ধকারে
ডুবে গেছে এ পৃথিবী, ...(*নৌফেল ও হাতেম*)

খ. চলো যাই কাঠের সন্ধানে;
কিম্বা চলো ফিরে যাই ঘরে। অসংখ্য ভল্লুক, বাঘ
এ বনে লুকিয়ে আছে; আজদাহার আস্তানা এখানে। (*নৌফেল ও হাতেম*)

গ. এ অরণ্যে
জনপ্রাণী আসে না সহজে। জানি না এসেছো কেনো,
কিম্বা এলে রাহা ভুলে বাঘ ভল্লুকের বনে
বিপদ বাড়াতে শুধু। অরণ্যের পথ চিনি আমি,
সঙ্গে এসো; নিয়ে যাব নিরাপদ বস্তির সড়কে। (*নৌফেল ও হাতেম*)

উদ্ধৃতিসমূহে নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ উপস্থিত। বিত্তের দম্ভ ত্যাগ করে তা'য়ীপুত্র হাতেম বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও মৃত্যুভয়ে পিছিয়ে আসে নি সে। বরং দুর্গম অঞ্চলে অন্যের জীবন রক্ষার্থে সে এগিয়ে গেছে। হাতেমের সাহসিকতার পরিচয় পরিস্ফুট করার জন্যই কবি হাতেমকে প্রসারিত প্রান্তরে নিয়ে গেছেন। হাতেম কখনো মরুভূমির তপ্ত বালুকায়, আবার কখনো 'আরণ্য-অন্ধকারে' ঘুরেছে। যে বনে অসংখ্য বাঘ, ভল্লুক লুকিয়ে আছে সেখানেও থেমে থাকে নি হাতেমের পথ চলা। এই বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করেও হাতেম মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, যারা 'রাহা ভুলে বাঘ ভল্লুকের বনে/বিপদ বাড়াতে' এসেছে, অরণ্যের পরিচিত পথ ধরে হাতেম তাদেরকে 'নিরাপদ বস্তির সড়কে' পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ফররুখ আহমদের প্রকৃতিভাবনা *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যেই সবচেয়ে পরিস্ফুট। সনেটের সংহত অবয়বে প্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা এই কাব্যে মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি কবিতা পুরোপুরি প্রকৃতি-নির্ভর। কয়েকটি কবিতার নামকরণ থেকেই এর বৈষয়িক পরিচয় চিহ্নিত হয়ে যায়। 'কোকিল', 'ফাল্গুনে', 'বৈশাখী', 'ঝড়', 'বৃষ্টি' 'বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির পরিবর্তন কবিমনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ফররুখের অধিকাংশ কবিতায় কবির চিন্তা ও কল্পনার প্রভাব প্রকৃতির ওপর ছায়া ফেলেছে। কিংবা বলা যায়, মানুষের অন্তর্গত অস্থিরতা ও অসুস্থতার প্রতিভূ হিসেবে প্রকৃতিকে তিনি সক্রিয় করে তুলেছেন। এমনকি তিনি যখন আশার বাণী শুনিয়েছেন, কখনও প্রকৃতির মধ্যে তিনি সেই সদর্থক জীবনচেতনার প্রকাশ লক্ষ করেছেন। কিন্তু *মুহূর্তের কবিতায়* এসে তিনি প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের বিবেচনার ব্যাকরণটিকে বদলে নিতে চেয়েছেন। এই কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. বসন্তের গীতিকার কোকিল, বনের মুক্ত সুরে
খেলা করে, উচ্ছল আনন্দে তার নওবাহারের
জেগে ওঠে পূর্ণ রূপ, ছিটে পড়ে তারার হারের
সাতটি উজ্জ্বল তারা ডাক দেয় যখন বন্ধুরে। ('কোকিল')

খ. 'বনানী সেজেছে সাকী ফুলের পেয়ালা নিয়ে হাতে',
তুহিন শীতের শেষে দেখি আজ মুক্ত রূপ তার,
গাছে গাছে, ডালে ডালে তারুণ্যের জেগেছে জোয়ার; ('ফাল্গুনে')

গ. বৈশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্পন্দ যখন
নিষ্প্রাণ, যখন বিবর্ণ ঘাস বিবর্ণ, নিষ্প্রভ ময়দান,
যোজন যোজন পথ ধূলিরুক্ষ, প্রান্তর বিরান;
শুক্‌নো খড়কুটো নিয়ে ঘূর্ণী ওঠে মৃত্যুর মতন; ('বৈশাখী')

ঘ. সম্মুখে চলার পথে ওরা পিষে যাবে সমতল,
অরণ্য, শহর, গ্রাম মঞ্জিলের একাগ্র আশ্বাসে ॥ ('ঝড়')

ঙ. দিকদিগন্তের পথে অপরূপ শোভা দেখে তার
বর্ষণ-মুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,

Dhaka University Institutional Repository

রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। ('বৃষ্টি')

চ. ঘাসফড়িঙের রঙ মিশে যায় ধানের সবুজে,
শাপলা শালুকে ঘেরা সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া বিল,
বকাওলি পরী বুঝি খোলে আকাশের ঝিলমিল
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি দেয় নীলার গম্বুজে! ('বিগত')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদ প্রকৃতির কাছে ফিরে গেছেন। কবি পাখির সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, ফাল্গুনের আনন্দঘন প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুলের নেশায় চুড় হতে চেয়েছেন, বৃষ্টিহীন বৈশাখের শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলোতে তিনি ঝড়ের অপেক্ষায় থেকেছেন। এই ঝড় 'ধ্বংসের আহ্বান' হয়ে কবিহৃদয়ে সৃষ্টির আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে। 'বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি' কীভাবে পদ্মা মেঘনার বুক ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই দৃশ্য অবলোকন করেছেন কবি। বর্ষার বিষণ্ন চাঁদের সঙ্গেও মিতালি গড়েছেন তিনি। 'বৃষ্টি-ধোয়া আসমানে' দৃষ্টি মেলে কবি 'হাজার বছর আগেকার' আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। কবি অনুভব করেছেন, বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ 'শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে জাগায় ব্যথার আবেষ্টনী'। আবার আজকের এই বর্ষার বেদনা হাজার বছর পরে অন্য এক বিষণ্ন বর্ষার স্মৃতি জনপদে পৌঁছে দেবে। কবি ঘাস-ফড়িঙের মতো সবুজ ধানের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। 'শাপলা শালুকে ঘেরা সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া বিল' কবিকে নিয়ে গেছে বকাওলি পরীর দেশে। এভাবেই কবির আনন্দ-বেদনার ব্যক্তিগত উপলব্ধি নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে চেয়েছে।

ফররুখ আহমদ *মুহূর্তের কবিতায়* ট্রেনভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। ট্রেনে যেতে যেতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ অন্য রকম। যদিও প্রকৃতিদর্শনের চেয়ে ট্রেনের রূপকল্পে যান্ত্রিক জীবনের আবহ সঞ্চারেই অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন কবি। তবু 'উত্তর বাঙলার মাঠ পাড়ি' দিতে দিতে প্রকৃতিও নিশ্চয়ই কবির চোখে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে। 'ময়নামতির মাঠে' শিরোনামে চারটি সনেট লিখেছেন কবি। প্রত্যেকটি কবিতায়ই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। যদিও প্রকৃতির মধ্যে আটকে থাকেন নি তিনি, এই প্রকৃতি তাঁকে নিয়ে গেছে জ্বিনের শা'জাদার কাছে। কখনো মাঠের দিকে তাকিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতাকেও নেড়েচেড়ে দেখেছেন কবি। ময়নামতির মাঠের মাটির কান্না শুনেছেন কবি এবং তিনি অনুভব করেছেন, মাটির বেদনায় আকাশের চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে :

মাঠের সীমান্ত ঘেঁষে যেখানে প্রাচীন ঝাউগাছ
(নির্জন পথের ফৌজ) বাতাসের শোনে দীর্ঘশ্বাস
যেখানে সমস্ত দিন নদীতীরে খঞ্জনের নাচ,
যেখানে মাটির কান্না সারাক্ষণ কাঁদায় আকাশ; ('ময়নামতীর মাঠে/এক')

বর্তমানের সবুজ মাঠ কবিকে কেবলই অতীতের নানা গল্প ও ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। তিনি নিজেই যেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ময়নামতির মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে রূপকথা ও লোকথার রাজপুত্রেরা। তখন তিনি অনুভব করেন, 'সমস্ত মাঠের বুক বিক্ষত ঘোড়ার পদতলে'। মাঠের সবুজে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে তিনি সোনালি অতীতে ফিরে গেছেন বারবার।

মুহূর্তের কবিতায় নানা প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্থাপনা অবলম্বনে ফররুখ আহমদ কবিতা লিখেছেন। 'মোতিঝিল', 'জিঞ্জরা', 'লালবাগের কেল্লা', 'সোনার গাও : একটি প্রাচীন স্মৃতি' ইত্যাদি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কালের চিহ্ন বুকে ধারণ যে সকল ঐতিহ্য ও স্থাপনা আজও দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর সেকাল একালের নানা পরিচয় উন্মোচনে কবি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন। দু'টো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. তাই বালুচরে অথবা শহরে
চৈত্রতপ্ত দিনে যা'রা বেঁধেছিল একদা মৌচাক
উড়ে যায় তারা আজ বহু দূরে পথে বনান্তরে॥ ('মোতিঝিল')

খ. দোয়েল, শ্যামার সাথে বুলবুল উঠেছিল ডেকে
চামেলি, যূথীর বনে, কেতকীর নিবিড় ছায়ায়। ('সোনার গাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি')

ফররুখ আহমদের 'নদীর দেশ' ও 'ধানের কবিতা' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। 'নদীর দেশ' কবিতায় ফররুখ বলেছেন, নদীমাত্রিক বাংলাদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই একদিন এখানে জালালী দরবেশের আগমন ঘটেছিল। কবি তাঁর জন্মভূমির প্রাকৃতিক প্রশান্তির মধ্যেও নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস সংস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাই বাংলাদেশের মাটির পবিত্রতা প্রমাণের জন্য এদেশের নদীকে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। 'ফররুখের একান্ত কামনা ছিলো, বাংলার আউশ ধানের ক্ষেতে আবার মদিনার সৌরভ নিয়ে আসা।' (মোহাম্মদ আজরফ ১৯৮৮ : ১৫)। 'ধানের কবিতা'য় আমরা লক্ষ করি, বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া বিচিত্র ধানের নাম করেছেন কবি। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর/আটলাই, পাশপাই ধান'সহ আরো অনেক ধানের নাম করেছেন কবি। কৃষকের আনন্দ কীভাবে ফসলের মাঠে দোল খেয়ে যায়, তা চমৎকারভাবে কবিতাটিতে মুদ্রিত। দু'টো কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. পদ্মা মেঘনার দেশ; চিত্রা, হেনা, তিতাসের দেশ
        –যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলি, কপোতাক্ষী আর
        গোমতী, যমুনা, তিস্তা, মধুমতী, হরিণ–ঘাটার
    বহমান গতিস্রোত খুঁজে ফেরে পূর্ণতা অশেষ
    অসংখ্য নদী ও নদে যে দেশের মাঝি নিরুদ্দেশ
        গেয়ে যায় ভাটিয়ালি, ...('নদীর দেশ')

খ.   আউশ ধানের স্বপ্নে কিষাণের তপ্ত দিন কাটে;
    আমনের বন্যা আনে ফসলের সম্পূর্ণ জোয়ার।
    শোকর-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার
        গোলায় তোলে সে ধান- রূপ সা'ল, তিলক কাচারী,
        বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর– মাঠের ঝিয়ারি
    কৃষক-পল্লীতে আনে পরিপূর্ণ সুরের সম্ভার। ('ধানের কবিতা')

হাতেম তা'য়ী কাব্যেও ফররুখ আহমদ প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। হুসনা বানুর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হাতেম যে সকল অভিযান চালিয়েছে এবং তাতে যে বিচিত্র প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে তাতে প্রকৃতির অংশগ্রহণও উল্লেখ করার মতো। কখনো কখনো প্রকৃতির সঙ্গে কথোপকথনেও লিপ্ত হয়েছে হাতেম। হাতেমের বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রমাণের জন্য প্রকৃতির অনেক অনুষঙ্গই তার সঙ্গে বৈরী আচরণ করেছে। কিন্তু হাতেম হাল ছেড়ে দেয় নি। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সকল প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে গেছে সে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. সংখ্যাহীন মাঠ আর বেশুমার বিয়াবান ঘুরে
    দুর্গম পাহাড় শেষে অরণ্যের সুপ্ত অন্তঃপুরে
    মুনীর শামীর সাথে শাহাবাদ পৌঁছিল হাতেম। ('শাহাবাদে')

খ. এই কথা ভেবে মনে পাড়ি দেয় প্রান্তর, ময়দান,
    তারপর দেখে এক অন্তহীন মরু অফুরান,
    পড়ে না সীমানা চোখে, চার দিকে ঘূর্ণির দাপট,
    পায় না প্রাণীর দেখা, শোনে না সে পাখার সাপট,
    পাখীরা মেলে না পর রৌদ্রতপ্ত মরুর আকাশে,
    লু হাওয়ার অগ্নিশ্বাস দূরান্তর হতে ভেসে আসে,
    বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই, যেন এক হতাশা ভীষণ,
    হাওয়ার প্রশ্বাসে শুধু আহাজারি করে সারাক্ষণ। ('দূরের পথে')

গ. পাহাড়তলীর প্রান্তে সেখানে সবুজ গালিচা বিছানো,
    –সবুজ ঘাসের শিষ দোল খায় নওবাহারের আবেশে;
    ফুল ফুটে ফুল ঝরে না কখনো নিভৃত বন বিজনে! ('পরীর দেশে')

ঘ. হেনার সুরভি ক্ষরে গ্রীষ্মতপ্ত বনের সীমায়;
    নামে সন্ধ্যা স্বর্ণচামেলির মধুগন্ধী মেওয়াজাত

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্জির, আনার, সেব পূরে ওঠে রসের সঞ্চয়ে,
গন্দম, ধানের ক্ষেতে স্বর্ণশীষে জমা হয় এসে
মুক্তা দানা ফসলের; শেষ হলে সোনালি মৌসুম
ঝরে যায় মাটিতে। ('সফর-নামা')

ঙ. প্রাচীন গাছের প্রাচীন শাখার 'পরে
পক্ষীযুগল নিল রাতের বাসা,
রাত কাটাবে সেই প্রশাখার নীচে
হাতেম তা'য়ীর জাগলো মনে আশা। ('পাখীর আলাপ')

উদ্ধৃতিসমূহে হাতেমের যাত্রাপথের পরিচয় দিতে গিয়ে ফররুখ আহমদ নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন। কেবল পৃথিবীর প্রকৃতিই নয়, পরীর দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। আবার জীবনের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াসেও তিনি জীবনকে প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানের সঙ্গেই সমীকৃত করেছেন। যেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে, সেখানে প্রকৃতির সজীবতাও উপস্থিত। তাই হাতেম তা'য়ীর প্রতিটি অভিযানেই তিনি প্রকৃতির নিকটবর্তী থেকেছেন।

ফররুখ আহমদ *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ছাড়া আর কোথাও প্রকৃতি-নির্ভরতার প্রয়াস দেখান নি। ফররুখের কাব্যাদর্শ তাঁর জীবনাদর্শের সমান্তরালে প্রসারিত। তাঁর কবিতায় আমরা যে জীবনাদর্শের রূপায়ণ লক্ষ করি তা কবির ধর্মবিশ্বাস থেকে উৎসারিত হলেও মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় জীবনের প্রকাশ প্রবল এবং জীবনের সজীবতাকে তিনি প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গেই প্রাণবন্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

সময়-সমাজ-রাজনীতি

শিল্পসাহিত্যে সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা বিষয়ে অনেক সমালোচকের আপত্তি প্রবল হলেও শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পস্রষ্টাকে তাঁর স্বকালের কাঁধে ভর দিয়েই দাঁড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে গিয়েও স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর 'দেশকালের প্রাণগত সম্মিলন আছে' বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তাঁর মতে, স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর স্বকালের উদ্দেশ্যের পরিস্ফুটন ঘটে এবং সময়ের এই অভিপ্রায় সর্বদাই সুপ্রকাশিত নয়। (২০০৬ : ৪/৭৯২)। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ শিল্পকর্মেরই এ এক সাধারণ কুললক্ষণ। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'শিল্পীর রচনা সাময়িক প্রসঙ্গকেই অবলম্বন করবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাময়িক যেখানে দেশকাল অতিক্রম ক'রে চিরকালের পটভূমিকায় দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, সেখানেই আমরা শিল্পকলার মহত্তম পরিচয় পাই।' (১৯৫৯ : ২৫)। একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণাও তাঁর স্বকালের পটভূমিতেই পরিস্ফুট বলে মনে করেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে, একজন লেখকের প্রধানতম অবলম্বন তাঁর স্বদেশ ও স্বকাল যেখানে তিনি 'বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন' অনুভব করেন। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ২৯)। একজন কবিও সমাজের আর দশজন মানুষের মতো বিচিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেই কাব্যচর্চা করেন এবং সেই জীবনযাপনের নানা চিহ্নও তাঁর শিল্পকর্মে ছায়া ফেলে। যদিও 'সামাজিক হিসাবে কবির দায়িত্ব শুধু পরিবেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে কিংবা ঐতিহ্যের রূপায়ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অমর অংশের জন্যে উপাদেয় উপজীবিকা সরবরাহ করাই বরং তার শ্রেষ্ঠ করণীয়।' (মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯৮৮ : ৩৬৫)। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও স্বকাল ও সমাজ সংলগ্নতার নানা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ 'বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এই ভূখণ্ডের বাঙালি জাতির অস্তিত্ব, রাজনৈতিক পরিচিতির জটিলতা, বহুবিভক্ত গোষ্ঠী-শ্রেণিকে একটি ধর্মীয় সংস্কৃতিতে– তা অবশ্য রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের মধ্যেই, সমতলিক করে তোলার ঐতিহাসিক ক্ষণটি তাঁর কবিতায় বিধৃত।' (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১৫)। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ফররুখের জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং শিল্পসাধনা, সেই সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিশেষত্ব চিহ্নায়নের প্রয়াসেও আমরা তাই তাঁর কবিতার ওপরই নির্ভর করতে চাই।

ফররুখ আহমদ অস্থির-অশান্ত-অসংস্থিত স্বকাল থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ ধর্মাদর্শে সমর্পিত হয়েছেন এবং এই আদর্শের অনুকূল আবহ সঞ্চারের শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে তিনি অতীত-ঐতিহ্যে অবগাহন করেছেন। 'ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যে অবগাহন করেছিলেন সত্যি, কিন্তু সমকালীন সমাজ, বিশ্বপটভূমি এবং জাতীয় জীবনের ঐকান্তিক অনুভব তাঁর মধ্যে যুগপৎ স্পন্দমান থেকেছে। তাঁর এই ঐতিহ্যনির্ভরতা শুধু শেকড়সন্ধানী নয়, প্রকৃতি যুক্তির অঙ্গীকার অর্জনের নিবিড় অনুষঙ্গ।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০২ : ৮৭)। ফররুখ স্বকালের বৈনাশী বাস্তবতার নিয়ামকসমূহকে জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করেছেন। যে কালখণ্ডে লেখকের নির্ভীক পদক্ষেপ, তারও সামান্য অংশেই তাঁর অধিকার জন্মে। 'অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা,/কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?' ('শেষ কথা'/*মুহূর্তের কবিতা*)– ফররুখের এই উচ্চারণে একজন শিল্পীর সীমাবদ্ধতা সুচিহ্নিত হলেও সময়কে নিবিড়ভাবে পাঠ করার অভিপ্রায়ও এতে মুদ্রিত। ইতিহাসের নিবিড় পাঠক ছিলেন তিনি। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ অনুভব করেছেন কবি। 'ইতিহাসের দীর্ঘ সড়কে তিনি বিচরণ করেছেন সজাগ মুসাফিরের মতো। উদ্ভ্রান্ত হন নি কখনো, বরং ঐতিহ্যের মূল স্রোতধারায় তিনি অবগাহন করে আপন সত্তাকে জাগ্রত করায় হয়েছেন ব্যাপৃত।...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল থেকে তাঁর লেখনী হিমাচলের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাতে ঝঙ্কৃত হয়েছে আমাদের চেতনার মূল সুর। তা মুসলিম বাংলার মন ও মানসকে নবায়ন করার প্রেরণা জুগিয়েছে।' (হাসান আবদুল কাইয়ুম ১৯৮৮ : ৫৫৮)। ফররুখের রাজনীতিসচেতনতাও প্রকৃত অর্থে কবির সময় ও সমাজ-সম্পৃক্ততারই ফল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে ফররুখ যে কাব্যাদর্শ সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাও কবির তীব্র স্বকাল-সংলগ্নতা এবং সমাজ-সম্পৃক্ততা থেকেই উৎসারিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করি একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> কবি ও রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা এক নয়। সমাজ থেকে অবশ্য কবিকে বিচ্ছিন্ন হলেও চলে না। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবির কবিতা কাগজের ফুল; প্রাণের সজীবতা তাতে অনুপস্থিত থাকে। রাজনীতিকের যে সমাজ-চর্চা পরিবেশের তাৎক্ষণিকতাকে অবলম্বন করে, কবি সেই সমাজের সংগে লগ্ন থাকার জন্যেই ঐতিহ্যকে ধরে থাকেন, তাই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি জীবন-নিরপেক্ষ অতীতের কাহিনী-বিলাস নয়। জীবনের প্রয়োজনেই কবিকে ঐতিহ্য-সংলগ্ন হতে হয়। রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা ও আশু কার্যসিদ্ধির সত্বরতা, কিংবা ধর্মগুরুর বৃত্তাবদ্ধ নীতি নিয়মের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও, কবির কাছে তেমন কার্যসিদ্ধি তুচ্ছ ব্যাপার। (মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯৮৮ : ৩৬৩-৬৪)

সাত সাগরের মাঝি ফররুখ আহমদের কালসচেতন ও সমাজসম্পৃক্ত কবিসত্তার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশে' নিবেদিত এই কাব্যের শুরুতেই উৎসর্গপত্র হিসেবে একটি সনেট জুড়ে দিয়েছেন ফররুখ। এই কবিতায় তিনি আল্লামা ইকবালের দীপ্তিকে তুলনা করেছেন সিকান্দার শাহার সঙ্গে। 'নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা'– কবি ইকবালের উদ্দেশে ফররুখের এই উচ্চারণ থেকে এই কাব্যের মৌল সুরটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ফররুখও নতুন পথের অন্বেষণেই অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই নতুনের অন্বেষণে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন, অতীতের প্রতি বিমুখ হলে বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় না এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করার শক্তিও অর্জিত হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের *কণিকা* কাব্যের 'চালক' শীর্ষক কবিতাটি :

> অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
> অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
> সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
> সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৩/৭৫)

ফররুখ আহমদ আলোকিত আগামীর অন্বেষায় তাঁর 'পশ্চাতের আমি'র সঙ্গে সম্পর্কসেতু নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। 'সাধারণভাবে মুসলমানদের নবজাগরণের জন্যে তিনি অতীত থেকে প্রেরণা লাভ করলেও বাস্তবে কিন্তু তিনি অতীতমুখী নন। অতীতের পুনরুজ্জীবন নয়, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পানে অভিযাত্রার স্বার্থে অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল

দিনগুলো থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণই তাঁর কাম্য।' (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ৩৭৭)। আর এ কাজে অন্যতম প্রেরণাসঞ্চারক চরিত্র হিসেবে আরব্য-উপন্যাসের নায়ক সিন্দাবাদের সাহচর্য দারুণভাবে উপভোগ করেছেন কবি। ফররুখ তাঁর আপন চৈতন্যের সারাৎসারকে সিন্দাবাদের রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন। "সিন্দাবাদ বীর, সাহসী, সংগ্রামী, অকুতোভয় যোদ্ধা নেতৃত্বের প্রতীক। উপমহাদেশের মুসলিমদের নৈরাশ্য-ধূসর জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য যে সাহসী নেতার প্রয়োজন ছিল 'সিন্দাবাদ'-এ তারই স্বরূপ রূপায়িত করা হয়েছে। আরব্য রজনী থেকে ফররুখ এই বীর নায়কের নির্বাচন করেন।" (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১৭৮)। সিন্দাবাদের দুঃসাহসী অভিযানকে তিনি স্বকালের বৈরী বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ লোনা দরিয়াসম বৈরী পরিবেশের সকল বিপত্তির কালো রাত পাড়ি দিয়ে এ নাবিক যাত্রা শুরু করেছিলেন 'হেরার রাজতোরণ'-এর উদ্দেশ্যে। দূরবিস্তারী লোনা দরিয়ারি হু হু বাতাসে আমাদের কানে ভেসে আসছিল সে নাবিকের অসহিষ্ণু আর্তনাদ– 'রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী?' বলা বাহুল্য, আমাদের স্বপ্নরাজ্যের সে নতুন দুঃসাহসী সিন্দাবাদ ছিলেন এ যুগের ব্যতিক্রমী কবিকণ্ঠ ফররুখ আহমদ। (মুহিউদ্দীন খান ১৯৮৮ : ১৭৮)

যে সিন্দাবাদকে আমরা ফররুখ আহমদের কবিতায় উপস্থিত হতে দেখি, সে সিন্দাবাদ অতীতের সকল শক্তি ও সমৃদ্ধিসমেত নতুন অবয়বে নির্মিত। সিন্দাবাদের হাতে আমরা যে আলোর মশাল দেখতে পাই, তা বর্তমানের কালো রাত্রি ভেদ করে একালের বিভ্রান্ত পথিককে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে– এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন লক্ষ করি ফররুখের কবিতায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ! ('সিন্দবাদ')

খ. নিপুণ হাতের বলিষ্ঠ পেশী যদি প'ড়ে যায় ছিঁড়ে
তবে দুরন্ত বদলায়ে নাও হাত,
এক লহ্‌মার গাফলতে জেনো এই মৃত্যুর তীরে
ডোবালে অতলে প্রবল ঝঞ্ঝাঘাত।
বল্‌গা টানো এ ফেনিলাবর্তে
পার হয়ে এই ঝড়
সমুদ্র থেমে সমুদ্রে ঘুরে পথ খুঁজে পাবে তাজী! ('বা'র দরিয়ায়')

গ. কালো মওতের মুখোমুখি হ'য়ে জংগী জোয়ারে ফিরে
দরিয়া-সোঁতায় টেনে তুলি চলো তুফানের মাতামাতি।
ভুলে যেও না এ মাল্লার জিন্দিগী,
শুরু করো ফের নতুন সফর আজি,
দেখ, মাস্তুলে জ্বেলেছি নতুন বাতি;
মৌসুমী-হাওয়া পাল ভ'রে ওঠে বাজি। ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা বৈরী বাস্তবতার বিবরণ লক্ষ করি। সিন্দাবাদের সাহসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে তা থেকে উত্তরণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন কবি। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি সিন্দাবাদকে নতুন দিনের স্বপ্ন জাগানিয়া হিসেবে নির্মাণ করেছেন। আকাশের নতুন চাঁদ, দরিয়ার দামাল জোয়ার এবং নতুন পানি কবির ইতিবাচক জীবনার্থে সমর্পিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। উদ্ধৃতি খ-এর মর্মকথাও পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থার রূপায়ণ। এখানে কবি যে মৃত্যু-উপত্যকার কথা বলেছেন, তা কেবল কবির স্বকালের সাধারণ মানুষের মৃত্যুই নয়, মনুষ্যত্বের মৃত্যুরও স্মারক। তাই বাধা অতিক্রম করে কবি দরিয়ার তাজীকে গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগিদ দিয়েছেন। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও 'কালো মওতের মুখোমুখি' দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অন্ধকার ভেদ করে আলোর দিগন্তে পৌঁছানোর প্রত্যাশাই এখানে নতুন সফর ও নতুন

বাতির রূপকল্পে উদ্ভাসিত। মৌসুমী হাওয়ায় পাল ভরে ওঠার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। এই হাওয়াও আমাদের নতুনের কেতন ওড়ানোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

ফররুখের কবিস্বভাবের অনুকূল আবহ সঞ্চারে সিন্দাবাদ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। সহজ স্বাভাবিক ঝঞ্ঝামুক্ত জীবনযাপনের মধ্যে যে আপসকামী মনোভাবের প্রকাশ থাকে, ফররুখের জীবন ও কর্মে তা যেমন অনুপস্থিত, তেমনি তাঁর কাব্যসাধনায়ও তিনি এক দুঃসাহসী কবিব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর শিল্পকর্মে সিন্দাবাদ ঘুরেফিরে এসেছে। হাতেম তা'য়ীকে নিয়ে একাধিক কাব্যই শুধু রচনা করেন নি, তাঁর অন্যান্য কবিতায়ও তিনি বারবার হাতেমের শরণ নিয়েছেন। এই দুই চরিত্রের দুঃসাহসী অভিযানের প্রতি ফররুখের মুগ্ধতা থেকে আমরা তাঁর কবিস্বভাবের ধরনটিও অনুধাবন করতে পারি। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> বিশ্বসাহিত্যের অন্য একটি চারিত্রলক্ষণ ফররুখ-কাব্যে প্রতিভাসিত। তা হচ্ছে এ্যাডভেঞ্চার, একটা যাত্রা, অভিযাত্রা, ভ্রমণ। ফররুখ আহমদের প্রথম ও শেষ নায়ক, সিন্দাবাদ ও হাতেম তা'য়ী, দুজনই অভিযাত্রিক। এই-যে বৃহৎ কল্পনা, অভিযাত্রা, এরই মধ্যে ফররুখের রোমান্টিকতা ও আদর্শিকতার এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে। বৃহতের জন্যে এরকম তৃষ্ণা তিরিশ-পরবর্তী কবিতায় দুর্লভ। এই দুর্লভতাই কবি হিশেবে ফররুখ আহমদের মহত্ত্বকে চিনিয়ে দ্যায়। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৫ : একত্রিশ)

ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যে বিপর্যস্ত বর্তমানের বিরুদ্ধে কেবল সংগ্রামের কথাই ব্যক্ত হয় নি, সংগ্রাম-উত্তর শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রত্যাশাও সেখানে প্রতিভাত। জীবনের সজীবতা ও সচলতা তাঁর কবিতায় সফর হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। জীবন তাঁর কবিতায় নদী নয়, বরং বিক্ষুব্ধ দরিয়ার রূপকে ধরা পড়েছে। গন্তব্যের প্রত্যাশাকে কবি বন্দর ও নিশানের রূপকল্পে নির্মাণ করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতায় বন্দর ও নিশানের উপর্যুপরি ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, গন্তব্য নির্দিষ্ট না হলে পথিকের পথচলায় আনন্দ থাকে না। তাঁর মতে, মানুষের জীবনে যে হাহাকার ও অশান্তির কালো ছায়া নেমে এসেছে, তার কারণ মানুষ গন্তব্যে পৌঁছানোর সঠিক নির্দেশনা অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে কবির এই অনুভবের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

ক. কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিক্‌না সরে,
তবু সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে, ('সিন্দবাদ')

খ. এবার কোথায় কোন্ বন্দরে মাঝি!
ভিড়বে কিশ্‌তী মুখ?
থামবে কোথায় দরিয়ার শাদা তাজী? ('বা'র দরিয়ায়')

গ. পার হয়ে কত এসেছি নিরালা দরিয়ার বিভীষিকা
মাস্তুলে ফিরে জ্বালায়েছি দেখ সফরের শিখা... ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

ঘ. ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির! ('বন্দরে সন্ধ্যা')

ঙ. হে নিশান-বাহী! আজো সম্মুখে রাতের সীমা,
দৃষ্টি রোধে কি তিমিরাচলের ঘন গ্লানিমা? ('হে নিশান-বাহী!')

চ. নিশান আমার! নিশান আমার!
এতদিনে হ'ল সময় তবে? ('নিশান')

ছ. এখানে তোমার নিশান ওড়াও, নিশান ওড়াও বীর,
এখানে শুধুই আবছায়া রাত্রির ('নিশান-বরদার')

জ. কোন্ অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ, ('সাত সাগরের মাঝি')

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদ বিপন্ন বর্তমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমৃদ্ধ ও আলোকিত আগামী নির্মাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানের বৈরী বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবনের সহায়কশক্তি হিসেবে তাঁর কবিতায় অতীতের নানা অনুষঙ্গের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। তাঁর কবিতার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হলেও মাঝি-মাল্লারের চোখে থাকে অনুপম স্বপ্ন এবং বুকে

থাকে অসীম সাহস। তাই তারা নিশানের দিকে দৃষ্টি রেখে বন্দরে নোঙর করতে চায়। মাঝির উদ্দেশ্যে কবি বলেন, অশুভ শক্তি 'বিষাক্ত ক'রছে তোমার নুয়ে পড়া আকাশেরে', তবু তাঁর সাত সাগরের মাঝির 'কপাটে মানুষের হাহাকার' এবং 'ক্ষুধিত শিশুর কান্না' এসে আছড়ে পড়ে। কবির বিশ্বাস, এই দুঃসময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাঁর মাঝিকে বন্দরে পৌঁছে যাবে।

ফররুখ আহমদ *সাত সাগরের মাঝি* কাবের অধিকাংশ কবিতায় স্বকালের অন্ধকারকে অতীতের উজ্জ্বল দিনের সাপেক্ষে উপস্থাপন করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় সেকালের মধ্যাহ্ন সূর্যের পাশাপাশি একালের অস্তগামী সূর্যের রূপকল্প নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অস্তগামী সূর্যই কেবল নয়, সূর্যহীন অবস্থা, অর্থাৎ অন্ধকার, কালো কিংবা রাত্রির প্রসঙ্গও তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর সংলগ্নতা থেকে তিনি স্বকালকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করেছেন। ফররুখের কবিতায় একালের দুঃসহ দিন-রাত্রির অভিজ্ঞতা সেকালের উজ্জ্বল দিনের সাপেক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. দিনের আকাশে এ কি জুলমাত মাঝি?
ঐ দেখ আসে মউজের পর মউজের কালো সারি; ('বা'র দরিয়ায়')

খ. দেখছো কেবল তৃষ্ণায় ভরা কালো রাত্রির বিষ–
সূর্যোদয়ের পথে দেখ নাই মিঠে পানি; ওয়েসিস।
ডুবে গেছে চাঁদ? আঁধারে যায় না দেখা? ('আকাশ-নাবিক')

গ. এই সব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার–
খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়
অন্ধকার বালিয়াড়ি, তলদেশে যাত্রীরা নিশ্চল,
মৃত্যুর কুয়াশা মাঝে বিবর্ণ তুহিন তনুতল ('এই সব রাত্রি')

ঘ. আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী,
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী। ('পাঞ্জেরী')

ঙ, সূর্য আজ ডুব দিল অক্সাসের তটরেখা পারে
আসন্ন সন্ধ্যার কালি নিয়ে এল পুঞ্জীভূত শোক,
পাহাড় ভুলের বোঝা রুদ্ধপথে দাঁড়ালো নির্মম। ('স্বর্ণ-ঈগল')

চ. হে নিশান-বাহী! ওড়াও তবুও ওড়াও
হেলাল রশ্মি আকাশে আকাশে ছড়াও। ('হে নিশান-বাহী')

ছ. কার হাতে তুমি সওয়ার হ'য়েছ আল হেলাল?
আরাফাত মাঠে প'ড়ে আছে ম্লান নাই বেলাল! ('নিশান')

জ. উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হ'য়েছে। তবু জাগলে না? ('সাত সাগরের মাঝি')

সাত সাগরের মাঝি কাব্যে ফররুখ আহমদ সমসাময়িক অস্বস্তি ও অস্থিরতাকে কেবল অতীত ও ঐতিহ্যের আলোকেই উপস্থাপন করেন নি, কোন কোন কবিতায় সরাসরি বর্তমানকেই অবলম্বন করেছেন তিনি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে প্রগতি-কবিতার যে ধারা বহমান ছিল, ফররুখের কয়েকটি কবিতাকে সেই ধারার সমান্তরালে পাঠ করা যায়। যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন, এই কবিতাগুলোতেও তার প্রতিধ্বনি অনুপস্থিত নয়। বিশৃঙ্খল বর্তমানের বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়ানো এবং স্বকালের অসুখ ও অস্থিতিশীলতার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়ায় কবিতাগুলো লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা। এই কাব্যের 'লাশ' এবং 'আউলাদ' শীর্ষক কবিতা দুটোকে আমরা এ জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। "আউলাদ' ও 'লাশ' ইত্যাদি কবিতায় মানবতার বিপর্যয়ের জন্যে হাহাকার এবং ক্ষুধাতুর মানুষের জন্যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে

মানবতাবিরোধী শোষক-সমাজ ও সভ্যতার প্রতি অভিশাপ।" (মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৬৫)। ফররুখ আহমদ এই কবিতাদ্বয়ে ভোগবাদী মানুষের পাশবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ফররুখের 'লাশ' কবিতাটি ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর স্বকালের সকল কবিকেই তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই সময়ের প্রত্যেকের কবিতায়ই আমরা এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং এর কারণ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস লক্ষ করি। 'বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে প্রভেদটা বুঝেছিলেন ভালো করেই। সেই বোধ কম বেশি প্রকাশ পেয়েছে এঁদের সৃষ্টিতে। সরকারের প্রতি এঁরা ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, মজুতদারদের প্রতি ঘৃণা। জেনেছেন, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েছে মানবতা। কিন্তু এও তাঁরা দেখেছেন যে, মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বারেবারেই। ভাবতে চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে মানবতাই।' (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ১০৮)। মানতার বিজয়ে বিশ্বাসী হয়ে কেবল চিহ্নায়নে মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি তাঁরা, কেউ কেউ এই মানবসৃষ্ট দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৯৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), মনীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০৩) প্রমুখ কবিও এই মন্বন্তরকে কবিতায় ধারণ করেছেন। 'মন্বন্তরকালীন পরিস্থিতি ও মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশায় অভিভূত কবিকুলের হৃদয়বেদনা এ-সমস্ত কবিতায় উদ্ঘাটিত।' (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ১৮০-৮১)। বাংলাদেশের কবিতায়ও আমরা দুর্ভিক্ষের দুঃসহ দিনগুলোর রূপায়ণ লক্ষ করি। আহসান হাবীব এই বিপর্যয়কে কবিতায় ধারণ করেছেন। অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের জীবনরক্ষার লড়াইকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন তিনি। বন্দে আলী মিয়া (১৯০৮-১৯৭৯), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২), আবুল হোসেন (জ.১৯২২), মতিউল ইসলাম (১৯১৮-) প্রমুখ কবিবৃন্দের সৃজনকর্মেও এই বিপর্যয়ের সংহত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। ফররুখ আহমদের 'লাশ' এ ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'বস্তুতঃপক্ষে তের শ' পঞ্চাশ ফররুখকে মানুষ সম্বন্ধে শুধু নতুন ধারণাই দেয়নি মানুষের সভ্যতার গুণাগুণ পরিমাপ করার নতুন চোখও দিয়েছিল। ইতিহাস পড়লে বা জানলে মোটামুটি আঁচ করা যায় যে তের শ' পঞ্চাশের কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বিদেশী শাসন এবং পরাধীনতাজনিত কারণে মানুষের মানবিক চেতনার সুপ্তিমগ্নতা।' (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১০৮-১০৯)। ফররুখ এই কবিতায় মন্বন্তরের ভয়াবহতাই কেবল নির্দেশ করেন নি, সেই সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের মুখোশও উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষ-রূপী শয়তানদের কলুষিত আত্মার নোংরামি আর নষ্টামির চিত্র তিনি এই কবিতায় ধারণ করেছেন। ফররুখের 'লাশ' কবিতাটি থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থাপন করছি :

ক. জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে
নিসাড় নিথর,
পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর ('লাশ')

খ. পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার,
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,
মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর;
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর 'পর।('লাশ')

গ. কার হাত অনায়াসে শিশু কণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন্ সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?

কোন্ সভ্যতার?
মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছে পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,
জনতান সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠি অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে যাও পথ-প্রান্তে নর্দমার পাশে। (‘লাশ’)

ঘ. হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতোমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ॥ (‘লাশ’)

ফররুখ আহমদ দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের অদূরদর্শিতা, অবহেলা ও অবজ্ঞার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব, ভোগবাদী মানুষ এবং সমাজ-সভ্যতাকে অধিক দায়ী করেছেন। এই কবিতায় মুদ্রিত সভ্যতা তাঁর কাছে ‘স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা’, জড়পিণ্ড নিঃস্ব সভ্যতা, ‘জড়-সভ্যতা’, ‘মৃত-সভ্যতা’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফররুখের ‘লাশ’ কবিতা-বিষয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

> ফররুখ আহমদ তাঁর ‘লাশ’ কবিতায় শুধু দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের অসহায় করুণ অবস্থার ‘ফটোগ্রাফিক’ চিত্র রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর আন্তরিক আবেগ অনুভূতি ও চেতনা দিয়ে মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। তাঁর কবিতায় ঘৃণা ও ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে জড়সভ্যতা এবং পুঁজিবাদী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে। তিনি আগামী দিনের অর্থাৎ নির্যাতিত নিপীড়িত ও বুভুক্ষু মানুষের উত্থান এবং অগ্রযাত্রার দিনে, এই জড়সভ্যতা ও পুঁজিবাদ শোষক সমাজকে ‘জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে’ টেনে নিয়ে যাবার কথাও দৃঢ় ও বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। (মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ১৯৭৮ : ২২৯)

ফররুখ আহমদের ‘আউলাদ’ শীর্ষক কবিতাটিতেও আমরা ‘এ বীভৎস সভ্যতার’ চিত্রায়ণ লক্ষ করি। ‘লাশ’ শীর্ষক কবিতায় বিম্বিত নর-পিশাচদের হীন প্রবৃত্তির প্রকট রূপটিই এতে মুদ্রিত হয়েছে, যা দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে উৎসারিত। কবিতাটির প্রথম দুইটি স্তবকে দুর্যোগের ভয়াল কালো রাত্রি অতিক্রম করার প্রত্যাশা উচ্চকিত এবং এই উত্তরণের প্রেরণা-সঞ্চারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ‘বিজয়ী সিন্দবাদ’কে ফিরিয়ে এনেছেন। তারপর সিন্দাবাদের চোখে তিনি তুলে ধরেছেন ‘দুর্গম সমুদ্র পারে আরেক অচেনা লোক’, যেখানে মানুষের ঘর মানেই জীবন্ত কবর, ‘যেখানে বাসা বেঁধে আছে দাম্ভিকের মৃত মরু মন’। আশাবাদী কবি তবু মানুষকে গাঁইতি, শাবল, কলম, লাঙল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেন যারা ‘পার হ’য়ে মরু, মাঠ, বন’ পৌঁছে যায় ‘মানুষের আদালত ঘরে’, কারণ সেই ঘরে কবি লক্ষ করেছেন ‘পাথর-জমানো প্রহসন’। এই কবিতার পরের অংশকে অনায়াসে ‘লাশ’ কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

ক. দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে,
কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার শড়কে বিপথে
যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ
তারি পানে, দুর্নিবার টানে চলে আজ মানুষের

দুর্বল, বিশীর্ণ আউলাদ।
আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা। ('আউলাদ')

খ. বাড়ায়ে ত্রস্তের দল, বাড়াবে ভ্রষ্টের দল,
নর-ঘাতকের সাথে, নারী-ঘাতকের হাতে
হ'ল এরা শোণিত-চঞ্চল
হ'ল এরা জালিম, নিষাদ,
মানুষের অমানুষ মৃত আউলাদ। ('আউলাদ')

গ. অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির নীচে, অনেক সামুদ
কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ
মিশে গেল ধূলিতলে
নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দুর্গম উপলে
উড়ায়ে নিশান
সাথে ক'রে নিয়ে এল জীবনের অ-শ্রান্ত তুফান। ('আউলাদ')

ফররুখ আহমদের কালসচেতনতা এবং সমাজসংলগ্নতার স্বাক্ষর তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও দুর্লক্ষ্য নয়। বলা যেতে পারে, *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের ফররুখ আহমদই ভিন্ন অবয়ব ও আয়োজনে তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত। তিনি যখন ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করেছেন, তখন তিনি সেই কালের আলোকিত দৃশ্যাবলির সঙ্গে একালের সামাজিক-রাজনৈতিক অসুস্থতা ও অস্থিরতার চিত্রাবলি জুড়ে দিয়েছেন। ফররুখের 'সিন্দবাদ' কবিতার সমসাময়িককালে রচিত *সিরাজাম মুনীরা* কাব্যের কবিতাবলির জন্মলগ্নের দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং এ কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন সমালোচকের অভিমত :

> এ-সময়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। উপমহাদেশে চলছিল বৃটিশ প্রশাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন এবং ইসলামী ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ও উপমহাদেশের মুসলিমদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন। সুতরাং বলা যেতে পারে মানবতার জন্যে, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্যে এবং কোনঠাসা উপমহাদেশের মুসলিমদের পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামই ছিল 'সিন্দাবাদ' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র বিষয়বস্তু। (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১৭৮)

সিরাজুম মুনীরা কাব্যে আমরা লক্ষ করি, মুহম্মদের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা' কবিতায় তিনি মুহম্মদকে সিরাজাম মুনিরা বা আলোর চেরাগ সম্বোধন করে সেকালের আলোয় একালের অন্ধকার দূর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' অংশের খলিফাবৃন্দের জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত কবিতায় তিনি বর্তমানের নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। এ গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায়ও আমরা কবির এই প্রবণতা লক্ষ করব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. পার হ'য়ে তুমি এসেছো অনেক ঝড়,
পাড়ি দিয়ে তুমি এসেছো অনেক মরু,
তাই সমুদ্র-বাধা প'ড়ে আছে পোষ মানা সরোবর
যে বিরাণ মাঠে জেগেছে একেলা

সেই মাঠে আজ জাগে অসংখ্য তরু। ('আবুবকর সিদ্দিক')

গ. আজকে এখানে নিশীথ-প্রহরী উমর জাগে না আর।
তবু অতীতের প্রশ্বাসে আজো ভরে নিখিল,
দরদী উমর! বন্ধু উদর, সারাজ দিল॥ ('উমর-দারাজ দিল')

ঘ. আজ জাগবার– আজ জাগবার দিন,
মৃত্যু যেখানে তুলিয়াছে সংগিন
নিজেকে সেখানে সবল করিয়া দিতে হবে শেষ দান ('আজ সংগ্রাম')

ঙ. মনের সকল পশুদল আজ
মাতাল– টেনেছে সুরা,
মধ্যদিনের আকাশ আমার
হ'য়েছে তন্দ্রাতুরা,
ঝিমন্ত; নির্জীব।
রণশ্রান্ত সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা,
মাথা কোটে তার অন্তিম ব্যর্থতা! ('এই সংগ্রম')

উদ্ধৃতিসমূহে কবির সময় ও সমাজভাবনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শরণ নিলেও কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বকালের সমাজবাস্তবতায় এসে নোঙর করেছেন এবং বিপন্ন জীবন ও বিধ্বস্ত মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন, এ কাব্যে 'প্রকাশ পেয়েছে মানবতাবাদী আদর্শের উজ্জীবন ও প্রতীক্ষার প্রত্যাশা। চরিত্রবান, সেবাব্রতী ও কর্মী মানুষের দিকে এই প্রত্যাশাতেই ফররুখ আহ্‌মদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে।' (১৯৮৮ : ৪৬৫)। কবির এই প্রসারিত দৃষ্টি গভীরভাবে স্বকালসংলগ্ন বলেই তাঁর কবিতায় প্রতি যুগের মর্মের স্পন্দন অনুভূত হয়।

মুহূর্তের কবিতা ফররুখ আহমদের সনেট-সংকলন। ফলে এতে গীতিকবিতার বিচিত্র অনুষঙ্গের সম্মিলন লক্ষ করা যাবে। ফররুখের সনেটে তাঁর রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির বিকাশও ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের আবহে উপস্থাপিত। তবু এতে ধরা পড়েছে কবির স্বকালের সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার নানা চিহ্ন। ফররুখ-গবেষক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

> কবি এখানে বর্তমানের রূঢ়তার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে অনেকটাই জেগে উঠেছেন, পারিপার্শ্বে দৃষ্টি তুলে ধরেছেন, আপন হৃদয়-গহীনে ডুব দিয়ে ভাবনার মুক্তা আহরণের চেষ্টা পেয়েছেন। এ কাব্যে তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, আপন পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, যুগ ও জীবন, স্বদেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। (২০০৮ : ১৪৪)

কালসচেতনতা ফররুখের কবিতার একটি সাধারণ কুললক্ষণ হলেও *মুহূর্তের কবিতার* কালসচেতনাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। কাব্যের নামকরণের মধ্যেই সময়ের পরিসর বিষয়ে তাঁর অভিমত উপস্থিত। এ কাব্যের প্রথম তিনটি কবিতার নামকরণেও – 'মুহূর্তের কবিতা', 'মুহূর্তের গান' এবং 'দুর্লভ মুহূর্ত'– কবি অনন্ত কালপরিসর থেকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য কালখণ্ডে মনোযোগ দিয়েছেন। 'ক্ষণিকের চিন্তা ক্ষণিকের ভাবনা কবি-চেতনাকে মুহূর্তের জন্য নাড়া দিলেও কবি সেগুলিকে মূল্যহীন মনে করেননি বরং কবিতার ভাষায় চিরস্থায়ী করে গেছেন।' (গোলাম মঈনউদ্দিন ১৯৮৫ : ৭৭)। প্রথম কবিতায় ফররুখ সময়কে শাশ্বত ও স্থির হিসেবে চিহ্নিত করে মুহূর্তের গতিময়তায় মগ্ন হয়েছেন এবং এই গতি পাখির গানে, সমুদ্রের স্রোতে ও সফেদ-জরদ-নীল বর্ণালির আভায় ধরা পড়েছে। অন্য দু'টি কবিতায়ও মুহূর্তের প্রতিধ্বনি মুদ্রিত। তিনটি কবিতা থেকেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

ক. মুহূর্তের এ কবিতা, মুহূর্তের এই কলতান
হয়তো পাবে না কণ্ঠে পরিপূর্ণ সে সুর সম্ভার,
হয়তো পাবে না খুঁজে সাফল্যের, পথের সন্ধান,–
সামান্য সঞ্চয় নিয়ে যে চেয়েছে সমুদ্রের পার;

তবু মনে রেখো তুমি এ নগণ্য এ ক্ষণিকের গান
মিনারের স্তম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলি কণিকার॥ ('মুহূর্তের কবিতা')

খ. ভোলো যুগান্তের কথা, ভুলে যাও দীর্ঘ শতাব্দীর
খতিয়ান, কাম্য এ মুহূর্ত শুধু, মুহূর্তের গান
আকাশের রঙ নিয়ে দুই চোখে জাগুক অম্লান,
ঘাসের সবুজ শীষে জমে ওঠে যেমন শিশির। ('মুহূর্তের গান')

গ. এমন মুহূর্ত আসে এ জীবনে (হয়তো ক্বচিৎ
সে মুহূর্ত, তবু আসে, তবু ফিরে আসে)
যখন বিক্ষত মন ব্যথা কিম্বা বিষণ্ন সন্ত্রাসে
পড়িতে চাহে না বাধা, ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ? ('দুর্লভ মুহূর্ত')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখের কাব্যভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট এবং শিল্পসাহিত্যে কালের কণ্ঠস্বর কীভাবে বিশেষ মুদ্রায় উপস্থাপিত হয়, তার একটা রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা এতে চোখে পড়ে। যে-সকল সনেটে কবির জীবনদর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে, সেখানেও আমরা তাঁর যুগসচেতন শিল্পসত্তার পরিচয় পাই। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৮ : ১৪৩) এই গ্রন্থের 'সাতান্ন'র কবিতা/এক', 'সাতান্ন'র কবিতা/দুই', 'শহীদ-স্মরণে', 'পূর্বসূরীর প্রতি', 'কর্মীর প্রতি', 'কবির প্রতি', 'পূর্ণিমা', 'এই বিধ্বস্ত শহর', 'একটি আধুনিক শহর', 'রক পাখী', 'অশান্ত পৃথিবী', 'হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি', 'মুক্তিস্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায় ফররুখের যুগ ও জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন। মানবজীবন মুহূর্তের সংস্থিতিতেই একটি অবয়ব ধারণ করে এবং বিশাল কালখণ্ডের সাপেক্ষে জীবনের পরিসর খুবই সীমিত। কিন্তু অনিঃশ্বেষ অধরার অনুভব ও উপলব্ধি জন্য মানুষের আক্ষেপের সীমা নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. একশো বছর আগে; তবু আজো আছে অমলিন
সেদিনের স্মৃতি-গাঁথা শহীদের লাল রক্তে আঁকা;
রক্ত-ঝড়ে-ঘূর্ণাবর্তে সেদিনের জেহাদী পতাকা
জেগে আছে বুকে নিয়ে জালিমের কৌশলী সঙ্গিন। ('সাতান্ন'র কবিতা/এক')

খ. একশো বছর পরে জাগে প্রাণ সে রক্ত প্রবাহে,
কীটদষ্ট পিতৃভূমি জাগে আজ তীব্রতর দাহে ('সাতান্ন'র কবিতা/দুই')

গ. আমরা এসেছি পথে, জীবনের সুদৃঢ় সড়কে
যেখানে প্রতিটি ইঁটে সুকঠিন তোমার প্রয়াস,
প্রতি পাথরের মূলে যেখানে তোমার তপ্ত শ্বাস
রক্তক্ষরা স্বেদবিন্দু ভেসে ওঠে চোখের পলকে। ('পূর্বসূরীর প্রতি')

ঘ. সর্বগ্রাসী সঞ্চয়ের লোভ আর বিলাস বাসনা
ক'রেছে উন্মত্ত তাকে, নাগিনীর মতো সে নিষ্ঠুর,
প্রেমের পায়ে নাই, নাই প্রাণে বেদনা অশ্রুর,
মধ্য রাত্রে অতর্কিতে হয় না সে কখনো উন্মনা, ('একটি আধুনিক শহর')

ঙ. এসেছিল একদা যে জীবনের পরিপূর্ণ ভোজে
মহৎ সৃষ্টির শেষে মিলালো সে প্রান্তের নীলিমার!
এখানে বিস্ময়ে দেখি চিত্র শুধু ইতর সত্তার;
এ যুগের ধূর্ত কাক নর্দমায় কৃমি কীট খোঁজে ॥ ('রক পাখী')

চ. এ পৃথিবী শান্তি চায়, শান্তি চায় মানুষের প্রাণ;
সংশয়-সন্দেহ-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাসে রক্তাক্ত, বিক্ষত,
তারকালোকের পথে হয়তো সে চায় পরিত্রাণ; ('অশান্ত পৃথিবী')

ছ. এখানে পাবে না শান্তি উন্মাদের উৎকট হাসিতে,
এ রাত্রে পাবে না খুঁজে শান্তি আর বাণী সান্ত্বনার,

Dhaka University Institutional Repository

ক্রূর কুণ্ডলীতে বন্দি মুক্তি নাই তোমার আমার
সাপের ফনার নীচে মৃত্যু-তিক্ত এই শর্বরীতে। ('হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি')

জ. মরণের মুখোমুখি এ দিনের বিষাক্ত হাওয়ায়
দুর্বিষহ জিন্দেগানি, জীর্ণ প্রথা গতানুগতিক,
এবার আসুক মুক্তি প্রান্তরের কিম্বা সামুদ্রিক
উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি পূর্ণ হোক কানায় কানায়। ('মুক্তি স্বপ্ন')

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদ অস্থির ও অসুস্থ স্বকালের নানা দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কবিতাসমূহের নিবিড় পাঠে মনোনিবেশ করলে আমরা লক্ষ করব, কবি সময় ও সমাজের ক্ষতগুলোকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার প্রয়োজনেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গে ফিরে গেছেন, কিন্তু দৃষ্টিকে তিনি স্বকালেই নিবদ্ধ রেখেছেন। পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি এবং তারই আলোকে উজ্জ্বল আগামী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কেবল এই কবিতাবলিতেই নয়, কবির নিসর্গভাবনা, প্রেম-স্বপ্ন-যৌবনভাবনা, স্বদেশভাবনা ও ঐতিহ্যচেতনা, ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিচিন্তা, কবি-প্রশস্তি, আত্মসমীক্ষণ, আদর্শানুধ্যান ও তত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী কবিতাবলিতেও কবির স্বকাল ও সমাজের নানা অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফররুখ আহমদ রাজনীতিসচেতন কবি। কবিকন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু উল্লেখ করেছেন, প্রথম জীবনে ফররুখ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম এন রায়ের শিষ্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মাওলানা আবদুল খালেকের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় ফররুখ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে।' (সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু ১৯৮৮ : ২৮১)। এই বিশ্বাস তাঁকে যে কাব্যাদর্শে পৌঁছে দিয়েছে, তার সঙ্গেও রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। "জড় সভ্যতার অবসান করে মানবতাভিত্তিক নতুন সভ্যতার নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এই পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুল খালেকের প্রভাব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর প্রভাব কার্যকর ছিল। পরিণতিতে পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে মেনে নিয়ে ইসলামী-আদর্শ ও মুসলিম-ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণে তিনি ব্রতী হলেন।" (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬২)। আবদুল হক এক স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন ফররুখ। 'ভারতীয় সমাজে যে সামাজিক এবং মানবিক বৈষম্য আছে তা পাকিস্তানে সম্ভব হবে না, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান অধিকতর অগ্রসর রাষ্ট্র হবে, হওয়া উচিত, এই ছিল আমাদের ধারণা। আরো অনেকের মতো গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের চোখে একটা রোমান্টিকতা মণ্ডিত ছিল। রাজনৈতিক আদর্শের এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো এবং এই সূত্রেই ফর্‌রুখ আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।' (আবদুল হক ১৯৮৮ : ২৪)। পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রেই ফররুখ আহমদ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পথপ্রদর্শক মুহম্মদ মুস্তফা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সূচনাসূত্রেই আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডলে ইসলামী জীবনাদর্শের রূপায়ণ অত্যন্ত প্রভাবশালী দিক । এর ফলে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছেন। পুথিসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগের অনুপ্রেরণাও পাকিস্তান আন্দোলন থেকে উৎসারিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> বর্তমানের হতদশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলমানদিগকে শুধু ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে কবি সন্তুষ্ট থাকেন নি, একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণের দ্বারা ও একটি বিশেষ ভূখণ্ডের ভিত্তিতে কিভাবে নতুন জাতির বিকাশ হতে পারে, সে-সম্পর্কেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ ও তাঁর চার খলীফার জীবনের সমুন্নত আদর্শের মধ্যে কবি তাঁর ঈপ্সিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় আকাংক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে ভেবেছিলেন। 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'আজাদ করো পাকিস্তান' কাব্যদ্বয়ে দুই ভাবনার প্রতিফলন

ঘটেছে। প্রথমটি পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল প্রাক-পাকিস্তান যুগে। (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬৩)

ফররুখ আহমদ রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনই তাঁর কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই আন্দোলনের আদর্শকে তিনি জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনে কখনো এই আদর্শ থেকে সরে আসেন নি। তাঁর *হাতেম তা'য়ী* কাব্যে আমরা যে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষ করি, তা পাকিস্তান আন্দোলনেরই ফল। এমনকি তাঁর প্রথম কাব্য *সাত সাগরের মাঝি*তেও আমরা লক্ষ করি, প্রথম যুগের মুসলমানদের নির্মিত আদর্শের ভিত্তিকে গ্রহণ করার প্রয়াস এবং আবার সেই স্বপ্নজগতে ফেরার অভিপ্রায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য উপস্থাপন করছি :

ক. ফররুখের প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের মাঝেই, কিন্তু সে সংগ্রামের মধ্যে তখন বিক্ষিপ্ততা নেই, এ সংগ্রাম একটা চরম পর্যায়ে সুস্পষ্ট গতিপথ বেছে নিয়েছে। গোটা সমাজ সেদিন আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংগ্রাম ও অভিযানমুখর মুসলিম মানস একটা আবাসভূমি পাবার স্বপ্নে বিভোর। এই পটভূমিতেই সফরক্লান্ত সিন্দাবাদকে খাকের স্বপ্নে বিহ্বল দেখিয়েছেন ফররুখ। (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ৩৭৭)

খ. পাকিস্তান আন্দোলনের পটভুমিতে রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়েই তিনি সচেতন প্রয়াসে কাব্যে মুসলমান ঐতিহ্যের ব্যবহার, বিশেষ করে চলতি ভাষার পুঁথি কাব্যের নবরূপায়ণের দিকে দৃষ্টি দেন। আরব্য উপন্যাসের 'সিন্দাবাদ' কাহিনীকে প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নতুন ব্যঞ্জনায় ও গভীর তাৎপর্য মহিমায় মূর্ত করে তোলেন। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ১৯৮৮ : ৪৬৪)

গ. প্রথম যুগের মুসলমানেরা ইসলামের বাণীতে একতাবদ্ধ হয়ে অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে যে-বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং আনন্দ-ঐশ্বর্য ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে যে-নতুন সমাজ-সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিল, বর্তমানের মুসলমানদের জন্যও কবি ঐ-সমাজ কামনা করেছেন। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ঐ-স্বপ্নের যুগে প্রত্যাবর্তনের ও তার উদ্‌বোধনের আহ্বান রয়েছে এবং স্বপ্নিল ভাষায় কবি অতীত যুগের প্রাণোচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, দুঃসাহসিকতা, শক্তি ও সংগ্রামের ছবি অংকন করেছেন। সিন্দাবাদ, বা'র দরিয়া, দরিয়ায় শেষ রাত্রি, আকাশ-নাবিক, পাঞ্জেরী, নিশান, সাত-সাগরের মাঝি প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মনোভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬২)

ঘ. পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' পাকিস্তান আন্দোলনের সমসূত্রে যে আত্মনিয়ন্ত্রণী সাহিত্যান্দোলন শুরু করেছিলেন, সে আন্দোলনের যথেষ্ট সমর্থনই ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যের পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'সোসাইটি' ঘোষিত সাহিত্যান্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছতে কোন সাহিত্যিক যদি কিছুমাত্র সার্থকতা অর্জন করে থাকেন, তা হলে তিনি ফররুখ আহ্‌মদ ছাড়া আর কেউ নন্‌। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ২৫)

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক বিবেচনার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব। রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকলেও কবিতাকে তিনি রাজনৈতিক শ্লোগান করতে চান নি। মানবিক মূল্যবোধের অভাবকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অশান্তির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লড়াইয়ে সাফল্য অর্জনের প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের শরণ নিয়েছেন। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, ফররুখের 'ধর্মবোধ তাঁর মজ্জাগত, কিন্তু সাধারণ ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যে যে জীবনদৃষ্টির সংকীর্ণতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উপেক্ষা দেখা যায়, ফররুখের সাহিত্যকর্ম তার থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত।' (২০০৮ : ২৫)। ধর্মবোধের মতোই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি তাঁর জীবনবোধের অনিবার্য অংশ হওয়ায় তাঁর কবিতায় রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়-আশয়ের উপস্থানও কখনোই আরোপিত মনে হয় না, তাঁর কাব্যাদর্শের অনিবার্য অংশ হিসেবেই তা গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্মে ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শৈল্পিক নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি। ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাষার প্রতি বিরূপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি এবং তাঁর সেই সমালোচনার ভাষাও সংহত ও শৈল্পিক, অর্থাৎ কবিতারই ভাষা। তাঁর ব্যঙ্গ-

কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে এর যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে। ১৯৪৫ সালে *মোহাম্মদী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'উর্দু বনাম বাংলা' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-কবিতার উল্লেখ করেছেন ফররুখ-জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, যা পরবর্তী কালে কবির *অনুস্বার* কাব্যে সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা।
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)
আত্‌রাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন? ('উর্দু বনাম বাংলা'/*অনুস্বার*)

ফররুখের ভাষা-প্রীতির চমৎকার নির্দশন মিলবে *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যের দুটি কবিতায়। এই কবিতাদ্বয়ে ভাষার মাধ্যমে যে দেশপ্রেমের পরিচয় মুদ্রিত, সঙ্গত কারণেই সেই দেশ পাকিস্তান, কিন্তু ভাষা কীভাবে একটি জাতির সংস্কৃতিকে লালন পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, সেই বিষয়ে তাঁর সচেতনতা এই কবিতাদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে ষড়যন্ত্র করেছেন সংস্কৃতবাদীরা, তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন কবি। দুটি কবিতা থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. কবির বিস্মিত দৃষ্টি (ফকীরের প্রোজ্জ্বল চিরাগে
যেমন দ্বীপের রোশ্‌নি চট্টলের বিস্মিত শহরে,
পাহাড়তলীতে, গ্রামে) জীবনের পূর্ণ অনুরাগে
খুঁজে ফেরে সে সঞ্চয় ফসলে ও পুস্পল প্রান্তরে ॥ ('অশেষ ঐশ্বর্য'/*মুহূর্তের কবিতা*)

খ. কে বলে দুহিতা কার? কোথায় বা সে মৃতা জননী
গিয়েছিল পথে রেখে যে কেবলি বাড়ায়ে জঞ্জাল?
কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে ছিলে জেগে তুমি কত কাল
কে জানে সে কথা? আর প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত গণি
কাটায়েছো কতকাল জীবনের চেয়ে পদধ্বনি
অস্পৃশ্যা নারীর মতো বর্ণশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িতা
পরিত্যক্ত 'পক্ষি ভাষা'? পাদপিষ্টা, মৃত্যুভয়ে ভীতা
কখন পিঞ্জরে প্রাণ উঠিল আবার রনরণি? ('বাংলা ভাষার প্রতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছেন ফররুখ। তিনি অনুধাবন করেছেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হলে পূর্ব-বাংলার মানুষের আত্মপ্রকাশের সকল পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি লালন করেন তাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি ভাষার প্রশ্নে কখনোই আপস করেন নি। ফররুখের গদ্যসাধনার জগৎ সীমিত হলেও ভাষা-প্রশ্নে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য তিনি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যেরও আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে *সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে।
> যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ২০)

ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। কিন্তু এর জন্য বাংলার কয়েকজন সাহসী সন্তানকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। ফররুখ তাঁর কবিতায় কবিতায় সেই বীর সন্তানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বীরের রক্তস্রোত কখনো বৃথা যেতে পারে না বলে বিশ্বাস করেন ফররুখ। কোন জাতি যখন দেশ ও মানুষের কল্যাণে

নিবেদিত বীরসন্তানদের সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয় সেই জাতির ভবিষ্যতও অন্ধকারে নিপতিত হয় বলে মনে করেন তিনি। ফররুখের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে ৪ জানুয়ারি ১৯৬৪ সালে লেখা একটি ছোট্ট কবিতা উদ্ধার করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। আমরা পুরো কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান,
সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিস্কম্প, অম্লান,
মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যুভয় মানে নাই যারা
তাদের স্মরণচিহ্ন এ মিনার– কালের পাহারা!
এখানে দাঁড়াও এসে মনে করো তাদের সে-দান
যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান। ('ভাষা-আন্দোলনে নিহত আত্মার প্রতি')

ফররুখ আহমদ স্বকালের হৃৎস্পন্দন ধারণ করেই কবিতার সঙ্গে সংসার করেছেন। সমাজজীবনের বিবিধ অসঙ্গতি তাঁর কবিতায় বিচিত্র অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতি সমাজজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বলেই রাজনৈতিক অনুষঙ্গকে তিনি কবিতার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর মনে করেন নি। জীবনাদর্শের অনুকূল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শরণ নিয়ে তিনি তাঁর সময় ও সমাজের আর্তনাদকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যে ভাবাদর্শ ফররুখের শিল্পাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়োজনেই তিনি বিশেষ কিছু রূপকল্পের উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর কাব্যবিষয়ের কেন্দ্র চিহ্নিতকরণের প্রয়াসে সমালোচকবৃন্দ ফররুখের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত কিছু অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করেছেন। এমনকি তাঁর কাল-সচেতনতাও কতিপয় অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অবয়ব লাভ করেছে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, 'তিনি সময়ের ভিতর দিয়ে, অনেক সময় ইতিহাসের চশমায়, বর্তমানকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সমকালের সামনাসামনি দাঁড়াতেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর দাঁড়ানোর যতখানি ঋজুতা দেখা যেত, তার থেকে বেশী দেখা যেত অনুভূতি। সমকাল ও কালের সমস্যাগুলির সংগে তিনি একাত্ম ছিলেন। তাঁর কবিসত্তার বড় অংশটি এই কালের সংগে নাড়ীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাই তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে একই কেন্দ্রে ফিরে আসার এত আয়োজন।' (১৯৮৮ : ৫৯৩)। সমালোচকের এই বিবেচনা ফররুখের কবিতায় বিম্বিত কালসচেতনতার স্বরূপ অনুধাবনে সহায়ক বলে আমরা মনে করি। ফররুখ আহমদ অনুভব করেছেন, একজন স্বকালসংলগ্ন কবি সমাজসম্পৃক্তির দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর সময়ভাবনা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গে উজ্জ্বল ও অভিনব রূপ লাভ করেছে। বর্তমান সময় ও সমাজের ক্ষতস্থানসমূহকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি অতীতের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ ও ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত মন

কবি হিসেবে ফররুখ আহমদের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। কবির স্বকালের প্রতিষ্ঠিত কবিবৃন্দের অধিকাংশই মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে সময় ও সমাজকে পাঠ করেছেন। কবিতায় সেই অভিজ্ঞতাসিক্ত মার্কসীয় জীবনবোধের প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সাহিত্যকর্মে আমরা লক্ষ করব শ্রেণিচেতনার প্রবল প্রকাশ। শোষক ও শোষিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের নানা প্রান্তে আলোক প্রক্ষেপণের চেষ্টা করেছেন তাঁরা। মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসও তাঁদের সৃষ্টিকর্মে লক্ষ করা যায়। মহৎ শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বে স্বকালের প্রভাব অনিবার্য এবং ফররুখের কবিতায়ও এই শ্রেণিচেতনার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। 'তিনি যৌবনে একদা মার্কবাদের প্রভাবে পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু ফুরফুরার বিখ্যাত সাধক-সংস্কারক হযরত আবু বকর সিদ্দিকীর (রহঃ) বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর চিন্তা-জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি হয়।' (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ৩৭৮)। অর্থাৎ, বিপ্লবের একজন সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন ফররুখ, কিন্তু চল্লিশের প্রগতি-কবিতার প্রধান ধারা থেকে তাঁর পথ অন্যদিকে বেঁকে গেছে। ফলে মধ্যবিত্তের চরিত্র-চিত্রণের প্রগতিপন্থী ঘরানা থেকে বাইরে এসে তিনি মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের নতুন পথ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্তের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে দোলাচলতা– তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন ফররুখ। মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী অবস্থানে থেকে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে তিনি আপস করেন নি। কবি-সমালোচক আবদুল কাদির যথার্থই বলেছেন, 'তিনি পলায়নবাদী ছিলেন না, বাস্তব জীবনের কঠোরতা তাঁকে কোনদিন তাঁর আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করে নি। এরূপ কঠিন পথে অকুতভয়ে চলার আনন্দই তাঁর কাব্যকে করেছে সৌন্দর্যের সামগ্রী।' (১৯৮৮ : ৩০৬)। নির্ভীক ও নিরাপস মনোবৃত্তির জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন তিনি। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। প্রতিবাদের ভাষা ছিলো তাঁর নিষ্কম্প। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেছে ১৯৫২-তে, ১৯৬৮-তে। তাঁর এই প্রতিবাদী চরিত্রের কথা কথা মহাকাল মনে রাখলেও রাখে নি তাঁর সুবিধাবাদী প্রতিপক্ষের দল। সেই কারণে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর জীবনে নেমে এসেছিলো চরম লাঞ্ছনা, তাঁর মতো একজন কবির জন্যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর চাকরিটির ওপর এসেছিলো হামলা। কিন্তু কবি মাথা নত করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ পরাজিত হতে পারে, কিন্তু মানুষের আত্মার ধ্বংস নেই। যদি তিনি সেদিন নতি স্বীকার করতেন, চাকরি ইত্যাদি জাগতিক সব সুযোগ-সুবিধা ফিরে পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। (ফখ্‌রুজ্জামান চৌধুরী ১৯৮৮ : ২৪৮)

অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত না করেও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার জোরেই চাকরিটি ফিরে পেয়েছিলেন ফররুখ। কষ্টের সঙ্গে লড়াই করেই তিনি জীবনের প্রকৃত পথ খুঁজে নিতে চেয়েছেন। তাঁর এই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব মার্কসবাদী সাহিত্যচিন্তাপ্রসূত নয়, নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভর দিয়েই বাস্তব পৃথিবীর বৈরী বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেছেন কবি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, 'প্রবল ছিল তাঁর আবেগ, প্রাকৃতিক শক্তির মত তীব্র কল্পনাশক্তি এবং অনমনীয় ছিল চরিত্র। সমঝোতা, সুবিধাবাদিতা, নম্রতার পথানুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না আদৌ। এই অনমনীয়তা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অনেকের কাছ থেকে, বিরূপ করেছে অনেককে, কিন্তু এই অনমনীয়তা রক্ষা করেছে তাঁর নিজস্বতাকে।' (১৯৮৮ : ৪৫৩)। মানবতাবাদী কাব্যাদর্শের আলোকেই ফররুখ তাঁর কবিতায় শোষক ও শোষিতের ব্যবধান চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁর কবিসত্তা শোষিতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

ফররুখ আহমদের প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনতার মর্মভেদী বেদনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর কোন কবিতাই কেবল মানুষের কষ্টের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়, তা থেকে মুক্তির প্রত্যাশাও তাতে উচ্চারিত। ফররুখের প্রথম কাব্য *সাত সাগরের মাঝি*-তেই আমরা শুনতে পাই শোষকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুর। এই প্রতিবাদের অনুপ্রেরণা তাঁর ধর্মীয় মুল্যবোধ-উৎসারিত হলেও শোষকের স্বরূপ উন্মোচনে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই চল্লিশের প্রগতি-কবিদের সমগোত্রীয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং পুঁজিপতিদের অনিঃশেষ লোভের পরিণাম তিনি কবিতায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। অল্প কিছু মানুষের সম্পদের পাহাড় রচনার প্রবৃত্তি কীভাবে বিশাল-সংখ্যক মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তার পরিচয় ফররুখের কবিতায় স্পষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ক. তুমি দেখ কোন ক্ষুধিত ভয়ঙ্কর
হিংস্র চোখের দৃষ্টি-তীক্ষ্ণ শর
নিরাশা ধূসর কালো পটে ভাসে মৃত্যুর বন্দর। ('আকাশ-নাবিক'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. হে জড় সভ্যতা
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতোমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ; ('লাশ'/ *সাত সাগরের মাঝি*)

গ. চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিস্বাদ
মানুষের বুভুক্ষু মুমূর্ষু আউলাদ! ('আউলাদ'/ *সাত সাগরের মাঝি*)

সিরাজাম মুনীরা কাব্যের প্রধান অবলম্বন ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য হলেও ফররুখ যখন কবিতার জন্মমুহূর্তে স্বকালের সমাজব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, তখন অসহায় মানুষের মুখচ্ছবিই তাঁকে আহত করেছে। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বাপ্নিক কবি এখানে আদর্শবাদী সমাজকর্মীর ভূমিকায় নেমে এসেছেন।' (২০০৮ : ৮৬)। কিন্তু

আদর্শবাদের শৈল্পিক উপস্থাপনে ফররুখের কবিসুলভ কল্পনাপ্রতিভার স্বাক্ষর তাতে উপস্থিত বলেই আমরা মনে করি। *সিরাজাম মুনীরা* কাব্যে 'কবির কাব্যপন্থার ওপর সামাজিকের আদর্শ-পন্থাই অনেকটা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে কবিকে কিছুটা কোনঠাসা করে ফেলেছে' বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচক, কিন্তু এই অভিব্যক্তিই কবিকে মানুষের নিকটবর্তী করেছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে এই কাব্যের 'আজ সংগ্রাম' এবং 'এই সংগ্রাম' কবিতা দু'টিতে আমরা বিপ্লবী ফররুখের পরিচয় মুদ্রিত হতে দেখি। এতে সংগ্রামের যে চিত্র ধরা পড়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে কবির মানবপ্রেম থেকে উৎসারিত। মার্কসবাদী জীবনবীক্ষায় অনুপ্রাণিত শিল্পস্রষ্টারাও মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই নিপীড়িত মানুষের নিকটবর্তী হয়ে তাঁদের দুঃখের অংশীদার হন এবং এই দুঃখের কারণ চিহ্নিত করে তা উৎপাটনের চেষ্টা করেন। ফররুখ আহমদ প্রগতি-পন্থীদের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ভিত্তি করে তাঁদের দুর্দশার ছবি আঁকেন নি, কিন্তু অর্থের অভাবে মানুষের জীবনে কীভাবে অন্ধকার নেমে আসে এবং অর্থের প্রভাব মানুষের মূল্যবোধকে কীভাবে গ্রাস করে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। একজন সমালোচক বলেছেন :

> সমাজে অর্থনীতির যে প্রবল ও নিয়ামক প্রতাপ থাকে তাকে অবজ্ঞা করতেন ফররুখ আহ্‌মদ। সেইখানে তিনি অনেক দূরে মার্কসবাদীদের পথ থেকে, যদিও তিনি পুঁজিবাদীকে ঘৃণা করতেন পুরোপুরি। সেইখখানেই প্রধান দুর্বলতা তাঁর ইতিহাস-চেতনার। অর্থনীতিকে তিনি মূল্য দেন নি ব্যক্তি জীবনে, দেন নি সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রেও। যে জড় সভ্যতাকে তিনি পদাঘাত করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড ঘৃণায় সেই সভ্যতার শক্তি ছিল তার অর্থনীতিতে। তিনি যেমন ক্ষমা করেন নি সভ্যতাকে, সভ্যতাও ক্ষমা করে নি তাঁকে। ফিরিয়ে দিয়েছে আঘাত প্রত্যাঘাত করে। (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৮ : ৪৫৯)

ফররুখ আহমদের সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক অবস্থান সম্পর্কে সমালোচকের এই মন্তব্যে ফররুখের প্রতি সুবিচার করা হয় নি। ফররুখকে মার্কসবাদী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে-কোন প্রয়াসই ব্যর্থ হবে বলে আমরা মনে করি। ফররুখ যে কাব্যাদর্শের অনুসারী, তার ভিত্তিতে তিনি মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় নির্দেশের চেষ্টা করেছেন এবং সেখানে অর্থলোভীদের পাশবিক কর্মকাণ্ডকেও তিনি ক্ষমা করেন নি। যে সমাজব্যবস্থা তাঁর প্রত্যাশিত, তার সঙ্গে ভিন্নমত থাকা অসঙ্গত নয়, কিন্তু ফররুখের কাব্যবিচারের মাপকাঠি নির্বাচনে ভুল হলে তাঁর কবিতার সৌরভ ও গৌরব অনুধাবন করা অসম্ভব। *সিরাজাম মুনীরায়* ফররুখ যে মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র এঁকেছেন, তাঁর উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকেও কবির দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। দুঃখ-বেদনাকে উদ্‌যাপন করেন নি কবি, কিংবা মানুষের দুঃখে দু'ফোটা চোখের জল ফেলেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেন নি তিনি, বরং তা থেকে উত্তরণের প্রত্যাশাও তাতে উচ্চকিত। যে পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, তারা যে অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী, তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠে তা বুঝে নিতে পাঠকের কষ্ট হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক. লুণ্ঠিত হলে মানবতা, তুমি
জাগো অনাচার বাঁধন টুটি,
প্রবল লাথিতে ভেঙে ফেলে ছেঁড়ো
সব জালিমের পাপের ঝুঁটি। ('উমর-দারাজ দিল'/*সিরাজাম মুনীরা*)

খ. পায়ে পায়ে পিষে বাধার পাহাড়
আজ চিত্তের সংগঠন;
ব্যক্তির মাঝে– মুক্ত জনতা,
খুঁজুক প্রাণের উজ্জীবন! ('আজ সংগ্রাম'/*সিরাজাম মুনীরা*)

গ. রুগ্ন মনের আকাশ এখানে ছড়ায় মৃত্যু হাওয়া,
দূর পাহাড়ের যাত্রীদলের বোঝা হ'ল আরো ভারী,
শ্বাপদের মাঝে তবু তারা করে মানুষের সন্ধান,
পাশবিকতার শিরে হানে তরবারি। ('এই সংগ্রাম'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতায় মানুষের শোষণ ও নিপীড়নের ছবি ধরা পড়েছে। নিপীড়িত জনতার বেদনাকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। একইসঙ্গে শোষকের চরিত্র চিত্রণেরও চেষ্টা করেছেন তিনি। বিশেষ করে শ্রেণি-সচেতনতা

ও শ্রেণিসংগ্রামের বিচিত্র চিহ্ন এই কাব্যে বিদ্যমান। পুঁজির বিকাশে মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক পরাজয়ের নানা চিত্র এই কাব্যে লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ফররুখের বিবেচনা এই কাব্যে মুদ্রিত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ে দেশি ও বিদেশি শোষণের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন কবি। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিত্তবানদের অবজ্ঞাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। একই সঙ্গে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের জীবনাচরণের দ্বিধাচলতাকেও তিনি তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিক্ষত করেছেন। মেহনতি মানুষের দুঃসহ দিন-রাত্রির চলচ্ছবি উপস্থাপনের মাধ্যমে জমিদারি শোষণের স্বরূপ উন্মোচনে কবির প্রয়াস প্রশংসনীয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. বিদেশী প্রভুর দানে শহরের আভিজাত্য নিয়া
গ্রামে পচে মরা পাপ (যদিও রয়েছে মেষপাল,
তাদের সঞ্চিত রক্ত পাওয়া যায় লিভার চষিয়া
দোহন, শোষণ আদি তা'ও কিছু বে-সামাল।
কেননা মোদের তবে সর্বদাই ন্যায্য সে সেলামী
হোক তা হালালী কিম্বা হই মোরা আদর্শ হারামী।) ('জমিওয়ালা'/*অনুস্বার*)

খ. কুলি মজুরের গন্ধে বমি আসে, নেপথ্যে তাইতো
কওমের খেদমত করি ব'সে আরামচেয়ারে
রৌদ্র ও বৃষ্টির ভয়ে নহি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত
আবাল্য মানুষ আমি বৈদেশিক তন্বীর কেয়ারে। ('কুলি-চালক'/*অনুস্বার*)

গ. দু নৌকায় ভর করি, লোকে বলে আমরা বাদুড়
অথচ নির্বোধ তারা জানে না তো কেন বেমালুম
মিথ্যা আদর্শের তরে চোখ হ'তে মুছে ফেলে ঘুম
আধপেটা খেয়ে খেয়ে ক্রমে হয় অতিথি মৃত্যুর। ('প্যাঁচ'/*অনুস্বার*)

ঘ. কখনো করেনি প্রজা তারস্বরে কোন প্রতিবাদ
সব কথা শুনেছে সে পোষ-মানা পশুদের মত
কালের কুটিল চক্রে ঘনালো এ তিক্ত বিসম্বাদ
প্রজার নির্বোধ পুত্র ফণা তোলে সংগিন আহত
অক্ষুণ্ন রাখিতে তন্ত্র অগত্যা এ সংগত আঘাত
সুবুদ্ধি হ'লেই জানি হবে শিশু বিপ্লব-বিরত ॥ ('রাজতন্ত্র'/*অনুস্বার*)

ঙ. এক জমিদারী তুলে তোমাকে ফেলেছি দুর্বিপাকে
এ কথা ভেবো না তুমি, সর্ববিধ আরাম আয়েশ
অবশ্যই পাবে, যদি মেনে চলো পুঁজির পন্থাকে
পাবে তুমি বিনা শর্তে দুরারোহ আনন্দের রেশ
বাণিজ্যে নাচিবে নটী, সুদের সোনালি কারবারে
সাক্ষী এসে ধরা দেবে, যাবতীয় শেয়ারবাজার
তোমার বিজয়বার্তা অবশ্য ঘোষিবে চারিধারে
জমিদারী হারিয়েও তুমি হবে দোসর রাজার। ('পুঁজির প্রগতি'/*অনুস্বার*)

ফররুখ আহমদ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আত্মস্বার্থে নিমগ্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি কেবলই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে নিয়ে জীবনধারণের উপযোগী হয়ে উঠতে চায়। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ অব্যাহত রাখার জন্য অনেক অন্যায় ও অপরাধকেও প্রশ্রয় দেয় তারা। মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত না হয়ে তারা নিজের চারপাশে একটা নিরাপত্তার দেয়াল নির্মাণ করতে চায়। এভাবেই সমাজজীবনে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মনুষ্যত্বের অসম্মানকে গুরুত্ব না দিয়ে অর্থ ও ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণের হীন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ফররুখ আহমদ। সরল, সাধারণ, প্রবঞ্চিত মানুষকে ভালোবেসেছেন কবি। তাঁর এই ভালোবাসার উৎস কিংবা প্রেরণা ধর্মাদর্শ হলেও মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর যে প্রয়াস তাতে আন্তরিকতার অভাব নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শচ্যুত হন নি বলেই আদর্শহীন জীবনের বিরুদ্ধে ফররুখ আহমদের লড়াই বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত।

উদ্বাস্তুবোধ

বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মানুষ ক্রমশ উদ্বাস্তুবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের বিকাশ এবং যন্ত্রনির্ভরতা মানব-সম্পর্কের গতিপ্রকৃতিতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। জীবনকে সুখকর ও আরামদায়ক করার নানা আয়োজন ও আবিষ্কারে মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে, কিন্তু এর জন্য জীবনের স্বস্তি ও আনন্দকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। 'যে কৃৎ-কৌশলের দৌলতে মানুষ তার পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে, সেই কৃৎ-কৌশলই আজ মানুষের পরিবেশকে টেনে এনেছে ধ্বংসের মুখে। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজগুলিতে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষ গড়ে তুলেছিল মানুষেরই প্রয়োজনে, সেইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আত্মবিকাশের পথে বাধা।' (অশ্রুকুমার শিকদার ১৯৯৩ : ২১)। এই প্রতিবন্ধকতা মানুষকে নানামাত্রিক বিচ্ছিন্নতা উপহার দিয়েছে।

মানুষ তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায়, কিন্তু তার বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার শেকড় এত গভীরে বিস্তৃত যে, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার চেষ্টা করতে গিয়েও তাকে হোঁচট খেতে হয়। নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির সকল চেষ্টাই যখন নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন বাস্তবজীবনের প্রতিও মানুষ ভয়ানক বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে এবং অন্য এক জগতের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকে। দৈবের ওপর মানুষের নির্ভরতার উৎস অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলেও আমরা লক্ষ করব, গভীর এক নিঃসঙ্গতার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস তার আত্মবিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরিয়েছে, তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক অনিঃশ্বেষ অসহায়ত্ব। অনাশ্রয়ী ব্যক্তিসত্তার অনিশ্চয়তা এবং অচরিতার্থতা থেকেই মানুষ অদৃশ্য শক্তির কাছে সমর্পিত হতে শিখেছে।

ফররুখ আহমদের কবিতায় আমরা বারবার অসহায় মানুষের হাহাকার শুনতে পাই। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী অভিব্যক্তিও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়, কিন্তু প্রবল শক্তিধরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে বঞ্চিত ও বুভুক্ষু মানুষ এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তির কাঁধে ভর দিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায় এক বিপন্ন বাস্তবতা যা কেবলি শূন্যতার গহ্বরে নিমজ্জিত করতে চায়। জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতায় আমরা যেমনটি লক্ষ করি :

> স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়– ভালোবাসা নয়,
> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
> আমি তারে পারি না এড়াতে,
> সে আমার হাত রাখে হাতে;
> সব কাজ তুচ্ছ হয়,– পণ্ড মনে হয়,
> সব চিন্তা– প্রার্থনার সকল সময়
> শূন্য মনে হয়,
> শূন্য মনে হয়! (জীবনানন্দ দাশ ১৯৯৮ : ৭৮)

এই শূন্যতাকে নানা নামে সম্বোধন করা যেতে পারে। শূন্যতার গভীর থেকে জন্ম নিতে পারে আরো গভীর গভীরতর শূন্যতা, যা মানুষকে 'সহজ লোকের মতো' চলতে বাধা দেয়, 'আলোয় আঁধারে' নিজের ইচ্ছের অনুকূলে থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার অবসরটুকুও হরণ করে। এই বোধকে কবি 'মড়ার খুলির মতো ধ'রে' আছাড় মারতে চান, তবু তা থেকে মুক্তি মেলে না। জীবনানন্দের এই মৃত্যুহীন, প্রতীকারহীন উপলব্ধির নামই বোধকরি নিঃসঙ্গতা যার গভীর থেকে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম। ফররুখ আহমদের কবিতায় এই উদ্বাস্তুবোধই অন্য অবয়বে উপস্থিত।

ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অসঙ্গতির নানা চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের সীমাহীন বেদনার ছবি এঁকেছেন কবি। এই বেদনা মূল্যবোধশূন্য মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন জীবনযাপনেরই অনিবার্য পরিণাম।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মস্বার্থসর্বস্ব মানুষ কেবলই বিত্তের পেছনে ছুটে বেড়ায়। মানুষকে বঞ্চিত করার অপকৌশলে সিদ্ধহস্ত এইসব মানুষের অসাধু অভিপ্রায় চরিতার্থ হলে তারা উল্লাস প্রকাশ করে। ফররুখের কবিতায় আমরা শোষণের স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হতে দেখি, তেমনি শোষিতের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়াসও লক্ষ করি। শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন তিনি। সবার জন্য একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণের পথে যে-সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার পরিচয়ও ফররুখের কবিতায় উপস্থিত। তাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও তাঁকে বারবার আচ্ছন্ন করে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান বিশাল বলেই কবির কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে কখনো কখনো। পৃথিবীর সঙ্গে কবি যত বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন, ততই বৈরী বাস্তবতা তাঁকে আহত করেছে। কষ্টের সঙ্গে আপস করেন নি তিনি, কিন্তু বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানুষের হৃদয়হীন নির্মমতায় তাঁর হৃদয় বারবার রক্তাক্ত হয়েছে । এই বেদনা কবির মনে কখনো কখনো উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দিয়েছে। ফররুখ যদিও বলেছেন :

> পৃথিবীর প্রয়োজন করিনি কখনো অস্বীকার,
> তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়,
> যে পারে সহজে নিতে আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়
> সংগ্রামের পথ রুদ্ধ কোন দিন হয় না তো তার। ('কবিতার প্রতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

পলায়নপর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কবির এই উচ্চারণ থেকেই অনুমিত হয় যে, কবিচৈতন্যে উদ্বাস্তুবোধ একটা সূক্ষ্ম ছায়া ফেলেছে। এই ছায়াকে অস্বীকার করার চেষ্টা থেকেই কবি পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন কিংবা উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। 'যে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মনে মোহমায়া আনে নিরন্তর', কবি সর্বত্রই সেই স্বপ্নের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করেছেন, প্রত্যাশা করেছেন, 'সে স্বপ্ন নামুক এই পথ-শ্রান্ত গোধূলি আলোকে।' কবি যখন তাঁর স্বকালের কোথাও স্বস্তিতে দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে পান নি, তখনই তিনি অতীতের শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। ফররুখের কবিতায় আমরা যে ইতিহাস-চেতনা ও ঐতিহ্যমগ্নতার স্বাক্ষর লক্ষ করি, তার সঙ্গে কবির বাস্তুবোধহীন অতৃপ্তি ও অসহায়ত্বের যোগ থাকা অসম্ভব নয়। অসঙ্গত বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় বিচলিত ফররুখ যেমন সমৃদ্ধ অতীতে আনাগোনা করেছেন, তেমনি আলোকিত আগামির শস্যশ্যামল প্রান্তরেও বিচরণ করেছেন কবি। এই দ্বিবিধ ভ্রমণের মধ্যেই কবির বাস্তুহীন মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যাবে। কবির নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতা কখনো মৃত্যু আবার কখনো রাত্রি বা অন্ধকারের রূপকল্পে ধরা পড়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> ক. পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
> ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
> জানি না কোথায়–
> ব'সে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রচ্ছায়,
> পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব
> শুধু একা করি অনুভব
> তোমার হারানো গন্ধ সুরভি-প্রশ্বাস,
> মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ। ('আকাশ-নাবিক'/*সাত সাগরের মাঝি*)
>
> খ. লু হাওয়ায় হেথা তীব্র পিপাসা, মৃত্যুর হাহাকার :
> আজকে এখানে নিশীথ-প্রহরী উমর জাগে না আর।
> তবু অতীতের প্রশ্বাসে আজো ভরে নিখিল,
> দরদী উমর! বন্ধু উদর! দারাজ দিল ॥ ('উমর-দারাজ দিল'/*সিরাজাম মুনীরা*)
>
> গ. আরক্ত সন্ধ্যার মুখে টেনে দিল রাত্রির নেকাব
> মৃত্যুহীন অন্ধকার। এখন যায় না দেখা তার
> তারুণ্যের স্বর্ণবিভা, চিবুক-নিটোল শুভ্রতার
> মর্মরে খোদিত মুখ। প্রশ্ন আর পায় না জওয়াব,
> ফিরে আসে এই মনে যে মনের বিচিত্র স্বভাব

রাত্রির অলিন্দ খুলে পাড়ি দিয়ে ঘন তমিস্রার
মরু মাঠ,– খুঁজিয়াছে লায়লার আঁখি তারকার
রংমহল; সুর চাহিয়াছে ফিরে সুরেলা রবাব। ('সন্ধ্যায়'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদের বিরহ ও বিষণ্ণতার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কবি বিশৃঙ্খল বর্তমানের সঙ্গে আপস না করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অবগাহন করে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। যে স্বপ্নের পৃথিবী নির্মাণ করেছেন তিনি, সেখানে দুঃখ নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই– মনুষ্যত্বের পরাজয় নেই। কেবল স্বপ্নই দেখেন নি কবি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও তাঁকে আহত করেছে। এই বেদনার গভীর গহ্বর থেকে যে দীর্ঘশ্বাসের জন্ম তাকে যতই উপেক্ষা করা হোক, তা থেকে মুক্তি নেই। এই দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ এসে কবির বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে। জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলা যেতে পারে :

তবু সে মাথার চারিপাশে!
তবু সে চোখের চারিপাশে!
তবু সে বুকের চারিপাশে!
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে। (১৯৯৮ : ৭৮)

মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল ফররুখ আহমদের। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে নিমগ্ন মানুষ সভ্যতাকে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে, যেখানে প্রতিনিয়ত 'মানুষের চরম সত্তা' অসম্মানের শিকার হচ্ছে। কবি এমন এক পৃথিবীর অসহায় মানবসন্তান যেখানে ইবলিস মানুষকে মৃত্যুপাকে ফেলে পরিহাস করে, 'আজাজিল লাথি মারে মানুষের শবে'। এই 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা–/এ পাশবিকতা,/শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ/বিষাইছে দিনের পৃথিবী;/রাত্রির আকাশ।' ('লাশ'/*সাত সাগরের মাঝি*)। মানুষের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত আকাশ দেখে তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন। এই বিষণ্নতা কবির মনে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দিয়েছে।

শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ

ফররুখ আহমদের কবিতায় ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। শিল্পসাহিত্যের নানা বিষয়কে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যের শরণ নিয়ে তিনি স্বকালের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ফররুখ আহমদ 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং এই সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের সৃজনকর্মের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের মনোজাগতিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সোসাইটির তিন দিন ব্যাপী সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে আবুল কালাম শাসমসুদ্দীন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

> পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বস্থতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। পুঁথি ও লোকসাহিত্যে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাবর্তনে সেই স্বস্থতা ও স্বকীয়তা আসবে না। কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনের কথা– রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতেই আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিতের সৌধ রচনা করতে হবে। (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১১৯)

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের উৎসাহ এবং পরামর্শেই পাকিস্তানি সাহিত্যের প্রকৃতি-নির্ধারক মেনিফেস্টো তৈরি করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান এবং ফররুখ আহমদ। (২০০৩ক : ১৭)। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), হাবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬), মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-৮৪), মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-৮৪), জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-৮০) প্রমুখ। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১১৯)। সংগঠনের ইশতেহার থেকে সাহিত্যকর্মীদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানও চিহ্নিত হয়ে যায়। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, সেই ইশতেহারের মূল কথাগুলো ছিল : ক. সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার; খ.

গ্রামীণ জীবনে অর্থাৎ লোক-জীবনে প্রচলিত লোককাহিনী অথবা লোকসংস্কার, সেগুলোকে অবলম্বনে নতুন সাহিত্য নির্মাণ; গ. গ্রামবাংলায় পঠিত দোভাষী পুঁথি অবলম্বনে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস; ঘ. ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ; ঙ. বাঙালি মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবন-আকাঙ্ক্ষা এবং চৈতন্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি। (২০০৩ক : ১৮)। এই ইশতেহার তৈরির সময় সংগঠনের উপরিউক্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইদ্রিস আলী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, খায়রুল কবীরসহ আরো কয়েকজন সাহিত্যকর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। ফররুখ আহমদ তাঁর সাহিত্যকর্মে এই ইশতেহারের সর্বোচ্চ প্রয়োগে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে দোভাষী পুথির আশ্রয়ে কবির স্বকালের সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনে ফররুখ আহমদের অবদান অসামান্য ও অননুকরণীয়। যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুথিসাহিত্যের উদ্ভব, ফররুখ সেই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম থেকেই তিনি সামনে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্যের কারণেই মুসলমান শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মকে 'দোভাষী পুথি' বলা হয়। পুথিসাহিত্যের ইতিহাস সেই অর্থে কেবল সাহিত্যের ইতিহাস নয়, রাজনীতিরও ইতিহাস। এই ইতিহাসের ভেতর থেকে সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত অংশের অভাব, আক্ষেপ ও বিক্ষোভের চিহ্নগুলো সনাক্ত করার প্রয়াস থেকেই নির্মিত হতে পারে বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, যে ইতিহাসের নায়ক হবে প্রাকৃতজনের প্রতিনিধি। (তারেক রেজা ২০১২ : ১৬৯)

ফররুখের কবিতায় বারবার পুথিসাহিত্যে প্রত্যাবর্তনের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, আমাদের বিবেচনায়, তা বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস বিনির্মাণের অভিপ্রায় থেকেই উৎসারিত।

পুথিসাহিত্য থেকে কাহিনি-সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ফররুখ আহমদ নতুন যুগের সাহিত্যসৃজনের প্রয়াস পেয়েছেন। কেবল পুথিসাহিত্য নয়, আরব্যোপন্যাস এবং ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর সাহিত্যকর্মের পুনর্নির্মাণেও প্রয়াসী হলেন তিনি। আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন, 'এ যুগের অনেক কবির মতো ফররুখেরও প্রধান একটি আশ্রয়– প্রাচীন গ্রন্থ।...ফররুখ আশ্রয় করলেন বিশ্বসাহিত্যের একটি অতুল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, আরব্যোপন্যাস, ইসলামী ঐতিহ্যের এক আলোকোজ্জ্বল আধার।' (১৯৯৩ : ১১৪)। তাঁর পুথিসাহিত্য-নির্ভর কাব্যগ্রন্থ *নৌফেল ও হাতেম* এবং *হাতেম তা'য়ী* কাব্যগ্রন্থের নানা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, যেখানে ফররুখের আধুনিক জীবনবোধের প্রকাশ স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনবোধের মূল্যায়নে ভিন্নতর মানদণ্ড প্রয়োজন। কারণ ধর্মবিশ্বাসবিযুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্গাতা যে আধুনিকতা, তাতে প্রশ্নাতীতভাবে সমর্পিত হন নি তিনি, বরং তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার কাজটি 'ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য মৈত্রীবন্ধনে' মিলে গিয়ে 'গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যে' উত্তরণের প্রয়াস পেয়েছে। বেগম আকতার কামাল লিখেছেন, 'তিনি একটি মানবগোষ্ঠীর ধর্মসংস্কৃতি ও সক্রিয় রাষ্ট্রবাদী ভাবনাচিন্তা ও সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।' (২০১৩ : ১১৪)। ফররুখের কবিতায় আধুনিক মননের স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন :

> ফররুখের আধুনিক ব্যক্তিবাদ জড়িয়ে গিয়েছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার কাজে। আর্থসামাজিক-রাজনীতি, বিশেষত তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমানের বুদ্ধিজীবী রূপে উত্থান ও রাষ্ট্রভূমি গঠনের পটে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাঁর মধ্যে তাই জেগে উঠেছিল একদিকে আত্মস্বাতন্ত্র্য, আরেকদিকে সমাজবদ্ধ ও সামূহিক মন থেকে উৎসৃত হয়েছিল নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ততার সদিচ্ছা। যেহেতু এই সম্প্রদায়টি অবতলিক, ধর্মপ্রতীতীতে প্রগাঢ়ভাবে সম্পৃক্ত এবং আর্থরাজনীতির পটে অধস্তন তাই সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছিল ধর্মবোধ। ইসলাম ধর্মকে ঘিরে তাঁর মধ্যে জাগ্রত ও অনুশীলনরত যে চিন্তামণ্ডল [thinking complex] তা নিছক ব্যক্তিবিশ্বাস নয়, সেটি একইসঙ্গে সামূহিক বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশ, নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আধুনিক একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্রভূমি অর্জনের যৌক্তিক উপায়। অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসকে ঘিরে আধুনিক যুক্তির ব্যবহার। (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১৪)

ফররুখের অন্যান্য কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় আমরা যে পুথিসাহিত্যের স্রষ্টা, কাহিনির বিচূর্ণ উপস্থাপন কিংবা বিশেষ কোন চরিত্রের উল্লেখ লক্ষ করি, তাও কবির গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যের বোধ থেকেই উৎসারিত। আরব্য উপন্যাসের পাত্রপাত্রিরাও তাঁর কবিতায় স্বকালের বাস্তবতায় উপস্থাপিত হয়েছে। ইরান ও আরবের শিল্পসাহিত্যের নানা অনুষঙ্গের উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন তিনি। কোরআনের অনেক ঘটনাকেও তিনি তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। *মুহূর্তের*

কবিতা গ্রন্থের কবিতাসমূহের নামকরণের মধ্যেই ফররুখের এই প্রবণতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। এই কাব্যে তিনি ফেরদৌসী, রুমী, জামী, সাদী, হাফিজ, শাহ্ গরীবুল্লাহ প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার নামে কবিতার নামকরণ করেছেন এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের সৌরভ ও গৌরবকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। ইকবালের জীবনবোধ ও সাহিত্যকর্ম ফররুখ আহমদের জীবনভাবনা ও শিল্পদৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। মহাকবি ইকবাল এবং তাঁর সাহিত্যপ্রসঙ্গ ফররুখের কবিতার একটি বহুল ব্যবহৃত অনুষঙ্গ। আল্লামা ইকবালকে তিনি *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থের নানা কবিতার শুরুতে তিনি ইকবালের কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং অনেক কবিতায়ই তিনি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। ইকবালের কবিতার অনুবাদেও আত্মনিয়োগ করেছেন কবি। অনেক মহৎ সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে কবিতার নামকরণ করেছেন তিনি। দেওয়ানা মদিনা, শহীদে কারবালা, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, শাহনামা, আলিফ লায়লা ইত্যাদি কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম তাঁর কবিতার নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র যেমন সিন্দাবাদ, শাহরিয়ার, নৌফেল, হাতেম তা'য়ী, চাহার দরবেশ ইত্যাদি চরিত্র তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর অনেক কবিতায়ই আমরা শিরীন, ফরহাদ, লায়লা, মজনুর পায়ের শব্দ শুনতে পাই। ইউসুফ-জোলেখার প্রেমের মহিমাকীর্তন করেছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যিক-অনুষঙ্গ আশ্রয়ী কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

ক. মর্মর নেকাব
ছাড়ায়ে হীরার কুচী, জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে; ('এইসব রাত্রি'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশে স্বপ্ন-সেহেলী জাগে গুলে বকাওলী! ('সাত সাগরের মাঝি'/*সাত সাগরের মাঝি*)

গ. ফরহাদের প্রেম শিখা আনিয়াছে প্রিয়াকে আলোতে; ('প্রেম-পন্থী'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঘ. জেনেছি তোমার ইশারা তাইতো ফিরে আসি বারবার,
ফরহাদ চেনে শিরীর রুদ্ধ দ্বার। ('ইশারা'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঙ. মেহেদীর রাঙা রঙ যে অধ্যায় ক'রেছে উজ্জ্বল
'লাল রক্ত' হয় কন্যা দেখে যার মুখের আদল ('গাথা ও গান'/*মুহূর্তের কবিতা*)

চ. এখনো বিস্ময়ে শুনি কাহিনী দীউয়ানা মদীনার, ('দীউয়ানা মদিনা'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ছ. অমর গীতিকা সেই– হাফিজের দীউয়ান, গজল, ('হাফিজ'/*মুহূর্তের কবিতা*)

জ. অসমাপ্ত পুঁথি দেখে সুমহান 'আমীর হামজার'
বিস্ময়ে তাকালো শুধু নির্নিমেষ, নির্বাক শায়ের; ('শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঝ. হাতেম তা'য়ীর সাথে হাম্মামের করে সে সন্ধান,
তাহ্‌মিনা, শাহের জাদী জাগে তার সম্মুখে অম্লান
পুঁথির আসরে ফের নামে রাত্রি আলিফ লায়লার। ('পুঁথির আসর'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঞ. বাজুর কুয়তে সেই অতুলন সুদূর বিদেশে
পারিল না জিনে নিতে বিজয়ী হানিফ পাহলোয়ান। ('লোকসাহিত্যের নায়িকা'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ফররুখের কবিতায় এজাতীয় সাহিত্যিক অনুষঙ্গের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গেলে সেই দৃষ্টান্তের তালিকা সঙ্গত কারণেই দীর্ঘ হবে। দোভাষী পুথির জগতেই ফররুখের পদচারণা সর্বাধিক ও স্বচ্ছন্দ। 'প্রায় বিস্মৃত দোভাষী পুঁথির জগৎ থেকে অপরিচিত শব্দাবলী তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, তাদের কাব্য সম্ভাবনাকে দক্ষ কারিগরের মতো যাচাই করেছেন এবং নতুন ব্যঞ্জনায় সেইসব শব্দরাজিকে পরে কবিতায় ব্যবহার করেছেন।' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৮ : ৫০০)। কবিতায় ব্যবহৃত শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ ফররুখের দুঃসাহসী সাহিত্যিক অভিযাত্রায় অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। এই অভিযাত্রার মাধ্যমে 'মধ্যবিত্ত জীবনের নোঙর-মুক্ত একনায়কের মতো ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বাংলা কবিতাকে বহিঃসমুদ্রে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন' বলে উল্লেখ করেছেন কবি-সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সেকালের সাহিত্যিকবৃন্দ

এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে একালের সাহিত্যকর্মী ও পাঠকের সংযোগ-সেতু নির্মাণে ফররুখ আহমদের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

ফররুখ আহমদ কবিতা ও জীবনের সম্পর্কের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে বিশ্বাসের জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর কাব্যচর্চার কোন পর্যায়েরই তিনি সেই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করেন নি। তাঁর কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল নির্ধারণ কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমরা তাঁকে সেই জগতেই আবর্তিত হতে দেখি। ধর্মীয় মূল্যবোধ তাঁর শিল্পচেতনার প্রতিপক্ষ নয়, বরং তা সহায়ক এবং প্রেরণাসঞ্চারী শক্তি হিসেবে তাঁর কবিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যে আদর্শ ও বিশ্বাসের জগৎ তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল, সেই জগতের তিনি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী। সৈয়দ আবুল মকসুদ যথার্থই বলেছেন, 'বাঙালী কবিদের কাফেলায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হেঁটেছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নিজস্ব ভঙ্গীতে, কিন্তু একা। অবশ্য সেখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, সেখানেই তিনি অনন্য।...বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাগরে মূল্যবান মাল-মশলা নিয়ে এক বিরাট কিশতীতে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন দুঃসাহসিক সিন্দাবাদের মতো।' (১৯৮৮ : ৫৮৪-৮৫)। ফররুখ আহমদ ধর্মকে কেবল পারলৌকিক প্রশান্তি ও পরিত্রাণের উপায় হিসেবে দেখেন নি, ধর্মাদর্শে সমর্পণের মাধ্যমে ইহলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব বলেই মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি। আদর্শহীন সমাজব্যবস্থায় বিপন্ন মানুষের দীর্ঘশ্বাস কবিকে আহত করেছে। মনুষ্যত্বহীনতার মর্মঘাতী পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই শিল্পসাধনার মাধ্যমে ফররুখ জীবন ও জগতের স্বরূপ-সম্পর্ক অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছেন। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন সৃষ্টিই সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না বলে বিশ্বাস করেন তিনি। ইসলামী অনুষঙ্গ অবলম্বনে মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবনই ফররুখ আহমদের সমগ্র কাব্য-সাধনার প্রেক্ষণবিন্দু। ফররুখ আহমদের কবিতায় বহুল উদ্ধৃত সিন্দাবাদ এবং হাতেম তা'য়ীর মতোই তিনি দুঃসাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তাঁর এই কাব্যযাত্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকরণ

একজন কবি তাঁর অন্তর্গত অনুভবকে এমন অবয়বে উপস্থাপন করতে চান যে-অবয়ব একান্তভাবেই স্রষ্টার আত্মখচিত শিল্পচৈতন্যের স্মারক হয়ে ওঠে। চেতনাকে শিল্পরূপ দেওয়ার প্রয়াস থেকেই কবিতার ভাষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে পৃথক হয়ে যায়, যদিও কবির দৃষ্টি জীবনের সকল প্রান্তেই প্রসারিত হওয়ার প্রত্যাশা রাখে। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, সাধারণ মানুষের চিন্তায় যে অস্পষ্টতা, বিশৃঙ্খলা, অপরিচ্ছন্নতা ও অব্যবস্থাপনা থাকে, একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা তা অতিক্রম করে যান বলেই তিনি বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। তাঁর মতে, 'কবি চান আত্মোপলব্ধি, তাই তাঁর জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম : চিন্তার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে ইঙ্গিতের যুদ্ধ, ক্ষমাহীন, বিরামহীন, পর্যায়ধর্মী; সন্ধি হয় না কখনো; একটি যুদ্ধে যদি বা কষ্টেসৃষ্টে জেতা গেলো, তখনই নতুন ও তীব্রতর আর-একটি আরম্ভ হ'য়ে যায়;– কবির যন্ত্রণার ও চিরযৌবনের রহস্য এ-ছাড়া আর কিছুই নয়।' (বুদ্ধদেব বসু ১৯৯১ : ৬৯)। একজন কবি আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারজনিত জীর্ণ ভাষায় 'প্রাণ, তাস, দ্যুতি, ধ্বনি, প্রতিধ্বনি' সঞ্চার করে সেই ভাষাকে 'একাধারে চঞ্চল ও স্থির সনাতন ও সদ্যোজাত' করে তোলেন। কবিতায় যে সংগ্রামের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন বুদ্ধদেব, সেই সংগ্রাম মুখ্যত কবিতার করণকৌশলে সিদ্ধিলাভের অনিঃশেষ প্রয়াস, যদিও কবিতার প্রাকরণিক সমৃদ্ধি চিহ্নিতকরণে এর বৈষয়িক পরিমণ্ডলে প্রবেশের পথও অবরুদ্ধ নয়।

কবিতার শৈলিসৌন্দর্যকে ভিত্তিহীন বা বিষয় নিরপেক্ষ বিবেচনা করার প্রয়াস স্বাস্থ্যকর নয়। এ কারণেই বিষ্ণু দে (১৯৯৭ : ১৩) কবিতার বিষয় ও টেকনিকের সম্পর্ককে 'জ্যা-বদ্ধ ধনুকের টংকারে ধনু ও ছিলার টানের মতো' বলেছেন। কাব্যবিষয়ে অভিনবত্ব এলে তার অনুরণনে পাঠক পল্লবিত হয়, যদিও বিষয়ের অভিনবত্ব কালোত্তীর্ণ কবিতার জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু কাব্যভাষার গতানুগতিকতা পরিহারে ব্যর্থ হলে কবির সেই প্রয়াসে সময়ের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 'কাব্যপ্রকরণ ও কাব্যভাষার পুনর্বিন্যাস ছাড়া গতানুগতিক কাব্যচর্চার পথ অতিক্রম করা কঠিন। নিজের কালসীমা অতিক্রম ক'রে ভাবীকালের পাঠকের মনে কিছু-মাত্র আলোড়ন আনতে হলে প্রকরণ ও ভাষা ব্যবহারের নবতর প্রয়োগ ছাড়া কবির গত্যন্তর নেই।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ২৮৮)। একজন শিল্পস্রষ্টা কাব্যসৃষ্টির প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পথসমূহে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর পথটি তাঁকেই নিজের কবিস্বভাবের অনুকূলে নির্মাণ করে নিতে হয়। কলাকৌশলে সুদক্ষ না-হলে এই পথ-নির্মাণের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাব্যসৃষ্টিতে বাইরের পৃথিবী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেও কবির অন্তর্লোকই কবিতার প্রকৃত জন্মভূমি। যে বেদনা কবিকে শিল্পসৃষ্টিতে প্রাণিত করে, তার গভীরে সুপ্ত থাকে অন্যকে স্পর্শ করার অদম্য বাসনা এবং এই বাসনাবহ্নিতে পুড়েই নির্মিত হয় তাঁর কবিতার ভাষা, যার মাধ্যমে তিনি দূরের মানুষের নিকটবর্তী হতে চান।

ফররুখ আহমদ কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল নির্মাণে যেমন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি বিষয়ের শৈল্পিক উপস্থাপনেও তাঁর প্রয়াস অনলস, অভিনব ও আত্মখচিত। কাব্যদেহের সকল অংশেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন তিনি, যদিও সেই সতর্কতা তাঁর কাব্য-ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততাকে বিঘ্নিত করে না। স্বভাব-কবি তিনি নন, নিরলস পরিশ্রমেই তাঁর কবিতার অন্তর ও অবয়ব নির্মিত। কিন্তু সেই পরিশ্রমের কোন চিহ্নই তাঁর কবিতার সৌরভ ও সৌন্দর্য অনুধাবনের অন্তরায় নয়। পাঠকের প্রাণের কাছে গানের মতোই তিনি বেজে উঠতে চান, যদিও সেই গান কেবল পাঠকের অবসরযাপনের ক্লান্তিহরণে অবসিত নয়। জীবননিষ্ঠ শব্দশ্রমিক তিনি। জীবন ও জগতের রূপ-রহস্য বিষয়ে তাঁর বিবেচনা যে ভাষায় উপস্থাপিত হয়, তাতে ভালোবাসার প্রকাশ স্পষ্ট বলেই কবির কণ্ঠের গভীর থেকে ভেসে আসা দীর্ঘশ্বাসেও পাঠক জীবনেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পান। তিনি কবিতা ও জীবনের মধ্যবর্তী ব্যবধানে ব্যথিত হতেন বলেই এই ব্যবধান বিমোচনে আত্মনিয়োগ করেছেন। যে জীবনবোধ ফররুখের শিল্পাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, কবির স্বকালের বাস্তবতায় সেই বোধের কার্যকারিতা বিতর্কসম্ভব, কিন্তু এক জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে শিল্পসাহিত্যে কৃত্রিমতা পরিহারের যে পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন, 'জীবনে জীবন যোগ করা/না হলে কৃত্রিম

পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' (২০০৬ : ১৩/৭০), ফররুখ আহমদের শিল্পসাধনায় আমরা সেই অভিব্যক্তিরই অনুরণন টের পাই। যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, সেই জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র বিষয় তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গিও তাঁর জীবনাদর্শের অনুকূলেই নির্মিত। এ কারণেই ফররুখ আহমদের কাব্যদেহে যে দীপ্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তা জীবননিষ্ঠ এবং শিল্পবোধসম্পন্ন পাঠকের জন্য তৃপ্তিদায়ক।

গঠনবৈশিষ্ট্য

বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা লক্ষ করব, মানুষের জীবনযাপনে তাদের আচরিত ধর্মের প্রভাব কিংবা আধিপত্য সকল যুগের কবিতার শরীরেই অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনো রূপকাশ্রয়ে ধর্ম কবিতার অন্তর ও অবয়বকে আচ্ছাদিত কিংবা আলোকিত করেছে। ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতার এই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ধর্মকে আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর যে সাহিত্যিক রাজনীতি ফররুখের অদূর অতীত ও স্বকালের কবিবৃন্দকে তাড়িত করেছে, তিনি সেই রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। আধুনিকতার প্রকৃতি ও প্রবণতাসমূহকে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণের পরিবর্তে এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

মানুষের জীবনে বিদ্যমান অস্বস্তি ও অশান্তির জন্য ফররুখ আহমদ প্রচলিত মূল্যবোধে অনাস্থা এবং যুগ যুগ ধরে আচরিত ধর্মে অবিশ্বাসকে দায়ী করেছেন। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর স্বধর্মের মানুষের জীবনকেই তিনি তাঁর কবিতার প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একটি বিশেষ ধর্মে আস্থাহীনতার পরিণাম তাঁর কবিতায় সুচিহ্নিত হলেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঘেরাটোপ তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে নি। বরং ধর্মীয় দর্শন তাঁকে সকল মানুষের দুঃসহ দুঃখের অংশীদার হতে শিখিয়েছে। তাঁর কবিতার মর্মমূলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করব, তিনি তাঁর শৈল্পিক অভিব্যক্তি নির্মাণ কিংবা উপস্থাপনে ধর্মাশ্রিত বিচিত্র অনুষঙ্গে সমর্পিত হলেও চূড়ান্ত বিচারে মানুষই তাঁর কবিতার প্রধানতম উপজীব্য। ফররুখ আহমদকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমালোচকবৃন্দের যে দৃষ্টিভঙ্গি এ কাল পর্যন্ত প্রসারিত, তা বিশেষভাবে ধর্মবোধতাড়িত, কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক বিবেচনাপ্রসূত। এ পর্যন্ত যে-সকল অভিধায় তিনি চিহ্নিত হয়েছেন, তাও প্রকৃত অর্থে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শৈল্পিক অভিব্যক্তি থেকে উৎসারিত নয়। 'মুসলিম রেনেসাঁসের কবি', 'ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি', 'মুসলিম ঐতিহ্যের রূপকার', 'হেরার রাজতোরণের কবি', 'মরু-পুরাণের স্বাপ্নিক কবি' ইত্যাদি ভূষণ ফররুখ কিংবা তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও সৌরভ অনুধাবনে কতটুকু অবদান রেখেছে তা ভেবে দেখা দরকার। মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কোন প্রকল্প নির্দেশ করেন নি ফররুখ, কিন্তু তাঁকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সাহিত্যিক রাজনীতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, আমাদের বিবেচনায় তা ফররুখ আহমদের সামগ্রিক অনুধাবনের প্রধানতম অন্তরায়। তাঁর কবিতার বৈষয়িক সমৃদ্ধির সীমানা-নির্ধারণে সতর্ক না হলে তাঁর কবিতার গাঠনিক স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের প্রয়াসও পরিচ্ছন্ন কিংবা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

কবিতার করণকৌশল বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত অন্বয় স্থাপনে ব্যর্থ হলে তা কবিতার ভাব ও শরীর উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কবিতার গঠনকৌশল নির্দেশে তাই একজন কবির কাব্যবিষয়ের বিশেষত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ফররুখ আহমদের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও ঘনিষ্ঠ। ফলে কবিতায় তিনি এমন কোন প্রাকরণিক কাঠামোর শরণ নেন নি যা তাঁর বক্তব্যের গতি ও গভীরতাকে প্রতিহত করে। তাঁর কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের উপস্থিতি প্রবল এবং কবিতার শরীর নির্মাণেও তিনি ইসলামী আবহ অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। ফলে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক হিসেবে তিনি বাংলার কবিতার ইতিহাসে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারা নির্মাণ করেছিলেন এবং এর ফলে তিনি বিশিষ্ট এবং এককরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা তাদের থেকেও তিনি বিশিষ্ট এবং অনন্য ছিলেন। একটি বিশেষ ঐতিহ্য সন্ধান করতে গিয়ে ফররুখ আহমদ নিজেকে এমনভাবে ব্যতিক্রমী করেছিলেন যে তিনি একটি

> নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর এই কাব্যধারা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে একটি নতুন কাব্যধারার সূত্রপাত হল এবং বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধারা সম্মানিত এবং গ্রাহ্য হচ্ছে। (২০০১ : ১০৬)

এই নতুন কাব্যধারা নির্মাণে ফররুখ যেমন কবিতার নতুন বৈষয়িক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সেই বিষয়ের শৈল্পিক উপস্থাপনেও তিনি রেখেছেন নিজস্বতার স্বাক্ষর। 'ফররুখ আহমদ আমাদের কাব্যসাহিত্যের আধুনিক উত্তরণে প্রকৃত সাহায্যটা করেছেন তাঁর কাব্যভাষা এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে। নজরুল-পরবর্তী যুগের লক্ষণসম্পন্ন একটি বিকশিত কাব্যভাষার রূপ তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করি। এ ভাষা শিল্পসজাগ এবং তন্ময়তায় উদ্বুদ্ধ ও পরিণত, যা সফল কাব্যভাষার একটি প্রধান চাহিদা। বোধ, বক্তব্য, স্বপ্ন, কল্পনা ও রুচির এক পরম মিলন ঘটেছে এই ভাষার ধ্বনি উদ্ভাবনার সঙ্গে।' (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৪ : ৪৬৫)। ফররুখের এই নিজস্বতা নির্দেশ করতে গিয়ে আমাদের প্রতিভাবান কাব্যসমালোচকবৃন্দ ফররুখের সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন এবং কাব্যবিষয়ের উপস্থাপনে কবির শব্দরাজির সুসংহত সন্নিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কবিতা শব্দনির্ভর শিল্পমাধ্যম হলেও কেবল শব্দের শরীরে ভর দিয়ে একজন কবি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত শিল্পস্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেন না। শব্দের শরীরে তিনি কীভাবে তাঁর উপলব্ধির সারাৎসারকে গেঁথে দিচ্ছেন এবং সেই গাঁথুনির গভীরে কীভাবে তাঁর শিল্পবোধের আত্মখচিত ব্যাকরণটি অবয়বপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারই আলোকে একজন কবি এবং তাঁর কবিতার ভূগোল চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ফররুখ আহমদের কবিতায় সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অনুবর্তন বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পুথিসাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ অনুভব করেছেন তিনি এবং এই আগ্রহের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ' এবং এরই ফল হিসেবে 'পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে মেনে নিয়ে ইসলামী-আদর্শ ও মুসলিম-ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণে তিনি ব্রতী হলেন।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬২)। এই সাহিত্য-আন্দোলন কেবল ফররুখের কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডলকেই সুনির্দিষ্ট করে দেয় নি, তা তাঁর কবিতার গঠনকৌশলেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচিত করেছে। 'ফররুখ পুঁথিসাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের চরিত্র, কাহিনী ও ভাব থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে তিনি আধুনিক সাহিত্যের রূপ-রীতি ও শিল্প-কলা অনুযায়ী কাব্য রচনা করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের ভাষা তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করে। মূলত এ ভাষার সাথে বাঙালি মুসলমানদের ঐতিহ্যিক যোগ-সূত্র বিদ্যমান।' (মুহম্মদ মতিউর রহমান ১৯৯১ : ৮৬)। এই ঐতিহ্যিক যোগসূত্রতার প্রতিই প্রবল পক্ষপাত দেখিয়েছেন ফররুখ। এ কাজে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকীর্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও নজরুল-অনুসরণে অবতীর্ণ হন নি তিনি, বরং স্বতন্ত্র জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের আলোকে তিনি একটি নিজস্ব কাব্যপরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। 'এমন-যে নজরুল ইসলাম– তাঁর কাছ থেকে তিনি নিলেন ইসলামী বিষয়ের শিল্পরূপায়ণের সাহস : কিন্তু ইসলামী বিষয়কে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ধরনে ব্যবহার করলেন।'– আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৯৪ : ১১৯-২০) এই মন্তব্যে ইসলামী বিষয়ের ভিন্নতর উপস্থাপন এবং শৈলিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ফররুখের প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর সমগ্র শিল্পসাধনায় একটি পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। এই পরিকল্পনা একই সঙ্গে কবিতার বৈষয়িক এবং প্রাকরণিক প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের বিবেচনার শরণ নেওয়া যাক :

> তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা, বাস্তবতা, বিদ্রোহী-চেতনা ও ঐতিহ্যে উজ্জীবনের প্রেরণা পাশাপাশি কাজ করেছে। কবিতায় উপজীব্য আহরণে, প্রতীকী-উপস্থাপনায়, শব্দগুচ্ছ নির্মাণে, পুঁথি ও পুঁথির ভাষা এবং বাক-প্রতিমার যে শিল্প-সফল ও সার্থক ব্যবহার সে-ও নাকি অনেকটা সে-সময়ের সচেতন প্রচেষ্টার ফল।...তাঁর প্রায় সব রচনার পেছনেই কিছুটা পরিকল্পনা কাজ করতো। এই পরিকল্পনার উৎস ছিল একটি বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলন। অর্থাৎ কবিতায় ইসলামী আদর্শ, জীবনবোধ, মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবন-পরিবেশের রূপায়ণ এবং জনজীবনে– বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে ব্যবহৃত শব্দাবলীর নবরূপায়ণ। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমানের জীবন-সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা, উজ্জীবনী প্রেরণাকে ভাষা দেয়া এবং মানবতাকে বিপর্যমুক্ত করার জন্যে তিনি কাব্যে পুঁথি সাহিত্য, মুসলিম পুরাণ এবং সাধক-দরবেশ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের শরণ নিয়েছিলেন। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ১৯৭৮ : ১৭৭)

মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যজগৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন ফররুখ এবং সেই সাহিত্যে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যোগ করতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত পুথিসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার। মধ্যযুগে

মুসলমান-রচিত সাহিত্যকর্মকে আমাদের সমালোচকবৃন্দ যে-সকল নামে অভিহিত করেছেন, তা থেকেই এই বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের প্রতি তাঁদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। 'পুথিসাহিত্য', 'বটতলার সাহিত্য', 'যাবনীমিশাল বাংলা সাহিত্য', 'ফারসি বাংলা' ইত্যাদি নামকরণে এর সাহিত্যমূল্য বিষয়ে সমালোচকবৃন্দের সংকীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই সাহিত্যকর্মে ফররুখ আহমদের প্রত্যাবর্তন এবং এই ভাণ্ডারের বিবিধ রতনে নিজের সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত সাহিত্যসমালোচনার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ১৯৫২ সালে অনুজ কবি আবদুর রশীদ খানকে লেখা একটি চিঠি উদ্ধার করেছেন ফররুখ-জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৩ : ২২), যেখানে ফররুখ লিখেছেন, 'আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'। এ ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। আবদুর রশীদ সরকারকে তিনি লিখেছেন, 'এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আংগিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।' লক্ষ্যণীয়, ফররুখ পুথির আঙ্গিককে আধুনিক শিল্পচেতনার সহচর হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরামর্শে ফররুখের স্বকালের কবিবৃন্দ কিংবা অনুজ কোন কবিই খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না, কিন্তু ফররুখ নিজের জীবনে তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। পুথির বিভিন্ন অনুষঙ্গ ফররুখের কবিতার করণকৌশলকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে প্রতীক নির্মাণে ফররুখ বারবার পুথির বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার শরণ নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য :

> দোভাষী পুঁথির রাজ্যে ফররুখের পরিভ্রমণ ছিলো নিশ্চিন্ত এবং সর্বসময়ের। প্রধানতঃ দুটো পুথি তার প্রিয় ছিলো– একটি 'হাতেম তাই' এবং অন্যটি 'আলিফ লায়লা'। ফররুখের সমগ্র কাব্যজীবনে এ-দুটো পুঁথির প্রভাব ছিলো প্রচণ্ড। 'আলিফ লায়লা' থেকে সিন্দাবাদ এবং 'হাতেম তায়ী' থেকে হাতেম তায়ী– এ-দুজন প্রবল পুরুষের বিভিন্ন অসাধারণ অভিযান ফররুখকে অভিভূত করেছিলো। কখনও তারা কোনও কাহিনীর শক্তিমান নায়ক হিসেবে এসেছে, আবার কখনও এসেছে প্রতীক রূপে অবিচল নিষ্ঠার, দুর্দমনীয় প্রাণবন্যার এবং সংঘর্ষের সামীপ্যের। (১৯৮৩ : ১৪৬)

ফররুখ আহমদের সাহিত্যসাধনায় একটি বিশেষ আদর্শের অনুরণন স্পষ্ট হলেও তাঁর কবিতা আদর্শ-প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে নয়, বরং কাব্যবিচারের পরীক্ষিত মানদণ্ডেই বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। কিন্তু বিষয়ের গৌরব ও গভীরতা সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগের ফলে ফররুখের কবিতার শিল্প-সংহতির দিকটি আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে নানাভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁর সমগ্র কাব্যের গঠনবৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা না-করে আমরা তাঁর একটি কবিতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করতে চাই। *মুহূর্তের কবিতা*র 'চলতি ভাষার পুথি' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করছি :

> যে দিন কৃত্রিম ভাষা দুর্বিষহ লানতের মত
> কিম্বা দুঃস্বপ্নের মত শ্বাসবোধ করিল তোমার
> (সংস্কৃত সাধু ভাষায় বেড়াজাল করিল তৈয়ার,
> টোলের পণ্ডিত; পুথি), সেই দিন ভারঅবনত
> সম্মুখে চলার গতি রুদ্ধ হল, বেদনা-বিক্ষত
> হে জীবন্ত মাতৃভাষা! হলে তুমি মৃত্যুর শিকার।
> দুই চোখে নেমে এলো কাল সিয়া রাত্রির আঁধার,
> অচেনা পিঞ্জর দেখি রক্তমাখা প্রাণ শরাহত!
>
> দুঃসহ দুঃখের পালা শেষ হ'ল একদা, যেদিন
> মুক্তি পেল জীবনের ভাষা, আর নিরুদ্ধ জবান
> জিন্দানের রাত্রিশেষে পেল খুঁজে রোশ্‌নি অমলিন;
> আড়ষ্ট প্রহর শেষে যেন সে উচ্ছল বহমান
> কুলপ্লাবী নদী এক পূর্ণতার পথে সুরঙ্গিন
> জীবন্ত ভাষায় দীপ্ত পরিপূর্ণ যৌবনের গান ॥ ('চলতি ভাষার পুথি'/মুহূর্তের কবিতা)

উপরিউক্ত কবিতাটিতে ফররুখ আহমদ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন ভাষার বিদেশি শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সচেতনভাবে

অন্যভাষার শব্দ আমদানি করে ভাষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করার চেষ্টা অশুভ এবং অস্বাস্থ্যকর। ওপরের কবিতাটিতে ফররুখ লানত, সিয়া, জিন্দান, রোশ্‌নি প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা কবিতাটিতে পুথিসাহিত্যের আবহ সঞ্চার করেছে। এই শব্দগুলো বাঙালি মুসলিম পরিবারের স্বাভাবিক কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে এই শব্দগুলোর উপস্থিতিতে কবিতার শরীর স্থূল না হয়ে বরং তা এর অন্তর ও অবয়বে ভিন্নতর দীপ্তি সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতানুসারী পণ্ডিতবৃন্দ বাংলা ভাষার শরীরে সংস্কৃতের অলঙ্কার পরানোর অজুহাতে বাংলার শরীরকে কলঙ্কিত ও কণ্টকিত করতে চেয়েছেন। ফররুখ বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রকেও রুখে দিতে চেয়েছেন। *মুহূর্তের কবিতা*র 'বাংলা ভাষার প্রতি' শীর্ষক কবিতায় ফররুখ বলেছেন, সংস্কৃতের দুহিতা পরিচয়ে বাংলা ভাষা যে-কালাতিপাত করেছেন তা দুঃস্বপ্নের, কলঙ্কের। বাংলা ভাষার উদ্দেশে ফররুখ বলছেন, "প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত গণি/কাটায়েছো কত কাল জীবনের চেয়ে পদধ্বনি/অস্পৃশ্য নারীর মতো বর্ণাশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িতা/পরিত্যক্ত 'পক্ষি ভাষা'? পাদপিষ্টা, মৃত্যুভয়ে ভীতা"। 'চলতি ভাষার পুঁথি' কবিতায় ফররুখ শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। পুঁথিসাহিত্যে বিপুলসংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও মুসলমান সমাজে স্বাভাবিক কথোপকথনেও সেই শব্দাবলি অবাধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ-ভাণ্ডারের সঙ্গে সেইসব আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রকৃত মুক্তি মিলবে বলে মত দিয়েছেন তিনি। সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু পুথিসাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা জীবন্ত এবং জীবনঘনিষ্ঠ। অন্য একটি কবিতায়ও ফররুখ সংস্কৃতকে মৃত ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং পুথির ভাষায় যে প্রাণের স্পন্দন আছে তার তোড়ে এই মৃত ভাষা হারিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'জীবন্ত ভাষার স্রোতে ভেসে গেল কোথায় তখন/মৃত ভাষা (গুরুভার সংস্কৃতের শিলা জগদ্দল)!' ('শাহ গরীবুল্লাহ'/*মুহূর্তের কবিতা*) এবং 'রসান্বেষী জনসাধারণ' পুথির ভাষায় জীবনের অন্য এক দিগন্ত সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। তাই পুথিসাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন ফররুখ এবং পুথির জীবন্ত ভাষায় তিনি 'যৌবনের গান' গাইতে চেয়েছেন। কবির এই বক্তব্যে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির মেনিফেস্টোর কয়েকটি ধারার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। সৈয়দ আলী আহসান এবং ফররুখ আহমদ এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পরামর্শে যে ইশতেহার তৈরি করেছিলেন, তাতে মুসলমান সমাজে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দকে কবিতায় ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে দোভাষী পুথির অবলম্বনে নতুন সাহিত্য রচনার প্রতিও মুসলমান কবি-সাহিত্যিকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দসমূহকে কবিতায় ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার ভাষা জীবনঘনিষ্ঠ হতে পারে বলে মনে করেছেন ফররুখ আহমদ। সংস্কৃত শব্দের ব্যাপারে ফররুখের অবস্থানকে কিছুতেই সংস্কৃত শব্দের প্রতি বৈরী মনোভাব হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে সংস্কৃত শব্দ চাপিয়ে দেওয়ার পণ্ডিতি-প্রয়াসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর কবিতায়ও আমরা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লক্ষ করব।

ফররুখের সমগ্র কবিতায়ই আমরা বিপুল পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি। এই শব্দ কবিতার বাক-ভঙ্গিতেও বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করেছে। যে বিষয়কে তিনি কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন, কবিতার ভাষাকেও তিনি সেই বিষয়ের অনুকূলে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। 'কবিকে অবশ্যই তার বক্তব্যের জন্য একটি প্রত্যয়যোগ্য ভাষা এবং ছন্দ আবিষ্কার করতে হবে।'– ফররুখের *সাত সাগরের মাঝি* কাব্য সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের (১৯৮৩ : ১৪৭) এই মন্তব্য ফররুখের সমগ্র কাব্য সম্পর্কেই প্রযুক্ত হতে পারে বলে আমরা মনে করি। ফররুখ যখন পুথি থেকে কাহিনি গ্রহণ করে নতুন সাহিত্য নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন, তখন তাতে আমরা যে পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি, অন্য কোন বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কবিতার বিষয় অনুযায়ী কবিতার ভাষা নির্মাণের ফলে ফররুখ আহমদের কবিতার পাঠককের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

শব্দ

ফররুখ আহমদ শব্দেশ্বরবাদী শিল্পস্রষ্টা নন, কিন্তু অতিমাত্রায় শব্দসচেতন তিনি। শব্দের আভিধানিক আর্থ-পরিধি অতিক্রমণ কবিপ্রতিভার সাধারণ কুললক্ষণ এবং এই লক্ষণও ফররুখ ভিন্নতর শব্দসংযোজন-কৌশলে রপ্ত করেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ কেবল উচ্চারিত শব্দসমূহের আড়ালেই সুপ্ত থাকে না, একটি শব্দ অনেক অনুচ্চারিত শব্দের প্রতিনিধি হিসেবে কবিতায় জায়গা করে নেয়। কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশাকে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিদগ্ধ শিল্পসমালোচকবৃন্দ এবং বলার অপেক্ষা রাখে না, কবির এ সিন্ধু শব্দ-সমবায়েই নির্মিত। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ভূমিকা বিষয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও ঈষদচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই দত্ত ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না; তিনি চান শব্দ হবে উপায়, কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের।...এক-একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় ক'নে নেয়া যায়, আধুনিক কবির দৃষ্টি সেই দিকে;...আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনোটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৯৯ : ১৮)

একজন কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত সকল শব্দকেই অভিধানের সীমানা ভেঙে ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রতিনিধি করে তোলে এমন নয়। কবিতার কিছু শব্দ নিশ্চয়ই 'নিজের বিষয়ে কোনো খবর' পরিবেশন করে, কিন্তু সেই খবর আশেপাশে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের প্রভাবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ধারণালব্ধ এবং অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ অর্থের পরিচয় দিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান। (১৩৭৫ : ৩)। এই ধারণা ও অন্তর্জ্ঞানের গভীরে ডুব দিয়ে আমরা কবির প্রাণের স্পর্শ পেতে চাই এবং এই স্পর্শ গানের মতোই আমাদের চৈতন্যে এসে আছড়ে পড়ে। ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের আলোকিত কিংবা দৃশ্যমান অংশে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের কাজ চলে যায়, কিন্তু অনালোকিত কিংবা অধরা অংশ অধিকৃত হলে রসবোধসম্পন্ন পাঠক কাজের কথা ভুলে যায়। এই দৃশ্য ও অদৃশ্যের মাঝখানে বসেই কবির বুক 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' নেচে ওঠে।

নিজের কবিতা বিষয়ে ফররুখ আহমদ বরাবরই নীরব থেকেছেন। তাই কোন দৈনিক কিংবা সাহিত্যপত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকারপ্রত্যাশীদের সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন তিনি। ফররুখ-জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ জুন ১৯৬৮ সংখ্যায় *বই* পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখের একটি সাক্ষাৎকার উদ্ধার করেছেন, যেখানে নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো কোন মন্তব্যই তিনি করেন নি এবং সেই সাক্ষাৎকারের শেষ মন্তব্যটি হল : 'সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমার পেশা নয়।' (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ৩১১)। ফররুখ যা বলেছেন, কবিতাতেই বলেছেন, এমনকি নিজের সম্পর্কে যা-কিছু বলা সঙ্গত মনে করেছেন তিনি, তার ভাষাও কবিতারই ভাষা। কবিতার শব্দ-ব্যবহার বিষয়ে ফররুখের অবস্থান প্রকৃত অর্থে 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র মেনিফেস্টোর বক্তব্যের অনুরূপ এবং এই মেনিফেস্টোর অন্যতম রচয়িতা তিনি। সেই মেনিফেস্টোর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা ফররুখের কবিতার শব্দানুষঙ্গে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নিতে চাই যা থেকে কবির শব্দ-সচেতনতার স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব হবে :

> ক. প্রায় বিস্মৃত দোভাষী পুঁথির জগৎ থেকে অপরিচিত শব্দাবলী তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, তাদের কাব্যসম্ভাবনাকে দক্ষ কারিগরের মতো যাচাই করেছেন এবং নতুন ব্যঞ্জনায় সেইসব শব্দরাজিকে পরে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৮খ : ৫০০)
>
> খ. শব্দের অন্তর্গত যে শক্তি প্রয়োগের চাতুর্যে অসামান্য উদ্দীপনায় ঝলসে ওঠে তরবারির মতো, ফররুখ আহমদ সেই শক্তি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষয় নির্বাচনের সাথে শব্দচয়নের আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর কবিতাকে নতুন দিগন্তের বার্তাবহ করে তুলেছে। প্রয়োগের এই পরীক্ষা তাঁর কবিতাকে যেমন দান করেছে নিজস্বতা, তেমনি শব্দ-অতিরেক ব্যঞ্জনায় তাঁর স্বপ্নচারিতার রহস্যময় পটভূমি সবকিছুকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে আনন্দময় শিল্পের অনুষঙ্গ। (রফিকউল্লাহ খান ২০০২ : ৮৯-৯০)

গ. কবিতায় শব্দকে তার রোমান্টিক এবং আবেগের প্রথাগত বিন্যাস থেকে মুক্ত করে সমকালীন দ্রুততা, যান্ত্রিকতা, শ্রমের দায়ভাগ এবং নিঃস্বার্থ অর্থের প্রতীতীতে প্রতিষ্ঠিত করার একটি আশ্চর্য কর্মচাঞ্চল্য আমরা লক্ষ্য করলাম। এ সময় দুজন কবি কালের অস্থিরতাকে বিশ্বাসের চৈতন্যে বিচলিত করতে চাইলেন– এদের একজন জসীমউদ্‌দীন, অন্যজন ফররুখ আহমদ। ...ফররুখ আহমদ জাতির ধর্ম ও ইতিহাসের স্মৃতি ও চৈতন্যলব্ধ শব্দাবলির দ্বারা তাঁর কালের অনিশ্চয়তা এবং বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে চাইলেন। ফররুখ আহমদেরও একান্ত লক্ষ্য ছিল একটি অনির্বচনীয় সত্যকে চিহ্নিত করা। সুতরাং সত্য ও বাস্তবকে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তিনিও আধুনিক। ('সৈয়দ আলী আহসান ২০০৩খ : ৫৯)

ঘ. ফররুখের যে-সব কাব্যের বিষয় ইসলামী অথবা পুঁথিনির্ভর, সেগুলিই আরবি-ফারসি শব্দকীর্ণ; বিষয় যখন বাংলাদেশের কোনো স্থান বা ঘটনা, সেখানে আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। "সাত সাগরের মাঝি"র অধিকাংশ কবিতায় সুপ্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু 'লাশ' কবিতায় নয়; "সিরাজাম মুনীরা"র তুলনায় "মুহূর্তের কবিতা"য় আরবি-ফারসি শব্দ কম। দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য "সাত সাগরের মাঝি'তে ফররুখের আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারও শ্রেষ্ঠভাবে ব্যবহৃত। আরব্যোপন্যাসের জগৎ যেখানে কিংবা যেখানে ইসলামের ইতিহাসের ঐশ্বর্য বিকিরিত, সেখানে তো আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার প্রাসঙ্গিক কারণেই আসবে। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০৩ : ১৫১)

ঙ. তিনিই [ফররুখ] বোধহয় মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম পুঁথি সাহিত্যের ভাষার ভাণ্ডার থেকে আরবী, ফারসী শব্দ চয়ন করে বিষয়ানুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্যবিধানে প্রয়াস পান।...তিনি নজরুল-প্রদর্শিত পথ থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করেই যেন পুঁথি-সাহিত্যের ভাব ও শব্দ-সম্পদ গ্রহণ করে এ ঐতিহ্যবাহী কাব্য-সাধনাকে আরও বিস্তৃতি, আরও গভীরতা, আরও সমৃদ্ধি দান করেছেন। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ৩৮)

উপরিউক্ত মন্তব্যসমূহে সমালোচকবৃন্দ ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। একইসঙ্গে ফররুখের কবিতায় বিম্বিত বিষয়াবলির সঙ্গে নির্বাচিত শব্দসমূহের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ নির্দেশ করার চেষ্টাও এতে লক্ষ করা যাবে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ মুসলমানদের জীবনভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্যকীর্তির বিপরীতে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দবহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার তাগিদ দিয়েছিল এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিয়ামক হিসেবে ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল। (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬)। ওই দুই সংগঠনের অণুপ্রেরণায় ফররুখ আহমদ কবিতায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের বহুল ব্যবহারে মনোনিবেশ করেন। কবিতার বিষয়ই ফররুখের শব্দ-নির্বাচনের নিয়ন্তা। 'রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না;... উপরন্তু সম্ভ্রান্ত শব্দ-সম্বন্ধে যে-কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়; এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী, সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা; কেননা ভাষা রূপেরই উপাদান।' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৯৫ : ২৪)। ফররুখ আহমদ কবিতার ভাবানুষঙ্গ বিবেচনায় রেখেই প্রাসঙ্গিক শব্দাবলির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃত রূপদক্ষের মতোই তিনি আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের মাধ্যমে ভাবকে শৈল্পিক অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। পুথির ভাব ও শব্দ-সম্পদ ফররুখের কাব্যে ইসলামী আবহ-সৃষ্টির পোষকতা করেছে এবং পূর্বসুরীদের ঐশ্বর্যময় উত্তরাধিকারকে স্বীকরণের মাধ্যমেই তাঁর এ প্রয়াস উচ্চস্তরের শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। (২০০৮ : ৩৮)। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দাবলি মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বাভাবিক কথোপকথনে প্রযুক্ত বলেই তা কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাধাগ্রস্ত করে না। বরং তা পাঠকের কানকে অধিকতর সচেতন করে তোলে, যেন সামান্য অমনোযোগেই হারিয়ে যেতে পারে প্রবাহিত শব্দাবলির প্রত্যাশিত স্পন্দন। ফররুখের কবিতায় অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন :

আমরা ভুলে যাই অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ ফররুখ মূলত ব্যবহার করেছেন কেবল "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থে। এই ধরনের অপরিচিত শব্দব্যবহারও সুচেতন ও পরিকল্পিত। এই সুচেতনা ও পরিকল্পনা দুই কারণে করেছেন ফররুখ (১) পুঁথিনির্ভর ব'লেই ঐ কাব্যে বিপুল পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগ করেছেন; (২) অপরিচিত আরবি-ফারসি

> শব্দব্যবহার ক'রেই হাতেম তা'য়ীর প্রাচীন জগতের পুনর্নির্মাণ সম্ভব– প্রত্যহ পরিচিত শব্দে ঐ জগৎ ফোটানো যেতো না। হাতেম তা'য়ীর প্রাক-ইসলামী সুদূর জগৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কাব্যভাষায় প্রাচীনত্বের স্বাদ আনা দরকার ছিলো।...এটি বাংলা সাহিত্যেরই একটি স্বীকৃত সাহিত্যিক প্রযুক্তি। সুতরাং ফররুখ অপ্রচলিত শব্দ চালানোর চেষ্টা করেছেন– এ এক প্রথাগত ও যুক্তিহীন সমালোচনা। (১৯৯৩ : ১৫২)

ফররুখের সাহিত্য-ভাবনায় পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পচৈতন্য রাজনৈতিক কূটকৌশলের কাছে পরাস্ত হয় নি। 'সত্য বটে তিনি কবিত্বের এক বিশেষ পরিমণ্ডলেই নিজের গতিবিধি সীমিত রেখেছেন; তবু তিনি ব্যাপক অর্থে বাঙলা কাব্যের মূল ধারার সাথেই যুক্ত।' (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ :৩৯)। বাংলা কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তিনি, তার সঙ্গে নিজস্ব জীবনবোধ ও শিল্পবিশ্বাসের সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াস থেকেই তাঁর কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ফররুখ আহমদের সমগ্র কবিতার শব্দব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে কবিতার বিষয় কীভাবে তাঁর শব্দসংযোজনায় প্রভাব সঞ্চার করেছে, তা অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁর কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঠ করতে চাই।

ক. নতুন দ্বীপের পত্তনি নিয়ে পেতেছি সেখানে খিমা,
জরিপ করেছি সাত সাগরের সীমা;
ঝড়ের ঝাপটা কাটায়ে এসেছি পাড়ি দিয়ে টাইফুন,
রূহা দ্বীপে শুকায়েছি মোরা আহত গায়ের ঘুণ...;
পার হয়ে কত এসেছি নিরালা দরিয়ার বিভীষিকা
মাস্তুলে ফিরে জ্বালায়েছি দেখ সফরের শিখা... ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. খুনের দরিয়া দেখেছি স্বপ্নে, কারবালা মাঠে দেখেছি খাব,
আহাজারি ওঠে দুনিয়া জাহানে, ভাসে আস্‌মানে কোটি বিলাপ;
হবে সয়লাব দুনিয়া জাহান– শান্ত মক্কা মুয়াজ্জামা;
জুলুমের তেগ হানবে জালিম পাবে না এখানে উদার ক্ষমা। ('শহীদে কারবালা'/*সিরাজাম মুনীরা*)

গ. ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রঙ জেগে আছে।
তোমার দু'চোখে নীল মেঘমুক্ত আকাশের আলো
আমার সত্তায় আজ নবতর বিস্ময় জাগালো,
জীবনের সব স্বপ্ন সংগোপনে দেখি চারাগাছে। ('প্রত্যয়'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঘ. পরদ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করার
চির প্রচলিত পন্থা যাকে ব'লো চুরি,
দেখ আজ দেশশুদ্ধ মস্তিষ্ক সবার
সেই পথে দেখাতেছে নিত্য বাহাদুরী।
হে সাধু! দিও না দোষ, এ-পথে তুমিও
যদি যোগ দাও এসে মুক্তি পাবে খুঁজে
তোমার অপূর্ব কীর্তি হবে স্মরণীয়
এ কথা বলিতে পারি আমি চোখ বুঁজে। ('চুরি'/*অনুস্বার*)

ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র বিষয়াশ্রয়ী কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ থেকে কবির পরিকল্পিত শব্দব্যবহার ধরনটি অনধাবন করা যায়। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি *আলিফ-লায়লা*র নায়ক সিন্দাবাদের দুঃসাহসী অভিযাত্রা রূপায়িত করেছেন। উদ্ধৃতাংশে খিমা (তাঁবু), জরিপ (ক্ষেত্রমাপ), রূহা (আত্মা), দরিয়া (সাগর), সফর (ভ্রমণ) ইত্যাদি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফররুখ সিন্দাবাদকে পুথিসাহিত্যের দরবার থেকে তাঁর কবিতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং পুথিসাহিত্যের আবহ-সঞ্চারে শব্দগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উদ্ধৃতি খ-এর মূল বিষয় কারবালার করুণ কাহিনি এবং এই কাহিনিও তিনি সংগ্রহ করেছেন পুথিসাহিত্য থেকে। তাই এই কবিতাংশে রক্তের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'খুন' এবং স্বপ্নের জায়গা দখল করে নিয়েছে 'খাব'। এই কবিতাংশে

আহাজারি, দুনিয়া, জাহান, আসমান, সয়লাব, মক্কা, মুয়াজ্জামা, জুলুম, তেগ, জালিম প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারবালার বেদনাতুর দৃশ্যের বর্ণনাকে জীবন্ত এবং মর্মস্পর্শী করার প্রয়োজনেই কবিকে বিপুল সংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। একই সঙ্গে সেকালের বেদনাকে একালের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সমীকৃত করার অভিপ্রায়েও এই শব্দাবলি দূরসঞ্চারি ভূমিকা পালন করেছে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি যখন বাংলাদেশের সবুজ অরণ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তখন তাঁর কবিতার ভাষাও বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরের মতোই ঘরোয়া আবহ অক্ষুণ্ন রেখেছে। চারাগাছের শরীরে যে সবুজের পরিতৃপ্তি থাকে, কবিতায় শব্দব্যবহারেও আমরা তারই একটা আভাস লক্ষ করি। স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ার মতো কোন বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেন নি তিনি। এই কবিতাংশে যে বিস্ময়ের জাগরণ দেখিয়েছেন কবি, সেই বিস্ময়ের শরীরে স্বদেশের জল-হাওয়া লেপ্টে আছে বলেই শব্দ ব্যবহারে আরবি-ফারসির প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেন নি কবি। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ভাষা ব্যঙ্গাত্মক কিন্তু তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণতা আরবি-ফারসির সাহায্য ছাড়াই লক্ষ্যভেদে সক্ষম। সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র এই কবিতায় ধরা পড়েছে, তার জন্য কবির আক্ষেপ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষাভঙ্গির কারণে পাঠকের মর্মে আঘাত করে। এভাবেই বিষয়ানুগ শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে ফররুখ কবিতার শরীর নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন।

ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের তালিকা করতে গেলে সেই তালিকা সঙ্গত কারণেই দীর্ঘ হবে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে শাহাবুদ্দীন আহমদ ফররুখের *সাত সাগরের মাঝি*, *সিরাজাম মুনীরা*, *মুহূর্তের কবিতা* এবং *হাতেম তা'য়ী* কাব্যগ্রন্থ থেকে পাঁচ শতাধিক আরবি-ফারসি শব্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যার মধ্যে সাড়ে তিনশ শব্দ নজরুল-কাব্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। (১৯৭০ : ১৫৯)। ফররুখের কবিতার শব্দসংযোজনায় নজরুলের কবিতার প্রভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শাহাবুদ্দীন আহমদ। কিন্তু ফররুখের সমগ্র কাব্যসাধনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে সমালোচকের এই বক্তব্য সমর্থন করা যায় না। ফররুখের শব্দব্যবহারে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন ও ভাষা ব্যবহারের প্রভাব রয়েছে। একইভাবে নজরুলও মুসলমান সমাজমানসের অন্তর্গূঢ় অভিব্যক্তিকে কবিতায় ধারণ করেছেন এবং আমাদের বিবেচনায়, এই দুই শিল্পস্রষ্টার শব্দব্যবহারে যেটুকু অন্বয় আমাদের চোখে পড়ে তার মৌলসূত্র এখানেই নিহিত। ফররুখের পুঁথি-নির্ভরতা তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, নজরুলের কবিতায় কবিতায় তা অনুপস্থিত। এই দুই শিল্পস্রষ্টার কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল যেহেতু স্বতন্ত্র, তাই তাঁদের শব্দ-নির্বাচন প্রবণতাও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে।

ফররুখ আহমদের কবিতায় শুধু আরবি-ফারসি শব্দ নয়, তাঁর কবিতায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করার মতো। বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে যা আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই শব্দভাণ্ডার ফররুখের উপলব্ধিতে শৈল্পিক সংহতি প্রদানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিল্প-সমালোচক সৈকত আসগর ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন :

> অঙ্গ, অঙ্গার, আদ্যোপান্ত, অধিত্যকা, অন্তরীক্ষ, অভিজ্ঞান, অভ্র, অম্বর, অম্বল, অরণ্যানী, অসূর্যস্পর্শা, আগন্তুক, উর্বশী, উষশী, ঊর্ণনাভ, কুজ্ঝটিকা, কুহক, কূপমণ্ডূক, কেকা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণপক্ষ, ক্লিন্ন, গম্বুজ, ঘটোৎকচ, চম্পা, জগদ্দল, জিঘাংসা, জ্যোৎস্না, জ্যোতির্ময়, ঝিল্লী, তমিস্রা, তূন, দুহিতা, ধূম্র, নিষাদ, নীহারিকা, নৃত্য, নৈর্ব্যক্তিক, পঙ্ক, পক্ষী, পল্বল, পণ্ডিত, পাকস্থলী, পান্থ, পাদপ, পাংশুল, প্রাকার, প্রাগৈতিহাসিক, প্রেক্ষণ, পৃথ্বী, পিঙ্গল, প্রতিভাস, প্রতীক, প্রমত্ত, প্রদোষ, প্রজ্ঞা, প্রতীচী, বক্ষ, বল্কল, বনস্পতি, বসুধা, বুভূক্ষু, বিহঙ্গম, বিদূষক, বসুন্ধরা, বজ্র, বিভা, বৃশ্চিক, বিহঙ্গ, বারিধি, ভুজগ, মৃদঙ্গ, মূর্তি, মন্বন্তর, মর্ম, মৃত্তিকা, মৃগতৃষ্ণিকা, স্বর্ণ, যামিনী, রাত্রি, রুদ্র, লাঙ্গুল, শর্বরী, শুক্তি, শ্বাপদ, শিখী, শ্মশান, স্থানু, সরীসৃপ, সিন্ধু, স্বর্গ, স্বাতী, স্ফুলিঙ্গ, হংস, হিমাদ্রি, হ্রেষা প্রভৃতি। (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ৮৮-৮৯)

ফররুখ আহমদের কবিতার নিবিড় পাঠক মাত্রই লক্ষ করবেন, তিনি উপরিউক্ত শব্দসমূহের উপর্যুপরি ব্যবহারে বিষয় ও শৈলীর তাৎপর্যপূর্ণ সংহতি বিধানে সক্ষম হয়েছেন। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারে ফররুখের অনাগ্রহ চোখে পড়ার মতো। তৃষা, মরম, বারতা, পরাণ, পরশ, লগন, উজল, জোছনা প্রভৃতি অর্ধতৎসম তৎসম শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যহৃত

হয়েছে। এমনকি হিন্দি শব্দকেও তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। জঞ্জাল, সাচ্চা ইত্যাদি শব্দ যদিও ফররুখের কবিতায় উপস্থিত, তবু তা সমগ্র শব্দ বিবেচনায় নগণ্য। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত ইরেজি শব্দের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন সৈকত আসগর, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই তালিকাটি এখানে উপস্থাপন করা হল :

> টাইফুন, ওয়েসিস, অক্সাস, ট্রাফিক, ট্রাম, হুইসিল, গ্রানাইট, সার্কাস, পার্কসার্কাস, ভ্যাগাবন্ড, ডাস্টবিন, প্রেসম্যান, বুলেট, বেয়োনেট, আটলাস, (মুসলিম) লীগ, ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন, স্টেশন, রেডিয়াম, ডায়াল, প্লাট ফরম, ব্লাক আউট, পারফিউম, ফ্যাসিস্ট, স্যাটায়ার, অফিসার, কোরাস, সনেট, ইডেন গার্ডেন, স্টিমার, ইউটোপিয়া, কন্ট্রাকটর, ট্রাভেলিং এলাউন্স, অহিফেন, লীগ (মোনাফেক), জেব্রা, বাইসন, আলবট্রাস, অর্কিড, ডালিয়া, ক্রিসানথিমাম, ম্যাগনোলিয়া, পেঙ্গুইন, পাম, ওয়েলেসলি, স্কোয়ার, ডিপো, বয়লার প্রভৃতি। (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ৮৯)

ফররুখ আহমদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ এবং শব্দ ব্যবহারে তিনি সর্বদাই বিষয়ের স্বভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শব্দের শরীরে কবির অভিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়েছে বলেই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি অনেক ক্ষেত্রেই অভিধানের শাসন উপেক্ষা করে কবিচৈতন্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি শব্দের স্বাস্থ্যকর সহাবস্থান ফররুখের কবিতায় দীপ্তি সঞ্চার করেছে। শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, 'কবিকে শুধু বহু-ব্যবহৃত শব্দের উপর নির্ভর করলে চলে না, তাঁকে সন্ধানী হতে হয়, পরিশ্রমী হতে হয়, প্রয়োজন হলে যেমন তাঁকে নতুন করে শব্দ গড়ে নিতে হয়, যেমন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তেমনি দরকার হলে তাঁকে নতুন শব্দ আমদানী করতে হয়।' (১৯৭০ : ২)। ফররুখ আহমদ শব্দানুসন্ধানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সঞ্চিত শব্দাবলির শৈল্পিক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি একটি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত কবিভাষা নির্মাণ করে নিয়েছেন। শব্দের সঙ্গে শব্দের বিবাহবন্ধন সম্পন্ন করার কাজে একজন কবি ঘটকের ভূমিকা পালন করেন বলে উল্লেখ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 'কে কবি– কবে কে মোরে? ঘটকালি করি/শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,/সেই কি সে যম-দমী?' (১৯৯৫ : ৪৩২) এবং এ কাজে সফল যিনি, কবি হিসেবে তাঁর শিরে 'অক্ষয় শোভা যশের রতন' মেলে বলে মত দিয়েছেন তিনি। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলির দাম্পত্যসম্পর্ক মধুর বলেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি 'অক্ষয় শোভা' এবং 'যশের রতন' লাভ করেছেন।

অলঙ্কার

কবিতায় অলঙ্কারের কাজ কেবল এর দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়, কবিতার ভাব কিংবা বৈষয়িক পরিমণ্ডলেও তা দীপ্তি সঞ্চার করে। আমাদের প্রাত্যহিক কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দাবলিই কাব্যদেহের প্রধান অবলম্বন কিন্তু কথোপকথন ও কবিতার উদ্দেশ্য ভিন্ন বলেই একজন কবি শব্দসজ্জা ও সংগঠনের ধরন বদলে নেন। 'গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে।'– সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯৯৫ : ২২) এই মন্তব্যে কেবল গদ্য-পদ্যের ফাঁরাকই চিহ্নিত হয় নি, ভাবের তালে তালে কবিতার নেচে চলার মধ্যে নৃত্যশিল্পীর পোশাক-পরিকল্পনার মতো কাব্যস্রষ্টার শব্দ-সচেতনতার দিকটিকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি অর্থের চেয়ে রসনিষ্পত্তির দিকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই রসনিষ্পত্তির প্রয়োজনেই কবিতার অবয়ব অন্য রকম। 'কবিরা যখন কথা বলেন, তখন সাধারণ ভাষা না হয়ে তা কবিভাষা হয়ে ওঠে। তার জন্য দরকার অলংকরণের।' (তরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০৬ : ২১)। প্রতিভাবান কবির অলঙ্কার তাঁর কবিভাষার অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর কবিতার অলঙ্কার স্বতন্ত্র অবয়বে উদ্ভাসিত না হয়ে কবিতায় বিম্বিত অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। 'প্রতিভার প্রকৃতি ও ক্ষমতানুযায়ী কবি-ভাষার প্রকৃতি যেমন নির্ধারিত হয়, তেমনি তার সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়।' (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ২০৪)। কবি যা বলছেন তা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিস্বভাব ও শিল্পিসত্তার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে না, কিন্তু কীভাবে বলছেন তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যান। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে বিনষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ইহাতে মানবের

> প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপূর্ণ হইতে থাকে মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।
>
> যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কী? তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।
>
> হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজ-সরঞ্জাম অনেক লাগে।
>
> পুরুষ মানুষের আপিসের কাপড় সাদাসিধা; তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্যসমাজেই প্রচলিত।
>
> মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়; এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা, ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষের যথাযথ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।
>
> সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৪/৬৪৬)

ফররুখ আহমদ অন্তরের জগতকে 'বাহিরে প্রকাশ করিবার' উপযোগী একটি কবিভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সে-ভাষা তাঁর উপলব্ধির সীমাকে প্রসারিত ও প্রাণবন্ত করেছে। 'রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম। তাই কাব্যের ভাষান্তর অসাধ্য; তাই কাব্যের ভাষা আর কথ্য ভাষা স্বতন্ত্র; তাই আধুনিক কাব্যে রূপের এত প্রাধান্য।'– সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯৯৫ : ২৩) এই মন্তব্যে কবিতায় রূপের যে প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়েছে, সেই রূপ প্রকৃত অর্থে যথাযথ অলঙ্কার প্রয়োগেরই ফল। 'রূপের সঙ্গে প্রসঙ্গের সম্পর্ক বৈধ ও স্থায়ী' বলেই ফররুখের কবিতার গতি, গন্তব্য ও গভীরতা অনুধাবনের প্রয়োজনে তাঁর অলঙ্কার ব্যবহারের ব্যাকরণটিও সুচিহ্নিত হওয়া দরকার।

শব্দালঙ্কার

ফররুখ আহমদ কবিতায় শব্দ ব্যবহারে যেমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তেমনি শব্দালঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি যে শব্দ-অতিরেক ব্যঞ্জনা উপহার দেয়, যে ধ্বনিমাধুর্যের সম্মোহন সঞ্চার করে, যে সাঙ্গীতিক আবহ ছড়িয়ে দেয়, তা অনেকাংশে শব্দালঙ্কারের সংহত সন্নিবেশের ওপর নির্ভর করে। শব্দালঙ্কার শব্দ-শরীরে ভর দিয়ে বিকশিত বলেই এর পরিবর্তন কিংবা স্থানান্তরে এই অলঙ্কারের অনুরণন ও অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত। অনুপ্রাস বাংলা ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হওয়ায় আধুনিক কবিতায় এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কিন্তু শব্দালঙ্কারের অন্যান্য অনুষঙ্গসমূহ ব্যবহারে কবিবৃন্দ তেমন আগ্রহ দেখান না। তাই আমরা ফররুখের কবিতায় শব্দালঙ্কারের আলোচনায় অনুপ্রাসের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব দিতে চাই।

অনুপ্রাস

ফররুখ আহমদের কবিতায় অনুপ্রাসের ব্যবহার খুবই পরিকল্পিত এবং পরিমিত। যে কবিতায় অনুপ্রাসের আধিক্য থাকে তা কানের প্রতি পক্ষপাত দেখায়। অর্থাৎ, এ জাতীয় কবিতায় ধ্বনিতরঙ্গের প্রাবল্য থাকায় শ্রবণেন্দ্রিয় সচকিত হয় এবং প্রাণের কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই অনেক সময় তার আবেদন অবসিত হয়। ধ্বনিতরঙ্গ তাঁর কবিতার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আড়াল করে নি, বরং বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপের অনুকূল আবহ সঞ্চার করেছে। ফররুখের কবিতার অনুপ্রাস কবিতার শরীরে দ্যুতি ও গতি সঞ্চার করলেও অনুপ্রাসের মোহে কখনোই আচ্ছন্ন হন নি তিনি। ব্যঞ্জনধ্বনির সুমিত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তিনি প্রাকরণিক সিদ্ধি লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

অন্ত্যানুপ্রাস

ক. ছুটেছে সে আজ অন্ধের বেগে পাহাড় যেখানে ঢালু,
 ম্লান সাহারায় প'ড়ে আছে হায় মুর্দার মত বালু,
 যে বিরাণ মাঠে ফোটে না আনার দানা,
 সেই নিরন্ধ্র মাঠে এ অন্ধ মন ছোটে একটানা, ('শাহ্‌রিয়ার'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. একাগ্রতার সকল সেতারা চেরাগ জ্বালায়ে মনের সাধ
খোঁজো হে সাধক মৌন পরম সত্য-স্রষ্টা আল্-আহাদ,
খুঁজে ফেরো তুমি লা-শরীকে মহান সত্য অভিজ্ঞান!
মরুর পিপাসা অশ্রু ভিজায়ে জাগাও দু'চোখে কী সন্ধান? ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা'/*সিরাজাম মুনীরা*)

গ. সেদিনের সে আনন্দ,– পরিপূর্ণ চাঁদ পূর্ণিমার
গুমোট দিনের শেষে প্রতীক্ষিত অতিথির মত
শ্যামল নদীর দেশে এনেছিল সুরের জোয়ার;
মেলেছিল বৃন্তে দল ছিল যারা ভার অবনত!

হারানো দিনের স্মৃতি : হাসি-অশ্রু-আনন্দ-সজল
পদ্মা মেঘনার দেশে জাগে আজও ইরানী গজল ॥ ('সোনার গাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঘ. পায় নাই দেখা তার, শুধু এক প্রশ্নের নির্দেশ;
দুর্বিষহ গুরুভার আজও যার হয় নাই শেষ
নির্মম উপেক্ষা নিয়ে ছিল আঁকা রুদ্ধ ঝরোকায়;
এখনো তা খোলে নাই; এখনো তা রুদ্ধ তমসায়। ('শাহাবাদে'/*হাতেম তা'য়ী*)

ঙ. সহজে মেলে নি ভাই ল্যাজের খেতাব
ব্যঙ্গ করে বৃথা যারা ফাজিল স্বভাব ॥ ('ল্যাজ'/*অনুস্বার*)

বৃত্ত্যনুপ্রাস

ক. সুসজ্জিত তনু যারা এই জড় সভ্যতার দাস, ('লাশ'/*সাত সাগরের মাঝি*)
[জ, ত ও স ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

খ. তীরের মতন বেগে স'রে যায় পদতলে মরুভূমি, ('আলী হায়দর'/*সিরাজাম মুনীরা*)
[ত,র এবং ম ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

গ. শান্তি নাই, স্বস্তি নাই সুপ্তিহীন রাত্রির প্রহরে। ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ তিন ' *নৌফেল ও হাতেম*)
[ত, ন, র এবং শ/স ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঘ. তখনি তো রোশনি তার দীর্ণ করে রাত্রির তিমির। ('সাদী'/*মুহূর্তের কবিতা*)
[ত, ন এবং র ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঙ. হাতেমের হাত ধরে নিল তারা মহলের মাঝে, ('পহেলা সওয়ালের রহস্যভেদ ॥ এক ॥'/*হাতেম তা'য়ী*)
[ত, ম, র এবং হ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

চ. স্বাধীন শ্রমের মাঠে কোনোদিন দেখিনি তোমারে ('পাতি'/*অনুস্বার*)
[দ/ধ, ন, ম,শ/স এবং র ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ছেকানুপ্রাস

ক. সিন্ধু ঈগল বালুচরে বুঝি নীড় করে সন্ধান ('বা'র দরিয়ায়'/*সাত সাগরের মাঝি*)
[ন এবং ধ যুক্তভাবে দু'বার ব্যবহৃত]

খ. সেই নিরন্ধ্র মাঠে এ অন্ধ মন ছোটে একটানা, ('শাহ্‌রিয়ার'/*সাত সাগরের মাঝি*)
[ন এবং ধ ধ্বনি যুক্তভাবে দু'বার ব্যবহৃত]

গ. মহান জ্ঞানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে নীরব হেরার-রবি। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা'/*সিরাজাম মুনীরা*)
[র এবং ব ক্রমানুসারে দু'বার উচ্চারিত]

ঘ. রাজ্য, রাজধানী তার লুটাবো ধূলায়, দেখে যাব... ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥'/*নৌফেল ও হাতেম*)
[র এবং জ ক্রমানুসারে দু'বার ব্যবহৃত]

ঙ. চিরস্থায়ী নীড়ে যা'রা চায় শান্তি, সান্ত্বনা আরাম ('জালালী কবুতর'/*মুহূর্তের কবিতা*)
[ন এবং ত যুক্তভাবে দু'বার ধ্বনিত]

চ. কোথায় আহার্য পাব? অন্তহীন এ মরু প্রান্তর, ('পহেলা সওয়াল ॥ দূরের পথে'/*হাতেম তা'য়ী*)
[ন এবং ত যুক্তভাবে দু'বার ব্যবহৃত]

শ্রুত্যনুপ্রাস

ক. চ ছ : তুমি দেখছো না, এরা চলে কোন্ আলেয়ার পিছে পিছে
চলে ক্রমাগত ছেড়ে আরো নীচে। ('সাত সাগরের মাঝি'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. ক খ : ওড়াও তোমার প্রথম ঊষার দীপ্ত বহ্নিশিখা
আলোর তুফানে ভাসাও জীর্ণ শেহেলা কুজ্‌ঝটিকা। ('নিশান-বরদার'/*সাত সাগরের মাঝি*)

গ. ত দ : কোন্ অনন্ত দরিয়ার পানে তার অশান্ত গতি
দু'পাশে ছিটায়ে ফুলের আঁজলা ছুটেছে মরুর নদী, ('আলী হায়দর'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঘ. দ ধ : আবার দেখি সে ক্ষুধিত জনের শিয়রে একাকী কাঁদে
নিশীথ প্রহরী ঘুমহারা চোখে বোঝা বয় পিঠে কাঁধে, ('উমর-দারাজ দিল'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঙ. ব ভ : সবারে বেসেছে ভালো,– করেনি সে স্বজন তোষণ;
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তার ছিল না সঙ্কীর্ণ আবরণ; ('ওস্‌মান গনি'/*সিরাজাম মুনীরা*)

চ. ত থ : আদব শেখাতে হবে লাথিতে? চাবুকে? ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ এক '/*নৌফেল ও হাতেম*)

ছ. জ ঝ : আমার বেদনা বুঝবে সহজে
দেখ যদি তস্‌বির, ('হাতেম তা'য়ী ও মুনীর শামীর আলাপ'/*হাতেম তা'য়ী*)

জ. ছ ঝ : যাবতীয় ছিদ্র তুমি বোঝায়েছ নির্মম গাট্টায়, ('জনৈক ছিদ্রান্বেষীকে'/*অনুস্বার*)

ঝ. র ড় : দেখেছি আজব খেল ডাস্টবিনে খাদ্য কাড়াকাড়ি,
চৈনিক তরুণ হ'লে অবশ্য তুলিত তরবারী ('নীতি'/*অনুস্বার*)

ফররুখ আহমদের কবিতায় অনুপ্রাসের ব্যবহার সীমিত। অনুপ্রাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন তিনি। বক্তব্যের অনুকূল আবহ সঞ্চারের প্রয়োজনে তিনি ধ্বনিমাধুর্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন কিন্তু ধ্বনিতরঙ্গের প্রবল প্রবাহকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর কবিতায় কাব্যিক ভাষা পরিহারের চেষ্টা নেই, বরং মানুষের মুখের ভাষা থেকে অনেকটাই দূরবর্তী তিনি। কিন্তু এই কবিভাষা নির্মাণে তিনি অনুপ্রাসের ওপর অধিকতর নির্ভরশীলতা পরিহার করেছেন। ফররুখের কবিতায় আমরা যে অনুপ্রাসের উপস্থিতি লক্ষ করি, তা সঙ্গীতের সম্মোহন নয়, বরং তা বাংলা ভাষার স্বভাবেরই আনুগত্য করেছে।

ফররুখের কবিতায় শব্দালঙ্কারের অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো নয়। অলঙ্কার প্রয়োগে সচেতন তিনি, কিন্তু অলঙ্কার তাঁর কাব্যদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আড়াল করে না। তাঁর কবিতায় যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু তা তাঁর শিল্পদৃষ্টি অনুধাবনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে মনে হয় না। তাঁর কবিতায় কিছু সার্থক বক্রোক্তির দৃষ্টান্ত মিলবে। শ্লেষ বক্রোক্তির চেয়ে কাকুবক্রোক্তি নির্মাণে ফররুখের দক্ষতা অধিকতর সার্থক ও শৈল্পিক। উচ্চারিত কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গি যখন নেতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিবাচক উত্তর প্রত্যাশা করে, একইভাবে নিষেধাত্মক বক্তব্যের প্রত্যাশায় ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার করে, তখন কাকুবক্রোক্তির সৃষ্টি হয়। কাকুবক্রোক্তি নির্মাণে কবির নৈপুণ্য অনুধাবনের প্রয়োজনে তাঁর কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

রক্ত শোষণের পালা চলে নি কি আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্রজাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিন্ন প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি, মাঠ
কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে? ('দুসরা সওয়াল ॥ সফরের পথে'/*হাতেম তা'য়ী*)

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার ব্যবহারে ফররুখ আহমদের প্রয়াস প্রশংসনীয়। অর্থালঙ্কার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ-শরীরে যোগ করে ভিন্নতর দ্যোতনা। কবির ভাব ও অভিব্যক্তির গতি ও গভীরতার শৈল্পিক সংহতি অনেকটা এই অলঙ্কারের ওপর নির্ভরশীল। অর্থালঙ্কার শব্দতরঙ্গ কিংবা ধ্বনিমাধুর্যের ব্যাপার নয়, বরং এই অলঙ্কার ব্যবহৃত শব্দের আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শব্দের বিচ্যুতি কিংবা পরিবর্তনেও এই অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে। ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত অর্থালঙ্কারের আলোচনা থেকে তাঁর শিল্পস্বভাবের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে।

উপমা

কবিতায় ব্যবহৃত উপমা একজন কবির জীবনাভিজ্ঞতার সারাৎসারকে ধারণ করেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপমা সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হলেও তা কেবল সমগোত্রীয় কিংবা সমধর্মী ভাব কিংবা বস্তুনিচয়ের সংযোগসাধন নয়, তা একজন প্রতিভাবান কবির আত্মখচিত শিল্পদৃষ্টির সংশ্রবেই দূরসঞ্চারী অভিব্যক্তির স্মারক হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত।' (১৯৯৭ : ৫৪)। বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধানের মধ্যেই কবির সৃজনপ্রতিভার প্রমাণ মেলে। 'কবির জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার প্রকাশ উপমার আশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করে বলেই হয়তো একে কবিত্বের মানদণ্ড হিসেবে শনাক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।' (তারেক রেজা ২০১২ : ১১৪)। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের স্পষ্ট উচ্চারণ– 'উপমাই কবিত্ব'– নিশ্চয়ই আমাদের মনে পড়বে। জীবনানন্দের এই বিবেচনার সারবত্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৭ : ৫৪) কবিতার ভাষাকেই উপমা হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কবিতা-নির্মাণে উপমা-নির্ভরতা একজন কবিকে কীভাবে প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, সৈয়দ আলী আহসান একটি কবিতায় তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন :

তোমার নামের স্মরণে
যে-মুহূর্তে আমি ভাষাহীন,
তখন জীবন, স্বপ্ন এবং রাত্রির নয়নে,
বেদনা ও অশ্রুর সঞ্চয়ে,
অনবরত উপমায়
তোমাকে পেলাম ॥ (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭৫ : ১৯৪)

কবিতার ভাষা বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি যেন এই কবিতা : 'এ-কথা বলতেই হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা'। ভাষাহীন মুহূর্তে অনবরত উপমায় ভর দিয়ে সৈয়দ আলী আহসান 'কবিতায় ছন্দ নির্মাণের উৎসাহ' লাভ করেছেন এবং 'তোমাকে পেলাম' বলে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কবি, সেই পাওয়া প্রেয়সীর সান্নিধ্যলাভে সচকিত, এ কথা ভেবে নিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু প্রেয়সীর সিংহাসনে কবিতাকে বসিয়ে দিলেও বড় ধরনের বিপত্তির আশঙ্কা দেখি না।

ফররুখ আহমদের কাব্যে প্রচুর অলঙ্কার তুলনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। 'যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ', তাদের মধ্যে সম্পর্কসূত্র রচনার প্রয়াস তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়। ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত উপমা প্রকৃত অর্থে তাঁর কবিস্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। 'কবিতায় উপমা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য দ্বিবিধ– এক, কাব্যশরীর ও কবিভাষাকে সুষম ও বর্ণাঢ্য করা; দুই, ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টি করা। ইঙ্গিতময় উপমা কবিতার মূলভাবনাকে প্রগাঢ় করে তোলে।' (আহমদ কবির ১৯৭৪ :১২)। ফররুখের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উপমা-নির্ভর পঙ্ক্তির শরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সাত সাগরের মাঝি

ক. কালো আকীকের মত এ নিকষ দরিয়ার বুক ছিঁড়ে
চলো সন্দল বন-সন্ধানে অজানা দ্বীপের তীরে, ('সিন্দবাদ')

খ. কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দবাদ! ('সিন্দবাদ')

Dhaka University Institutional Repository

গ. হালের মুঠির মত আমাদের কব্জা সিন্দবাদ!
দরিয়ার মত দারাজ সিনায় আজ নামে পেরেশানি; ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

ঘ. মনের আকাশে
প্রশান্ত সুপ্তির মত ব্যথাভারাক্রান্ত তার গন্ধ ভেসে আসে ॥ ('আকাশ-নাবিক')

ঙ. আকাশেরে করিয়া চৌচির
তার কান্না লুটে পড়ে
উত্তর সাগর তীরে দক্ষিণের সামুদ্রিক ঝড়ে,
সন্ধান করে সে ইতস্তত
নীড় তার শ্রাবণের পাখীদের মত। ('ঝরোকা'য়')

সিরাজাম মুনীরা

ক. মূক পশু সম মার খেয়ে মরে খরিদা গোলাম বাঁদির দল ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ অশেষ সম্ভাবনার পলিতে দুরন্ত মরু ঝড়ের মত
যারা এঁকে আসে নতুন মাটিতে সুদৃঢ় ছাপ পথচলার ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

গ. কেঁপে ওঠে যেথা উমরের মত বিশাল হৃদয় অগ্নিগিরি ('আবুবকর সিদ্দিক')

ঘ. তীরের মতন বেগে স'রে যায় পদতলে মরুভূমি, ('আলী হায়দর')

ঙ. নুড়ির মতন ওড়ে কাফেরের খুলি ('আলী হায়দর')

চ. জ্বলে ধুধু বালু দোযখের মত, নাই সব্জার চিহ্ন আর। ('শহীদে কারবালা')

ছ. দেখ সম্মুখে লানতের মত কারবালা মাঠ বিশ্বত্রাস। ('শহীদে কারবালা')

জ. দিগন্ত-বহ্নির মত হানা দিয়ে ফেরে সে ভাবনা, ('মন')

ঝ. পাহাড়তলীর আকাশ গন্ধে ভরে/প্রথম প্রেমের মত! ('এই সংগ্রাম')

ঞ. মুগ্ধ সাপের মতন বন্ধুর পথ পারে
তোমার আসন ব'য়ে নিয়ে যায় তারকালোকের দ্বারে, ('ইশারা')

নৌফেল ও হাতেম

ক. সিংহের তস্বির দেখি অন্য কোন প্রাণীর তুলিতে
নিতান্ত সে অসহায় বিল্লীর মতন। ('প্রথম অঙ্ক ॥ চার ॥ ভাঁড়')

খ. অথবা জেনেও আজ একরোখা শিশুর মতন
হাতেম তা'য়ীর খ্যাতি নিতে চায় বায়ুর কু'অতে ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ উজীর')

গ. যশের কাঙাল হয়ে কে পেয়েছে যশ পৃথিবীতে?
যে ত্যাগী অথবা কর্মী খ্যাতি আসে তার পিছে পিছে
অচ্ছেদ্য ছায়ার মত সাফল্যের সাথে। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ সিপাহ্সালার')

ঘ. জ্ঞানের বিশাল বিশ্ব চুড়ে পড়ে আছে
আদিঅন্তহীন এক দরিয়ার মত, কুল যার
দেখে নাই কেউ চোখে; ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ বৃদ্ধ মুর্শিদ')

ঙ. কিন্তু সে দাতার
পায়নি সম্মান আজও– যে ইজ্জৎ হাতেম তা'য়ীর
দরজায় পড়ে আছে পোষমানা প্রাণীর মতন। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ গুপ্তচর')

চ. গূঢ় মতলবের পথে চুপিসারে ঘোরে সে এখন
কৌশলী চিতার মত। ('('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চার ॥ ২য় মোসাহেব')

ছ. কিন্তু অন্যায়ের মুখে
আল্‌বোরজের মত শিলাদৃঢ় তার প্রতিরোধ।
তূর পাহাড়ের মত দগ্ধ সে আল্লার মুহব্বতে

ভালবাসে স্রষ্টার সৃষ্টিকে। (‘তৃতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ সরাই মালিক’)

জ. হাতেম তা’য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা’য়ীর শির পর্বতের মত মহিয়ান,
সুব্‌হে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন। (‘তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ শায়ের’)

মুহূর্তের কবিতা

ক. অথবা উল্কার মত নিক্ষিপ্ত এ আকাশের তীর
উজ্জ্বল আলোকে তার জীবনের শোনে কলতান, (‘মুহূর্তের গান’)

খ. কখনো বা মৃদু স্বরে, কখনো বা দ্রুত লয়ে ফের
উজ্জ্বল ঝর্ণার মত মিশে যায় দূর হতে দূরে। (‘কোকিল’)

গ. এখন তরুণী সেই প্রশাখার মত বাহু মেলে
একান্তে প্রতীক্ষমানা দয়িতার সাথে চায় মিল, (‘ফাল্‌গুনে’)

ঘ. শুকনো খড়কুটো লয়ে ঘূর্ণী ওঠে মৃত্যুর মতন; (‘বৈশাখী’)

ঙ. রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর, (‘বৃষ্টি’)

চ. মুখ গুঁজে পড়ে আছে পাখির মত এ হৃদয় (‘ক্লান্তি’)

ছ. কলমীলতার মত এ মাটির কন্যা যে কোমল (‘ময়নামতীর মাঠে/চার’)

জ. নিপুণ যন্ত্রের মত জন্মের প্রথম ক্ষণ থেকে
চলেছে মৃত্যুর পথে সাবলীল গতি। (‘যন্ত্র’)

ঝ. হিম-সিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে
সমস্ত আলোকরশ্মি পৃথিবীর সকল পথের।
ইরানী ছুরির মত তীক্ষ্ণধার হাওয়া উত্তরের (‘সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত’)

ঞ. অস্পৃশ্যা নারীর মতো বর্ণাশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িতা
পরিত্যক্ত ‘পক্ষি ভাষা’? (‘বাংলা ভাষার প্রতি’)

চ. যে দিন কৃত্রিম ভাষা দুর্বিষহ লানতের মত
কিম্বা দুঃস্বপ্নের মত শ্বাসরোধ করিল তোমার (‘চলতি ভাষার পুঁথি’)

ছ. জীবনের মত সত্য মৃত্যু আর তমিস্রার দেশ (‘নাস্তিকের প্রার্থনা’)

জ. জুল্‌মাতের এলাকায় হে নিঃসঙ্গ, খিজিরের মত
আবে-হায়তের তুমি পেয়েছো সন্ধান; (‘কুতুব তারা’)

ঝ. হুরের মতন কন্যা যৌবনে লাগেনি যার দাগ ॥ (‘রূপকথা’)

ঞ. নাগিনীর মত কেশ ছুঁয়েছে রক্তিম পদতল; (‘রূপমুগ্ধ’)

ট. পরেন্দা তাজীর মত উর্ধ্বলোকে ঘোরে সে যখন (‘অশান্ত পৃথিবী’)

ঠ. স্বর্ণ ঈগলের মত মুক্ত হোক এই বন্দি মন (‘মুক্তির স্বপ্ন’)

হাতেম তা’য়ী

ক. তাদেরি সে কাহিনী
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্বুদের মত। (‘সূচনা খণ্ড ॥ উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা’য়ী’)

খ. ওজুদ মাছের মত কিন্তু উর্ধ্বে তনু মানবীর/অপূর্ব সুন্দরী কন্যা (‘পহেলা সওয়াল ॥ আরো দূরে’)

গ. হলুকার মত প্রাণী মরে কখনো হাতিয়ারে। (‘দুস্‌রা সওয়াল ॥ সওয়াল ও সফর [পাঁচ]’)

ঘ. বৃশ্চিকের মত কূট অতুলন কেউ হিংস্রতায়
কদর্য হিংসার বিষ ছড়ায়েছে এই দুনিয়ায়,
গলিত লাশের দেহে পরিপুষ্ট কৃমির মতন
সমাজ সত্তাকে কেউ রাত্রিদিন করেছে শোষণ

কুষ্ঠ জীবানুর মত লালাসিক্ত কামুক ইল্লৎ
গলীজ, খবিস যারা কলঙ্কিত করেছে মিল্লৎ, ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ দুস্‌রা সওয়ালের জওয়াব')

ঙ. সঞ্চয়ের লোভ শুধু
ক্ষুধিত সাপের মত রয়ে গেল জীবনে আমার
তৃপ্তিহীন বাসনায়। ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী')

চ. নিকষ ছায়ার মত বিগত দিনের
সে কাল অধ্যায় এক মসীলিপ্ত চলে সাথে সাথে (চাহারম সওয়াল ॥ চাহারম সওয়ালের জওয়াব')

ছ. অগ্নিগোলকের মত চক্ষু তার হিংস্রতার বাসা ('পঞ্চম সওয়াল ॥ শিকার কাহিনী')

জ. রাজহংসীর মত/ উন্নতগ্রীবা কিশ্‌তী আমার ভেসে চলে অবিরত
রানীর মত অপরূপ গতি; অথচ সে মন্থর... ('শশম সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ী [সফেদ দরিয়া]')

ঝ. কন্যাকে যে চেয়েছিল দেখ সে শা'জাদা মেহেরওয়ার
মজলিসের প্রান্তে জাগে দীপ্তিহীন সিতারার মত, ('শশম সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর উক্তি')

ঞ. সপ্তম প্রশ্নের কথা হাম্মামের নিকষ ছায়াতে
হারাবে তোমার শূন্যে ঘূর্ণ্যমান জুল্‌মাতের মত। ('আখেরী সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর প্রতি সামান ঈরাক')

চ. নারী নর একাগ্র প্রয়াসে
প্রবাল কীটের মত গড়ে যেন মানবিকতার
এ মঞ্জিল এক মনে, যেন জানে সকল ইনসান
শ্রমের মর্যাদা; ('আখেরী সওয়াল ॥ শেষ কথা')

অনুস্বার

ক. তোমাকে ঘিরিয়া ফেলে আশ্বিনের কুকুরের মত
মনের মহুয়া সুরা ছেড়ে যায় পুরানো পেয়ালা। ('উত্থিতা')

খ. মালিকের আত্মা নাই, আছে শুধু বিশাল উদর–
কবন্ধ প্রেতের মতে গিলে ফেলে উদ্গারে না আর। ('ফেরাউন-সন্ততি')

গ. শস্তা মোড়কের মত তুলেছে কৃত্রিম ব্যবধান, ('হাইব্রিড')

ঘ. কখনো করেনি প্রজা তারস্বরে কোন প্রতিবাদ
সব কথা শুনেছে সে পোষ-মানা পশুদের মত ('রাজতন্ত্র')

ঙ. অহংকারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হয় পক্ব কদলীর মত ('জনৈক ছিদ্রান্বেষীকে')

চ. বৈশাখ বজ্রের মত মোর কণ্ঠে মানুষের দাবী
মানবতা প্রভৃতির একমাত্র আমি কারবারী ('সম্পাদক')

ছ. যাঁহারা প্রকৃত সাধু, ভেজাল-বর্জিত সদাশয়
দামী আতরের মত তাঁহাদের সুনাম ছড়ায়। ('চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমারের দৌরাত্মে')

জ. তোমার ধাতব মর্মে স্থূলধর্মী গণ্ডারের মিতা
আপাত পৌঁছানো গেল (আশা করি পাব সফলতা)। ('অরসিকেষু')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ফররুখ আহমদের উপমানির্মাণকৌশল অনুধাবন করা যায়। কবি বাস্তব পৃথিবীর বাণিজ্যনির্ভর মানুষের মানসিক অসুস্থতার রূপায়ণে শৈল্পিক সংহতির আড়ালে কবিতার বক্তব্যকে অস্পষ্ট করতে চান নি বলেই উপমা নির্মাণেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব, দৃশ্যমান এবং অনুভবসম্ভব উপমানের ওপর নির্ভর করেছেন। 'যেখানে মনের স্বাস্থ্য অবলুপ্ত রোগ প্রেতাত্মার/সৌন্দর্যের ছায়া মুছে ঢাকিয়াছে সমস্ত আকাশ।/কবিতা যে ব্যর্থ হবে সেখানে তাহাতে কিছু আর/সংশয় নাহিক মোর।' ('অরসিকেষু'/*অনুস্বার*)– এই উচ্চারণে তাঁর কবিতার ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেছেন ফররুখ এবং বলেছেন, 'অতএব ফুল ছেড়ে করিয়াছি বেত্রদণ্ড সার', কারণ তাঁর মতে, 'গণ্ডারের চর্ম ভেদ করে শুধু শাণিত কুড়ুল'। বক্তব্যকে লক্ষ্যভেদী করে, এমন উপমার প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন কবি। কখনো

শিল্পের দাবি উপেক্ষিত হলেও জীবনের দাবি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপসহীন থাকতে চেয়েছেন। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত উপমায় সেই আপসহীন মনোভাবের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

উৎপ্রেক্ষা

ফররুখ আহমদ কবিতায় উপমার চেয়ে উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে অধিকতর সিদ্ধহস্ত। উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সংশয়ের আবহ সঞ্চার করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন। 'উপমায় দুই সুদূর বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাদৃশ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়– উৎপ্রেক্ষার উদ্দেশ্যও প্রায় তাই। কবিচিত্ত এখানে কেবল সংশয়ে দোলায়িত থাকে এবং এই সংশয়চেতনা তিনি সঞ্চার করেন পাঠকহৃদয়ে। পাঠক নিজের কল্পনা ও অনুভব-প্রতিভার প্রয়োগে উৎপ্রেক্ষার রসগ্রহণ করেন।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৩৫)। ফররুখ কবিতার ভাবকে সুদৃঢ় এবং লক্ষ্যভেদী করার দিকে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষাও কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই বেশি মূল্য দিয়েছে। তাঁর উৎপ্রেক্ষা-আশ্রিত পঙ্‌ক্তির অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তির স্বরূপ অনুধাবনে পাঠককে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। অধিকাংশ উৎপ্রেক্ষায় ফররুখ পাঠকের কল্পনাপ্রতিভার চেয়ে তার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষার (সম্ভাবনাবাচক শব্দ যেমন– যেন, মনে হয় ইত্যাদি উপস্থিত) সংখ্যাই অধিক, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা নির্মাণে খুব বেশি আগ্রহ দেখান নি তিনি। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক :

সাত সাগরের মাঝি

ক. আলবুর্‌জের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
বজ্রের বেগে পাটাতনে ভাঙে পাহাড়ের মত ঢেউ, ('বা'র দরিয়ায়')

খ. আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ রস
জমে গাঢ় হ'য়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ– ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

গ. আগুনের মত জ্বলে বুকে ইনসাফ,
সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব ('শাহ্‌রিয়ার')

ঘ. অশান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে/স্বপ্নের প্রবাল। ('ডাহুক')

ঙ. মনে হয় তুমি শুধু সেই সুরাবাহী/পাত্র ভরা সাকী। ('ডাহুক')

চ. অচল ছবি সে, তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ। ('সাত সাগরের মাঝি')

ছ. নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ। ('সাত সাগরের মাঝি')

সিরাজাম মুনীরা

ক. শিশু হত্যার মৌসুম যেন, পাপে কেঁপে ওঠে জলস্থল, ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. তোমার সত্য খিলাফতে তারা যেন সাইমুমে প'ড়েছে লুটি, ('আবুবকর সিদ্দিক')

গ. আজো যেন দেখি জীর্ণ বস্ত্র মেলে ব'সে আছো একা
তোমার দিলের সেরা দৌলত্ ছিন্ন পিরানে লেখা। ('উমর-দারাজ দিল')

ঘ. তবু যেন শুনি জড়-প্রান্তরে জীবন্ত হুংকার,
আজো বুঝি মোর শিরায় শিরায় সুর তোলে তল্‌ওয়ার, ('আলী হায়দর')

ঙ. ধমনীতে আজ বহিছে পাশব ধারা ('এই সংগ্রাম')

নৌফেল ও হাতেম

ক. বৃদ্ধ, শিশু, নারী, নর যেন অন্ধ, বন্দি হয়ে আছে
হাতেমের মহব্বতে। তা'য়ী পুত্র হাতেমের নামে
সকলেই যেন আজ উন্মত্ত, দীউয়ানা। ('প্রথম অঙ্ক ॥ এক ॥ গুপ্তচর')

খ. ...তার যশ/হাওয়ার প্রশ্বাসে যেন ছড়ায় সহজে।... ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ নৌফেল')

গ. দেখেছি পাহাড়– দৃঢ় মেরুদণ্ড যেন

Dhaka University Institutional Repository

মর্দে মুমিনের। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ হাতেম')

ঘ. মনে হয় যেন নিরানন্দ এ দেশে কখনো
ছিল না আনন্দ, হাসি। প্রতি গৃহে শুনি আহাজারি, ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ গুপ্তচর')

ঙ. তা'রা আজ থেমে আছে হাতেমের কঠিন ইঙ্গিতে
পাথরের মূর্তি যেন। ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ ৩য় খাদেম')

মুহূর্তের কবিতা

ক. কণ্ঠে তার সুরে ইস্রাফিল
বজ্র স্বরে কথা, জানে না সে গম্ভীর বন্ধন। ('বৈশাখী')

খ. একচক্ষু 'দেও' যেন ক্ষুব্ধ রোষে স্টেশন প্রাঙ্গণে,
দাঁড়াল পিয়াসী দৈত্য আকণ্ঠ তৃষ্ঠার প্রয়োজনে, ('ট্রেনে/এক')

গ. তীর-তীব্র বেগে আসে তার যন্ত্রণার ক্ষণ
যেন উল্কা ছুটে চলে চেতনার গুপ্ত পথ ধরি, ('ট্রেনে/তিন')

ঘ. মনে হয় সে ঘোড়সওয়ার
কালো ঘোড়া নিয়ে তার খুঁজে ফেরে দিকদিগন্তর, ('ময়নামতীর মাঠে/দুই')

ঙ. অথবা বোর্রাক যেন এই মহা সমুদ্রের স্রোতে
দাঁড়ায় মুহূর্ত কাল তারপর বিদ্যুতের মত
পাখা মেলে মুক্ত নীলে পরিপূর্ণ সত্যের আলোতে; ('রুমী')

চ. মনে হল সারি বাঁধা খেলাঘর র'য়েছে সাজানো, ('মোতিঝিল')

ছ. আবরের ছায়া দেখে যেন মত্ত ময়ূরের প্রাণ
আনন্দে উধাও হ'লে নিমেষে বিস্মৃত মেঘ পানে! ('শাহ গরীবুল্লাহ')

জ. দূর সফরের পথে যেন সে নাবিক ভ্রাম্যমাণ
জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান,... ('পুঁথির আসর')

ঝ. ঘুমায়ে ছিল সে পরী বকাওলী নীলিম শয্যায়
যেন সে বিদ্যুৎ লেখা ('রূপমুগ্ধ')

ঞ. দেখিনি যা এতদিন আকাশের সেই মুক্ত আলো
তূর পাহাড়ের দীপ্তি মনে হল আজ মোর কাছে। ('প্রত্যয়')

হাতেম তা'য়ী

ক. ...মেলেছি চোখ পৃথিবীতে স্বপ্নালোকে যেন; ('সূচনা খণ্ড ॥ হুসনা বানুর স্বগতোক্তি')

খ. সাত সওয়ালের আড়ালে জাগে যে, সেই রূপসী
আবছা আঁধারে ঘেরা যেন চাঁদ পঞ্চদশী ॥ ('সূচনা খণ্ড ॥ মুনীর শামীর কথা')

গ. তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্ত-প্রজ্ঞার। ('পহেলা সওয়াল ॥ শাহাবাদে')

ঘ. রাত্রির নৈঃশব্দ্য যেন বেশুমার ঝিল্লী সুরে বাজে। ('পহেলা সওয়াল ॥ দূরের পথে')

ঙ. সমস্ত সৃষ্টির মাঝে দীপ্তি যেন কুতুব তারার ('পহেলা সওয়াল ॥ পহেলা সওয়াল প্রসঙ্গে')

চ. জীবনের সাড়া যেন জাগিল কবরে অকস্মাৎ। ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ খরজমের গোরস্তানে')

ছ. শঙ্কিত সিয়াহী যেন বিকলাঙ্গ রাত্রির আঁধারে। ('দুসরা সওয়াল ॥ সফরের পথে')

জ. জিঞ্জির খুলিয়া এল ধাত্রী,– যেন মূর্ছাতুর ভয়ে; ('দুসরা সওয়াল ॥ সওয়াল জবাব [ছয়]')

ঝ. মর্মর পাথরে গড়া ইমারত, দিনান্ত রশ্মিতে/প্রশান্তির ছবি যেন ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ দুস্‌রা সওয়ালের পথে')

ঞ. মুখের আদল দেখে মনে হয় যেন সে তরুণ নওজোয়ান
ক্লান্ত, বেহাল, বেখেয়াল তবু প'ড়ে আছে একা কোন ব্যথায়; ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ ভ্রাম্যমাণ')

ট. আগুনের মত খর রশ্মিতে যেন এ কলিজা, পরাণ কাঁপে
মনে হল তবু গাছের তলায় ঘুম আসে যেন দু'চোখ জুড়ে ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ সওদাগর')

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. আলোর মুখে আঁধার যেন হাতেম তা'য়ীর সামনে তারা। ('চাহারম সওয়াল ॥ যাদুর লড়াই [তিন]')

ড. জ্যোতিষ্ক সংসার থেকে কক্ষচ্যুত রশ্মি যেন এক
বিচ্ছিন্ন শূন্যতা মাঝে একাকীত্ব করে অনুভব
মৃত্যু-তিক্ত যন্ত্রণায়; ('পঞ্চম সওয়াল ॥বিরান শহরে হাতেম তা'য়ী')

ঢ. উৎক্ষিপ্ত সে রক্ত বন্যা যেন আসমানে ওঠে। ('শশম সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ী [লোহু দরিয়া]')

ণ. শিকারীর তীরে কবুতর যেন– আহত পুত্রশোকে
জমিনে লুটায়ে আহাজারি করে রক্তক্ষরা চোখে। ('আখেরী সওয়াল ॥ শেষ সওয়ালের পথে')

অনুস্বার

ক. ...তুমি যেন বাসন্তী-কোকিল
পরের বাসার দিকে ছুঁড়ে ফেলে ব্যস্ততার ঢিল
নতুন বসন্ত পানে উড়ে যাও ঠিক গ্রীষ্মকালে। ('বোঝাপড়া')

খ. পশ্চিমের ব্যাখ্যামতে মনে হয় তুমি যেন নোনা
সমুদ্রতীরের প্রাণী, পাও নাই আলোর ঝলক; ('সাম্প্রতিক')

গ. তুমি যেন সে গোত্রের দেহ যারা ফিরি করে হাটে
কাহারো বণিতা নয় সকলের বণিতা তথাপি ('স্বরূপ')

ঘ. পাত্রের উচ্ছিষ্ট প্রাণে সুর তোলে যেন সে রবাব, ('তলপীবর্দার')

ঙ. কণ্ঠে দড়ি দিয়া ঝোলে যেন সবে পুতুল সিকার ('বস্ত্র বর্জন')

চ. উত্তেজনা নিয়ে ফিরি যেন তপ্ত ফুটন্ত কড়াই ('যাত্রাদলের সৈনিক')

ছ. পুত্রগণ জন্মদাস, কন্যারা হ'য়েছে সেবাদাসী
বস্তাবন্দি হ'য়ে তারা চলে যেন প্রেত অধিবাসী ('চাপ')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সংশয়াত্মক সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে কবির আবেদন পাঠকের কাছে আরো প্রবল ও প্রাণবন্ত হয়েছে। ফররুখ আহমদের কবিতায় নির্মিত উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে পাঠকচিত্ত সন্দেহে আন্দোলিত হলেও সেই আন্দোলন তাকে কবিতার কেন্দ্রাভিমুখী করে। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষা কবিতার দৈহিক সৌন্দর্যবর্ধনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে, একইসঙ্গে কবির অন্তর্গত অভিজ্ঞানের সঙ্গে পাঠকের সংযোগসাধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রূপক

রূপকে উপমেয় এবং উপমানের ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে এই দুইয়ের সম্পর্ক এমন এক স্তরে উন্নীত হয় যেখানে উপমেয় উপমানের আধিপত্য স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত নয়। একজন কবির জীবনবোধের ব্যাকরণই তাঁর রূপকনির্মাণকৌশলকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'কবিকল্পনায় রূপক সৃষ্টির প্রবণতা আকস্মিক বা হঠাৎ কিছু নয়, কবির বোধ ও উপলব্ধির গভীর প্রতীতীজাত অনুধ্যাননির্ভর সে প্রবণতা।' (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০২)। প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার অনুভববিশ্বের সরল উপস্থাপন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং সেই অনুভবকে তিনি এমন এক অবয়ব দিতে চান যার সংস্পর্শে পাঠকের প্রত্যাশার সীমা প্রসারিত হতে থাকে। রূপক কবির অনুভূতি, উপলব্ধি, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আর্তিকে গভীরতর এবং ব্যঞ্জনাধর্মী করে তোলে। (মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৮৪)। রূপকের আড়ালে কবির যে অভিব্যক্তি মুদ্রিত থাকে, তা আবিষ্কার করতে হলে পাঠককেও কল্পনাপ্রতিভার অধিকারী এবং সৃজনশীল হতে হয়। রূপককে স্রষ্টার অন্তর্জগতের দর্পণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই দর্পণে একজন পাঠক যে দৃশ্যের উদ্ভাসন অনুভব করেন, তার স্রষ্টা কেবল কবি একা নন, পাঠক নিজেও। পাঠকের অভিজ্ঞতার মাত্রা অনুযায়ী রূপকের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> রূপকে যে ভাব ব্যক্ত হয় তা' আসলে অবগুণ্ঠিত ভাব, এই ভাবটিকে রূপকাবরণ থেকে উদ্ধার করে প্রতীয়মান অর্থে বুঝবার দায়িত্ব পাঠকের। পাঠক যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহলে রূপক সৃষ্টির অর্থ মোটামুটি ব্যর্থ। এখানে

একটা কথা বলবার আছে যে সব পাঠকের বোঝবার ক্ষমতা যেমন সমান নয়, তারতম্যপূর্ণ; তেমনি যে অর্থটিকে পাঠক রূপকাবরণ থেকে স্পষ্ট করে তুলে নেন তার মধ্যেও তারতম্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এটি সত্য যে, বিচার বিশ্লেষণ পরিণতিতে একটা সত্যের জন্ম দেয়। সেদিক থেকে পাঠকের অনুধ্যান ক্ষমতার সকল তারতম্য সত্ত্বেও রূপকের প্রতীয়মান অর্থটি মোটামুটি পরিষ্কার হয়। (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০২)

ফররুখ আহমদ যে কবিভাষার নির্মাতা, তা রূপকাশ্রয়েই সংহত ও সপ্রতিভ। যে ভাবকে তিনি ব্যঞ্জনাধর্মী অবয়ব দিতে আগ্রহী, তাঁর রূপক সেই ভাবকেই বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত করে তোলে। পূর্বসূরী কবিবৃন্দ এবং তাঁদের সৃষ্টিকর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি, কিন্তু নিজের চলার পথটিকে নির্মাণ করে নিয়েছেন একান্তই নিজের মতো করে। 'ফররুখীয় কবিতার অন্তরাত্মা তাঁর একান্ত নিজের জিনিশ।'– আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৯৪ : ১১৯) এই মন্তব্যে ফররুখের কবিতার অন্তরাত্মার প্রাতিস্বিকতা স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর কবিতার উপজীব্য আত্মখচিত বলেই প্রকরণকৌশলেও তিনি পূর্বসূরী কোন কবির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। রূপক-নির্মাণেও তাঁর নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় বিশেষ কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যেমন লক্ষ করি, তেমনি কিছু রূপকেরও উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বহুল ব্যবহৃত কিছু রূপকের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

সাত সাগরের মাঝি

ক. কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিক্‌না সরে, ('সিন্দবাদ')
খ. ঘোরে উদ্দাম সিন্ধু ঈগল সমুদ্র-নীল ঝড়ে ('বা'র দরিয়ায়')
গ. বেদনা-নিসাড় দোলনার সুরে প'ড়েছিল পাশে লুটি ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')
ঘ. চাঁদের ভাটার ঝড়-তরঙ্গে যুঝে সে হ'য়েছে ম্লান ('আকাশ-নাবিক')
ঙ. সামুদ্রিক অতলতা হ'তে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে, ('ডাহুক')
চ. আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও : ('লাশ')
ছ. তুমি একদিন এনেছিলে বান– জীবন তুফান! ('নিশান')
জ. বাঁচাতে হবে এ ধূলি-লুণ্ঠিত গণ-জীবন! ('নিশান')
ঝ. অনেক ক্ষুধিত রাত্রি, আর বহু সামুদ্রিক পীড়া ('আউলাদ')
ঞ. সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত, ('সাত সাগরের মাঝি')

সিরাজাম মুনীরা

ক. রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান? ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')
খ. ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ আকাশের তলে শান্তি নিলয় খুঁজিয়া ফিরে। ('আবুবকর সিদ্দিক')
গ. চমকে তোমার অস্ত্রে অশনি-দীপ্ত দিন। ('উমর-দারাজ দিল')
ঘ. মিশে গেছে সংখ্যাহীন মানুষের মৃত্তিকা মিছিল , ('ওস্‌মান গণি)
ঙ. তীক্ষ্ণ শিকারী-চোখ শত্রুর টুটীর পরে...('আলী হায়দর')
চ. মৃত্যুসাগরে ঝাঁপ দিয়ে মোরা ভাঙবো ক্লান্ত প্রাণের ঘুম! ('শহীদে কারবালা')
ছ. হিংস্র পশুর হিংসা-নিপুণ পাশবিকতা।
ওত পেতে আছে ক্লেদ-পঙ্কিল শ্বাপদদল! ('আজ সংগ্রাম')
জ. সহস্র আগ্নেয় শিলা– বিচ্ছেদ-অনলে বহ্নিমান ('প্রেম-পন্থী')
ঝ. হৃদয়ের দীপাগ্নিতে দেখেছে প্রমত্ত দুর্নিবার ('মুক্তধারা')
ঞ. জাগে ম্লান-সূচি গুলে বকাওলী শিশিরের ঝর্ণায়– ('ইশারা')

নৌফেল ও হাতেম

ক. জাহান্নামে যাক্ জুয়া খেলা। সর্বস্বান্ত গরীবেরা
মারা পড়ে প্রতিদিন আজাজিল জুয়ারীর চালে; ('প্রথম অঙ্ক ॥ এক ॥ ২য় দর্শক')
খ. দেখ চেয়ে কৃষ্ণবর্ণ কেশ
তুষার-সফেদ আজ। বৃদ্ধ আমি দুর্বল জয়ীফ ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ বাদ্‌শা')

গ. বহু শকুনির দৃষ্টি জেগে আছে অলিতে গলিতে। ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ মুটিয়া')
ঘ. বিষ-তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখ চেয়ে জঙ্গের ময়দানে, ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ তিন ॥ বেগম')
ঙ. নিয়েছে প্রশান্তি কেড়ে সংশয়-বিদীর্ণ এ জীবনে। ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ তিন ॥ নৌফেল')
চ. কি সুখ্যাতি পাবে তুমি এই হিংসা-কণ্টকিত পথে? ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ মুর্শিদ')

মুহূর্তের কবিতা

ক. বুক পেতে নেয় সেই মৃত্যু-কঠিন নির্মমতা ('ঝড়')
খ. অথচ এখানে এই মৃত্যু-স্তব্ধ রাত্রির ছায়ায় ('ক্লান্তি')
গ. বিপুল শব্দের ঝড়, পারি না থামাতে চেন টেনে ('ট্রেনে/তিন')
ঘ. আগ্নেয় প্রশ্বাসে তার সে ফুল নিমেষে ঝরে যায়, ('ময়নামতীর মাঠে/চার')
ঙ. তোমার প্রতিভা-দীপ্তি মানে নাই শতাব্দীর ঘের ('ফেরদৌসী')
চ. অতন্দ্র সহস্র দীপ জ্বেলে যায় প্রাণাগ্নিতে তার, ('জামী')
ছ. ভাবের সমুদ্র থেকে দিল এনে বাণী এ সত্যের, ('জামী')
জ. ঘুমের খবর নিয়ে রাত্রি নামে মন্থর হাওয়ায়
বাধাবন্ধহীন; তবু জিজ্ঞাসায় সংশয়-সর্পিল। ('মোতিঝিল')
ঝ. খুলে যায় সে প্রশ্বাসে বিস্মৃতির নিরুদ্ধ দুয়ার, ('জিঞ্জিরা')
ঞ. এখানে শতাব্দী ঘন অন্ধকার মৃত্যুর দিঠিতে ('বন্দরের স্বপ্ন')

হাতেম তা'য়ী

ক. দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে... ('সূচনা খণ্ড ॥ উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী')
খ. অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা ('সূচনা খণ্ড ॥ হুসনা বানুর স্বগতোক্তি')
গ. কোথায় জীবন-তরী খুঁজে পায় অভীষ্ট মঞ্জিল ('পহেলা সওয়াল ॥ শাহাবাদে')
ঘ. কামনার নিম্নাবর্তে পাশবিক প্রবৃত্তির ভোজে, ('পহেলা সওয়াল ॥ পহেলা সওয়াল প্রসঙ্গে')
ঙ. মৃত্যুস্তব্ধ সে মহলে নৈঃশব্দ্যের সুর যেন বাজে, ('পহেলা সওয়াল ॥ পহেলা সওয়ালের রহস্যভেদ')
চ. বীভৎস রাক্ষস হিংস্রতম
অতি ক্ষুদ্র দুই চোখে জিঘাংসার আগুন জ্বালায়ে ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ সওয়াল ও সফর [চার]')
ছ. ...এক স্নেহছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী
– আল্লার সংসার।.. ('দুসরা সওয়াল ॥ সফরের পথে')
জ. হাতেম দেখিল চেয়ে মৃত্যুস্তব্ধ সেই শূন্য ঘরে ('দুসরা সওয়াল ॥ সওয়াল জবাব [পাঁচ])
ঝ. খঞ্জন-চপল দিন ছিল এই নদীর কিনারে, ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ দুস্‌রা সওয়ালের জওয়াব')
ঞ. প্রবৃত্তির পাশবতা অনায়াসে যে করেছে জয় ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ আলগুন পরী')

অনুস্বার

ক. প্রকৃত জান্তব সুখ রূপ পেল সে বস্তু-লোকের/স্বপ্নস্বর্গে ('নীল হাওয়া')
খ. বিস্ময়ে তাকায়ে থাকি তীরে এসে ও দেহ-নদীর ('পত্নী')
গ. আর সাথে নিত্য নব পণ্য-প্রেয়সীর তনুতল ('অভিজাত তন্দ্রা')
ঘ. চর্ম স্বর্গে অধিবাস শ্রেষ্ঠ জেনো ভনে তা বামনে ॥ ('চামড়া')
ঙ. বিপ্লবের বহ্নিশিখা অবরুদ্ধ দেশলাই কেস-এ ('দেশলাই')
চ. অহর্নিশ ব'য়ে যাই জনতার দুঃখের সংগিন। ('নেতা')
ছ. অতলে ডুবিল শুধু সে দাম্ভিক হিংস্র আজাজিল; ('একটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে')
জ. গভীর হতাশা গর্তে সমাগত গর্বের মরণ ('শরীফ')
ঝ. কবরে মূষিক ভাগ্যে তারাই জাগালো প্রহসন। ('ঠাট্টা')
ঞ. পালানো সম্ভব নয়, নাই অব্যাহতি

তোমার অতীব সূক্ষ্ম বুদ্ধিজাল হতে। (‘সুন্দরবনের মামার প্রতি’)

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ফররুখ আহমদের রূপকনির্মাণকৌশল অনুধাবন করা যায়। রূপকের আশ্রয়ে এক বস্তুর বৈশিষ্ট্যের আলোকে অন্য বস্তুকে স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতায় প্রচলিত রূপকের ব্যবহার যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি কবিতায় বিম্বিত বিশেষ পরিস্থিতিকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনে বিষয়ানুগ রূপকের সৃষ্টি করেছেন তিনি। রূপক নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর কবিভাষায় যে রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়, পাঠকের সৃজনভাবনায় তা যোগ করে ভিন্নতর দ্যোতনা। ফররুখ আহমদ উপমেয় ও উপমানের সংগতিসূত্র উপেক্ষা করে এই দুইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের যে প্রগাঢ়তা নির্দেশ করেছেন, তা পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কসেতু রচনায়ও পালন করেছেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

সমাসোক্তি

সমাসোক্তির আশ্রয়ে কবিতার ভাষা সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ করে। কবি তাঁর চৈতন্যের অনুভবকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন। সেই অর্থে সমাসোক্তিকে কবিভাষার একটি সাধারণ প্রবণতা বলা যায়। সমাসোক্তিতে বিষয় বা উপমেয়র ওপর বিষয়ী বা উপমানের স্বভাব বা ব্যবহার আরোপিত হয়। অচেতন ও বিমূর্তকে কবি চেতনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে ভাব কিংবা উপলব্ধিকে সজীব ও সক্রিয় করে তোলেন। কবিতায় আমরা যে চিত্ররূপময়তা প্রত্যাশা করি, তা সমাসোক্তির আশ্রয়েই অধিকতর অর্থবহ অবয়ব লাভ করে। কবিতায় অধিকাংশ সমাসোক্তিতে অপ্রাণীর ওপর প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের স্বভাব ও সক্রিয়তা আরোপিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রাণ বস্তুকে প্রাণময় করে তাকে ব্যক্তিচৈতন্যে অভিষিক্ত করার অভিপ্রায় থেকেই কবিতায় সমাসোক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কবি তাঁর প্রাণের স্ফুরণকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন। ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি সমাসোক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

সাত সাগরের মাঝি

ক. তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত, (‘বা’র দরিয়ায়’)
খ. চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়/পাহাড় পেতেছে জানু, (‘শাহ্‌রিয়ার’)
গ. ঘুমায় শ্রান্ত নার্গিস আঁখি জাগছে কেবল যুথী (‘আকাশ-নাবিক’)
ঘ. পাপড়ির দ্বার রুধি’ পদ্মের সুরভি কোথা চ’লেছে একেলা, (‘আকাশ-নাবিক’)
ঙ. ঝিমায় তারার দীপ স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশে আকাশে। (‘ডাহুক’)
চ. এই সব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে,
সেতারা উড়িছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে। (‘এই সব রাত্রি’)
ছ. প’ড়ে আছে মৃত মানবতা/তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে। (‘লাশ’)
জ. সম্মুখে ডেকেছে তারে হিংস্র-নীল তিমির পাথার; (‘আউলাদ’)

সিরাজাম মুনীরা

ক. তোমার আসার পথ চেয়ে চেয়ে আবেগে সকল আকাশ কাঁপে, (‘সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা’)
খ. বিস্ময় মানে তিমির-শেখর রাত্রি কঠিন শিলা-প্রতাত; (‘আবুবকর সিদ্দিক’)
গ. লু’ হাওয়ায় সেথা তীব্র পিপাসা, মৃত্যুর হাহাকার : (‘উমর-দারাজ দিল’)
ঘ. ধ্যান করে লুব্ধ মনে আজো এই ব্যথা-দীর্ণ দিন। (‘ওস্‌মান গণি’)
ঙ. নিমেষে সূর্য ছিঁড়ছে শাণিত অস্ত্রে আঁধি-প্রাকার (‘আলী হায়দর’)
চ. যদিও মাটির ক্রন্দন সুর/আকাশে আকাশে বাজে, (‘এই সংগ্রাম’)
ছ. সহস্র আগ্নেয় শিলা– বিচ্ছেদ-অনলে বহ্নিমান (‘প্রেম-পন্থী’)
জ. রাতের পাতার ঘুমভাঙা ফুল জাগাবে সে এই ঝড়ে, (‘ইশারা’)

মুহূর্তের কবিতা

ক. সাতটি উজ্জ্বল তারা ডাক দেয় যখন বন্ধুরে! (‘কোকিল’)

খ. উড়ে যায় ঝরা পাতা, বালু-বক্ষ মেঘনার তীর
বুক পেতে নেয় সেই মৃত্যু-সুকঠিন নির্মমতা, ('ঝড়')

গ. যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে, ('ক্লান্তি')

ঘ. শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি দেয় নীলার গম্বুজে! ('বিগত')

ঙ. আরক্ত সন্ধ্যার মুখে টেনে দিল রাত্রির নেকাব/মৃত্যুহীন অন্ধকার। ('সন্ধ্যায়')

চ. নিভৃতে হেনার মত যারা হেসে সুরভী বিলালো; ('লালবাগ কেল্লা')

ছ. মুমূর্ষু এ মৃত্তিকার উজ্জীবিত প্রশান্তির রেশ
অপূর্ণ সত্তাকে তাই নিয়ে গেছে পূর্ণতার দ্বারে। ('অশেষ ঐশ্বর্য')

জ. যখন হিমেল কবি আনে ব'য়ে স্বপ্ন কুয়াশার
পুঁথির জগতে ঘোরে রসান্বেষী কৃষাণের প্রাণ, ('পুঁথির আসর')

অনুস্বার

ক. বৃথা করে জ্বালাতন শতাব্দীর প্রাচীন সম্বিত। ('পন্থী")

খ. দুলিত গৌরব-দীপ্ত যুথিকার স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত ('আদর্শ')

গ. বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা, ('উর্দু বনাম বাংলা')

ঘ. ষাঁড়ের ভূমিকা জানি অভিনয় করিবে বাছুর ('জমিওয়ালা')

ঙ. ছুঁচোর কীর্তন শোনে শূন্য ঘরে বিমর্ষ ইঁদুর ('প্যাঁচ')

চ. যেখানে মৃত্যুর হাতে আমাদের সৌভাগ্য বন্দিনী
অভিযান করো সেই জুলমাতের কোকাফ্ পর্বতে। ('মুরুব্বী')

ছ. নিমেষে থামায়ে দিক তৃণের চটুল পরিহাস ('শেষ')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, অচেতন ও বিমূর্তের সঙ্গে চেতনের স্বভাব ও ক্রিয়ার সংযোগসাধনের মাধ্যমে ফররুখ আহমদ কবিতায় বর্ণিত বিষয়কে শৈল্পিক ও সংহত করার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্রাণ চেতনের ব্যবহার বা ক্রিয়া জড়বস্তু বা বিমূর্তে আরোপ করে ফররুখ আহমদ ব্যক্তিত্বের উষ্ণতাকে বিচিত্র পথে পরিবেশনের প্রয়াস পেয়েছেন।

অন্যাসক্ত

জড় বা বিমূর্তের ওপর সপ্রাণ চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দের প্রয়োগে অন্যাসক্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয়। মাহবুব সাদিক উল্লেখ করেছেন, বিশেষণের এই বিসঙ্গত প্রয়োগের ফলে পাঠকচৈতন্যে তার অভিঘাত নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয় এবং এর ফলে পাঠকের নতুন ভাবনাবৃন্তে আলোক সঞ্চারিত হয়। (১৯৯১ : ৩৫০)। অন্যাসক্ত অলঙ্কারকেও কবিভাষার একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ফররুখ আহমদের 'হারামি মওত ঢাকে সারা মন, দেহ' ('সিন্দবাদ'/*সাত সাগরের মাঝি*) পঙ্‌ক্তিটিতে মওত বা মৃত্যুর পূর্বে 'হারামি' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'হারামি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ জারজ, অতিশয় পাজি বা দুর্জন। গালি হিসেবেও এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানব-স্বভাবের নেতিবাচক দিকটির উন্মোচনে এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হলেও ফররুখ মৃত্যুর ভয়াবহতা বোঝাতে মানব-প্রবৃত্তির অনুকূল এই শব্দটিকে মওতের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। এভাবেই অন্যাসক্ত অলঙ্কার জড়বস্তু বা বিমূর্তের গতিবিধি বদলে দেয়। ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত আরো কয়েকটি অন্যাসক্ত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. কেশর ফোলানে পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ, ('বা'র দরিয়ায়'/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. উচ্ছৃঙ্খল রাতের ভুলের আজ বুঝি শেষ নাই, ('শাহ্‌রিয়ার'/*সাত সাগরের সাঝি*)

গ. লোভের বিকট ক্ষুধা বুকে নিয়ে অত্যাচারী পুরুষেরা চলে, ('লাশ'/*সাত সাগরের মাঝি*)

ঘ. সৌম্য বৃদ্ধ মহা পারাবার অতল প্রশান্তির ('আবুবকর সিদ্দিক'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঙ. ভারাক্রান্ত নৈরাশ্যের অন্তহীন শোণিত অশ্রুর উপরে জাগালে দ্বীপ! ('ওস্‌মান গণি'/*সিরাজাম মুনীরা*)

চ. সূর্য মুছিয়াছে বর্ণ গোধূলি মেঘের ক্লান্ত মিনারের গায়, ('মন'/*সিরাজাম মুনীরা*)

ছ. মিনারের দম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলিকণিকার ॥ ('মুহূর্তের কবিতা'/*মুহূর্তের কবিতা*)

জ. দম্ভ, অহমিকা যত লেখা ছিল মিনার চূড়ায় ('গোধূলি সন্ধ্যার সুর'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঝ. যেখানে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
দূরচারী বেদুইন ক্রমাগত ভুলে গেছে দিক ('ইতিহাস'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উদ্ধৃতিসমূহে নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত উপাদানসমূহ কবির চেতনার রঙ ধারণ করেছে বলেই পঙ্‌ক্তিসমূহ শব্দের স্বাভাবিক আর্থ-পরিধি অতিক্রম করে অনাস্বাদিত অনুভবের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। ফররুখের প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থেই অন্যাসক্ত অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। অচেতন ও অনুভবসম্ভব উপাদানসমূহকে চেতনের গুণ ও অবস্থার সমান্তরালে সংস্থাপন করেন তিনি, যা নিষ্প্রাণ ও বিমূর্তের স্বাভাবিক রূপ বা ধারণায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ফররুখ আহমদের কবি-স্বভাবের অনুকূল আবহ সঞ্চারে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত অন্যাসক্ত অলঙ্কার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

চিত্রকল্প

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি পাঠকচৈতন্যে চিত্রের আভাস দিলেই তা চিত্রকল্প নয়। কবির কল্পনাপ্রতিভা যখন পাঠকের সৃজনভাবনায় দৃশ্যের অতিরিক্ত অনুভব ও উপলব্ধির দ্যোতক হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই তা সার্থক চিত্রকল্পের মর্যাদা লাভ করতে পারে। চিত্রকল্পে দৃশ্যের ধারণা সুস্পষ্ট হলেও সেই দৃশ্যের গভীরে কবির আবেগঋদ্ধ অভিব্যক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য এবং এই আবেগী চিত্রের রঙে রেখায় কবির জীবনাভিজ্ঞতার সারাৎসার মুদ্রিত থাকে বলেই চিত্রকল্প নির্মাণকৌশল থেকে একজন কবির শিল্পভুবনের মৌল প্রবণতাটি চিহ্নিত করা যায়। পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাই চিত্রকল্পের অন্দরমহলে প্রবেশের প্রধানতম চাবিকাঠি। 'প্রতিটি ইমেজ যেন ইম্যাজিনেশনে পৌঁছবার রাস্তা।'– চিত্রকল্প বিষয়ে অমলেন্দু বসুর (১৯৭১ : ৭) এই মন্তব্যে যে রাস্তার দেখা মেলে, সেখানে চলতে গেলে পাঠকের মনকেও কবির কল্পনাপ্রতিভার অনুকূলে ঢেলে সাজাতে হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রকল্পের জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন, এর মাধ্যমে কবি তাঁর অভিজ্ঞতার একটি সংহত ও শিল্পসম্মত অবয়ব নির্মাণ করতে চান। (১৯৮৪ : ৯)। বস্তু ও কল্পনার আদান-প্রদান স্বাস্থ্যকর ও শিল্পসম্মত হলেই সার্থক চিত্রকল্পের সৃষ্টি হতে পারে। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, 'চিত্রকল্প শেষ-পর্যন্ত কল্পনারই শস্য, বস্তু ও কল্পনা দুইকেই নতুন অর্থে উত্তীর্ণ করে চিত্রকল্প : বস্তুকে করে কাল্পনিক, কল্পনাকে করে বস্তুগত। বস্তু ও কল্পনার মিলনে কবিই হন সংঘটক, ঐ দুয়ের মিলনে চিত্রকল্পের জন্ম হয়।' (১৯৯৩ : ১৬৬)। অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বয়ান কবির কাজ নয়, কয়েকটি নির্বাচিত শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাসেই তাঁর অন্তর্গত অভিব্যক্তি স্ফটিকসংহতি লাভ করে। এভাবেই নির্মিত হয় চিত্রকল্প, যার বৈভবে কবিতার ভাষা চিত্র ও রূপের মিথস্ক্রিয়ায় মধুর ও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> কবিতার সকল 'বাক্‌চিত্র'-ই চিত্রকল্প নয়, কবি ত্রিবিধ গুণধর্ম– অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা এবং আবেগ-কল্পনা সঞ্চার করে 'বাক্‌চিত্র'-কে রূপান্তরিত করেন চিত্রকল্পে। শব্দনির্মিত চিত্র ইমেজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও, চিত্রকল্প কেবল চিত্র-নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকে না। চিত্রশিল্প যেমন শুধু চোখকে তৃপ্ত করে না, উদ্বুদ্ধ করে কল্পনাকেও, জন্ম দেয় তৃতীয় মাত্রার– চিত্রকল্পও তেমনি তৃতীয় মাত্রার জনয়িতা। উপমান চিত্রের অপূর্বত্ব এবং কল্পনাপ্রসারী গুণ চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত। উপমেয়-উপমানের ব্যঞ্জনাসম্ভব পটে চিত্রকল্প সৃষ্টি করে তৃতীয় মাত্রার আবেগ। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০২ : ১৪)

সমালোচকের এই মন্তব্যে চিত্রকল্পের কুললক্ষণ বিষয়ে যে বিবেচনা সুপ্রকাশিত, 'তা পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে নতুন অভিজ্ঞতার আবরণ' এবং এই প্রক্রিয়ায়ই কবিতায় সঞ্চারিত হয় সজীবতা ও প্রাণময়তা, যার মাধ্যমে কবিতা লাভ করে আত্যন্তিকতার বেগ এবং এভাবেই পাঠকচৈতন্যে ছড়িয়ে পড়ে মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা।

ফররুখ আহমদের কবিতা চিত্রকল্পপ্রধান নয়। বাক্‌চিত্রকে চিত্রকল্পে রূপান্তরের চেয়ে কবিতার ভাব ও অভিব্যক্তির একটি সুনির্দিষ্ট বৃত্ত নির্মাণ করতেই অধিকতর উৎসাহী তিনি। কিন্তু পাঠককে সেই বৃত্তের ভেতরে প্রবেশের জন্য ফররুখ যে আমন্ত্রণপত্র রচনা করেন, তা বিচিত্র যৌক্তিক শৃঙ্খলায় সপ্রতিভ হলেও সেই যুক্তি মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ভাষাকাঠামোর অনুগত নয়, তা কাব্যভাষারই নিকটতম প্রতিবেশী। তাই বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হন নি কবি, বক্তব্যের সারাৎসারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কখনো কখনো চিত্রকল্পের 'ত্রিবিধ গুণধর্ম– অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা এবং আবেগ-কল্পনা'কেও প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। ফররুখের কবিতায় চিত্রকল্প-প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন :

> ফররুখ আহমদ চিত্রকল্পবাদী কবি ছিলেন না; কিন্তু অনেক চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায়। বিশেষত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) অসম্ভব সালংকারা। ফররুখের কাব্যগ্রন্থাবলির মধ্যে এই বইটিই সর্বাধিক চিত্রকল্প-ঋদ্ধ। আমাদের চল্লিশের কবিদের মধ্যে ফররুখই সর্বাধিক সফল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। আর সাধারণভাবে বাংলা কবিতায় ফররুখের সমকালীন কবিদের মধ্যে দিনেশ দাসকে বলা যায় চিত্রকল্পী কবি : দিনেশ দাসের কবিতার প্রতিটি উচ্চারণ চিত্রকল্পময় : তাঁর বিশ্বাস মার্কসবাদে,...সব সময়ই তিনি কথা বলেন প্রতিমায়, যে-প্রতিমা উপমা থেকে প্রতীক অবধি সঞ্চরণ ক'রে ফেরে কিন্তু তার আদি প্রতিমারূপক-কে সতত জাগ্রত রাখে অন্তরে। চিত্রকল্প প্রয়োগে তাই ফররুখের সঙ্গে দিনেশ দাসের তুলনা করা চলে। চল্লিশের কবিদের মধ্যে যাঁরা কিছু বাকপ্রতিমা ব্যবহার করেছেন, যেমন– রাম বসু, তাঁর সঙ্গেই তিনি বরং তুলনীয়। পদ্ধতি ভিন্ন– কিন্তু দুজনের লক্ষ্যই একটি পরিচ্ছন্ন, শোষণহীন, উজ্জ্বল, আদর্শ সমাজ। চিত্রকল্পের সঙ্গে কল্পনার মিশেল থাকে; আদর্শবান কবির হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগ্রত থাকে এক স্বপ্ন; সুতরাং ফররুখ আহমদ বা রাম বসুর মতো আদর্শবাদী কবির রচনায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ স্বাভাবিক। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৬৬)

বিশ শতকের চল্লিশের কবিতার সমাজসচেতন ধারায় কেউ দীক্ষিত হয়েছেন মার্কসবাদে, কেউবা ইসলামী জীবনাদর্শে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধকেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট ফররুখের কবিতায় নির্মিত চিত্রকল্পে মানবিক বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ধরা পড়েছে, কখনো আবার এই বিপর্যয় থেকে মুক্তির স্বপ্নকেও তিনি চিত্রকল্পে ধারণ করেছেন। 'ফররুখ যেখানে কল্পনাময় সেখানেই ভালো কবিতা লিখেছেন, ভালো চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু যেখানে তিনি বাস্তবতার দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে তাঁর কবিতা পতিত হয়েছে। চিত্রকল্পও জমেনি।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৬৬-৬৭)। ফররুখের কবিতায় বৈষয়িক পরিমণ্ডল প্রসঙ্গে আমরা যেমন কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেছি, তেমনি তাঁর কবিতায় নির্মিত চিত্রকল্পেও কয়েকটি নির্বাচিত মোটিফ-উৎসের উপর্যুপরি ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। ফররুখের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

সাত সাগরের মাঝি

ক. পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ
পাথর জমানো দরিয়ার তীরে মওতের বুকে আহা,
কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দবাদ! ('সিন্দবাদ')

খ. কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল
সারারাত ভরি তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল। ('বা'র দরিয়ায়')

গ. কাল ঝোড়ো রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল কত দরিয়ার নীল ছাঁচে,
সফরের মায়া টানছে আমাকে দূর হ'তে আরো দূরে–
নোনা দরিয়ার আকাশ আমার জাগছে বুকের কাছে;
আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ, রস
জমে গাঢ় হ'য়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ– ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

ঘ. আগুনের মত জ্বলে বুকে ইনসাফ,
সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব
জড়োয়া জড়ানো কিংখাবে জাগে এ মন সর্বহারা,
খুঁজে ফেরে শুধু দিলের দোসর তার;
চিড় খেয়ে বুকে জেগে ওঠে শুধু সাথীহারা হাহাকার। ('শাহ্‌রিয়ার')

ঙ. তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম–
অন্তরের ঘ্রাণ–
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে

পাপড়ির 'পরে,
মনের আকাশে
প্রশান্ত সুপ্তির মত ব্যথাভারাক্রান্ত তার গন্ধ ভেসে আসে ॥ ('আকাশ-নাবিক')

চ. চাঁদের দুয়ারে
যে সুরার তীব্র দাহে ভেসে চলো উত্তাল পাথারে,
প্রান্তরে তারার ঝড়ে বিবর্ণ পালক,
নিমেষে রাঙায়ে যায় তোমার নিষ্প্রভ তনু বিদ্যুৎ ঝলক,
তীর-তীব্র গতি নিয়ে ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা,
মৃত অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায় সাড়া ('ডাহুক')

ছ. আকাশেরে করিয়া চৌচির
তার কান্না লুটে পড়ে
উত্তর সাগর তীরে দক্ষিণের সামুদ্রিক ঝড়ে,
সন্ধান করে সে ইতস্তত
নীড় হারা শ্রাবণের পাখিদের মত। ('ঝরোকা'য়')

জ. এই সব আঁধারের পানপাত্র, মর্মর নেকাব
ছাড়ায়ে হীরার কুচী, জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব,
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে;
ঝরিছে রক্তিম চাঁদ আঁধারের বালিয়াড়ি পারে। ('এই সব রাত্রি')

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ফররুখ আহমদের চিত্রকল্প ব্যবহারের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। কবির কল্পনাপ্রতিভা চিত্র ও রূপের মিথস্ক্রিয়ায় যে চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে, তা পাঠকের সৃজনভাবনায় যোগ করেছে অভিনব দ্যোতনা। 'কবিতার জন্যে দরকার কল্পনার জয়, চিত্রকল্পের জন্যে দরকার কল্পনার জয়।'– আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৯৩ : ১৬৭) এই মন্তব্য থেকে সার্থক কবিতায় চিত্রকল্পের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ফররুখ আহমদ অন্ধকার রাত্রির বিপুল প্রতিবন্ধকতাকে যখন ফাঁদ হিসেবে কল্পনা করেন, তখন রাত্রির একটা ভয়াল, বিপদসঙ্কুল বাস্তবতা রূপায়িত হয়, যা চোখের সীমা অতিক্রম করে মনের অলিন্দে প্রবেশের দুঃসাহস দেখায়। 'মওত' উপমান যখন 'পাথর জমানো দরিয়া' উপমেয়র ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, তখন সিন্দাবাদের অন্তরে নতুন জীবনের আঘ্রাণ কর্পূরের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। জীবনের ঘ্রাণ উপভোগের মধ্যে ফররুখের কল্পনাপ্রতিভা চমৎকার শিল্পসফলতা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি খ-এর হাওয়া কেশর ফুলিয়ে পালের বুকে আলোড়ন তুলেছে, চাঁদ নেমে এসেছে মাস্তুলের গায়ে এবং তা বাতাসের দোলায় দোল খাচ্ছে। আকাশের তারা রাতের বুকে যে আগুন ছড়িয়ে দেয়, তাই যেন স্বপ্নের পথপ্রদর্শক যা তাজীতে সওয়ার হয়ে দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। দরিয়ার জলের তোলপাড় কবির বুকের ভেতরে জেগে ওঠা ঝড়ের প্রতিভূ হিসেবে অসাধারণ। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত দাঁড়ের আঘাতে জেউর, হিরা ও জহরতের মতো মহামূল্য অনুভব সঞ্চার করেছে। উপমা-নির্ভর এই চিত্রকল্পে সফরের প্রতি প্রবল আকর্ষণেরও একটা দৃশ্যযোগ্য অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। নোনা দরিয়া ও আকাশের দূরত্ব গেছে ঘুচে, সৃষ্টিকর্তার 'অফুরান রূপ, রস' যখন জমাটবদ্ধ হয়ে হীরাকষ হয়ে ওঠে, তখন কবির কল্পনা পাঠকের নানা ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে। উদ্ধৃতি ঘ-এ মানুষের সুবিচার, সুবিবেচনা আগুনের উপমায় নির্মিত। ফলে বিমূর্ত অনুভব একটা মূর্তিমান সত্যের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রতিকূল সমাজবাস্তবতায় মানুষের সুস্থ-সুন্দর-কল্যাণের ধারণাকে কবি আলোকোজ্জ্বল সামিয়ানার নীচে কবরের শান্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির সর্বহারা মন মূল্যবান রেশমি কাপড়ের আচ্ছাদন ভেঙে বাইরে চলে আসে। প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যবঞ্চিত বেদনা যখন কবির বুকে ফাটল ধরিয়ে দেয়, তখন কষ্টকেও আমরা নেড়েচেড়ে দেখতে পারি, কষ্টের শরীরে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে ভাবতে পারি, এ যাত্রার এখানেই শেষ নয়, আমাদের জন্য নিশ্চয়ই আলোকিত আগামী অপেক্ষা করছে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবির প্রেম যখন ঘ্রাণ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সচকিত হয়। আবার এই প্রেম যখন পাপড়ির শরীরে এবং মনের আকাশে ঝরে পড়ে, তখন সেই পতনের দৃশ্যও

আমাদের কল্পনায় নতুন অনুভব সঞ্চার করে। কবির প্রেম যে গন্ধের শরীরে ভর দিয়ে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে চায় তা 'প্রশান্ত সুপ্তির মত ব্যথাভারাক্রান্ত', অর্থাৎ, গন্ধ তখন কেবল অনুভবসম্ভব অনুষঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা আমাদের হাতের নাগালে চলে আসতে চায়। চ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ডাহুকের ডাক চাঁদের দুয়ারে সুরার তীব্রতা নিয়ে ভেসে চলে যায়। কবির চেতনার প্রান্তরে ঝড় যে বিবর্ণ পালক ছড়িয়ে দেয়, তা কবির বেদনারই প্রতিভূ। প্রান্তরের ঝড়ে ডাহুকের দেহ-মনে যে বিদ্যুৎ ঝলক খেলে যায়, তা মৃত অরণ্যের শরীরেও প্রাণ-সঞ্চার করে। এই ঝড় নীল হয়ে অরণ্য থেকে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অরণ্য ও সমুদ্র কেবল প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবেই কবিতায় উল্লিখিত হয় নি, তা মানব-মনের গভীরতম প্রদেশের নানা প্রান্তের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ছ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কান্না আকাশকে চৌচির করে দেয় এবং এই বেদনার বিষে উত্তর সাগর তীর এবং দক্ষিণের সামুদ্রিক ঝড় নীল হয়ে যায়। মানুষের যে কষ্ট 'নীড় হারা শ্রাবণের পাখিদের মত' হয়ে যায়, সেই কষ্ট কেবল অনুভবসম্ভব নয়, তা স্পর্শযোগ্য ও দর্শন-উপযোগী। উদ্ধৃতি জ-এর অন্ধকার পানপাত্রের অবয়ব লাভ করেছে এবং অন্ধকারের আচ্ছাদনকে কবি কল্পনা করেছেন মর্মর নেকাব হিসেবে। এই অন্ধকারেই হীরার কুচির মতো জ্বলে ওঠে জুলেখার স্বপ্ন এবং 'লায়লির রঙিন শারাব'। কেনান শহরের এক নিভৃত ঘরের ছবি আঁকেন কবি, যেখানে রক্তবর্ণ চাঁদ বৃষ্টির মতো বেদনা ছড়াতে থাকে এবং সেই বেদনা অন্ধকারের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পাঠকের চেতনার চত্বরে কালোত্তীর্ণ প্রেমের আবহ সঞ্চার করে। এই চিত্রকল্পে জুলেখা ও লায়লির উপস্থিতি পাঠককে রোমান্টিক প্রণয়কুঞ্জে পরিভ্রমণের আনন্দ এনে দেয়। এই আনন্দ বেদনার গভীর থেকে উঠে আসে বলেই তা যুগের সীমানা অতিক্রম করে সর্বকালের মানব-সম্পর্কের সৌরভ ও স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। 'বস্তু ও কল্পনার মিলনে' নির্মিত এইসব চিত্রকল্প থেকে ফররুখ আহমদের শিল্পদৃষ্টির গতিপ্রকৃতি চিহ্নিত হয়ে যায়।

চিত্রকল্প-বিষয়ক আলোচনায় *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের 'বন্দরে সন্ধ্যা' কবিতাটি স্বতন্ত্র বিবেচনার দাবি রাখে। এই কবিতায় অনেকগুলো সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন কবি। একটি চিত্রকল্প অন্য চিত্রকল্পের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ায় সম্পূর্ণ কবিতাটিই হয়ে ওঠে একটি দূরসঞ্চারী চিত্রকল্পের দ্যোতক। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করা হল :

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
–অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোড়ে রাত্রির নিষাদ।
আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহ্বান,
তরুণীর মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,
এদিকে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদ : রমজান;
ক্ষীণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় যৌবনের প্রাচুর্য : পূর্ণিমা।

ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়ষীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে;
অনেক সমুদ্র তীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির,
তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে ॥ ('বন্দরে সন্ধ্যা'/*সাত সাগরের মাঝি*)

ফররুখ আহমদের কল্পনাপ্রতিভা এই কবিতাটিতে অসাধারণ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। এই কবিতাটিতে ফররুখ তাঁর পাঠককে আরব সাগরের স্নিগ্ধ জলের গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু সেই গল্প বিশেষ কোন পারম্পর্যে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই কবিতাটিতে পাঠকের সৃজনপ্রতিভা অনেক বেশি সক্রিয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততা দাবি করে। এই কবিতায় ফররুখ বাস্তবতার আঘাত ও অত্যাচার অতিক্রম করে কল্পনার অবাধ প্রান্তরে প্রবেশ করেছেন বলেই কবিতায় বিম্বিত চিত্রকল্পসমূহ অনেক বেশি সরব ও সপ্রতিভ। এখানে কল্পনার গতি অবরুদ্ধ নয়, বরং কল্পনার নির্দেশেই কবি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার

সারাৎসারকে এই কবিতায় সংস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে এটি অসাধারণ চিত্ররূপময় কবিতা হয়ে উঠেছে। 'বন্দরে সন্ধ্যা' সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> 'বন্দরে সন্ধ্যা' এক জটিল চিত্রকল্পময় কবিতা। এক চিত্রকল্প গড়িয়ে পড়ছে অন্য চিত্রকল্পে। বন্দরে সন্ধ্যার সঙ্গে এক সদ্যতরুণীর যৌবনে প্রথম পথিকের আসন্নতার একটি বর্ণনা আছে। আরবি-ফারসি শব্দ কয়েকটি মাত্র : রমজান, মুসাফির, সেহেলি।...এখানে যেন ফররুখের চেতন-অবচেতন একত্রে লীলা করেছে। এমনকি বুঝি তাঁর অবচেতন যৌনতাও সক্রিয়– রোমান্টিকতায় সমাচ্ছন্ন। চোদ্দো লাইনের সনেটের প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দ 'গোধূলি', আর শেষ পঙক্তির শেষে 'রাত্রির অঙ্গন'– গোধূলি থেকে রাত্রির রূপান্তরের মধ্যে ষোলো পাপড়িতে ঘেরা এক ষোড়শীর নারীতে রূপান্তরের নিঃশব্দ ইতিবৃত্তও হয়তো বর্ণিত। আর ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণের পর বিশেষণ : গোধূলি-তরল হরিণ, অন্ধকার ধেনু, শ্যান্ত মুসাফির, অগ্নির্বণ সেহেলি, বিমুগ্ধ স্বপ্ন, নিভৃত ইঙ্গিত, পুষ্পিত গহন, স্বপ্নময় শিরি, সোনালি ফুল : এই বিশেষণগুলিই কবিতাকে রঙিন, সচল, অর্থবান করেছে। মাছরাঙার মতো বর্ণময় কবিতাটি : এইটুকু কবিতার মধ্যে কতো রঙের খেলা চলেছে : পাটল, রক্তিমা, অগ্নিবর্ণ, সোনালি। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৬৯-৭০)

ফররুখ আহমদ *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যেই সবচেয়ে বেশি শিল্পসফল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। এই কাব্যে বাস্তব পৃথিবীর নানা অসঙ্গতির ছায়াপাত লক্ষ করা গেলেও, সেই বাস্তবতার শরীরে কল্পনার পোশাক পরিয়ে তিনি কাব্যদেহের সৌন্দর্য সংরক্ষণে মনোযোগী হয়েছেন। কল্পনাকে বুদ্ধির দণ্ডে মন্থন করেন নি তিনি, বরং একে আবেগের উষ্ণ জলে সন্তরণের সুযোগ দিয়েছেন। ফলে এই কাব্যের চিত্রকল্পসমূহে ফররুখের চেতনালোকের অর্ন্তগূঢ় অনুরণন অধিকতর প্রবল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও তিনি কিছু সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। আমরা ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো কিছু চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

সিরাজাম মুনীরা

ক. সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির-বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. ক্ষয়ে যাওয়া কত চাঁদের শিখায় নধর জোছনা শিশু,
শুকনো মাটির গোলাপের চারা কৌতুকে আঁখি মেলে
জীবনরসের পূর্ণ পাত্র বেড়ে ওঠে অবহেলে। ('আবুবকর সিদ্দিক')

গ. তুলেছে তোমার বদ্দু আকাশে মরু-প্রান্তরে খিমা
দারাজ দিলের প্রসারণ ভাঙে দূর দিগন্তে সীমা
জানি না কেমন ক'রে এ-মরুতে এল সে প্রাণের ঝড়,
নিমেষে ধরণী ছেয়ে নিল অম্বর,
ওড়ে কালো সিয়া জড়তার দুর্জয় কশাঘাতে,
আঁধার, ঊষর প্রান্তর কেঁপে শঙ্কাতে... ('উমর-দারাজ দিল')

ঘ. তবু তূর পর্বতের সেই তরু, – তরু মৃত্তিকার,
আবেগে আবেশে প্রেম করিতেছে ধূলায় বিস্তার। ('ওস্‌মার গণি')

ঙ. সকল অত্যাচারের মধ্যে ওঠে দিয়ে মাথা নাড়া
দারাজ বাহুতে সংহত করি অগ্নিগিরির ধারা
ইসলামী জোশে বেহুঁশ পাগল-পারা
খোলে একে একে মানবতার সে চির-নিরুদ্ধ কারা। ('আলী হায়দর')

চ. নিমেষে সূর্য ছিঁড়ছে শাণিত অস্ত্রে আঁধি-প্রকার
চমকে জুলফিকার
জেহাদের মাঠ চাষ ক'রে তার মেঘে ওঠে হুংকার... ('আলী হায়দর')

ছ. প্রতি মুহূর্তে শ্বাপদ তুলিছে ফণা
হানি পরাজয়ী বিষাক্ত যন্ত্রণা,
ক্রূর হীনতার পিছল পথে সে
বিষাইছে রাত্রিরে ॥ ('এই সংগ্রাম')

Dhaka University Institutional Repository

নৌফেল ও হাতেম

ক. ...কখনো আরণ্য-অন্ধকারে
ডুবে গেছে এ পৃথিবী, যেন শ্রান্ত ইউনুস নবীকে
সামুদ্রিক মৎস্য গ্রাস করেছে সহজে,... (‘দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ হাতেম’)

খ. হিংস্র আজদাহার মত এই প্রাণ তার খোঁজ চায়
যে নিল সকল শান্তি, আনন্দ, আরাম। (‘ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চার ॥ নৌফেল’)

গ. সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ অন্ধকার রাত্রির মতই
নেমে আসে নৈরাশ্য অশেষ। (‘তৃতীয় অঙ্ক ॥ তিন ॥ নৌফেল’)

ঘ. অনিশ্চিত অন্ধকারে কাফেলা যেমন
মঞ্জিলের রাহা ভুলে দীর্ণ হয় তীব্র বচসায়
বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন পথে; তিক্ত চিন্তা তেমনি প্রাণের
নিয়েছে প্রশান্তি কেড়ে সংশয়-বিদীর্ণ এ জীবনে। (‘তৃতীয় অঙ্ক ॥ তিন ॥ নৌফেল’)

ঙ. গলিত কুষ্ঠের মত, বিষাক্ত ক্ষতের মত এই যন্ত্রণা দুঃসহ। (‘তৃতীয় অঙ্ক ॥ চার ॥ নৌফেল’)

মুহূর্তের কবিতা

ক. রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারীর রগ ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ আসমানে শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর, (‘বৃষ্টি’)

খ. আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়,
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখি একা আর ফেরে না বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়। (‘ক্লান্তি’)

গ. ক্ষণিকের অবকাশ– শিশির কণিকা দুর্বাঘাসে
কান্নার সমুদ্র এক রেখে যায় সুরে ও সঙ্গীতে ॥ (‘সন্ধ্যায়’)

ঘ. যেমন ভোরের রঙ মিশে যায় বিস্মৃত নিমেষে,
থাকে না ঝড়ের চিহ্ন যেমন বনের কালো কেশে;
তেমনি সে গেছে তার জীবনের কাহিনীকে ঢেকে। (‘যন্ত্র’)

ঙ. গুমোট দিনের শেষে নামে যেথা আলোর প্লাবন
যেখানে রাণীর মত গেয়ে ওঠে রাত্রির পূর্ণিমা ॥ (‘পূর্ণিমা’)

হাতেম তা’য়ী

ক. তন্দ্রাহারা মোরাকাবা শেষে
সত্যের ইশারা পেয়ে জেগে ওঠে উল্লাসে যেমন
ধ্যানী সাধকের আত্মা, সেই মত ’য়েমনী হাতেম
সঙ্কীর্ণতামুক্ত চিত্তে পেল ফিরে দীপ্ত অনুভূতি
জীবনের,– অন্ধ কূপে এল যেন সুবে উম্মীদের
মুক্ত রশ্মি-প্রবাহ বিপুল। (‘সূচনা খণ্ড ॥ পরিচিতি’)

খ. মুক্ত সফরের মুখে সিতারার আলোক যেমন
পাড়ি দিয়ে আসে পথে আঁধারের স্তর অগণন,
সংখ্যাহীন মাঠ আর বেশুমার বিয়াবান ঘুরে
দুর্গম পাহাড় শেষে অরণ্যের সুপ্ত অন্তঃপুরে
মুনীর শামীর সাথে শাহাবাদ পৌঁছিল হাতেম। (‘পহেলা সওয়াল ॥ শাহাবাদে’)

গ. ভোরের সিতারা ওঠেনি এখনো, দেখ রাত্রির
বেদনা জমেছে তৃণের শিয়রে– অশ্রু শিশির।(‘দুস্‌রা সওয়াল ॥ হাতেম তা’য়ী ও হাস্‌না পরী’)

ঘ. অথচ হারানো দিন জেগে থাকে হৃদয়ে আমার,
যেমন শীতের পাখী উড়ে গেলে রক্তিম পালক
পড়ে থাকে ক্ষীণ-স্রোতা নদীতীরে, সূর্য অস্ত গেলে
প্রাণস্পর্শ থাকে তার নারঙ্গী আনারে, ফসলের
দিন শেষে রিক্ত মাঠে থাকে শস্য দানা, তেমনি এ
হৃদয়ের অন্ধকারে জেগে থাকে হারানো দিনের
ঐশ্বর্য; ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী')

ঙ. নিকষ ছায়ার মত বিগত দিনের
সে কাল অধ্যায় এক মসীলিপ্ত চলে সাথে সাথে
ক্রমাগত ছায়া ফেলে মনের মাটিতে। ('চাহারম সওয়াল ॥ চাহারম সওয়ালের জওয়াব')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে ফররুখ আহমদ চিত্রকল্পের আশ্রয়ে চিত্তের গভীরতম প্রদেশে আলোক-প্রক্ষেপণের প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতার ভাবকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করেই ক্ষান্ত হন না তিনি, সেই ভাবের স্পর্শে তাঁর কবিতার পাঠক যেন ভাবনার এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে যান। পাঠকের সৃজনশীলতা ও কল্পনাপ্রতিভা সক্রিয় হলেই ফররুখের চিত্রকল্প-নির্ভর কবিতার অভিনবত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'তাঁর রচিত চিত্রকল্প বাস্তবতা থেকে যতো উৎসারিত, তার চেয়ে বেশি নির্মুক্ত হয়েছে কল্পনা থেকে। যুক্তি ও আবেগকে এভাবেই ফররুখ মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সার্থক চিত্রকল্পে।' (১৯৯৩ : ১৭২)। ফররুখের কবিতায় বস্তু ও কল্পনার বিবাহবন্ধনের পরিণাম হিসেবে যে চিত্রকল্পের জন্ম, তা সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান, অর্থাৎ শৈল্পিক। 'তাঁর বাক্‌প্রতিমার চিত্রময়তা, ধ্বনিরূপ প্রবলতা এবং স্বাদলিপ্ততা এক বৈভবমণ্ডিত সম্পদ।' (বিপ্রদাশ বড়ুয়া ২০০৯ : ৩৭)। ফররুখ আহমদের কবিতায় নির্মিত এই শিল্পসম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারী যে প্রতিভাবান পাঠক, তাকে কেবল দৃশ্যের গভীরে ডুব দিয়ে তৃপ্ত হলে চলে না, অদৃশ্য ও অনুভবসম্ভব অভিজ্ঞতায়ও তাকে ঋদ্ধ হতে হয়।

প্রতীক

ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা সঞ্চারের অভিপ্রায় থেকেই প্রতীকের জন্ম। প্রতীক এমন এক অনবগুণ্ঠিত আন্তরিক অভিব্যক্তি যা কেবল পাঠকের অনুভবের জগতেই সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। কবির জীবনবোধের গতি ও গভীরতার স্মারক হিসেবেই কবিতায় প্রতীক-রহস্য নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রূপক নির্মাণে যেমন অভিজ্ঞতার সংহতি অপরিহার্য, তেমনি প্রতীক নির্মাণেও প্রয়োজন গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির, যা একজন কবিকে 'প্রতীকের ঘন গভীর রহস্য সৃষ্টি'তে অনুপ্রাণিত করে। 'আর এ জন্যেই রূপক প্রতীকের ভাবসংকেতে লীন হয়ে যায়, কেননা রূপককে চরমে টেনে নিয়ে গেলে হয় প্রতীক।' (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০২)। কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের মতোই রূপক ও প্রতীক পরস্পরে প্রোথিত হয়ে কাব্যদেহে লাবণ্য সঞ্চার করে। 'যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রতীকের সৃষ্টি। বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মানুষের অভিজ্ঞতাই প্রতীকে সংহতি লাভ করে। পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা ও অর্জনের উত্তরাধিকারী হিসেবে যে কোনো যুগের সৃজনশীল মানুষ তা কেবল ভোগই করেন না, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তাঁরা তুলে দেন নতুন ফসল। এভাবেই কবিতায় প্রতীকের পরম্পরা রচিত হয়।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১৪৩-৪৪)। প্রতীক কবির আত্মবিকাশের পথকে প্রসারিত করে বলেই রোমান্টিক কবিকল্পনায় তা খুবই প্রভাবসঞ্চারী শিল্প-অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। প্রচল কাঠামোর বাইরে গিয়ে আত্মখচিত শিল্পবিশ্ব নির্মাণের প্রয়াসও একজন কবিকে প্রতীক নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> রোমান্টিক কবিকল্পনায় প্রতীক সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার্য। রোমান্টিক আর্ট 'বাহিরিন্দ্রিয়ের দাস্য' থেকে আমাদের চিন্তার মুক্তি ঘটিয়েছে। সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে এমন একটা যুগ ছিল যখন সবকিছুই ছিল প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার অনুবর্তী; সেখানে চিন্তা, ভাবনা, মানসিকতা সবকিছুরই ব্যাপারে সীমারেখার শক্ত শাসন ছিল। এ জন্যই প্রকাশে দেখা দিয়েছিল বিপুল গতানুগতিকতা। ক্লাসিক সাহিত্য কল্পনার প্রাচুর্যভরা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে হৃদয়ের সূক্ষ্ম কারুকাজের অভাব প্রচুর। আত্মবিকাশের পথের অভাবই এর জন্য দায়ী। প্রকাশের মধ্যে যদি বাঁধভাঙ্গা প্রেরণা না থাকে তাহলে তা

Dhaka University Institutional Repository

> যে অবরুদ্ধতার গ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ কি? রোমান্টিকতা সব বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে– ন্যায়, নীতি, শাসন, সীমা, মূল্যবোধ সবকিছুই। আবেগের জোয়ারে সবকিছু ভেসে গেছে, বক্তব্যের সীমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে এবং এইভাবেই আবেগ প্রতীকের মধ্যে সঞ্জাত হয়েছে। (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০১)

ফররুখ আহমদের কবিতায় যে জগতের প্রত্যাশা প্রতিভাত, তা তাঁর রোমান্টিক কবিকল্পনারই ফল এবং সেই জগৎ নির্মাণের প্রয়োজনেই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে বিশেষ কিছু প্রতীকের ওপর। একইসঙ্গে তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে বেশ কিছু অভিনব প্রতীক। তাঁর কবিতার প্রতীক নির্মাণকৌশল আলোচনায় শিল্প-সমালোচক আহমদ কবিরের উপরিউক্ত মন্তব্যের অনেক অংশই হয়তো মেলানো যাবে না, কিন্তু প্রতীকের শক্তি ও সমৃদ্ধি বিষয়ে সমালোচকের বিবেচনা ফররুখের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য বলে আমরা মনে করি। ফররুখ আহমদ রোমান্টিকতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভেসে যাওয়াকে নিরাপদ মনে করেন নি। 'ন্যায়, নীতি, শাসন, সীমা, মূল্যবোধে'র বিপর্যয়ের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন তিনি, যদিও কবির এই অবস্থান রোমান্টিক চেতনারই নিকটতম প্রতিবেশী। আবেগের কাছে তাঁর যে সমর্পণ তাও শর্তহীন নয়, বক্তব্যের সীমারেখার যথেচ্ছ অতিক্রমণও নেই তাঁর কবিতায়। তবুও প্রতীকের শক্তিই তাঁর অনেক কবিতাকে লক্ষ্যভেদী করেছে। প্রতীক-রহস্যের মতোই এ-ও ফররুখের কবিতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কুললক্ষণ।

ফররুখ আহমদের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত দুইটি প্রতীক সিন্দাবাদ এবং হাতেম তা'য়ী। আলিফ লায়লা থেকে সিন্দাবাদকে আহরণ করেছেন ফররুখ, কিন্তু 'সিন্দাবাদকে অবিকল ব্যবহার করলেন না তিনি, ভ'রে দিলেন তার ভিতরে নিজের আশা, সিন্দাবাদের কাহিনীকে পুনর্নির্মাণ ক'রে নিলেন নিজের অর্থে ও তাৎপর্যে। পথ-সন্ধানী এ যুগের মুসলমানের নেতা হ'য়ে উঠলো তাঁর কবিতার সিন্দাবাদ।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১১৫)। যে আদর্শকে ফররুখ শিল্পজীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে সিন্দাবাদ প্রতীকে সমর্পণ তাঁর কবিতায় পদস্খলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। হেরার রাজ-তোরণের কবি হিসেবে ফররুখের যে খ্যাতি, তাও মূলত মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে অবিচল আস্থার প্রতীক হিসেবে উদ্ভাসিত। ফররুখ আহমদের কাব্যে সিন্দাবাদ এবং হেরার রাজ-তোরণ প্রতীকের তাৎপর্য বিষয়ে সৈয়দ আলী আশরাফ *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> 'অশ্রান্ত সন্ধানী' 'সমুদ্র-বিজয়ী' নাবিক সিন্দাবাদ ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ' 'মুসলিম চেতনা' 'মুসলিম গৌরব' ও 'মুসলিম অভিযানে'র প্রতীক, হেরা পর্বত অনুপ্রেরণার উৎস, আদর্শভূমি ও স্বর্গের প্রতীক– যেখানে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ঐশী আহ্বান লাভ করেছিলেন। ফররুখ আহমদই প্রথম কবি, যিনি সাফল্যের সংগে মুসলিম অতীত ও মুসলিম পুরাকাহিনীকে বাংলা কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন– উর্দু কাব্যে যেমন কাজে লাগিয়েছেন ইকবাল। (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৭৩)

একইভাবে *হাতেম তা'য়ী* পুথি থেকে যে হাতেমকে ফররুখ তাঁর শিল্পসঙ্গী করেছেন, সেই হাতেমও কবির চেতনার রঙে নতুন অবয়ব লাভ করেছে। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানোর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাতেম তা'য়ী, সেই দৃঢ়চিত্তের প্রতীক হাতেমের হাত ধরে ফররুখ দুঃসাহসী অভিযানে নেমেছেন।

ফররুখ আহমদের কবিতায় বিশেষ কিছু প্রতীকের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই প্রতীকসমূহ কবির জীবনবোধ ও শিল্পচৈতন্যের প্রতিভূ হিসেবে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ফররুখ আহমদের আবেগ-অনুভূতি-বিশ্বাসের প্রতিনিধি হিসেবে কবি বারবার সিন্দাবাদের শরণ নিয়েছেন। শিল্প-সমালোচক বেগম আকতার কামাল ফররুখের কবিতার উজ্জ্বলতম প্রতীক সিন্দাবাদকে লোকপুরাণের চাঁদ সওদাগর বা গ্রীক-পুরাণের অডিসিউসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। (২০১৩ : ১১৮)। ফররুখ হেরার রাজ-তোরণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে উজ্জ্বল ও আলোকিত আগামির স্বপ্ন নির্মাণ করেছেন, হাতেম তা'য়ীর কাছ থেকে লাভ করেছেন উদার-মানবিক-মহত্তম জীবনবোধের অনুপ্রেরণা। ফররুখের কবিতায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বর্তমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর যে অভিযাত্রা

প্রতিভাত, সেই অভিযাত্রার গতি-প্রকৃতি চিহ্নিত করেছেন সমুদ্র-যাত্রা, নাবিক, মাঝি, কিশ্‌তী, নিশান, বন্দর প্রভৃতি প্রতীকের আশ্রয়ে। এই প্রতীকসমূহ ফররুখের দুঃসাহসী অভিযানকেই মূর্ত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন :

> ফররুখ আহমদ সমুদ্রপথে দুঃসাহসী নাবিকের অভিযানকে প্রতীক হিসাবে বেছে নিয়ে নানা দিক থেকে কুশলী শিল্পী-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য ও ইতিকথায় দেশে দেশে কালে কালে সমুদ্র অভিযাত্রীকে বীরের জয়মাল্য দেওয়া হয়েছে। সত্যের সাথে কল্পনা মিশিয়ে তাকে বাস্তবের চাইতেও করা হয়েছে অনেক বড়, অনেক রহস্যময়। কাব্য ও সাহিত্যের এই বাস্তব ও কল্পলোকের নাবিক বীর নায়ক সর্বদেশের পাঠকচিত্তে সুপরিচয়ের অন্তরঙ্গতায় এক মর্যাদাবান আসনে প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রযাত্রী নাবিককে ফররুখ আহমদ প্রতীকী হিসাবে গ্রহণ করায় তাই সুবিধা হয়েছে। তাঁর কবিতার পাঠকের কাছে সহজে বোধগম্য হয়েছে। (১৯৯৫ : ৫৫৮)

ফররুখ আহমদ কবিতায় চিত্রিত দুঃসাহসী অভিযাত্রাকেও ‘জাতির অন্তরে আশা ও আন্দোলনের ইঙ্গিতময় প্রতীক’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নিচের উদাহরণগুলো থেকে ফররুখের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

সিন্দাবাদ

ক. ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ! (‘সিন্দবাদ’/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. জাজিমের বুকে ছড়ানো পাথর দানা!
ডাক্‌ছে তোমাদের সাথী মাল্লা সিন্দবাদ,
চলো ফুঁড়ে চলি আকাশের শামিয়ানা; (‘দরিয়ায় শেষ রাত্রি’//*সাত সাগরের মাঝি*)

গ. তবু জীর্ণ জাহাজের ভাঙা খোল আজ জয়ে ভরা
পশ্চাতে জাগিছে শুধু সে দুঃসহ স্মৃতির নিষাদ,
বহু ঝড় পার হয়ে এনেছে সে সম্পূর্ণ পশরা,
মানুষের আউলাদ ফিরেছে বিজয়ী সিন্দবাদ। (‘আউলাদ’/*সাত সাগরের মাঝি*)

ঘ. অমনি অন্ধ কূপমণ্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নতুন দিনের করে আবাদ, (‘সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা’/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঙ. সিন্দাবাদ জাহাজীর স্কন্ধ হ’তে জয়ীফ যেমন
জমিনে লুটায়ে পড়ি’ ছিল ছেড়ে বাধার অর্গল; (‘শাহ গরীবুল্লাহ’/*মুহূর্তের কবিতা*)

হেরার রাজ-তোরণ

ক. তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা। (‘সাত-সাগরের মাঝি’/*সাত সাগরের মাঝি*)

খ. ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভীড় করে– যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ। (‘সাত-সাগরের মাঝি’/*সাত সাগরের মাঝি*)

গ. ব্যাকুল আশায় হেরার শিখরে খুঁজে ফেরো তুমি আবহায়াত
সূর্য-শ্রান্ত দিনশেষে নামে দীর্ঘ তোমার ধ্যানের রাত। (‘সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা’/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঘ. তবু বহুদূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখরচূড়া
: ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা,
পাশবিকার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম ... জেহাদে বৃহত্তর ... (‘এই সংগ্রাম/*সিরাজাম মুনীরা*)

হাতেম তা'য়ী

ক. কি ভাবে করি সে ঋণ শোধ
পেয়েছি যা এ জীবনে জিন্দা-দিল হাতেমের কাছে! ('আর একজন ॥ এক ॥ প্রথম অঙ্ক'/*নৌফেল ও হাতেম*)

খ. হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহিয়ান,
সুব্‌হে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন। ('শায়ের ॥ পাঁচ ॥ তৃতীয় অঙ্ক/*নৌফেল ও হাতেম*')

গ. 'ঘুরেছি অনেক আমি' তায়ী পুত্র হাতেমের সাথে
হাবেদার মাঠ থেকে বাদগর্দ হাম্মাম অবধি,
দেখেছি অশেষ পথে জীবন-মৃত্যুর দুই নদী
ব'য়ে যায় এক সাথে কোন্ এক অজ্ঞাত বাসাতে। ('হাতেম তায়ী'/*মুহূর্তের কবিতা*)

ঘ. য়েমনের শাহ্‌জাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম যে দিন
আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেল খুঁজে পথের নির্দেশ ('পরিচিতি'/*হাতেম তা'য়ী*)

নাবিক

ক. আমরা নাবিক জংলী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যাই টুক্‌রো খড়ের মত। ('সিন্দবাদ'/সাত সাগরের মাঝি)

খ. অনেক ঝড়ের দোলা পার হ'য়ে এল সে নাবিক!
অনেক ক্ষুধিত রাত্রি, আর বহু সামুদ্রিক পীড়া
চঞ্চল করেছে তারে, অন্ধকারে হারায়েছে দিক,
কালা-পানি ঘিরে ঘিরে ডাকিয়াছে মৃত্যুর দূতীরা, ('আউলাদ'//সাত সাগরের মাঝি)

গ. সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানের,
পাখা মেলে কোথা আকাশ-নাবিক মুসাফির দূর বন্দরের, ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা'/*সিরাজাম মুনীরা*)

মাঝি

ক. এবার কোথায় কোন বন্দরে মাঝি!
ভিড়বে কিশ্‌তী মুখ?
থামবে কোথায় দরিয়ার সাদা তাজী? ('বা'র দরিয়ায়'/সাত সাগরের মাঝি)

খ. দরিয়ার ঝড়ে আহত ক্ষণিক নিতে চাই বিশ্রাম;
মাটির মমতা বোঝে শুধু এক দরিয়ার মাঝিদল। ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি'/সাত সাগরের মাঝি)

গ. তবু শুনবে কি, তবু শুনবে কি সাত-সাগরের মাঝি
শুকনো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাট উঠেছে বাজি; ('সাত-সাগরের মাঝি'/সাত সাগরের মাঝি)

কিশ্‌তী

ক. রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজ্‌দাহা
মউজের মুখে ভাসছে কিশ্‌তী শ্বেত, ('সিন্দবাদ'/সাত সাগরের মাঝি)

খ. তুফান ঝড়িতে তোলপাড় করে কিশ্‌তীর পাটাতন;
মোরা নির্ভীক সমুদ্র স্রোতে দাঁড় ফেলি বারো মাস। ('সিন্দবাদ'/সাত সাগরের মাঝি)

গ. বেহুঁশ হালতে খুঁজেছি আঁধারে দুখানা কোমল ডানা
কিশ্‌তীর মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা। ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি'/সাত সাগরের মাঝি)

ঘ. জনশূন্য নদীতীর, কিশ্‌তি নাই দরিয়ার কূলে;
তাকালো হাতেম তা'য়ী অসহায় দুই চোখ তুলে। ('পঞ্চম সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন/হাতেম তা'য়ী)

নিশান

ক. নিশান কি ঝড়ে প'ড়ে গেছে আজ মাটির 'পরে?
আধো চাঁদ-আঁকা সেই শাশ্বত জয়-নিশান? ('হে নিশান-বাহী!'/সাত সাগরের মাঝি)

খ. তাই বিমর্ষ আকাশ-কিনার, দিনের মিনার;

পারি না ওড়াতে সেখানে নিশান– নিশান আমার! (‘নিশান’/সাত সাগরের মাঝি)

গ. চারদিকে বন মরণ শর্তে জীবনের অধিকার–
এখানে তোমার নিশান ওড়াও হে নিশান বরদার! (‘নিশান-বরদার’/সাত সাগরের মাঝি)

ঘ. ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোনদিন শেষ হবে না জানি। (‘সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা’/*সিরাজাম মুনীরা*)

ঙ. যে নিশান নবী ধূলির ধরায় রাখিলেন তাঁর শেষ নিশানা
সৌম্য মহান, হে শক্তিমান! তোমার হাতে সে মেলিলো ডানা। (‘আবুবকর সিদ্দিক’/*সিরাজাম মুনীরা*)

চ. বাতাসে ভাসছে তখ্‌তে সুলায়মান,
দেখ ইশারায় ডাকছে আকাশে হেলাল-শ্বেত-নিশান! (‘ইশারা’/সিরাজাম মুনীরা)

বন্দর

ক. দূরে বহুদূরে বন্দরে গেছে মিশে
দিগ্‌কাউসের কোলে, (‘বা’র দরিয়ায়’/সাত সাগরের মাঝি)

খ. সকল দুয়ার রুদ্ধ কোথায় ঠাঁই তার, ঠাঁই তার
এ অচেনা বন্দরে (‘আকাশ-নাবিক’/সাত সাগরের মাঝি)

গ. ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির! (‘বন্দরে সন্ধ্যা’/সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত উপরিউক্ত প্রতীকসমূহ তাঁর কবিস্বভাব ও শিল্পচৈতন্যর প্রতিনিধি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। ‘সর্বজন-পরিচিত’ প্রতীকসমূহ অবলম্বনেই ফররুখের কবিতার ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ভূগোল নির্মিত। ফলে তাঁর প্রতীকসমূহ কবিতার ভাব বা অভিব্যক্তিকে দুর্বোধ্য করে না, বরং তিনি সহজেই পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহে ‘বস্তু ও বাস্তবের অন্তর্নিহিতি আত্মার সারাৎসার’ সংস্থাপিত হয়ে তা কবির কাব্যবিশ্বাসের অনুকূল আবহ সঞ্চার করেছে। ফররুখের কবিতার প্রতীকনির্মাণপ্রবণতা চিহ্নিত করতে গিয়ে শিল্পসমালোচকবৃন্দও বিশেষ কিছু প্রতীককেই অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

ক. “আলিফ লায়লা” থেকে ‘সিন্দাবাদ’ এবং “হাতেম তা’য়ী” থেকে ‘হাতেম তা’য়ী’ এ দুজন প্রবল পুরুষের বিভিন্ন অসাধারণ অভিযান ফর্‌রুখকে অভিভূত করেছিলো। কখনও তারা কোনও কাহিনীর শক্তিমান নায়ক হিসেবে এসেছে, আবার কখনও এসেছে প্রতীক রূপে অবিচল নিষ্ঠার দুর্দমনীয় প্রাণবন্যার এবং সংঘর্ষের সামীপ্যের। (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৮ : ৩৫৮)

খ. ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় নাবিক অশ্রান্ত-সন্ধানী, সমুদ্র-বিজয়ী ‘সিন্দাবাদ’। তাই পরিচিত ‘মৃত্তিকার ডোর’ ছিঁড়ে ফেলে সে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে পাড়ি জমাতে উৎসুক। ‘নাবিক’-এর প্রতীকে ফর্‌রুখ আহমদ স্বপ্ন-মুগ্ধ মনের দূরচারিতার আকাঙ্ক্ষা এবং অভিব্যক্তিকে যেন ভাষা দেন। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৭২)

গ. তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত মৃত উপকরণে নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমাগত ব্যবহারের ভেতর দিয়ে শব্দ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলো।...ফর্‌রুখের সিন্দাবাদ কেবল আরব্য উপন্যাসের চরিত্র নয়– এই সিন্দাবাদ এক আশাবাদী চেতনার প্রতীক, বারবার সমুদ্র-যাত্রায় বিপর্যস্ত হয়েও যার অভিযাত্রী আত্মা ক্লান্তি স্বীকার করে না– সেই অপরাজেয় মানবিক সত্তার প্রতীক। একই অর্থে শাহেরজাদী, হাতেম তা’য়ী, নৌফেল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যপরিমণ্ডলে বারবার ফিরে এসেছে। বস্তুত ফর্‌রুখের কবি-ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে এই সব প্রতীকের মর্ম হৃদয়ংগম করতে হবে। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৮খ : ৫০৩)

ঘ. ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন কয়েকটি প্রতীকের সাহায্যে। ‘সিন্দাবাদ’ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের একটি বহুল ব্যবহৃত প্রতীক, যে নাবিক নিত্য নতুন দরিয়ায় তরী ভাসায়; সে নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণের প্রতীক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই সিন্দাবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের, কল্পনার আদর্শ জগতে পাড়ি জমান। (রফিকুল ইসলাম ১৯৮৮খ : ৫২৬)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. 'হেরার রাজ-তোরণ'– তাঁর মানসপটে সাম্যের, শোষণমুক্ত সমাজের অনিবার্য প্রতীক হিসাবে ধরা পড়েছে। (ফাইজুস সালেহীন ১৯৮৮ : ৬২১)

সমালোচকবৃন্দের উপরিউক্ত মন্তব্যে ফররুখের কবিতার প্রতিনিধিত্বশীল প্রতীকসমূহের প্রবণতা চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কবিতায় বহুল ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের আলোকে ফররুখের মানসগঠন ও শিল্পচৈতন্যের স্বরূপ অনুধাবনেরও চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তাঁর কবিতায় আমরা বারবার সমুদ্রে অবগাহনের দৃশ্যকল্প উপস্থিত হতে দেখি, কিন্তু সমুদ্র-প্রতীকে তিনি কখনোই আরামদায়ক ও আনন্দময় ভ্রমণের ছবি আঁকেন না, বরং জীবনসমুদ্রের মতোই তাঁর কবিতার সমুদ্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে গন্তব্যে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই তাতে প্রতিভাত। 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে/আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে ॥'– রবীন্দ্রনাথের (১৯৭১ : ১/৮৯) এই গীতবাণীর মতোই 'ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে' ফররুখ 'অভয় মনে' তরী ভাসাতে চেয়েছেন। গন্তব্যহীন ভ্রমণের ভয়াবহতা বারবার চিত্রিত করেন তিনি এবং এই চিত্রণও বিশেষ কিছু প্রতীকের আশ্রয়েই শিল্পরূপ পেয়েছে।

ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলাম ধর্মের নানা ঘটনা ও চরিত্র কখনো কখনো প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্মাণে যাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তাঁরাও কবির আবেগ ও মনোভাবের স্মারক হয়ে উঠেছে। প্রতীক সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি স্বর্গ-মর্ত্য পরিক্রমণ-প্রত্যাশী। বারবার মিথ-পুরাণ থেকে প্রতীক-নির্মাণের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তিনি। কারণ, 'মিথ সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে প্রতীকে লুকিয়ে রাখে, মানবমস্তিষ্কে ও নিশ্চেতনায় সেগুলি মিশে থাকে আর্কিটাইপ-টোটেম-ট্যাবুর আকরণে।' (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১৭)। একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম থেকে নানা ঘটনা ও চরিত্র চয়ন করেছেন ফররুখ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কেবল শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্মই নয়, যুগোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টাদেরকেও তিনি তাঁর মানসচৈতন্যের দোসর করে তুলেছেন এবং সমগ্র কবিতার ভাবাবহ নির্মাণে তাঁদের অবদান প্রতীকের মতোই উজ্জ্বল-প্রবল-প্রাণবন্ত। তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠে আমরা লক্ষ করব, ঐহিত্য-সংলগ্নতাও তাঁকে কখনো কখনো প্রতীকাশ্রয়ী করেছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম-রাজনীতির বিচিত্র অঙ্গন থেকে প্রতীক সংগ্রহ করেছেন তিনি। ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো কিছু প্রতীকের দৃষ্টান্ত :

সাত সাগরের মাঝি

ক. ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ, ('সিন্দবাদ')

খ. সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ায় শাদা তাজী ... ('বা'র দরিয়ায়')

গ. সিন্ধু ঈগল পাড়ি দেয় পাশে ফেন উত্তাল রাত,
ঝলসায় কালো মেহ্‌রাবে তাজা মুক্ত নীল প্রভাত, ('বা'র দরিয়ায়')

ঘ. সফেদ আলোয় দেখেছি আমরা সরন্দিপের তীর। ('বা'র দরিয়ায়')

ঙ. এড়াতে পারি না– ঐ শোনো ডাকে বহুদূরে বাগদাদ ... ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

চ. হাজার নাজুক কমনীয় মুখ যেখানে ভাসছে আর
আতশী দহনে খুনের তুফানে জ্বলছে শাহরিয়ার। ('শাহ্‌রিয়ার')

ছ. জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে; ('এই সব রাত্রি')

জ. রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? ('পাঞ্জেরী')

ঝ. সোহ্‌রাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম। ('স্বর্ণ-ঈগল')

ঞ. তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি; ('লাশ')

সিরাজাম মুনীরা

ক. বাধার পাথরে প্রতিরোধ জাগে, জাগে শয়তান আবুজিহিল, ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')
খ. এমনি সে কোন্ নীরব নিশীথে এল বোর্‌রাক বহিয়া জ্যোতি, ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')
গ. কত শয়তান 'তোলায়হা' পাপী 'মুসায়লেমার' ছিঁড়েছে টুটি ('আবুবকর সিদ্দিক')
ঘ. তোমার মাটিতে লুট হ'ল দেখি/ফিরদৌসের রং ('আবুবকর সিদ্দিক')
ঙ. নতুন পথের মুবারক-বাদে আগ্নেয় বোররাক (উমর-দারাজ দিল')
চ. কেঁপে মরে তার বজ্রের রবে শঙ্কিত আজাজিল ('আলী হায়দর')
ছ. ফরহাদের প্রেম শিখা আনিয়াছে প্রিয়াকে আলোতে; ('প্রেম-পন্থী')
জ. ইবলিসের গুপ্ত মন্ত্র ছড়ায় কে আজ বিশ্বময়; ('মৃত্যু-সংকট')
ঝ. মূসার পূর্ণতা তার পদপ্রান্তে,– ঈসার নিঃসীম
ধ্যানমূর্তি! দেখেছে সে জিজ্ঞাসার বেলা
খিজিরের দৃষ্টি দিয়ে; পথে যার নবী ইব্রাহিম জ্বেলেছে তৌহিদ শিখা! ('মুক্তধারা')

নৌফেল ও হাতেম

ক. আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই; লজ্জা নাই জীবনে; যদি সে
না পায় সম্মান শীর্ষে খুঁজে ফেরে ইব্‌লিসের রাহা। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ উজীর')
খ. সেদিন নামাবে টেনে অত্যাচারী নৌফেল বাদ্‌শাকে
ধূলিতে অথবা জাহান্নামে, রক্ত নিয়ে কিম্বা রক্ত দিয়ে ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ দুই ॥ ৩য় খাদেম')
গ. শহরে, গঞ্জে ও লোকালয়ে
সন্ধান চালালো লোভী শকুনির হিংস্র দৃষ্টি মেলে; ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ কাঠুরিয়া')
ঘ. প্রবৃত্তির উর্ধ্ব জানি ফেরেশতারা– নূরানী লেবাস; ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ শায়ের')
ঙ. যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর ॥ ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ শায়ের')

মুহূর্তের কবিতা

ক. সে আসে বিপুল বেগে! কণ্ঠে তার সুরে ইস্রাফিল
বজ্র স্বরে কথা কয়, জানে না সে গম্ভীর বন্ধন। ('বৈশাখী')
খ. ...খুঁজিয়াছে লায়লার আঁখি তারকার
রংমহল; সুর চাহিয়াছে ফিরে সুরেলা রবাব। ('সন্ধ্যায়')
গ. জটিল চিন্তার মত সে আঁধার তিক্ত বেদনার
ফরহাদের তিক্ত মনে– একে দেয় মরণ যন্ত্রণা ('হাতঘড়ি/এক')
ঘ. 'সৌন্দর্যের সাথে জ্ঞান' মিশে আছে যেখানে, সাদীর
দেখা পাবে সেখানেই, ... ('সাদী')
ঙ. অমর গীতিকা সেই– হাফিজের দীউয়ান, গজল, ('হাফিজ')
চ. নয়া কারবালার গাঁথা এখানে শহীদ সিরাজের,
চলেছে মন্থর নদী স্মৃতি নিয়ে ক্লান্ত ফোরাতের ॥ ('জিঞ্জিরা')
ছ. জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান, আমীর হামজার
কাহিনীতে পায় খুঁজে রহস্যের নিরুদ্ধ দুয়ার
হাতেম তা'য়ীর সাথে হাম্মামের করে সে সন্ধান,
তাহ্‌মিনা, শাহেরজাদী জাগে তার সম্মুখে অম্লান
পুঁথির আসরে ফের নামে রাত্রি আলিফ লায়লার। ('পুঁথির আসর')
জ. যেখানে দেখেছি চেয়ে সর্বত্যাগী হুসেনের দান, ('শহীদে কারবালা')
ঝ. রুস্তমের অহমিকা আত্মঘাতী নিজের খঞ্জরে ('শাহ্‌নামা')
ঞ. শা'জাদা তাজলমুলক সেই রূপ দেখিল বিস্ময়ে ('রূপমুগ্ধ')

অনুস্বার

ক. অধুনা শৃগাল তবু ভূতপূর্ব হে সিংহশাবক
'সিংহ' পরিচয় দিতে হাস্যকর ও ব্যর্থ প্রয়াস, ('পরিচয়')

খ. গোঁফের মর্যাদা শুধু বোঝে এক শিকারী বিড়াল, ('পেশাদারী বিদ্যালয়')

গ. হাজার জুলুম স'য়ে বেঁচে গেল বনি ইসরাইল
অতলে ডুবিল শুধু সে দাম্ভিক হিংস্র আজাজিল; ('একটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে')

ঘ. তবু শুনি শ্রমিকের নাভিশ্বাসে তিক্ত অভিশাপ–
যারা বহিতেছে এই ফেরাউন-সন্ততির পাপ ॥ ('ফেরাউন-সন্ততি')

ঙ. ছহি সোনাভানে মোর জ্ঞান কি কারুর চেয়ে কম? ('পাক জনাবেষু')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, ফররুখ আহমদ কবিতায় এমন কিছু প্রতীকের ব্যবহার করেছেন যেগুলো বাংলা কবিতায় বহুল ব্যবহৃত এবং এই প্রতীকসমূহ তাঁর কবিতায় বিশেষ কোন দ্যোতনা সঞ্চার করেছে বলে মনে হয় না। তবে কালপুরুষ বা আদমসুরত, জয়তুন শাখা ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহারে তিনি নতুনত্ব সঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন। চাঁদ প্রতীকটিও ফররুখের কবিতায় ভিন্নতর দ্যোতনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামাল লিখেছেন, "কবির আহরিত ঐতিহ্যচেতনা ও বিষয়প্রীতি তথা ভাবাদর্শই চাঁদ প্রতিমায় দ্যোতিত। চাঁদ-খচিত পতাকার উল্লেখে কবি অক্লান্ত। বস্তুত, স্বাদে ও স্বাতন্ত্র্যে এসব আর্কিটাইপ প্রতীক তাঁর কবিতায় 'আদর্শবোধের দ্যোতক।" (২০১৩ : ১১৮)। কবিকল্পনার অবয়ব কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে তিনি বারবার প্রতীকের পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। প্রতীক-নির্ভরতা ফররুখ আহমদের কবিতার গঠনকৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য কুললক্ষণ।

পুরাণ

একজন মহৎ শিল্পস্রষ্টা তাঁর সাহিত্যকর্মে সর্বকালের প্রতিধ্বনি প্রত্যাশা করেন এবং সেই প্রত্যাশার শৈল্পিক রূপায়ণের প্রয়োজনেই তিনি পূর্বসূরীদের কালজয়ী অর্জনসমূহকে স্বীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গে অবগাহনের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তা বিভাজিত কালখণ্ডের নানা পর্বের অভিজ্ঞতা ও অর্জনসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের অভিপ্রায় থেকেই উৎসারিত। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন, 'পুরাণকথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।' (১৯৭৪ : ৩২)। মিথ-পুরাণের জগৎ যেন সকল যুগের মানুষের উদ্দেশে গান গেয়ে ওঠে, 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭১খ : ৩০২)। মিথ-পুরাণ 'লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি' নিয়ে প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে এবং প্রবল উৎসাহ নিয়ে পূর্ণ করে দেয়, 'বারবার তার দানমঞ্জরী নব নব ক্ষণে ক্ষণে।' কবিতার সঙ্গে মিথ-পুরাণের আন্তঃসম্পর্ক গভীর এবং গতিশীল। মিথ-পুরাণের প্রশ্রয়ে কবির ভাব ও অভিব্যক্তি লাভ করে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা। এ প্রসঙ্গে মাহবুব সাদিক লিখেছেন, 'সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সমসাময়িক জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ-অভিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রার সংযোজন ঘটায়।' (১৯৯১ : ৩৯৫)। তাঁর মতে, মিথের কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে একজন কবির বর্তমান জীবন-অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ অভিজ্ঞানে উন্নীত হয়। সেই অর্থে মিথ-পুরাণকে 'মানব-প্রজাতি-সত্তার অভিজ্ঞানের আধার' বলা যায়। মিথ-পুরাণের সঙ্গে কবিতার সখ্য, সন্নিহিতি ও সম্পৃক্তির ফলে কবিতাই কেবল সমৃদ্ধ হয় না, মিথের উদ্দেশ্যও অনেকাংশে সিদ্ধ হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করছি :

> যূথবদ্ধ মানবপ্রজাতির বিস্ময়মিশ্র কল্পনা ও বস্তুজগৎ ব্যাখ্যার ধরন থেকে মিথের জন্ম, আর কবিতার উদ্ভব সেই আদিমুহূর্তে যখন মানবপ্রজাতির মধ্যে জেগেছিল ব্যক্তি হয়ে-ওঠার আন্তরতাগিদ। মিথ মানববুদ্ধি বিকাশের সূচনালগ্নের মননক্রিয়া, কবিতা হচ্ছে আবেগবৃত্তির উৎসারণ। মিথ ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্কটি তাই মনন ও আবেগের মিথষ্ক্রিয়ায় জটিল এবং এ সম্পর্ক আদিসময় থেকে আজও অনবচ্ছিন্ন। তবে মিথ কবিতার ভিত্তি নয়, বরং কবিতাই মিথের কাঠামো ও বার্তা-প্রকাশের আঙ্গিক। সে অর্থে কবিতা মিথকে ব্যবহার করে, মিথ কবিতার ব্যঞ্জনাগুণটিকে

Dhaka University Institutional Repository

> আত্তীকৃত করে কাব্যগত হয়। কবিতায় প্রযুক্ত হলেই মিথ হয়ে ওঠে নান্দনিক এবং সমষ্টিচেতনার বদ্ধতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তির সৃজনশীল বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়। (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১১)

কবিতায় মিথ-পুরাণের ব্যবহার কেবল শিল্পস্রষ্টার ঐতিহ্যসংলগ্নতার স্বাক্ষর নয়, তাতে তাঁর অতৃপ্তি ও অচরিতার্থতার নানা চিহ্নও মুদ্রিত থাকে। যে সময় ও সমাজবাস্তবতায় তিনি বাস করেন, তার সঙ্গে একাত্ম হতে না-পারার বেদনাও মিথ-পুরাণের আশ্রয়ে মূর্ত করেন তিনি। বিদ্যমান বিপর্যস্ত বাস্তবতার বাইরে ভিন্নতর এক শৈল্পিক বাস্তবতা নির্মাণ করেন তিনি, যেখানে সবকিছু তাঁর ইচ্ছের অনুকূলে পল্লবিত-প্রস্ফুটিত-প্রবাহিত-প্রসারিত হতে পারে। শিল্পসমালোচক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন :

> শিল্পী জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখতে চান– বাস্তব জীবনে তিনি সব সময় সেই কল্পনার লীলার প্রতিরূপ দেখতে পান না তাই তো বাস্তবকে মিথের কল্পজগতে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেখতে চান বা ভিন্নভাষায়, তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে মিথ-পুরাণের বাস্তব-সত্যের পটে প্রতিফলিত করেন।...তারই ফলে এই ধরণের রচনাগুলি কেবল পুরাণের পুনর্জাগরণ হয় না– মহাকাল বা বিশ্বনিয়তির প্রেক্ষাপটটিও হয় সেই সঙ্গে রচিত– আর শিল্পীর সৃষ্টিলীলাটিও দিবাস্বপ্নের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন জীবনস্বপ্ন হয়ে ওঠে। (১৯৮৮ : ৮৩)

ফররুখ আহমদের কবিতায় বিম্বিত মিথ-পুরাণের জগতেও আমরা কবির অতৃপ্তি ও অচরিতার্থতার বেদনা মূর্ত হতে দেখি। এই বেদনা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামের স্বর্ণযুগের নানা চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহে। স্বকালের অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশেই তাঁকে বারবার ফিরতে হয়েছে সেকালের আলোকিত মানুষের কাছে, যাঁরা মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "মুসলিম পুরাণের প্রথম প্রকৃত কাব্যিক ব্যবহার করেছেন নজরুল। উত্তরকালে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে যোগ্যতায় ফররুখ আহমদ। 'সাত সাগরের মাঝি'তে তো বটেই, 'নৌফেল ও হাতেম', 'হাতেম তা'য়ী'– এসবের মধ্যেও ফররুখ মুসলিম পুরাণেরই উদ্বোধন করেছেন।" (১৯৯০ : ১০৩)। হাতেম তা'য়ী অমুসলিম ও প্রাক-ইসলাম যুগের হলেও 'মুসলমানদের কাছে হাতেম আমাদেরই একজন পূর্বসূরী হিশাবে চিহ্নিত' বলে উল্লেখ করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাঁর মতে, 'মুসলিম পুরাণ যেহেতু সুবিস্তৃত হয়, এবং কিছুটা অস্পষ্ট, কাজেই একজন মুসলিম কবি ব্যবহার করতে পারেন কল্প-পুরাণ। আমাদের বিচারে হাতেম তা'য়ীর পুনর্ব্যবহার ফররুখে সম্পূর্ণ সংগত এবং তা কাব্যন্যায়-কে কখনোই এবং কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করেনি।' কবিতায় ফররুখ যে-সকল ব্যক্তিকে মহিমান্বিত করেছেন, তাঁদের 'তেজ-সাহস-সংকল্প-ত্যাগ' মিথিক আবহে উদ্ভাসিত হয়েছে। বেগম আকতার কামাল লিখেছেন, 'মিথচরিত্রবর্গের মতোই সমষ্টির কাছে ঐসব মহৎ নেতাব্যক্তিরা হয়ে ওঠেন অনুসরণীয় মডেল ও ত্রাতা।' (২০১৩ : ১১৫)। সেইসঙ্গে ঐতিহ্য-সংলগ্নতার অভিপ্রায়ও তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত। 'কবিতালোকে কাঙ্ক্ষিত বাস্তবকে বিনির্মাণে উদ্ব্যস্ত' ফররুখের কবিতার মিথের জগতকে দুই কোটিতে বিভক্ত করেছেন একজন সমালোচক :

> ক. ইসলাম-পূর্ব পারসিক আরবীয় পরীকথা-রূপকথা, আরব্যরজনীর আঙ্গিকে রক্ষিত আদিকল্প চিন্তার প্যাটার্ন ও আর্কিটাইপ। এই পর্বে প্রতিনিধিত্বশীল কিংবদন্তি-মিথগুলো হচ্ছে বুরাক, আজাজিল, ইউনুস নবী, সুলেমান নবী, মুসা নবী, খিজির, রুস্তম, নমরুদ, করুণ, গুলে বকাওলি ইত্যাদি।
>
> খ. বাংলার প্রাকৃতিক-নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক মিথের চূর্ণ ও প্রচ্ছন্ন উপমা চিত্রকল্প বিশেষণ ধ্বনি– যাকে বলা যায় latent motif। দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য মিথগুলো ফররুখ আহমদের ব্যক্তি নির্জ্ঞানস্থিত লোকজ সংস্কৃতির প্রত্নছাঁচ থেকে উৎকলিত হয়েছে, যেমন আলো-অন্ধকার, চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্র, বৃক্ষ-পাখি-সমুদ্র-মরু ইত্যাদি। (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ১১৮)

ফররুখ আহমদের যে সকল কবিতায় পুরাণ ও প্রতীক পরস্পর-প্রোথিত, তাঁর কবিতার প্রতীকী-উদ্ভাসন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সে-জাতীয় কিছু পৌরাণিক অনুষঙ্গ-আশ্রিত কাব্যপঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। কেবল পুরাণ-প্রসঙ্গই নয়, ফররুখের কবিতায় বিপুল-সংখ্যক কিংবদন্তির ব্যবহার লক্ষ করা যাবে যার সঙ্গে তাঁর ইতিহাসবোধের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ শিল্পকর্ম। স্বতন্ত্রভাবে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গও তাঁর কবিতায় মিথিক আবহে উপস্থাপন

করেছেন তিনি। তবে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাব্যপ্রয়াসের চেয়ে কিংবদন্তি-নির্ভর কবিতায় তিনি অধিকতর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন :

> ইতিহাস অপেক্ষা কিংবদন্তীতে তাঁর প্রকাশের উল্লাস এবং সাচ্ছন্দ্য অধিক। এবং খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে "সিরাজাম মুনীরা"র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোও এক সময়ে কিংবদন্তীর পোষাক পরে অবতীর্ণ, যে পোষাক চরিত্র হিসাবে তাদের উত্তরণের প্রধান বাহন। ...কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক, এই উভয় শ্রেণীর কাহিনী বিন্যাস, আবহ সৃষ্টি, চরিত্রাঙ্কন, প্রতীক– উপমা ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুগত এবং আঙ্গিকগত প্রকাশের একটি মূল্যায়নে এই ধারণা স্পষ্টতর হবে যে, ফররুখ আহমদের প্রধান উৎকর্ষ তাঁর প্রথমোক্ত বিচরণ ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যাদর্শ, কবি পরিচয়, এবং ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত অবস্থান বিচারে কিংবদন্তী চিহ্নিত হবে তাঁর প্রধান প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে। (১৯৯২ : ১৬০)

ফররুখ আহমদের কবিতায় ব্যবহৃত মিথ-পুরাণ এবং কিংবদন্তিসমূহ বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপন এবং ধর্মচর্চার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকায়, তার অর্থ অনুধাবনে পাঠককে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। যদিও দু'একটি কবিতায় বেহুলা-লখিন্দরের বাসর, ভেলা এবং লখিন্দরকে দংশনকারী সাপ (একটি কবিতায় 'সর্প-চিক্কণ জিহ্বা')– এসব লোকমিথের বিচূর্ণ অবয়ব নির্মাণ করেছেন ফররুখ, যা অনুধাবনে পাঠকের চিন্তাশীলতা ও সৃজনভাবনা প্রয়োজন। *রামায়ণের* দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস কবন্ধকেও আমরা একটি কবিতায় উপস্থিত হতে দেখি। বেগম আকতার কামাল লিখেছেন, ফররুখ আহমদ 'কবন্ধ' মিথটিকে কবির গভীর আস্থাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (২০১৩ : ১১৯)। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো কিছু মিথ-পুরাণ আশ্রয়ী কবিতার শরণ নেব, যা থেকে কবির 'ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও পুরাণ-অভিজ্ঞানের' আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

সাত সাগরের মাঝি

ক. জমানো পাথর দরিয়ার তীরে মওতের বুকে আহা,
কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দবাদ ('সিন্দবাদ')

খ. আরশির মতো নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলী
এসেছি এখন তুফান বিজয়ী খিজিরের এলাকায় (বা'র দরিয়ায়')

গ. খিজিরের সাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই, ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

ঘ. কোন্ ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?
কোন্ আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে? ('লাশ')

ঙ. কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ
মিশে গেল ধূলিতলে ('আউলাদ')

চ. সোহ্‌রাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম। ('স্বর্ণ-ঈগল')

ছ. নাস্তিকতার টুঁটি ছিঁড়ে নিতে
সয়ফুল্লাহর ঠিকরে জ্যোতি!
যেথা কবন্ধ মৃত জড়বাদ
সেখানে জীবন চিরন্তন। ('নিশান')

জ. ইব্রাহিমের পথ বেয়ে যার শুরু হ'ল যাত্রার, ('নিশান-বরদার')

ঝ. সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙিন মিনার ভাঙে। (সাত-সাগরের মাঝি')

সিরাজাম মুনীরা

ক. তবু সে জাগালো মেশ্‌কের বাস, জাগালো মরুতে গুলে আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে নার। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. প্রবল বাহুতে টেনে নিয়ে ঐ বিরাট নিখিল ভরানো দিল

Dhaka University Institutional Repository

বলে 'পাঠ করো' ফুকারে বিশাল দীপ্ত বক্ষ জিবরাইল। ('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

গ. মরু-শর্বরী পাড়ি দিয়ে যবে নেমে এল নীচে আদম-সূরাত
দূর মদীনার খেজুর শাখায় হারালো নিবিড় তিমির প্রপাত। ('আবুবকর সিদ্দিক')

ঘ. জান্নাতে ফিরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে :
এস সিদ্দিক দরদী সঙ্গী যে ক'রেছ সাথী নিঃস্বতাকে। ('আবুবকর সিদ্দিক')

ঙ. নতুন পথের মুবারক-বাদে আগ্নেয় বোররাক ('উমর-দারাজ দিল')

চ. আলোক-অন্ধ খান্নাস দল তীর ছোঁড়ে তাঁর বুকে
পর্বত-বাধা আনে তার সম্মুখে। ('আলী হায়দর')

ছ. এই আকাশের মেঘাবরণের ফাঁকে
হাতছানি দিল তারা,
কোন দুর্গম তূর পাহাড়ের ডাকে
অসহন হ'ল কারা ('এই সংগ্রাম')

জ. অগণন মিথ্যাচারে নমরুদের সাজানো পুতুলে ('মুজাদ্দিদ আলফেসানী')

ঝ. তুমি এনেছো এ পাথরে পাহাড়ে শিরীনের সংবাদ
ভাঙে ফরহাদ কুঠারের মুখে প্রবল বাধার বাঁধ। ('ইশারা')

ঞ. ইংগিত দিয়ে জাগছে সুলায়মান
বাতাসে ভাস্‌ছে তখ্‌তে সুলায়মান! ('ইশারা')

নৌফেল ও হাতেম

ক. জাহান্নামে যাক্ জুয়া খেলা। সর্বস্বান্ত গরীবেরা
মারা পড়ে প্রতিদিন আজাজিল জুয়াড়ীর চালে; ('প্রথম অঙ্ক ॥ এক ॥ ২য় দর্শক')

খ. জানি না তো/কোন সে জান্নাত ছেড়ে নেমেছো মাটিতে! ('প্রথম অঙ্ক ॥ এক ॥ গুপ্তচর')

গ. কে বলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের মাঝে; আহাম্মদ
কিম্বা অন্ধ অহঙ্কারী ফেরাউন, নমরুদের চর
অশান্তি যে আনে পৃথিবীতে। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ বৃদ্ধ মুর্শিদ')

ঘ. গন্দমের পোড়া ক্ষেত, ফসলের/চিহ্ন নাই কিছু। ('দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তিন ॥ ৩য় মহিলা')

ঙ. কে তুমি? কে তুমি দোস্ত্ ইন্‌সানের
তুমি কি হাতেম তা'য়ী? 'য়েমনের শা'জাদা হাতেম? ('তৃতীয় অঙ্ক ॥ এক ॥ মুটিয়া')

মুহূর্তের কবিতা

ক. ...ছিটে পড়ে তারার হারের
সাতটি উজ্জ্বল তারা ডাক দেয় যখন বন্ধুরে! ('কোকিল')

খ. শিথিল হয়েছে আজ সুলেমান নবীর জিঞ্জির। ('ঝড়')

গ. দাঁড়াল পিয়াসী দৈত্য আকণ্ঠ তৃষ্ণার প্রয়োজনে, ('ট্রেনে/এক')

ঘ. সেখানে অনেক রাতে ঝাউশাখে ঘোড়া বেঁধে রেখে
জ্বিনের শা'জাদা নামে ময়নামতর ফাঁকা মাঠে। ('ময়নামতীর মাঠে/এক')

ঙ. মিশেছে তাজ ও তখ্‌ত কায়কোবাদ, কায়কাউসের ('ফেরদৌসী')

চ. তুমি সে প্রেমিক সুফী, নিষ্কম্প প্রাণের প্রতিদানে
জাগায়েছো এ মাটিতে রশ্মিকণা নবী মুস্তফার ('জামী')

ছ. নার্গিস, গোলাব আর জাফরানের দূর দেশ থেকে
হাফিজের সওগাত এসেছিল ফাল্‌গুন বীণায়, ('সোনার গাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি')

জ. বাগদাদের মাল্লা আর মরু হেজাজের সওদাগর
এ মাটিতে পেল খুঁজে শেষ রাত্রির আলিফ লায়লার

হাজার তারার হারে মধ্যমণি এই সিতারার
স্বপ্নালোকে ছিল জেগে মুসব্বর; ('বন্দরের স্বপ্ন')

ঝ. ইউসুফের রূপ দেখে অপরূপ, মোহমুগ্ধ প্রাণে
যেমন সম্বিতহারা মিসরের সহস্র সুন্দরী
চেয়েছিল নিষ্পলক; ('শাহ গরীবুল্লাহ')

ঞ. অচ্ছেদ্য ছায়ার মত সেই ডাক সাথে সাথে আসে,
ডাক দেয় অন্ধকারে কোহে-নেদা মৃত্যুর পাহাড়! ('কোহে-নেদা')

হাতেম তা'য়ী

ক. জানে নাই কত ছদ্মবেশে
সুনিপুণ ষড়যন্ত্রে ইবলিসের কত গুপ্তচর
পাপের বেসাতি করে দিনে কিম্বা রাতের প্রহরে
সভ্যতার বুলি মুখে। ('পরিচিতি')

খ. বলিল হাসিন বানু, 'আছে সাত সওয়াল আমার
জওয়াব না পেয়ে যার দীর্ঘ দিন আছি বেকারার, ('প্রথম সওয়াল ॥ শাহাবাদে')

গ. হলুকা প্রাণীর নাম, হাতিয়ারে মরে না কখনো
হিংস্র এ রাক্ষস। ('দুস্‌রা সওয়াল ॥ সওয়াল ও সফর [তিন]')

ঘ. বলিল তরুণ, "আলগুন পরী করেছে আমার এমন হাল।" ('তিস্‌রা সওয়াল ॥ ভ্রাম্যমাণ')

ঙ. ছিন্ন শিরের মধ্যমণি
নাম মালেকা জরিনপোশ
শাম যাদুকর পিতা যে তার,
মেয়ের 'পরে বিষম রোষ ! ('চাহারম সওয়াল ॥ যাদুর ময়দানে')

চ. লরনোস পরীর দেশে গেল শেষে সোনার পাহাড়ে;
যত দেখে তা'য়ী পুত্র অজানা বিস্ময় তত বাড়ে। ('পঞ্চম সওয়াল ॥ হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন')

ছ. শম্‌স্‌ শাহা– বাদশা জ্বিনের
বলিল, "বর্জখ দ্বীপে মাহেয়ার শাহার ভাণ্ডারে
রয়েছে মুক্তার জোড়া, ... ('শশম সওয়াল ॥ শেষ আলাপ')

জ. গুমোট রাত্রির কালো দু'পাখা গুটালে আজাজিল
দেখা দিল দীপ্ত দিন– 'জমর্রুদি পাখা জিব্রিলের; ('আখেরী সওয়াল ॥ হাম্মামের পথে [এক]')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামের স্বর্ণ-যুগের নানা ঘটনা ও চরিত্র এবং মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরানের নানা ঘটনা ও চরিত্রই ফররুখ আহমদের মিথিক-জগতের প্রধান অবলম্বন। মুসলমান সাহিত্যস্রষ্টাদের কালোত্তীর্ণ শিল্পসম্পদ থেকেও বিবিধ ঘটনা ও চরিত্রের শরণ নিয়েছেন তিনি, যা তাঁর কবিতায় মিথিক আবহ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। ফররুখের মিথ-প্রকল্পের প্রধান দুই প্রতিনিধি সিন্দাবাদ ও হাতেম তা'য়ী। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'সমুদ্রের সাত সফরের নায়ক সিন্দাবাদ ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যজীবনের নায়ক, আর সাত সওয়ালের উত্তরদাতা হাতেম তা'য়ী তাঁর শেষ কাব্যনায়ক। এই দুই নায়কই অভিযাত্রিক। এই অভিযাত্রাতেও ফররুখ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হ'য়ে যান।' (১৯৯ : ১৩৭)। কিংবদন্তির বিস্তৃত পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেছেন কবি এবং সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তিনি, যা তাঁর কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ-পুরাণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের অনুকূল নয় বলেই রামায়ণ, মহাভারত কিংবা গ্রিক পুরাণের প্রতি আগ্রহ দেখান নি তিনি। 'মনোরহস্যের আলো-আঁধারী জগৎ অনুপস্থিত বলে তাঁর কবিতায় মিথগুলি প্রায়ই চিত্রবৎ চিহ্নই [pictorial sign] হয়ে থাকে।'– ফররুখের কবিতায় মিথ-পুরাণের ভূমিকা বিষয়ে বেগম আকতার

Dhaka University Institutional Repository

কামালের (২০১৩ : ১২০) এই বিবেচনা যথার্থ বলেই আমরা মনে করি। ফররুখ আহমদ মিথ-পুরাণের আশ্রয়ে 'বহুমাত্রিক অর্থব্যঞ্জনা' সৃষ্টির চেয়ে 'স্থির আকল্প ও ভাবাদর্শে স্থিতপ্রজ্ঞ' হতেই অধিকতর প্রয়াসী হয়েছেন।

ছন্দ

কবিতার সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নিরূপণের প্রধানতম সূচক এই ছন্দ। গদ্যের গভীরে যখন আমরা ছন্দের স্পন্দন অনুভব করি, তখন সেই গদ্যও কাব্যধর্মী গদ্যের অভিধা লাভ করে, যদিও গদ্য-পদ্যের ব্যবধান বিমোচনই আধুনিক কবিতার অন্যতম কুললক্ষণ। 'বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের মতো, কবিতার জন্মরহস্যও মানুষের পক্ষে (এবং কবিদের পক্ষেও) অজ্ঞেয়।'– এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরও বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'কবিতার নবজন্ম তখনই সম্ভব হয় যখন কবিরা ভাষাকে দেন নতুন প্রাণ ও ধ্বনিস্পন্দন।' (১৯৯১ : ১৭৩)। ছন্দ আর মিলের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে বুদ্ধদেবের অভিমত : 'বাংলা, তার শুদ্ধ স্বরবর্ণ ও অসংখ্য স্বরান্ত শব্দ নিয়ে স্বভাবতই মিলে এত সমৃদ্ধ যে ছন্দ আর মিল যেন পরস্পরকে দাবি না-ক'রে পারে না।' (১৯৯১ : ১৮৪)। কবিতা ও ছন্দের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। *স্বগত* গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে ছন্দ-সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> ক. ভাষা, ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গ'ড়ে ওঠে। ভাষা ও ভাব-সম্বন্ধে কোনও রকম পূর্বসংস্কার পোষণীয় নয়।
>
> খ. ছন্দ আর মিল এক জিনিসি নয়; মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত নূতন অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি। কাব্যের জন্মবৃত্তান্তের তদন্তে নেমে আমরা বুঝেছিলুম যে আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি।
>
> গ. ছন্দ আর আবেগ যমজ, তাদের টান নাড়ির টান; এবং আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী। অর্থাৎ মুখর আবেগ উর্ধ্বশ্বাসে চলে না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধহয় ছন্দ।
>
> ঘ. কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনই অকৃত্রিমতার পদধ্বনি। অনেকে বলবেন এটা নূতন সত্য নয়, প্রত্যেক মহাকবি এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন, এবং জীবন্ত কবিতার ছন্দ সর্বত্রই অহংজ্ঞানশূন্য, সর্বত্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত। বাস্তবিক পক্ষে অভিনব-বিশেষণটা কোনও সৎকবিকে সাজে না,; সে জানে যে অর্বাচীনতা সর্বত্রই উপহাস্য; এবং সেই জন্যে উদ্ভাবন ছেড়ে সে শুধু আবিষ্করণে মন দেয়। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৯৫ : ২৫-২৭)

সমালোচকের এই বিবেচনা থেকে বাংলা কবিতায় ছন্দের গতিবিধি যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনি ছন্দের প্রবাহ ও প্রবণতার স্বরূপ সম্পর্কেও পাঠকের ধারণা জন্মে। সুধীন্দ্রনাথের মতে, ছন্দোস্বাচ্ছন্দ্যই 'কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র'। তিনি ছন্দোবিচারকেই 'সমসাময়িক কাব্যজিজ্ঞাসার নির্বিকল্প মানদণ্ড' হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। সমালোচকের এই বিবেচনা থেকে অনুভব করা সম্ভব যে, কবিতায় ছন্দ কোন আরোপিত করণকৌশল নয়, বরং তা অনেকাংশে কাব্য-বিষয়ের অনুগামী, যা কবির আন্তরিক অভিব্যক্তিকেই গভীর ও গতিশীল করে তোলে।

ফররুখ আহমদ *সাত সাগরের মাঝি* থেকেই ছন্দোস্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা কবিতার প্রচল ছন্দেই তিনি যোগ করেছেন ভিন্নতর দ্যোতনা। ফররুখ আহমদ 'রূপকল্পে যতোটা পরীক্ষাশীল ছিলেন, ছন্দে হয়তো ততোটা পরীক্ষাশীল ছিলেন না– কিন্তু বৈচিত্র্যসন্ধানী ছিলেন। কোন নতুন রূপকল্প বা ছন্দ ফররুখ সৃষ্টি করেননি; কিন্তু পুরোনো ছন্দেই তিনি নতুন ক'রে প্রাণসঞ্চার করেছেন।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৪ : ১১৮)। ফররুখ আহমদের প্রতিভাবান পূর্বপুরষদের হাতেই বাংলা ছন্দ একটি নির্ভরযোগ্য অবয়ব লাভ করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে কবি-আত্মার অনুভব-অনুরণনকে অন্যের আত্মীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। জীবনানন্দ দাশ ও ফররুখ আহমদের কবিতার রূপকল্প ও ছন্দ-বিষয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> আধুনিক বাংলা কবিতা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় বিংশ শতাব্দীর তিরিশের ও চল্লিশের দশকে ছন্দ ও রূপকল্পের প্রধান পরীক্ষাগুলি নিষ্পন্নই হ'য়ে গেছে, নতুনের দরকার নেই আর হয়তো ততোটা। কিন্তু জীবন তো ঠিকই সবসময়ই নতুন-নতুন দরজা-জানলা খুলে দিচ্ছে; কবিতাও তাই নতুন-নতুন আলোপাতে ঝলমল ক'রে উঠছে। জীবনের

> উৎসারণ আর কবিতার উৎসারণ তাই অনিঃশেষ। বাংলা কবিতায় পুরোনো রূপকল্প আর পুরোনো ছন্দের মধ্য দিয়েই জীবনানন্দ ও ফররুখ দু'রকম বিস্ময়কর নতুন কবিতার উৎসারণ ঘটিয়েছেন। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৪ : ১১৮)

ছন্দের প্রতি কবির প্রবল আগ্রহের প্রমাণ মেলে ফররুখের ঘনিষ্ঠজন কবি আবদুস সাত্তারের এক স্মৃতিকথায়, যেখানে তিনি লিখেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কবিতায় 'শব্দের অপপ্রয়োগ হ'লে এবং কোথাও কোনো ছন্দপতন থাকলে তিনি [ফররুখ] ডেকে বলে দিতেন।' আবদুস সাত্তারের কোন গদ্যকবিতায় তিনি অভিভূত হলেও সেই গদ্যকবিতার ছন্দ-সম্ভাবনা বিষয়ে কবি চিন্তা করার পরামর্শ দিতেন ফররুখ। কবি আবদুস সাত্তার লিখেছেন :

> আমার স্পষ্ট মনে আছে, "মাহে-নও" পত্রিকায় আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হলো 'দিনরাত্রির কাব্য' শিরোনামে। ওতে কিছু চিত্রকল্প ছিল, যা ফররুখ ভাইয়ের কাছে অভিনব ঠেকেছিল। যেমন, "সন্ধ্যার একটু আগে সূর্যের লালটুপি মাথায়/পৃথিবীর বিস্তৃত জায়নামাযে/দিনের সিজদা দেখলাম পশ্চিম দিকে।" ইত্যাদি। একদিন অফিস থেকে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছি, হঠাৎ ফররুখ ভাইয়ের কণ্ঠ শুনলাম, "এই শোন্।"
>
> আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, ফররুখ ভাই। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন, "তোর দিনরাত্রির কাব্য' পড়লাম। কবিতাটির বিষয়বস্তু সত্যি অভিনব। তা তুই কবিতাটি গদ্যে না লিখে ছন্দোবদ্ধ করতে পারলি না? একটু চিন্তা করে দেখিস।" (১৯৮৮ : ১৩৩)

এ থেকে ছন্দের প্রতি ফররুখ আহমদের প্রবল আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের বাঁধনেই তিনি মুক্তির আনন্দ অন্বেষণ করেছেন। বাংলা কবিতার নিরূপিত ছন্দেই তিনি গেঁথে গেছেন অন্তরের বিচিত অভিব্যক্তি। '৬-মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্ত, মুক্তক অক্ষরবৃত্ত এবং ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ও অমিত্রাক্ষর ফররুখ আহমদের প্রিয়তম ছন্দ।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৪ : ১২১)। স্বরবৃত্ত ছন্দেও কবিতা লিখেছেন ফররুখ, এমন কি আখ্যানকাব্যে তিনি স্বরবৃত্তের স্পন্দনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কখনো কখনো, কিন্তু এই ছন্দের প্রেমে পড়েন নি তিনি। মাত্রাবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তের ভুবনেই স্বচ্ছলতার স্বাক্ষর রেখেছেন ফররুখ। এই দুই ছন্দেই তাঁর স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা। কেবল বৈচিত্র সৃষ্টির অভিপ্রায়েই মহাকাব্যিক প্রয়াসেও মাঝে-মধ্যে ফররুখ স্বরবৃত্তের আন্দোলনকে আবাহন করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুউল্লাহ্ লিখেছেন, 'ছন্দোযুক্ত কবিতার দক্ষ রূপকার এবং এই আঙ্গিক মাধ্যমের নিষ্ঠাবান সাধক হলেও তাঁর জীবনের প্রায় শেষ-পর্বে তিনি রচনা করেছেন বহুসংখ্যক গদ্যকবিতা ও মুক্তছন্দের কবিতা।' (১৯৮৮ : ৪৭৭)। গদ্যছন্দ ও মুক্তছন্দের কবিতা ফররুখ লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু এর বিস্তৃতি তাঁর কাব্যপ্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রটি বিবেচনায় রাখলে কিছুতেই বহুসংখ্যক বলা যাবে না। ফররুখের সমগ্র কাব্যসাধনার ফসল হিসেবে যা-কিছু কালোত্তীর্ণ শিল্পের সৌরভ ও স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা মুখ্যত অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ওপর ভর করেই পাঠকের প্রাণে প্রোথিত বলে আমরা মনে করি।

অক্ষরবৃত্ত

ফররুখ আহমদ কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আশ্রয় নিয়েছেন। *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের অনেক বিখ্যাত কবিতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নির্মিত। 'ডাহুক', 'লাশ' প্রভৃতি কবিতায় তিনি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন। ১৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা অনুধাবন এবং এই ছন্দ ব্যবহারের অনুপ্রেরণা ফররুখ লাভ করেছিলেন তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকর্ম থেকে। এক স্মৃতিকথায় মুস্তফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন, "ফররুখ ভাই প্রায়ই বলতেন, 'ক্লাসিকস পড়বি। মধুসূদন পড়েছিস?' তাঁর প্রিয় কবি মধুসূদন। ক্লাসিকসের উৎস থেকে, মধুসূদনের চর্চা থেকে একটি বিশেষ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেন। তা হচ্ছে কবিতা রচনায় কব্জির জোর। এ জোর ছিল তাঁর সহজ দখলে।" (১৯৮৮ : ১৭৬)। আবু হেনা মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, মিল্টন, মধুসূদন এবং এলিয়ট ছিলেন ফররুখের প্রিয় কবি। তিনি লিখেছেন, ফররুখ "মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা থেকে।... 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সম্পূর্ণটাই বোধ করি তিনি মুখস্ত বলতে পারতেন।" (১৯৮৮ক : ১৯২-৯৩)। আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের কবিতার রূপকল্প ও ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনায় মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে ফররুখের দখল বিষয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর একটি অভিমত উদ্ধার করেছেন, যা থেকে কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি আগ্রহের কারণ অনুধাবন করা যায়। প্রসঙ্গত আমরা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অভিমতটি এখানে উপস্থাপন করছি :

> His [Farrukh's] love for Michael Madhusudan Dutt is well-known. long passages from "Meghnadbad", Dutt's epic came easily to his lips. One can imagine him making full use of his god-gifted voice in reciting those famous passages, classic examples of the grand style that Bengali poetry can be proud of Michael's influence on Farrukh ran in different direction in his sonnets, his experiment with verse-drama ("Maufel O Hatem"), his venture to write a long heroic poem ("Hatem Tyee") in an age when poets, in Bengali, have thoughtfully kept away from such attemts. (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৪ : ১১৯)

কবিস্বভাব এবং শিল্প-বিবেচনার ভিন্নতার কারণেই 'শব্দে-বাক্যে মাইকেলের সরাসরি প্রভাব ফররুখে অকল্পনীয়'। কাব্যদেহের শৈথিল্য পরিহারে প্রয়াসী ছিলেন ফররুখ। কবিতার একটি ধ্রুপদী অবয়ব নির্মাণের অভিপ্রায় থেকেই মাইকেলের ৮.৬ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুপ্রেরণায় ফররুখ ৮.১০ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগের মাধ্যমে এই ছন্দের একটি স্বতন্ত্র অবয়ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। ফররুখের কবিতা থেকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক.	মনে হয় তুমি শুধু | সেই সুরাবাহী	৮.৬
	পাত্র ভরা সাকী।	৬
	উজাড় করিছ একা | সুরে ভরা শারাব-সুরাহি	৮.১০
	বনপ্রান্তে নিভৃত একাকী।	১০
		('ডাহুক'/*সাত সাগরের মাঝি*)
খ.	আরব সমুদ্র-স্রোতে | ক্রমাগত দূরের আহ্বান,	৮.১০
	তরণীর মুখ থেকে | মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,	৮.১০
	এ দিকে হরিণ আনে | বাঁকা শিঙে চাঁদ : রমজান;	৮.১০
	ক্ষীণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় | যৌবনের প্রাচুর্য পূর্ণিমা।	৮.১০
		('বন্দরে সন্ধ্যা'/*সাত সাগরের মাঝি*)
গ.	যেখানে প্রশস্ত পথ | ঘুরে গেল মোড়	৮.৬
	কালো পিচ-ঢালা রঙে | লাগে নাই ধূলির আঁচড়,	৮.১০
	সেখানে পথের পাশে | মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে | জমিনের 'পর;	৮.৮.৬
	সন্ধ্যার জনতা জানি | রাখে না সে মৃতের খবর।	৮.১০
		('লাশ'/*সাত সাগরের মাঝি*)
ঘ.	নিয়ত জ্বলিয়া ওঠে | অবরুদ্ধ চিত্তের পল্বলে;	৮.১০
	সে কথা পূর্ণতা পায় | একটি নিটোল অশ্রুজলে ॥	৮.১০
		('অশ্রুবিন্দু'/*সিরাজাম মুনীরা*)
ঙ.	বুঝেছি খ্যাতির মূল্য | এতদিনে, বুঝেছি এখন	৮.১০
	যে মানুষ প্রাণ দিয়ে | করে যায় বিশ্বের কল্যাণ	৮.১০
	কুল মুখলুকের বুকে | স্থান তার; দুনিয়া জাহানে	৮.১০
	পায় সে বিপুল মান | জীবনে অথবা মৃত্যুপারে।	৮.১০
		('তৃতীয় অঙ্ক ॥ পাঁচ ॥ নৌফেল'/*নৌফেল ও হাতেম*)
চ.	কাহিনীর পুরোভাবে | নেমে আসে নায়িকা পুঁথির	৮.১০
	কাল চুলে চাঁপা ফুল | দীর্ণ করে রাত্রির তিমির ॥	৮.১০
		('লোকসাহিত্যের নায়িকা'/*মুহূর্তের কবিতা*)
ছ.	আপাদমস্তক তব | গোলামী গর্বের	৮.৬
	উজ্জ্বল প্রতীক! তবু | করো উদ্গীরণ	৮.৬
	স্বাধীনতা বাক্য যবে | করে বন্ বন্	৮.৬
	অসীম বিস্ময়ভরে | মস্তিষ্ক খর্বের;	৮.৬

Dhaka University Institutional Repository

('চরম'/*অনুস্বার*)

ফররুখ আহমদ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রাসংখ্যাকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন, কখনো কখনো ২৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতাও লিখেছেন তিনি, কিন্তু ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেই তিনি অধিকসংখ্যক কবিতা লিখেছেন। ফররুখের *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাট্যটি ১৮-মাত্রার প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তের কবিতার সংখ্যা খুবই কম। 'জীবনানন্দ দাশের মতো বিস্তারধর্মিতা ফররুখ আহমদে নেই। তিনি সমিল সমপংক্তির অক্ষরবৃত্ত লিখেছেন, অমিল সমপংক্তিক অক্ষরবৃত্তও তাঁর আছে। সমিল অসমপংক্তিক অক্ষরবৃত্তের মুক্তক যেমন লিখেছেন, তেমনি অমিল অসমপংক্তিক মুক্তকও লিখেছেন। তাঁর কিছু কিছু অক্ষরবৃত্তের কবিতাকে মাত্রাবৃত্তেও ফেলানো যায়।' (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১১১)। এভাবে ফররুখ আহমদ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিরূপিত অবয়বটিকে আত্মস্থ করেই এই ছন্দে নতুন করে প্রাণসঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন।

সনেট

ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সনেটের দৃঢ়সংহত শরীরে তিনি অনায়াসে আপন অনুভব-উপলব্ধির সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কাব্যযাত্রার প্রথম প্রকাশিত প্রয়াসও ছিল সনেট– ১৯৩৭ সালে *বুলবুল* আর মাসিক *মোহাম্মদী*র শ্রাবণ সংখ্যায় 'রাত্রি' আর 'পাপ-জন্ম' শীর্ষক সনেট দু'টি প্রকাশ পায়– এবং সর্বশেষ কবিতাটিও '১৯৭৪' শীর্ষক একটি সনেট। 'অর্থাৎ ফররুখ চিরকাল সনেট রচনা ক'রে গেছেন। এস্নিতে ফররুখ ছিলেন সবসময় প্রকরণমনস্ক : বিষয়ের সঙ্গে বিন্যাসের দিকে নজর রেখেছেন সবসময়, এক কাব্যপ্রকরণ থেকে অন্য কাব্যপ্রকরণে তিনি অবিরাম সফর করেছেন, কিন্তু ঘুরে-ফিরে এসেছেন সনেটের কাছে।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৭৪)। ফররুখের *মুহূর্তের কবিতা*, *অনুস্বার* ও দিলরুবা পূর্ণাঙ্গ সনেট-কাব্য। এছাড়া তাঁর *সাত সাগরের মাঝি*, *আজাদ করো পাকিস্তান*, *সিরাজাম মুনীরা*, *হাতেম তা'য়ী*, *হে বন্য স্বপ্নেরা*, *কাফেলা*, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও বেশ কিছু সনেট রয়েছে। ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয়– দুই রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেট সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ লিখেছেন :

> রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা, উপমা-চিত্রকল্পের প্রাণ-সজীবতা ও অভিনবত্ব, বক্তব্যের প্রতীকী উপস্থাপনা ফর্রুখ আহ্মদের অনেক সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতাকেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুই নয়– আঙ্গিক ও রূপরীতির দিক থেকে দেখতে গেলেও তাঁর বিপুলসংখ্যক সনেটের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সন্ধান মিলবে। সনেটের আঙ্গিক ও মিল-বিন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি যেমন বাংলা সনেটের আদি স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন, তেমনি পূর্বসূরী আরও অনেক কবি এবং তাঁর সমসাময়িকদের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ফররুখ আহমদ ছিলেন প্রতিভাবান ও সৃজনধর্মী কবি, সে কারণে তিনি পূর্বসূরীদের অনুগত অনুসরণই করেন নি, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আঙ্গিক এবং মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে নতুনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সনেট রচনায় ফররুখ আহমদ কোনো এককেন্দ্রিক কিংবা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি অনুসরণ করে নি, তাঁর হাতে শেক্সপীয়রীয় পেত্রার্কীয় উভয় রীতিতেই যেমন সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচিত হয়েছে, তেমনি এমন অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছেন, যা প্রথাগত ও প্রচলিত রীতির মধ্যে পড়ে না। (১৯৮৮ : ৪৭৭-৭৮)

ফররুখ আহমদ প্রচুর সনেট লিখেছেন কিন্তু তাঁর কবিতায় সনেটের বিশেষ কোন রীতিকেই বিশুদ্ধতার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হয় নি। তিনি নিজের ইচ্ছের অনুকূলে সনেট-শরীরে পরিবর্তন এনেছেন। সনেটের ছন্দ-সন্নিবেশেও তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। তাই সনেটের প্রথাসিদ্ধ অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দকেও ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর সনেট নিয়ে সমালোচক মহলে বিকর্তের ঝড় উঠেছে। আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত *কাব্য-মালঞ্চ* (১৯৪৫)-এর ভূমিকা হিসেবে 'বাঙ্গালা কাব্যের ইতিহাস' শীর্ষক রচনায় আবদুল হক লিখেছেন, 'ইদানীং ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।' ফররুখের সনেটে 'সৌন্দর্যবিহার ও বেদনাবোধ অনবদ্য রসমূর্তি লাভ করিয়াছে' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কারণ, তাঁর মতে 'তিনি [ফররুখ] রোমান্টিক কবি কিন্তু তাঁহার নভোবিহারী কল্পনা ধূলিম্লান পৃথিবীর আকর্ষণ অস্বীকার করে নাই।' (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৭৬)।

কিন্তু ১৯৬৪ সালে 'পূবালী' পত্রিকায় *মুহূর্তের কবিতা* গ্রন্থের আলোচনায় আবদুল কাদির ফররুখের সনেটে অন্তমিল, অনুপ্রাস ও মিলকল্পের অভাবে পীড়িত বোধ করেন এবং মন্তব্য করেন, 'বহুসংখ্যক রচনার জন্যেই ফররুখ আহমদ সার্থক সনেটকার হিসাবেও মর্যাদার আসন পাবেন।' একইরকম মন্তব্য করেন ফররুখের ঘনিষ্ঠজন আবদুল হক। তিনি বলেন, 'ফররুখ আহমদের চতুর্দশ পংক্তির সব রচনাকেই সনেট ধরলে, তিনি বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠ সনেটকারদের অন্যতম।' (১৯৮৮ : ২৭)। আমাদের বিবেচনায় কেবল সংখ্যা-বিচারে নয়, শৈল্পিক সমৃদ্ধি মূল্যায়ন করলেও সনেটকার ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন। 'বাংলা সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী– মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে– হয়তো ফররুখ আহমদের নাম একদিন তাঁদের সঙ্গেই উচ্চারিত হবে।'– ফররুখ আহমদের সনেট সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৯৩ : ১৮২) এই বিবেচনা যথার্থ বলেই আমরা মনে করি।

ফররুখ আহমদ ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেরই অধিকসংখ্যক সনেট রচনা করেছেন। ভাবের গতি ও গভীরতা অক্ষুণ্ন রেখে প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্তের যতিস্বাধীন অবয়বটি ফররুখের কবিস্বভাবের অনুকূলে চমৎকারভাবে আত্মীকৃত হয়েছে। পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় রীতিই তাঁর সনেটের প্রধানতম অবলম্বন, কিন্তু অন্ত্যমিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রায়শই স্বাধীনতা নিয়েছেন। *মুহূর্তের কবিতা*র সর্বশেষ রচনা 'শেষ কথা' শীর্ষক সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি, যেখানে কবি তাঁর অপ্রকাশিত অনুভব ও উপলব্ধির জন্য আক্ষেপ করেছেন :

> কিছু লেখা হল আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের
> কিছু বলা হ'ল আর হয়নি অনেক কিছু বলা;
> অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা,
> কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?
>
> শুধু নিমেষের রঙে এই সব গান মুহূর্তের
> অতলান্ত দরিয়ায় এ সব বুদ্বুদ গোত্রহীন
> কখনো উঠেছে কেঁদে, কখনো বা হয়েছে রঙিন
> দু'দণ্ড খেলার ছলে স্পর্শ নিতে পূর্ণ জীবনের।
>
> লক্ষ যুগ যুগান্তর মিটে যায় যেখানে পলকে
> সেখানে এ বুদ্বুদের কান্না-হাসি, সংশয়িত কাল
> কতটুকু? তবু তারে রাখে ঘিরে প্রদোষ সকাল
> রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে, অন্ধকার তারার ঝলকে
> দূরের ইশারা এনে; (মুহূর্তের আনন্দ উত্তাল
> উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে দিক দিগন্তে শাশ্বত আলোকে) ॥ ('শেষ কথা'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উপরিউক্ত সনেটটি ক খ খ ক ॥ গ ঘ ঘ গ ॥ ঙ চ চ ঙ চ ঙ– এই মিলবিন্যাসে রচিত এবং এই কবিতার 'কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?'– এই পঙ্ক্তির 'সময়ের' শব্দটির পরিবর্তে 'সনেটের' সংযোজন করলে ফররুখের সনেটসমূহের স্বরূপ অনুধাবন সহজ হবে বলে আমরা মনে করি। 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সনেট রচনায় প্রথাগত রীতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী এবং আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর ফলেই তাঁর হাতে সৃজিত হয়েছে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের এবং বিচিত্র আঙ্গিকের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা।' (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ১৯৮৮ : ৪৭৮)। ফররুখ বিশ্বাস করেন, সনেটের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রূপ-রীতিই সনেট-সম্পর্কে শেষ কথা নয়, এর সীমা ও সম্ভাবনাকে আরো অনেক দূর প্রসারিত করার সুযোগ আছে। সনেট-নির্মাণে ফররুখ আহমদ আমৃত্যু সেই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

গদ্যছন্দ

ফররুখ আহমদ গদ্যছন্দে খুব বেশি আগ্রহ দেখান নি। প্রাণের কথাকে ছন্দে বেঁধেই তিনি পাঠকের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগসাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'গদ্যছন্দ ফররুখের প্রাণের ছন্দ ছিল না– ফররুখ ছন্দ-মিলেই স্বস্তি বোধ করতেন।' (১৯৯৪ : ১২৮)। *হাবেদা মরুর কাহিনী* (১৯৮১) ফররুখের পূর্ণাঙ্গ গদ্যকাব্য এবং কাব্যের কবিতাবলিকে তিনি 'গদ্যে লেখা রূপক কবিতা' দাবি করেছেন। এই কাব্যে 'নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা' প্রকাশ পেয়েছে বলে গ্রন্থের প্রবেশকে উল্লেখ করেছেন কবি। জীবনের ছন্দহীনতার রূপকল্প নির্মাণের প্রয়োজনেই তিনি গদ্যছন্দে এই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর ছন্দাশ্রয়ী কাব্যসমূহের পাশে *হাবেদা মরুর কাহিনী*-কে অনেকটাই ম্লান মনে হয়। নিচের উদ্ধৃতি দু'টো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. জুলমাতের হিংস্র ছায়ায়
মিশে গেছে কাহিনী শোনার সন্ধ্যা...
কিন্তু এখানে,
এখানে এই অমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে,
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুমাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে... (১-সংখ্যক কবিতা/*হাবেদা মরুর মাঠে*)

খ. জোনাকী জ্বলা বিজন মাঠের মধ্যে
ক্ষণিক আলো ছায়ার মত
জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে
আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা। (৩৭-সংখ্যক কবিতা/*হাবেদা মরুর কাহিনী*)

গদ্যছন্দের প্রতি ফররুখ আহমদের অনাগ্রহের কারণ তাঁর কবিস্বভাবের গভীরে নিহিত বলে আমরা মনে করি। 'গদ্য কবিতার মধ্যে প্রাত্যহিক কথ্যবুলি অনায়াসে আনা যায়।'– অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের (১৯৯১ : ১৬৫) এই অভিমত খুবই সঙ্গত, যার প্রয়াস ফররুখের সাহিত্যকর্মে একেবারেই অনুপস্থিত। কথ্যঢঙের প্রলোভন এড়িয়ে গদ্য পদ্যের মাঝখানের দেয়ালটি তিনি বরং অক্ষুণ্নই রাখতে চেয়েছেন। কবিতায় তিনি মানুষের আটপৌরে জীবনের খণ্ডচিত্র উপস্থাপনের পেয়ে মহত্তম মানবিক মূল্যবোধকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ছন্দোবদ্ধ অবয়বেই তা অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য দ্যুতি ও গতি লাভে সক্ষম হয়েছে। ফররুখের অধিকাংশ কবিতার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত যা গদ্যের স্বাভাবিক ধ্বনিস্পন্দের চেয়ে বাংলা ছন্দের নিরূপিত রীতিতেই লক্ষ্যভেদী হয়েছে।

স্বরবৃত্ত

ফররুখ আহমদের কবিতায় স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ উল্লেখ করার মতো নয়। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কবিতায় তিনি স্বরবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছেন, যা থেকে এই ছন্দের তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। *হাতেম তা'য়ী* কাব্যের বেশ কিছু কবিতায়ও তিনি এই ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। এই কাব্যের 'চাহারম সওয়াল' পর্বের 'মালেকা জরিন পোশের কিস্‌সা', 'যাদুর লড়াই' এবং 'শশম সওয়াল' পর্বের 'পাখীর আলাপ' ও 'পথচারী' কবিতায় আমরা স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করি। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি :

ক. গানের আসর | শুরু হ'ল, ৪.৪
নাচের আসর | সব শেষে, ৪.৩
অবাক হ'ল | সেই মুসাফির ৪.৪
ম'ফিল দেখে | দূর দেশে। ৪.৩
('চাহারম সওয়াল ॥ মালেকা জরিন পোশের কিস্‌সা [তিন]'/*হাতেম তা'য়ী*)

খ. জানলো যখন | কন্যাকে তার | ছিনিয়ে নিতে ৪.৪.৪
সত্য-সাধক | হাতেম চলে | অভয় চিতে ৪.৪.৪

বিষম ক্ষোভে | কাঁপলো যে তার | মাথার জটা, ৪.৪.৪
চোখের কোণে | উঠ্‌লো জেগে | অগ্নিছটা, ৪.৪.৪
('চাহারম সওয়াল ॥ যাদুর লড়াই [এক]'/*হাতেম তা'য়ী*)

গ. নিজের হাতে | নিজেই হেনে | ছুরি ৪.৪.২
হাতেম তা'য়ী | রক্ত করে | দান, ৪.৪.১
মৃত্যুমুখী | প্রাণী ওঠে | বেঁচে ৪.৪.২
হয় সে আবার |সতেজ, বলী|য়ান। ৪.৪.১
('শশম সওয়াল ॥ পথচারী'/*হাতেম তা'য়ী*)

স্বরবৃত্তে ফররুখের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রমাণ মেলে *হে বন্য স্বপ্নেরা* কাব্যের কয়েকটি কবিতায়, যেখানে কবি সনেটের শরীরেও স্বরবৃত্তের শ্বাসাঘাতকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "স্বরবৃত্ত ছন্দেও কবি কয়েকটি পরীক্ষামূলক সনেট লিখেছিলেন; এরকম চারটি সনেট বেরিয়েছিল 'সওগাত' বৈশাখ ১৩৫৪ সংখ্যায়।" (১৯৯৩ : ১৮০)। 'বৈশাখ', 'জ্যৈষ্ঠ', 'স্বপ্ন' ও 'প্রতীক'– এই চারটি সনেটে ফররুখ স্বরবৃত্তের ঝোঁক অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সনেটের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিকে তিনি ৪.৪.৩ মাত্রায় বিন্যস্ত করেছেন। সনেটের সংহত অবয়বে স্বরবৃত্তের স্পন্দন কতটা কার্যকর, সক্রিয় ও শৈল্পিক হয়েছে, তা অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ সনেট এখানে উদ্ধার করছি :

যৌবন যে প্রেমের প্রতীক বলি না তা'
বাসন্তী নীল দিনগুলি যার রূপ বিভায়
কাটলো সুরের দাহ নিয়ে ঝড় হাওয়ায়
পিছন পানে তাকিয়ে শুনি সেই গাথা।
ফাল্‌গুনে যে সবুজ শিখা সেই পাতা
ঝরল যে-দিন তাকিয়ে দেখি মোর শাখায়
ফুলের জোয়ার রিক্ত শাখার শেষ সীমায়
প্রেমের নতুন জয়ধ্বনি জয়গাথা।
পৌঢ় শরৎ রাত্রে দেখি তৃপ্তিলীন
এই পৃথিবীর তপ্ত শিরা শান্ত হিম,
শ্রান্তি মধুর স্বপ্ন ছড়ায় মধ্য দিন
পাপড়ি ধূসর পরাগ তবু আরক্তিম;
দীর্ঘ স্মৃতির রন্ধ্রে জাগে বর্ণহীন
গন্ধভারে পূর্ণ আমার মন অসীম ॥ ('প্রতীক'/*হে বন্য স্বপ্নেরা*)

মাত্রাবৃত্ত

ফররুখ আহমদের ছন্দোপ্রীতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সমান্তরালে মাত্রাবৃত্তেও প্রবাহিত ও প্রসারিত ছিল। বিশেষ করে ৬-মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্তে তাঁর দুই প্রতিভাবান পূর্বসূরী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বেনজীর আহমদের কৃতিত্বের মতো তিনি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত স্বর-সংযোজনে সক্ষম হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাঁর মতে, বিশের তিরিশের ও চল্লিশের দশকের এই তিনজন কবির মধ্য দিয়ে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত চূড়াস্পর্শী সাফল্য অর্জন করে। (১৯৯৪ : ১২২)। এই সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে নজরুলের *অগ্নি-বীণা* (১৯২২), বেনজীর আহমদের *বৈশাখী* (১৯৪৪) এবং ফররুখের *সাত সাগরের মাঝি* (১৯৪৪) কাব্যের নাম করেছেন তিনি। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন জীবনানন্দ দাশ। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'এঁদের এই সাফল্যের পটভূমিকায় মুক্তক মাত্রাবৃত্ত প্রসঙ্গে' জীবনানন্দের এই বক্তব্য পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছেন। কবিতার আত্মা ও শরীরের খোঁজ করতে গিয়ে জীবনানন্দ লিখেছেন :

> মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই;– এই যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে-পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে– সেইটে কাব্যের ছন্দলোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে

> মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার জন্ম যদি যুগের নাড়ি-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা? (জীবনানন্দ দাশ ২০০২ : ৪০)

ফররুখ আহমদ জীবনানন্দের এই প্রত্যাশাকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন। মুক্তক মাত্রাবৃত্তে নজরুল ইসলাম এবং বেনজীর আহমদের সাফল্য মনে রেখেও বলা যায়, *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যে ফররুখ আহমদ এই ছন্দে ভিন্নতর দ্যোতনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহেও এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে, যদিও বিষয়ের প্রভাবেই অন্যান্য কাব্যের ৬-মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে। ফররুখের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-আশ্রিত কয়েকটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. দরিয়া তুফান | জয় ক'রে মোরা | দাঁড়ায়েছি দেখ | মাঝি।	৬.৬.৬.২
ভেসে গেছে শুধু | মাল্লা সাতশো, | আর	৬.৬.২
উড়ে গেছে শুধু | সামনের এক | পাটাতন তক্|তার,	৬.৬.৬.২
দেখ ক্ষত তনু | সুদৃঢ় মাস্ |তুল	৬.৬.২
প্রশান্ত খা'বে | মাপে দরিয়ার | মুক্ত নীল কি|নার,	৬.৬.৬.২
দেখ আসমানে |ফোটে সেতারার | কলি,	৬.৬.২
আরশির মতো | নিটোল পানিতে | মুখ দেখে বকা|ওলি।	৬.৬.৬.২
	('সিন্দবাদ'/*সাত সাগরের মাঝি*)
খ. পাহাড় পথের | সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে | উঠেছিল যারা | আগে	৬.৬.৬.২
তাদের গতির | ঝড়ে আজো এই | মরুতটে দোলা | লাগে!	৬.৬.৬.২
থেমে যায় যত | পিশাচের কল| রোল,	৬.৬.২
অবিশ্রান্ত | সে গতির কল্| লোল	৬.৬.২
শোনা যায় দূরে | দূরে :	৬.২
তারা চ'লে গেছে | সব বাধা ঠেলে, | পশুদের পিষে | ফেলে	৬.৬.৬.২
বন্ধুর কোহি| তূরে...	৬.২
	(এই সংগ্রাম'/*সিরাজাম মুনীরা*)
গ. বনি আদমের | রূপ দেখে ভুল | হয়েছে যার	৬.৬.৫
জাহেরি সুরাতে | পেয়েছে সে দেখা | ব্যর্থতার	৬.৬.৫
বনি আদমের | দিল চিনে ভুল | হয়নি যার	৬.৬.৫
চিনেছে সে পরী | ঈশ্কের রঙ | পূর্ণতার,	৬.৬.৫
প্রাণ-সঞ্চয়ে | পেয়েছে পাথেয় | অকূলে তরী!	৬.৬.৫
হাতেম তা'য়ীকে | চিনেছিল শুধু | হাস্না পরী।	৬.৬.৫
	('দুস্রা সওয়াল ॥ কাহিনী'/*হাতেম তা'য়ী*)

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, মাত্রাবৃত্তের পূর্ণ পর্বের ৬-মাত্রা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি অপূর্ণ পর্বে যথাসাধ্য স্বাধীনতা নিয়েছেন। পর্ব বিন্যাসের প্রয়োজনে অনেক শব্দের মধ্যখণ্ডন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উদ্ধৃতিসমূহে তক্তার, মাস্তুল, কিনার, বকাওলি, কলরোল, কল্লোল, কহিতূর প্রভৃতি শব্দের মধ্যখণ্ডনের মাধ্যমে তিনি ৬-মাত্রার মূল পর্বে সমতা বিধান করেছেন।

মিশ্রছন্দ

ফররুখ আহমদের মিশ্রছন্দে লেখা কবিতার সংখ্যা খুবই কম। কয়েকটি কবিতায় একাধিক ছন্দের মিশেল ঘটিয়েছেন তিনি। কবিতার ভাবানুষঙ্গের অনুরোধেই তিনি একই কবিতার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এতে কবিতার অনুভব-উপলব্ধি দ্যোতিত ও দূরসঞ্চারী হয়েছে। একই কবিতায় ছন্দ-পরিবর্তনের ফলে পাঠকের কান যেমন সচকিত হয়, তেমনি এ জাতীয় কবিতা প্রাণের কাছেও অন্যরকম ব্যঞ্জনার দ্বার উন্মোচন করে। 'ফররুখ বিভিন্ন ছন্দ

প্রয়োগ করেছেন'– এ জাতীয় কবিতার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রত্যেকটি কবিতার স্বভাব চিহ্নিত করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ :

> 'আঁধারের স্বপ্ন' ('সওগাত', পৌষ ১৩৪৫) গদ্যছন্দ ও মাত্রাবৃত্তে লেখা। 'প্রেক্ষণ' ('সওগাত', বৈশাখ ১৩৫০) কবিতাটি একই সঙ্গে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে গাঁথা। 'মৃত্যু ও মৃত্তিকা' ('সওগাত', আশ্বিন ১৩৫০) কবিতার তিনটি অংশ তিনরকম ছন্দে রচিত। 'আউলাদ' ('সাত সাগরের মাঝি') কবিতার প্রথমাংশ একটি সনেট, পরবর্তী অংশ মুক্তক অক্ষরবৃত্ত। (জীবনানন্দের ধরনে অনিয়মিত ও স্বেচ্ছাচারী অন্তমিল, কখনো-কখনো পর-পর তিনটি বা চারটি অন্তমিল ব্যবহার করেছেন 'আউলাদ' কবিতায়।) 'কাফেলা ও মনজিল' ('কাফেলা') কবিতার প্রথমাংশে একটি সনেট, দ্বিতীয়াংশে ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তের দুরকম স্তবকের নকশায় তিনটি-তিনটি ছয়টি স্তবক। 'রবীন্দ্র-স্মরণে' ('শ্রেষ্ঠ কবিতা') কবিতার প্রথম চারটি স্তবক চার পঙক্তিতে সম্পন্ন– যেখানে চতুর্থ পঙক্তিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; প্রথম স্তবকের 'শূন্যপ্রাণ পঁচিশে বৈশাখ' চতুর্থ স্তবকের শেষে 'পরিপূর্ণ পঁচিশে বৈশাখ'এ রূপান্তরিত হয়ে যায়; কবিতার দ্বিতীয়াংশটি একটি সনেট। (১৯৯৪ : ১২৮)

অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কারিগর ফররুখ আহমদ যেমন স্বরবৃত্তকেও কবিতায় স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি ছন্দের মিশ্রণেও কবিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ফররুখের মিশ্রছন্দে রচিত একটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

জীবন তোমার | পাক খেয়ে যায় | তীব্র স্রোতে | দুর্নিবার	৪.৪.৪.৪
গাঢ় তিমির | অতল হতে | বিষিয়ে ওঠে | নীল আঁধার ।...	৪.৪.৪.৪ (স্বরবৃত্ত)
তোমার অতীত শ্বাস | হয়ে গেছে সোনা	৮.৬
মুহূর্তে, মুহূর্তে সেথা | করে আনাগোনা,	৮.৬
হানা দেয় বারবার | শ্বাপদ ভয়াল,–	৮.৬ (অক্ষরবৃত্ত)
তোমাকে পরাবে | পূর্ণিমা রাখী | যে হাত তোমার | ফাঁকা	৬.৬.৬.২
সে ফাঁকা হাতে | মুঠিতে বদ্ধ | শিরীর ওষ্ঠ | পুট	৬.৬.৬.২
তোমার দীপ্ত | কুঠারের মুখে | শিরীণের মুখ | আঁকা	৬.৬.৬.২
তোমার চলায় | শিরীর তিলের | তিলক হয়েছে | লুট	৬.৬.৬.২ (মাত্রাবৃত্ত)
	('মুমূর্ষু শাল'/*হে বন্য স্বপ্নেরা*)

উদ্ধৃত কবিতাংশে ফররুখ আহমদ স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রত্যেক ছন্দের অতিনিরূপিত মাত্রাসংখ্যাই বহাল রেখেছেন তিনি। ফররুখের ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তের কবিতা খুব কম হলেও এই কবিতায় অক্ষরবৃত্তে রচিত কবিতাংশটি ১৪-মাত্রার।

ফররুখ আহমদ প্রবলভাবে ছন্দমগ্ন কবি। তাঁর এই মগ্নতার ভাঁজে ভাঁজে স্বচ্ছলতা দেদীপ্যমান বলেই ছন্দের অভিযাত্রায় তিনি এত সহজ-স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কবিতার ওপর ছন্দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেন নি তিনি। ছন্দ তাঁর কবিতার ভাবের অধীন থেকেই আপন স্বভাবে বিকশিত হতে চেয়েছে। ফররুখের স্বকালের কবিরা যখন কবিতার ভাষার সঙ্গে ও কথ্যভঙ্গির বিরোধ বিমোচনে প্রয়াসী হয়েছেন, তখন তিনি ছন্দের বাঁধনেই মুক্তির আনন্দ খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছন্দের প্রভাবে কথার জড়ত্ব কেটে যায়। সেতারের বাঁধা তার যেভাবে সুরকে মুক্তি দেয়, সেভাবেই ছন্দ অন্তরের সুরে মুক্তির আনন্দ সঞ্চার করে। 'ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে নিক্ষেপ করে।' (১৯৭৬ : ৫০)। রবীন্দ্রনাথের এই বিবেচনাকেই বোধকরি শিরোধার্য করেছিলেন ফররুখ। কথাকে ছন্দে গেঁথেই ফররুখ আহমদ অনুভবপুঞ্জকে 'তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে নিক্ষেপ' করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : আবুল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি

ব্যক্তিপ্রতিভার আত্মখচিত উপলব্ধি শিল্পসংহত অবয়বে পাঠকের প্রাণের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করলেই তা লাভ করে সাহিত্যের সম্মান ও স্বীকৃতি। আত্মনির্মাণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একজন শিল্পস্রষ্টার অন্যরকম হয়ে ওঠার এই প্রয়াস সচেতন এবং সঙ্গত কারণেই অনলস ও অন্তহীন। এই সচেতনতার আড়ালেও থাকে এমন কিছু উপাদান যা অচেতনভাবেই তাঁর মানসগঠনে প্রভাব ফেলে এবং তাঁকে মেলে ধরে, কিংবা ঠেলে দেয় সৃষ্টিসুখের উল্লাসে অবগাহনের পথে। একজন সৃজনশীল মানুষ জানেন, কুসুমাস্তীর্ণ পথের যাত্রী তিনি নন, তাঁর 'পথে পথে পাথর ছড়ানো'। তবু থমকে দাঁড়ান না তিনি। এই 'পথ চলা' কিংবা 'পথ-চাওয়ার' আনন্দকে আমরা যদি জীবনের সমান্তরালে স্থাপন করতে শিখি, তাহলে শিল্পের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুঁচে যায়। শিল্পের সঙ্গে সহাবস্থানে আমরা তাই জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হই। জীবনের কোন অর্জন কিংবা অভিজ্ঞতাই অর্থহীন নয় বলে যে-কোন মহৎ শিল্পকর্মের মর্মে প্রবেশের প্রয়োজনে স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের নানা প্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যে অতীত একজন শিল্পীকে ক্রমাগত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়, তাকে জানতে ও বুঝতে পারলে কৌতূহলী পাঠকের আনন্দ নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হতে পারে।

পারিবারিক পটভূমি ও শৈশব জীবন

সৃজনশীল মানুষের মানসগঠনে পারিবারিক পরিমণ্ডল তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাঁর বেড়ে ওঠা কেবল দৈহিক বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বও নির্মিত হতে থাকে, যা তাঁর সৃজনবিশ্বকে পুষ্ট করে এবং তাঁকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবুল হোসেনের কবিপ্রতিভার স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য ও গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়োজনেই আমরা তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলের খোঁজ নিতে চাই, পাঠ করতে চাই তাঁর শৈশব যৌবনের দিনলিপির তাৎপর্যপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলো।

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার আড়ুয়াডাঙ্গা গ্রামে নানাবাড়িতে ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট আবুল হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতা মেহের-উন-নিসা খাতুন জমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কবির পৈত্রিক নিবাস খুলনার দেয়াড়া গ্রামে। তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে কবি নিজেই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। সেই সময়ে মুসলমান পরিবারে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ ছিল না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন্মতারিখ লিখেও রাখা হত না। মায়ের কাছে শোনা স্মৃতিকথার সঙ্গে বাবার উল্লেখ করা মাস ও সাল থেকে কবির জন্মতারিখ নির্ধারিত হয়েছে। স্মৃতিকথায় আবুল হোসেন লিখেছেন, 'আমি এবং আমার এক বোন একসঙ্গে, আমরা দু'জনে একটু আগে-পরে পৃথিবীর মুখ প্রথম দেখেছিলাম; শুক্রবারে, শ্রাবণের এক বর্ষণহীন সকালে, বোনটি প্রথম, আমি দ্বিতীয়। মনে করতে পারেননি সঠিক সন-তারিখ। বলেছিলেন, ঝড়ের বছর, ১৫ই শ্রাবণ। আব্বা বললেন, অগস্ট ১৯২২। আম্মার তারিখ আর আব্বার বছর নিয়ে জন্মদিনটা হয়ে গেল ১৫ই অগস্ট, ১৯২২।' (২০০৩ : ৩)। স্কুলে ভর্তির সময় বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী আবুল হোসেনের জন্মতারিখ লেখা হয় ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২। কবির পিতা এস এম ইসমাইল হোসেন ছিলেন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, যিনি ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেন।

আবুল হোসেনের শৈশব কেটেছে কৃষ্ণনগরে। ১৯২৯ সালে সাত বছর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে আবুল হোসেনের বাবা কুষ্টিয়ায় বদলি হন। মেধাবী ছাত্র হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে ছাড়পত্র দিতে রাজি হন নি। প্রধান শিক্ষক তাঁকে নিজের বাসায় রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু পারিবারিক সিদ্ধান্তে আবুল হোসেন কৃষ্ণনগর ছেড়ে কুষ্টিয়ায় চলে আসেন এবং ভর্তি হন কুষ্টিয়া হাই স্কুলে। ১৯৩৭ সালে কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং পাশ করে ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক আবুল হোসেন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অর্থনীতির সঙ্গে সোসিওলজি পড়েছেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখার প্রতি আবুল হোসেনের আগ্রহ তৈরি হয়। এমনকি খেলাধুলায়ও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তিনি। কবির বাবা নিজে খেলাধুলা করতেন এবং কবিকেও খেলায় অংশ নিতে উৎসাহ দিতেন। খেলাধুলায় আবুল হোসেনের মনোযোগ তাঁর পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায় নি। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি– সব খেলাতেই তিনি সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আবুল হোসেন লিখেছেন :

> ছেলেবেলায় পড়াশোনা, খেলাধুলা ও লেখালেখিতে আমার সমান উৎসাহ ছিল। পড়াশোনা নিয়ে কখনও ভাবতে হয়নি। লেখালেখি করতাম নিজের মনে। স্কুলের টিমে ফুটবল, ক্রিকেট, হকিতে আমার স্থান ছিল পাকা। খেলতে যেমন ভাল লাগত, ভাল খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে, তাদের কথা শুনতে আমার ছিল অদম্য উন্মুখতা। খেলাধুলার প্রতি এই আকর্ষণ আমি নিশ্চিত আব্বার কাছেই পেয়েছি। (২০০৩ : ৩০)

লেখালেখির প্রতি আবুল হোসেনের আগ্রহের সূত্রপাত তৃতীয় শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠার সময়। বার্ষিক পুরস্কার হিসেবে পাওয়া নতুন বইগুলো তাঁকে লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী* কাব্যের নামকবিতা না বুঝেও তার ভাব ও ছন্দের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। আবুল হোসেনের অভিব্যক্তি : 'পড়তেই মনের মধ্যে এমন আলোড়ন শুরু হল, বুকের মধ্যে আবেগ এমন ঠেলে ঠেলে উঠছিল, আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কবিতাটা পড়ে ফেললাম।' (২০০৩ : ২৫)। কবির বড় বোনের বিয়েতে উপহার হিসেবে লেখা একটি কবিতা ঘটনাক্রমে কবির বাংলা শিক্ষক চারুবাবুর হাতে পড়েছিল। চারুবাবু এই কবিতা পড়ে আবুল হোসেনকে আশীর্বাদ করেছিলেন, যা কবির লেখক হয়ে ওঠার অন্যতম অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কবির মানসগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই শহরের জল-হাওয়া কবিকে মানবিক মূল্যবোধে আস্থা রাখতে শিখিয়েছিল। অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থায় অতিবাহিত কবির সেই দিনগুলি তাঁর স্মৃতিকথায় অনেক জায়গা দখল করে আছে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি ছিল সেখানে। কিন্তু সবার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করায় সমাজজীবনে শান্তি বিরাজ করত। কৃষ্ণনগরের মানুষের মুখের ভাষা শৈশবেই রপ্ত করেছিলেন কবি, যা তাঁর সৃজনকর্মেরও প্রধানতম অবলম্বন। আবুল হোসেন উল্লেখ করেছেন :

> হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এলাকাগুলোর সমন্বয়ে কৃষ্ণনগরে এক ধরনের সাধারণ উদারনৈতিক সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, যার শক্তি ছিল সব সম্প্রদায়ের লোক। হয়তো এজন্যই স্যর আজিজুল হক ও হেমন্তকুমার সরকারের মতো রাজনৈতিক নেতা, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি, আকবর উদ্দীনের মতো সাহিত্যিক, অমিয়নাথ সান্যালের মতো সঙ্গীতজ্ঞ এবং মানা গুই-এর মতো খেলোয়াড় একই সঙ্গে পেয়েছিল এই শহর। কিন্তু কৃষ্ণনগরের আসল গৌরব তার মুখের ভাষা, যার হাত ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। আমার সৌভাগ্য এই ভাষাই আমি শিখেছিলাম ছেলেবেলায়, এই ভাষায়, এদের উচ্চারণে কথা বলতাম এবং যখন দু'চার কথা লিখতে শিখলাম, এই ভাষাতেই লিখে গেলাম। (২০০৩ : ৩৪-৩৫)

এই কৃষ্ণনগরেই কাজী নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখেছিলেন আবুল হোসেন। কিন্তু সেই সময় নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় নি, সে কেবলই চোখের দেখা। স্কুল পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে এই নামের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন তিনি। কৃষ্ণনগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহ কবির মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কৃষ্ণনগরে দীর্ঘকাল অতিক্রম করেন নি আবুল হোসেন। কিন্তু শৈশবের কৃষ্ণনগরকে তিনি বুকের গভীরে ঠাঁই দিয়েছিলেন। কবির জীবনস্মৃতি পাঠ করলে কৃষ্ণনগরের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ও স্মৃতিকাতরতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণনগর থেকে কুষ্টিয়ায় এসে তিনি অন্যরকম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন। জেলা শহর কৃষ্ণনগর ছেড়ে কুষ্টিয়ার মহকুমা সদরে এসে মনটা খারাপ হলেও ধীরে ধীরে তিনি কুষ্টিয়ার সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে নিজের করে নিতে শেখেন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় কবির সঙ্গে পরিচয় ঘটে গোলাম কুদ্দুসের। আবুল হোসেন যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, গোলাম কুদ্দুস তখন নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সাহিত্যচর্চায় গোলাম কুদ্দুসের আগ্রহের কারণেই এই বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে থাকে। দু'জন মিলে পাবলিক লাইব্রেরিতে লেখাপড়া, লেখালেখি এবং নিজেদের লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতেন তাঁরা। আবুল হোসেনের ভাষায় :

> আমরা দু'জনে একসঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে মাসিক পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করি : প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতি। বেছে বেছে বই নিয়ে যাই বাড়িতে। পড়া হয়ে গেলে খেয়াঘাট থেকে রেনউইকদের কারখানা পর্যন্ত গড়াই নদীর পাড় ধরে সরু নির্জন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে করতে আলোচনা করি কার কোন লেখা অথবা বই ভাল লাগল, কেন লাগল। কুষ্টিয়া থেকে দুটি কি তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত : দীপিকা, জাগরণ। আমাদের প্রাথমিক লেখাগুলো ছাপা হয়েছিল এ সব কাগজে। (২০০৩ : ৩৯)

এই কুষ্টিয়া বাসকালেই আবুল হোসেন রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। 'হে ধরণীর কবি' শীর্ষক কবিতাটির একটি জবাবও এসেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, যাতে লেখা ছিল 'আশীর্বাদ' এবং নিচে ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। আবুল হোসেনের কবি হয়ে ওঠার পেছনে রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বচন গভীর প্রভাব ফেলেছিল বলে জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রথম জীবনে কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাব, শব্দ ও ছন্দের সম্মোহনে মুগ্ধ ছিলেন। আবুল হোসেন আত্মস্মৃতি এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেই মুগ্ধতার কথা অকপটে স্বীকারও করেছেন। তারেক মাহমুদ সম্পাদিত *আবুল হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন* গ্রন্থের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আকণ্ঠ ডুবে গেলাম এবং এতটাই ডুবে গেলাম যে প্রথম যখন কবিতা লিখতে শুরু করি রবীন্দ্রনাথের ধাচেই লিখেছি। শুধু আমি কেন, সবাই। রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে তখন কবিতা লেখা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এতবড় প্রতিভা ছিলেন যে, তার সময়ে যে যা-ই লিখেছেন, তার উপরে রবীন্দ্র প্রভাব পড়েছে। এমনকি আধুনিক বাংলা কবিতার তিন দিকপাল– বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ এবং বিষ্ণু দে প্রভাব এড়াতে পেরেছেন। জীবনানন্দের উপর খানিকটা প্রভাব পড়েছিল নজরুলের। (২০১০ : ৭৩)

আবুল হোসেন পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই বই পড়ার অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন। লেখালেখিতে আগ্রহও তৈরি হয়েছিল বইয়ের সান্নিধ্যে এসে। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন, 'বইপড়ার ব্যাপারটা পেয়েছি মা-র কাছ থেকে।' (২০০৩ : ৭২)। ছেলেবেলায় তিনি মাকে পড়তে দেখেছেন *আনোয়ারা*, *মনোয়ারা*, *বিষাদ সিন্ধু*। শিশুদের পত্রিকা *শিশুসাথী* এবং *মৌচাক*-এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন আবুল হোসেন। বিশেষ করে সুনির্মল বসুর ছড়া-কবিতা ও গল্প তাঁকে খুবই আকর্ষণ করত। ছেলেবেলা থেকেই বইপাগল হিসেবে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়মহলে পরিচিতি ছিল তাঁর। স্কুলে প্রথম দিকে তিনি গল্পের বই পড়তে বেশি আনন্দ পেতেন। 'নানা রকমের গল্প, পৌরাণিক গল্প, ইতিহাসের গল্প, অ্যাডভেঞ্চরের গল্প, রহস্যের গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্প।' বিদেশি বইয়ের অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ হতেন তিনি। তৃতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণির মধ্যে তাঁর পড়া বইয়ের তালিকা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। হোমারের *ইলিয়ড* ও *ওডেসি*, সুইফটের *গালিভারস ট্রাভল*, *অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড*, *হাঞ্চব্যাক অব নটরডেম্‌স*, *আঙ্কেল টমস কেবিন*, রেমার্কের *অল কুয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট*– এসব বই তিনি স্কুলজীবনেই অনুবাদে পড়ে শেষ করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *হাসিখুশি*, সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল*, *পাগলা দাসু*– এসব বই পাঠেও নিবিড় আনন্দ লাভ করতেন শিশু আবুল হোসেন। তাঁর পড়া প্রথম উপন্যাস নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের *অভয়ের বিয়ে*। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি লুকিয়ে এই বই পড়েছিলেন। পরবর্তী তিন বছরে তাঁর পড়া বইয়ের তালিকা দীর্ঘ। এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব, প্রবোধকুমার, অন্নদাশঙ্কর– এঁদের রচনা গভীরভাবে আত্মস্থ করেন তিনি। বইপড়ার অভ্যাস-বিষয়ে কবির বক্তব্য : '... ছেলেবেলা থেকেই আমি নিজের ভেতর থেকেও বইপড়ার আগ্রহ অনুভব করতাম। বই পড়ার জন্যে যেমন তৃষ্ণা হতো, পড়ে

তেমনি গভীর আনন্দও পেতাম। আমি নিয়মিত বই পড়া শুরু করি স্কুলে, লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ ছিল বিপুল। ওখান থেকে বাড়িতে এনেও বই পড়তাম। তাছাড়া, আমার কিছু হিন্দু বন্ধুবান্ধব ছিল। তাদের সঙ্গেও বইয়ের আদান প্রদান করতাম। এভাবে ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ার সময়েই পড়ে ফেলি রামায়ণ, মহাভারত, কথা সরিৎসাগর, বিষাদ সিন্ধু।' (২০০৩ : ৭২)। এভাবে বইয়ের সান্নিধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে আবুল হোসেনের শৈশব-কৈশোরের আনন্দময় দিনগুলো এবং নির্মিত হয়েছিল তাঁর বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের নিজস্ব ভুবন। এই ভুবনেরই বিচিত্র স্ফুরণে তাঁর সৃজনকর্ম লাভ করেছে আত্মখচিত সৌরভ ও গৌরব।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

আবুল হোসেন **১৯৪৬** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি কলকাতা আয়কর কমিশনারের অফিসে 'এক্সামিনার অব একাউন্টস' পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র সংস্থা, রেডিও ও টেলিভিশন, জনসংযোগ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কাজ করেছেন। **১৯৮২** সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন নি। ব্যাংককে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কয়েক বছর কাজ করেছেন তিনি। কিছু দিন তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।

কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পর কবির চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বাংলার বিদগ্ধজনের সান্নিধ্য তাঁর মননে ও সৃজনে যোগ করে নতুন মাত্রা। প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে রেডিওতে কাজ করতে গিয়ে আবুল হোসেন তৎকালীন পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভ করেন, যার প্রভাব তাঁর সাহিত্যকর্মেও অনিবার্যভাবে পড়েছে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার একমাত্র রেডিও স্টেশন ছিল ঢাকায়। তাই এই স্টেশনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল, আবুল হোসেন সেখানে যুক্ত হয়ে নানাভাবে লাভবান হয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থ *আর এক ভুবন* পাঠ করলে সেই সময়ের পূর্ব বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক জগতেরও একটা ছবি পাঠকের মনে মুদ্রিত হবে :

> সেই পঞ্চাশ দশকের শুরুতে রেডিও স্টেশনই ছিল ঢাকার, সম্ভবত সারা দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। দেশের সেরা এত জ্ঞানী-গুণীজন, কবি, কথাশিল্পী, অধ্যাপক, সমালোচক, গবেষক, গীতিকার, সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক– আর কোথায় কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন? রেডিওতে না এলে কি কলকাতায় যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় হয়নি, যেমন ড. শহীদুল্লাহ, ড. এনামুল হক, কবি জসীমউদ্দীন, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহবুবউল আলম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, মনসুর উদ্দীন– এদের এত শিগগির, এত ভালো করে জানতে পারতাম? না, এদের কয়েকজনের সঙ্গে গভীর প্রীতির সম্পর্ক হতো? বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরীকে। আন্তরিক হৃদ্যতা হয়েছিল শরীফুল ইমাম ও জাহানারা ইমামের সঙ্গে। ঢাকায় আসতে পেরেছিলাম বলেই তো এদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। (২০০৫ : ৬০)

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও কবি আবুল হোসেনই সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল তাঁর। তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক (১৯৩৯-৪০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যকরী পরিষদেরও সদস্য ছিলেন তিনি। আবুল হোসেন পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য (১৯৫৯-৬২) ছিলেন। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। আবুল হোসেন রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি (১৯৯০-২০০২) ছিলেন ।

আবুল হোসেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত বাই এন্যুয়াল অব পোয়ট্রি ও ভারতে অনুষ্ঠিত ইন্দোপাকিস্তান সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে আফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলন এবং যুগোস্লাভিয়ায় স্ট্রুগা কবিতা উৎসবে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

লেখক হিসেবে আবুল হোসেন শৈশবেই পাঠক ও সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কুষ্টিয়ায় স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই কলকাতার বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর লেখা মুদ্রিত হয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক– সব ধরনের পত্রিকায়ই তিনি লেখা দিয়েছেন এবং প্রকাশ পেয়েছে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন :

> ফজলুল হক সেলবর্ষীর সম্পাদনায় দৈনিক 'তকবীর', চৌধুরী শামসুর রহমানের সাপ্তাহিক 'হানাফি', এস ওয়াজেদ আলির মাসিক 'গুলিস্তাঁ'।...কলকাতায় প্রথম বড় লেখাটি বেরিয়েছিল মাসিক 'মোহাম্মদী'তে একটি ভ্রমণ কাহিনী, শিলঙ যাত্রী, ১৯৩৭ সালের শেষ অথবা ৩৮-এর প্রথম দিকে, ধারাবাহিকভাবে ৭/৮টি সংখ্যায়। মোহাম্মদীর সম্পাদক ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ কিন্তু দেখাশোনা করতেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এই সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় সেই আমার প্রথম লেখা। (আবুল হোসেন ২০০৩ : ৭০-৭১)

পরবর্তী সময়ে হবীবুল্লাহ বাহারের *বুলবুল* পত্রিকায়ও তাঁর লেখা নিয়মিত মুদ্রিত হতে থাকে। *বুলবুল* পত্রিকায় কেবল আবুল হোসেনের লেখাই প্রকাশ পায় নি, এই পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। এই পত্রিকার মাধ্যমেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আহসান হাবীবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। শওকত ওসমান ও আবু রুশদ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মুসলমানদের সৃজনপ্রতিভার বিকাশে *বুলবুলে*র ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

কলেজের ছাত্র থাকাকালে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে আবুল হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নব-বসন্ত* প্রকাশিত হয়। বইটি মুদ্রিত হয় কলকাতার ৩২ নং আপার সার্কুলার রোডের বিখ্যাত শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে। ২৫টি কবিতার এই সংকলনের দাম ছিল এক টাকা আট আনা। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাবিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক রামকিংকর বেইজ। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উৎসর্গপত্রে ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি সনেট যেখানে আবুল হোসেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের নানা প্রান্ত ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন, যার শেষ দুইটি চরণ : 'জানিয়াছি সুন্দরের তীর্থপথে তাহারে আমার/পরম পাথেয় ব'লে, তাহারেই শ্রেষ্ঠ পাওয়া মানি।' প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, বলেছেন, সেই সময় রবীন্দ্র-প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে চলা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থেই আবুল হোসেনের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের নানা চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন সেকালের পাঠক এবং সমালোচকবৃন্দ। একটি সাক্ষাৎকারে আবুল হোসেন বলেছেন, "সেকালের আধুনিকতার পরীক্ষায় 'নব-বসন্ত' বোধ হয় উতরে গিয়েছিল, তা হয়তো আজ অনেকেই জানেন না।" সেকালের আধুনিকতার সঙ্গে একালের আধুনিকতার ব্যবধান বিস্তর সন্দেহ নেই, কিন্তু আবুল হোসেন কবিতার সঙ্গে জীবনের দূরত্ব দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাই কেবল আধুনিকতার পরীক্ষায় নয়, সময়ের পরীক্ষায়ও তিনি একজন সফল শিল্পস্রষ্টা।

আবুল হোসেনের কবিজীবনের পরিধি সত্তর বছরেরও অধিক। এই দীর্ঘ সময়ে রচিত তাঁর কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে তাকে স্বল্পপ্রজ শিল্পস্রষ্টাই বলতে হয়। কবির মৌলিক কাব্যগ্রন্থ : *নব-বসন্ত* (রচনাকাল ১৯৩৮-৪০, প্রকাশ ১৯৪০), *বিরস সংলাপ* (রচনাকাল ১৯৪০-৬৭, প্রকাশকাল ১৯৬৯), *নব-বসন্ত* (পরিবর্ধিত সংস্করণ, রচনাকাল : ১৯৪০-৪৩, প্রকাশকাল ১৯৭৭), *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* (রচনাকাল ১৯৬৯-১৯৮১, প্রকাশকাল ১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (রচনাকাল ১৯৮২-৮৫, প্রকাশকাল ১৯৮৫), *এখনও সময় আছে* (রচনাকাল ১৯৮৬-৯৬, প্রকাশকাল ১৯৯৭), *আর কিসের অপেক্ষা* (২০০০), *রাজকাহিনী* (২০০৪), *কালের খাতায়* (২০০৮), *ব্যঙ্গ কবিতা* (২০০৭), *যাবার আগে* (২০১০); শিশুদের জন্য দুইটি কাব্যগ্রন্থ– *রাজা-রাজড়া* (১৯৯৮), *শাহানের বই* (২০০০); অনুবাদগ্রন্থ– *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *অন্য ক্ষেতের ফসল* (১৯৯০), গদ্যগ্রন্থ : *আমার এই ছোট ভুবন* (২০০৩), *আর এক ভুবন* (২০০৫), *ভারত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা* (২০০৯), *আবুল হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন* (২০১০), *অপরাহ্ণের স্মৃতি* (২০১৩)।

আবুল হোসেন লেখক প্রতিনিধি হিসেবে এবং সরকারি কাজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি 'যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান, যুগোশ্লাভিয়া, ফিলিপিন্‌স, শ্রীলঙ্কা, হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, লাওস ও গ্রীস ভ্রমণ করেন।' (জুনান নাশিদ ২০১১ : ৩৬৪)।

লেখক হিসেবে আবুল হোসেনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সম্মানতার তালিকাও দীর্ঘ। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩) এবং একুশে পদক (১৯৮০) লাভ করেছেন। এছাড়া জনবার্তা স্বর্ণপদক (১৯৭৮), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৯), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার, আবুল হাসানাত সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, কাজী মাহবুব উল্লাহ স্বর্ণপদক, কবি মাজহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার, জনকণ্ঠ সম্মাননা এবং জাতীয় জাদুঘর সম্বর্ধনা ইত্যাদি পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন তিনি।

আবুল হোসেন ১৯৫৮ সালে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আকবর উদ্দীনের বড় মেয়ে সাহানাকে বিয়ে করেন। শাহানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন। অনুবাদক হিসেবে শাহানা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিপত্নীর মৃত্যু হয় ৮ মে ১৯৯৪। আবুল হোসেনের দুই পুত্র সেলিম রেজা ফরহাদ হোসেন ও সোহেল রেজা খালেদ হোসেন এবং দুই কন্যা ফারাহ ইমরানা হোসেন ও নাজ আকতার হোসেন। আবুল হোসেনের পুত্রকন্যারা সবাই ব্যাংকার।

কর্মজীবনে তিনি নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যজীবনই আবুল হোসেনকে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের কাছে টেনে এনেছে। ব্যক্তিগত জীবনে নিভৃতচারী এই মানুষটি কবিতায়ও নিভৃতেই নিজের একটি জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। কাব্যসৃষ্টিতে তিনি কখনোই উচ্চকণ্ঠ নন। নিম্নকণ্ঠে তিনি নিজের কথাটি বলে যান তবু তাঁর স্বরের স্বাতন্ত্র্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি

আবুল হোসেন বিশ্বাস করেন, একজন কবি স্বপ্নে পাওয়া কোন বিষয় বা নির্দেশ অবলম্বনে কবিতা লেখেন না। প্রেরণায় তাঁর বিশ্বাস নেই বলা চলে। ছেলেবেলার কিছু কবিতা লেখার পেছনে ঘনিষ্ঠজনদের উৎসাহ কিংবা প্রেরণা তাকে উদ্দীপিত করে থাকলেও পরিণত কবিতার জন্য তিনি পরিশ্রমের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি কবিতার স্রষ্টা নন, স্থপতি। কবিতার স্থপতি হিসেবে নিজের স্থাপত্যকৌশল সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন তিনি। কবিতা লেখাকে নিজের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজ বলে বিবেচনা করেছেন তিনি, কিন্তু সেই কাজের জন্য কারো কাছে বিশেষ কোন স্বীকৃতির অপেক্ষা করেন নি। জীবনের প্রয়োজনে তিনি কবিতায় নিমগ্ন ছিলেন এবং কাব্যসাধনায় নিজস্ব বিশ্বাস ও রুচির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি যা কিছু করেছেন, তাঁর বিবেচনায় তা বাজে কাজ। আবুল হোসেনের ভাষায় :

ক. আমি শুধু প্রেরণার তাড়নায় কবিতা লিখি না, লিখিনি, একেবারে ছেলেবেলায় ছাড়া। অনেক ভেবে অনেক খেটে আমি লিখি। স্থপতি যেমন হাতুড়ি বাটালি নিয়ে একটু একটু করে পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে শব্দকে, বাক্যকে ভেঙেচুরে ছেনে বাছাই করে আমি কবিতার রূপ দিতে ভালোবাসি। কত ঘাম ঝরলো, কত বিনিদ্র দিন রাত্রি কাটলো এক একটা কবিতার শরীর গড়ে তুলতে সে খবর পাঠকদের অবশ্য জানার দরকার নেই। আমি কাব্য এবং গদ্যের পৃথক ভাষায় বিশ্বাস করি না। শুধু তাই নয়, আমরা যে ভাষায় ঘরে, বাইরে, বৈঠকখানায়, অফিস-আদালতে কথা বলি, সেই ভাষাতেই কবিতা লিখতে চেয়েছি। আধুনিক নাগরিক শিক্ষিত মানুষ যা করে, যা ভাবে, যেমন ভাবে, কবিতায় আমি তার প্রতিফলন দেখতে চাই। (২০১০ : ১১-১২)

খ. আমি আমার প্রবণতাটা খুব কম বয়সেই ধরতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম, কবিতা লেখাই আমার কাজ। কিন্তু আমাদের দেশে কবিতা লিখে মন ভরলেও পেট ভরে না, ভদ্রভাবে খাওয়া পরা চলে না। তাই আমাকে সারা জীবন আজে বাজে কাজ করতে হলো।

> আমি লিখেই খুশি। আমাকে কে কি বললো, অথবা বললো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার লেখা পড়ে কেউ যদি খুশি হয়, আমিও খুশি হই। কেউ আমাকে কবি বলে সম্বোধন করলে অথবা পরিচয় করিয়ে দিলে আমি উল্লসিত হইনে অথবা আপত্তি করিনে। (২০১০ : ৪০)

বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় আবুল হোসেন তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গে আবিষ্কার করেছেন তিনি এবং সেই আবিষ্কারের আনন্দকে শব্দে বন্দি করার কাজেও তিনি পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। জীবনকে সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি এবং কবিতাকেও সহজ অবয়বে পাঠকের সামনে হাজির করতে চেয়েছেন। সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 'বাংলা কবিতায় কথোপকথনের যে ধারাক্রম আবুল হোসেন সেই ধারাক্রমকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা কবিতার উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং উচ্চসুরকে কৌশলের সঙ্গে পরিহার করে আবুল হোসেন আধুনিককালের সময় সচেতনতায় আপন কবিতাকে উন্মুখর করেছিলেন।' (২০০১ : ১২৪-২৫)। বিভিন্ন কবিতায় বিক্ষিপ্ত কাব্যভাবনার প্রকৃতি অনুধাবনের চেয়ে আমরা আবুল হোসেনের একটি কবিতা পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর কবিস্বভাব ও শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ শনাক্ত করতে চাই। এক্ষেত্রে *বিরস সংলাপ* কাব্যের 'আমার ভাবনা' কবিতাটির শরণ নেওয়া যেতে পারে। কবিতায় তিনি কি ভাব বা রূপকল্পকে ধরতে ও গড়তে চান এবং সেই গঠনপ্রক্রিয়ায় তিনি নির্বাচিত অনুভব কিংবা উপলব্ধিকে বাস্তব জীবনের কোন কোন উপকরণের সঙ্গে সমীকৃত করতে চান তা থেকে কবির কাব্যনির্মাণকৌশল যেমন বোঝা যাবে, তেমনি কবিতাকে জীবনঘনিষ্ঠ করতে কবিতায় তিনি কোন জীবনের প্রতিভাস নির্মাণ করতে চান, তাও অনুধাবন করা সম্ভব হবে। আমরা পুরো কবিতাটিই এখানে উপস্থাপন করছি :

> আমার ভাবনাগুলিকে যদি
> সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারতাম
> যেমন ক'রে পোকা ছাড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে
> তাকের পর তাক আলমারিতে বইগুলো তুলে রাখ তুমি
> নিপুণ হাতে
> অথবা রোদে শুকনো শাড়িগুলো
> থাকে থাকে পাট ক'রে উঠিয়ে রাখ আলনায়,
> কেউ জানে না কখন।
>
> যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম
> যেমন ক'রে টবের গাছগুলিতে পানি ঢেলে
> নিড়েন দিয়ে রোদ লাগিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোল তুমি,
>
> অথবা রক্ষা ক'রতে পারতাম
> যেমন ক'রে বাজের চিলের ছোঁ এড়িয়ে
> মুরগীর ছানাগুলিকে আগলে রাখ তুমি,
> অথবা রূপ দিতে পারতাম
> যেমন ক'রে নরম আঙুলে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
> উলের বল খুলে খুলে কার্ডিগান মোজা ব্লাউজ বোন তুমি
> গুটিপোকার মতো স্বচ্ছন্দে আপন মনে।
> নয় তো শাদা শাড়িতে পেটিকোটে কি রুমালে
> লাল পাতা ফুল তোল
> লাল নীল হলদে রেশমী সূতোয়। ('আমার ভাবনাগুলি'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেনের এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর সমগ্র কবিজীবনের মৌলসত্যটি মুদ্রিত হয়ে আছে বলে আমরা মনে করি। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে তিনি কেবল অভিজ্ঞতার অবিকল উপস্থাপন বা পরিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

সচেষ্ট থাকেন নি, অভিজ্ঞতার প্রকাশকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ‘অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতার অন্তর্গত আভিজাত্য। তাঁর শিল্পভাবনা দূরত্বের দাহ থেকে মুক্ত থাকতে চায় বলেই দূরকে নিকটবর্তী করে তোলেন তিনি।’ (তারেক রেজা ২০১২ : ১৩৮-৩৯)। অভিজ্ঞতার রূপায়ণে আবুল হোসেন পরিচিত পরিমণ্ডলের নানা অনুষঙ্গে অবগাহন করলেও সেই অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় দার্শনিক অভিব্যক্তি সঞ্চার করে। ‘আবুল হোসেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কবিতায় একটি দার্শনিক চেতনায় উপনীত হয়েছেন এবং সত্যকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।’ (মাসুদুল হক ২০০৮ : ৭৫)। ভাষা বা উপস্থাপনের সারল্য অক্ষুণ্ন রেখেও পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত কবিতা লেখার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। মারুফ রায়হানের খ্যাতিমান লেখকদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ *মুখোমুখি*-র এক সাক্ষাৎকারে আবুল হোসেন বলেছেন, ‘যে ভাষায় লিখবো সে ভাষা যেন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি হয়, যে ভাষায় আমরা ঘরে বাইরে, সারাক্ষণ কথা বলি, সোজা কথায় কথ্য, চলিত ভাষা।’ (১৯৯৩ : ৭৩)। কবিতার ভাষাকে তিনি কেবল মানুষের মুখের ভাষার নিকটবর্তীই করেন নি, শব্দ ও বাক্যকে ভাঙার ভেতরে দিয়েও তিনি নির্মাণের একটি আত্মখচিত ধারা রপ্ত করেছেন। আবুল হোসেন সহজ কথা সহজ করে বলার কঠিন কাজেই অনাবিল আনন্দ লাভ করেছেন।

আবুল হোসেনের কবিতার নিবিড় পাঠকমাত্রই স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্ত ও পাঠক হিসেবে রবীন্দ্র-রচনায় অবগাহনের পরও রবীন্দ্রবলয়ে খুব বেশি দিন স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন নি কবি। এমনকি তিরিশের কবিতার প্রাকরণিক জটিলতাকেও স্বাগত জানান নি তিনি। পাঠকের জন্য তাঁর পরিশ্রম অন্তহীন, কিন্তু তাঁর কবিতার পাঠককে তিনি সেই কষ্টের অংশীদার করতে চান নি। তাঁকে আরামে পাঠ করা যায় এবং আনন্দের সঙ্গে আমাদের একজন হিসেবে গ্রহণ করতেও কোন বাধা নেই। আবুল হোসেনের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

ক. আমার অগ্রজ কবিদের মধ্যে আবুল হোসেনের প্রতিই আমার পক্ষপাত বেশি। তিনি আধুনিক মনের অধিকারী, প্রগতিপন্থী, তার চোখ কান খোলা, তিনি মুক্ত চিন্তাশ্রয়ী, যদিও কোনও কোনও ব্যাপারে তার কোনও কোনও উক্তি শুনে ঈষৎ খটকা লাগে। আমি তাঁর কবিতার অনুরক্ত ভক্ত পাঠক।...আবুল হোসেন, আমরা জানি, বিরলপ্রজ কবি। খুব কম লিখেছেন তিনি, কিন্তু কখনও এমন কবিতা নিঃসৃত হয় নি তার কলম থেকে যা পাঠকপাঠিকার পাতে দেওয়া যায় না। সব সময় ভাল লিখেছেন, কখনও কখনও খুব ভাল। (শামসুর রাহমান ২০১১ : ১৩)

খ. তিনি [আবুল হোসেন] নাগরিক কবি, প্রথম তাঁর চিন্তায়, দ্বিতীয় তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গিতে। তাঁর কবিতাগুলি আকারে ছোট, ওজনে হালকা। যুক্তাক্ষর, ধ্বনিগৌরব তিনি যথাসাধ্য বাদ দিয়ে চলেন। তিনি সাম্প্রতিক জীবনের শুষ্কতা, দীনতা ও ফাঁকির কথা ভেবে কখনো বিরক্ত, কখনো একটুখানি তিক্ত, কখনো কথনো বা একটুখানি অবাক এর বেশি নয়। জীবনের এই এই ছবিগুলি তিনি আঁকেন হালকা তুলির আঁচড়ে। বলেন প্রায় আত্মকথনের স্বরে, বড়োজোর কাছের একজন মানুষকে। কখনোই গলা চড়িয়ে কোনো কল্পনার জনতাকে নয়। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২০১১ : ১৫)

গ. স্বভাবকবি নন আবুল হোসেন, কিন্তু স্বাভাবিক কবি। কোনো উন্মুল শেকড় ছেঁড়া ঐতিহ্যহীন আধুনিকতার পথিক নন আবুল হোসেন।...মননশীল কবি তিনি, বুদ্ধিবাদী কবি তিনি, কিন্তু বিষ্ণু দে কথিত সেই বুদ্ধিজীবী নন ‘কৈলাসেরে লক্ষ্য করে যে দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল’। তার মনন জনতান্তর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কখনো, কিন্তু কবিতান্তর থেকেও নয় আলাদা। সমাজচেতন হয়েও আবুল হোসেন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সতত সচেতন। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১১ক : ১২৫)

ঘ. আবুল হোসেনের কবিতায় বার-বার তাঁর নিজের জীবনের কথা শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাবার শহীদ হবার কথা, তাঁর স্ত্রীর হঠাৎ, মৃত্যুর কথা, তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর বন্ধুজনের কথা, ছোটোখাটো নানা ঘটনার কথা। নিজের একান্ত কথাকে তিনি সবার করে তোলেন। এমনটি সব কবির লেখায় দেখা যায় না, বা, সব সময় [দেখা] যায় না। (মনজুরে মওলা ২০১০ : ৫৩)

ঙ. ব্যক্তিমনন, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও শিল্প-অন্বেষার সমন্বিত পরিচর্যায় আবুল হোসেনের কবিতা এক স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে– যেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, স্বদেশ ও বিশ্বপটভূমি নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে আন্দোলিত ও কলরবমুখর। তিরিশের সেই নৈরাশ্যবিহারী, ভবিষ্যৎচিন্তায় সংশয়ী কাব্যপরিক্রমার পথ পেরিয়ে তিনি একদিকে যেমন বিষয়ের নতুনত্ব সন্ধানে তৎপর হলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রকরণের ক্ষেত্রেও সংযোজন করলেন নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কেননা, তাঁর ধারণায়, কাব্যের উত্তরণ কেবল বিষয়ের মধ্যেই নিহিত নয়, প্রকরণও এক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এজন্যে, বিশ শতকের নবজাগ্রত মুসলিম সমাজের অবরুদ্ধ চেতনার মুক্তিকামনায় কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকের প্রতি যুগপৎ মনোযোগী হলেন আবুল হোসেন। (রফিকউল্লাহ খান ২০০২ : ৯৩-৯৪)

অনন্তকাল বেঁচে থাকার প্রত্যয় বারবার উচ্চারণ করেছেন আবুল হোসেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অনন্তকালের সঙ্গে যুক্ত করার কাজটি সহজ নয় কবি জানেন, তাই যা-কিছু সুন্দর ও প্রীতিময়, তাকে আপন করে নিতে চেয়েছেন তিনি : ‘এক ফোটা প্রীতি এতটুকু গান–/কৃপণের মতো দু’হাতে কুড়াই।/যক্ষের ধন বক্ষে লুকাই।’ (‘ভাবি বেঁচে থাকি’/*বিরস সংলাপ*)। কৃপণের মতো তিনি সবকিছু কুড়িয়ে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাকে যক্ষের ধনের মতো বুকে লুকিয়ে রেখেছেন– একথা বিশ্বাস করা কঠিন। বুকের সম্পদকে কবিতার হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যের ‘জন্মদিন’ শীর্ষক কবিতায় আবুল হোসেন একটি নতুন কবিতা লেখার মাধ্যমে নতুন করে জন্মলাভের কথা বলেছেন। ‘সন তারিখ ছাড়াই,/উৎসবের অপেক্ষা না ক’রেই,/আমার জন্মদিন আমার কাছে/বার বার ঘুরে ঘিরে আসে।/কোন একটা নির্দিষ্ট দিন নয়,/সপ্তাহ মাস বৎসরের কোন একটা বিশেষ দিন নয়,’– এভাবেই জন্মদিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে বৎসরের প্রতিটি দিনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। জীবনের নানা স্মরণীয় মুহূর্তের শরণ নিয়েছেন কবি। যে-কোন নতুন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে প্রত্যেক মানুষই নবজন্ম লাভ করেন। তাই ব্যক্তিগত জন্মদিনের সন-তারিখ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জীবনের ঘাটে ঘাটে নোঙর করে নিজেকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন কবি এবং সেই নির্মাণের আনন্দকেই কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন :

এইসব মুহূর্ত তো কখনো
সন তারিখ বার মিলিয়ে বছর বছর
নির্দিষ্ট দিনে হাজির হয় না।
অথচ তারা ঠিক সময় বুঝে বারবার আসে।
আর মনে করিয়ে দেয়
আমাদের জন্মের কথা।
এমনি একটি দিনেই তো আমি প্রথম
কবিতার মুখ দেখেছিলাম। (‘জন্মদিন’/দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে)

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই কবিতার মুখ দেখা কবির জীবনেরই অরূপ সৌন্দর্যের অবলোকন। প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিজেকে বদলে নেওয়ার আনন্দ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কবি। অভিজ্ঞতাকে অবয়ব দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই জীবনের সমুদয় অর্জনকে অর্থবহ মনে করেছেন তিনি। জীবনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে ব্যর্থ হলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়– এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন লক্ষ করি তাঁর কবিতায়। এভাবেই আবুল হোসেন কবিতা ও জীবনকে একই সমতলে স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিষয়-বৈচিত্র্য

একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা তাঁর অন্তর্গত অনুভব ও উপলব্ধিকেই ব্যক্তিত্বখচিত সৌরভ ও সৌন্দর্য দান করেন এবং তাঁর সৃজনকর্মের মাধ্যমে তিনি কেবল নিজেকেই নেড়েচেড়ে দেখেন না, অন্যকেও অভিভূত, আলোড়িত কিংবা আলোকিত করতে চান। শিল্পসাহিত্যে স্রষ্টার অন্তরের অভিব্যক্তি অবয়বপ্রাপ্ত হলেও এই অনুভবপুঞ্জের পুরোটাই কল্পনাপ্রসূত নয়, তাতে অনিবার্যভাবেই বাস্তব পৃথিবীর অনুরণন টের পাওয়া যায়। কল্পনাপ্রতিভার সীমানা নির্ধারণ অসম্ভব হলেও একজন স্রষ্টাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই শিল্পের সত্যকে সংহত অবয়ব দিতে হয় এবং সেই ভিতকে দৃশ্যমান করে তোলা কিংবা অনুভবের সীমায় আবদ্ধ করার চেষ্টা অর্থহীন মনে হয় না। কবিতার সদর ও অন্দরে অনুপ্রবেশ-প্রয়াসী একজন পাঠকের ভাবনা কেবল তার শিল্পসৌন্দর্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয় না, তিনি কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডলকেও অধিকার করতে চান। অর্থাৎ, কবির কল্পিত ভূখণ্ডের শোভা ও প্রভায় অভিভূত কিংবা আপ্লুত একজন পাঠক কবিপ্রতিভার পরিকল্পিত অবয়বের ভেতর কঙ্কালের সুদৃঢ় অবস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন থাকেন। কবিতার বিষয়-অন্বেষণকে সেই অর্থে কবিকল্পনার বুনিয়াদ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস বলা যায়।

আবুল হোসেনের কবিতার সমগ্রতাকে স্পর্শ করার প্রয়োজনে তাঁর সৃজনবিশ্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা দরকার। তাঁর কবিতায় আমরা যে জীবনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, সে জীবন কেবল শূন্যতায় ভর দিয়ে কল্পিত বিশ্বের প্রতিবিম্ব নির্মাণে পরিতৃপ্ত নয়। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সর্বদাই বস্তুনির্ভর না হলেও অবস্তুগত ভাবনার কল্পিত অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনে তাঁকে স্বভাবতই বৈষয়িক হয়ে উঠতে হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ কোন বিষয় অবলম্বনেই কবির অনুভবের শব্দসৌধ নির্মিত। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আবুল হোসেনকে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি, সুর শিহরিত করেছিল– অর্থের অনধিগমনে ব্যর্থ হয় নি তাঁর রসোপলব্ধি। 'কিছু না বুঝলেও কবিতা যে ভালো লাগে, যে কবিতার কোন মানেই বুঝতে পারিনে, সেও মনের মধ্যে ঢুকে বুকের ভেতর এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সে কত ভালো কবিতা সেটা পরে বোঝা যায়'– আবুল হোসেনের শৈশবের এই অভিব্যক্তি পরিণত বয়সেও বহমান ছিল বলে মনে হয়। তাই ভালো কবিতার জন্য মহৎ বিষয়ের দিকে ধাবিত হন নি তিনি। কবিতায় বিষয়ের আবশ্যতা স্বীকার করলেও তিনি কখনোই বিষয়-সর্বস্ব কবিতার প্রতি পক্ষপাত দেখান নি।

আবুল হোসেন কবিতার বিষয় নির্বাচনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন। কবিতার বিষয়কে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন নি তিনি, বরং কবিতাকে কবিতা হয়ে ওঠার যাবতীয় আয়োজনকে নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছেন। খ্যাতিমান লেখকদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ *মুখোমুখি*-তে কবিতায় বিষয় বা মানের গুরুত্ব বা তাৎপর্য এবং বিষয় কীভাবে কবিতার মৌলসত্যকে পাঠকচৈতন্যে সঞ্চারিত করতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে আবুল হোসেন কবি এলিয়টের বরাত দিয়ে কবি-সমালোচক মারুফ রায়হানকে জানিয়েছেন :

> কবিতার কাজ কি? কবিতার মানে থাকতে হবে? শব্দগুলোর যদি কোন মানে না থাকে তাহলে শুধু একটা সুর উঠবে। যে গানে কথা থাকে না, তার মতো। যেমন– যন্ত্রসংগীতে। সেটাই তো মৌল এবং বিশুদ্ধতম শিল্প। গানেও কথা থাকে, কথা এবং সুরের মিলনেই গানের সার্থকতা। কবিতা তো কথা, শব্দ দিয়েই তৈরী। তার একটা মানে থাকতে

> হবে না? কবিতায় মানেটার কাজ কি? গৃহস্তের বাড়ি গিয়ে চোর যেমন এক টুকরো গোস্ত পাহারাদার কুকুরের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়, তারপর নির্বিঘ্নে ঘরের ভেতর ঢুকে সে তার নিজের কাজ সারে, কবিতার অর্থ ঐ মাংসের টুকরোর মতো। বাইরে ঐ লোভনীয় টুকরোটি ছুঁড়ে দিয়ে কবিতা তার কাজ করে যায় ভেতরে ভেতরে। (১৯৯৩ : ৭১)

কবিতার বিষয়কে পাহারাদার-ভোলানো বস্তুপিণ্ড হিসেবে উল্লেখ করলেও পাঠকের মনের ভেতরে প্রবেশ করে নির্বিঘ্নে নিজের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কবিতাকে বিষয়ের শরণ নিতেই হয়। আবুল হোসেনের কবিতা পাঠকের প্রাণে যে প্রণোদনা সৃষ্টি করে, তাও নিশ্চয়ই বিষয়নিরপেক্ষ নয়। তাই তাঁর কবিতার গতি ও গন্তব্যের প্রকৃতি অনুধাবনে আমরা তাঁর কাব্যভুবনের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রেম

আবুল হোসেনের কবিতায় প্রেম একবার এসে কেবল নীরবেই নাড়া দিয়ে যায় নি, বারবার এসেছে এবং সেই প্রেম সরব, সবল ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেমের আনন্দকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, বেদনার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন নি। বিরহের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে কবির ভাবনা ইতিবাচক, যা তাঁর কবিতার দেহ-মনে সঞ্চার করেছে অনাস্বাদিত অনুভব। 'স্বল্পসংখ্যক কাব্যের রচয়িতা তিনি, নিজস্ব স্টাইল ও কথ্যস্পন্দ সঞ্চারে অতিসচেতন ও আবেগশাসিত। ফলে রাবীন্দ্রিক ভাষাবাণীর প্রচ্ছায়া থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রেমকবিতায় ভাবসর্বস্ব বিবেচনা দমিত, তবে তাই বলে তিনি ব্যক্তির রহস্যকুটিল অন্তশ্চেতনা ও গূঢ়ৈষণাকেও শব্দবন্দি করেন না। প্রেম প্রকাশের নিরাবেগধর্মী সংরাগ– যা দেহধর্মের বাস্তবতার প্রতিই শুধু কবির দৃষ্টিকে সচেতন রাখে, তিনি সেটা ব্যক্ত করেন কথ্যস্পন্দে, গদ্যকবিতার আঙ্গিকে।' (বেগম আকতার কামাল ২০১৩ : ২৭৭)। *আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতা* (২০০৮) গ্রন্থের ভূমিকায় বিরহের বৈভব সম্পর্কে কবির অভিমত : 'বিরহ তো প্রেমেরই অন্য নাম। পাওয়া, না-পাওয়া ও হারানোর আনন্দ-বেদনার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ছাড়া প্রেম আর কি?' কবির এই প্রেমানুভূতি-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *স্ফুলিঙ্গ* কাব্যের ১৪৩-সংখ্যক কবিতার সেই প্রবাদপ্রতীম উচ্চারণ– 'প্রেমের আনন্দ থাকে/শুধু স্বল্পক্ষণ,/প্রেমের বেদনা থাকে/সমস্ত জীবন।' (২০০৬ : ১৪/৪২)– পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়বে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কলকাতায় আঠার থেকে আটাশ বছর বয়সী আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতা পাঠককে বিশেষভাবে পল্লবিত করেছিল। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'মেহেদির জন্যে' শিরোনামে লেখা প্রেমের কবিতা প্রতিকূল রাজনৈতিক বাস্তবতার দমকা হাওয়ায় হারিয়ে গেছে। 'ইচ্ছে ছিল এই নামে শুধু প্রেমের কবিতা নিয়ে একটা বই বের করা। আকস্মিক দেশবিভাগ এসে আমার বেশ কিছু ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে এই পরিকল্পনাটিও ভেস্তে দিল। এলোমেলো হয়ে গেল আমার জীবনই। দারুণ ধাক্কা খেল সাহিত্য চর্চা।' *আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতা* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত সাহিত্যচর্চার 'দারুণ ধাক্কা' পরিবর্তিত কালের প্রভাবে কবি সামলে উঠেছিলেন। তাই তাঁর 'কবিতা লেখা, প্রেমের কবিতাও, কখনো একেবারে থেমে যায়নি।' কবির প্রেমের কবিতা 'বিভিন্ন কবিতার বইয়ে ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে'। আমরা সেই ছড়িয়ে থাকা প্রেমের কবিতাবলির আলোকে আবুল হোসেনের প্রেম ও বিরহভাবনার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব।

আবুল হোসেনের কবিতায় মেয়েদের গতায়াত অবাধ এবং এই আসা-যাওয়ার জন্য তাদের বিশেষ কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ মেয়েদের নিরাভরণ সৌন্দর্যের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত রেখেছেন তিনি। *নব-বসন্ত* কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের 'বাংলার মেয়ে' শীর্ষক কবিতায় নারী ও পুরুষকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে কবি আবহমান বাংলার নারী-পুরুষের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ-রাজনীতির নানা দিক থেকে তিনি নারী-পুরুষকে দেখেছেন এবং তাদের সম্পর্ক ও সংঘর্ষের সরল ও সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন। তবে এই দেখা পুরুষের চোখের দেখা নয়, নারীর আন্তরিক অবলোকন। নারীর চোখে তিনি পুরুষের প্রতিকৃতি আঁকতে চেয়েছেন এবং এতে নারীর অবয়বও অপ্রকাশিত থাকে নি। প্রেমের কবিতায় নারীর ভূমিকা কিংবা অবস্থান বিষয়ে এই কবিতায় কবি বলছেন :

> যদি বলি : প্রেমে শ্রেষ্ঠতা দাবি আমরা করতে পারি;

ওরাও বলবে : মর্তে সেরা যা প্রেমের কবিতা পুরুষের দল
লিখেছে সবই তা। মেয়েদের কথা মেয়েরা লিখেছে অল্প,
তবু খুব কম কাব্য অথবা গল্প তাদের না নিয়ে হয়েছে মর্তে,
সাহিত্যে তো ওরাই রয়েছে ভ'রে।
কেউ কিন্তু তাদের কাহিনী লেখেনি সত্য ক'রে। ('বাংলার মেয়ে'/*নব-বসন্ত*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে মূর্ত নারী-পুরষের বিতর্ক এড়িয়ে আমরা কেবল প্রেমের কবিতায় নারীর প্রাধান্য বিষয়ে মনোযোগ নিবন্ধ রাখতে চাই। 'কেউ কিন্তু তাদের কাহিনী লেখেনি সত্য ক'রে'– এই অভিযোগ থেকে আবুল হোসেন মুক্ত কি-না সে প্রসঙ্গেও বাক্য-ব্যয়ে আগ্রহী নই আমরা। যে-বিষয়টিকে এখানে অধিকতর গুরুত্ব দিতে চাই তা এই যে, আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতায়ও আমরা নারীকে নানা ভাবে ও বিচিত্র অবয়বে উপস্থিত থাকতে দেখি। তাঁর কবিতার 'রাজকুমারীরা পালঙ্কে শুধু ঘুমিয়ে কাটায়' না। 'তারা সব মৃত, একান্ত অসহায়'– একথাও স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। তিনি কেবল রাজকুমারের কাহিনি নয়, 'রাজকুমারীর কাহিনী'ও লিখেছেন এবং 'তাদের গোপন মনের ছবি'ও ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। সেই ছবির ভেতরে কবির প্রেম কিংবা বিরহের বৃত্তান্তও ব্যক্তিত্বখচিত সৌন্দর্যে এবং সৌকর্যে উদ্ভাসিত।

আবুল হোসেনের কবিতার নায়িকারা কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ কথিত 'হঠাৎ হাওয়ায় হারিয়ে ধন' হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, তাই 'হঠাৎ পাওয়ায় চমকে ওঠে মন'-এর আবহও তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত হতে দেখি। ক্ষণিকের দেখা বা পরিচয়ও কবির মনে চিরস্থায়ী আসন রচনা করেছে। তাই রাতের অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলা গাড়িতে দেখা একটি মেয়ের জন্য কবির মন কেমন করে : 'আচম্বিতে পরিচয় হল আমি ফিরাইতে মুখ;/অজ্ঞাতে কখন গাড়ি বহুদূর হল অগ্রসর।' ('আকস্মিক'/নব-বসন্ত)। কখনো-বা খুব কাছে বসে থেকেও নিজের মনের কথাটি প্রকাশ করতে না-পারার কষ্ট ধরা পড়েছে কবিতায়। কোন এক দীপ্ত সন্ধ্যায় দেখা একজন মানুষের স্মৃতি তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে অনেক দূর। এই ভালো লাগার মধ্যে মিলনের প্রত্যাশাও হয়তো তীব্রভাবে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু বিরহের আনন্দ উদ্‌যাপনের আয়োজনটি মনোহর :

আমি দূরে বসেছিনু স্তব্ধ মূক; বক্ষে মোর বাণী
গুমরী গুমরী কাঁদে, গাঢ় অন্ধকারাঞ্চল টানি
জাগিয়া রজনীগন্ধা; এলোমেলো থামগুলি সব
ভাষাশূন্য চেয়ে ছিল উদাসীন অব্যক্ত, নীরব। ('অব্যক্ত'/*নব-বসন্ত*)

আগেই বলেছি, আবুল হোসেনের প্রেম প্রাত্যহিক জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে সমীকৃত। প্রিয় মানুষটির কাছে কবি কি পেয়েছেন, তার হিসেব মেলানোর আগ্রহ নেই তাঁর। যার মনের ভেতরে প্রবেশের চাবি তাঁর হস্তগত হয় নি, তাকেও মনে রাখেন কবি, আবার কাছে পেয়েও কবি সীমাহীন অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস উচ্চারণ করেছেন কখনো কখনো। সান্নিধ্যের মধ্যেও তিনি অনুভব করেছেন দূরত্বের অতল আভাস, আরো নিবিড় করে পাওয়ার বাসনায় বিহ্বল হয়েছেন কখনো-বা। কবির নায়িকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় স্বপ্নে, তবু সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটিই হয়ে ওঠে তাঁর 'হৃদয়ের মেয়ে'। সেই মেয়ের শরীর কবির রক্তের মতো রাঙা, তার 'কোমল উজ্জ্বল বুক' কবির মনের মতোই কোমল। এভাবেই কবির নায়িকা হয়ে ওঠে তাঁর 'চিরকালের মনের মেয়ে'। নিচের দৃষ্টান্তসমূহ লক্ষ করা যাক :

ক. তোমার মনের চাবি পাইনি আজও।
দীর্ঘ হল স্তব্ধ হল আকাশ বিনিদ্র বিলাপে,
দুঃখের সমুদ্রস্রোতে ভেসে গেছে সহস্র রাত্রি,
ছিন্ন ধমনীর নীল রক্তবিন্দু ঢেকে দিল পথ,
পদক্ষেপে ভিজেছে প্রান্তর। ('তোমার মনের চাবি'/*নব-বসন্ত*)

খ. সঙ্কোচহীন, নির্মেঘ সেই দেশে
তোমাকে পাব অশঙ্কিত, অনাবৃত বেশে,

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে পাব গ্রহণ ছাড়া মুক্ত দেহে মনে। ('যতই কাছে যাই'/*নব-বসন্ত*)

গ. মনের কোণে ছিলো হাজার গান,
বুকের মধ্যে মত্ত রাঙা হাওয়া,
আমার গান হয়ে আর আনমনা হাওয়া হয়ে
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে একটি মেয়ে এলো।
সেই আমার চিরকালের মনের মেয়ে। ('চিরকালের সেই মেয়ে'/*নব-বসন্ত*)

লক্ষ করার বিষয়, কবির না-পাওয়ার আক্ষেপ কিংবা পাওয়ার বাসনাই তাঁর প্রেমের কবিতার প্রধান অবলম্বন নয়, কবি সেই মেয়েটিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করে নেন। তাঁর প্রেমের কবিতায় সেই সৃষ্টির আনন্দ কিংবা বেদনাও মূর্ত হতে দেখি। কবি পাওয়ার অভিজ্ঞতার আড়ালে বন্ধনের ছদ্মবেশে মুক্তির আনন্দ সঞ্চার করতে চেয়েছেন। 'গ্রহণ ছাড়া মুক্ত দেহে মনে' কবি যাকে পেতে চান, সেই পাওয়ার ডাক-নাম প্রেম কি-না সে বিষয়ে বিস্তর বিতর্ক সম্ভব। কিন্তু আবুল হোসেন *নব-বসন্ত* কাব্যে প্রেমকে এভাবেই ধারণ করতে চেয়েছেন।

বিরস সংলাপ-এ এসে আবুল হোসেনের প্রেম আরো জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্তবসম্মত অবয়ব পেয়েছে। ততদিনে যৌবনের আবেগকে আরো সংহত করতে শিখে গেছেন তিনি। স্বপ্নে আসা নায়িকাদের তিনি পরিচিত পরিমণ্ডলে নিয়ে এসেছেন এবং প্রেমকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন পার্থিক অর্জনের অন্যতম প্রেরণাসঞ্চারক শক্তি হিসেবে। প্রেমহীন জীবনের দুঃখ সম্পর্কে কবির চিন্তাচেতনাও এই পর্যায়ে এসে পরিণত হয়েছে। বাস্তবের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কবি অনুভব করেছেন, প্রেমের সঙ্গে পকেটের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই তিনি প্রিয় মানুষের জন্য মাসের টাকা কাবার হওয়ার কথা বলেন, চুরি, প্লেট, পিরিচ, হাঁড়ি, চেয়ার-টেবিল থেকে শাড়ি পর্যন্ত কেনাকাটার তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। এ কেবল কেনাকাটার তালিকা নয়, এগুলো ভেঙে ফেলা কিংবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার গল্পও শোনান তিনি। 'তরতরানি কলকলানি দস্যি সোনা/মেয়ে তো নয়, হাউই যেন ঝড়ের কণা।'– এই ঝড় সবকিছু এলোমেলো করতে পছন্দ করে। দস্যি মেয়ের এই ভাঙচুর এবং ছড়ানো ছিটানো বেশ উপভোগ করেন কবি। তাঁর মতে, ঘর ভাঙার চেয়ে এ বরং ভালো, হৃদয় ভাঙার চেয়েও তা অনেক স্বাস্থ্যকর। কবির ভাষায় :

ভাগ্যিস সে মেয়ে ছড়ায় ছিটোয় শুধু,
নইলে সারা ঘর দুয়ার করবে ধূ ধূ।
ফেলে ফেলুক যা খুশি তার, ভাঙে ভাঙুক,
নইলে কত ভাঙবে ঘর ভাঙবে বুক। ('মেয়েটা'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতায় দৈহিক সংরাগের উপস্থিতি নেই। তাঁর নায়িকারা তাঁকে কখনোই রূপে ভোলায় না, ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো কবি নিজেই শরীরের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রেমের এই অনুভবকে তিনি সত্তার অনিবার্য অংশ হিসেবে মূর্ত করতে চান। প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে তিনি মনের ভাষাকে প্রাধান্য দেন। পরম সোহাগে মুখ রাঙা হয়ে উঠলেও সেই মুখকে তিনি চাঁদের রূপকল্পে নির্মাণ করতে চান না। তাই আগ্নেয়গিরির কথা মনে পড়ে তাঁর। চাঁদের প্রসঙ্গে আগুনের অনুপস্থিতি টের পান, সেখানে বরফে ঢেকে যাওয়া বুকের শীতলতা অনুভব করেন। আবুল হোসেন বলেন, 'দেহ তো আর পাথর নয়, মাংস আর মেদ,/এবং মাংস মোমের মতো,/একটুখানি তাপেই গলে যাবে।' ('মেহেদির জন্য'/*বিরস সংলাপ*)– এই গলে যাওয়া ক্ষণস্থায়ী প্রেমের প্রতিভাস নির্মাণ করে। চিরন্তন প্রেমের অনুভবই আবুল হোসেনের কবিতার প্রধান সুর, যা ভীরুতার আবরণ ভেদ করে হৃদয়ের গভীরে মূর্ত হতে চায়। কখনো জ্যোৎস্নার আবহে, কখনো জোয়ারের রূপকল্পে কবির প্রেম সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই কবি 'রূপে নয়, সাজে নয়, সায়াহ্নের অন্ধকারে অস্পষ্ট আধো আধো/পরিচয় স্বপ্নের মতো' তাঁর মানসীর অন্তর্গত লাবণ্যকে অধিকার করতে চান। *বিরস সংলাপ*-এর আরো কয়েকটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

ক. মেয়ে, তোমার সরাও বাহু দুটি।
বাহু তো আর শিকল নয়, বলেছে তাকে লতা,
এবং লতা বড় নরম,

Dhaka University Institutional Repository

টানতে গেলে ছিঁড়বে কুটি কুটি। (‘মেহেদির জন্য’/*বিরস সংলাপ*)

খ. রজনীগন্ধার গন্ধ কাল
ভেঙে দিল ভীরুতার সব আবরণ।
যে ছিল সত্তার অন্তরালে
দূর দিকচক্রবালে তার
মূর্তি এল স্পষ্ট হয়ে হৃদয়ে এবার। (‘জন্মদিনে’/*বিরস সংলাপ*)

গ. মুখের ভাষার মতো ভাষা আছ চোখেরও–
নাইবা বললে, জ্বলে তারায় তারায়!
মুখের চোখের মতো ভাষা আছে মনেরও–
বোঝা যায় অনুভবে, হৃদয় হারায়! (‘হৃদয়ের ভাষা’/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. জীবনে তোমার টান জ্যোৎস্নার নিশ্চিত নির্মম জোয়ারে,
দিগন্ত প্লাবিত বানে দিশাহারা হৃদয় তরণী আমার,
তৃষ্ণার্ত নিশায় শুনি অরণ্যকম্পিত ডাক শিরায় শিরায়?
শিহরিত আমি কম্পিত আমি, বন্ধনহীন বিহ্বল যৌবন
ঘন অনুরাগে ফেটে পড়ে পরম পরাগে তোমাকে ঘিরে।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে, হে জ্বলন্ত জ্যোৎস্না এসো আমার শরীরে।
ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার তোমাকে চাই তোমাকে চাই। (‘দুর্লভা বল্লভা’/*বিরস সংলাপ*)

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস কাব্যে এসে আবুল হোসেন ভালোবাসার শক্তি সম্পর্কে আরো সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছেছেন। ভালোবাসায় বেঁচে থাকার আনন্দ সম্পর্কে কথা বলেছেন কবি। দাম্পত্যজীবনের সুখকর অভিজ্ঞতাকেও কবি প্রেমের কবিতায় রূপ দিয়েছেন। ‘শুধু তার ছোঁয়ায় বেঁচে থাকি’ কবিতায় কবি প্রেমকে প্রতিদিনের বাস্তবতায় স্থাপন করেছেন। ‘সারা বাড়ি ঘরময় সে আছে ছড়িয়ে/এমন রোদের মতো দেখেও দেখি না তাকে,/শুধু তার ছোঁয়ায় বসে/সেরে উঠি/বেঁচে থাকি।’–এই উপলব্ধির মধ্যে কবির সংসারযাপনের প্রকৃতি ও প্রেম ধরা পড়েছে। প্রেম মানুষকে সৃজনশীল করে, কবিতায় গানে জীবনকে করে তোলে অনবদ্য ও উপভোগ্য। আবার প্রেমের গভীর থেকে উঠে আসা বিরহের উদ্‌যাপনকেও ছুঁয়ে গেছেন তিনি। প্রেমের কলঙ্ক সম্পর্কেও কবি সচেতন। ‘এদের ওদের কানভাঙ্গানি চোখ রাঙ্গানি’ সহ্য করার শক্তিও তো প্রেমেরই শক্তি। প্রেম সহজেই মানুষের হাতে ধরা দেয় না, এর জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে, যা কবির বিবেচনায় ‘গাথার বোঝা’ সহ্য করা। তবুও প্রেমেই তো মানুষের মুক্তি। প্রেমহীন জীবনের দিকে ধাবিত হন নি তিনি, প্রেমের ভালোমন্দ সব কিছুই তিনি সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই প্রেমই আবার কখনো কবির কাছে ধরা দিয়েছে রাক্ষসী রূপে। ‘মনের যত হীরে মানিক, বুকের রাঙা রোদ/তবু কি তোর ঋণ এখনো হল না আজ শোধ।’– এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে একবার বাঁধা পড়লে মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা। তাই কবির প্রেমের কাছেই নিজের গলাটা বাড়িয়ে দেন, অর্থাৎ তিনি প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। প্রেমের হাত থেকে মুক্তি চাইলে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রেম যত গভীর নিবিড়ই হোক, তাতে মিশে থাকে কিছু মধুর ছলনা। সেই ছলনাও তাই সুখকর মনে হয় তাঁর। তাই কাছে এলে দূরে যাওয়া, দেখেও না-দেখার ভান করা, আবার ধরা পড়ে নাজেহাল হওয়া– সবই উপভোগ করেছেন তিনি। নিচের দৃষ্টান্তগুলো পাঠ করা যেতে পারে :

ক. তুমি আছো ব’লেই আজো
দু’একটা গান গাইতে পারি, একটা ছড়া কাটতে পারি
এক গলা বুক জ্বালা নিয়ে হাওয়ায় ধোঁয়া ছড়াতে পারি
শীতের রাতে খালি গায়ে খোলা পায়ে হাঁটতে পারি (‘তুমি আছো ব’লেই’/*হাওয়া, তোমর কি দুঃসাহস*)

খ. ভালবাসা, রাক্ষসী রে, আর কি দেব তোরে?
ছিল আমার যা কিছু সব দিয়েছি হাত ভ’রে।
একটা তাজা হৃদপিণ্ড, সবটা গরম মগজ।

তাতেও ক্ষিদে মিটল না তোর, হল না তোর ভোজ? ('ভালবাসা, রাক্ষসী রে'/*হাওয়া, তোমর কি দুঃসাহস*)

গ. কাছে আসতে দেখলে স'রে পড়ি
এদিকে চাই ওদিকে চাই এবং
দেখেও যেন না-দেখার ভান করি।
চোখের ওপর চোখে রাখি না বরং
মুখের ওপর মুখোশ এঁটে ঘুরি,
কেমন করে বুঝতে পার ভড়ং
ধরে ফেল সকল জারিজুরি। ('কেমন করে বুঝতে পারো'/ *হাওয়া, তোমর কি দুঃসাহস*)

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে কাব্যগ্রন্থে আবুল হোসেন প্রেমের স্পর্শে নবজন্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই প্রেম কবির কাছে নারীর অবয়ব নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। কেউ প্রেমে পড়লে কিংবা নারীর সংস্পর্শে এলে তার শারীরিক মানসিক কি কি পরিবর্তন ঘটে তার একটা কাব্যিক তালিকা হাজির করেছেন কবি। নারীর কাছে গেলে কবির নিজের কি পরিবর্তন ঘটে সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, তার পরিবর্তন বাইরে থেকে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। তিনি ভেতরে ভেতরে নিজেকে বদলে নিয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হন। এই রূপান্তরের আনন্দ কবির মতে নিজেকে ফিরে পাওয়ার বা নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দ। প্রাণবন্ত-প্রেমময় কোন নারীর নিকটে এলে আবুল হোসেনের বদলে যাওয়ার বিবরণ কবির নিজের ভাষায়ই পাঠ করা যাক –

আমার সমস্ত রাগ হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ক্ষোভ
অভিমান, ক্লান্তি ও বিক্ষোভ
ঝরে যায়, হেমন্তের পাতার মতন,
আর আমি বার বার মুক্তি পেয়ে
স্নেহে প্রেমে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
স্তব্ধ হ'য়ে
নিজেকে আবার ফিরে পাই। ('যখন নারীর কাছে যাই'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

এই কবিতাটিতে কবির নারী-ভাবনার মৌল প্রবণতাটি ধরা পড়েছে। নারী-সান্নিধ্যে কবি নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের কিংবা শারীরিক উপস্থিতির কথা ভুলে যান। তখন তিনি নারীর দিকে নয়, বরং নিজের দিকেই ফিরে তাকান। এই ফিরে তাকানো মানে ভাসমান জলস্রোত থেকে তীরের দিকে যাত্রা করা নয়, জলস্রোত নিংড়ে নিজেকে নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা। বলা যায়, নারী তাঁর ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়ে দেয়। এই জেগে ওঠার আনন্দ প্রকৃত অর্থে তাঁর সৃষ্টিরই আনন্দ। যদিও তিনি বলেছেন নারীর কাছে গেলে তাঁর 'কবিতা লেখার কথা মনে হয় না', এমনকি ছবির আঁকার কথাও ভাবেন না তিনি, তবু নিজেকে ফিরে পাওয়া একজন প্রতিভাবান মানুষ প্রেমের স্পর্শে শুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারেন না। আবুল হোসেনও কবিতাকল্লোলে সচকিত হয়েছেন, যার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন প্রেমের কবিতায়।

আবুল হোসেনের প্রেম কোন কোন কবিতায় বিরহের পোশাক পরে এসেছে। *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যের 'দুঃসময়' শীর্ষক কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। কবি নিজের জীর্ণ হাতের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রিয় মানুষটির হাতের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছেন। 'কী অবসন্নতা চেপে আছে দেহে মনে, সারা দিন/শূন্যতার হাহাকার। আর রাত্রিগুলো ঘুমহীন/দুর্ভাবনার শিকার।'– এভাবেই অনুপস্থিত মানুষটির প্রেমকে আপন মনে উদ্‌যাপন করছেন কবি। দুঃস্বপ্নের ঘোরে কবি সেই নারীর চুলের স্পর্শ টের পান, কখনো ঠোঁটের, এমনকি কবির উপলব্ধিতে সেই নারী 'নিঃশ্বাসের চেনা গন্ধ নিয়ে আসে আগের মতন'। নায়িকার এই নিরাবয়ব উপস্থিতিতে কবি বিহ্বল হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই :

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ছেলে ॥ (১৯৭০ : ৪৭৮)

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পলাতকা চঞ্চল চরণে ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে দিয়ে যায়। আবুল হোসেনের নায়িকাও কবিকে সেই বেদনার পথেই টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর কবিতায় নায়িকার এই অদৃশ্য আসা-যাওয়াকে কবি তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া নায়িকার তীব্র প্রতিশোধ হিসেবে দেখেছেন। কবির অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটিকে তিনি জাগাতে চান না। কারণ, কবির ভাষায়–

কি ক'রে এখন তাকে ডাকি ফের যে আছে ঘুমিয়ে?
ঘুম তার ভাঙ্গাবো কেমন করে? জেগে উঠে যদি
সে আর আমাকে চিনতে না পারে, আড়মোড়া দিয়ে
ঘুমায় আবার? তা হলে কি আমি সকাল অবধি
এমনি ঠায় বসেই থাকব তার মুখে রেখে চোখ?
যদি সে আবার জাগে, তবে তাই হোক, তাই হোক। ('দুঃসময়'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

এক হাতে প্রেম আর অন্য হাতে বিরহ নিয়ে আবুল হোসেন *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন* কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রিয় মানুষকে খুঁজে পাওয়ার দুঃখগুলোকে আনন্দের সঙ্গেই উদ্‌যাপন করতে চেয়েছেন। 'তোমার কাছেই যেতে চেয়েছিলাম' কবিতায় আমরা লক্ষ করি, প্রিয় মানুষের কাছে যাবেন বলে কবি সেই কবে ঘর ছেড়েছেন। পাখিরা জেগে ওঠার আগেই, ভোরের আজান ধ্বনিত হবার আগেই কবি বেরিয়ে পড়েছেন। 'জামা কাপড় জুতো মোজা' কোন কিছুর দিকেই খেয়াল নেই তাঁর। 'পকেটেও জমেনি কিছুই। তোমাকে কোথায়, কোন/পথে গেলে পাব জানি না, তবু সেই বয়সটা এমনি/ছিল, কারও অপেক্ষা না ক'রে, কোন কিছুর তোয়াক্কা/না রেখে কখন হুট ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'– কবির এই ঘর ছাড়ার পর আর ঘরের দিকে মুখ ফেরান নি, কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর প্রিয় মানুষটিকে। এইভাবে খুঁজে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। কখনো পেয়েও হারানোর বেদনায় বিক্ষত হয়েছেন তিনি। কথা দিয়ে কথা না রাখার কথাগুলোই কবিকে ঘিরে রাখে। কখনো প্রেম আবার দুঃখের ছদ্মবেশে কবির ঘরে প্রবেশ করে কবিকে পাহাড়ী কুয়াশার মতো ঘিরে ধরেছে কিংবা শীতরাত্রির হিম হয়ে কবির চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করেছে। কবি জানেন, 'জীবন ও সময় কাউকেই/ফিরে যেতে দেয় না কখনো', শুধু কিছু গন্ধ আর স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায়, যা মানুষকে কেবলই অস্থির করে তোলে। তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস অচরিতার্থ প্রেমেরই প্রতিভাস রচনা করে। নিচের উদাহরণগুলো পাঠ করা যেতে পারে :

ক. সেই থেকে আমি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখনও।
যতই যাই ফুরায় না এই পথ, এ ঘাটে পা ধুয়ে
ও সড়কে উঠে দরজায় দরজায় ব্যাকুল ঠেকা দিই,
ও ঘরে উঁকি দিই, ও প্রাসাদে খুঁজি, শহরের সব
সরাই মেহমানখানা ঘুরে দেখি, এখনও তোমার
খোঁজ পেলাম না। তবে কি তোমার কাছে যাওয়া আর
হবে না আমার কোন দিন? শুধু আশা-নিরাশার
দোটানায় দোল খেয়ে কাটবে সারা জীবন এ ভাবে? ('তোমার কাছেই যেতে চেয়েছিলাম'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

খ. তুমি নেই, অথচ আমাকে যেতে হল,
যদিও অনেক দিন আগে
একসঙ্গে চলতে চেয়ে আমরা
হাতে হাত রেখেছিলাম স্বেচ্ছায়।

আমি না থাকলেও, তুমি হয় তো থাকবে।
যেমন আমি ছিলাম
তুমি ছিলে,
আমাদের দেশাশোনা হয় নি যখন। ('যখন তুমি আর থাকবে না'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

গ. সে যখন আসে

ডাকে না, কাশে না,
কড়াও নাড়ে না,
ঘন্টিও টেপে না।

এসে ঢুকে পড়ে।
দেখার আগেই ঘিরে ফেলে–
পাহাড়ী সড়কে 'ফগের' মতো,
শীতের রাত্রে যেমন হিম। ('দুঃখ'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

আবুল হোসেন *এখনও সময় আছে* কাব্যে ভালোবাসার কাছে নাজেহাল হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। প্রেম কখন আসে তা বোঝা যায় না, কিন্তু প্রেমে পড়লে ভেতরের ভাঙচুর অনুভূত হয় এবং এই ভাঙার উৎসবে মানুষ মাঝে মাঝে অসহায় বোধ করে। ভালোবাসা একদিন কবির সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। কবির বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল এই ভালোবাসা। সেই দরজা দিয়েই প্রেম কবির সবকিছু লুট করে নিয়েছে। অন্ধকার ঘরে বসে কবি যখন নিজের কথা ভাবছিলেন, তখনই সেই ঘরে প্রেম এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং সেই আলোয় কবির ভেতরের পৃথিবীর উন্মোচনে বিব্রত হয়েছিলেন তিনি। কবি যখন ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন, তখন প্রেম আসে নি, অসময়ে প্রেমের আগমনে কবি অনেকটা দিশেহারা। কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলছেন, 'এ ভরা নদীতে জোয়ারের সিম্ফনি/সেদিন সুরের মূর্ছনা তুলেছিল।/বান ডাকা সেই মত্ত হাওয়ার রাতে' কবি তাকে প্রত্যাশা করেছিলেন, সে আসে নি। প্রেম না পেয়েও একদিন অপবাদে বিপন্ন হয়েছিলেন তিনি। যে মেয়ে কবির সুখ ও সৌখিনতাকে মূল্য না দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, অসময়ে এসে সেই মেয়েই কবিকে ডাকছেন। কিন্তু কবি জানেন, সময় কারো জন্য নদীর তীরে অপেক্ষা করে না। যে প্রেম কবির রক্তে আঙুরের ফেনা তুলেছিল, যার প্রলোভনে মাতাল মৌমাছির আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল, সেই প্রেম হারিয়ে ফেলেছেন কবি। যৌবনের মধু চিরকাল থাকে না, তাই অসময়ে এসে বাঁশি বাজালেও ঘর ছেড়ে বাইরে আসার সেই শক্তি নেই কবির। নারীর কাছে প্রত্যাখ্যানের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই কবি নারীকে প্রকৃতির মতোই প্রতিশোধ-পরায়ণ হিসেবে দেখেছেন। প্রকৃতি ও নারীর কাছে সমর্পণের বিপদ সম্পর্কে এখন তিনি সচেতন। একটি কবিতায় কবি ইয়েট্স্ ও ফ্রস্টের প্রকৃতি ও নারী দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে হোচট খেয়েছেন : 'পথের মোড়ে যে যুবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে/সত্তর পেরোনো ইয়েট্স্ ব্যাকুল বাহুতে তাকে/ধরতে চান, আর ঐ ফ্রস্ট শীতের সন্ধ্যায় এক/নির্জন গহন বনের কিনারে থেমে একা একা/দেখেন বরফ পড়া, জানি ওরা জীবনের সার/জেনেছেন, চেখেছেন যে ভাবে তা আমার অসাধ্য।' ('নারী ও নিসর্গ'/*এখনও সময় আছে*)। ভালোবাসার পেছনে সারাটা জীবন কাটিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, নারীরা তাকে কোন দিনই বুঝতে পারে নি কিংবা বুঝতে চায় নি। কবিকে বুঝতে না পারা মেয়েদের জন্যও তো কবির দরদ কম নয়। তাই কবিতা ও নারীকে তিনি তাঁর সমস্ত প্রেম ভাগ করে দিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে যান এবং 'ভুল ভালোবাসা'য় বিদীর্ণ কবি উপলব্ধি করেন 'জীবনই তো শেষ ভালবাসা জীবনের'। এভাবেই নারীকে নিবিড়ভাবে পাঠের অভিজ্ঞতা নানা রূপকল্পে কবিতায় ধারণ করেন আবুল হোসেন :

ক. ভালোবাসা এসে একদিন বড় নাজেহাল করেছিল।
দস্যুর মতো অতর্কিতে সে ঘরে ঢুকে আচমকা
দু'হাতে আমাকে সজোরে এমন জাপটিয়ে ধরেছিল,
হুড়মুড় ক'রে নিমেষে দেহের ভিত ভেঙে পড়েছিল।
সারা রাত ধ'রে ঝর্নার মতো কী রক্ত ঝরেছিল। ('ভালোবাসা এসে'/*এখনও সময় আছে*)

খ. এ পোড়া জমিতে ঘর বাঁধা আর কেন?
উঠোনে দিনের আলো পড়ে এল বলে,
এখানে এখন আগাছা ছাড়া কি হবে?
এই কি তোমার আসার সময় হল। ('ফিরে এলে কেন'/*এখনও সময় আছে*)

গ. আমি প্রকৃতির যে খামখেয়ালি দেখেছি হাজার

বার, তার আকস্মিক খামকা আঘাত, প্রতিশোধ-
পরায়ণ নারীর যে সস্তা ঠুনকো অসার স্বভাব,
আমার সমস্ত ভালবাসা মুগ্ধতা দুর্বোধ্য এক
অসঙ্গতির লুকোনো পাহাড়ে ঘা খেয়ে ডুবে যায়। ('নারী ও নিসর্গ'/*এখনও সময় আছে*)

ঘ. নারীকেও কিছু কম ভালবেসেছি কি?
তারই কাছে তো প্রথম অঙ্গীকারও।
তাকে তো দিয়েছি টকটকে লাল
ঝলমল বেনারসির জড়োয়া খুশি,
দিয়েছি আমার ব্যাকুল প্রাণের
নিভৃত কান্না, তৃষ্ণার তীব্রতা,
রক্তের শেষ বিন্দুতে লেখা
বিধুর কবিতাগুলো,
তবু সে নিকটতমও সুদূর
বন্ধুও চিনল না। ('ভুল ভালবাসা'/*এখনও সময় আছে*)

রাজকাহিনী কাব্যের একটি ছোট্ট কবিতায় আবুল হোসেনের প্রেম চমৎকারভাবে মুদ্রিত হয়েছে। এখানেও কবির প্রেম কবিতার সঙ্গেই সমীকৃত। কবিতাকে তিনি বেঁচে থাকার প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে দেখেছেন। এই বেঁচে থাকার জন্য প্রেমও অপরিহার্য। আবুল হোসেনের কবিতায় নায়িকাদের নাম থাকে না। তারা মেয়ে হিসেবেই উপস্থিত হয়। তাই একাধিক কবিতায় আমরা একটি মেয়েকে ঘুরেফিরে আসতে দেখি। এই একটি মেয়ের মধ্যেই হয়তো তিনি অনেক মেয়ের প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সেই মেয়েটি প্রতিবারই নতুন অবয়ব ও ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। কবি সেই মেয়ের অবয়বে আকৃষ্ট না হয়ে তার অন্তরের দিতে দৃষ্টি প্রসারিত রাখেন। সে অন্তরে উদারতা থাকে, আবার কঠোর কঠিন প্রত্যাখ্যানের মতো নির্মমতাও উপস্থিত। কবি তাই প্রেমকে কেবল অনাবিল আনন্দের আধার হিসেবে দেখেন না। সে প্রেমে প্রত্যাখ্যান থাকে, বিরহের বিপুল দীর্ঘশ্বাস থাকে, তবু প্রত্যাশার দিকে হাত বাড়িয়ে রাখেন কবি। কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি প্রিয় মানুষটির মধ্যে ডুবে যান এবং সেই মানুষটিই তাঁর সমগ্র কবিতা জুড়ে থাকে। কবিতার সারা দেহে যার নাম ছড়িয়ে থাকে, সে যে কবির মনকেও আচ্ছন্ন করে রাখে তাতে সন্দেহ নেই। সেই নিঃসন্দেহ প্রেমেরই প্রকাশ লক্ষ করি কবিতাটিতে :

সেদিন একটা কবিতা লিখছিলাম
লেখা শেষ হলে দেখি
একি?
সারা পাতা জুড়ে শুধু তোমারই নাম। ('নাম'/*রাজকাহিনী*)

কালের খাতায় কাব্যগ্রন্থে আবার আমরা 'একটি মেয়েকে' দেখতে পাই। মেয়েটি কিছুতেই একটি কালো ছেলেকে গ্রহণ করতে চাইছে না। কালো রঙের আড়ালে যে ঐশ্বর্যকে লালন করছে ছেলেটি, কবি সেই সৌন্দর্য উন্মুক্ত করতে চাচ্ছেন। বাইরের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা গেলেও তা অধিকার করার মধ্যে আনন্দ নেই। কবি বলেন, 'ভেতরটা দেখতে গেলে অন্য চোখ লাগে,/তাকে ছোঁয়াও যায়, তবে হাত দিয়ে নয়,/তার জন্যে আরও কিছু চাই– /একটা হৃদয়।' ছেলেটির থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট কিংবা ঘোড়ার মতো মুখ দেখে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে যে অপরিণত-অপরিপক্ব প্রেম প্রকাশ পায়, কবি তা পরিহার করার পরামর্শ দেন মেয়েটিকে। মানুষকে চেনার কাজটি সহজ নয়। এই কঠিন কাজটি করার মধ্যেই ভালোবাসার প্রকৃত আনন্দ লুকিয়ে আছে। কবি মেয়েটিকে সেই আনন্দের জগতে নিয়ে যেতে চান। 'সেই মেয়েটি' শীর্ষক কবিতায় যে মেয়ে উপস্থিত, তার মধ্যেও রয়েছে নিষ্ঠুরতা। অথচ কবি এই নিষ্ঠুর মেয়েটির জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করেছেন। কবি যাকে স্বেচ্ছায় জীবন দিতে চান, সেই মেয়ে যখন হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন কষ্টের সীমা থাকে না। সেই সীমাহীন কষ্টের গভীর থেকেই আবুল হোসেন ভালোবাসার আনন্দ নিঙড়ে নিতে চেয়েছেন :

Dhaka University Institutional Repository

তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারো
ভাবিনি তা একবারও।
এই কি সে মেয়ে
চেয়েছি জীবন দিতে যাকে চেয়ে? ('সেই মেয়ে'/*কালের খাতায়*)

এভাবেই আবুল হোসেনের কবিতায় প্রেম আসে। কবির প্রেম পরীক্ষিত এবং সেই প্রেমের প্রকাশ নিরাভরণ হলেও তাকে বরণ করতে তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই। কবিতায় তিনি স্বাভাবিক প্রেমকেই অন্তরের উষ্ণতা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতেই তিনি তাঁর প্রেমিকার পায়ের চিহ্ন এঁকেছেন, তাতে স্বর্গের সৌরভ কিংবা মহিমা কীর্তনের প্রয়াস নেই। তাঁর কবিতায় প্রেম কখনো নারীর অবয়বে, কখনো কবিতার রূপকল্পে হাজির হয়েছে। *নব-বসন্তে* কবি যে মেয়ের হাতে হাত রাখতে চেয়েছেন, কালের খাতায় এসে আমরা সেই মেয়েকেই ভিন্নতর বাস্তবতায় খুঁজে পাই। অর্থাৎ, তার প্রেমের কবিতার কিংবা প্রেমিকার বিবর্তনের কোন চিহ্ন অনুপস্থিত। তাঁর বিবেচনায়, প্রেমের ডাক-নামই হল বেদনা। কবি সেই বেদনার সঙ্গেও বন্ধুত্ব রচনা করতে চেয়েছেন। আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতায় প্রেম তাই জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রকৃতি

আবুল হোসেন *এখনও সময় আছে* কাব্যের 'নারী ও নিসর্গ' কবিতায় বলেছেন, 'কবিরা যে নারী ও নিসর্গে জীবন যৌবন জান/কবুল করেছে, আমি তাঁর ফাঁদে পড়িনি কখনও/হলফ করে বলতে পারব না'। তাঁর কবিতায় প্রেম অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, নারীর জন্য তিনি অনেকবার 'জীবন যৌবন জান' কবুল করেছেন। একইভাবে কবিতার জন্য তিনি নিসর্গের কাছেও ফিরে গেছেন বারবার। কিন্তু সেই ফিরে যাওয়া কবিতার জন্যই, নিসর্গপ্রীতি বলতে আমরা যা বুঝি, সেইভাবে আবুল হোসেনের কবিতায় প্রকৃতির অনুরণন অনুপস্থিত। তিনি প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে সমর্পিত হয়ে জীবনের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ অন্বেষণের অভিপ্রায় তাঁর কবিতায় পুষ্টি জুগিয়েছে। নারীর স্নিগ্ধতা কিংবা কোমলতার রূপায়ণে তিনি প্রকৃতির শরণ নেন, আবার স্বদেশের মুখকে কবিতায় মূর্ত করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তবে প্রকৃতি সব সময় তাঁর কবিতায় আরামদায়ক অনুভবের দ্যোতক নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। 'নারী ও নিসর্গ' কবিতায়ই তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি হাজার বার প্রকৃতির 'খামখেয়ালি' দেখেছেন এবং 'তার আকস্মিক খামকা আঘাত' কবিকে বিপর্যস্ত করেছে অনেকবার। ক্ষুব্ধ প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের আর্তনাদও আবুল হোসেনের কবিতায় ধরা পড়েছে। কখনো বাণের জলে ভেসে যায় মানুষের সর্বস্ব, কখনো-বা ঝড়ের কবলে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সবকিছু। প্রচণ্ড খরায় বিপন্ন হয় মানুষের জীবন ও জীবিকা। মানুষকে তো প্রকৃতির মধ্যেই, প্রকৃতির সঙ্গেই বাঁচতে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয় কখনো কখনো। তাই কবিতায় যখন আমরা জীবনের রূপায়ণ প্রত্যাশা করি, সেখানে সঙ্গত কারণেই প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

আবুল হোসেনের *নব-বসন্ত* কাব্যে একটিও প্রকৃতি-নির্ভর কবিতা নেই, কিন্তু প্রকৃতি-নির্ভর মানুষের জীবনকেই কবিতায় ধারণ করেছেন কবি। প্রকৃতির কাছে সমর্পিত মানুষ বারবার বৈরী বাস্তবতায় বিপন্ন হয়, সেই বিপন্নতা কখনো কখনো জীবন-সংহারের মতো নির্মম পরিণতি ডেকে আনে। তাই বসন্তের আরামদায়ক স্মৃতির পরিবর্তে কবিকে বলতে হয় প্রিয়জন হারানোর গল্প, যারা কবির স্মৃতির আকাশকে বিবর্ণ করে তোলে, বিক্ষত হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'স্বপ্ন রাতের সুষমা-স্নিগ্ধ কোথা কুসুমের মাস?/মৃত্তিকার দীপ ধূলার আঘাতে হ'য়েছে ম্লান।/কোথা বর্তিকা-বাহিকারা? দেখেছ কি কেউ বসন্ত-নীলাকাশ'? ('নব-বসন্ত'/*নব-বসন্ত*)। কখনো আবার সমুদ্রগামী নাবিকের চোখে চারপাশের প্রকৃতির ছবি আঁকেন কবি। দিনান্তে 'পশিচম আকাশের কোণে' যখন 'সূর্যের সোনালী আলো অস্পষ্ট হয়ে' আসে, তখন কবি দেখতে পান 'একঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল সোঁ সোঁ শব্দে,/চাঁপাইগাছির বিলে নামে প্রদোষের আলোছায়া'। অন্ধকার ঘনীভূত হলে প্রকৃতি মানুষের চৈতন্যে ভিন্নতর আবহ সঞ্চার করে। কবিও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে

প্রকৃতিকে পাঠ করেছেন এবং সেই অন্তর-উৎসারিত প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সৌরভ পাঠকের অন্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। নিচের দৃষ্টান্ত দু'টো পাঠ করা যাক :

ক. গত বর্ষের বসন্ত-স্মৃতি জলের লিখন হল,
এল দুর্দিন কালবৈশাখী, বর্ষের প্রাতে বর্ষার ঝড়ো রাত;
আকাশে বজ্রবাহিনী মেঘের বিপুল আর্তনাদ,
ঝড়ে জলে টলমল
ধূলায় লুটায় পাখির পাখনাগুলো;
উলঙ্গ তার বীভৎস দেহে কী করুণ ভঙ্গিমা।
সে কি পাখির তনিমা?
চিনেছে কি কেউ সবুজের রেখাগুলো? ('নব-বসন্ত'/*নব-বসন্ত*)

খ. হঠাৎ দূরস্থিত নদীর তীর থেকে
ভেসে এল জাহাজের বাঁশি,
আঠারোবেকীর বুক থেকে উঠে
নিকিরীপাড়ার ঘাটের সিঁড়ি ডিঙিয়ে
হন্নের মাঠ পেরিয়ে
সারি সারি বাবলা গাছের মাথার ওপর দিয়ে
ভেসে এল তার শিঙার গম্ভীর একটানা ধ্বনি :
কু--উ--উ--কু-- উ--উ।
বাঁশঝাড় আর অ্যাশ্শাওড়ার ঝোপে ঢাকা
পল্লীর কানে কানে স্টীমারের ভেঁপু যেন
সাহেব-বাড়ির ঘর থেকে ভেসে আসা
পিয়ানোর একটানা মৃদু সুর তোলে। ('সারেঙ'/*নব-বসন্ত*)

আবুল হোসেন প্রথম কাব্যগ্রন্থেই স্বদেশের 'অরূপ মূর্তিখানি' কবিতায় ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে। পল্লিপ্রকৃতির ছবি আঁকতে গিয়ে স্মৃতিকাতর কবির কণ্ঠে আক্ষেপের সুর লেগেছে। বাদলদিনের প্রকৃতি কবিকে বাংলাদেশের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ছেলেবেলার গ্রামের সঙ্গে কবি যৌবনের গ্রামকে মেলাতে চেয়েছেন। 'জল ছল্ ছল্ করে আড়া ভেঙ্গে,/ভাসানো পুকুর থেকে কই মাছ উঠে/কান বেয়ে হেঁটে যায় জলভরা মাঠে,/তুমি না জানলেও এ তল্লাটে সবাই যা জানে/ছেলেবেলা থেকে।' ('আমার সোনার দেশ'/*নব-বসন্ত*)। কবির এই 'তুমি' তাঁর বর্তমান নির্দেশ করে। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতার অংশীদার সকলের মধ্যে কবিও একজন। অনেক দিন পর দেখা প্রকৃতি আবুল হোসেনের কাছে প্রিয়জনের চেয়েও আপনজন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে :

আজকে সকালে এই গ্রাম দেখে পলক পড়ে না চোখে
নদীর কিনারে, ঘন বনের ধারে, অমাবস্যার দীঘির পাড়ে,
আম জাম কাঁঠালের মিনারে মিনারে,
ধানক্ষেত ঘেরা সীমাহীন মাঠে মাঠে
এই সব ছোট ছোট গ্রাম,
আমাদের দেশের নাম খোদা তার সোনার ফলকে।
আমার সোনার দেশ সোনা হল এই সব গ্রামে গ্রামে। ('আমার সোনার দেশ'/*নব-বসন্ত*)

'উত্তরাধিকার' শীর্ষক কবিতাটিতে আবুল হোসেন জন্মভূমির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে আকাশকে তিনি অবলোকন করেন, তা তাঁর অন্তরে 'সোনালী ধানের মতো রোদ' ছড়িয়ে দেয়। আকাশ থেকে যে বর্ষা ঝরে পড়ে 'তা চোখের জলের মতো আর জ্যোৎস্না ছড়ায় রক্তের ফিনকি দিয়ে'।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ থেকে নেমে আসা অন্ধকার তাঁর কাছে 'মেঘের মতো পীচের মতো নরম'। তাই এই আকাশ কবির মনে অক্ষয় আসন রচনা করেছে। তাঁর দৃষ্টি কেবল আকাশেই আটকে থাকে নি, তিনি মাটির দিকেও ফিরে তাকিয়েছেন :

আমরা কি মনে রাখব এই অপূর্ব অদ্ভুত মাটির কথা,
যেখানে ফেলেছি পা সহজ স্বাধীন মনে, সমস্ত শরীরে যার
আলো জল হাওয়ার মতো ধুলোর কাদার প্রসাদ, শ্রাবণে
ঘন বর্ষার দিনে আরকের মতো গন্ধ যার পেয়েছি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বাসে। মনে থাকবে কি এই কচি কাঁচা ধানের ঝলমল,
ফুটন্ত ফুলের সুবাস আর সোনালী ফসল? এই সব ফল ফুল
গাছপালা পাখি বন, ফুটন্ত স্রোতের মতন হাসিখুশি
শিশুদল আর যত ঝর্নার মতো বহ্নির মতো তন্বিরা।
প্রাণ খুলে কোন দিন নিয়েছি কি স্বাদ, পেয়েছি কি স্পর্শ?
কেনই বা রাখব? ('উত্তরাধিকার'/*নব-বসন্ত*)

আবুল হোসেন 'উত্তরাধিকার' কবিতাটিতে বাংলাদেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের শরণ নিয়েছেন। কবি দেখেছেন, 'চাষী মাঠে ধান বোনে, সূতো কাটে তাঁতী,/শান দেয় কুড়ালে কামার, জেলেরা নদীতে ফেলে/জাল, ঘটি বাটি বানায় কুমোর,/কাঠ কাটে করাতীরা/রেঁদা ঘষে ছুঁতোর, ক্ষেতে কলে জান দেয় হাজার হাজার মজুরেরা।' এই শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ অত্যন্ত নিবিড়। মানুষকে দেখতে গিয়েই তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন। কবি বলেছেন, 'আমরা দেখেছি সেই অপূর্ব দৃশ্য। আমরা পেয়েছি তারই স্বাদ। তাই শুধু মনে রাখবার।' এই কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আবহ যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই প্রকৃতির প্রতি কবির আবেগ ও আকর্ষণ প্রসারিত হয়েছে।

বিরস সংলাপ কাব্যগ্রন্থে আবুল হোসেন প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে খুব বেশি আবর্তিত হন নি। তবে কারো প্রতি কবির ভালোবাসার প্রকাশকে তীব্রতা দিতে গিয়ে কখনো কখনো প্রকৃতির সঙ্গে কবির অনুভব সমীকৃত হয়েছে। আবু রুশ্‌দকে উৎসর্গীকৃত 'ঝড়ের পূর্বে' কবিতায় আমরা দেখতে পাই, কবি অপেক্ষার তীব্রতা বোঝাতে বৃষ্টির জন্য 'গ্রীষ্মের তৃষ্ণার্ত রুক্ষ ভূমি'র অপেক্ষার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাত্রির জন্য দিনের অপেক্ষার রূপকল্পে 'সময়ের রেলিং ধরে' দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটি অসাধারণ। নিচের কবিতাংশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক :

আমি জানি তুমি অপেক্ষায় ছিলে গ্রীষ্মের তৃষ্ণার্ত
রুক্ষ ভূমি যেমন বিশুষ্ক ঠোঁপ মেলে চেয়ে থাকে দূর
বর্ণহীন নীলে এক ফোঁটা বারিবিন্দুর আশায়, যেমন
জৈষ্ঠ্যের তপ্ত দিন উষ্ণ আকাঙ্খায় রাত্রির অপেক্ষা
করে সময়ের রেলিং ধরে। ('ঝড়ের পূর্বে'/*বিরস সংলাপ*)

'এ দেশে আমরা একা' কবিতায় মেহেদীর কাছে নিজের স্বদেশের বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাও কবি বারবার উল্লেখ করেছেন। মেহেদীকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলোকে প্রেমের কবিতা হিসেবে দেখার সুযোগ থাকলেও সেই প্রেম কেবল ব্যক্তিগত সীমায় আবদ্ধ না থেকে স্বদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কবি ও মেহেদী– দুজন মিলে একা হয়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে কবির মন ভ্রমণ বিলাসী হয়ে উঠেছে। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপস্থাপনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল মূর্ত হয়েছে। কবি যখন বলেন, 'মেহেদী, তুমি অরণ্যের মতো গহন,/যে অরণ্যে আমি বারে বারে পথ হারাই,/তবু যাই।'– তখন এ অরণ্য কবির অন্তর অতিক্রম করে স্বদেশের গহন বনেও ছড়িয়ে পড়ে।

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস কাব্যে প্রকৃতি এসেছে আবুল হোসেনের স্বদেশভাবনার অনুষঙ্গী হিসেবে। এই বাংলাদেশের বুকেই কবি তাঁর শেকড় বিস্তার করেছেন। তাই এই দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চান না তিনি। কবি বলেন, 'আমি কিন্তু কিছুতেই যেতে চাই না,/যাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।' এই চলে যাওয়ার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

হয়তো কবির মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটে থাকবে। সব মানুষকেই তো একদিন চলে যেতে হয়। কিন্তু কবি কিছুতেই তাঁর প্রস্থানের কথা ভাবতে পারেন না। তিনি বলেছেন, ভয় দেখিয়ে তাকে ভাঙা যাবে না, এমনকি লোভ কিংবা যাদুর কাছেও পরাভূত হতে চান না তিনি। জীবনকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলতে চান যেখানে মিলিয়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তা অনুভব করতে পারেন তিনি। তাই হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই তাঁর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. আমি নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলব
এই সবুজ পিছল মাটি আর রঙ-বদলানো আকাশকে
ঝিরঝিরে আর ঝড়ো বাতাসকে আমি এত ভালবাসি
কেমন ক'রে এ সব ছেড়ে চলে যাব এক মুহূর্তে
ছেড়ে চলে যাব আমার দ্বিধাদীর্ণ স্ত্রী ছেলেমেয়ে বন্ধুদের
এক অবিচ্ছিন্ন ঘুমের আশায়।

আমি বরং এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। ('যেতে চাই না'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

খ. বরং যেমন ভাবে আলো আর হাওয়া হাতে হাত রাখে
যেমন ক'রে মাটি আর পানি গড়াগড়ি দেয়
যেমন ভাবে আকাশে মেঘ থাকে
একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে
অথচ হারায় না কেউ।
ঠিক তেমনি ভাবে,
যে যেমন সে রকম থেকে। ('হারিয়ে যাওয়া নয়'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

গ. আমার গেটের কাছে
যে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে
ওকে দেখে বলবে কে ওর
শিকড়টা গেছে কতদূর
মাটির ভিতরে।
চোখে পড়ে ওপরটা।
ছড়িয়ে দিয়েছে ডালপালা
খোলা
নিঃসঙ্গ আকাশে, বাড়িয়ে দিয়েছে হাত
কাঁধ, মাথা। ('কত বড় হবে'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

আবুল হোসেন *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যে খুব বেশি প্রকৃতির শরণ নেন নি। 'না-দেখা নাটক' কবিতায় নাটক-সিনেমার প্রতি কবির অনাগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ কবি নিজের ভেতরে ডুবে গিয়ে শব্দের ছবি নির্মাণে নিমগ্ন থাকেন। এই মগ্নতার আড়ালে হারিয়ে যায় কবির চারপাশের অনেক মনোরম দৃশ্য। সেই হারিয়ে যাওয়া বা না-দেখা দৃশ্যের দিকেই কবি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কবি হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেন, তাঁর খুব কাছেই অপরূপ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য। তিনি যখন এই দৃশ্যে আটকে যান, 'সূর্যদেব তখনও/হাঁটতে আসে নি, তারাদের পথ/শূন্য, বাতাস শুধু দর্শক', তখন হঠাৎ করেই তাঁর চোখে পড়ে :

গেটের ওপাশে কাঁঠালিচাঁপার
একটা ডাল কি ক'রে রাত্তিরে
নেমে এসে লাল গোলাপগুলোর
কামরায় ঢুকে পড়েছে কখন।
দূরে দেয়ালের আড়াল থেকে তা

দেখে মুখ টিপে হাসছে হাস্না
-হেনা আর রাগে রক্তজবা ও
সূর্যমুখীর জ্বলছে শরীর। (‘না-দেখা নাটক’/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

এই দৃশ্য দেখার জন্য কবিকে ডেকে নিয়ে যায় হাস্যোজ্জ্বল ডালিয়া। রজনীগন্ধা ও বেলি কবির খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায়। কবি অবাক হয়ে ভাবেন, তাঁর নিজস্ব বাগানে প্রতিদিন এত কিছু ঘটছে, অথচ কবি তার কোন খোঁজই রাখেন না। আবুল হোসেনের এই অনুভব পাঠককে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের *স্ফুলিঙ্গ* কাব্যের একটি কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে, যেখানে কবি বলেছেন, ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/একটি ধানের শিষের উপরে/একটি শিশিরবিন্দু।’ (২০০৬ : ১৪/৪৬)। *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যের ‘বৃষ্টি, বাতাস, মেঘ’ শীর্ষক কবিতাটিতে কবি নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে তাঁর মনের অবস্থা তুলে ধরেছেন। সেখানে বৃষ্টি পড়তে দেখেন কবি, যে বৃষ্টি ‘বোনের মায়ের কান্নার মতো’। তিনি প্রচণ্ড বাতাসের কথা বলেন যা ‘ব্যথার চাবুকে গোঙাতে গোঙাতে’ কবির ব্যক্তিগত বারান্দা অতিক্রম করে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে। কবি যে মেঘের ডাক শুনতে পান, তাও তাঁর চেতনার আকাশে ধমকের মতো আওয়াজ করে।

আবুল হোসেন *এখনও সময় আছে* কাব্যে প্রকৃতির বিচিত্র বিষয়কে ধারণ করেছেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতি এসেছে জীবনের অন্যবিধ অভিজ্ঞতার সহায়ক কিংবা সহযাত্রী হিসেবে। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য সম্পর্কেও কবির বিবেচনা ধরা পড়েছে কোন কোন কবিতায়। কখনো আবার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনাকে তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। আমরা অকারণে বৃক্ষনিধন করি, স্বার্থপরতায় আক্রান্ত হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করি। প্রকৃতিও সুযোগমতো তার প্রতিশোধ নেয়। আবুল হোসেন ‘তিনটি লোক’ শীর্ষক কবিতায় একজন বৃক্ষপ্রেমিকের গল্প শুনিয়েছেন। তরুণ বয়সে কবি দেখেছিলেন, ‘একজন পৌঢ় গোছের লোক রাস্তার এক পাশে/মাটি খুঁড়ে কী যেন একটা গাছের চারা লাগিয়ে/পানি ঢালছে।’ রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ করছিল যে লোকটি, কবি তার সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারেন, সে রাস্তার পাশের জমিটার মালিক নয়, কিন্তু পরিশ্রান্ত পথিকের কথা, মাঠের রাখালের কথা এবং দূর দূরান্ত থেকে উড়ে আসা পাখির কথা ভেবে লোকটি এই কাজ করছিল। সেই গাছটি বড় হয়েছিল কি না লোকটি হয়তো কোন দিন দেখতেও আসে নি, কিংবা কবির সঙ্গেও তার দেখা হয় নি কোনদিন, কিন্তু সেই লোকটিকে কবি ভুলতে পারেন নি। এভাবেই আবুল হোসেনের প্রকৃতি-প্রীতি কবিতায় মূর্ত হয়েছে :

ক. এই সারা রাত পথে পথে ঘোরা
সারা রাত একা জেগে থাকা
আকাশের কাছে বাতাসের কাছে ধাওয়া
রোদের দিকে মেঘের সঙ্গে ছায়ার পিছু ছোটা
গাছের কাছে যাওয়া আর ফুলের কাছে চাওয়া
পাখির কাছে নদীর কাছে হাত পাতা... (‘সেই লেখাটি’/*এখনও সময় আছে*)

খ. গাছটা বড় হলে তার নিচে পথচারীরা
একটু জিরিয়ে নিতে পারবে। আশেপাশের রাখালেরা এসে
বসতে পারে, খেলতে পারে,
গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাঁশি বাজাতে পারে।
চাদ্দিকের পাখিরা এসে বসবে, গান করবে, বাসা বাঁধবে। (‘তিনটি লোক’/*এখনও সময় আছে*)

গ. ফাল্‌গুন কবেই শেষ। রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ
বোশেখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ চোখ রাঙায়, যখন খুশি
বাজায় ঝড়ের ঘণ্টা। বৃষ্টির সময় নয়, তবু
যখন তখন বৃষ্টি নামে পানিপ্রপাতের শব্দে,
কখনও বা কানে কানে ফিসফিসে কথার মতন। (‘অসময়ের কোকিল’/*এখনও সময় আছে*)

ঘ. এই পৃথিবীর প্রকৃতিটা যদি আর একটু সদয় হত,
যারা তাদের ছোটখাটো সুখ দুঃখ নিয়ে
কবরের এপারে চোরাবালিতে ঘর বেঁধেছিল
তাদের অনেকেই ঘুণে খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ত না.
দুর্যোগের দাঁত নখ থেকে রেহাই পেত আর
অকূল দরিয়ার নোনা পানিতে ভেসে যেত না। ('পৃথিবীটা যদি'/*এখনও সময় আছে*)

আর কিসের অপেক্ষা কাব্যেও আবুল হোসেন প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। নিজের অনুভবের নানা প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়োজনেই কবি প্রকৃতির আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কবি আপনজনদের অনেককেই হারিয়েছেন, যারা তাঁর চলার পথের সঙ্গী ছিল। তারা নেই, কিন্তু পথ চলতে চলতে যে গাছ, যে নদী, যে পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলেন, তারা কবিকে স্মৃতিভারাতুর করে তুলেছে। কখনো-বা বৃষ্টিস্নাত দিনের এলোমেলো হাওয়া ও অস্থির গাছ কবিকে ভাবনার নতুন দিগন্তে টেনে নিয়ে গেছে। 'তুমুল বৃষ্টির দিনে/জোরে হাওয়া দিলে/এলোমেলো গাছগুলো/এমন আলুথালু বেআব্রু হয়ে পড়ে/আবছা ফিকে আলোয় ভেজা/ঘরবাড়ি এত ঝাপসা দেখায়' (বৃষ্টির দিনে'/*আর কিসের অপেক্ষা*) যে তাতে কবির মনের চোখ খুলে যায় এবং তিনি দেখতে পান তাঁর প্রিয় মানুষের মুখ। সে আসছে বলে মনে হলেও আসে না। অর্থাৎ কবির ভালোবাসার মুখটিকে মনে করতেও তাঁকে প্রকৃতির শরণ নিতে হয় কখনো কখনো। আবার বিশেষ কোন ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত কোন প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে আঘাত আসলে কবি বিনয়ের সঙ্গে মানুষকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির জড়িয়ে থাকার এই অন্তরঙ্গ অনুভব ও অভিজ্ঞতাকেই আবুল হোসেন বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. যে পাখিরা এসে ঘুম ভাঙাত সকালে
যে মানুষ সঙ্গে ছিল বলে

ভুলেছি পথের ক্লান্তি, জুড়িয়েছি বুক।
দেখেছি মেঘের মতো যে পাহাড়
খেয়েছি নদীর পানি দুধের মতন
দুই চোখ ভ'রে নিয়েছি যে আলো আর অন্ধকার
তারা আর কেউ নয় এখন আমার। ('সে দিনের পর'/*আর কিসের অপেক্ষা*)

খ. সিজার, এই গাছগুলো থাক, কেটো না, অযত্ন করো না,
জানি 'লন'টা বেজায় হাবিজাবি হ'য়ে আছে।
তা হোক, এখানে আসার পর
ওগুলো লাগিয়েছিল সে নিজের হাতে। ('ছেলেমেয়ের উদ্দেশে'/*আর কিসের অপেক্ষা*)

আবুল হোসেনের কবিতায় নানা অনুষঙ্গে প্রকৃতির উপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতির কবি নন। প্রকৃতির বন্দনা করে কবিতা লেখেন নি তিনি। জীবনকেই তিনি কবিতায় মূর্ত করতে চান। সেই জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড় বলেই তিনি বারবার নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে ফিরে গেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে অন্যায় ও অশোভন আচরণের ফল কত ভয়াবহ হতে পারে, সেই দিকটিও তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন। মানুষকে বাঁচতে হলে প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে– এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। মানুষের মধুর স্মৃতিতে যেমন প্রকৃতির অংশগ্রহণ থাকে, তেমনি দুঃখের অভিজ্ঞতায়ও প্রকৃতির প্রভাব কম নয়। তাই আবুল হোসেনের কবিতায়ও আমরা প্রকৃতির বিচিত্র অবয়ব লক্ষ করি।

সময়-সমাজ-রাজনীতি

যে-কোন সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার মননচৈতন্যেই প্রতিভাত হয় তাঁর স্বকালের ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত। 'ইতিহাসবোধ, সমাজচিন্তা এবং সমসাময়িক কাল সম্পর্কে সচেতনতা সম্ভবত যে কোন শক্তিমান কবিকেই কোন না কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে। কবি যখন সমসাময়িককাল সম্পর্কে ভাবিত তখন অতীত ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁকে চিন্তিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কবিরা যেহেতু রাজনৈতিক নেতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারক নন, তাঁর অভিব্যক্তি হয় স্বতন্ত্র ধরনের।' (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ৯৪)। আবুল হোসেনও সময়কে কবিতায় ধারণ করেছেন। সমাজের অন্তর্নিহিত অসুখবিসুখ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন তিনি। সময় ও সমাজের গভীর থেকেই উত্থিত তাঁর কবিতার বৃক্ষ। ফলে সেই বৃক্ষের পত্রপল্লবে ও শাখাপ্রশাখায় সঙ্গত কারণেই রাজনীতির হাওয়া এসে লাগে। যে কোন মহৎ কবিই স্বকালের নানা আলোড়ন-আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেই সক্রিয়তা কখনো কবিকে কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে, কখনো-বা তার প্রকাশ ঘটে কেবল কবিতায়। একজন সৃজনশীল মানুষ সমাজে বসবাস করেও প্রচলিত অর্থে সামাজিক জীবনযাপন বলতে আমরা যা বুঝি, তা তিনি যাপন করেন না। তাঁর বিবেচনা, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বই তাঁকে অন্য দশজন থেকে আলাদা করে তোলে। এই আলাদা হওয়ার মধ্যে অপরিসীম আনন্দ এবং সীমাহীন দুঃখ আছে। এই দুঃখ দুঃসহ হলেও একজন কবির কাছে তা অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথ *শেষ লেখা* কাব্যে যখন বলেন, 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,/সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,' (২০০৬ : ১৩/১২৪), তখন 'মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ' করার চেয়ে জীবনসত্যকে উপলব্ধির আনন্দই বড়ো হয়ে ওঠে। এই জীবনকে মানুষের যাপিত জীবন থেকে আলাদা করে দেখলে শিল্পের সত্যের প্রতি অবিচার করা হয়। 'সমাজজীবনের অন্তঃসারকে আত্মস্থ করেই যেহেতু কবিতার উদ্ভব, বিকাশ, ও ক্রমযাত্রা, সে-কারণে বিশেষ ভৌগোলিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানচিত্রগত বৈচিত্র্যের ফলে কবিতার স্বরূপও ভিন্ন হতে বাধ্য।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৮৯ : ২৩)। একজন শিল্পস্রষ্টার স্বকালের রাজনৈতিক বাস্তবতার ছাপ তাঁর সৃষ্টিকর্মে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সেই ছাপ সর্বদাই যে কবির সচেতন প্রয়াস থেকে উৎসারিত, তা কিছুতেই বলা যাবে না। স্বকালের রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়েও কাব্যরচনার চেষ্টা করেন কেউ কেউ। তাতে জীবনের নানা অনুভব ও উপলব্ধি মুদ্রিত হতে দেখি কিন্তু জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে হলে রাজনীতির ঢেউগুলোকেও মূল্য দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল হোসেনের বক্তব্য :

> আমার কবিতায় রাজনীতি এসেছে চিন্তার বাহন হিসেবে। সুধীন দত্তের কবিতায় এটা দেখেছি। এ যুগে কোনো মানুষের পক্ষেই রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে সমাজে বাস করা সম্ভব নয়। সামাজিক মানুষ এবং সাধারণ মানুষ প্রায় সমার্থক। সাধারণ মানুষের কল্যাণ ছাড়া সমাজের অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। এই বিশ্বাস আমি আজীবন লালন করেছি। আমার রচনায় তার প্রকাশও অকুণ্ঠিত। কিন্তু আমি কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে শরিক হইনি, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েও পড়িনি। কবিতার জন্যই আমি রাজনীতির কথা ভেবেছি। রাজনীতির জন্য কবিতা লিখিনি। কর্মী এবং কবির মধ্যে যদি কোনো বৈষম্য না থাকে তো ভালোই, তবু আমি কবি হতেই চেয়েছি। কর্মী নৈব নৈব চ। সমসাময়িক ঘটনাবলী তো আমি এড়িয়ে যাই-নি, বরং কবিতার উপাদান হিসেবে তাদের হরহামেশাই ব্যবহার করেছি। চেম্বারলেনের নির্লজ্জ আপোষনীতি আমাকে 'ছাতাটা' লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। (২০১০ : ১৩)

'রাজনীতির জন্য কবিতা' না লেখার কারণ কেবল তাঁর কবি হওয়ার অভিপ্রায়ের মধ্যে অনুসন্ধান করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব বলেই আমরা মনে করি। বিশেষ করে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহের রাজনৈতিক অনুষঙ্গের ধরন অনুধাবন করতে হলে তাঁর কর্মজীবনের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে বরাবরই কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়েছে। তাই 'রাজনীতির জন্য কবিতা' লেখার দুঃসাহস দেখান নি তিনি। 'কবিতার জন্যই' তাঁকে 'রাজনীতির কথা' ভাবতে হয়েছে। আবুল হোসেন নিজেই বলেছেন, 'সরকারি চাকরি করি। তাও খুবই নাজুক (sensitive) জায়গায়। খুবই ভেবেচিন্তে লিখতে হয়।' (২০১০ : ৬২)। জীবনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে চেয়েছেন বলেই তিনি স্বকালের ঘাটে ঘাটে নোঙর করেছেন, সমাজের ভাঁজ খুলে তার ভেতরের বৈভবে পুলকিত হয়েছেন এবং বৈনাশিক প্রবণতায় ব্যথিত হয়েছেন, এমনকি অস্থির ও অসুস্থ রাজনীতিকেও তিনি তাঁর কবিতার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসন দেন নি।

কবি আবুল হোসেনের আবির্ভাবকালে বাংলা কবিতা সময় ও সমাজকে বিশেষ মাত্রায় উদ্ভাসিত করেই ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেছে। আবুল হোসেন সেই সময় সম্পর্কে বলেছেন, 'চল্লিশের সেই আগুন ঝরা,/আমি বলি সোনায় মোড়া,/দিনগুলিতে যে কয়েকজন/তাজা তরুণ খেলার ছলে/লিখতে বসে হৃদয় ক্ষরণ।' ('সোনালী দিন'/*রাজকাহিনী*)। চল্লিশের প্রতিভাবান তরুণদের এই হৃদয় ক্ষরণের কথা বলতে গিয়েই বারবার তাঁদেরকে স্বকালের রাজনীতির নানা অনুষঙ্গকে কবিতায় স্থান দিতে হয়েছে। 'কবিতার শুদ্ধতানাশী ব'লে অভিযুক্তদের মধ্যে রাজনীতির স্থান প্রথম

পংক্তিতে।'– হুমায়ুন আজাদের (১৯৯২ : ১০৭) এই মন্তব্যে অভিভূত পাঠকের পক্ষে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতার শক্তি ও সমৃদ্ধির স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। কারণ রাজনীতি এই দশকের কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উপস্থিতি রাজনৈতিক নয়, সময় ও সমাজের অনুপুঙ্খ রূপায়ণের অনিবার্য অংশ হিসেবেই কবিতায় স্বীকৃত হয়েছে রাজনীতি এবং এর বহুমাত্রিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রকাশের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে কবিতায় রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। এই দশকের বাংলা কবিতার প্রতিনিধিত্বশীল ধারা প্রগতিকবিতার প্রবল স্রোতে গা ভাসান নি আবুল হোসেন, কিন্তু তার ঢেউ এসে তাঁকেও স্পর্শ করেছে কখনো কখনো। সেই স্পর্শের অনুভবজাত কতিপয় কবিতা অবলম্বনে আমরা আবুল হোসেনের কবিতায় সময়, সমাজ ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করব।

আবুল হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নব-বসন্ত* প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ কালপর্বে লেখা কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রস্তুতিলগ্ন থেকে যুদ্ধকালের প্রথম পর্যায়ের অস্বস্তি ও অস্থিরতা এই কাব্যের অনেক কবিতাকেই গ্রাস করেছে। ক্ষমতালোভী মানুষের বৈনাশিক প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত মানবতার ক্রন্দন সেই সময়ের অন্য কবিদের মতো আবুল হোসেনকেও ব্যথিত করেছে। সেই ব্যথিত আত্মার আর্তনাদকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। *নব-বসন্তে*র অনেক কবিতায়ই আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ টের পাই। মূল গ্রন্থের প্রবেশপথে 'পূর্বলেখ' শীর্ষক একটি পরিচয়পত্র সেঁটে দিয়েছেন আবুল হোসেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পাঠককে তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ারই এ এক কাব্যিক প্রয়াস। সেখানে তিনি বলেছেন, 'অনুভব করেছ কি আমার বেদনা সীমাহীন?' কবির এই বেদনাকে আত্মতাড়িত উচ্চারণ হিসেবে পাঠ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু এই আত্মতার সঙ্গে কবির স্বকালের সংক্ষুব্ধ বিশ্বব্যবস্থার সংযোগ নেই– একথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। 'পৃথিবীর হাতে বাঁধি লাল রাখি, হৃদয় মিলাই।'– বলার পর আবুল হোসেনের বেদনায় কেবল ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাসের ছায়াপাত ঘটা সম্ভব নয়। প্রথম কবিতা 'নবযুগে' প্রবেশ করলেই আমরা কবির দীর্ঘ দিন ও নির্ঘুম রাতের স্বপ্নে 'শ্রান্তিবিহীন শিকারী'র উপস্থিতি লক্ষ করি। সেখানে 'জ্যোছনা রাতের সাদা মেঘ আর প্রভাতী পূর্বাকাশ' ঢেকে দিচ্ছে 'কুটিল হিয়ার স্নিগ্ধ প্রবঞ্চনা'। তাই কবিকে বলতে শুনি :

> আজ তারা সব ছাড়া-পাওয়া জানোয়ার;
> আজ তারা এল, ভেঙ্গে এল কারাগার;
> ক্ষমা নাই আর এতটুকু নাই ক্ষমা,
> শোধ চাই সব যেখানে যা আছে জমা।
> অনেক বেদনা জমাট করেছে বুক,
> ভরেছে চিত্ত অনেক স্মৃতির ব্যঙ্গ সান্ত্বনায়,
> আজ তারা হল নিঃশেষ, হল মূক। ('নবযুগ'/*নব-বসন্ত*)

'ডায়নামো' শীর্ষক কবিতায় যে 'ডায়নামো একটানা দ্রুত ধ্বনি তোলে' এবং যার শিহরন শাখায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে কবির 'হৃদয়ের তুমুল ক্রন্দন' জাগায়, তার মধ্যে কবির স্বকালের অসুস্থ সময়েরই পায়ের শব্দ শোনা যায়। কারণ 'আকাশ আঁধারে ঢাকা, মৃত্তিকা নিসার' পাঠককে সেই প্রতিকূল প্রতিবেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাই কবির 'নব-বসন্ত' উপভোগ্য হয়ে ওঠে না। কবি দেখেন, 'ধূলায় লুটায় পাখির পাখনাগুলো;/উলঙ্গ তার বীভৎস দেহে কী করুণ ভঙ্গিমা।' ('নব-বসন্ত'/*নব-বসন্ত*)। 'মমি' শীর্ষক কবিতায় কবি 'মৃত্যুর অতল অন্ধকারে' ডুবে থাকার কথা বলেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই সময়ের প্রতিভাস নির্মাণ করেন বলেই তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়, 'কবর-গহ্বরে আজ মনুষ্যত্ব লুকায়েছে মুখ :/আহার বিহার ঘুম, শান্তির নির্বিঘ্ন বাতায়নে/কাটে দীর্ঘ রাত্রি দিন অনায়াস অবিচ্ছিন্ন সুখে।' রক্তলোলুপ দেবতার কাছে ক্ষমার বাণী ব্যর্থ হয়েছে, অহিংসার স্নিগ্ধতায় বিশ্বকে টানার প্রয়াসকে দেবতা কৌতুকহাস্য ও করুণায় উড়িয়ে দিয়েছে। তাই কবির কণ্ঠে এই শোকবিহ্বল উচ্চারণ :

> আমরা তো মরে গেছি, আমাদের প্রাণহীন মমি
> পাথরে খোদাই মূর্তি। অস্থিসার নির্বাক কঙ্কাল

সনাতন পিরামিড ঐতিহ্যের ধূসর গুহায়
রয়েছে দাঁড়ায়ে আজও। দক্ষিণের বাতাস মরমী
বয়ে যায়, জাগে না স্পন্দন কোন আমাদের মনে,
অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা আমরা খোলস একতাল। ('মমি'/*নব-বসন্ত*)

আবুল হোসেন 'দুর্যোগ' শীর্ষক কবিতায় ঘুমহীন রাতের কথা বলেছেন। কপাটে ঝড়ের করাঘাত শুনেছেন কবি, অনুভব করেছেন, 'বিশৃঙ্খল পাইনের বিশীর্ণ বিনুনি/টেনে ছিঁড়ে ফেলে এক বর্বর নিষাদ।' এই নির্ঘুম রাতের আবেগ কবির 'শরীরটাকে কুড়ে কুড়ে খায়/হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলে পিঙপঙ।' আকাশে অস্থির দাপাদাপি, বাইরে অসংখ্য বজ্রের শব্দ পাঠককে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'শোণিতে শোণিতে মোর বিষাক্ত বাসনা,/আমার মনের তলে সংখ্যাহীন আদিম নিষাদ', তখনো পাঠকচৈতন্যে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিভাসই নির্মিত হয়। এই সময়ে রচিত আরো কয়েকটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপন্ন বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে :

ক. তোমার ভুবনজয়ী যুদ্ধরথ-চক্রের নির্ঘোষে
মিলায়েছে আত্মগত অন্তরের ক্ষীণ কলরব,
বীরত্বের দর্প-বর্মে প্রতিহত চেতনা নীরব।
অশান্ত আদিম পশু তৃষ্ণায় ফুঁসিছে রুদ্ধ রোষে,
চাহিল সে উর্ধাকাশে, বারিবিন্দু জানে না অন্তরে। ('বিজয়ী'/*নব-বসন্ত*)

খ. আমাদের মৃত্যুদূত আসিতেছে জানি চুপে চুপে,
সিংহদ্বারে শুনিয়াছি বারবার নিলয় নর্তন।
আমাদের ক্ষীণ আয়ু ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসে অন্ধকূপে,
ঝরি ঝরি পড়িতেছে অতীতী বটের ঝুরিগুলো। ('অসমাপ্তি'/*নব-বসন্ত*)

গ. ওদের কামানগুলি যদি পারত
উড়িয়ে নিতে সব বালুকণা
মরুভূমির অসংখ্য অগণ্য বালুরাশি,
ওদের বোমাগুলি যদি পারত মরুভূমির মাটি ফাটিয়ে
জলের উৎসধারা বের করতে,
ওদের ট্যাঙ্কগুলো যদি চষে ফেলত সমস্ত মরুভূমি,
বেয়োনেটের আগায় মাটি খুঁড়ে বুন্‌তে পারত ধান
সবুজ কচি ধানের বীজ।
যদি পারত পারত পারত ('ঘোড়সওয়ার'/*নব-বসন্ত*)

ঘ. আমরাও স্বপ্ন দেখি দিনে আর রাতে
পথক্লান্ত পাখিদের পাখাতে পাখাতে
সে স্বপ্ন এলোমেলো ভেসে ভেসে আসে
শতাব্দীর মৃত্যুনীল আকাশে আকাশে। ('স্বপ্ন'/*নব-বসন্ত*)

ঙ. দুরন্ত পবনে ধু ধু জ্বলে ওঠে ধূমায়িত জ্বালানির কাঠ
মহান মৃত্যুর মুখে। আর নয় এই ধুকে ধুকে
তিলে তিলে প্রাণক্ষয়, বিস্বাদ বিষণ্ন বেঁচে থাকা।
রে বিহঙ্গ রে বিহঙ্গ, মুক্ত করো মুক্ত করো পাখা। ('একটি অসমাপ্ত কবিতা'/*নব-বসন্ত*)

আবুল হোসেনের কবিতায় কেবল যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাসই প্রতিভাত হয় নি, এই যুদ্ধ কীভাবে সুবিধাবাদী শ্রেণির ভাগ্য খুলে দিয়েছে, তার পরিচয়ও মুদ্রিত হয়েছে। এই পুঁজিপতি ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী শ্রেণির জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং এই সংকটকে তীব্রতা দিয়েছিল।

'মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের মজুত কৌশলেও অনেকসময় ব্যাপক অন্নাভাব ঘটে থাকে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের এও আর একটি কারণ।' (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ৩)। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মন্বন্তর মানুষের জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে। সমাজজীবনের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এবং মানুষের জীবনে দুঃসহ দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানবিক মূল্যবোধেরই কেবল মৃত্যু ঘটে না, ক্ষুধার যন্ত্রণায় জীবনাবসান ঘটে অগণিত মানুষের। আবুল হোসেন সাধারণ মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে পুঁজি করে মুনাফাখোর শ্রেণির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের চিত্রও তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতার এটি একটি সাধারণ প্রবণতা। প্রগতি-কবিতায় তেতাল্লিশের মন্বন্তর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। বিশেষ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় আমরা যুদ্ধ-পরবর্তী মন্বন্তরের মর্মঘাতী চেহারা ফুটে উঠতে দেখি। 'মালিক, মহাজন, মজুতদার, বণিক ও জমিদার-শ্রেণী কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারার রক্ত শোষণ করে ক্রমে তাদের কঙ্কালে পরিণত করে। অনাহারে মৃত মানুষের সৎকারের ব্যবস্থা নেই বলে পথের দু'ধারে, খালে-বিলে কঙ্কাল জমে ওঠে।' (তারেক রেজা ২০১০ : ১৬০)। এই কঙ্কালের করুণ কাহিনী কবিতায় রূপ দিয়েছেন আবুল হোসেন। তিনি কবিতায় মন্বন্তরের ঘটনাপ্রবাহকে পরিস্ফুট না করে পাঠককে ঘটনার গভীরে মনোযোগ দিতে বলেছেন। সমাজজীবনের ভাঙন ও বিপর্যয় তাঁকেও আহত করেছে এবং তিনি এই সংকটকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সংকট উত্তরণে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের বর্ণনাতীত বেদনা আবুল হোসেনকে নাড়া দিয়েছে বলেই তিনিও সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের পেছনে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের যে মানবিক মূল্যবোধহীন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি কাজ করেছে, আবুল হোসেন সেই দিকটিকেও কবিতায় তুলে আনতে চেয়েছেন। তাঁর স্বকালের অন্য কবিদের মতো বলিষ্ঠ ভাষার আশ্রয় নেন নি তিনি, কিন্তু তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ থেকে যুদ্ধপ্রভাবিত বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের মানবেতর জীবনযাপন এবং অগণিত মানুষের জীবনাবসানের চিত্র ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত দুইজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

ক. পঞ্চাশের বীভৎস মন্বন্তর প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল বাংলা সাহিত্য এবং শিল্পের প্রতিটি শাখাকে। সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ। তেরোশ' পঞ্চাশ বাঙালি জাতির কাছে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়; যা একই সঙ্গে দুঃখের, অপমানের এবং লজ্জার। এই বিষাদ সমুদ্র ভুলে গেলে ক্ষুধা এবং মহামারিতে মৃত লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর প্রতি করা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলা সাহিত্যের কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সেই সময়ের নির্মম দাগকে অমর করে রেখেছেন কথাসাহিত্যে, নাটকে, অভিনয়ে, গানে, ছবিতে এবং কবিতায়। (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ৬)

খ. সাহিত্যিক শিল্পীদের মধ্যে কবিদের হৃদয় বোধকরি সর্বাধিক সংবেদনশীল। পঞ্চাশের মন্বন্তর অন্তত সে ধারণাই সমর্থন করে। দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয় এ সময় কালের কবিদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেসময় প্রায় প্রত্যেক কবিই এ-বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। কোন কবি করুণাঘন বিষণ্নতায় দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ্ চিত্র ফুটিয়ে তুললেন, কোন কবি মন্বন্তর-স্রষ্টা মনুষ্য-ঘাতকদের তীব্র ক্ষোভে অভিযুক্ত করলেন, কেউ বা তাঁদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে প্রতিবাদী রূপ দিলেন, আবার কোন কবির কবিতায় ধ্বনিত হল সমবেদনাপূর্ণ আশার বাণী। (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ১৬৬)

আবুল হোসেন কবিতায় মন্বন্তরের মর্মঘাতী দৃশ্য তুলে ধরতে গিয়ে বিদেশি শত্রুকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি দেশি শত্রুদের পাশবিক প্রতাপকেও কবিতায় ধারণ করেছেন। মন্বন্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো স্মৃতিকাতরতায় আক্রান্ত হয়েছেন, যা দুর্ভিক্ষের দিনগুলোকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে। স্মৃতির ভেতরে যে গ্রাম বা শহরকে তিনি ধারণ করেন, পঞ্চাশের মন্বন্তর সেগুলোকে শোকের ছায়ায় আবৃত করেছে। কখনো কখনো তিনি বিদ্রোহের চেয়েও বেঁচে থাকার জন্য সামান্য অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর বলে উল্লেখ করেছেন। ঈদের আনন্দ হরণ করে দুর্ভিক্ষ উপহার দেয় 'বহু শতাব্দীর অন্ধকার/মরা বনে মর্চে ধরা বিধির ফসিল।' তাই কবির 'দিন কাটে অসহ্য স্মৃতির রোমন্থনে।' এই দুঃসময়ে কবির জাহাজ বন্দরে নোঙর করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় এবং তা বালুচরে আটকে যায়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' আবুল হোসেনের কাছে ভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরে এবং তিনি কবির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে বলেন, 'সাহিত্যের মাননীয় সমালোচক,/আমার কুসুম কামনা শেষ এখানেই।/সমস্ত দিন আর

রাত/ছিন্নভিন্ন, বিক্ষিপ্ত।' আবার কখনো-বা ডাস্টবিন থেকে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত ভিখারির ছবি পাঠককে যুদ্ধদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নিচের দৃষ্টান্তগুলো পাঠ করা যাক :

ক. বাজারে পণ্য হাজার হাজার
মেলে না অন্ন তবু ক্ষুধার,
ঘর আছে তবু মেলে নাক' ঘর।
এই আমাদের আজীবন স্বপ্নের সে শহর।
কত দূরে সেই ছায়াঘন নীল দিন,
সোনালী ধানের সুরভিত আশ্বিন। ('মন্বন্তরে'/*নব-বসন্ত*)

খ. আমরা বিদ্রোহী নই,
আমরা ক্ষুধার্ত
ডাল ভাত রুটি আলো হাওয়া আর একটু আশ্রয়,
আপাতত আর কিছু নয়। ('পটভূমি'/নব-বসন্ত)

গ. আমরা ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কালে
আজ সে সমুদ্রস্বপ্ন অনর্থ প্রলাপ,
শাহারা ডিঙানো সেই ওসমানী উল্লাস
আমাদের জীর্ণ দেহে সুতীক্ষ্ণ শায়ক। ('ঈদের সকালে'/*নব-বসন্ত*)

ঘ. স্বদেশী বিদেশী প্রভুরা লালে লাল,
দালালদের গাল লোহিততর,
তহবিল ঠাসা সোনায়।
কারখানায় আসুরিক উৎপাদন,
অথচ ক্ষুধার্ত শ্রমিক।
মাঠে ঘাটে খামারে জাহাজে বোঝাই কৃষিপণ্য,
তবু মুমূর্ষু দেশের লোক।
এ আমলের সোনা সূর্যাস্তের রশ্মিতে শেষ। ('স্বগত'/*নব-বসন্ত*)

ঙ. খড়খড়ি দিয়ে দেখি সামনে ঘরে ঘুমায় ওদের চাকরটি,
খালি গায়ে শুধু একফালি গামছা প'রে।
আলসের গা বেয়ে চলেছে একটি বিড়াল।
ডাস্টবিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে অর্ধেক ভিখিরী।
ফুটপাতে অনেকগুলো ছেঁড়া কাগজের পাতা।
মাংসের হাড়গোড়, মাছের কাঁটা, ঝোল।
তা ছাড়া রাস্তাতি ফাঁকা।
দুপুর। ('প্রতীক্ষা'/*নব-বসন্ত*)

আবুল হোসেনের কবিতায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রভাব লক্ষ করার মতো। তিনি বলেছেন, 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে সে সময়ে শুধু কবিদেরই নয়, সকল শিল্পী সাহিত্যিককে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমি এমন কোন কবির কথা ভাবতে পারি না যিনি সেই সময়ে এই বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন নি।' (২০১০ : ৬৬)। আবুল হোসেন নিজেও যুদ্ধপরবর্তী মানবিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কবিতায়।

আবুল হোসেনের কবিতায় মন্বন্তরের রূপায়ণ প্রসঙ্গে আমরা *বিরস সংলাপ* কাব্যের 'মানপত্র' কবিতাটিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে চাই। এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিবর্তে শোষণের পরিণামকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন কবি। 'বিদ্রোহ নয়, প্রতিবাদ নয়, নালিশ নয়, জোর-জুলুম নয়। শুধু ভিক্ষে, শুধু কাকতি মিনতি, শুধু সুসজ্জিত খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দোকানের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা, শুধু ফ্যানের জন্য চিৎকার, শুধু

মরে যাওয়া।' (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ৯৮)। আবুল হোসেন 'মানপত্র' কবিতায় শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিকে প্রণতি জানিয়ে কবিতা শুরু করেছেন : 'হুজুর, হাজার সেলাম নেবেন গরীবের,/আপনি নিজেই এসেছেন, আমাদের জোর-/কপাল। চলুন, দেখবেন কিছু ঘরে ঘরে।'– এইভাবে জমিদার বা প্রভুকে সম্ভাষণ করে তিনি গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সর্বস্ব হারানোর করুণ কাহিনি বিবৃত করেন। এই কবিতাটির সঙ্গে আহসান হাবীবের *ছায়া হরিণ* কাব্যের 'হক নাম ভরসা' কবিতার তুলনা করা যেতে পারে। সেই কবিতায় আহসান হাবীব চিঠির আদলে জমিদারের শোষণ নিপীড়নে সর্বস্ব হারানো আমানীর পাড়ের মহম্মদ তালেবালির দুঃখ-দুর্দশার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর আবুল হোসেন মানপত্রের আদলে সেই জমিদারের কাছেই এক আদর্শ গ্রামের নিরন্ন মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরেছেন। আহসান হাবীব বিপন্ন মানুষের ছবি এঁকেছেন শোষিতের একজন হিসেবে। আর আবুল হোসেন এই কবিতায় বর্ণিত গল্পের কথককে জমিদারের দোসর হিসেবে দেখিয়ে ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে মন্বন্তরের অবস্থা তুলে ধরেছেন। আবুল হোসেনের কবিতাটি ব্যঙ্গাত্মক বলেই এর ভাষা অধিকতর তীর্যক ও লক্ষ্যভেদী। কবি বলছেন : 'এই গ্রামটিকে আদর্শ বলতে হয়, কি যে/নির্বিকার ঝকঝকে এ দিকটা। রোদে জলে ভিজে/সব যে করেছি নিজেরাই অবশ্যি ঠিক তা নয়,/বিধাতাই সহায়, বাকিটা না বললেও/চলে আমাদেরই কাজ।' মন্বন্তরে সব কিছু বিক্রি করে কোন রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে তারা, কেউ বা বাঁচার আশায় শহরে পাড়ি জমিয়েছে। জমিদারের শোষণে সর্বস্ব হারানো কঙ্কালসার মানুষেরা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে বলছে, জমিদারের এ এক 'অপূর্ব শাসন'। আবুল হোসেনের ভাষায় :

দারুণ দুর্দিনে যে যা
চেয়েছে বেচতে, যা-ই দাম হোক, আহা কী কষ্ট,
নিতে হল কিনে। অকেজো বাড়তি লোকগুলো
গেছে শহরে, তাই তো
খাওয়ার পরার শোওয়ার
ভাবনাও আর নাই, ঘরে ঘরে নির্ভেজাল শান্তি,
হয় না লড়াই। আর এমনি চমৎকার লোক এরা
নালিশও করবে না, আগাড় ভাগাড় যাই হোক
তিন হাত চাই শুকনো হাড়ে সার দেয়ার।
মাটির সাথে একাট্টা, আহা কী সামান্য প্রয়োজন।
শব্দহীন নির্বিকার জলের জীবন। মৃত্যু আর
জীবন সমান। হুজুরের অপূর্ব শাসন। ('মানপত্র'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেনের *বিরস-সংলাপ* কাব্যগ্রন্থের আরো অনেক কবিতা দ্বিতীয় যুদ্ধের আবহে রচিত। প্রথম কবিতা 'ব্যাঙ্ককে গ্রীষ্ম' শুরু হয়েছে এইভাবে : 'সারা দিন সূর্য ছুঁড়েছে নেপাম বোমা/আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে/চীনে নববর্ষের হাওয়া/গেসোলীনে ভিজিয়েছে সমস্ত ব্যাঙ্কক।' আবুল হোসেন এই গ্রীষ্ম থেকে বর্ষার দিকে যাত্রা করেন এবং 'ব্যাঙ্ককে বৃষ্টি'র ছবি আঁকেন। ব্যাঙ্ককের বৃষ্টি কবিকে বাংলাদেশের বৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি অনুভব করেন, 'বাংলার ঘাসের স্টেজে নরম নদীর কার্পেটে নামে/টাপুর টুপুর, খিল খিল ক'রে নেচে খেলে/সমস্ত দুপুর সকাল বিকেল কখনও সঘন সারা রাত,' কিংবা 'সুনামগঞ্জের হাওড়ে/চিলমারির বিলে' যেভাবে বর্ষার আগমন ঘটে, ব্যাঙ্ককের বৃষ্টি সেই রকম নয়। এখানে বৃষ্টি মানুষকে ভিজিয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তা যেন রক্তে ভেজার নির্মম অভিজ্ঞতা। বৃষ্টির রূপকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতাকে চিত্রিত করার এই প্রয়াস অসাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈশ্বিক বাস্তবতাকে অনুধাবনের প্রয়োজনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের শরণ এই কবিতায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। যে বৃষ্টি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে পৃথিবীকে ফুলে ফসলে পরিপূর্ণ করে তোলে সেই আরাধ্য বৃষ্টিকে কবি মানবসভ্যতার কলুষিত অধ্যায় উন্মোচনের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবির ভাষায় :

তাহলে কি দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ড্রাগনেরা
হঠাৎ জেগে উঠে ছিঁটোয় আগুন
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই ঝড়ো এলাকায়

আর গুলির শব্দে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
ঝাঁকে ঝাঁক বোমারু মেঘের জোট থেকে
এলোমেলো বস্তিতে সদর রাস্তায় নদীর ঘাটে
ধানের ক্ষেতে। (‘ব্যাঙ্ককে বৃষ্টি’/*বিরস সংলাপ*)

এই যুদ্ধের বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তারই চমৎকার প্রকাশ লক্ষ করি আবুল হোসেনের ‘বাজার দর’ শীর্ষক কবিতায়। ‘চালের ডালের তেলের নুনের/হাঁড়ির বাড়ির গাড়ির চুনের।/আলু মাঙ্গা বালু মাঙ্গা,/কাপড় কিনতে লাগছে দাঙ্গা,’– এই হল বাজারের অবস্থা। ‘গৌরী সেন’ কবিতায়ও আমরা দেখতে পাই, ‘চাল নেই ঘরে গম নেই ক্ষেতে পশ্চিমে পুবে কোনখানেই।’ এই খবর সাধারণ মানুষের অবস্থা তুলে ধরে। অন্যদিকে রাজার হাজার হাতির খোরাক ঠিকই জোগাড় হয়ে যায়। তাদের টাকা জোগায় লোককথার বিত্তবান চরিত্র গৌরী সেন।

আবুল হোসেনের প্রথম পর্যায়ের কবিতায় এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী নানা ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে কবি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাপ্রবাহ থেকে কবিতার উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। সেখানে রাজনৈতিক ঘটনার সরাসরি উল্লেখের পরিবর্তে কবি রূপক কিংবা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, ‘সমাজ-রাজনীতি-ভাবনাই আবুল হোসেনকে যেন জাগ্রত রেখেছে। ফলত প্রথম থেকেই আবুল হোসেনের কবিতায় একটি তির্যক ধাঁচ থেকে থেকে দেখা দিয়েছে।’ (২০০৭ : ৮)। *বিরস সংলাপ*-এর অনেক কবিতায়ই আবুল হোসেন ব্যঙ্গের ছলে স্বকালের সমাজ-রাজনীতির নানা বিষয়ে নিজের অভিমত উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গকৃত ‘তিরিশ টাকার মাইনেতে’ কবিতাটির কথা আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। এই কবিতায় স্বকালের সমস্যা সংঘাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রেমের কবিতায় মগ্ন হওয়ার কথা বলেছেন, যা মধ্যবিত্তের পলায়নপর মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কবি বলেছেন, ‘প্রেমের কবিতা রুখতে কহ যে/ভাবনার চাষ থামে কি সহজে/এই মগজের মওসুমে?/রাত্রি কাটাই কি ক’রে এখন এক ঘুমে।’ আবুল হোসেন উল্লেখ করেছেন, সুভাষের পদাতিক দুঃসময়ে ‘চুপি চুপি স’রে পড়বেই সহজে/সে পথ কোথায়?’। হাঁড়ির, বাড়ির, তাড়ির ও নারীর ভাবনায় মগ্ন মানুষের মানসিকতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। এভাবেই আবুল হোসেন সময় ও সমাজকে কবিতার গায়ে গেঁথে দিয়েছেন।

সময়চেতনা একজন কবির স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে। আবুল হোসেনের কবিতা পাঠ করলে আমরা সহজেই সময় সম্পর্কে কবির চিন্তার ধরনটি ধরতে পারি। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা *বিরস সংলাপ* কাব্যের ‘চরম মুহূর্ত’ শীর্ষক কবিতার আলোকে আমরা আবুল হোসেনের সময়-ধারণার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করব। একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মিনতি জানিয়েছেন তিনি সময়ের কাছে : ‘হে কাল, থামাও থামাও/উদ্দাম উত্তাল নিত্য উধাও তোমার তরঙ্গবেগ।’ সময়কে থমকে দাঁড়ানোর এই আহ্বান ব্যর্থ হবে জেনেও কবি ‘জীবনের পরম পাওয়া’কে যৌবনের উষ্ণতায় ধারণ করতে চেয়েছেন। ‘ঘনীভূত, প্রস্ফুটিত, রন্ধ্রহীন অন্ধকার, অসহ্য পুলকে’ হৃদয়ের শিহরনকে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন তিনি। সময় থমকে দাঁড়াবে না ঠিকই, কিন্তু সময়কে যারা লোভ ও প্রতিহিংসার ছোবলে অসুস্থ করে তোলে, তাঁদের তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও আমরা আবুল হোসেনের ভাষায় সেই বিক্ষুব্ধ কালের প্রতিরূপ অনুধাবন করতে চাই যেখানে ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’ কবির অনুভবের রূপকল্পে উদ্ভাসিত :

হে কাল, এই শব্দস্পর্শগন্ধহীন রুদ্ধশ্বাস
অনন্ত মুহূর্তে শুনে যাও
আমাদের হৃদয় স্পন্দন, অবিরাম
হাতুড়ি বাড়ির মতো, শিরায় শিরায় দ্রুত
শিহরন আর রক্তস্রোতে দুরন্ত ফুটন্ত ঝঙ্কার।

হে কাল, এই মুহূর্তে চরম সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ি
আমরা দু’জন, বিপরীতমুখী দু’টি ঝড়। দুরন্ত মর্মর

Dhaka University Institutional Repository

ছড়ায় ঝংকৃত অস্থির আকাশে, শুনি শুধু
গান বাজে ধমনীর কোষে কোষে আর
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ফোঁসে লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর
আমাদের ভেঙ্গে দিয়ে, মাটির দলার মতো দুটি রাঙ্গা
ফুটন্ত হৃদয় গুড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে।

হে কাল, থামাও থামাও
উদ্দাম, উত্তাল তোমার তরঙ্গবেগ
আর এই পরম ক্ষণে, নিয়ে যাও
আমাদের চরম স্বাক্ষর মর্তে
উচ্ছসিত রক্তের আবর্তে আবর্তে ফেনায়িত। ('চরম মুহূর্ত'/*বিরস সংলাপ*)

একজন শিল্পস্রষ্টার মানসগঠনে তাঁর স্বকালের সমাজ ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ নিশ্চিতভাবেই প্রভাব ফেলে। 'সমাজের নানা আবর্তে উত্থিত অমৃত পান করে শিল্পী যেমন ভাস্বর হয়ে ওঠেন, তেমনি গরল পানে তাঁকে হতে হয় নীল কণ্ঠ।' (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ১)। আবুল হোসেনের কবিতায়ও আমরা কবির স্বকালকে নানা মাত্রায় মুদ্রিত হতে দেখি। স্বকালকে স্বীকরণ করেই তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠকের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করতে চেয়েছেন।

আবুল হোসেন নিজের অন্তরের অভিঘাত যেমন কবিতায় রূপ দিয়েছেন, তেমনি সমাজের একজন মানুষ হিসেবে তাঁর চারপাশের কোন অভিঘাত থেকেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন নি। তাই তাঁর কবিতায়ও আমরা রাজনীতির নানা অনুষঙ্গের অবতারণা লক্ষ করি। 'রাজনীতি নিয়েই শিল্পী শুধু চলতে পারে না, লেখা শুধু have এবং have not-দের কথা বলবে না, তার একটা অন্বেষণ থাকবে– সত্যের অন্বেষণ।' (২০১০ : ৩৩)– আবুল হোসেনের এই অভিব্যক্তির মধ্যে রাজনীতি গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হলেও কবিতাকে কেবল রাজনৈতিক আবর্তে ঘুরপাক খাওয়াতে চান নি কবি। জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে রাজনীতিকেও জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবতে হবে– আবুল হোসেনের মন্তব্যে আমরা এই বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করি। কবিতায় রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : 'আমার কবিতায় একটা রাজনৈতিক প্রবণতা তো সব সময়েই ছিল। তা কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে নয়– সাধারণ মানুষের সপক্ষে। দলিত, নির্যাতিত, নিরন্ন মানুষের পক্ষে।' (২০১০ : ১০৭)। তাঁর মতে, তিনি তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই রাজনৈতিক বিষয়কে কবিতায় ধারণ করেছেন। তিনি মতবাদ বা শ্লোগানের পক্ষে নন। 'রাজনীতিতে আমার আস্থা নেই, কিন্তু সে স্লোগানের রাজনীতি।'– এই হল কবি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। তিনি ১৯৪২ থেকে ১৯৬২ সালের বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা 'মানপত্র', 'স্বদেশী কোরাস', 'দেব, সব দেব', 'গৌরী সেন', 'নায়ক', 'শেষ যুক্তি', 'ছাতাটা' ইত্যাদি কবিতাকে রাজনৈতিক কবিতা হিসেবে বিবেচনার পক্ষপাতী।

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস কাব্যের 'রাজনীতি' শীর্ষক কবিতায় আবুল হোসেনের রাজনৈতিক বিবেচনার প্রকাশ ঘটেছে। রাজনীতির ভেতরের ক্ষতগুলোকে তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। জনস্বার্থ কিংবা জনসেবার ভান করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অশোভন প্রবৃত্তির প্রদর্শনী দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। আবুল হোসেন দেখেছেন, 'একসঙ্গে/ধনী ও নির্ধন, ছাত্র কৃষক শ্রমিক মাতামাতি/করে তার খোলা মাঠে, দেখি নেতা কর্মীর চোখ/চকচক করে সে কি এক আশ্চর্য উন্মাদনায়।' রাজনীতির নেশায় সমাজ-সংসারের কর্তব্যে অবহেলা তাঁর কাছে স্বাস্থ্যকর মনে হয় নি। বিশেষ করে আমাদের রাজনীতিবিদদের ইতিহাসচেতনার অভাব তাকে আহত করেছে। আবুল হোসেনের ভাষায় :

কে শেখাবে ইতিহাস নেতাদের? তারা একবার
পেয়েছেন স্বাদ তাজা রক্তের। এখন, শিকারের
গন্ধে মত্ত, আত্মহারা। নীতির বালাই নেই কোন,
রুচির ধারে না ধার, বিশ্বাস করে না কিছুতেই,
শুধু যে ক'রেই হোক টিকে থাকতেই হবে যেন।
জীবন ও জগতের কত কিছু জানি না তা ঠিক,

তবু জানি রাজনীতি আমাদের অমোঘ নিয়তি। (‘রাজনীতি’/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

আবুল হোসেনের এই অভিব্যক্তি আমাদেরকে অসুস্থ রাজনীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘তবু জানি রাজনীতি আমাদের অমোঘ নিয়তি।’– উচ্চারণে রাজনীতির কাছে অসহায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতা রাজনীতি-অবলম্বনে রচিত হলেও তাঁর অধিকাংশ-রাজনীতি আশ্রয়ী কবিতায় রাজনীতি মিছিল-মিটিং-শোভাযাত্রা-ধর্মঘট-নির্বাচন-ক্ষমতা বদলের মতো আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিত্যাগ করে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গের দীর্ঘ আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আমরা সময় ও সমাজের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে কবিচৈতন্যের প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করেছি।

মধ্যবিত্ত মন

আবুল হোসেনের কবিতায় স্বকালের সমাজ ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ যেমন উপস্থিত, তেমনি কবি হিসেবে তাঁর উদ্ভবলগ্নের নানা সাহিত্যিক প্রবণতাকেও তিনি স্বীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে কবিতায় মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং সেই সীমা অতিক্রমের মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তনে সক্রিয় হয়ে ওঠার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ যথার্থই বলেছেন, ‘জীবনপ্রেমিক আবুল হোসেন প্রধানত মধ্যবিত্ত মানসের রূপকার এবং বৃহত্তর দেশ এবং সমাজ-জীবনের সংকট-সমস্যার চিত্র তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে।... আবুল হোসেন শুধু মধ্যবিত্তের জীবন-জটিলতা এবং বৃহত্তর দেশবাসীর জীবন-সমস্যার রূপকার নন, তিনি মূল্যবোধের বিপর্যয়েরও নিষ্করুণ সমালোচক।’ (২০১০ : ১৫৫)। ‘মূল্যবোধের বিপর্যয়ে’র রূপায়ণ করতে গিয়ে আবুল হোসেন মধ্যবিত্তের জীবন-মানসের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। একে শুধু কবির স্বকালের অস্থির রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সাহিত্য-ভাবনার সাধারণ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত না করে আমরা বরং এই প্রবণতাকে কবির জীবনদৃষ্টিরই একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখতে চাই। আবুল হোসেন নিজেই বলেছেন :

> চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজে কবিতার যে রূপান্তর তা সম্ভব হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ে ওঠার আশা আকাংক্ষা আবেগ অনুভূতিকে অবলম্বন করে। সমসাময়িক বর্ধিষ্ণু হিন্দু সমাজের মানসিক, শৈল্পিক, সামাজিক অভিযানের আদর্শ তো তার সম্মুখে ছিলই, সেই প্রেরণার দোসর হয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া। চল্লিশের তরুণ মুসলমান লেখকেরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। আর তার ফলে আমাদের সমাজে সাহিত্যে ও শিল্পে আধুনিকতার সূচনা।...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জনজাগরণের সূচনা করেছিল সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটলো সমাজচেতনার জোয়ারে। শ্রেণী সচেতনা লক্ষ্য হয়ে উঠল সকল লেখকের। (১৯৮৭ : ১৩)

চল্লিশের কবিতার রূপান্তরের বিবিধ চিহ্ন আবুল হোসেনের কবিতায় অনুপস্থিত নয়। তাঁর কবিতায়ও আমরা শ্রেণি-চেতনার নানা পরিচয় মুদ্রিত হতে দেখি। আবুল হোসেন পল্লি-প্রকৃতির সঙ্গে কখনোই নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারেন নি। ফলে তাঁর কবিতায় আমরা যে মধ্যবিত্তের পরিচয় পাই তা মুখ্যত নাগরিক মধ্যবিত্ত। তাঁর নিজের কবিতার ভাষা-প্রসঙ্গে সমর সেনের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন তিনি, বলেছেন, ‘সমর সেনের কবিতা থেকেই আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সমর সেনের কাছেই আমি আমার গদ্যের ভাবনা পেয়েছি।’ (২০১০ : ৩৪)। যাঁর কবিতার ভাষা-ভঙ্গির প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছিলেন আবুল হোসেন, সেই কবির ভাব কিংবা বিষয় তাঁকে স্পর্শ করে নি এমনটি ভাবা যায় না। আমরা জানি, সমর সেন মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতাকেই কাব্যিক অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। ‘জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি/দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,/বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর/ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা/নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।’ (১৩৮৮ : ১২৫)– এভাবেই মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী চরিত্র উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন সমর সেন। মধ্যবিত্তের দোদুল্যমান অবস্থাকে তিনি ধারণ করেছেন এইভাবে : ‘ঘুণধরা আমাদের হাড়,/শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার।’ (১৩৮৮ : ১৩২)। আবুল হোসেনের কবিতায় আমরা যে মধ্যবিত্তের উপস্থিতি লক্ষ করি, তা কিছুটা সমর সেনের মধ্যবিত্ত-ভাবনার প্রভাবজাত কি-না তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন কি আবুল হোসেনের কবিতায় যে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির প্রবল প্রতাপ লক্ষ করা যায়, তার প্রেরণাও হয়তো তিনি সমর সেন থেকে লাভ করে থাকবেন। আবুল হোসেনের মধ্যবিত্ত-ভাবনায় বিপ্লবের

চেয়ে ব্যঙ্গের তির্যক বাক্যবাণই প্রবলরূপে প্রতীয়মান। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ যথার্থই বলেছেন, '[মধ্যবিত্তের] সমস্যা-সংকট ও জীবনের গ্লানি ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও তিনি [আবুল হোসেন] ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ঠাট্টা- কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন।' (২০১০ : ১৫৫)। এই কৌতুক-আশ্রয়ী ভাষাভঙ্গির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদী চরিত্রের উন্মোচনে আবুল হোসেনের কবিতা সুতীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে।

'মধ্যবিত্ত মানসের রূপকার' আবুল হোসেন মধ্যবিত্তকে সংগ্রামে আহ্বান করেন নি, ব্যক্তিগত বিবরে ডুব দিয়ে কোন রকমে টিকে থাকার সুবিধাবাদী মানসিকতাকেই কবিতায় রূপ দিয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে সংগ্রামের স্বপ্নে বিভোর হলেও তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। তাঁর কবিতার মধ্যবিত্ত তিল তিল করে মৃত্যুকে বরণ করার কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু সেই কষ্টের বিবর থেকে বের হওয়ার মতো দৃঢ়তা তাদের নেই । তাই তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয় দিকভ্রান্ত মধ্যবিত্তের অন্ধকারে সলিতা হাতড়ানোর কথা, শূন্যতার দিকে চোখ মেলা, কিংবা মুষিক বিবরে আত্মগোপনের গল্প। এই বিবরবাসী মানুষের কণ্ঠস্বর বারবার ধ্বনিত হয় আবুল হোসেনের কবিতায়। ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রমণের শক্তি না থাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। 'ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক অধঃগতি অনিবার্য বলেই মানুষের হাহাকার কখনোই বন্ধ হয় না, ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে হতে মানুষ পাহাড়ের স্তব্ধতায় মাথা কুটে মরে; দুঃস্বপ্নের সঙ্গেই সখ্য গড়ে ওঠে তাঁর। অন্ধকারে কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারে না, কেবলি দূরবর্তী দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ বোধ করে মানুষ।' (তারেক রেজা ২০১২ : ৯৬)। এই নিঃসঙ্গ মানুষেরই মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে আবুল হোসেনের 'মধ্যবিত্ত' শীর্ষক কবিতায়। তাঁর কবিতায় চিত্রিত মধ্যবিত্ত মনকে অনুধাবনের প্রয়োজনেই পুরো কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> মাঝে মাঝে মনে হয়
> একটু একটু করে এই প্রাণ ক্ষয়
> না করলেই নয়।
> দিনে দিনে তিলে তিলে ম'রে ম'রে এই বেঁচে থাকা
> এর মানে কী!
> মগজের বহ্নি বাষ্প শহরে পল্লীতে ছড়ায়ে দিই।
>
> তারপর শীতল মুহূর্তে
> ফিরে আসি ঘরে,
> অন্ধকারে সলিতা হাতড়াই,
> শূন্য চোখে চেয়ে থাকি মুষিক বিবরে।
> আর মনে মনে আওড়াই যে যাবার যাক
> আমাদের থাক এই ম'রে ম'রে বেঁচে থাকা
> আমি ফাঁকা মধ্যবিত্ত এক। ('মধ্যবিত্ত'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেন মধ্যবিত্তের চরিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত জন্মভুমির বিবর্ণ দৃশ্যের দর্শক হিসেবে তাঁর পাত্রপাত্রীদের উপস্থাপন করেন। এই দুঃসময় থেকে মুক্তির তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ করি না তাঁর কবিতায়। স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে ডুবে গিয়ে বর্তমানকে ভুলে থাকার বা এড়িয়ে যাওয়ার নানা আয়োজন দেখা যায় তাঁর কবিতায়। অনাহারে অর্ধাহারে জীর্ণ মানুষকেও আমরা তাই কল্পনায় তাজমহল রচনায় মগ্ন হতে দেখি। হতাশায় ডুবে গিয়েও ব্যক্তিগত জীবন-সংসারের পিছুটান থেকে মুক্তি পায় না তারা। বোমারু বিমানের ভয়ে বাইরের ইজিচেয়ার গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভাবে ভীরু মধ্যবিত্ত, সাহস করে প্রতিবাদে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা ভাবে না। এই পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে– এই ভাবনায় তাদের মন খারাপ হয়, কিন্তু তারা জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য অন্যের পাশে দাঁড়ানো কিংবা মানুষের জন্য কাজ করার কথা চিন্তা করে না। 'আমি যখন বিদায় নেব এই দুনিয়া থেকে/কি যাব রেখে/ছেলের মেয়ের বৌয়ের জন্য?' (যখন বিদায় নেব'/হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস)–এই উচ্চারণকে

মধ্যবিত্তের চরিত্রের পরিস্ফুটন হিসেবেই গ্রহণ করা যায়। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা থেকে মধ্যবিত্তের চরিত্রসূচক কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

ক. আমরা গড়িয়া তুলি তৃণ দিয়ে, কাদা দিয়ে অপূর্ব অঙ্গদ :
আমাদের অনন্ত সম্পদ,
সৌন্দর্য-ক্রন্দন নীরে সৃষ্টি করি স্নিগ্ধ সরোবর,
ফোটাই লাবণ্য শতদল,
মাটিতে রচনা করি ধূলির তাজমহল। (‘মূষিক’/*নব-বসন্ত*)

খ. কেন এই নিষ্প্রাণ হতাশা?
একই অন্ধ বন্ধ কূপে ফিরে আসা বারবার।
জাল ছাড়া আর
হারাবার আছে নাকি এখনও?
আর কোন্ পিছুটান, আর কোন ভয়? (‘শেষ যুক্তি’/*বিরস সংলাপ*)

গ. আজকে একটু আরামে শুই এইখানে,
বাগানের ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা মাঝে
বাইরে বাতাস আজ ভারি মোলায়েম যেন।
ইজিচেয়ারটা বাইরে আন এজেহার।

কী সুন্দর আজকের সোনালী সকাল,
বাইরে বেরিয়ে হাত পা ছাড়ার এই তো সময়।
তা নয়, কী বলিস তুই হতভাগা,
বোমারু বিমান উড়ে ঐ আসে আসে।

ইজিচেয়ারটা তুলে রাখ তবে এজেহার। (‘বাস্তবিক’/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. ইয়ার দোস্ত বক্‌শী নিয়ে
সমস্তক্ষণ বকবকিয়ে
কাটিয়ে দিলাম সারা জীবন,
কাউকে কিছু দিতে হবে
ভাবার সময় পেলাম কখন? (‘যখন বিদায় নেব’/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঙ. আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগি,
হারাই মনের জোর হামেশাই মাঝপথে। দু’পা
এগোই তো তিন পা পিছোই, পেরোতে পারি না কাঁটা।
ক্ষত নিয়ে ফিরে আসি বার বার নিজের বিবরে। (‘উৎসর্গ, ছেলেমেয়েদের’/*আর কিসের অপেক্ষা*)

আবুল হোসেন মধ্যবিত্তের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গিয়ে নিজের দিকেই ফিরে তাকিয়েছেন। ব্যঙ্গের ছলে মধ্যবিত্তকে তার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলসহ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন তিনি। সৈয়দ আলী আহসান যথার্থই বলেছেন, ‘প্রতিদিনকার জীবনযাপন এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের জীবনযাত্রা। একজন লেখক এই পরিমণ্ডলের বাইরে কখনও যেতে পারে না। তাকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে সমাজ থেকে, জীবন থেকে এবং ক্রমান্বয়ে ইতিহাস থেকে এবং কল্পনা থেকেও।’ (২০০৩ : ৭৭)। আবুল হোসেন যে বিত্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন, তা সকল বিবেচনায়ই মধ্যবিত্ত। তাই তাঁর কবিতায় আমরা মধ্যবিত্তের নানা পরিচয় উন্মোচিত হতে দেখি। এই কাব্যিক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আমরা আবুল হোসেনের মধ্যবিত্ত মনকেও অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

উদ্বাস্তুবোধ

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আবুল হোসেনকে ভুবনের নানা ঘাটে নোঙর করতে হয়েছে। বাবা পুলিশ বিভাগের কর্মকতা হওয়ার কারণে শৈশব থেকেই তিনি বাসা-বদলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন তিনি। কোন জায়গায় পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল ও বন্ধুস্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে না হতেই তাঁকে যেতে হয়েছে নতুন জায়গায়। এই ঘন ঘন স্থান-বদলই বোধকরি তাঁর মনে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দিয়েছে। ছেলেবেলায় খেলাধুলায় অভ্যস্ত হলেও খুব বেশি বন্ধুবান্ধব তৈরি হয় নি তাঁর। বিশেষ করে সেই ছেলেবেলায় লেখক হয়ে ওঠার স্বপ্ন তাঁকে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে, যেখানে একা না হলে অন্য রকম হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাঁর আত্মচরিতমূলক রচনায় তিনি যাঁদের কথা স্মরণ করেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই লেখক কিংবা তাঁর চাকরিসূত্রে সম্পর্কিত। নিজেকে উদার ও উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রয়োজনে বন্ধু অন্বেষণ করেন নি তিনি। যা বলার তা যেন নিজের কাছেই অকপটে বলেছেন এবং সেই কথামালা কবিতায় গেঁথে দিয়েছেন। আবুল হোসেনের উদ্বাস্তুবোধের বীজ, বলা যেতে পারে, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যেই নিহিত।

আবুল হোসেনের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন হয়েছে কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া এবং কলকাতায়। কলকাতায় ছাত্র থাকাকালেই শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন তিনি। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সাহিত্যপত্রিকা ও লেখকবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চাকুরিজীবনের শুরু কলকাতা হলেও দেশভাগের পর তিনি চলে আসেন ঢাকায়। দেশভাগ কবির শিল্পের ভূখণ্ডেও ফাটল ধরিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কবি : 'আকস্মিক দেশবিভাগ এসে আমার বেশ কিছু ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে এই পরিকল্পনাটিও ভেস্তে দিল। এলোমেলো হয়ে গেল আমার জীবনই।' এই বোধও কবির মনে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দিয়ে থাকবে। পরবর্তী সময়ে চাকরিসূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করেছেন তিনি। তাঁকে বিদেশেও অবস্থান করতে হয়েছে পেশাগত কারণে। ফলে কোথাও শেকড় প্রোথিত হয় নি তাঁর। এই শেকড়হীনতা তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যে নিক্ষেপ করেছে। এই নিঃসঙ্গতা থেকেও তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে উদ্বাস্তুবোধের।

পুঁজির বিকাশের ফলে মানুষের চেতনাজগতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল আবহ অনুপস্থিত। বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতাকে আবাহন করা আধুনিক মানসতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। যন্ত্রের ওপর নির্ভরতার কারণে মানবিক সম্পর্ককেও যান্ত্রিক উপায়ে পরিমাপ কিংবা মূল্যায়ন করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। নিঃসঙ্গতার শেকড় অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিল্পসমালোচক অশ্রুকুমার শিকদার বলেছেন, 'শিল্পবিপ্লবের ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে, মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার শ্রম থেকে, তার বিশ্রাম থেকে, নিজের গোষ্ঠী থেকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাতিস্বিক সত্তা থেকে, তার প্রেম আর অনুরাগের অনুভূতি থেকে। যন্ত্রকে নিজের সেবায় ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্রের দাস, মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক।' (১৯৯৩ : ২১)। সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে, আমাদের বিশ্রামেও নেই সৃজনশীল আরাম ও আনন্দ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রের আশির্বাদে অবসরের সময়ই কেবল দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে অবসরযাপনের মানসিকতার। 'উৎকণ্ঠা আর হতাশা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আধুনিক মানুষ শিকড়হীন, সংযোগহীন, একলা। বিচ্ছিন্ন আর নিরর্থকতাবোধে পীড়িত এই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যয়ে আর প্রমূল্যে।'– অশ্রুকুমার শিকদারের (১৯৯৩ : ২২) এই মন্তব্যের আড়ালে আধুনিকতার অন্তঃসারশূন্যতা ধ্বনিত হলেও এই শূন্যতা থেকেই মানুষ জীবনকে অর্থহীন ভাবতে শেখে, যার পরিণাম হিসেবে জন্ম নেয় উদ্বাস্তুবোধের। সঙ্গত কারণেই আবুল হোসেনের নিঃসঙ্গতার শেকড়ে এই ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উপাদানসমূহ জল সরবরাহ করে থাকবে, যা ক্রমশ তাঁকে উদ্বাস্তুভাবনায় আচ্ছন্ন করেছে।

আবুল হোসেনের নিঃসঙ্গতাকে জনবিচ্ছিন্নতা বা একাকিত্বের সমার্থক ভাবলে এই নিঃসঙ্গতার মর্মার্থ অনুধাবন সম্ভব হবে না বলে আমরা মনে করি। নিজের কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করতে না পারার বেদনাও তাঁকে নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন করেছে। অর্থাৎ, সৃষ্টিশীলতার প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলেই তিনি কবিতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যা তাঁকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, '...শুধু সঙ্গহীনতাকেই নিঃসঙ্গতা বলে না, মনকে নিবিষ্ট করার উপায়ের

অভাবকেই বলে নিঃসঙ্গতা।' (১৯৯১ : ৭)। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আবুল হোসেন দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগে ভুগেছেন। দীর্ঘ সময় একাকী বিছানায় কাটিয়েছেন তিনি। এই একাকিত্ব থেকেও উদ্বাস্তবোধের জন্ম নেওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, অসুস্থতার কারণে তাঁর বারবার পড়াশোনা ও পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে ছাত্রজীবন দীর্ঘ হয়েছে তাঁর। অসুস্থ মানুষ নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শেখে। সেই বিচ্ছিন্নতাকে তিনি বারবার কবিতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিচের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আবুল হোসেনের উদ্বাস্তবোধের স্বরূপ অনুধাবন করা যেতে পারে :

ক. ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিলাম দেহ।
সারাটি দুপুর বসে রইলাম ঘরে।
তুমি বলেছিলে আসবে আজ একটায়। এলে না। ('প্রতীক্ষা'/নব-বসন্ত)

খ. সিংহের মেকাপে যত শেয়ালেরা আসর জমায়।
আমিও তাদের সঙ্গে উঠি বসি, না ভেবেই দিই সায়
(সহজ ব'লেই নয়, এটাই সুবিধে) কি কুক্ষণে
জন্মেছি জানি না, নামতে হবে এই পার্টে আমাকেও।
এর চেয়ে স্টেজ ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল না কি শ্রেয়! ('এরণ্ড'/*বিরস-সংলাপ*)

গ. থামবে যেখানে সেখানে কি কেউ
গরম চায়ের বাটি হাতে ক'রে
ঘাটে ব'সে আছে সারা দিন ধ'রে?
সেখানে কি কেউ অচেনা শহরে
হাত ধ'রে নিয়ে যাবে ঘরে? ('বাঁচব কি'/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. আমার মন এক ছোট দ্বীপ :
উঠেছে সমুদ্র থেকে জানি না কখন
লতা নেই পাতা নেই, নেই ঘন বন
শুনিনি পাখির ডাক বাঘের গর্জন–
মানুষ তো আরও দূর। ('দ্বীপ'/বিরস সংলাপ)

ঙ. আমি চিরদিন
সঙ্গীবিহীন
পথে পথে ঘুরে
মরেছি একাই। ('নসিব আমার'/*এখনও সময় আছে*)

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে কাব্যের 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা' কবিতাটিতে আবুল হোসেনের উদ্বাস্ত-মন চমৎকারভাবে মুদ্রিত হয়েছে। বয়সের কারণে মানুষের মনে মৃত্যুচিন্তা বাসা বাঁধে। সেই মৃত্যুভাবনায় আচ্ছন্ন মন স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ে। স্মৃতির ভেতর ডুবে যেতে যেতে মানুষ বাস্তব ও বর্তমান থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। চারপাশের দৃশ্যমান ও অনুভূত জগতের সঙ্গে এই দূরত্ব থেকেও মানুষের মনে উদ্বাস্তবোধের জন্ম নিতে পারে। মানুষের বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই তার পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার ইচ্ছে প্রবল হতে থাকে। সেই অর্থে মানুষের মৃত্যুচেতনার গভীরে তাঁর জীবনচেতনারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবি আবুল হোসেন যখন নিজের বয়সের দিকে তাকিয়ে দূর অতীতকে নিকটবর্তী করতে চাইছেন, তখন জীবনের প্রতি যৌবনের প্রতি গভীর প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমের গভীরতর অনুভব থেকেও মানুষের মনে উত্থিত হতে পারে উদ্বাস্তবোধের। মানুষের প্রত্যাশার উচ্চতা যখন প্রাপ্তির সমতল ভূমিকে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মনের ভেতর সৃষ্টি হতে থাকে ভয়ানক শূন্যতা। এই শূন্যতা থেকেও মানুষ পীড়িত হতে পারে উদ্বাস্তবোধে। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করা হল :

যখন বয়স ছিল দলবেঁধে তরুণ বন্ধুরা
আসত মৌমাছির মতো, কখনও একাকী। সেই এক

ওড়ার সময়, মাটিতে পা পড়ে না। আর এখন
যে যার বাজারে গেছে। পাংশু আঁশটে ঘরে বাতি জ্বেলে
বসে আছে যক্ষের মূর্তির মতো একা একজন
নিঃশব্দ বিনিদ্র পাহারায়। অথবা বুদ্ধের মূর্তি
সে, নির্বাণ প্রার্থনায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন। শব্দ নেই,
ঘরময় কালের যাত্রার স্মৃতি গম গম করে। ('সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

আবুল হোসেনের শেষ পর্যায়ের কবিতায় মৃত্যুচেতনার প্রকাশ লক্ষ করার মতো। এই মৃত্যুভাবনা থেকে তিনি নৈঃসঙ্গ্যে আচ্ছন্ন হয়েছেন, যা তাঁর মনকে উদ্বাস্তু করে তুলেছে। একে একে তাঁর কাছের মানুষেরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। মৃত্যু এসে দাম্পত্যজীবনের সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়েছে। এইসব ঘটনায় জীবনের শেষ ঘণ্টা শোনার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়েছেন তিনি। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় কাতর কবির কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে, অনেক তো হল, আর কত। কিন্তু পথিক তো জানে না, পথ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। আবুল হোসেনের কবিতায় বারবার এসেছে পথের প্রসঙ্গ। এই পথকে তিনি সত্যান্বেষণের প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবুল হোসেন বলেছেন, 'আমার কাছে পথ মানে অন্বেষণ। ১৯৭৮-এ পৌঢ়ত্বের কাছে এসে একটা কবিতা লিখেছিলাম– *অন্য পথ।* বলেছিলাম *ওরা সব যাবে বামে*– কিন্তু আমি খোলা পথের সন্ধান করেছিলাম। আমি চিরকাল অন্বেষণ করে যাবো। কিসের অন্বেষণ? সেই আমার অন্য পথ।' (২০১০ : ৩৬)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!/এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে?' (১৯৭১ : ২৪২)। আবুল হোসেন অন্য পথে চলতে চান। সেই পথ কোথায় গিয়ে মিশেছে তা জানেন না কবি। এই অন্য পথ, অজানা ও অচেনা পথের যাত্রী যিনি, তাঁকে তো উদ্বাস্তু বলতেই হয়। এই উদ্বাস্তুচেতনায় জীবন ও শিল্পের সত্য আবিষ্কার করার অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে বলে এই অনিকেত মানসতাকে উপভোগই করেছেন আবুল হোসেন।

আবুল হোসেনের কবিতায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অনুরণন লক্ষ করার মতো। এমন অনেক পারিবারিক ঘটনাকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন সাধারণভাবে যা কবিতা হয়ে ওঠা কঠিন। কিন্তু আবুল হোসেনের আন্তরিক উচ্চারণ সেই সব ঘটনায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। ফলে তা পারিবারিক বা দৈনন্দিন ঘটনার সীমা ছাড়িয়ে অভিনব ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। মনজুরে মওলা বলেছেন, 'আবুল হোসেনের কবিতায় বার-বার তাঁর নিজের জীবনের কথা শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাবার শহীদ হবার কথা, তাঁর স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যুর কথা, তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর বন্ধুজনের কথা, ছোটোখাটো নানা ঘটনার কথা। নিজের একান্ত কথাকে তিনি সবার করে তুলেছেন।' (২০১০ : ৫৩)। একটি কবিতায় আবুল হোসেন এই প্রবণতাকে ধারণ করেছেন এইভাবে :

কখন নেপথ্যে সংসার
ঢুকেছে লেখায় তার,
চমকে দেখেছে সে মাঝে মাঝে
অথবা দেখেও চোখ
হয়েছে ফিরিয়ে নিতে।
সন্ধি সে করেছে পায় পায়। ('শত বর্ষ পরে'/*বিরস সংলাপ*)

শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। *আর কিসের অপেক্ষা* কাব্যের একটি কবিতার নাম 'ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে'। এই কবিতায় নিজের স্ত্রীর হাতে রোপণ করা গাছের প্রতি কবির অপরিসীম মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গাছের প্রতি সন্তানের মতই স্নেহ বর্ষণ করেছেন কবির স্ত্রী। আবুল হোসেন বলছেন :

সিজার, এই গাছগুলো থাক, কেটো না, অযত্ন করো না,
জানি 'লন'টা বেজায় হাবিজাবি হ'য়ে আছে।
তা হোক, এখানে আসার পর
ওগুলো লাগিয়েছিল সে নিজের হাতে।

তোমরা যেমন তাকে পেয়েছিলে
ওরাও পেয়েছে তার ছোঁয়া, মায়া,
চোখ থেকে ঝরে পড়া মমতা জন্ম থেকে,
বেড়ে উঠেছে, বড় হয়েছে,
ঠিক তোমাদেরই মতো। (‘ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে’/*আর কিসের অপেক্ষা*)

এই কাব্যের ‘উৎসর্গ, ছেলেমেয়েদের’ শীর্ষক কবিতায়ও এসেছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, বিশেষ করে কবির স্ত্রীর কথা। স্ত্রীর মৃত্যুকে ভেঙে পড়া কবির মর্মবেদনা এই কবিতায় ধরা পড়েছে। সন্তানদের উদ্দেশে কবি বলছেন, ‘তোমাদের মা তো পেটে ধরেছিলেন। বুকের দুধ/দিয়ে বড় করে যতটুকু রক্ত তার ভেঙে পড়া/অশক্ত শরীরে ছিল সবটা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে/নিজেকে নিঙড়ে চলে গেলেন অকালে; একেই কি/বলে ফলের অপেক্ষা না করে নিজের কাজ করে যাওয়া?’ (উৎসর্গ, ছেলেমেয়েদের’/*আর কিসের অপেক্ষা*)। এভাবেই আবুল হোসেন ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভবকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

কবিতায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা থাকলেও আবুল হোসেন সেই প্রসঙ্গকে কবিতা করে তুলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আমার কবিতায় অনেক আছে। তবে আমি মনে করি, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কবিতা যদি শেষ পর্যন্ত সার্বিক হয়ে না ওঠে তাহলে তা কবিতা হয় না। একজনের ব্যক্তিগত অনুভূতি অন্যজনের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই– তাহলেই তা কবিতা হয়ে উঠবে।’ (আবুল হোসেন ২০১০ : ৩২)। আমাদের বিবেচনায়, আবুল হোসেন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে কবিতা লিখলেও তাঁর মধ্যে তিনি ব্যক্তিক আবহের সীমা-অতিক্রমী শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ‘পরিবারের স্বজনদের নিয়ে যখন আবুল হোসেন কবিতা লিখেছেন, দেখতে পাই তখন জীবনের কোনো গূঢ় বাস্তবতাকেই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন।’ (মারুফ রায়হান ২০১১ : ২০২)। কেবল ব্যক্তিগত জীবন কিংবা সম্পর্ককেই কবিতায় ধারণ করেন নি তিনি, তাঁর স্বকালের অনেক শিল্পস্রষ্টাকেও তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অনেক কবিতাই আমরা লক্ষ করি, তিনি যাঁকে কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন, তাঁরই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ও শৈল্পিক সম্পর্কের নানা দিক উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। কখনো সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়, যাঁদের মধ্যে কালিদাস, সক্রেটিস, ভল্টেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ফররুখ আহমদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, আবু রুশ্‌দ, শওকত ওসমান, রশীদ করীম, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক, শিশির ভাদুড়ী, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, রফিকুন নবী উল্লেখযোগ্য। কেবল শিল্পী বা সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই কবিতায় ধারণ করেন নি আবুল হোসেন, অনেকের সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই প্রেরণাকেও পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন।

আবুল হোসেনের কবিতায় মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন লক্ষ করি। বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার আলোকে আমরা তাঁর কবিতার বৈষয়িক গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। তিনি কবিতার বিষয়কে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতাকে তো কোন একটা বিষয়ে ভর দিয়েই দাঁড়াতে হয়। আমরা কেবল আবুল হোসেনের কবিতার সেই আশ্রয়েরই স্বরূপ অনুধাবন করতে চেয়েছি। কবিতার বিষয়কে কবিতা থেকে আলাদা করে দেখলে সেই বিষয়ের সৌরভ কিংবা গৌরব কিছুই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর কবিতায় গৃহীত বিষয়সমূহ কবিতা হয়েছে উঠেছে কি-না, তা অনুধাবনের জন্য কবিতার সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন, যেখানে আধার ও আধেয়ের মাঝখানে কোন দেয়াল কল্পনা করার সুযোগ নেই। এমন কি সামগ্রিক আলোচনায়ও কবিতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। স্বস্তির বিষয় এই যে, আবুল হোসেনের কবিতার মর্মে প্রবেশে ব্যর্থ হওয়ার আক্ষেপও তাঁর কবিতা পাঠের মতোই আনন্দদায়ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকরণ

ব্যক্তিপ্রতিভার অন্তর্গত অনুভব কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শব্দবন্দি হলে তাকে কবিতা বলা যাবে, তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হতে পারে। বিষয় ও প্রকরণের আন্তঃসম্পর্কের ব্যাকরণ নিয়েও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কবিতার আলোচনা সর্বদাই স্থির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করে কি-না সে-বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। উপস্থাপন-ভঙ্গিকে বাদ দিয়ে বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় কবিত্বশক্তির পরিচয় যেমন অস্পষ্টই থেকে যায়, তেমনি বিষয়-নিরপেক্ষ প্রকরণকলার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন থেকেও একজন কবির ব্যক্তিত্বখচিত ভূখণ্ডের চিত্রায়ণ ও চিহ্নায়নের প্রয়াস অর্থহীন। ভাব ও ভাষার বন্ধন বিবেচনা করেই কবির শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতায় আধার ও আধেয়ের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। এর কোন একটির স্বতন্ত্র আলোচনায়ও তাই অন্যটির প্রাসঙ্গিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আবুল হোসেনের কবিতার প্রকরণ-কৌশল আলোচনায় আমরা তাঁর কবিতার বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব না। বিষয়কে কোন বিশেষ অবয়ব দেওয়ার মাধ্যমে আবুল হোসেন তাঁর বিবেচনাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, আমরা তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনেই একজন স্রষ্টাকে শিল্পপদ্ধতির শরণ নিতে হয়। শিল্পপদ্ধতি অবলম্বনে একজন কবির শিল্পচৈতন্যের স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা লক্ষ করা গেলেও সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, এই প্রক্রিয়ার প্রকাশ কবির উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর অভিব্যক্তিকে অভিনব করে তোলার প্রয়োজনে তিনি শিল্পপদ্ধতির প্রয়োগ করেন। বিষ্ণু দে যথার্থই বলেছেন, 'মিডিয়ম্ বা শিল্পপদ্ধতিকে যে কী ক'রে শিল্পী প্রকাশ দেবে সে-প্রশ্ন না-তুলে বলা যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে তার শিল্পপদ্ধতি,– মানস ও শিল্পবস্তুর জ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্য দিয়ে।' (১৯৯৭ : ৩০)। আবুল হোসেন প্রকরণ-সর্বস্ব শব্দবন্ধের সম্মোহন এড়িয়ে ভাব ও অনুভবের অনুকূল করণকৌশলেই নিজেকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কবিতার মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষায় তিনি সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকরণের আনুগত্য স্বীকার করে তিনি বলার কথাটিকে জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলেন নি। কবিতার শরীর-গঠনে তিনিও কর্মঠ শ্রমিক, কিন্তু সেই শ্রম তিনি ব্যয় করেছেন কাব্যদেহে লাবণ্য-সঞ্চারের কাজে। তাঁর কবিতা তাই অধরা, দুর্গম কিংবা দূর দ্বীপবাসিনী নয়। একটি সাক্ষাৎকারে আবুল হোসেন বলেছেন, 'অনেক ভেবে অনেক খেটে আমি লিখি। স্থপতি যেমন হাতুড়ি বাটালি নিয়ে একটু একটু করে পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে শব্দকে, বাক্যকে ভেঙেচুরে ছেনে বাছাই করে আমি কবিতার রূপ দিতে ভালোবাসি।' (২০১০খ : ১১)। আবুল হোসেনের এই মন্তব্যে তাঁর শিল্পচেতনার পরিচয় মুদ্রিত হলেও তাঁর কবিতার শরীর স্পর্শ করলেই আমরা অনুভব করি, সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করার কঠিন কাজটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। তাই 'কত ঘাম ঝরলো, কত বিনিদ্র দিন রাত্রি কাটলো এক একটা কবিতার শরীর গড়ে তুলতে', সেই খবরটি তিনি পাঠককে জানাতে চান না। আবুল হোসেনের কবিতার অবয়ব তেমন ভারী নয় বলেই তা অনায়াসে হালকা হাওয়ায় ভেসে ভেসে পাঠকের চিন্তা ও কল্পনার সমগ্র আকাশে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এই ছড়িয়ে পড়া শৈল্পিক অভিব্যক্তি কেবল উড়ে উড়ে দূরেই হারিয়ে যায় না, তা পাঠককে জড়িয়ে ধরে তার নিকটবন্ধু হয়ে ওঠে।

গঠনবৈশিষ্ট্য

আবুল হোসেন কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের যে ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছেন তা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাতন্ত্র্যখচিত। স্বকালের অন্যান্য কবিপ্রতিভার কাব্যচিন্তা ও শিল্পভাবনার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন কবি, কিন্তু নিজের চলার পথটি তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন নিজের মতো করে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বিক্ষুব্ধ বাস্তবতার নানা চিহ্ন তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় উপস্থিত, কিন্তু তিনি ইতিহাস কিংবা উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ কিংবা তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করেন নি, বরং ঘটনার অভিঘাত তাঁর চৈতন্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেই আলোড়নকে আত্মচিহ্নিত করণকৌশলে ধারণ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রবল প্রভাব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বাংলা কবিতাকে যে নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিরিশের কবিরা, কিংবা রবীন্দ্রপ্রভাবিত প্রকরণ-কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে কাব্যদেহে যে ব্যতিক্রমী আভরণ পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন 'রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক' কবিরা, তাঁদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি আবুল হোসেন, আবার তিরিশের 'জনবিচ্ছিন্ন কাব্যধারা'র বিপরীত স্রোতে নৌকা ভাসিয়েছিলেন চল্লিশের যে প্রগতিকবিরা, তাঁদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে চান নি তিনি। তাই আবুল হোসেনের কবিতায় আমরা কোন বিদ্রোহী শিল্পিসত্তার পরিচয় পাই না কিংবা স্বকালের সহযোদ্ধাদের রাজনৈতিক দীক্ষায় আপ্লুত জনসম্পৃক্ত শিল্পচৈতন্যের প্রতি পক্ষপাতেরও কোন চিহ্ন খুঁজে পাই না। 'আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।'– *অগ্নি-বীণা*র 'বিদ্রোহী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৯৮৩ : ৮) এই উচ্চারণে বিদ্রোহের উত্তাপ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আবুল হোসেন বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লবের স্পন্দনকে আড়াল রেখে নিজের নাচের ছন্দটি নিজেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন এবং মুক্ত জীবনের আনন্দকেও তিনি অন্যভাবে উদ্‌যাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন, "নজরুলোত্তর আধুনিকতার ধারক এই কবি 'ভাবের ছলছলানি' (তাঁর ভাষায়) এড়িয়ে কবিতাকে করতে চেয়েছিলেন কৃশ, ঝকঝকে, মুখের ভাষা তথা জন-সাধারণের কাছাকাছি।" (১৯৯৪ : ২১৪)। তাই তাঁর কবিতায় আমরা অন্যরকম একজন কবির দেখা পাই, যিনি পূর্বসুরী কোন কবিকে প্রত্যাখ্যান করেন না, স্বকালের কোন কবি কিংবা কাব্যান্দোলনে সমর্পিত হতে চান না, যিনি কবিতায় নিজেকেই খুঁজে ফেরেন। আবুল হোসেন বলেছেন, 'আমি নিজের পথটা খুঁজতে চেয়েছিলাম। সেই অন্বেষণের ফলশ্রুতি আমার কাব্যরীতি।' (২০১০খ : ১৪)। *নব-বসন্ত* কাব্যের একটি কবিতায়ও কবি আত্মখচিত একটি পথের অন্বেষণে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন :

> পথটা সোজা না বাঁয়ে না ডাইনে
> জানিনে জানিনে জানতে চাইনে।
> শুধু জানি এই সেটা নিজেকেই
> নিতে হবে চিনে যথা সময়েই ('দিক-নির্ণয়'/*নব-বসন্ত*)

নিজের পথটি খুঁজে পেয়েছিলেন আবুল হোসেন। এই পথ খোঁজার প্রয়োজনেই তিনি বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু পথের ক্লান্তি ভুলে গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রয়াসে অনড় ছিলেন কবি। তাঁর কবিতা পাঠে তাই অন্য কোন কবিকে মনে পড়ে না, আমরা আবুল হোসেনকেই নানাভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি।

আবুল হোসেন গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য দেয়াল রাখতে চান নি। কবিতার ভাষাকেও তিনি দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতার বাইরের কোন কাব্যিক আবহে বেঁধে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। 'আগে কবিতাকে প্রথমে হয়ে উঠতে হতো পদ্য; গদ্য থেকে বেশ দূরে থেকে বাঁচিয়ে চলতে হতো তার কাব্যত্ব। তবে গদ্যের সাথে কবিতার শত্রুতা নেই, বরং পদ্যের সাথেই প্রকৃত কবিতার বিরোধ বেশি; কারণ পদ্য প্রতিভাস সৃষ্টি করে কবিতার, মুখোশকেই প্রতিভাত করে মুখ ব'লে; দেহকেই ঘোষণা করে আত্মা ব'লে। এখন গদ্য হয়ে উঠেছে কবিতার আত্মপ্রকাশের মুখ্য মাধ্যম। তাই এখন আর রচনাকে প্রথমে পদ্য হ'তে হয় না, সরাসরি হ'তে হয় কবিতা।' (হুমায়ুন আজাদ ২০০৫ : ৬২)। আবুল হোসেন কবিতার সঙ্গে গদ্যের সম্পর্কের গভীরতা বিষয়ে সজাগ ছিলেন বলেই পদ্যের প্রলোভনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। নাগরিক জীবনের চালচিত্রই তাঁর কবিতায় মূর্ত হতে দেখি। এই জীবনকে রূপায়ণের উপযুক্ত ভাষাভঙ্গিও তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেছেন, 'তিনি নাগরিক কবি, প্রথম তাঁর চিন্তায়, দ্বিতীয় তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতে।' (২০১১ : ১৫)। জীবনের ছোট ছোট অনুভব ও উপলব্ধিকে তিনি ছোট আকারেই ধারণ করতে

চেয়েছেন, যার ব্যঞ্জনা গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। গদ্য ও পদ্যের সুস্পষ্ট বিভাজন জীবনপ্রবাহের অকৃত্রিমতার অনুকূল নয় বলেই মনে করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শিল্প-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

> আধুনিক বাংলা কবিতা চিরকাল যা করেছে, তা হচ্ছে গদ্যকেই কবিতা ক'রে তোলা। আসলে তো জীবন কবিতা ও গদ্যে বিভক্ত নয়, ওতপ্রোত। কবিতা ও গদ্যের রূপপ্রকল্পই সেদিক থেকে দুই কৃত্রিম প্রবাহ। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য এই কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে কবিতাকে গদ্যের যথাসাধ্য কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছে, গদ্যের ভিতরে চাচ্ছে কবিতার সঞ্চার। আবুল হোসেন এই পথেরই সচেতন যাত্রিক কবিকর্মী। (১৯৯৪ : ২৯৬)

আবুল হোসেন হালকা চালে কথা বলেন কিন্তু সেই চালের আড়ালে যাপিত জীবনের এমন সব অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে, যা সহজ সৌন্দর্যেই শক্তিশালী অনুভবের দ্যোতক হয়ে ওঠে। তিনি নিজেকে আধুনিক মধ্যবিত্তের একজন হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন এবং এই জীবনেরই ভাব, ভাষা কিংবা বৈদগ্ধ্যকে ধারণ করতে চেয়েছেন কবিতায়। এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি :

> আমি কাব্য এবং গদ্যের পৃথক ভাষায় বিশ্বাস করি না। শুধু তাই নয়, আমরা যে ভাষায় ঘরে, বাইরে, বৈঠকখানায়, অফিস-আদালতে কথা বলি, গল্পসল্প করি, সেই ভাষাতেই কবিতা লিখতে চেয়েছি। আধুনিক নাগরিক শিক্ষিত মানুষ যা করে, যা ভাবে, যেমন ভাবে, কবিতায় আমি তার প্রতিফলন দেখতে চাই। (আবুল হোসেন ২০১০খ : ১২)

একটি কবিতায় আবুল হোসেন কবির সঙ্গে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রচনার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, একজন কবি যে কোন সময় যে-কাউকে ছন্দে বাগিয়ে নিয়ে বাক্যবন্ধে বেঁধে ফেলতে পারেন। সেই বন্ধনের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> পদ্য শিকারে বেরিয়ে
> মিলের দেউড়ি পেরিয়ে
> ঝাঁপ দেবে টানা গদ্যে,
> নয় তো বা মাঝে মধ্যে
> গদ্য পদ্য মিশিয়ে
> খিঁচুড়ি রাঁধবে ঘি দিয়ে। ('কাব্যের গরু খোঁজা'/*এখনও সময় আছে*)

আবুল হোসেন তাঁর ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে রাখতেই চেয়েছেন, কিন্তু সেই গোছানোর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে দৈনন্দিন দাম্পত্য-জীবনেরই পরিচিত আবহ। কবিতায় তিনি যেমন বারবার পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন, তেমনি সেই রূপায়ণের পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেছেন প্রতিদিনের পরিচিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমীকৃত করে :

> আমার ভাবনাগুলিকে যদি
> সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারতাম
> যেমন ক'রে পোকা ছাড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে
> তাকের পর তাক আলমারিতে বইগুলো তুলে রাখো তুমি
> নিপুণ হাতে
> অথবা রোদে শুকনো শাড়িগুলো
> থাকে থাকে পাট ক'রে উঠিয়ে রাখ আলনায়
> কেউ জানে না কখন।
>
> যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম
> যেমন ক'রে টবের গাছগুলিতে পানি ঢেলে
> নিড়েন দিয়ে রোদ লাগিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোল তুমি, ('আমার ভাবনাগুলি'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেন তাঁর ভাবনাকে কেবল সাজিয়ে রাখার কথাই ভাবেন না, সেই সঙ্গে তা রক্ষার জন্যও সচেতন প্রয়াস প্রদর্শন করেন। মুরগী যেমন করে তার ছানাগুলোকে বাজের কিংবা চিলের হাত থেকে রক্ষা করে, সেভাবেই তিনি তাঁর অনুভব সংরক্ষণে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চান। আর ভাবনার প্রকাশ কিংবা রূপায়ণে তাঁর যে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি তাও আবার

শিল্পতত্ত্বের বিশেষ কোন ঘরানায় সমর্পিত নয়, তিনি বরং তাঁর প্রিয় মানুষের বুনন-নৈপুণ্যের অণুকরণে নিজেকে নির্মাণ করতে চান :

যেমন ক'রে আঙুলে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
উলের বল খুলে খুলে কার্ডিগান মোজা ব্লাউজ বোন তুমি
গুটিপোকার মতো স্বচ্ছন্দে আপন মনে।
নয় তো শাদা শাড়িতে পেটিকোটে কি রুমালে
লতা পাতা ফুল তোল লাল নীল হলদে রেশমী সুতোয়। ('আমার ভাবনাগুলি'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেন মনে করেন, কবিতা অসাধারণ কিছু নয় বলেই এর শব্দ-সন্নিবেশ এবং বাক্যসংগঠনে অসাধারণত্ব আরোপ করার চেষ্টা অর্থহীন। কবি বলেছেন, 'সাধারণ ভাষাকেই বাছাই করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যবহার করেন কবি। তাই প্রথম থেকেই আমি কবিতার ভাষাকে সাধারণ লোকের মুখের ভাষার কাছাকাছি আনবার চেষ্টা করেছি।' (২০১০খ : ১৪)। আবুল হোসেনের এই চেষ্টার স্বাক্ষর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই লক্ষ করা যাবে। কবিতার বিষয় নির্বাচনে তিনি বিশ শতকের চল্লিশ দশকের প্রধান প্রগতি-কবিদের মতোই স্বকালের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার শরণ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্মে কবিতাকে রাজনৈতিক শ্লোগান করার প্রয়াস অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট : 'কবিতার জন্যই আমি রাজনীতির কথা ভেবেছি। রাজনীতির জন্য কবিতা লিখিনি। কর্মী এবং কবির মধ্যে যদি কোনো বৈষম্য না থাকে তো ভালোই, তবু আমি কবি হতেই চেয়েছি।' (২০১০খ : ১৩)। ফলে তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চৈতন্যের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও রাজনীতির উত্তাপ তাঁর কবিতার শরীরে অনুভব করা যাবে না। 'সমসাময়িক ঘটনাবলী তো আমি এড়িয়ে যাই-নি, বরং কবিতার উপাদান হিসেবে তাদের হরহামেশাই ব্যবহার করেছি।'– এই ঘটনাবলির মধ্যে রাজনীতি অন্যতম অনুষঙ্গ হলেও তাঁর কবিতায় শ্লোগানের বলিষ্ঠতা অপেক্ষা অর্ন্তধ্যানের নিবিড়তা কিংবা নিগূঢ়তার পরিচয় পরিস্ফুট। কবি শামসুর রাহমান উল্লেখ করেছেন যে, আবুল হোসেনের কবিতায় কথ্যছন্দ এবং বাংলা বাগধারার সফল প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। (২০১১ : ১৩)। এই কথ্যছন্দ ও বাগবিধি প্রয়োগের ফলে আবুল হোসেনের কবিতা ভারমুক্ত হলেও তাতে ভাবের অনুরণন অনুপস্থিত নয়।

আবুল হোসেনের কবিতার গঠনবৈশিষ্ট্য আমাদের কথনকৌশলেরই অনুরূপ। তাঁর সমগ্র কবিতায়ই তিনি এই বৈশিষ্ট্য অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁর সমগ্র কবিতার কিংবা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের স্বতন্ত্র আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মেয়ে' কবিতাটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। এই কবিতায় বাঙালি নারীর দিনযাপনের গ্লানি ও আত্মপ্রকাশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন কবি। নারীর কল্পনার জগতের সঙ্গে বাস্তবের প্রভেদও এই কবিতায় মুদ্রিত। কবিতাটি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> আবুল হোসেনের 'বাংলার মেয়ে' কবিতাটি যখন 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ পায় তখন রচনা-রীতির স্বাতন্ত্র্যে তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের ঘরোয়া শব্দগুলো একটি সহজ নিরাভরণ নিঃসংশয়ে এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু অতিকথন ছিল যা এ-ধরনের ভঙ্গি নির্মাণের জন্য প্রায় অপরিহার্য বলা চলে। আবুল হোসেন ছন্দকে এবং বাচ্যকে প্রথা থেকে শিথিল করে একটি অনিরূপিত ভঙ্গিতে উপস্থিত করে[ন]। (১৯৮৩ : ১৭৭)।

'বাংলার মেয়ে' কবিতায় গদ্য-পদ্যের ব্যবধান বিমোচনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন কবি। তিনি যে-রকম করে ভাবতে পছন্দ করেন, সেভাবেই তিনি শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে দিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর কবিতার দেহ। সরল সৌন্দর্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, কিন্তু তা কবিত্বহীন তরল বাক্যের স্তূপ নয়। নারীর পক্ষ নিয়ে কবি তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সেই নারীকে তিনি নিজের মতোই প্রতিভাবান পণ্ডিত হিসেবে নির্মাণ করেন নি। একজন সাধারণ বাঙালি নারীর ভাবনার ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন, তেমনি তাঁর শব্দ-ভাণ্ডার ও বাক্যনির্মাণকৌশল সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট। 'বাঙালি মেয়ে দোয়াত কলম আর কালি হাতে পেয়ে প্রকাশ্যে/কোন পত্রিকাতে আপন জবানবন্দী ছাপাতে শুরু করে দেবে'– এটা যুগ যুগ ধরে পুরুষের চোখে নারীর পতন হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর অবস্থানকে আবুল হোসেন অঙ্কন করেছেন এইভাবে :

যাদের ন্যায্যত বৈঠক হল বন্ধ হারেম, যাদের প্রেম খাঁটি আর

Dhaka University Institutional Repository

তাজা থাকে শুধু অন্দরে, বাইরে এলেই যারা পথ-আবর্তে
প'ড়ে হয় দিশেহারা, একেবারে কানা,
তাদেরই একজনা হাজার হাজার নারী পুরুষের সম্মুখে মুখ তুলে
আপন কাহিনী বলবে খুলে?
ছি– ছি– ছি! ('বাংলার মেয়ে')

এই 'ছি– ছি– ছি' নারীর মুখেই সবচেয়ে ভালো মানায়। বাঙালি নারীর কথোপকথনে তা প্রায়ই শোনা যায়। কথোপকথনের আবহ সঞ্চারের প্রয়োজনেই তিনি নারীর অভিব্যক্তি প্রকাশে নারী–ভাষার স্বাভাবিক ধরনটিকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এই কবিতা পাঠ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ে অসাধারণ প্রতিভাবান এবং তার পাণ্ডিত্যের ধারও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো। তাঁর কবিতার নায়িকা শরৎচন্দ্রের কাছে একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখার অনুরোধ করে, যে মেয়ের 'স্বভাবের গভীরে' 'অসাধারণ কিছু তলিয়ে' থাকার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এই মেয়ের হাতে 'মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে' দেওয়ার মতো ধন নেই, কিন্তু উচ্চতর ভাবনা ও কল্পনাপ্রতিভায় ঋদ্ধ সেই মেয়ের মনোরাজ্যে দারিদ্রের ছাপ অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প–
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে–
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার। (২০০৬ : ৮/২৮৯)

রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে চায়, গণিতে প্রথম হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। এমনকি ইউরোপে গিয়ে 'যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,/যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা', তাদের ঈর্ষা জাগাতে চায়। কিন্তু আবুল হোসেনের 'বাংলার মেয়ে' গ্রামবাংলার সাধারণ মেয়ের মতোই শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতের নায়িকা হতে চায়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের জঞ্জাল ঠেলে ঠেলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সেই ক্লান্তির বর্ণনায় তিনি নারীর দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দেরই আশ্রয় নিয়েছেন। আবুল হোসেন লিখেছেন :

আজকের দিনে রান্নাঘরের অন্ধকারের মাঝে যে মেয়েরা বসে
চীনের-বাসন মাজে, মসলা পিষতে চোখ ভ'রে আসে জলে
তাদেরও অন্ধ জীবনের তলে উঁকিঝুঁকি মারে রাজকুমার।
পেঁয়াজ কাটার ফাঁকে মনের গহনে রবিঠাকুরের একটি লাইন
হয় তো ছবি আঁকে, হয় তো কখনও মনে তোলে দোলা
শেলির একটি কবিতা, আত্মভোলা কীট্সের অমর ওডগুলো,
হয় তো পথের ধুলো সংবাদ আনে রাজকুমারের আগমনের।
সুপ্ত মনের আড়াল-দেওয়া পর্দাটা যায় ফেঁসে একটি নিমেষে।
বোরখার বেড়া ভেঙে ছুটে আসে মালবিকা মদনিকা।
রাজকুমারীর টিকা কপালে তার।
সেও খোঁজে তার রাজকুমার। ('বাংলার মেয়ে'/*নব-বসন্ত*)

শিল্পসাহিত্যে পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীর এই প্রতিবাদ নারীর ভাষাতেই উপস্থাপন করেছেন আবুল হোসেন। তাঁর এই মেয়ে আক্ষেপ করে, 'মেয়েদের নেই কবি। রাজকুমারীর কাহিনী তাই তো জানল না কেউ দেখল না/তার গোপন মনের ছবি।' আবুল হোসেন নারীর মনের গোপন ছবির রূপায়ণে যেমন তার ভাষার স্বভাব অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন, তেমনি নিজের অনুভবকে শব্দে বন্দি করার কাজেও কবি অভিধান থেকে শব্দ খুঁজে বেড়ান নি। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষাভঙ্গির সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন। যদিও এই কবিতার গদ্যভঙ্গিতে কবি

মধ্যমিলের আশ্রয় নিয়েছেন, এবং কবিতার পঙ্‌ক্তি ভেঙে ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করলে একে অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্যকবিতা বলা যাবে, তবু এই বিন্যাসের কৌশলেই এতে কথ্যভঙ্গির আবহ অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আবুল হোসেনের কবিতার ভাষা আমাদের মুখেরই ভাষা এবং এই ভাষায় তিনি আত্মচিহ্নিত অনুভবের নির্যাস ঢেলে দিতে সক্ষম হয়েছেন বলেই তাঁর কবিতার মুখের ভাষা, এবং আমাদের বুকেরও ভাষা।

শব্দ

আবুল হোসেনের কবিতা অনিবার্যভাবেই শব্দের বিন্যাসে অবয়বপ্রাপ্ত কিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠতম শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাস না বললেও তাঁর কবিতার সৌরভ কিংবা গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে হয় না। শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অভিধান-আশ্রিত ভারি কিংবা দৈনন্দিন জীবনের অব্যবহৃত কিন্তু কবিতায় বহুল ব্যবহৃত কাব্যিক শব্দের আধিপত্যকে স্বীকার করেন নি কবি। তিনি যা ভেবেছেন এবং যেভাবে ভেবেছেন তার প্রকাশে তিনি কথ্যভঙ্গির নিকটবর্তী থাকতে চেয়েছেন। কবিতায় মানুষের কথনকৌশলের অবিকল উপস্থাপন সব সময় সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি। আবুল হোসেনের কবিতায়ও আমরা লক্ষ করব, তিনি বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন যা তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলিকে নতুন দীপ্তি দিয়েছে। এই দীপ্তির উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করলে আমরা কবিস্বভাবের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ব্যাকরণটি অনুধাবনে সক্ষম হব। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি কীভাবে কবির অনুভবের দ্যোতক হয়ে ওঠে সে-বিষয়ে দুইজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

ক. শব্দই সর্বময় চৈতন্যের ধারক। তার প্রাত্যহিক অথবা আভিধানিক অর্থ হয়তো একটা বিশেষ বস্তু বা উপলব্ধির সংলগ্ন, কিন্তু কবির প্রয়োগ কৌশলে অভিধানের সীমা বারবার ভেঙে যাবে, সুরকে আশ্রয় করে গানের শব্দ যেমন সর্বসঞ্চারী হয়, ইঙ্গিতে-উল্লেখে, অবস্থান বৈচিত্র্যে কবিতার শব্দ তেমনি সাঙ্গীতিক হয়ে উঠবে, প্রত্যহের হয়েও তা প্রত্যহের অতীতকে স্পর্শ করবে। পাঠকের স্মৃতিকে, আবেগকে আলোড়িত কিম্বা শিহরিত করবে। তাকে বর্তমান থেকে অতীত কিম্বা ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করবে। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ২০০১ : ২৭১)

খ. আমরা জানি, কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, শব্দ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে লেখা হয় না, প্রতিদিন যে-শব্দ মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে, সেটি ছাড়া কবির আর কোনও পুঁজি নেই, সেই শব্দকেই কবি নতুন করে তোলেন, নতুন করে তুলে ভাষার সীমানা ও সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন। কখন যে শব্দ কবির হাতে অন্য রকম হয়ে যায়, পাঠক তা টেরও পান না। সে-শব্দ পাঠকের চেতনায় মিশে যায়, তাঁর নিজের ভাষার সঙ্গে এক হয়ে যায়, সে-ভাষায় জায়গা করে নেয়। (মনজুরে মওলা ২০১০ : ২৯)

আবুল হোসেনের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিও পাঠকের চৈতন্যে নতুন দীপ্তি সঞ্চার করে, খুব পরিচিত শব্দের শরীরেও আমরা আবিষ্কার করি অনাস্বাদিত অনুভব ও অনুরণন। 'শব্দ তো শব্দই, শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়, তা যতোই নতুন হয়ে উঠুক, যতোই ঋদ্ধ হোক। কবি কী করে শব্দকে পাল্টে দিলেন, তা নিয়ে কথা বলা মানে শব্দ নিয়ে কথা বলা, কবিতা নিয়ে কথা বলা নয়' বলে মনজুরে মওলা উল্লেখ করলেও, তিনি স্বীকার করতে ভোলেন নি, 'কেবল কবির হাতেই এবং কবিতার কারণেই শব্দ এমনি করে পাল্টে যায়।' কবির হাতে কিংবা কবিতায় অবস্থান নিয়ে শব্দ তার আভিধানিক ভূখণ্ডের বাইরে যাওয়ার শৈল্পিক অনুমোদন লাভ করে বলেই কবির চেতনাকে নিজের করে নেওয়ার প্রয়োজনে একজন পাঠককে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ধরন-ধারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হয়।

আবুল হোসেন শব্দসচেতন কবি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সচেতনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নয়, বরং সরলতায় সমর্পিত। শব্দ-বিষয়ে তাঁর ভাবনার প্রকাশ বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত। শব্দের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি। শব্দের বেড়া ভেঙে তিনি তাঁর অন্দরমহলে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। কখনো-বা তিনি শব্দ নিয়ে মধুর খেলায় মগ্ন থেকেছেন। একটি শব্দকে নিজের ইচ্ছের অনুকূলে স্থাপন করার জন্য শিশুর মতো অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন, কখনো আবার অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে একটি কথা কিংবা শব্দের জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর 'ঘুমের নিঃস্রোত নদীতে' কখনো আবার 'জাদুকরী শব্দের বুদবুদ ফুটেছে খইয়ের মতো'। সারাজীবন শব্দ ও কথার মালা গেঁথে কাটানোর আনন্দই তাঁর কাছে মহৎ কবিতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। *আর কিসের অপেক্ষা* কাব্যের 'কবিতা এখন' শীর্ষক কবিতায় একালের কবি ও কবিতা সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'গায়ের ধুলো

ঝেড়ে/শব্দগুলো ঝলমলিয়ে উঠে/বুকের ভেতর ধিনিকধিনা/তোলপাড় শুরু করে' কিনা সে-বিষয়ে একালের কবিরা বিশেষ মনোযোগী বলে মনে হয় না তাঁর। এভাবেই কবি শব্দ-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনাকে বাণীবদ্ধ করেন। আবুল হোসেনের কবিতা থেকে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাঠ করা যেতে পারে :

ক. কত কাল থেকে খেলছি লেখার খেলা।
স্বপ্নের মাঠে ছন্দের পিঠে চ'ড়ে
ঘুরেছি কতই শব্দের হাত ধ'রে,
সারা রাত খেটে চিত্রকল্প ঘেঁটে
উপমার আলোজ্বলা পথে গেছি হেঁটে। ('কত কাল খেলছি লেখার খেলা'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

খ. কখনো শিশুর মতো
আকুলি বিকুলি করি
একটি কথার জন্য, সারা রাত পাগলের মতো
একটি শব্দের জন্য ছটফট করি। ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

গ. যা বলা হয় নি অথচ ছিল মনে মনে,
ঘুমের নিঃস্রোত নদীতে
যে সব জাদুকরী শব্দের বুদবুদ ফুটেছে খইয়ের মতো,
স্বপ্নে সওয়ার হয়ে যারা সারা রাত মাথার ভেতর
সুর আর ছন্দের আতশবাজি করে গেল
আগুনের সেই ফুলকিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে
দম বন্ধ ক'রে ভূত-তাড়ানো ওঝার মতো,
মন্ত্রের পর মন্ত্র আউড়ে যেতে দেখি
অক্ষরের হরিণগুলো নেচে যাচ্ছে
চোখের সম্মুখে রাখা অদৃশ্য কম্পিউটারে। ('অজাতক'/*এখনও সময় আছে*)

ঘ. আমিও তো সারাজীবন শব্দে শব্দে কথায় কথায়
কখনও ছন্দে, কখনও ছন্দ ছাড়াই
কখনও মিল দিয়ে কখনও মিল না দিয়েই
কখনও ছন্দ মিল মাত্রা বাক্য পঙক্তি স্তবক
নিয়ে মশগুল হয়ে
কাটিয়ে দিলাম দিন
সমান উৎসাহে। ('একই কাজ'/*আর কিসের অপেক্ষা*)

শব্দের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ব না থাকলে এবং শব্দের অন্তর্গত ঐশ্বর্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলে একজন কবির রচনায় ব্যবহৃত শব্দাবলি নতুন আর্থবৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। কবির অনুভবপুঞ্জ কীভাবে কবিতা হয়ে ওঠে তার সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু জীবন ও জগতের অনাস্বাদিত সত্য ও সুন্দরকে কবিতায় ধারণ করার প্রয়োজনে কবিকে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়। সন্দেহ নেই, শব্দই সেই লড়াইয়ের অব্যর্থ অস্ত্র। আবুল হোসেন মনে করেন, সেই অস্ত্রের ক্ষমতা প্রচলিত ও দৃশ্যমান যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। 'শুধু একটা কলম আর গলায় কিছু শব্দ নিয়ে' যে কবি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, প্রতিকূল জীবন ও সমাজবাস্তবতায় তিনি পরাস্ত হবেন। তাই কবি তাঁর শব্দাবলিকে হৃৎপিণ্ডের গভীরে স্থান দেন। তখন সেই শব্দাবলি লাভ করে বিদ্যুতের গতি ও দীপ্তি। কবি বিশ্বাস করেন, সেই গতি ও দীপ্তির কাছে কামান কিংবা বোমার শক্তি ম্লান হতে বাধ্য। আবুল হোসেনের একটি কবিতায় শব্দ-বিষয়ে এ রকম ভাবনারই প্রকাশ লক্ষ করি। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করা হল :

কী দিয়ে লড়াই করব আমি
আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই–
এল এম জি স্টেনগান অথবা গ্রেনেড,

এমন কি মামুলি থ্রি নট থ্রি কি বেয়োনেট
মায় একটা শড়কি কিংবা দাও।
আমার আছে শুধু একটা কলম
আর গলায় কিছু শব্দ।
আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
যখন সেই শব্দগুলো
বিদ্যুতের মতো
বেরিয়ে আসে কলমের ডগায়
পাতার পর পাতা থেকে
ফেটে পড়ে
সদর রাস্তায়, রেঁস্তোরায়, পাড়ায় পাড়ায়
গ্রামে-গঞ্জে, বন্দরে
সেই বিস্ফারণের সঙ্গে পাল্লা দেবে কে?
কোন্ কামান? কার বোমা? ('আমার অস্ত্র'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

শব্দের যে শক্তি আবুল হোসেনের কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তা গদ্য-পদ্যের সার্থক সংমিশ্রণেরই ফল। দীপ্তি ত্রিপাঠী বিশ শতকের তিরিশের কবিদের কবিতায় বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণের সঙ্গে 'গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা' লক্ষ করেছেন। (১৯৯২ : ৩)। তিরিশের কবিদের উত্তরসূরী হিসেবে আবুল হোসেন তাতে ব্যক্তিগত রুচি ও শিল্পচৈতন্যের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মনের ভাষাকে মনের মতো করে প্রকাশ করে অন্যের মনের কাছে তার আবেদন তীব্রতর করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের মুখের ভাষাই সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে। তাঁর কবিতায় কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির সার্থক সংমিশ্রণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. খাওয়ার জিনিষ শোওয়ার জিনিষ
পরার জিনিষ মরার জিনিষ
কিছু ছোঁয়ার সাধ্যি নাই। ('বাজার দর'/*বিরস সংলাপ*)

খ. কখনো বুদ্ধির প্যাচে
কখনো বা প্যাঁচার মতন
হাঁড়িমুখ ক'রে। ('শত বর্ষ পরে'/*বিরস সংলাপ*)

গ. মাফ করবেন মিস,
আপনার জন্যেই এই উপদেশ, পিস্
এখনও রয়েছে।... ('প্রেম-অপ্রেমের কবিতা'/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. নসিব রে, এই পঞ্চাশ বছর কী করলাম আমি?
খুব তো গেঁজালে।... ('কী করলাম আমি'/*হাওয়ার, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঙ. ...পা হড়কে হঠাৎ কখন
পড়ে যাবে, অকালে ভাঙবে মাজা, লুটোপুটি খাবে
পাঁকে। ও পথে যাদের হামেশাই আনাগোনা তারা
কেউ গায়ে মাখে না।... ('এক পথভোলা লেখক বন্ধুকে'/*এখনও সময় আছে*)

চ. মাথায় যাদের গোবর-ভরা এমন ক'জন সঙ
(পত্রিকা বা বিশ্ববিদ্যার আড়ত থেকে)
লেলিয়ে, তথাপিও
যদি কারও সন্দেহ না-ই ঘোচে
কথার তুবড়ি ছুটিয়ে মুখ তাদের

বন্ধ করে দিয়ো। ('সাফল্যের পেছনে ছোটা এক কবিকে'/*এখনও সময় আছে*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ পাঠ করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি, আবুল হোসেন কেবল কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতিরই ব্যবহার করেন নি, সেইসঙ্গে ঘরোয়া পরিবেশ বা ঘরোয়া আড্ডার আবহটিকেও অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর বলার কথাটি অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বরভাবেই পাঠকের অন্তরে আসন রচনা করে।

ইডিয়ম বা বাগধারার ব্যবহারেও আবুল হোসেন নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইডিয়ম কেবল ভাষার স্বাভাবিকতারই স্মারক নয়, তাতে মানুষের যাপিত জীবন-উৎসারিত অভিজ্ঞতার নির্যাস বিদ্যমান থাকায় এর ব্যবহারে কবিতায় সঞ্চারিত হয় চলমান জীবনের বিবিধ সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়। বহমান জীবনের বিবিধ গতি ও চাপ বাগধারায় ধরা পড়ে। তাই বাগধারার ব্যবহারে কবির জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশও সহজতর হয়। কয়েকটি বাগধারা-আশ্রিত পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. কষ্কে পাই বর্তে যাই এরণ্ডের মাঝে বৃক্ষ বনে। ('এরণ্ড'/*বিরস সংলাপ*)

খ. টাকার কুমীর আর ন্যাংটো নটবর
লেঠেল জোয়ান আর তালপাতার সেপাই
কেউ পেল না রেহাই। ('কাঁদারও অপেক্ষা রাখে না'/*বিরস সংলাপ*)

গ. কৃপণের মতো দু'হাতে কুড়াই।
যক্ষের ধন বক্ষে লুকাই। ('ভাবি বেঁচে থাকি'/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. তুলো আর পাট চামড়া বেচব সে গুড়ে বালি। ('গৌরী সেন'/*বিরস সংলাপ*)

ঙ. যে যেভাবে পারে ভাগাভাগি ক'রে পগার পার। ('গৌরী সেন'/*বিরস সংলাপ*)

চ. টাকা দেবে তো সে গৌরী সেন। ('গৌরী সেন'/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেনের কবিতায় প্রচুর বিদেশি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও তা তাঁর কবিতার ভাষাকে দুর্বোধ্য করে না, কারণ তিনি মানুষের সাধারণ আলাপচারিতায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলোকেই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যাবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গেই এই শব্দাবলির আগমন ঘটেছে। মানুষের কথনকৌশলের ধরনটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই তাঁর কবিতায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থের বিদেশি শব্দের অন্বেষণে অবতীর্ণ না হয়ে আবুল হোসেনের শব্দ ব্যবহারের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁর একটি কবিতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। *নব-বসন্ত* কাব্যের 'ট্রেন' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেছেন, তাঁর অন্তরে ট্রেনের 'অবিরাম হুইসিল বাজে'। কোলাহলমুখর দিনরাত্রি কবি শুনতে পান সেই ট্রেনের শব্দে। 'উড়ন্ত সময়, মেল্, গুড্স, সাটল্, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার,/অবিশ্রান্ত গতি বাধা ইস্পাতের আগুনে চাকায়'। ট্রেনের প্রসঙ্গে কবি ব্যবহার করেন প্লাটফর্ম, লাইন, ট্যাবলেট, সিগারেট ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ। কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

হু হু শব্দে মাটি কাঁপে, ইস্পাতের চাকায় চাকায় লাগে দোলা,
ছুটছে ট্রেন, মানুষ, স্টেশন, স্টল, ঘড়ি, ব্রিজ উর্ধ্বশ্বাসে, ঘুরে ঘুরে
উড়ছে টকটকে ধুলো আকাশে বাতাসে, আগুনের খুরে।
ছুটছে কার পিছু? কেন? কি চায়? ধরবে কি শব্দ, শূন্য, আলো,
হাওয়া, সময়, সাদা মেঘ। শিয়ালদহ হাওড়ায় টার্মিনালে
মাঝে মাঝে থেমে দম নেয়, তরপর দরকার থাক আর
নাই থাক বের হ'য়ে পড়ে তারা, যেমন পালে পালে
আফ্রিকায় মাঠে তাড়া-খাওয়া হাতি হরিণ জেব্রা গণ্ডার
হুড়মুড় ক'রে ছোটে দিকবিদিকে (কোন দিকে তাকাবার
সময় নেই এক মুহূর্ত) আসছে ধাওয়া ক'রে মৃত্যু দ্রুত পায়।
আসছে সে, তাই বাজছে দ্রিমি দ্রিমি, ছুটছে পৃথিবী, ছুটছে মানুষ
বাসে ট্রামে রেস্তোরাঁয় পার্কে মাঠে, থিয়েটারে সিনেমার পর্দায়, হুশ

নেই আর কারও, ছুটছে অবিরাম ট্রেনের চাকায়, অন্তহীন ফাঁকায়। (‘ট্রেন’/*নব-বসন্ত*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে আমরা লক্ষ করছি, এই কবিতায় বিপুলসংখ্যক ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি। কবিতার বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিতকে প্রাণবন্ত করার প্রয়োজনেই এই শব্দসমূহের আগমন ঘটেছে। এভাবেই আবুল হোসেন উদারভাবে প্রাসঙ্গিক যে-কোন ভাষার শব্দকেই কবিতায় অবলীলায় ব্যবহার করেন।

আবুল হোসেনের কবিতায় আমরা প্রচুর নামবাচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি। ব্যক্তির নাম যেমন তিনি ব্যবহার করেছেন তেমনি স্থানের নাম উল্লেখ করেও অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। কবিতার নামকরণেও তিনি ব্যক্তি ও স্থানের নাম ব্যবহার করেন। *বিরস সংলাপ* কাব্যে তিনি ‘মেহেদীর জন্য’, ‘জয়নুলের আঁকা নজরুল ইসলামের ছবি দেখে’; *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যে ‘ভল্টেয়ার’, ‘সক্রেটিস’, ‘ম্যাডাম টুসোর যাদুঘরে’, ‘সোহরাবের লাশ নিয়ে, রুস্তম’; *এখনও সময় আছে* কাব্যে ‘শওকত ওসমানকে’, ‘জীবনানন্দ-কে’, ‘ফররুখ আহমদ’; *আর কিসের অপেক্ষা* কাব্যে ‘আশির দরোজায় শওকত ওসমানকে’, ‘শহীদ কাদরী’– এভাবেই বিভিন্ন কাব্যে তিনি ব্যক্তির জীবন ও কর্মকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। আবার কবিতার উৎসর্গপত্র হিসেবেও তিনি তাঁর কাব্যে যোগ করেছেন বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম। *নব-বসন্ত* কাব্যের ‘স্বগত’ শীর্ষক কবিতাটি তিনি উৎসর্গ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। এই কবিতায় নানাভাবে তিনি সুধীন দত্তের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পচৈতন্যের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং কবির স্বকালের প্রেক্ষিতে সুধীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তিক শিল্পচর্চার পরিণতি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। *বিরস সংলাপ* কাব্যের ‘বাংলার বাঘ’ কবিতায় কবি কৃষকের বন্ধু শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হকের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন, ‘দেশ তাঁকে বসিয়েছে হৃদয়ের সিংহাসনে তার।’ একই কাব্যের ‘তিরিশ টাকার মাইনেতে’ কবিতাটি *পদাতিক* কাব্যের স্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন কবি। ‘শেষ যুক্তি’ কবিতাটি শিল্পতাত্ত্বিক ও সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আবুল হোসেনের শিল্পচৈতন্য নির্মাণে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকা সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> কবিতা লেখা আমি কখনো বন্ধ করিনি। ছেপেছি কম। বেশির ভাগই ফেলে দিয়েছি। ছাপা কবিতার কপি রাখিনি। এটা ঘটেছিল আবু সয়ীদ আইয়ুবের সংস্পর্শে এসে। তার সঙ্গে পরিচয় হয় ৩৮-এর দিকে। তখন আমি দুড়ুমদাড়াম করে লিখে যাচ্ছি। আইয়ুব বললেন, ঐ রকম করে ভালো লেখা যায়? সব লেখাই ছাপার যোগ্য হয় না। সেই লেখাটাই শুধু ছাপতে দিন যা থাকবে বলে আপনার মনে হয়। দেখলাম আইয়ুব তার কোন লেখাতেই সন্তুষ্ট নন। অথচ তার যে লেখাটাই ছাপা হয় সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। উনি বছরে একটা কি দুটো লেখেন। ওর প্রভাব আমার ওপর খুবই পড়েছিল। আমার মনে হলো কে কত ভাল লিখলো সেটাই বড় কথা, আসল কথা। কত বেশি লিখেছে এটা বাহ্য। আইয়ুব রুচিটা এমন উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন যে আর নীচে নামতে পারি না। (আবুল হোসেন ২০১০খ : ৬৩)

এই আইয়ুবকে স্মরণ করেই ‘শেষ যুক্তি’ কবিতাটি লেখেন আবুল হোসেন, যেখানে জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে কবির নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। আবুল হোসেন ‘ঝড়ের পূর্বে’ কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন আবু রুশ্‌দকে। *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* কাব্যের ‘নিজের মুখ দেখি না’ কবিতায় কবি নিজেকেই নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে বলছেন, ‘সাব্বাস। চিনতে পারলেন, আবুল হোসেন।’ *এখনও সময় আছে* কাব্যের ‘একজন সমালোচককে’ কবিতায় তিনি শিরোনামের নীচে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন রশীদ করীমের নাম। ‘সময়ের স্রোতে’ কথাটি উৎসর্গ করা হয়েছে শামসুর রাহমানকে। এভাবেই কবিতা উৎসর্গের মাধ্যমে কবি তাঁর শিল্পকর্মে অনেক ব্যক্তিত্বের শরণ নিয়েছেন।

কবিতার ভেতরেও তিনি নানা ব্যক্তিনামের উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর কাব্যসমূহের বিভিন্ন কবিতায় ব্যক্তিনামের অনুসন্ধান না করে একটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উল্লেখ করতে চাই, যেখানে অনেক শিল্পস্রষ্টা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে তিনি স্মরণ করেছেন :

> ছন্নছাড়া মাইকেল ফিরে এল ঘরে,
> ইস্কুল পালানো ছেলে বিশ্বের শিরোপা নিয়ে এল,
> বিদ্রোহী হলেন নিজে,

দেশকেও করলেন নজরুল
বাঙলার মুখ খুঁজে পেলেন জীবনানন্দ দাশ,
তোমাকে নিয়েই সঙ্গে
বরিশালে ফজলুল হক
ভাঙ্গা কবরের ধারে কেঁদে
সমস্ত দেশের বুক ভাসালেন একা,
'সীতা', 'সীতা' ডাক দিয়ে শিশির ভাদুড়ী
বাঙলার কানে তার কান্না গেলেন অনন্তকাল রেখে ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

এভাবেই আবুল হোসেন বাংলার কৃতি সন্তানদের কবিতায় ধারণ করেছেন। স্বদেশের মুখ আঁকতে গিয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা স্মরণ করেছেন। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ তাঁর অনেক কবিতায়ই ঘুরেফিরে এসেছে। কখনো এই মহান স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মের কোন অংশকে তিনি তাঁর চিন্তার অনুকূলে ব্যবহার করেছেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলের অনেক ব্যক্তিকেই আমরা তাঁর কবিতায় খুঁজে পাই– বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের প্রসঙ্গ। তাঁর অনেক কবিতায় ব্যক্তিনামের ব্যবহার মিথের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। কিছু কবিতায় একটি নামের ভেতর দিয়েই কবি সময় ও সমাজের একটি বিশেষ অবস্থাকে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো-বা সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অবস্থারও ধারক হয়ে উঠেছে একেকটি নাম।

স্থানবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্তও আবুল হোসেনের কবিতায় কম নয়। কবিতার ভেতরে তার নানা চিহ্ন যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি নামকরণের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। *বিরস সংলাপ*-এর 'ব্যাঙ্ককে গ্রীষ্ম', 'ব্যাঙ্ককে বৃষ্টি', 'মধ্যপ্রাচ্য', 'ডি. এইচ. রেলওয়ে'; *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*-এর 'ক'লকাতা ১৯৭৯', 'চাঁদে যাবে যাও'; *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যে 'প্রিন্সটনে এক কালো কাঠবিড়ালি' প্রভৃতি কবিতার নামকরণেই স্থানবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। স্থানবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার-সূচক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ঘুম ঘুম ঘুম
ঘুমায়েছে ব্যাবিলন, পিরামিডগুলি,
প্রাচীন মিসর
সহস্র মোয়েনজোদাড়ো
সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড
জেরুজালেম
ঘুম ঘুম ঘুম ('তবু'/নব-বসন্ত)

খ. তেত্রিশ বছর পার ক'রে আল্‌ফাডাঙ্গা বরিশালে
মাস ছয় প্যারী ঘুরে এসে পড়েছে সে ভাবনায়। ('একজন দর্শনীয় ব্যক্তি'/*বিরস সংলাপ*)

গ. ঢাকা কি করাচী,
ক'লকাতায়, নবদ্বীপে
অথবা গৌড়েও নয়,
টোলে কি মক্তবে
অথবা ফোর্টেও শুধু নয়,... ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঘ. অথবা সেই গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর যাওয়ার পথে
পদ্মায় তারপাশা আর বহরের মধ্যে
আমাদের স্টিমারটা ঝড়ের সঙ্গে
ঝাড়া এক ঘণ্টা লড়ে ঠিক সন্ধ্যার মুহূর্তে
যখন ঘাটে এসে ভিড়ল, ... ('জন্মদিন'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

আবুল হোসেন প্রথম কাব্যগ্রন্থে বিশেষণ ব্যবহারে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে। *নব-বসন্ত* কাব্যের কিছু কবিতায় তিনি প্রচলিত কাব্যিক আবহকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। ফলে কবিতায় বিশেষণ ব্যবহারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটিকেও স্বীকরণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কবিতা যতই সাধারণ কথনকৌশলের নিকটবর্তী হয়েছে, ততই তিনি বিশেষণ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয়েছেন। প্রথম কাব্যের 'নবযুগ' কবিতা থেকে গৃহীত নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ করা যাক :

স্বপ্ন দেখেছি দীর্ঘ দিবস রাতে,
শ্রান্তিবিহীন শিকারী আঁখির পাতা :
শুভ্র বকের কোমল পালকের ঢাকা
জ্যোছনা রাতের সাদা মেঘ আর প্রভাতী পূর্বকাশ;
আজ দেখি তার রঙিন পাখায় আঁকা
কুটিল হিয়ার স্নিগ্ধ প্রবঞ্চনা। ('নবযুগ'/*নব-বসন্ত*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটিতে আমরা প্রচুর বিশেষণের উপস্থিতি লক্ষ করি। প্রায় প্রতিটি অনুষঙ্গকেই তিনি বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষ করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায়ও আমরা আর আবুল হোসেনকে এই রূপে খুঁজে পাব না। বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিশেষণের ওপর ভর দিয়ে তিনি তাঁর ভাবকে ব্যতিক্রমী করে তুলতে চান নি। কবি অনুভব করেছেন, আমরা সাধারণ কথকতায় বিশেষণের আশ্রয় নিলেও কবিতা লিখতে গিয়ে অধিকমাত্রায় বিশেষণে সমর্পিত হই। এটা আবুল হোসেনের কবিতার গঠনকৌশলের অনুকূল নয় বলেই মনে করেছেন তিনি। 'বাংলার মেয়ে' কবিতায় তিনি কথ্যরীতির শরণ নিয়েছেন বলেই সেখানে বিশেষণের ব্যবহার সীমিত। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

আমরা যারা এদেশী মেয়ে, যাদের মূল্য ঘরের নতুন
পিয়ানোর চেয়ে কানাকড়ি নয় বেশি
তাদের সঙ্গে মনে মনে আছে কবিদের রেষারেষি।
তাই তো আজকে কলম নিয়েছি আমরা নিজের হাতে,
রঙ দিতে চাই আমাদের কাহিনীটাতে। ('বাংলার মেয়ে'/*নব-বসন্ত*)

একই গ্রন্থের পরপর দুই কবিতার তুলনামূলক আলোচনায় আমরা লক্ষ করব, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পঙ্ক্তিতেই যেখানে বিশেষণের ব্যবহার করেছেন কবি, তেমনি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বিশেষণের ব্যবহার নেই বললেই চলে। বিশেষণ কবির আভিজাত্যের স্মারক হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু ক্রিয়াপদের অধিকতর ব্যবহার কর্মযজ্ঞে বিশ্বাসী শিল্পস্রষ্টার সক্রিয়তাকে নির্দেশ করে। তাই বিশেষণের রাশ টেনে ধরে আবুল হোসেন যখন ক্রিয়াপদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তখন তা কর্মযজ্ঞে আগ্রহী কবির মানসভুবনকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আবুল হোসেন কবিতাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথ্যরীতির নিকটবর্তী করার চেষ্টা করলেও কর্মে বিশ্বাসী কবির সক্রিয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশেষণ ব্যবহারে তিনি দেখিয়েছেন সীমাহীন মিতব্যয়িতা।

অলঙ্কার

কবিতায় আমরা যে জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ করি, তা যতই মানুষের কথনকৌশলের অনুবর্তী হোক না কেন, তাতে শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পচেতনার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যে ভাষায় সাধারণভাবে কথা বলে তার হুবহু অনুকীর্তিতে কবিতা হয়ে ওঠা কঠিন। কবি যা বলতে চান কিংবা যে ভাবনা-বিশ্বে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করেন, সেই আমন্ত্রণ-সভার আয়োজন যতই অনাড়ম্বর হোক না কেন, তাতে বাহ্যিক সৌন্দর্যের উদ্‌যাপন অনিবার্যভাবেই পাঠকের চোখে পড়ে। একজন অনুরাগী পাঠক শব্দবন্ধের ভাঁজে ভাঁজে কবির সৌন্দর্যভাবনার প্রকাশ লক্ষ করেন। ভাবকে অন্যের অন্তরে প্রবেশের উপযোগী শক্তি সরবরাহ করেন একজন শিল্পস্রষ্টা। সেই শক্তিকেই আমরা অলঙ্কার হিসেবে শনাক্ত করতে চাই।

নিরাভরণ শব্দসজ্জার সহজ-সরল-স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে আমরা আবুল হোসেনের কবিতার উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। তাঁর কবিতায় বিম্বিত আভরণহীনতার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাব নানা অলঙ্কারের উপস্থিতি। সেই অলঙ্কারের অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা আবুল হোসেনকেও নিবিড়ভাবে পাঠ করার সুযোগ পাব। কারণ অলঙ্কার কবিতার দৈহিক অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিলেও এই দেহ-নির্মাণে কবির শিল্পচেতনার ব্যাকরণটি সম্পর্কেও আমাদের বিবেচনার পথটি সুস্পষ্ট হবে।

শব্দালঙ্কার

শব্দকে আশ্রয় করেই শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি। শব্দের পরিবর্তনে এই অলঙ্কারের অস্তিত্ব লোপ পায়। শব্দ নির্বাচনে কবির সতর্কতা সেই অর্থে শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁর আগ্রহের স্মারক হিসেবে স্বীকৃত। একটি শব্দের পর অন্য একটি শব্দের উপস্থিতি কেবল কবির বক্তব্যকেই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করে না, তা কবির ভাবনা বা বলার কথাটিকে বিশেষ দ্যোতনায় উপস্থাপন করে। শব্দালঙ্কার কবিতার পাঠকের কানে যে অনুরণন সঞ্চার করে তা কবির অভিব্যক্তিকেও পাঠকের প্রাণের প্রান্তরে পৌঁছে দেয়।

অনুপ্রাস

অনুপ্রাসকে শিল্পসমালোচক ক্ষুদিরাম দাস (১৯৯৪ : ৪৮) 'স্বরসংযোগে সমধ্বনিময় ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ব্যঞ্জনের এই আবৃত্তি চারভাবে সম্পন্ন হতে পারে :

ক. একটিমাত্র অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের একাধিকবার উচ্চারণ।

খ. সংযুক্ত বর্ণ অথবা একত্রাবস্থিত একাধিক বর্ণের মাত্র দু'বার উচ্চারণ।

গ. সংযুক্তবর্ণ অথবা একত্রাবস্থিত একাধিক বর্ণের দুয়ের অধিকবার উচ্চারণ।

ঘ. শুধুমাত্র উচ্চারণস্থানের সাম্য অনুসারেই বিভিন্ন ব্যঞ্জনের একাধিকবার উচ্চারণ। (ক্ষুদিরাম দাস ১৯৯৪ : ৪৮)

ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তির উপরিউক্ত রকমভেদ থেকেই বিভিন্ন রকম অনুপ্রাসের নামকরণ করা হয়ে থাকে। অনুপ্রাসের শ্রেণিকরণ নিয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় অনুপ্রাসের আলোচনায় চার প্রকারের অনুপ্রাসেরই উপস্থিতি লক্ষ করি– অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস এবং শ্রুত্যনুপ্রাস। আমরা আবুল হোসেনের কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই।

অন্ত্যানুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাস বাংলা কবিতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই অনুপ্রাসে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তা কবিতার চরণের শেষের শব্দটির সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দের ধ্বনিসাম্য সংরক্ষণ করে। এই অনুপ্রাসে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অক্ষুণ্ন থাকে না। কারণ এই অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির অনুবৃত্তিকেও অনুপ্রাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। আবুল হোসেনের কবিতা থেকে অন্ত্যানুপ্রাস প্রযুক্ত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. ক্ষমা নাই আর এতটুকু নাই ক্ষমা
শোধ চাই সব যেখানে যা আছে জমা ('নবযুগ'/*নব-বসন্ত*)

খ. আলু মাঙ্গা বালু মাঙ্গা
কাপড় কিনতে লাগে দাঙ্গা, ('বাজার দর'/*বিরস সংলাপ*)

গ. স্মৃতির সুড়ঙ্গ দিয়ে তিন দশকের পোকাগুলো
কিলবিল ক'রে আসছে ধেয়ে, কানের ভেতরে তুলো ('ক'লকাতা ১৯৭৯'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঘ. চার দশকের হিসেব নিকেশ
নসিবের পথ এ ভাবেই শেষ ('আর কতকাল'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

ঙ. পাখিরে দিয়েছ তুমি গান,
আমাকে শোনার কান। ('খোদা, খোদা'/*এখনও সময় আছে*)

বৃত্ত্যনুপ্রাস

বৃত্ত্যনুপ্রাসে এক বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে পুনরাবৃত্ত হয়। ব্যঞ্জনের এই পুনরাবৃত্তির ফলে বাক্য বা পঙ্‌ক্তি শ্রুতিমধুর হয়। বৃত্ত্যনুপ্রাসে কখনো একই ব্যঞ্জন দুবার ধ্বনিত হয়, কখনো আবার বহুবার আবৃত্ত হয়। ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হলেও বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়ে থাকে। ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হওয়াও বৃত্ত্যনুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য। আবুল হোসেনের কবিতা থেকে বৃত্ত্যনুপ্রাস প্রযুক্ত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. কে খুলিল কে খুলিল জাহাজের পাল ('প্রাগৈতিহাসিক'/*নব-বসন্ত*)

খ. যত ভয় পাবে তত তোমাকে মৃত্যুর পাকে পাকে
জড়াবে সে জল্লাদ নিয়ত ('কূর্ম'/*নব-বসন্ত*)

গ. উঠছে বাজার দর হুহু ক'রে সব কিছুর–
আকের শাকের কাঠের পাটের আম লিচুর। ('বাজার দর'/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. হবে কি এমন দিন কোন দিন এই সব দন্তুর জন্তুরা
দলে দলে বনে জঙ্গলে মাথা হেট ক'রে ভেট দেবে প্রভুদের ('হবে কি এমন দিন কোন দিন'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঙ. সদর রাস্তায় রেস্তোরাঁয়, পাড়ায় পাড়ায়/গ্রামে-গঞ্জে, বন্দরে ('আমার অস্ত্র'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

চ. কেবলই তো কুঁকড়ে যাচ্ছি, মার খাচ্ছি, বাড়ছে
অপমানের পাহাড় আর বেঁচে থাকার একঘেয়েমি। ('অভ্যাসের দাস'/*এখনও সময় আছে*)

ছেকানুপ্রাস

ছেকানুপ্রাসে যুক্তব্যঞ্জন অথবা একত্রাবস্থিত ভিন্নস্বরের দ্বারা সংগ্রথিত একাধিক ব্যঞ্জন দু'বারমাত্র আবৃত্ত হয়ে থাকে। একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে দু'বার ধ্বনিত হলেই তা ছেকানুপ্রাসের সৃষ্টি করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

ক. মেয়েদের কথা মেয়েরা লিখেছে অল্প,
তবু খুব কম কাব্য অথবা গল্প তাদের না নিয়ে হয়েছে মর্তে, ('বাংলার মেয়ে'/*নব-বসন্ত*)

খ. অন্তরের অন্তরীক্ষে ছায়ামগ্না যে শক্তি-শরণী, ('বিজয়ী'/*নব-বসন্ত*)

গ. রজনীগন্ধার গন্ধ কাল/ভেঙ্গে দিল ভীরুতার সব আবরণ। (''জন্মদিনে'/*বিরস সংলাপ*)

ঘ. কুড়িগ্রামের মাঠঘাট আগাড় ভাগাড় গা-গঞ্জ থেকে
অবাক ক'রে দিয়েছিলেন আপনি সবাইকে। ('কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

ঙ. হৃৎপিণ্ডে গিয়ে দিচ্ছে ধাক্কা/টরে টরে টক্কা ('কবিতার জন্ম'/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

চ. এ আগাছা পরগাছা অজন্মা ও বেজন্মার দেশে
হেসে খেলে হেলায় ফেলায়... ('শওকত ওসমানকে'/*এখনও সময় আছে*)

শ্রুত্যনুপ্রাস

শ্রুত্যনুপ্রাস বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারটি ধ্বনি এখানে সাদৃশ্যধ্বনি রূপে গৃহীত হয়। এমনকি কম্পনজাত ('র') এবং তাড়নজাত ('ড়') ধ্বনিও উচ্চারণসাদৃশ্যের কারণে শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করে। আবুল হোসেনের কবিতা থেকে শ্রুত্যনুপ্রাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ত থ : কূজন ধ্বনিতে দৈন্যের ঘুম ভাঙবে না সেই সাথে?
মনে মুমূর্ষু ফুল
উঠবে না জেগে স্মৃতি-কুসুমের রাতে? (নব-বসন্ত/*নব-বসন্ত*)

খ. ড়. র : আজ মনে পড়ে
মন্বন্তরে
আমরা এলাম এ শহরে। ('মন্বন্তরে'/*নব-বসন্ত*)

গ. ক খ : তিলে তিলে প্রাণক্ষয়, বিস্বাদ বিষণ্ন বেঁচে থাকা।
রে বিহঙ্গ রে বিহঙ্গ, মুক্ত করো মুক্ত করো পাখা। ('একটি অসমাপ্ত কবিতা'/*নব-বসন্ত*)

ঘ. জ ঝ : যেখানে মানুষ দৈনন্দিন কাজে
প্রাণপাত করে দুঃস্বপ্নের মাঝে, (‘পোস্টার’/*নব-বসন্ত*)

ঙ. চ জ : তা যদি কালের রসনায় না-ই রোচে
বেরোব না আর সোনালি মৃগের খোঁজে, (‘কতকাল খেলছি লেখার খেলা’/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

আবুল হোসেনের কবিতায় অনুপ্রাসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। তিনি কাব্যিক ভাষা পরিহার করে মানুষের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তবুও তাঁর কবিতায় আমরা যে অনুপ্রাসের উপস্থিতি লক্ষ করি, তাকে আমরা ভাষার স্বাভাবিক রূপের প্রকাশ হিসেবেই দেখতে চাই।

শব্দালঙ্কারের অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ইত্যাদির ব্যবহার আবুল হোসেনের কবিতায় নেই বললেই চলে। তিনি কবিতা লিখেছেন অন্তরের টানে, অলঙ্কারের সচেতন প্রয়োগে আগ্রহ দেখান নি তিনি। আবুল হোসেনের কবিতার প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ইত্যাদির ব্যবহার তেমন সহায়ক নয় বলেই আমরা মনে করি। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা শব্দালঙ্কারের এইসব অনুষঙ্গের আলোচনা থেকে বিরত থেকেই আবুল হোসেনের কবিতার প্রাকরণিক প্রবণতাটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার নির্ভর করে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহের অর্থের ওপর। এই অলঙ্কারে অর্থই গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়, শব্দধ্বনির আধিপত্য এখানে অস্বীকৃত। অর্থ অক্ষুণ্ন কিংবা অপরিবর্তিত রেখে সমার্থক শব্দের ব্যবহারে এই অর্থালঙ্কারের আবেদন ক্ষুণ্ন হয় না। ‘অর্থালঙ্কার বহুবিধ হলেও শ্রেণীগতভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়– সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক ও গূঢ় প্রতীতিমূলক।’ (‘অমরেন্দ্র গণাই ১৯৮৪ : ১১)। অর্থালঙ্কারের উপরিউক্ত সব শৃঙ্খলার বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা আবুল হোসেনের কবিতা থেকে অর্থালঙ্কারের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি দিকে আলোকপাত করতে চাই।

উপমা

কেবল সৃষ্টিশীল রচনায় নয়, আমাদের প্রাত্যহিক কথোপকথনেও প্রচুর উপমা ব্যবহৃত হয়। একজন সৃজনশীল মানুষ সেই উপমাকেই আরো গভীরতর অর্থে ব্যবহার করেন যা কবিতার শরীরেই কেবল দ্যুতি ছড়ায় না, কবির ভাবকেও তা দান করে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা। জীবনানন্দ দাশ উপমাকেই কবিত্বের মানদণ্ড হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। ব্যাকরণগত অর্থে উপমার সীমানা লঙ্ঘন করে ‘বড়ো অর্থে নিলে এ-কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা’– বুদ্ধদেব বসুর (১৯৯৭ : ৫৪) এই বিবেচনাই বোধকরি জীবনানন্দের উপমা-ভাবনার অনুকূল আবহ সঞ্চার করে। কবিতার অবয়ব অনুধাবনে উপমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। অলঙ্কারশাস্ত্রে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারসমূহের মধ্যে উপমার মাধ্যমেই কবির সৃজনভাবনার গৌরব ও সৌরভ অধিকতর অভিনবত্বে উদ্ভাসিত হয়। তাই কোন কোন সমালোচক সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হিসেবে উপমার স্বভাবকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। উপমাকে কবিতার প্রাণশক্তি হিসেবেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন কোন কোন সমালোচক। নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি :

> মোটামুটিভাবে বলা চলে শব্দ যদি কবিতার শরীর হয়, তাহলে উপমা হচ্ছে তার প্রাণ, যেহেতু উপমা ভাব-নির্ভর। শ্রেষ্ঠ গদ্য নিদর্শনে শব্দের ব্যবহারিক দিকটাই স্পষ্ট, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে শব্দ-ব্যবহার তার মধ্যে রয়েছে ‘আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা’ ও গভীর রহস্যময়তা– আমাদের সাধারণ বুদ্ধির আওতায় যার স্বরূপনির্ণয় অনেকটা দুরূহই বলতে হবে। উপমা সেই রহস্যময়তা ও প্রত্যাশাকে কাব্য-সম্ভবপরতার মধ্য দিয়ে কবিতাকে রহস্যাবৃত অথচ পরিপূর্ণ রূপ দিতে সক্রিয়। (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১২)

কাব্যসৃষ্টিতে সাদৃশ্য কিংবা সামঞ্জস্যের ধারণা কেবল দৃশ্যমান বস্তুজগতেই আবর্তিত হয় না, তা কবির অনুভবের জগতেও পাঠককে আমন্ত্রণ জানায়। মূর্ত ও বিমূর্তের সম্পর্কসেতু নির্মাণের মাধ্যমে উপমা সংহত অবয়ব লাভ করে

Dhaka University Institutional Repository

বলেই তা কবির জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পিত প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃত। উপমা কেবল কবির বিমূর্ত ভাবনাকেই প্রকাশ করে না, এই প্রকাশ-প্রবণতার মধ্যে ধরা পড়ে তাঁর দূরদর্শিতা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবির ব্যক্তিত্বের উষ্ণতায় উপমা ঋদ্ধ হলেই কবিতায় বিম্বিত 'দূর' পাঠকের 'নিকটবন্ধু' হয়ে ওঠে। এভাবেই কবির অনুসন্ধিৎসা সুদূর এবং অপরিচয়ের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে তোলে, যা কেবল ইঙ্গিতময়ই নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও বটে। *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* কাব্যের 'কতকাল খেলছি লেখার খেলা' শীর্ষক কবিতায় আবুল হোসেন বলেছেন, 'উপমার আলোজ্বলা পথে গেছি হেঁটে'। শব্দের খেলায় উপমার সাহচর্য বেশ উপভোগ করেছেন কবি। আবুল হোসেনের কবিতায় উপমার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

নব-বসন্ত

ক. বেলাভূমিতে ঝিনুকের মতো অগণ্য দ্বীপ, ('সারেঙ')

খ. পাহাড়িয়া শীত সাপের মতো ঢুকেছে ওদের শরীরে,/ওদের দেহের প্রতি অনুপরমাণুতে
ঢুকেছে ধারালো ছুরির মতো উলঙ্গ তীক্ষ্ণ শীত। ('ঘোড়সওয়ার')

গ. রূপালী ঝর্ণার মতো চিকচিকে সকাল/নামছে আকাশের গা বেয়ে। ('আমার সোনার দেশ')

ঘ. যে আকাশ থেকে সোনালী ধানের মতো রোদ আসে, বর্ষা
নামে চোখের জলের মতো আর জ্যোৎস্না ছড়ায় রক্তের
ফিনকি দিয়ে। তারপর মেঘের মতো পীচের মতো নরম
নিবিড় অন্ধকার। এই সব লাল নীল কত পাখি আর
আলোর মতো তুলোর মতো হালকা বাতাস। মনে থাকবে
কি এই নিঃস্রোত নদীর মতো দিন? এইসব কুসুমের
মাস, খাপখোলা ক্ষীণ চাঁদ, অন্তহীন অরণ্যের মতো মেঘ? ('উত্তরাধিকার')

ঙ. আমার রক্তের মতো রাঙা তার শরীর,/আমার মনের মতো বিস্মিত মুগ্ধ চোখ,
আমার স্বপ্নের মতো কোমল উজ্জ্বল বুক,/হৃদয়ের সেই মেয়ে আমার
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে নেমে এল। ('চিরকালের সেই মেয়ে')

চ. জ্বলজ্বলে ইস্পাতের মতো আকাশ;/লাল নয়, নীল নয়, কালো নয়, সাদা নয়।
একদল চিল ওড়ে ঘুরে ঘুরে। ('প্রতীক্ষা')

বিরস সংলাপ

ক. কখনও বা প্যাঁচার মতন/হাঁড়িমুখ করে। ('শতবর্ষ পরে')

খ. দেখতে দেখতে গাঁয়ের খোলা মাঠ ছেড়ে/নিয়ে গেল চিলের মতো ছোঁ মেরে ('কাঁদারও অপেক্ষা রাখে না')

গ. দেহ তো আর পাথর নয়, মাংস আর মেদ, /এবং মাংস মোমের মতো, ('মেহেদির জন্য')

ঘ. মুখের ভাষার মতো ভাষা আছে চোখেরও-/নাইবা বললে, জ্বলে তারায় তারায়!
মুখের চোখের মতো ভাষা আছে মনেরও- ('হৃদয়ের ভাষা')

ঙ. সকাল সন্ধ্যে অন্ধের মতো/জীবনের ঘানি প্রাণপণে টানি, ('নায়ক')

চ. বালবের ছেঁড়া তারের মতন/থরথর হাত। ('বাঁচব কি')

ছ. ঝর্ণার দূরাগত ঝঙ্কারের মতো আসে/ঝিরঝিরে জলের একটানা বাজনার সুর, ('বর্ষার দিনে')

জ. মাস্তুলের মতো/দেখা যায় খাড়ির চড়ায় কি যেন রয়েছে প'ড়ে। ('দ্বীপ')

ঝ. তাতানো লোহার মতো ছড়ায় ছিটকায় অনবরত/হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে কামারশালায়। ('শয়তান')

ঞ. বুকের মাঝে তুলোর মতো নরম পাখির উষ্ণ ছোঁওয়া লাগে।...
সমস্ত দিন সারা রাত মনের মাঝে/অবিশ্রাম সমুদ্রের মতো শুনি তোমার গান।
মেহেদি, তুমি অরণ্যের মতো গহন,.../মেহেদী, তুমি পর্বতের মতো পরম বিস্ময়,
হাওয়ার মতো পানির মতো সহজ তুমি, আশ্চর্য অদ্ভুত, ... ('এ দেশে আমরা একা')

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. আজ সারা দিন আমি মাতালের মতো হেঁটেছি বসেছি ('ক'লকাতা ১৯৭৯')

খ. মার্কিন ছবিতে দেখা/ঘোড়ার বাচ্চার মত তিড়িং বিড়িং করে নাচে ('মেয়ে দুটো')

গ. এই খেলা খই ফোটার মতন কখনও ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা')

ঘ. অন্ধকারে, পোষ-না-মানা/অবাধ্য এক ঘোড়ার মতো। ('হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস')

ঙ. শব্দ উঠছে খন্ খন্ করে ফাঁটা ঢাকের মতো। ('আলো, তোমাকে ভয় পাই না')

চ. আয়নার মতো নদী/এঁকে বেঁকে গেছে কতদূর ('ডায়রির ছেঁড়া পাতা থেকে')

ছ. লুটের বখেরা নিতে এসেছিল বর্গীর মতন/এখন তারাই ঝুলছে নিজেদের লাগানো ফাঁসিতে। ('শিকারের কবিতা')

জ. যখন ছুটে এল দুঃস্বপ্নের মতো/হয়ে গেলো সমস্ত শহর ('আমরা কি পারব না')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. বসে আছে যক্ষের মূর্তির মতো একা একজন/নিঃশব্দ বিনিদ্র পাহারায়। ...('সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা')

খ. আমাকে ষাঁড়ের মতো/অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়/সমস্ত জীবন। ('রাবণ')

গ. প্রশ্নের জবাব খোঁজা জটিল আলাপ সংলাপের/বাঁকা স্রোতে, টলমল ডুবুরীর মতো।... ('সক্রেটিস')

ঘ. আর এদিকে আমি তো/কাছা খুলে তালকানার মতো শুধু পালাচ্ছি, পালাচ্ছি ('দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে')

ঙ. সমস্ত রাগ হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ক্ষোভ/অভিমান, ক্লান্তি ও বিক্ষোভ
ঝড়ে যায়, হেমন্তের পাতার মতন,...' ('যখন নারীর কাছে যাই')

চ. আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে/যখন সেই শব্দগুলো
বিদ্যুতের মতো/ বেরিয়ে আসে কলমের ডগায়... ('আমার অস্ত্র')

ছ. বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে/বোনের মায়ের কান্নার মতো। ('বৃষ্টি, বাতাস, মেঘ')

জ. দেখার আগেই ঘিরে ফেলে–/পাহাড়ী সড়কে 'ফগের' মতো,
শীতের রাত্রে যেমন হিম। ('দুঃখ')

এখনও সময় আছে

ক. সারা রাত ধরে ঝর্ণার মতো কী রক্ত ঝরেছিল। ('ভালবাসা এলে')

খ. বসায় নি সে কি, কাটে নি ছেড়ে নি বাজে কাগজের মতো?...
এই বিবর্ণ সকাল, ফ্যাকাশে আকাশ, বালির মতো
বৃষ্টির ছাট এমন আর কি খারাপ করবে মন? ('কারও মুখ আর দেখতে চাইনে')

গ. যে সব জাদুকরী শব্দের বুদবুদ ফুটেছে খইয়ের মতো,...
দম বন্ধ করে ভূত-তাড়ানো ওঝার মতো,
মন্ত্রের পর মন্ত্র আউড়ে যেতে যেতে দেখি ('অজাতক)

ঘ. কখন ভেড়ার মতো চলছে সে নিজেও জানে না। ('অভ্যাসের দাস')

ঙ. চুল ছোঁব নিয়মমাফিক হাত বাড়ানোর মতো, ('অভ্যাসের দাস')

চ. স্যামোয়ার রাণীর মতো সে/বসে আছে। ('বয়স কি ছুঁতে পারে তাকে)

ছ. ...যেন সে জ্বলে
উঠতে পারে বারুদের মতো, তার গলা চড়ে আর
ছাঁপোষা জীবন তাকে টেনে ধরে রাখতে না পারে। ('সময়ের স্রোতে')

জ. তবু সে গলায় কাঁটার মতো/আটকে থেকেই গেল। ('ভুল ভালবাসা')

ঝ. তার ফুটবলের মতো চোখ দুটো যেন...
শরীর তো নয়, বিদ্যুৎ,/মেঘনাদের মতো গলার আওয়াজ। ('ফররুখ আহমদ')

ঞ. কখন সমস্ত ঝুরঝুরে কাঠামোটা
ভেঙে পড়ে বরফ ধসের মতো ('তের শ' সালের বিহঙ্গ')

ট. ট্রটস্কির মতো দেশ ছাড়া করে/নয়তো ক্রুশ্‌চেভের মতো মুকুট খুলে নিয়ে
মাথায় ঘোল ঢেলে/ফেলে দেয় ভাগাড়ে। ('শেষ বল')

আর কিসের অপেক্ষা

ক. দেখেছি মেঘের মতো যে পাহাড়/খেয়েছি নদীর পানি দুধের মতন ('সে দিনের পর')

খ. পানির মতো নিরীহ আর কি আছে? ('রক্ত না পানি')

গ. পাট করে তুলে রাখা বিয়ের শাড়ির মতো
ঝলমলে দিনরাতগুলো ('কি করে ফিরে যাব')

ঘ. বরফের পাহাড়ের মতো/ডুবে থাকে লবণের পানিতে। ('জাহাজগুলি')

ঙ. দিনের পর দিন পাথর খোদাই করার মতো
কাঠ কুঁদে কুঁদে যে এই নক্সা করেছে ('ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে')

চ. আমার দু'পাশে নিঃশব্দ নদীর মতো মানুষের স্রোত, ('বন্ধ্যা বেঁচে থাকা')

ছ. ফাটা চামড়ার ভেতর থেকে কাঠির মতো হাড়গুলো
এমন ডালপালা মেলে চাদ্দিকে বেরিয়েছে,/রিলিফ ম্যাপের মতোই দেখায়। ('জাগতিক সম্পর্ক')

জ. কেমন সহজে সে হাঁটছে সদর সড়ক ধরে
টাবুরে নৌকার মতো ভিড় ঠেলে,... ('কারখানার মেয়েটা')

ঝ. অনেকেই কচুরিপানার মতো/সারা জীবন ভেসে বেড়ায় ইতঃস্তত। ('মানুষ ও সভ্যতা')

ঞ. গলায় লতার মতো হালকা গয়না
চুল বাঁধ কখনও টান টান করে
কখনও এলো খোঁপায়
কখনও ছড়িয়ে দাও পিঠের ওপর ঢেউয়ের মতো
কখনও বা ফুটন্ত ফুলের মতো তোড়া করে। ('একই কাজ')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, 'উপমা-আশ্রিত পঙ্‌ক্তিতেই আবুল হোসেন সবচেয়ে সবল-স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত। শব্দের ওপর অত্যাচার নেই তাঁর কবিতায়। কষ্টকল্পিত উপমায় তিনি পাঠককে বিভ্রান্তও করেন না। তাঁর অন্তরের স্পর্শেই শব্দ প্রবল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি সরল-সংক্ষিপ্ত পঙ্‌ক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর অন্তর্গত ভাব ও ভাবনাকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।' (তারেক রেজা ২০১২ : ১৩৮)। যা কিছু দেখার অতীত, যাকে কিছুতেই ধরা যায় না, সেই জগতকে তিনি স্পর্শযোগ্য করে তোলেন। তাঁর কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক যেমন নিবিড়, তেমনি তিনি উপমার সঙ্গেও উপমেয়কে সংস্থাপন করেছেন সুদৃঢ় বন্ধনে। কোলাহল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের বিশ্বাসকে যেমন তিনি বাণীরূপ দিয়েছেন, তেমনি অসঙ্গতি ও বিপর্যয়কেও বিচিত্র সব উপমায় বিম্বিত করেছেন কবি। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতার অন্তর্গত আভিজাত্য। কবির শিল্পভাবনা দূরত্বের দাহ থেকে মুক্ত থাকতে চায় বলেই দূরকে নিকটবর্তী করে তোলেন তিনি। এই শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ তাঁর উপমা-আশ্রিত পঙ্‌ক্তিসমূহে স্পষ্ট। আবুল হোসেনের কবিতায় নির্মিত উপমাসমূহে আপাত অসামঞ্জস্যের বেদনা প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে প্রকাশ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষায় উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে গভীরতর সাদৃশ্য সত্ত্বেও কবিকল্পনার নৈপুণ্য ও অভিনবত্বের জোরে তাতে প্রযুক্ত হয় প্রবল সংশয়ের আভাস। এই সংশয় প্রকৃত তথা উপমেয়ের সঙ্গে পরাত্মা বা উপমানের সাদৃশ্য-ভাবনাকে সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট করে তোলে। উৎপ্রেক্ষা শব্দটির আভিধানিক অর্থ উৎকট জ্ঞান হলেও কবি-প্রতিভার স্পর্শে এই উৎকট জ্ঞান, কল্পনা বা মিথ্যা পাঠকের বিশ্বাসের ভিতকে দৃঢ়তা দেয়। শিল্পসমালোচক ক্ষুদিরাম দাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> উপমেয়কে নিষেধ বা বর্জন না ক'রে যেখানে কবি-প্রতিভাবলে আহৃত উপমানের পক্ষে সত্যতা-সংশয় গড়ে তোলা হয় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

এতে কবির এমন বর্ণনকৌশল থাকে যে, উপমেয় বা প্রকৃত উপস্থিত থাকলেও কাল্পনিককেই সত্য বলে বোধ হয়। কবি তাঁর প্রতিভাবলে কাল্পনিক বা মিথ্যাকে এমনভাবে স্থাপন করেন যাতে তাকে সত্য বলে মনে ক'রে চমৎকার বোধ করতে পাঠকের এতটুকু বিলম্ব হয় না। উৎপ্রেক্ষা বিশেষভাবে কবি-কল্পনার উপর নির্ভরশীল। (১৯৯৪ : ৯২-৯৩)

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার– বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দ যেমন– বুঝি, যেন, অনুভবি বা অনুভব করি, মনে হয়, গণি, জানি ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকলে তা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। প্রস্তুত বা উপমেয়কেই অপ্রস্তুত বা উপমান বলে সংশয় প্রকাশ পেলেও তাতে যদি সংশয়বাচক শব্দ অনুপস্থিত থাকে তাহলে তা প্রতীয়মাণোৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষায় সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। উৎপ্রেক্ষায় যে সংশয়ের আবহ সঞ্চারিত হয় তা পাঠকের নিঃসংশয়ের অভিব্যক্তিকে তীব্রতর করে তোলে। জীবন ও জগতের বিচিত্র অনুষঙ্গে প্রজ্ঞাবান শিল্পচৈতন্যের স্পর্শেই উৎপ্রেক্ষা-আশ্রয়ী কাব্যপঙ্ক্তি লাভ করে গভীরতর অনুরণন ও অর্থদীপ্তি। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উৎপ্রেক্ষা-নির্ভর পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

নব-বসন্ত

ক. আমাদের প্রাণহীন মমি/পাথরে খোদাই মূর্তি। ('মমি')
খ. আমার মনের প্রান্তে পড়ে যেন তাহারই প্রসাদ। ('অসমাপ্তি')
গ. পল্লীর কানে কোনে স্টীমারের ভেঁপু যেন ('সারেঙ')
ঘ. সকালের এই ঝকঝকে বন/তখন যেন রাশি রাশি প্রেত ('আমার সোনার দেশ')
ঙ. মনে হয় বলি/অবিরত গানের মতো সে গন্ গুন্ করে অন্তরে ('কি বিস্ময়')
চ. যেন এক অন্তহীন অরণ্যের মেঘ/জমে আছে আমার এই কামরায়। ('আলো নিভিয়ে')
ছ. আমাকে প্রহার করে বাইরের আনন্দ উল্লাস। ('ঈদের সকালে')

বিরস সংলাপ

ক. মিছিলে ফেস্টুনে ফ্লাগে মাতাল শহর। ('ফাল্গুন, ওগো ফাল্গুন')
খ. তরতরানি কলকলানি দস্যি সোনা
মেয়ে তো নয়, হাউই যেন ঝড়ের কণা। ('মেয়েটা')
গ. যেন কোন্ দূর আকাশ বাতাস আজ
গান হয়ে গলে যায় মাটিতে অরণ্যে ঘাসে। ('বর্ষার দিনে')
ঘ. আমার মন এক ছোট্ট দ্বীপ ('দ্বীপ')
ঙ. হয় তো চলেছি ট্রামে
দক্ষিণে বামে অন্তহীন ইটের দেয়াল মন্ত্র পড়ে। ('শয়তান')
চ. রক্ত যেন নীর,/ঝরে অবিরাম। ('শেষ যুক্তি')
ছ. হয় তো বা ঝড়ো বৃষ্টি আর দুপুরের রুক্ষ ক্ষণ
বুটের তলায় দলে তুচ্ছ ক'রে আমিও যেতাম। ('ছাতাটা')

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. চোখের পলকে/জেগে জেগে দেখা স্বপ্নের মতোই যেন। ('শুধু তাঁর ছায়ায় বেঁচে থাকি')
খ. বন্যাটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে কাগজ থেকে। ('কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে')
গ. দূর থেকে ওরকমই মনে হয়/চাঁদের থেকেও চাঁদ যেন মোহময়। ('চাঁদে যাবে যাও')
ঘ. আর কেমন ক'রে জানি ভেঙ্গেছিল আমার গলা।
সে তো যুগ নয়, যেন যুগান্তর। ('আলো, তোমাকে ভয় পাই না')
ঙ. আর টেবিলে একটা মাছি মা এমন
আঁৎকে উঠতেন যেন ভূমিকম্প হচ্ছে ('মা ছিলেন')
চ. কখনো মরিয়া হয়ে যেন তার বড্ড তাড়া, যেতে
হবে এক্ষুণি কোথাও, হাসপাতালে না রেল স্টেশনে, ('রাস্তার আর্ত লোকটা')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. বোলার তো নয় যেন এক্সপ্রেস ট্রেন (‘ওপনিঙ ব্যাটস্‌ম্যান’)

খ. ঘরময় কালের যাত্রার স্মৃতি গম গম করে। (‘সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা’)

গ. ওর বুকের খাঁচা ভেঙে যেন বেরিয়ে আসবে
ভেতরে আটকে থাকা কি একটা উচ্চারণ (‘জন্মদিন’)

ঘ. আমরা দু’ভাই, আবহকালের মানুষের
শুয়ে আছি ঢেউ-এর একই খাটে। (‘তোমরা ও আমরা’)

ঙ. এইসব ভাঙাভাঙা ছবি কাঁপতে দেখি
ঠিক যেন এক জ্যোতিষীর স্ফটিক গোলকে। (‘অন্ধের নিশ্চিত পা-ফেলা’)

চ. যেন খোলা জায়গা এ নয়, আমরা ক’জন কেনা
গোলাম, অথবা কেউ ক’রেছে এমন সম্মোহন (‘বিকর্ণের বিস্ময়’)

এখনও সময় আছে

ক. মরালের গলা যেন/দুই হাত তার,
দাভিঞ্চি দিয়েছে এঁকে/হাসি তার ঠোঁটে,
গঁগ্যা বুঝি এই/কোমর নিতম্ব দেখেছিল
এক দ্বীপে। (‘বয়স কি ছুঁতে পারে তাকে’)

খ. সেই যে দাঁড়ালে–/পার হয়ে গেলে বুঝি যুগ যুগান্তর। (‘অসম সমর’)

গ. তার ফুটবলের মতো চোখ দুটো যেন
নীল আগুনের গোলা (‘ফররুখ আহমদ’)

ঘ. ...আবেগের উঁচু
মিনার ছেড়ে পা রাখতে হয় মাটিতে, যেন সে জ্বলে
উঠতে পারে বারুদের মতো (‘সময়ের স্রোতে’)

ঙ. সুরের রেশটা এখনও কানে লেগে আছে।
আমেজটা বুঝি মন থেকে কখনো যাবে না। (‘প্রথম প্রশ্ন : শেষ উত্তর’)

চ. ...যেন একান্ত আপন মনে, হঠাৎ বললেন,
‘মন থেকে যা না-আসে তা না-লেখাই কি ভাল নয়?’

ছ. কখনও বা দৌড়ে, রেসের ঘোড়ার মতো–/যেন বাজি রাখা আছে, (‘এত দূর এসেও’)

জ. কে যেন ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে
মুছে নেয় মানুষের মুখ
চেনা অচেনার চিহ্ন। (‘এত দূর এসেও’)

আর কিসের অপেক্ষা

ক. বুকের ওপর ফুলের গাছ তো না
সাজিয়েছে ভালবাসার পাথর। (‘ধরে রাখা বেঁধে রাখা’)

খ. অথই অকুল সমুদ্দুরে
অথবা এক মহাশূন্য চারদিকে
তারই মধ্যে ভাসছি আমি অনন্তকাল।
তার চেয়ে বেশি ভাবতে ভাল লাগে
হয় তো কেউ হাত বাড়িয়ে সঙ্গে টেনে নেবে (‘আমার জায়গা কোথায়’)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে আমরা আবুল হোসেনের কবিতায় নির্মিত উৎপ্রেক্ষার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি। উৎপ্রেক্ষায় কবির অভিজ্ঞতার স্ফুরণ যেমন স্পষ্ট, তেমনি অভিজ্ঞতার শিল্পায়নে তাঁর প্রযত্ন প্রয়াসের স্বাক্ষরও এতে ধরা পড়েছে। অদৃশ্য ও অনুভবভেদ্য অনুষঙ্গকে পাঠকের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চেয়েছেন কবি। উৎপ্রেক্ষার

ব্যবহারে কবির উপলব্ধির জগৎ যেমন সংহতি লাভ করেছে, তেমনি তাঁর সৌন্দর্যচেতনাও পেয়েছে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা। প্রকৃত এবং পরাত্মার মধ্যে সংশয়ের অনুরণন সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি যে উৎপ্রেক্ষা নির্মাণ করেন, তাতে কবিচৈতন্যের প্রকাশ সহজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

রূপক

আবুল হোসেনের কবিতায় ব্যবহৃত রূপকে উপমেয় ও উপমানের পার্থক্যই কেবল অপহৃত হয় না, তাঁর কবিতার কথ্যভঙ্গিতে তা যোগ করে অনাস্বাদিত রূপ ও লাবণ্য। নিরঙ্গ, সাঙ্গ এবং পরম্পরিত– এই তিন প্রকার রূপকের উপস্থিতিই তাঁর কবিতায় লক্ষ্যযোগ্য। রূপক কেবল কবিতার রূপ বা সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, কবির বক্তব্যকেও তা সংহতি দান করে। উপমেয় এবং উপমানের ব্যবধান অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের সঙ্গে পাঠকের দূরত্বকেও উপেক্ষা করতে চান। ভাষার ওপর কবির দখল কতটা সাবলীল, কবিতায় ব্যবহৃত রূপক থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব। "রূপকে বোঝানো হয় যে বৈসাদৃশ্য একেবারে নেই, সাদৃশ্য এত প্রবল যে উভয়কে অভেদ ভাবে দেখাই ঠিক। কিন্তু এটুকুও মনে রাখতে হবে যে 'রূপকে' উপমেয় বা বিষয়কে নিষেধ করা হয় না। উপমেয় সেখানে আছে, উপমানের সঙ্গে অভেদভাবে আছে।"– রূপক সম্পর্কে ক্ষুদিরাম দাসের (১৯৯৪ : ৭৮) এই মন্তব্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব যে, রূপক ব্যবহারের প্রবণতা থেকে কল্পনাপ্রতিভার অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে কবির আত্মবিশ্বাসের স্বরূপটিও অনুধাবন করা সম্ভব। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

নব-বসন্ত

ক. শ্রান্তিবিহীণ শিকারী আঁখির পাতা ('নবযুগ)
খ. তাদেরও অন্ধ জীবনের তলে উঁকিঝুঁকি মারে রাজকুমার ('বাংলার মেয়ে')
গ. আকাশে বজ্রবাহিনী মেঘের বিপুল আর্তনাদ, ('নব-বসন্ত')
ঘ. হৃদয়-সমুদ্র মোর কামনায় উদ্দাম উত্তাল, ('প্রাগৈতিহাসিক')
ঙ. সৌন্দর্য-ক্রন্দন-নীরে সৃষ্টি করি স্নিগ্ধ সরোবর, ('মূষিক')
চ. শতাব্দীর মৃত্যুনীল আকাশে আকাশে। ('স্বপ্ন')

বিরস সংলাপ

ক. কখনো বা প্যাঁচার মতন/হাঁড়িমুখ ক'রে। ('শত বর্ষ পরে')
খ. টাকার কুমির আর ন্যাংটো নটবর
লেঠেল জোয়ান আর তালপাতার সেপাই ('কাঁদারও অপেক্ষা রাখে না')
গ. পোড়া কাঠ, পোকাকাটা শাস্ত্রের আড়ালে ঝলসায়, ('জনৈক নাট্যকারের মৃত্যুতে')
ঘ. দেশে দেশে আমাদের প্রাণের স্বদেশ ('স্বদেশী কোরাস')
ঙ. সময়ের সীমাহীন দরিয়ায়
জীবন জাহাজ পাড়ি দিয়ে যায়, ('বাঁচব কি')

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. চুলে, চিবুকে ও ঠোঁটে দেখি এই পিপাসার মরু ('গোধূলি শেষের আলোছায়া')
খ. স্মৃতির সুড়ঙ্গ দিয়ে তিন দশকের পোকাগুলো
কিলবিল ক'রে আসছে ধেয়ে, ('ক'লকাতা ১৯৭৯')
গ. ছড়ানো স্মৃতির টুকরো টুকরো আয়নায় ভাসে, ('যাওয়া, ফিরে আসা')
ঘ. হবে কি এমন দিন কোন দিন উত্তাল এক মাতাল রাত্রে ('হবে কি এমন দিন কোন দিন')
ঙ. ফুৎকারে উড়ে যায় বিশ্বাসের চাল
রীতির নীতির হাল,
শূন্যতার হাঁ-মুখ সম্মুখে। (দুঃশীল কালের বন্যায়')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. আমি মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে
বেরিয়ে এলাম খোলা আলোয়। ('জন্মদিন')

খ. সম্রাটের দরবারে
বসে বিদ্রূপের চাবুকে যে তাকে পেটাতেও পারে, ('ভল্টেয়ার')

গ. এরই মধ্যে শূন্যের আবছা স্বপ্নগুলো/ ভাসতে ভাসতে
চৈতন্যের ঘাটে ভেড়ে। ('অন্ধের নিশ্চিত পা-ফেলা')

ঘ. হাঁ করে দেখব চেয়ে নির্লজ্জ উলঙ্গ মত্ততার
এই দৃশ্য ('বিকর্ণের বিস্ময়')

ঙ. আমার জমানো আশার টুকরোগুলো ('অহঙ্কার')

এখনও সময় আছে

ক. এই যে তোমাকে নিয়ে চাদ্দিকে বেলেল্লা হৈ হুল্লাড়
আমি তার মধ্যে নেই ('কবিতাকে সান্ত্বনা')

খ. বিকেলে বাতাস যখন
বৃষ্টির চাবুক হাতে
গোঁ গোঁ করতে করতে
ঝাঁপিয়ে পড়ল শহরে, ('সেই ঝড়')

গ. অপমানের পাহাড় আর বেঁচে থাকার একঘেয়েমি। ('অভ্যাসের দাস')

ঘ. অক্ষরের হরিণগুলো নেচে যাচ্ছে ('অজাতক')

ঙ. দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা সংশয়ের পাথরে
হোঁচট না খেয়ে, ('নিশ্চিত আশ্রয়')

আর কিসের অপেক্ষা

ক. হৃদয়ের গনগনে আগুনে পুড়িয়ে, ('কি ক'রে ফিরে যাব')

খ. জীবন জাহাজ সে আঘাত
পারবে কি আদৌ সামলাতে? ('জাহাজডুবি')

গ. লেখা বুকের জাবদা খাতায়। ('যতক্ষণ না শুয়ে পড়ি')

ঘ. ...তোমার মনের পড়ো মাটি আর
শুকনো ঘাসের ঠোঁট ভিজায় নি ভোরের শিশির ('কবিতার বাইরে')

ঙ. জীবনের নদী ভরে উঠেছে যখন সুখে, দুঃখে ('কবিতার বাইরে')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহের নিম্নরেখ শব্দবন্ধ থেকে আবুল হোসেনের রূপক-নির্মাণকৌশলের ধরন অনুধাবন করা যায়। রূপকের ব্যবহারে তাঁর কবিতায় যে রূপ ও লাবণ্য সঞ্চারিত হয়েছে, তা কবির জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত। আবুল হোসেন কাব্যচর্চায় মানুষের জীবনাযাপনের নিকটবর্তী থাকতে চেয়েছেন। তাই রূপকের ব্যবহারে তাঁর কবিতার ভাষা সংহত অবয়ব লাভ করলেও তা সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাধারণ কথনকৌশলের অনুরূপ। ভাষার সংক্ষিপ্ত অবয়ব তাঁর কবিতায় কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করে না, কিন্তু কবিতায় বর্ণিত ভাব, বিষয় কিংবা রূপকল্পের অন্তর্গত শক্তি ও সৌন্দর্যকে তা দান করে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা।

সমাসোক্তি

আবুল হোসেন বিষয় বা উপমেয়ের ওপর বিষয়ী বা উপমানের ব্যবহার আরোপ করে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের শরীরে যেমন গতি সঞ্চার করেন, তেমনি তাঁর বলার কথা বা বিষয়টিকে তিনি করে তোলেন প্রবল ও প্রাণবন্ত। নিষ্প্রাণ বস্তুসমূহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে সমাসোক্তির সৃষ্টি, তা কেবল পাঠকের চেতনাকেই সচকিত করে না, এর মাধ্যমে কবির অভিব্যক্তি পাঠকের নানা ইন্দ্রিয়ের কাছে সবল ও সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। আলঙ্কারিক বিবেচনায় কবিতায় বর্ণিত

Dhaka University Institutional Repository

চেতন, অচেতন, মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণীর ওপর যে কোন বস্তুর স্বভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সমাসোক্তি বলা হলেও প্রাণহীন কিংবা অধরা অনুভূতিকে মানবীয় আবেদন আরোপের মাধ্যমেই সাধারণত সমাসোক্তির সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ, কবিতায় কেবল প্রাণবান অস্তিত্বই কবির চিন্তার অনুকূলে ব্যবহৃত হয় না, নিষ্প্রাণ বস্তুকেও কবি তাঁর চিন্তার দোসর করে তোলেন। একজন প্রতিভাবান ও সৃজনশীল কবিব্যক্তিত্বের কাছে সমাসোক্তি অলঙ্কার কোন সচেতন প্রয়াস নয়, তা তাঁর স্বভাবেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। সমাসোক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কবি তাঁর চৈতন্যে সঞ্চার করেন শৈল্পিক সংহতি, যা কবিতার ভাব ও রূপকল্পের সঙ্গে পাঠকের চিন্তা ও কল্পনার সংযোগসেতু নির্মাণে অবদান রাখে।

আবুল হোসেন সমাসোক্তির মাধ্যমে অনুভবকে পাঠকের ইন্দ্রিয়ের সীমায় নিয়ে আসেন। লেখার ভেতর দিয়ে নিজের দেখার জগতকে পাঠকের বোধ ও বিশ্বাসের নিকটবর্তী করে তোলেন তিনি। সমাসোক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের ইন্দ্রিয়কে সজাগ করার ফলে কবিতার সঙ্গে তার সম্পৃক্তি যেমন সুদৃঢ় হয়, তেমনি তার সৃজনভাবনাকেও তা দান করে ভিন্নতর দীপ্তি। কবিতার পাঠ তৃপ্তিদায়ক করার ক্ষেত্রে সমাসোক্তির অবদান তাই স্বীকার করতেই হয়। আবুল হোসেনের কবিতা থেকে সমাসোক্তি-আশ্রয়ী কতিপয় পঙ্ক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

নব-বসন্ত

ক. শহর গভীর ঘুমে নিস্তব্ধ নিঝুম,
সে শব্দ কাঁপন তোলে শাখায় পাতায়, ('ডাইনামো')

খ. শিহরণে মৃত্তিকার দেহ কাঁপে তরঙ্গ দোদুল ('প্রাগৈতিহাসিক')

গ. জ্যোৎস্না রাত লুকাইবে বিস্মৃতির অতল গুহায়। ('অসমাপ্তি')

ঘ. জাহাজের মাস্তুলে ক্লান্ত সন্ধ্যার আবছায়া মূর্তি,
সমুদ্রের জলে নীরব নিবিড় অন্ধকার,
শূন্যে গোধূলিশেষ আলোর চাপা দীর্ঘশ্বাস। ('নাবিক')

ঙ. সময় বিনিদ্র চোখ কাটায় প্রহর ('তবু')

বিরস সংলাপ

ক. সকালের আলো তার চুলের ফাঁকে ফাঁকে
খেলা করছিল কি না জানতেও পেল না, ('তার অপারেশনের পূর্বে')

খ. রাতের ফ্লাটের থাবা আপিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজে চোখ কখনও কখনও
গড়াগুড়ি দেয়, ('কিমাশ্চার্যম')

গ. রজনীগন্ধার গন্ধ কাল
ভেঙ্গে দিল ভীরুতার সব আবরণ ('জন্মদিনে')

ঘ. রক্তের ঢেউ অন্ধ জোয়ারে
মাথা কুটে মরে দেহের কিনারে,
ভাঙা হাড়ে হাড়ে হাওয়ার চাবুক। ('তিরিশ টাকার মাইনেতে')

ঙ. জ্যৈষ্ঠের তপ্ত দিন উষ্ণ দিন আকাঙ্ক্ষায় রাত্রির অপেক্ষা
করে সময়ের রেলিং ধরে। ('ঝড়ের পূর্বে')

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. গোধূলি শেষের আলো খেলা করুক তোমার এলো-
চুলে, চিবুকে ও ঠোঁটে, দেখি এই পিপাসার মরু– ('গোধূলি শেষের আলোছায়া')

খ. অথবা দুর্যোগের দিনে ঝড় আর বর্ষার সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে মগজের মধ্যে

মাতামাতি করত শব্দরা ('জেগে থাকা নয়, ঘুমের অভাবও নয়')

গ. বন্যাটা যেন হাঁ ক'রে গিলতে আসছে কাগজ থেকে। ('কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে')

ঘ. চা'র কাপে লাফায় না ঝড়। ('কী করলাম আমি')

ঙ. যখন ক্ষিধেটা পেটে
মুচড়ে উঠল
ডুগডুগি নিয়ে মাঠের খেলায় ('যাওয়া, ফিরে আসা')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. ঘরময় কালের যাত্রার ধ্বনি গমগম করে। ('সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা')

খ. আমার সমস্ত সত্তা শরীর পেয়ে চোখ মেলে চায়। ('জন্মদিন')

গ. হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শব্দগুলো আসছে উড়ে। ('কবিতার জন্ম')

ঘ. ...যার কলমের
শাণিত নখরে টুকরো টুকরো হাত তাঁর কাল, ('ভল্টেয়ার')

ঙ. লেক থেকে মাথা তুলে কোমর হেলিয়ে
পাথরের মারমেড
দেখছে দৃশ্যটা। ('দুপুরে তুফান, স্ট্রুগায়')

এখনও সময় আছে

ক. বিকেলে বাতাস যখন
বৃষ্টির চাবুক হাতে
গোঁ গোঁ করতে করতে
ঝাঁপিয়ে পড়ল শহরে,
চুলের মুঠি ধ'রে
হেঁচকা টানে গাছগুলোকে
আছাড় দিয়ে শুইয়ে দিল মাটিতে, ('সেই ঝড়ে')

খ. শেফালি বসে থাকে, হাস্নাহেনা ডাকে
চকিত ইশারায়, কোথায় কোন বাঁকে ('পালাও এ শহর ছেড়ে')

গ. অক্ষরের হরিণগুলো নেচে যাচ্ছে
চোখের সম্মুখে রাখা অদৃশ্য কম্পিউটারে। ('অজাতক')

ঘ. ঠোঁটের আলো এসে বসল আমার পাশে,
হাত রাখল পিঠে, একটু চাপড়েও দিল। ('তিনটি লোক')

ঙ. প্রতারক চাঁদ নেমে এসে তার পাশে
ঘন হয়ে বসে কী জাল বিছিয়েছিল। ('ফিরে এলে কেন')

আর কিসের অপেক্ষা

ক. বাতাস ফিস ফিস ক'রে
তোমার সঙ্গে কথাও বলতে পারে না। ('রক্ত না পানি')

খ. বিহ্বল পুতুলগুলো ঘোরে ফেরে
দুঃস্বপ্নের ঘোরে। ('কি ক'রে ফিরে যাব')

গ. নদীর ধারে একলা গ্রামটা ঘুমে ঢুলত এক পায়ে। ('একটি উপকথা')

ঘ. এলোমেলো গাছগুলো
এমন আলুথালু বেআব্রু হয়ে পড়ে ('বৃষ্টির দিনে')

ঙ. ফাটা চামড়ার ভেতর থেকে কাঠির মতো হাড়গুলো
এমন ডালপালা মেলে চাদ্দিকে বেরিয়েছে, (‘জাগতিক সম্পর্ক’)

আবুল হোসেনের কবিতা থেকে সংগ্রহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, সমাসোক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতাকে বর্ণিল ও বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবিচৈতন্যের সারাৎসারকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের অভিজ্ঞতার সীমায়। নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে সপ্রাণ ও গতিশীল জীবনের ব্যবহার আরোপ করে ভাবকে ইন্দ্রিয়ভেদ্য করে তোলেন কবি। উপমেয় ও উপমানের শক্তি ও স্বভাবের পারস্পরিক লেনদেন থেকে কবির জীবনবোধের গভীরতা যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনি অনুভবকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ব্যাকরণটিও এতে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, প্রাণহীন পৃথিবীতে কবিমনের সংবেদনা ছড়িয়ে দিয়ে আবুল হোসেন পাঠকের প্রাণের কাছে গানের মতো বেজে উঠতে চেয়েছেন।

অন্যাসক্ত

আবুল হোসেন জড় বস্তু বা কোন বিমূর্ত বিষয়ের ওপর সপ্রাণ বা চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ আরোপ করে শব্দের গভীরে যে গতি সঞ্চার করেন, তা কবির অভিব্যক্তিকে গন্তব্যে পৌঁছানোর শক্তি এনে দেয়। কবিতায় আমরা যে চিত্ররূপময় ভাষা প্রত্যাশা করি, সমাসোক্তি ও অন্যাসক্তের আশ্রয়ে তার নির্মাণ সহজতর হয়। জড়বস্তুর শরীরে চেতনের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার বা ক্রিয়া আরোপ করে সমাসোক্তি সৃষ্টি করে তিনি যেমন শব্দকে ভাব বহনের উপযোগী করে তোলেন, তেমনি চেতনের গুণাবলি জড়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অন্যাসক্ত অলঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে কবির অভিজ্ঞতা শব্দের হাত ধরে পাঠকের চেতনায় আসন রচনা করে। অন্যাসক্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ একজন কবির সহজাত প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কারণ তিনি জড়ের সঙ্গে জীবনের গভীরতর সম্পর্কের নানা প্রান্তে দৃষ্টি দিতে চান। তাই জীবনের গান জড়ের প্রাণেও শিহরন সঞ্চার করে। আবুল হোসেনের কবিতায় আমরা লক্ষ করব, অন্যাসক্ত অলঙ্কার তাঁর কবিতার শরীরে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। অন্যাসক্ত-অলঙ্কার আশ্রয়ী কয়েকটি কাব্যপঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

নব-বসন্ত

ক. মন্ত্রমুগ্ধ কোন রাতে খুলে দেখেছ, দেখেছ কি তা? (‘পূর্বলেখ’)
খ. বালুকার ব্যাকুলতা, ক্লান্ত রাতে মায়াময় চাঁদ (‘অসমাপ্তি’)
গ. জাহাজের মাস্তুলে ক্লান্ত সন্ধ্যার আবছায়া মূর্তি, (‘নাবিক’)
ঘ. সূর্যশ্রান্ত শাল তাল হিন্তাল ছায়াতে (‘স্বপ্ন’)
ঙ. তারপর মেঘের মতো পীচের মতো
নরম নিবিড় অন্ধকার (‘উত্তরাধিকার’)

বিরস সংলাপ

ক. রাতের ফ্লাটের থাবা আপিসের দেয়াল পেরিয়ে (‘কিমাশ্চার্যম’)
খ. যে ব্যাকুল ভীরু দাবী মগ্ন ছিল মনে (‘জন্মদিনে’)
গ. আর আছে তারও চেয়ে নিষ্ঠুর সময়। (‘দ্বীপ’)
ঘ. কেন এই নিষ্প্রাণ হতাশা (‘শেষ যুক্তি’)
ঙ. শিহরন আর রক্তস্রোতে দুরন্ত ফুটন্ত ঝঙ্কার। (‘চরম মুহূর্ত’)

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. নির্লজ্জ বাতাস এলোমেলো করবে চুল, (গোধূলি শেষের আলোছায়া’)
খ. ঝরঝরে ট্যাকসিতে, ফুটন্ত ফেরী পার হয়ে, কিছু হেঁটে, (‘কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে’)
গ. নিঃসঙ্গ আকাশে,
বাড়িয়ে দিয়েছে হাত (‘কবে বড় হবে’)
ঘ. নিকোনো উঠোনে

সৌখিন সৌফায়, ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা')

ঙ. প্রশান্ত উদয় এক আদিগন্ত উন্মুক্ত আকাশ, ('ফুল, তুমি ফুটন্ত হৃদয়')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. সংশয়ের ঘোলাটে আকাশে তর্কের ঘূড়ি কাটা। ('সক্রেটিস')

খ. নির্দোষ সেভেন আপ ('দুপুরে, স্ট্রগায়')

গ. ছেলেবেলাকার নিরুদ্বেগ আঙিনায় ('স্মৃতি এসে হানা দেয়')

ঘ. আর রাত্রিগুলো ঘুমহীন

দুর্ভাবনার শিকার। ('দুঃসময়')

এখনও সময় আছে

ক. দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা সংশয়ের

পাথরে হোঁচট না খেয়ে ('নিশ্চিত আশ্রয়')

খ. প্রতারক চাঁদ নেমে এসে তাঁর পাশ (ফিরে এলে কেন')

গ. সান্ত্বনাবিহীন যন্ত্রণার

রাত আর ঘরে–

বাইরে বিষাক্ত সমালোচনা ('এক প্রিয়জনের বিয়োগে শোক প্রকাশে অস্বীকৃতি')

ঘ. নির্ঘুম ঢাকার জেলে আমরা যখন অবরুদ্ধ, ('উত্তরাধিকার')

ঙ. বিনিদ্র ফুসফুসের ব্যাকুল/নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ('ভুল ভালবাসা')

আর কিসের অপেক্ষা

ক. বুকের ওপর ফুলের গাছ তো না

সাজিয়েছে ভালবাসার পাথর ('ধরে রাখা বেঁধে রাখা')

খ. পোড়-খাওয়া নির্বাক মাটিতে ('জাহাজডুবি')

গ. নিঃসঙ্গ অচেনা পথে, সারা মুখ ভিজে, ('বন্ধ্যা বেঁচে থাকা')

আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, অন্যাসক্ত অলঙ্কার তাঁর কবিতার শরীরে দীপ্তি সঞ্চার করেছে। আত্মকৃত অভিব্যক্তিকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনে তিনি নিস্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে প্রাণবান অনুষঙ্গে প্রযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন।

চিত্রকল্প

আবুল হোসেনের কবিতা যেমন সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখের ভাষার অনুরূপ, তেমনি তা সজীব বা প্রাণময়, প্রগাঢ় অনুভবযুক্ত ও মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার নানা আয়োজন তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। শব্দের সমবায়ে তিনি যে ছবি আঁকেন, তার আবেদন কেবল দৃষ্টির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সৌরভ ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয় আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ে। চিত্রকল্পকে তিনি কেবল কবিতার বাহ্যিক সজ্জা হিসেবে দেখতে চান নি, তা তাঁর অভিব্যক্তির অনিবার্য অংশ হিসেবেই পরিস্ফুট। তাই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পে কবির অন্তর্গত অনুভবকেও স্পর্শ করা যায়। আবুল হোসেনের কবিতায় নির্মিত চিত্রকল্পসমূহে প্রগাঢ় অনুভূতির স্বাক্ষর যেমন স্পষ্ট, তেমনি বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়ের সীমায় আবদ্ধ না হয়েও কখনো কখনো পাঠকের চেতনায় তার একটি ছবি কল্পনা করে নেওয়া যায়। 'চিত্রকল্প তাই যা মুহূর্তের মধ্যে বর্ণিত জটিল অনুভূতিকে পাঠকের সংবেদী কল্পনায় মূর্ত করে তোলে। এই মূর্ত অভিজ্ঞতার উপলব্ধি শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়গম্যই নয়, পাঠকের ব্যাপক অনুভূতি-সংবেদনশীলতার মুখাপেক্ষী।'– চঞ্চলকুমার ব্রহ্মের (১৯৮৬ : ৬১) এই বিবেচনা আবুল হোসেনের কবিতার চিত্রকল্প অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। আবুল হোসেনের কবিতায় সহজ সৌন্দর্যের যে দীপ্তি তা পাঠকের চিন্তা ও কল্পনা সহযোগেই তৃপ্তিদায়ক

হয়ে ওঠে। তাই তাঁর কবিতার চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমার স্বরূপ অনুধাবনে কবির সঙ্গে পাঠককেও সৃজনশীল হয়ে উঠতে হয়। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে চিত্রকল্প-নির্ভর কতিপয় পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

নব-বসন্ত

ক. শহর গভীর ঘুমে নিস্তব্ধ নিঝুম,
সে শব্দ কাঁপন তোলে শাখায় পাতায়,
আকাশে উঠছে তার গান ঘুরে ঘুরে,
আমার নয়নে সে যে স্বপ্ন-সিঁড়ি খোলে। ('ডাইনামো')

খ. আমরা তো মরে গেছি, আমাদের প্রাণহীন মমি
পাথরে খোদাই মূর্তি। অস্থিসার নির্বাক কঙ্কাল
সনাতন পিরামিড ঐতিহ্যের ধূসর গুহায়
রয়েছে দাঁড়ায়ে আজও। ('মমি')

গ. আমরাও স্বপ্ন দেখি দিনে আর রাতে।
পথক্লান্ত পাখিদের পাখাতে পাখাতে
সে স্বপ্নরা এলোমেলো ভেসে ভেসে আসে
শতাব্দীর মৃত্যুনীল আকাশে আকাশে। ('স্বপ্ন')

ঘ. রূপালী ঝর্ণার মতো চিকচিকে সকাল
নামছে আকাশের গা বেয়ে। ('আমার সোনার দেশ')

ঙ. বিষিয়ে উঠেছে হাওয়া
বক্ষের চূড়ায় চাপে প্রকাণ্ড পাথর,
চক্ষের সম্মুখে কাঁপে ভয়ঙ্কর
বিলুপ্তির গহ্বর চারদিকে। ('কূর্ম')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, আবুল হোসেন তাঁর অনুভব ও উপলব্ধিকে পাঠকের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, পাতায় পাতায় শব্দের কাঁপন ছড়িয়ে দিয়ে শব্দের একটি দৃশ্যমান অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি। গান যখন ঘুরে ঘুরে আকাশে উঠে যায় তখন তা কেবল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কেই সচকিত করে না, তা চলে আসে আমাদের দৃষ্টির সীমায়। তখন স্বপ্নও কেবল অনুভবের সীমায় আবদ্ধ না থেকে সিঁড়ির মতো ধরা-ছোঁওয়ার সীমায় চলে আসে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, মমির ভেতর দিয়ে নিজের মৃতদেহকে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পাথরের রূপকল্পে নিজের মৃতদেহকে ছুঁয়ে দেখার এ অভিজ্ঞতা কেবল বিরলই নয়, ব্যতিক্রম। পিরামিডের ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার ছবিই কেবল পাঠকচৈতন্যে আলোড়ন তোলে না, এই অন্ধকার মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেরও প্রতিভাস রচনা করে। উদ্ধৃতি গ-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বপ্ন যখন পাখিদের পাখায় পাখায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন স্বপ্ন আর কেবল অনুভবের সীমায় আবদ্ধ না থেকে স্বপ্নও মানুষের ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। ভেসে বেড়ানো স্বপ্নের সঙ্গে পাঠকের যুক্ততার একটা ভিন্নতর পাঠ দাঁড় করাতে চান কবি। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি সকালকে যখন রূপালি ঝর্নার মতো চিকচিকে কল্পনা করেন, তখন সকালও আমাদের নানা ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে। কবি যখন আকাশের গা বেয়ে সকালের নেমে আসার কথা বলেন, তখন সকালকে আমরা অনায়াসে ছুঁয়ে দেখতে পারি। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি হাওয়াকে যখন প্রকাণ্ড পাথরের রূপকল্পে নির্মাণ করেন, তখন হাওয়ার একটা দৈহিক অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এমনকি হাওয়ার ওজন পর্যন্ত আমাদের শরীর অনুভব করতে পারে। তাই তা চোখের অর্থাৎ দৃষ্টির সীমায় চলে আসে। হাওয়ার কম্পন পাঠকের বুকের ভেতরেও আলোড়ন তোলে। বিলুপ্তির যে গহ্বরের কল্পনা করেন কবি, সেই বিলুপ্তির আড়ালে নিজেকে নিমগ্ন রাখার আনন্দও উদ্‌যাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করেন তিনি। আবুল হোসেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবিতার ভাষাকে চিত্ররূপময় অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে কবির এই প্রয়াস আরো প্রগাঢ় রূপ পেয়েছে। তাঁর কবিতা কেবল ইন্দ্রিয়ের কাছেই আবেদন পাঠায় না, পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে যায় তাঁর আহ্বান। সেই

আহ্বান কবিতাকে নিজের মতো করে পাঠ করার পথকেই সুগম করে। এই পথে পরিশ্রমের চেয়ে প্রাণের অংশগ্রহণকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে চান কবি।

বিরস সংলাপ

ক. জেলখানার ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির মতো
সকালের আলো তার চুলের ফাঁকে ফাঁকে
খেলা করছিল কি না জানতেও পেল না, ('তার অপারেশনের পূর্বে')

খ. রাতের ফ্লাটের থাবা, আপিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজে চোখ কখনো কখনো
গড়াগড়ি দেয়, ('কিমাশ্চর্যম')

গ. বুকের মধ্যে ছারখার জ্বালা
ফুলে ফুলে ওঠে,
গন্‌গনে সীসে ঢালা ঝাঁঝাঁ কানে,
বালবের ছেঁড়া তারের মতন
থরথর হাত। ('বাঁচব কি')

ঘ. কখন সকাল হয়, দুপুর গড়িয়ে আসে
সোনালী বিকাল
লাফিয়ে মাছের মতো। ('দ্বীপ')

ঙ. রক্তের ঢেউ অন্ধ জোয়ারে
মাথা কুটে মরে দেহের কিনারে,
ভাঙা হাড়ে হাড়ে হাওয়ার চাবুক। ('তিরিশ টাকার মাইনেতে')

আবুল হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিরস সংলাপ* থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহেও আমরা তাঁর চিত্রকল্প নির্মাণকুশলতার পরিচয় পাই। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি সকালকে যখন চড়ুই পাখির উপমায় নির্মাণ করেন, তখন সকালের নৃত্যই কেবল উপভোগ করি না আমরা, সকালের গানও যেন শুনতে পাই। সকালের চুলের ফাঁকে ফাঁকে আলোর খেলা থেকে সকালের একটা দৈহিক অবয়ব কল্পনা করে নেওয়া যায়। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রাতের ফ্ল্যাট যখন থাবা বিস্তার করে, তখন রাত একটা দানবীয় আকার ধারণ করে। আর চোখের গড়াগড়ি দেওয়ার দৃশ্যও পাঠক-চৈতন্যে সঞ্চার করে এক অনাস্বাদিত অনুভব। উদ্ধৃতি গ-তে কবির বুকের ভেতর ছারখার জ্বালা যখন ফুলে ফুলে ওঠে, তখন অন্তর্গত যন্ত্রণার একটা দৃশ্যমান অবয়ব নির্মিত হয়। হাত যখন বাল্বের ছেঁড়া তারের মতন থরথর করে কাঁপতে থাকে, তখন সেই হাতের কম্পন থেকে আমরা সহজেই কবির হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সকাল অতিক্রম করে দুপুর যখন গড়িয়ে যেতে থাকে এবং সোনালি বিকাল যখন মাছের মতন লাফিয়ে চলতে থাকে, তখন সময়কে খুব সহজেই চোখে দেখে নিতে পারি। উদ্ধৃতি-ঙ রক্তের ঢেউকে সচেতন পাঠকের দৃষ্টির সীমায় নিয়ে আসে। রক্ত যখন দেহের কিনারে মাথা কুটে মরে, সেই আলোড়ন বা আন্দোলনকে উপেক্ষা করা কঠিন। হাওয়া কেবল অনুভববেদ্য হলেও তা যখন চাবুকের রূপকল্পে নির্মিত হয়, তখন হাওয়া আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. ...আমি যৌবনের ফ্যাকাশে তুলোজমাট
বালিশে হেলান দিয়ে বেঁচে থাকবার মহড়ায়
এ পাশ ও পাশ করি। ('গোধূলি শেষের আলোছায়া')

খ. অথবা দুর্যোগের দিনে ঝড় আর বর্ষার সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে মগজের মধ্যে
মাতামাতি করত শব্দরা ('জেগে থাকা নয়, ঘুমের অভাবও নয়')

গ. আপনার কলমটা কী জোরালো।
বন্যাটা যেন হাঁ ক'রে গিলতে আসছে কাগজ থেকে। ('কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে')

ঘ. যখন ক্ষিধেটা পেটে
মুচড়ে উঠল
ডুগডুগি নিয়ে মাঠের খেলায়
সেও নেমে এল। ('যাওয়া, ফিরে আসা')

ঙ. ছড়ানো স্মৃতির টুকরো টুকরো আয়নায় ভাসে, ('যাওয়া, ফিরে আসা')

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস কাব্যগ্রন্থে কবির ভাষা কেবল চিত্ররূপময়ই নয়, ভাষাকে গভীরতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপনে কবির প্রয়াস এখানে আরো উজ্জ্বল এবং দূরসঞ্চারী। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তিনি যৌবনকে 'ফ্যাকাশে তুলোজমাট বালিশে'র রূপকল্পে নির্মাণ করেন যা যৌবনের দৃশ্যমান এবং স্পর্শযোগ্য অবয়ব প্রদান করে। উদ্ধৃতি-খ শব্দের দৃশ্যমান অবয়ব নির্মাণের উজ্জ্বল উদাহরণ। মগজের মধ্যে শব্দের মাতামাতি শব্দকে কেবল দৈহিক অবয়বই প্রদান করে না, ঝড়ের রূপকল্পে শব্দকে চিহ্নিত করার প্রয়াস থেকে শব্দের শক্তি সম্পর্কেও পাঠকের ধারণা জন্মে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বন্যার ভয়াবহতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কবি বন্যাকে হাঁ করে গিলতে আসতে দেখেন। উদ্ধৃতি ঘ-তে ক্ষুধার মোচড় থেকে কেবল এর ভয়াবহতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, ক্ষুধার মাঠে নামার দৃশ্যে অনুভব-সম্ভব ক্ষুধাকেও যেন কবি পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, কবি স্মৃতিকে ভাঙা আয়নার টুকরোর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই স্মৃতি কেবল দৃশ্যময় অবয়বই লাভ করছে না, স্মৃতিকে একজন সৃজনশীল পাঠক অনায়াসে তার বুক পকেটে জমা রাখতে পারছেন। অর্থাৎ আবুল হোসেন স্মৃতির বিচূর্ণ আয়নার রূপকল্পে স্মৃতিকে ছুঁয়ে দেখার এবং গুনে দেখার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. ...শব্দ নেই,
ঘরময় কালের যাত্রার স্মৃতি গম গম করে। ('সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা')

খ. দেখে মুখ টিপে হাসছে হাস্না–
হেনা আর রাগে রক্তজবা ও
সূর্যমুখীর জ্বলছে শরীর। ('না-দেখা নাটক')

গ. আমার সমস্ত সত্তা শরীর পেয়ে চোখ মেলে চায়। ('জন্মদিন')

ঘ. হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শব্দগুলো উড়ে আসছে ('কবিতার জন্ম')

ঙ. লেক থেকে মাথা তুলে কোমর হেলিয়ে
পাথরের মারমেড
দেখছে দৃশ্যটা। ('দুপুরে তুফান, স্ট্রুগায়)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, আবুল হোসেন কেবল ছবির মতো করে শব্দের মালা গাঁথেন না, ছবির আড়ালে গভীর জীবনবোধেরও প্রকাশ ঘটান কবি। ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, কাল বা সময়কে কবি একটা দৈহিক অবয়ব দিতে চেয়েছেন। কালের পায়ের শব্দই শুধু নয়, আমরা তাঁর ভরাট কণ্ঠের গমগম শব্দও শুনতে পাচ্ছি। উদ্ধৃতি খ-তে হাস্নাহেনার মুখ টিপে হাসা কিংবা রক্তজবার শরীরে যে ক্ষোভের উপস্থিতি লক্ষ করছি, তাতে এই ফুলদ্বয়ের একটা মানবীয় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ফুলের সৌন্দর্য কিংবা ঘ্রাণকে অতিক্রম করে হাস্নাহেনা ও রক্তজবা কবির অনুভবের দোসর হয়ে উঠেছে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবির সত্তা শারীরিক অবয়ব লাভ করেছে। উদ্ধৃতি ঘ-তে হাওয়ায় ভর করে শব্দের উড়ে আসার দৃশ্যকল্পে কবিতার অন্তর্গত শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি। কবির শব্দের শরীর যেন পাখির মতো, সেই পাখি উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কবিকে নানা কথা বলে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পাথরের মারমেড কোমর হেলিয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে একটি দৃশ্য অবলোকন করছে। পাথরের মারমেড এখানে মানবীয় অনুভূতিকে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

করে নিয়েছে। উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, কবির দৃষ্টি ও অনুভবের সীমায় আসা সবকিছু তাঁর চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে, যা পাঠকের নানা ইন্দ্রিয়ে আবেদন সঞ্চার করে অসাধারণ বাকপ্রতিমার সৃষ্টি করেছে।

এখনও সময় আছে

ক. এই গুড়ি উপড়ানো
থ্যাতলানো থাম
ভিত নড়ে যাওয়া
লোহা ইট পাথরের
দাঁত বের করা
কাঁচের শহরে
তোমারই মতন আমি ('ভিজে কাক')

খ. ভালবাসা এসে একদিন বড় নাজেহাল করেছিল।
দস্যুর মতো অতর্কিতে সে ঘরে ঢুকে আচমকা
দু'হাতে আমাকে সজোরে এমন জাপটিয়ে ধরেছিল,
হুড়মুড় ক'রে নিমেষে দেহের ভিত থেকে ভেঙে পড়েছিল। ('ভালবাসা এসে')

গ. বিকেলে বাতাস যখন
বৃষ্টির চাবুক হাতে গোঁ গোঁ করতে করতে
ঝাঁপিয়ে শহরে, ('সেই ঝড়')

ঘ. অচেনা এক কানা গলির
আবছা আঁধার মোড়ে হঠাৎ
কাচের চুড়ির শব্দ শুনে
বুকের ভেতর সে কী কাঁপন! ('কেউ দেবে না ফিরিয়ে আর')

ঙ. হা হা হি হি করে মেঘ মাথার ওপরে,
তেড়ে আসে ঝড়, বুনো
মোষের মতন। ('এত দূর এসেও')

আবুল হোসেনের *এখনও সময় আছে* কাব্যে চমৎকার কিছু চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কাঁচের শহরকে কবি এমন সব উপমার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন যাতে শহরের জান্তব অবয়বটি পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবির কাছে ভালোবাসা দস্যুর মতো, ভালোবাসা শরীর ধারণ করে কবিকে জড়িয়ে ধরেছে। ভালোবাসার শক্তির একটা দৃশ্যমান রূপ এখানে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃতি গ-তে কবি বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টিকে জুড়ে দিয়েছেন এবং বৃষ্টির চাবুক হাতে বাতাস যখন গোঁ গোঁ করতে করতে এগিয়ে আসে, তখন এই বৃষ্টি কেবল আমাদের দর্শণেন্দ্রিয়কেই সচকিত করে না, বৃষ্টি চলে আসে স্পর্শের সীমায় এবং এই স্পর্শের অনুভব শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভিন্নতর অনুভব সঞ্চার করে। এমনকি বৃষ্টির ঘ্রাণও যেন পাঠকের প্রাণে ছড়িয়ে দেয় অন্যরকম আনন্দ। উদ্ধৃতি ঘ-এ অপরিচিত গলির অন্ধকারে কাচের চুড়ির শব্দ বুকের ভেতর যে কাঁপন তোলে, তা কেবল বুকেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা কবির চেতনার চত্বর থেকে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকের অনুভবের নানা প্রান্তে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মাথার ওপরে মেঘের হা হা হি হি শব্দ যখন বুনো মোষের মতো তেড়ে আসে, তখন মেঘের গতি ও শক্তি সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা জন্মে। মেঘের শরীরে মোষের পোশাক পরিয়ে এর গতিবিধি লক্ষ করার এই দৃশ্যকল্প অসাধারণ।

আর কিসের অপেক্ষা

ক. বুকের ওপর ফুলের গাছ তো না
সাজিয়েছ ভালবাসার পাথর। ('ধরে রাখা বেঁধে রাখা')

খ. বিহ্বল পুতুলগুলো ঘোরে ফেরে
দুঃস্বপ্নের ঘোরে। ('কি ক'রে ফিরে যাবে')

গ. রোজ সকালে যখন যেত ছেলেটি পাঠশালাতে,
গাছগুলো মাথা নেড়ে কইত কথা তার সাথে। ('একটি উপকথা')

ঘ. মরা কথাকে যে ওঝা
তড়াক করে সোজা লাফিয়ে ওঠার
মন্ত্র দিতে জানে, ('কবিতা এখন')

ঙ. ফাটা চামড়ার ভেতর থেকে কাঠির মতো হাড়গুলো
এমন ডালপালা মেলে চাদ্দিকে বেরিয়েছে,
রিলিফ ম্যাপের মতোই দেখায়। ('জাগতিক সম্পর্ক')

চ. দেখি কাছের আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোর মাথায়
সূর্য দিনের শেষ চুমু খায়। ('আমার জায়গা কোথায়')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে নির্মিত হয়েছে চমৎকার কিছু চিত্রকল্প। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতি কবি বুকের ফুলকে পাথরের মতো ভারী করে তুলেছেন। উদ্ধৃতি খ-এ কবি পুতুলের শরীরে মানবীয় অনুভূতি দান করেছেন। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পাঠশালায় যাওয়ার পথে ছেলেটির সঙ্গে গাছের কথোপকথনদৃশ্য অসাধারণ। উদ্ধৃতি ঘ-এ কবি মন্ত্রবলে মৃত কথাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে হাড় জিড়জিড়ে মানুষটিকে গাছের শাখাবিস্তার এবং মানচিত্রের রেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। চ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিশাল অট্টালিকার শরীরে সূর্যের চুম্বনদৃশ্য চমৎকার।

আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে তাঁর চিত্রকল্পের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। অনুভবের বিচিত্র প্রান্তকে পাঠকের চৈতন্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে চিত্রকল্প-নির্ভর কাব্যপঙ্ক্তির মাধ্যমেই কবি তাঁর ভাব ও কল্পনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অনুভবসম্ভব করে তোলেন। চিত্রের গভীরে অভিজ্ঞতার স্ফুরণ প্রগাঢ় বলেই আবুল হোসেনের চিত্রকল্প পাঠককে নিয়ে যায় ভিন্নতর এক পরিমণ্ডলে। কেবল চিত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না কবি, চিত্রের গভীরে তিনি ছড়িয়ে দেন বিচিত্র সব অনুভব ও উপলব্ধি। এভাবেই আবুল হোসেনের চিত্রকল্প কবির চেতনা-নির্ভর গল্পগুলোকে পাঠকের কল্পনাপ্রতিভার কাছে ডালপালা বিস্তারের প্রত্যাশা রাখে।

প্রতীক

মানুষের সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহকেই আবুল হোসেন কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন। কাব্যিক জটিলতা পরিহার করেছেন তিনি, ভাবনাকে রাখতে চেয়েছেন ভারমুক্ত। তাঁর প্রতীকের মৌলশক্তিকে তিনি কবিতার অন্যান্য পঙ্ক্তির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতীকের ব্যবহারে আবুল হোসেনের কবিতার ভাষা সংহত অবয়ব লাভ করলেও সেই সংহতিকে জটিল কিংবা দুর্বোধ্য বলা যাবে না। তাঁর কিছু কবিতা প্রতীক-নির্ভর। *নব-বসন্ত* কাব্যের 'ডাইনামো' কবিতায় ডাইনামোকে কবি যান্ত্রিক জীবনের অশান্তি ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'মমি' কবিতাটিকে আবুল হোসেন প্রাচীন মিশরে সংরক্ষিত মৃতদেহ মমিকে প্রাণহীন বস্তুসর্বস্ব জীবনের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'নাবিক' শীর্ষক কবিতায় জীবনের গতি কিংবা প্রবাহকে তিনি জাহাজের রূপকল্পে উপস্থাপন করে নাবিকের জীবনের মধ্যে তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'জাহাজের মাস্তুলে ক্লান্ত সন্ধ্যার আবছায়া মূর্তি' থেকে আমরা অনায়াসে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা পাঠ করতে পারি। একইভাবে 'সারেঙ' কবিতায়ও চলমান জীবনের জলছবি এঁকেছেন কবি। এই কবিতায় সারেঙ তাই চলমান জীবনের গতি ও গন্তব্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। *বিরস সংলাপ*-এর 'বাংলার বাঘ' কবিতায় আমরা শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন ও কর্মের পরিচয় পাই। তাই বাংলার বাঘ এখানে ফজলুল হকের সাহস ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতীক-নির্ভর পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনায় আবুল হোসেনের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কাব্যের 'রাবণ', 'ভল্টেয়ার', 'সক্রেটিস', 'সোহরাবের লাশ নিয়ে, রুস্তম' প্রভৃতি কবিতায়। আবুল হোসেনের কয়েকটি কাব্য থেকে কিছু প্রতীক-নির্ভর পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

নব-বসন্ত

ক. আজ তারা সব ছাড়া-পাওয়া জানোয়ার;
আজ তারা এল, ভেঙ্গে এল কারাগার; (‘নবযুগ’)

খ. ভাঙিয়াছে আমাদের স্বপ্ন-নিকেতন,
সেথা ধূর্ত মূষিকেরা করে বিচরণ, (‘মূষিক’)

গ. আর সমুদ্রতটে কোন্ আগ্নেয়গিরির
ধূম্রের কুণ্ডলী এল ভেসে। (‘নাবিক’)

ঘ. যত ভয় পাবে তোমাকে মৃতুর পাকে পাকে
জড়াবে সে জল্লাদ নিয়ত। (‘কূর্ম’)

ঙ. চোরাবালিহীন শূন্যে কি যাবে নোঙর পাতা?
যেদিকে তাকাও ধূ ধূ করে বালু আগুনতাতা। (‘স্বগত’)

চ. বুদ্ধি নয়, বিদ্যা নয়, শান দাও এ কাস্তেটায়,
দেয়াল তোল দেহের পাঁজা ভেঙ্গে। (‘স্বগত’)

ছ. জানালায় বসে আছি। ট্রেন আসে দূর থেকে, বহু দূর থেকে,
ঢালা একটানা মৃদু গান ভেসে আসে। (‘ট্রেন’)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আবুল হোসেনের প্রতীক-নির্মাণকৌশল অনুধাবন করা যাবে। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতির জানোয়ার এবং কারাগার যথাক্রমে মনুষ্যত্ববর্জিত মানুষের নির্মম কর্মকাণ্ড এবং শৃঙ্খলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে রূপায়িত করেছে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতির মূষিক অসৎ, ব্যক্তিত্ববর্জিত, আত্মস্বার্থসর্বস্ব মানুষের ভণ্ডামি ও ধূর্ততার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল হোসেনের অনেক কবিতায় আমরা মূষিকের উপস্থিতি লক্ষ করি। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতির আগ্নেয়গিরি মানুষের অন্তর্গত সম্ভাবনার স্মারক হিসেবে চিত্রিত। উদ্ধৃতি-ঘ জল্লাদকে মানুষের হিংস্রতা কিংবা নির্মমতার প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। ঙ-সংখ্যক দৃষ্টান্তের চোরাবালি গুপ্তঘাতক কিংবা অদৃশ্য বিপদের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত চ-এর কাস্তে শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাস্তে কেবল উৎপাদনে ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবেই নয়, মেহনতি মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথাও মনে করিয়ে দেয়। আবুল হোসেন অনেক কবিতায় জীবনের গতি কিংবা ধাবমান সময় বোঝাতে ট্রেনের প্রসঙ্গ টানেন। ছ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ট্রেন সেই অর্থেই প্রতীকী দীপ্তি লাভ করেছে বলে মনে হয়।

বিরস সংলাপ

ক. সারা দিন সূর্য ছুড়েছে নাপাম বোমা
আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
চীনে নববর্ষের হাওয়া
গেসোলীনে ভিজিয়েছে সমস্ত ব্যাঙ্কক। (‘ব্যাঙ্ককে গ্রীষ্ম’)

খ. মুখ তো নয় অগ্নিগিরি, বলেছে তাকে চাঁদ,
এবং চাঁদে নেই আগুন,
বরফে তার ভরেছে সারা বুক। (‘মেহেদীর জন্য’)

গ. পড়ন্ত রোদে চোখ মেলে আজ
দেখি জীবনের বিশাল জাহাজ
ছোট হয়ে আসে। (‘বাঁচব কি’)

ঘ. সহস্র সাহারা মাঝে সবুজ ধানের একটি শীষ
এই সব দিনে বসে ভাবি :
এত কি দামী এ প্রাণ? (‘শেষ যুক্তি’)

ঙ. গান বাজে ধমনীর কোষে কোষে আর
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ফোঁসে লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর

আমাদের ভেঙ্গে দিয়ে, মাটির দলার মতো দুটি রাঙ্গা
ফুটন্ত হৃদয় গুড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে। ('চরম মুহূর্ত')

চ. তোমার ছাতার তলে জানি কী আরাম আরাম! ('ছাতাটা')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহের ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নাপাম বোমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। হিরোসিমা নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের ছবিটাই যেন নাপাম বোমার প্রতীকে তুলে ধরেছেন কবি। উদ্ধৃতি খ-এর অগ্নিগিরি, চাঁদ ও আগুন একটি মেয়ের তেজস্বিতা, সৌন্দর্য, রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি অনুষঙ্গের দ্যোতক হিসেবে চিত্রিত। অবশ্য এই মেয়ের আড়ালে কবি বাংলাদেশের মুখচ্ছবি কল্পনা করেছেন। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতির পড়ন্ত রোদ জীবনের শেষ পর্যায় এবং জাহাজ চলমান জীবনের চালচিত্র উপস্থাপনে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি-ঘ সবুজ ধানের শীষের আড়ালে জীবনের সজীবতাকে মূর্ত করছে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ট্রাক্টর এর ব্যবহারে আবুল হোসেন সৃজনশীল কল্পনাপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষাবাদে ফসল উৎপন্ন হলেও মাটির বুকের ওপর ট্রাক্টরের আঁচড় কিংবা আঘাতকে এখানে ট্রাক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন কবি। সুস্থ, সুন্দর ও আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন। আবুল হোসেন চ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ছাতাকে সেই আশ্রয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

হাওয়া, তোমার কী দুঃসাহস

ক. জীবনের আলো থিতিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে সংসারের
আলুথালু বাগানে, তোমার মোটেই সময় নেই, ('গোধূলি শেষের আলোছায়া')

খ. তাহলে কি হয়নি সময়
কাঁটাতারের সিংহাসন
থেকে নেমে আসার এখন? ('তোমার শক্তির সীমা নেই')

গ. ... সেই সব লাল নীল খামেমোড়া দিন
আর রাত, চিঠি দেয়া (রবি ঠাকুরের কাছে ঋণ) ('ক'লকাতা ১৯৭৯')

জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে চান আবুল হোসেন। তাই সাজানো জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবি জীবনকে বাগানের রূপকল্পে উপস্থাপন করেন। উপরিউক্ত ক-সংখ্যক উদ্ধৃতির বাগান তাই আলোকিত এবং প্রস্ফুটিত জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তের কাঁটাতারের সিংহাসন জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রতীক হিসেবে চিত্রিত। দৃষ্টান্ত গ-এর 'লাল নীল খামেমোড়া দিন' সুন্দর জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবুল হোসেন জীবনকে সার্থক ও অর্থবহ করার কথা ভাবেন কিন্তু জীবন যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সে কথাও তিনি ভোলেন না।

আবুল হোসেন উপলব্ধিকে সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতেই শব্দবন্দি করতে চান। তাঁর প্রতীক-নির্মাণের ক্ষেত্রেও সেই সহজবোধ্যতার স্বাক্ষর উপস্থিত। তাঁর চিত্রকল্পে বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মানুষের অভিজ্ঞতার পরিচয় যেমন স্পষ্ট, তেমনি পূর্বপুরুষের জীবনবোধ এবং বাস্তব-অভিজ্ঞতায় অর্জিত চৈতন্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে আত্মকৃত অনুভবকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

পুরাণ

আবুল হোসেন পৌরাণিক অনুষঙ্গে খুব বেশি অবগাহন করেন নি। বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রসমূহ কিংবা ঘটনাপ্রবাহের অনুরণন তাঁর কবিতায় উল্লেখ করার মতো নয়। পুরাণের চেয়ে লোককথা-লোকগল্পের ভগ্নাংশ কিংবা চরিত্রের উল্লেখে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রথিতযশা শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদানকে তিনি মিথিক আবহে উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকরণে তাঁর কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে তিনি এমনভাবে পঙ্ক্তিভুক্ত করেছেন যা তাঁর কবিতাকে দান করেছে ভিন্নতর দীপ্তি। ইসলামের নানা অনুষঙ্গ এবং মুসলিম সংস্কৃতির উজ্জ্বল ও ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গের আলোকে কবি তাঁর

স্বকালের স্বদেশকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেই তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য-সংলগ্নতার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে।

নব-বসন্ত

ক. ছোটবলা থেকে শুনে আসছি ঠাকুরমায়ের ঝুলি,
আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি :
রাজপুত্রেরা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে কত নদ নদী পর্বত বন
মরুভূমি পথ ধরে ছুটেছে উর্ধশ্বাসে রাজকুমারীর তল্লাসে;
রাজপুত্রের ওড়না পড়েছে খুলে, বাতাসের আঘাতে কাঁপন
উঠছে উস্‌কোখুশকো চুলে, পক্ষীরাজের লেজ খাড়া হ'য়ে
উঠেছে উপরে, লাগামের কোণা সাদা হল ফেনা পড়ে।
রাজকুমারের চোখে যেন ঘুম নেই, চলেছে তো চলেছেই। ('বাংলার মেয়ে')

খ. কালিদাস ছিল যে সময়ে বেঁচে তার সে যুগের মেয়েরা, মদনিকা
আর মালবিকা, অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদারা ঝুলিয়ে দু'কানে
মল্লিকার দুল, আল্‌গা খোঁপায় গুঁজে শিরীষের ফুল,
গলায় দুলিয়ে অপরাজিতার মালা, চরণে নূপুর, কটিতটে বেঁধে
পুষ্প-মেখলা সন্ধ্যায় গিয়ে বসত কুঞ্জে একান্তে নিরালায়। ('বাংলার মেয়ে')

গ. ঘুম ঘুম ঘুম
ঘুমায়েছে ব্যাবিলন, পিরামিডগুলি,
প্রাচীন মিসর,
সহস্র মোয়েনজোদাড়ো
সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড,
জেরুজালেম
ঘুম ঘুম ঘুম ('তবু')

আবুল হোসেন *নব-বসন্ত* কাব্যের 'বাংলার মেয়ে' কবিতায় রূপকথা ও লোককথার নানা অনুষঙ্গে বাঙালি নারীদের সেকাল-একাল উপস্থাপন করেছেন। কবি কেবল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলিতে*ই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন নি, তিনি ফিরে গেছেন কালিদাসের রাজ্যে, মদনিকা- মালবিকা-অনুসূয়া-প্রিয়ংবদাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন একালের নারীকে। উপরিউক্ত ক ও খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ঐতিহাসিক স্থানের সঙ্গে ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। লোককাহিনীর খণ্ডাংশ কিংবা চরিত্রের আসা-যাওয়ার মাধ্যমে কবিতায় অতীতের উজ্জ্বল সৃষ্টি কিংবা অর্জনকে স্বীকরণের প্রয়াস ধরা পড়েছে, তেমনি একালের নানা অর্জন, ক্ষতি কিংবা ক্ষরণও আরো স্পষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় দূরসঞ্চারী আবেদন সৃষ্টি করেছে।

বিরস সংলাপ

ক. রুবাই পড়েছি খৈয়ামের, হাফিজের।
স্বপ্ন দেখেছি শাহ্‌রজাদের মতো অপরূপ সুন্দরীদের। ('মধ্যপ্রাচ্য')

খ. সত্তার দূয়ারে দূয়ারে পড়ে খিল আর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রাণবায়ু গিলে লক্ষ লক্ষ কবন্ধ যক্ষ ফোঁসে
সে যখন আসে। ('শয়তান')

বিরস সংলাপ কাব্যে আবুল হোসেন হাফিজ ও খৈয়ামের সৃষ্টিকর্মকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ভোগবাদী সংস্কৃতিকে পাঠ করতে গিয়ে কবি হাফিজ ও খৈয়ামের সৃষ্টিসম্ভার থেকে সুন্দরীদের স্বাগত জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ করছি। 'শয়তান' শীর্ষক কবিতায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের শয়তানকে কবি তাঁর খুব কাছের মানুষের ওপর ভর করে আপন কার্যোদ্ধারে ব্যস্ত থাকতে দেখেছেন। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মানুষের শয়তানির তীব্রতা বোঝানোর জন্য কবি দেখেছেন কীভাবে 'লক্ষ লক্ষ কবন্ধ যক্ষ ফোঁসে' ওঠে। দণ্ডকারণ্যবাসী মহাকায় রাক্ষস যে শ্রী নামক দানবের পুত্র হওয়ায় দনু নামেও পরিচিত, তার উপস্থিতিতে মানবরূপী দানবদের ভয়াল অবস্থার চিত্রায়ণ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস

ক. হাওয়া, তোমার কী দুঃসাহস
হাজার নিষেধ, ঘোর অভিশাপ
কিছুই পারল না আটকাতে,
ঘাড় বেঁকিয়ে দিয়েছো ঝাঁপ ('হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস')

খ. ছন্নছাড়া মাইকেল ফিরে এল ঘরে,
ইস্কুল পালানো ছেলে বিশ্বের শিরোপা নিয়ে এল,
বিদ্রোহী হলেন নিজে,
দেশকেও করলেন নজরুল
বাঙলার মুখ খুঁজে পেলেন জীবনানন্দ দাশ,
তোমাকে নিয়েই সঙ্গে
বরিশালে ফজলুল হক
ভাঙ্গা কবরের ধারে কেঁদে
সমস্ত দেশের বুক ভাসালেন একা,
'সীতা', 'সীতা' ডাক দিয়ে শিশির ভাদুড়ী
বাঙলার কানে তার কান্না গেলেন অনন্তকাল রেখে ('তোমাকে নিয়েই যত খেলা')

আবুল হোসেন *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* কাব্যের নাম-কবিতায় ইসলাম ধর্মমতে পৃথিবীর প্রথম মানবী হাওয়ার দুঃসাহসী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য করে হাওয়া এই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। হাওয়ার উদ্দেশ্যে কবি বলছেন, 'সংস্কারের দড়ি ছিড়ে/তুমিই ঝাঁপ দিয়েছিলে/নতুন পথে, চাওনি ফিরে'। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে হাওয়ার প্রতি কবির প্রণতি বোধকরি পৃথিবীর সমুদয় নারীর প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদনের স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দীপ্তিকে কবিতায় ছড়িয়ে দিয়ে কবির অনুভব ও উপলব্ধিতে তৃপ্তিদায়ক আবহ সঞ্চার করেছেন। নাট্য-ব্যক্তিত্ব শিশির ভাদুড়ীর কণ্ঠে 'সীতা' 'সীতা' আহ্বান বাংলার কানে অনন্তকালের চিহ্ন রেখে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন কবি।

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে

ক. সারাক্ষণ
দশ মাথা দশ হাত বিকট দর্শন
রাক্ষস শাসায় ('রাবণ')

খ. ...এতগুলো পুরুষের সম্মুখে সতীর
শাড়ি খুলে নেওয়া । ('বিকর্ণের বিস্ময়')

গ. একদিন কে রাজকুমার এসে কাঠি দিয়ে নাড়া
দিতেই উঠল জেগে তারা।
সেই কাঠিটার নাম
কেউ কি জানে না, শোনেও নি এ তল্লাটে? ('ম্যাডাম টুসোর যাদুঘরে')

ঘ. কী করছো রুস্তম, ভুলে কি যেতে
হবে তোমাদের এখনই অনেক পথ, এই ভিজে

ধুলোবালি থেকে তুলে নি ছেলেকে, ঘুমোবে সে ঘরে,
যত দিন মাটির কবরে তার রক্ত মাংস পেশী হাড়
সার হয়ে না ফোটায় বীজ ঘরে ঘরে মাঠে ক্ষেতে। ('সোহরাবের লাশ নিয়ে, রুস্তম')

ঙ. পিকাসো, প্রিন্সটন, তাঁর কবি-অধ্যাপক আর
দর্শনার্থীদের দিকে
সে একবার ফিরেও চাইল না।
আর অমনি ইয়েট্‌স্‌কে মনে পড়ল আমার। ('প্রিন্সটনে এক কালো কাঠবিড়ালি')

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে বিক্ষুব্ধ ও বিহ্বল আবুল হোসেন 'রাবণ' কবিতায় পৌরাণিক আবহে একালের দুর্বিষহ দিনযাপনের গ্লানিকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাই 'রাবণ' কবিতার শুরুতেই আমরা রাক্ষসের বিকটমূর্তি দেখতে পাই। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পরোক্ষভাবে মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গের অবতারণ লক্ষ করি। বিকর্ণের সাহসী ভূমিকার প্রতিই বোধকরি পক্ষপাত দেখিয়েছেন কবি। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্রের অন্যতম বিকর্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সভায় বলেছিলেন, 'যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন। অতএব দ্রৌপদী বিজিত হননি।' (সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪০৮ : ৩৩৯)। 'বিকর্ণের বিস্ময়' কবিতায় কবি একালের পুঁজিনির্ভর ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার বস্ত্রহরণ-সভায় উপস্থিত সম্মানবোধহীন ও ব্যক্তিত্ববর্জিত মানুষের নীরব ভূমিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, রূপকথার রাজকুমার ও সোনার কাঠি রূপার কাঠির প্রসঙ্গ। 'সোহরাবের লাশ নিয়ে, রুস্তম' আবুল হোসেনের একটি অনন্যসাধারণ কবিতা। এই কবিতায় একালের নির্মমতার ছবি রুস্তমের সন্তান হারানোর রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন। পুত্র সোহরাবকে হারিয়ে পিতা রুস্তম এবং মাতা তাহমিনার যন্ত্রণাকে কবি স্বকালের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেছেন। সোহরাবের আত্মদানকে মহিমান্বিত করেছেন কবি। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, সোহরাবের 'রক্ত মাংস পেশী হাড়' মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিকে উর্বর করে তুলবে এবং সেই মাটি হেসে উঠবে সোনার ফসলে– এই বিশ্বাসে অবিচল থেকেছেন কবি। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'পিকাসো, প্রিন্সটন, তাঁর কবি-অধ্যাপক'-এর মাঝে ইয়েট্‌স্‌-এর উপস্থিতি কবিতাটিতে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

এখনও সময় আছে

ক. তাঁর ঠোঁটে ছিল ইস্পাত,
সারা মুখে রক্ত ছড়ানো,
শরীর তো নয়, বিদ্যুৎ,
মেঘনাদের মতো গলার আওয়াজ। ('ফররুখ আহমদ')

খ. না কোন হুরির ইশারায়
বিহ্বল দিয়েছে পাড়ি
এপারের শোধ নেবে বলে,
না কি সে দেখেছে পুলসিরাতের পুল
অনেক ভাগ্যের ফলে, একান্ত অকালে? ('এক প্রিয়জনের বিয়োগে শোক প্রকাশে অস্বীকৃতি')

গ. দুই ভাই হাসান হোসেন।
হাসানকে বিষ দিল যারা
স্বপ্ন বুঝি দেখেছিল তারা
ফাঁকতালে সহজে জেতার।
হোসেন শহীদ হয়ে তার
প্রতিদান কেমন দিলেন! ('নিয়তি')

আবুল হোসেনের *এখনও সময় আছে* কাব্যে কবি ফররুখ আহমদের দৈহিক অবয়ব ও ব্যক্তিত্বের শৈল্পিক উপস্থাপন লক্ষ করার মতো। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ফররুখের কণ্ঠের দৃঢ়তা বোঝাতে কবি রামায়ণের মেঘনাদকে স্মরণ করেছেন।

উদ্ধৃতি খ-এর শোকবিহ্বলতা বর্জনের প্রয়াসকে আবুল হোসেন ইসলাম ধর্মীয় আবহে উপস্থাপন করেছেন। তাই কবিতায় উপস্থিত হয়েছে হুরদের প্রসঙ্গ, পরকালের কঠিন পরীক্ষার পুলসিরাত এবং স্বকালে অবস্থান করে পরকালের স্বর্গীয় দীপ্তির আভাস। উদ্ধৃতি গ-এ ইসলামের শেষ নবীর দৌহিত্র হাসান-হোসেনকে কবি আবাহন করেছেন। ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে কবি একালের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে মানবিক বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন।

আর কিসের অপেক্ষা

একদা এক কালসাপিনী
আমার ঘরে ঢুকেছিল।
ঢুকেই কোমর গলা বেয়ে
মাথার ওপর ফণা তুলে
লকলকে জিব বের করে সে
দুলতে থাকে হিসহিসিয়ে, ('মায়াবিনী')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে আমরা লক্ষ করছি, আবুল হোসেন পরোক্ষভাবে লোককাহিনীর বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘরের বিষাক্ত সাপের কথা বলেছেন। এই সাপের দংশন কবির সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। 'মায়াবিনী' শীর্ষক কবিতাটিতে কবিকে কেবল কালসাপিনীই দংশন করে নি, তিনি খল ডাকিনীর হাতে ধরা পড়েন, কোন এক সন্ধ্যায় তাঁর কাঁধে ভর করে প্রেতিনী। এমনকি ভূতের আক্রমণ থেকেও মুক্ত নন কবি। অথাৎ, নানা লৌকিক বিশ্বাস বা সংস্কারের ফাঁদে বন্দি হয়ে কবির জন্মভূমি কীভাবে নাজেহাল হচ্ছে, এই কবিতাটিতে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

আবুল হোসেনের কবিতায় লোককথা-লোকবিশ্বাস-লোকপ্রবাদ-লোকগল্পের অধিকতর উপস্থিতি তাঁর কবিতার গঠন-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কবিতায় তিনি সাধারণ কথনভঙ্গিকে যথাসম্ভব অবিকল রাখতে চেয়েছেন। বাঙালি জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে এইসব অনুষঙ্গ। ইসলাম ধর্মীয় অনুষঙ্গের অনুবর্তনও তাঁর কবিস্বভাবের অনুকূল আবহ সঞ্চারে অবদান রেখেছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ ব্যবহারেও তিনি জটিলতা পরিহারের চেষ্টা করেছেন। 'কোনো উন্মুল শিকড়-ছেঁড়া ঐতিহ্যহীন পথিক নন আবুল হোসেন– দুঃশাসন-দ্রৌপদী বা সোহরাব-রুস্তমের পুরাণকাহিনীর পুনর্জনন ঘটান তিনি সমান নিস্তাপ বা তাপময় উৎসাহে।' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ১৪০)। মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ-সাধনের মাধ্যমে তিনি অতীতের অর্জনকে স্বীকরণ করেছেন, যা তাঁর কবিতায় বিম্বিত বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নেওয়ার শক্তি সরবরাহে উজ্জ্বল অবদান রেখেছে।

ছন্দ

কবিতার সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক অনিবার্য এবং অবিচ্ছেদ্য। 'কাব্যের জন্মবৃত্তান্তের তদন্তে নেমে আমরা বুঝেছিলুম যে আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি।'– সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯৯৫ : ২৫) এই মন্তব্যে কবিতা ও ছন্দের আন্তঃস্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। ছন্দ বলতে সুধীন দত্ত 'ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্‌সা'কে বুঝতেন। 'ভাষা ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গ'ড়ে ওঠে' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আবুল হোসেনও কবিতার ভাষা ও ভাবকে ছন্দেই গেঁথেছেন এবং গ্রন্থনপ্রক্রিয়ায় বাংলা ছন্দের নিরূপিত বৈশিষ্ট্যসমূহই তাঁর অবলম্বন। কবিতার ছন্দের ভেতর দিয়েই একজন কবির আত্মচিহ্নিত ছন্দের ব্যাকরণটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন, 'কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনই অকৃত্রিমতার পদধ্বনি।' (১৯৯৫ : ২৭)– তখন কবির শৈল্পিক অভিব্যক্তির অন্তর্গত সৌন্দর্যকে অনুধাবনের জন্য তাঁর ছন্দভাবনার খোঁজ নিতেই হয়। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা তাঁর ছন্দের ব্যাকরণটি অনুধাবন করতে চাই।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

বাংলা ছন্দের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাখা অক্ষরবৃত্ত। এই ছন্দকে নানা নামে অভিহিত করেছেন আমাদের কবি এবং শিল্পসমালোচকবৃন্দ– "রবীন্দ্রনাথ একে বলতেন 'সাধু ছন্দ', 'সংস্কৃত-বাংলার ছন্দ' বা 'পয়ারজাতীয় ছন্দ'।

সত্যেন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন ‘আদ্যা’। মোহিতলাল বলতেন ‘পদভূমক’। অমূল্যধন নাম দিয়েছিলেন ‘তানপ্রধান’। প্রবোধচন্দ্র সেন ‘অক্ষরবৃত্ত’, ‘যৌগিক’, ‘মিশ্রকলাবৃত্ত’ বা ‘মিশ্রবৃত্ত’। বুদ্ধদেব ‘পয়ার’। সুধীন্দ্রনাথ ‘আক্ষরিক’। আরো কেউ কেউ আরো কোনো কোনো নাম দিয়েছিলেন।” (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০১ : ১২-১৩)। এই নামকরণের বৈচিত্র্য থেকে এই ছন্দের শক্তি ও স্বভাব অনুধাবন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এই ছন্দ ব্যবহারে আবুল হোসেনের স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। কবি ‘তিন ধরনের ছন্দেই কবিতা লেখেন, এগুলোর মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে অক্ষরবৃত্ত।’ (খালেদ হোসাইন ২০১১ : ৪০৬)। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় আবুল হোসেন প্রতি পঙ্‌ক্তির মাত্রা সন্নিবেশে স্বাধীনতা নিয়েছেন, যদিও অতিনিরূপিত ১৪ (৮+৬) এবং ১৮ (৮+১০ কিংবা ১০+৮) মাত্রার পঙ্‌ক্তির নজির তাঁর কবিতায় যথেষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. কাল মোর এতটুকু | হয় নাই ঘুম,	৮.৬
সারা রাত কাটায়েছি | জেগে বিছানায়,	৮.৬
অদূরে পথের পাশে | অবিরাম সুরে	৮.৬
ডাইনামো একটানা | দ্রুত ধ্বনি তোলে।	৮.৬
	(‘ডাইনামো’/*নব-বসন্ত*)
খ. জীবন সুন্দর হোক | মেঘমুক্ত আকাশের মতো,	৮.১০
সুনীল আয়ত চোখ | অবারিত স্বচ্ছ সমুদ্রের,	৮.১০
কর্মের কষায় চূর্ণ | দিন হোক দুঃস্বপ্ন ক্ষণিক,	৮.১০
গভীর শ্রান্তিতে মৃত | রাত্রি হোক শতদল নীল,	৮.১০
	(‘জীবন সুন্দর হোক’/*বিরস সংলাপ*)
গ. কতদিন তার হাতে | রাখি না আমার শীর্ণ হাত।	৮.১০
কী অবসন্নতা চেপে | আছে দেহে মনে, সারা দিন	৮.১০
শূন্যতার হাহাকার। | আর রাত্রিগুলো ঘুমহীন	৮.১০
দুর্ভাবনার শিকার। | দুঃস্বপ্নে হয় তো হঠাৎ	৮.১০
	(‘দুঃসময়’/*দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*)

গদ্যছন্দ

গদ্যকবিতার স্বভাব সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, ‘আবেগেই শুধু এ-ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগে মাত্রা এক চালে না-ও চলতে পারে। যথারীতি পদ্যে এক-এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনে ছন্দ দানা বাঁধে, কিন্তু গদ্যকবিতার ছন্দের দম সম্পূর্ণতা পায় সমগ্র বক্তব্যের এক-এক পর্যায়– strophic unit-এ।’ (১৯৯৭ : ৯০)। পয়ারের ক্লান্তিকর যতি-অধীনতা পরিহার করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে আবেগশাসিত ভঙ্গির সূত্রপাত করেন, গদ্যছন্দের জন্মবৃত্তান্তে মনোনিবেশ করলে আমরা এই ছন্দে সেই আবেগ-নির্ভর যতিস্বাধীনতার প্রভাব লক্ষ করব। আবুল হোসেন আবেগের অবিকল উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন বলেই বোধকরি কথ্যভঙ্গির আনুগত্য করেছেন এবং এই ভঙ্গির শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর গদ্যকবিতায়। একজন সমালোচক আবুল হোসেনের *বিরস সংলাপ* কাব্যের কতিপয় গদ্যকবিতা সম্পর্কে বলেছেন, ‘এগুলোতে তিনি এমন একটা ভঙ্গি দিয়েছেন, এমন একটা ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় না, আমাদের কবিতায় দেখা যায় না...।’ (শহীদ ইকবাল ২০১৩ : ৫৭)। আমাদের বিবেচনায়, সমালোচকের এই মন্তব্য আবুল হোসেনের অন্য কাব্যগ্রন্থের গদ্যকবিতাসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে :

ক. জাহাজ ভেসে চলেছে অতল সমুদ্রে,
ক্লান্ত মন্থর তার গতি।
আকাশে ধূসর কুয়াশার ধাঁধাঁন আস্তরণ,
পাণ্ডুর মেঘে ঢেকেছে গাঢ় নীলিমা (‘নাবিক’/*নব-বসন্ত*)

খ. আমার ভাবনাগুলোকে যদি
সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারতাম

যেমন ক'রে তুমি পোকা ছাড়িয়ে ধূলো ঝেড়ে
তাকের পর তাক আলমারিতে বইগুলো তুলে রাখো তুমি
নিপুণ হাতে
অথবা রোদে শুকনো শাড়িগুলো
থাকে থাকে পাট ক'রে উঠিয়ে রাখ আলনায়
কেউ জানে না কখন। ('আমার ভাবনাগুলি'/*বিরস সংলাপ*)

গ. মিলিয়ে যাওয়া নয়, হারিয়ে যাওয়া নয়
বোঝাই আসল কথা, যার মাটিতে
ভালবাসার চারা গজায়,
যাকে আলো হাওয়া পানি দিয়ে–
তারও চেয়ে বেশি হাতের চোখের বুকের ছোঁয়ায়–
বাঁচিয়ে রাখতে হয়, বাড়তে দিতে হয়
নিজের মতো ক'রে। ('হারিয়ে যাওয়া নয়'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

স্বরবৃত্ত ছন্দ

আবুল হোসেন স্বরবৃত্ত ছন্দে খুব বেশি কবিতা লেখেন নি। স্বরবৃত্তের চাল দ্রুত এবং এই ছন্দ-প্রয়োগে অতিমাত্রায় সচেতন না থাকলে কবিতার ভাবের ওপরে ছন্দের আধিপত্য বিস্তারের একটা প্রয়াস চোখে পড়ে। এই ছন্দে কবিত্বের চিহ্নসমূহ আড়াল করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু "তার কবিতার পরিশোধন থেকে বোঝা যায় : তিনি ক্রমাগত চলতি রীতিকে আত্মীকৃত করে চলেছেন এবং তার লক্ষ্য কবিতাকে স্বচ্ছস্পষ্ট–'অকাব্যিক' করে তোলা।" (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১১খ : ১৩২)। বাংলা ভাষার আদিমতম ছন্দ স্বরবৃত্ত আবুল হোসেনের কাছে খুব বেশি সমাদৃত না হওয়ার কারণ হিসেবে কবিতাকে 'অকাব্যিক করে তোলা'র প্রয়াসকে দায়ী করা যায়। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক. ধাক্কা মেরে | খুলে দিলে	৪.৪
জানলা এবং | দরজাগুলো,	৪.৪
দৌড়ে ছুটে | ইতঃস্তত	৪.৪
এল বাতাস | এল আলো।	৪.৪
	('হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)
খ. ভালবাসা, |রাক্ষসী রে, | আর কি দেব | তোরে?	৪.৪.৪.২
ছিল আমার | যা কিছু সব | দিয়েছি হাত | ভ'রে	৪.৪.৪.২
একটা তাজা | হৃদপিণ্ড, সব|টা গরম ম | গজ	৪.৪.৪.১
তাতেও ক্ষিদে | মিটল না তোর,| হল না তোর | ভোজ?	৪.৪.৪.১
	('ভালবাসা, রাক্ষসী রে'/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)
গ. শাড়ির একটু |খসখসানি,	৪.৪
আধখানা মুখ| দেখেই এমন	৪.৪
বাজত হৃদয়, |হু হু করে	৪.৪
জ্বলত আগুন| শিরায় শিরায়।	৪.৪
	('কেউ দেবে না ফিরিয়ে আর'/*এখনও সময় আছে*)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেও নানা নামে অভিহিত করার প্রয়াস দেখা যায়– 'ব্রজবুলি-ভাঙা', হৃদ্যা', 'ধ্বনিপ্রধান', 'মাত্রিক', 'স্বরমাত্রিক', 'কলাবৃত্ত' ইত্যাদি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য সর্বাবস্থায় বদ্ধাক্ষরের দ্বিমাত্রিক মূল্যায়ন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আবুল হোসেন খুব বেশি কবিতা লেখেন নি। এই ছন্দে লেখা কবিতায় তিনি ছয়মাত্রার পূর্ণ পর্বের পঙ্‌ক্তি রচনা

করেছেন। অর্থাৎ, এই ছন্দের অতি-প্রচলিত অবয়বটিকেই তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন, কোন রকম নিরীক্ষার স্বাক্ষর এখানে অনুপস্থিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. কোন্ দিকে যাব, | ডাইনে না বাঁয়ে	৬.৬
অথবা যে পথ | সোজা চলে যায়,	৬.৬
যে পথে গেছেন | পিতা পিতামহ,	৬.৬
যে পথে পথিক | চলে অহরহ,	৬.৬
	(‘দিক নির্ণয়’/*নব-বসন্ত*)
খ. ঘন ঘুট ঘুট | চারধার	৬.৪
আম জাম ঝাউ | দেউদার	৬.৪
আর শাল তাল	৬
তমাল গহন	৬
নির্জন বন।	৬
	(‘দেয়াড়ায়’/*বিরস সংলাপ*)
গ. ওরা সব যাবে | বামে।	৬.২
ও পথ এখন |ভেজে না রক্তে | ঘামে।	৬.৬.২
খোলা পথ গেছে |সোজা	৬.২
শেষ সব খোঁজা।	৬
	(‘অন্য পথ’/*হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*)

মিশ্র ছন্দ

আবুল হোসেন মিশ্র ছন্দের কবিতা রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ছন্দ নিয়ে তাঁর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা মূলত এই ছন্দকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। এই ছন্দে একই কবিতায় একাধিক ছন্দের সংমিশ্রণ ঘটে। এমন কি গদ্য-পদ্যের মিশ্রণও এই ছন্দের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় না। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, “একে ‘মুক্তছন্দ’-ও বলা হ’য়ে থাকে, কিন্তু ‘মিশ্রছন্দ’ কথাটি আরো নির্দিষ্ট ও স্থিরলক্ষ্য। মিশ্রছন্দ বলতে এই ছন্দের চারিত্র পরিষ্কার হয়ে যায় সহজেই– যে-কবিতায় অনেক ছন্দের মিশেল থাকে।” (১৯৮৭ : ১৬৭)। অর্থাৎ, এই ছন্দের একটি কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে নানা ছন্দের মিশ্রণ ঘটে। এই ছন্দে অমিয় চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তী পর্যায়ে সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্বের সঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়– তিনি আবুল হোসেন। আবুল হোসেনের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে মিশ্রছন্দে রচিত কবিতা থেকে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যাক :

ক. মনের ঘোড়াটা, | হা পোড়া কপাল, | হয়েছে খোঁড়া	৬.৬.৫
পায়ের তলেও | মেলে নাক আর | শক্ত মাটি,	৬.৬.৫
হাত পা ছোঁড়ার | করবে কোথায় | আজ মহড়া?	৬.৬.৫
চোখ বুজে আর | কার পিঠে বল | চালাবে চাঁটি?	৬.৬.৫
ছেঁড়া চাটাইতে | কত দিন রবে | স্বপ্ন টাটি? ...	৬.৬.৫ (মাত্রাবৃত্ত)
দুঃসহ এ | আত্মলোভী | স্বয়ংক্রিয়া,	৪.৪.৪
বন্ধ ঘরে | অন্ধকারের | পুতুল খেলা | মার্জারের।	৪.৪.৩
খেলাওলা, | অস্ত্র কোন | নেই ঝাঁকায়?	৪.৪.৪
কথার সাথে | মিলিয়ে কথা | আতসবাজি | চাইনে আর।	৪.৪.৩ (স্বরবৃত্ত)
	(‘স্বগত’/*নব-বসন্ত*)

খ. শিহরিত আমি\| কম্পিত আমি, \| বন্ধনহীন \| বিহ্বল যৌবন ৬.৬.৬.৬ (মাত্রাবৃত্ত)
ঘন অনুরাগে \| ফেটে পড়ে পড়ে \| পরম পরাগে \| তোমাকে ঘিরে। ৬.৬.৬.৫ (মাত্রাবৃত্ত)

রাত্রির তিমির ছিঁড়ে, |হে জ্বলন্ত জ্যোৎস্না | এসো আমার শরীরে।   ৮.৮.৮ (অক্ষরবৃত্ত)
ওগো দুর্লভা |বল্লভা আমার | তোমাকে চাই | তোমাকে চাই।   ৬.৬.৫.৫ (মাত্রাবৃত্ত)
(‘দুর্লভা বল্লভা’/*বিরস সংলাপ*)

আবুল হোসেন কবিতার শরীরে এমন কোন অলঙ্কার জুড়ে দেন না কিংবা এমন কোন প্রাকরণিক প্রকোষ্ঠে তিনি তাঁর ভাবনাকে আবদ্ধ করতে চান না যাতে তাঁর ভাবনা চলার সহজ স্বাভাবিক গতিটি হারিয়ে ফেলে। তাঁর শৈলিসচেতনতাকে তাই সহজ সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম বলা যায়। নববসন্তের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আবুল হোসেন বলেছেন, ‘এক একটি কবিতা আমি বহুবার লিখি, বহুদিন ধরে লিখি। নব-বসন্ত বেরুবার কিছুদিন পর থেকেই এটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এক একটি শব্দ, চরণ, কবিতা বহুদিন ধরে মনে মনে ভাবি, আওড়াই।’ (২০১০খ : ৫৯)। একটি কবিতার পেছনে কবির এই দীর্ঘদিন লেগে থাকা কেবল তো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াসই নয়, তাতে প্রাকরণিক পরিচর্যার প্রয়াসটিও সন্দেহাতীতভাবে জড়িত। কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন বলেই কবিতার শরীরে কোন অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অবাঞ্ছিত ভার লেপ্টে থাকে না, যা তাঁর কবিতার গতিকে মন্থর করে তুলবে। তাই আবুল হোসেনের কবিতা অনায়াসে পাঠককে জড়িয়ে ধরে, ছড়িয়ে পড়ে তার চেতনার চরাচরে।

পঞ্চম অধ্যায় : সৈয়দ আলী আহসান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি

শিল্পসাহিত্য জীবনের আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও জীবনের সঙ্গে শিল্পের আত্মীয়তা অবিচ্ছেদ্য। প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বে পরিভ্রমণের যে আনন্দ, তা জীবনকে উপলব্ধি ও উদ্‌যাপনের পরিসরকেই প্রসারিত করে। অভিজ্ঞতার বাইরে গেলে নির্ভীক, নির্মাণক্ষম মানুষও শৃঙ্খলার অভাববোধে আক্রান্ত হতে পারেন। অবিন্যস্ত ভূখণ্ডের বাসিন্দা কেবলই বিরামহীন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় থাকেন। অবিনাশী আত্মার অধীশ্বর হয়ে ওঠার সাধনা নির্জনতায় জমে ওঠে না বলেই সৃজনশীল মানুষ জনতার কোলাহলে নেমে আসেন, সাধনা ও সংগ্রামের আভিধানিক দূরত্ব তিনি মুছে দিতে চান। তাই তাঁর কণ্ঠের গান জীবনের গভীর থেকে উঠে আসে। পাঠক ও শ্রোতার আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হন তিনি, বেদনাকেও বঞ্চিত করেন না। মানুষের অনুভব ও উপলব্ধির দোসর হয়ে ওঠার এই যে শক্তি, তার উৎস অনুসন্ধানে আগ্রহী হলে ধৈর্যশীল ও দায়িত্ববান শিল্পানুরাগীর জন্য নির্মাতার জীবনবৃত্তান্তের প্রকৃত পৃষ্ঠাগুলির নিবিড় পাঠ কেবল প্রাসঙ্গিকই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে অপরিহার্যও বটে। শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টা তাঁর কর্মের গভীরে ডুব দিয়ে থাকেন। গভীরভাবে লক্ষ করলে এই বোধও জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয় যে, তিনি মূলত নিজেকেই সৃষ্টি করেন। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় কীভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি, জীবনের কোন সত্য তাঁর শিল্পের দর্পণে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার তদন্তে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাই ব্যক্তি ও কবি সৈয়দ আলী আহসানকে পাঠ করা জরুরি।

পারিবারিক পটভূমি ও শৈশব জীবন

জীবনের প্রথম পাঠশালা হিসেবে পরিবার প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণে পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। পরিবার কেবল অপরিণত দেহের পুষ্টি ও নিরাপত্তাই বিধান করে না, অপক্ক মস্তিষ্কের কর্মপরিধি বিস্তার এবং এর গতিবিধি নির্ধারণের প্রাথমিক পর্যায়টিও পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। একজন মানুষ পৃথিবীর যে অংশের আলো বাতাসে প্রথম স্নাত হন, তার অমোচনীয় ছাপ তাকে আমৃত্যু বহন করতে হয়। প্রতিভাবান মানুষের ব্যক্তিত্বের যে ধরন কিংবা ধার আমাদেরকে স্পর্শ কিংবা সক্রিয় করে তোলে, সেই ব্যক্তিত্বের গভীরদেশে ব্যক্তি মানুষটির

পারিবারিক পরিমণ্ডলের প্রভাব রুধিরধারার মতোই অদৃশ্য এবং অনস্বীকার্য। সৈয়দ আলী আহসানের জীবন-প্রবাহের প্রাথমিক পর্যায় তাঁর পরবর্তী কর্মময় ও সৃজনশীল জীবনের ভিত নির্মাণেও নিশ্চয়ই উজ্জ্বল অবদান রেখেছে। এ কারণেই, রবীন্দ্রনাথের (২০০৬ : ৫/৩৩৯) ভাষায়, 'সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো'র খোঁজ নিতে হয়।

মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে ১৯২২ সালের ২৬ মার্চ সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং জীবনস্মৃতিতে তাঁর জন্মসাল ১৯২০-এর উল্লেখ থাকলেও বর্তমান গবেষণাকর্মে আমরা তাঁর একাডেমিক জন্মসালকেই গ্রহণ করেছি। এক সম্ভ্রান্ত সুফি পরিবারের উত্তরাধিকার প্রবাহিত ছিল আলী আহসানের রক্তে। 'যখন দিল্লীতে সৈয়দ বংশের শেষ নৃপতি আলাউদ্দিন আযম শাহ রাজত্ব করছিলেন তখন বাগদাদ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহ:) দিল্লীতে আগমন করেন এবং রাজগৃহে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হন। তিনি সম্রাটের প্রথমা কন্যা আয়েশা খাতুনের পাণিগ্রহণ করেন। পরে লোদীদের আক্রমণে সুলতান আলাউদ্দিন আযম শাহ দিল্লী ছেড়ে চলে যান। হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহ:) নৌকাযোগে ফরিদপুরের ঢোল সমুদ্রের কাছে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সৈয়দ আলী আহসানের ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ।' (২০০৩খ : ২১৭)। হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহ:) ঢাকার মিরপুরে সমাহিত। সৈয়দ আলী আহসানের পিতা সৈয়দ আলী হামেদ এবং মাতা সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। আলী আহসানের পিতা-মাতা দুজনেই পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। আহসান পিতার-মাতার কাছ থেকেই ফারসি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তিনি উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন মায়ের কাছ থেকে। পিতা-মাতা দুজনেই আলী আহসানকে ধর্মীয় জীবনাদর্শে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। আলী আহসান জানিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাঁর মায়ের আদেশ, 'তোমার কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সাধক হওয়া। আমাদের পূর্বপুরুষ সকলেই সুফী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তোমারও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত।' (২০০৩ক : ৫৮-৫৯)। সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার প্রেরণাও তিনি লাভ করেছেন পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে। সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন, "তাঁর পিতা সৈয়দ আলী হামেদ ফারসী আরবী ও উর্দু ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন এবং ফেরদৌসীর শাহনামা তাঁর প্রিয় কাব্য ছিল। প্রায় প্রতিদিন বিকালে তিনি সুর করে মূল শাহনামা আবৃত্তি করতেন। শিশু আলী আহসান ধ্বনি-ঝংকার তন্ময় হয়ে শুনতেন। উত্তরকালে তাঁকে 'কবিতার মুখ্য উপাদান ধ্বনি ও শব্দ' মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী করে তোলার জন্য অবচেতন মনে শৈশবের ঐ-প্রভাব হয়ত অনেকাংশে কাজ করেছে।" (২০০১ : ১৮০)। আহসানের পিতা উর্দু, ফারসি এবং বাংলা ভাষায় গজল ও গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এই ধর্মীয় ও সৃষ্টিশীল পরিমণ্ডলেই সৈয়দ আলী আহসানের শৈশব কেটেছে।

সৈয়দ আলী আহসানের শৈশবের যশোর তাঁর স্মৃতিতে দাগ কাটার আগেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। তিনি আনুমানিক ১৯২৮ সালে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং বাবার কর্মস্থল ধামরাইয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

> আমার জন্ম হয়েছিল যশোরে এবং শিশুকালের যে সময়টুকু যশোরে কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতি প্রধানত মায়ের মুখে শুনে গড়ে উঠেছিল। সে সময়কার কথাগুলো আমি বলিনি। তখন থেকে চলে এসেছিলাম নানাবাড়ি আগলা পূর্বপাড়ায়, যেটা ছিল ঢাকা শহরের কাছাকাছি। বাবার কর্মস্থল ছিল ধামরাই। আমরা নৌকায় করে তাই ধামরাই গিয়ে পৌঁছলাম। (২০০৩ক : ২০)

ধামরাইয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে ধামরাইয়ের রথযাত্রার অভিজ্ঞতার আবেগবিহ্বল বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। 'আমার শৈশবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি কোন ধরনের বিরোধ দেখিনি।'– আলী আহসানের এই মন্তব্যে তাঁর শৈশবের ধামরাইয়ের অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে। বাবার হাত ধরে নদীর তীর ঘেষে হেঁটে বেড়ানোর ভেতর দিয়ে তিনি কেবল প্রকৃতিকেই ভালোবাসতে শেখেন নি, সেইসঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের ছবি দেখতেন, কখনো আবার সৃষ্টির আনন্দ ও স্রষ্টার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাবার কাছে তাত্ত্বিক আলোচনা শুনতেন। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় :

> এক একদিন বিকেল বেলা বাবা আমাকে এবং আমার ভাইবোনদেরকে নিয়ে নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে যেতেন। নদীর তীর ছিল ফাঁকা। কিছু কিছু গাছ ছিল, প্রধানতঃ বাবলা গাছ। বছরের কোন কোন সময় সে গাছগুলোর গা বেয়ে স্বর্ণলতা ছড়িয়ে থাকতে দেখতাম। নদীর তীরেই ছিল বাজার। বাজারের ছোট ছোট ঘর এবং সেখানে মানুষের চলাফেরা নদীর পাশ দিয়েই ভালই লাগত। নদীতে নৌকো বাঁধা থাকত এবং কাজ সেরে লোকেরা নৌকো করে ওপারে চলে যেত। কোন কোন দিন আমাদের চলার সঙ্গে গ্রামেরও কিছু লোক এসে যোগ দিত। তারা চুপচাপ থাকত। চতুর্দিকের শব্দগুলো আনন্দময় ধ্বনি নির্মাণ করে নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যেত। বাবা পথ চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা বলতেন। সব যে বুঝতাম তা নয়। মনে হত তিনি বলতে চান, এই যে নদী, এই যে মাটি এবং এই যে আশোপাশের লোকালয় সব বিধাতার সৃষ্টি। তিনি তার ইচ্ছা এবং আমাদের আনন্দের জন্য সৃষ্টিকে বিচিত্র করেছেন। সকাল বেলার দৃশ্য ছিল আরও সুন্দর। সূর্যকিরণ যখন ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ত তখন ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমাদের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে লাল শাপলা ফুটত, সূর্যকিরণে সেই শাপলা ফুল দেখতে খুব ভাল লাগত। প্রকৃতিদত্ত আবরণের বিচিত্রতায় পৃথিবী যে কত সুন্দর এবং কত মহিমাময় তা শৈশবে আমি যেভাবে বুঝেছি বড় হয়ে ঠিক সেভাবে অনুভব করিনি। (২০০৩ক : ২১-২২)

শৈশবেই আলী আহসান মানুষ ও প্রকৃতিকে পাঠ করতে শিখেছিলেন। মানুষকে তিনি দেখতেন 'বিভিন্ন রকমের বেশে এবং এসব মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যেও ব্যবধান ছিল'। কিন্তু মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। আহসানের মা তাঁকে শিখিয়েছিলেন, 'মানুষকে কখনো অন্য মানুষ ভাবতে নেই অথবা অন্য কোন রকম জীব ভাবতে নেই। সবাই আমরা মানুষ হিসেবে এক।' (২০০৩ক: ২২)। ধামরাইয়ের দিনগুলো তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। 'গ্রামে প্রকৃতির যে ঔদার্য, নদীর যে স্নিগ্ধতা এবং বাতাসের যে অনাবিল প্রফুল্লতা সেগুলোই' যেন আহসানের শৈশবের দিনগুলোকে ভরিয়ে তুলেছিল।

পারিবারিক পরিমণ্ডল সৈয়দ আলী আহসানের শৈশবকে একটা বিশেষ ধর্মীয় আবহে আবদ্ধ রেখেছিল। তাই কোরআন শিক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। তিনি লিখেছেন, 'প্রথমে শিশুকে কুরআন শরীফের বর্ণলিপি শেখানো হত। জাফরান গুলিয়ে খাগের কলম দিয়ে একজন বয়স্ক এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তখ্‌তিতে অক্ষরগুলো লিখে দিতেন, পরে শিশুকে হাতে ধরিয়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর দাগ টানতে হত।' (২০০৩ক : ২৪)। ১৯২৬-৩১ কালপরিসরে আহসান গৃহশিক্ষকের সহযোগিতায় পড়াশোনা করেন এবং ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং আর্মানিটোলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি ডব্লিও ওয়েস্ট, ডি. জে. কলিন্স, বি. কে. বিশ্বাস, ড্যানিয়েল জোন্‌স, মিসেস ডব্লিও ওয়েস্ট, এস. এন. কিউ, জুলফিকার আলী, ও ওসমান গণির মতো খ্যাতিমান শিক্ষাবিদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। স্কুলে পাঠগ্রহণকালেই তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছিলেন। আহসান ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৩৯ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। আই. এ. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজে তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অত্যতম প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। টি. এস. এলিয়টের কবিতার প্রতি আহসানের আগ্রহের সূত্রপাত কলেজজীবনেই। ঢাকা কলেজে পড়ার সময়ই বিশ শতকের তিরিশের দশকের প্রধান কবিদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন আহসান। ১৯৪১-১৯৪৪ কালপর্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়াশোনা করেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর– উভয় পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মোহিতলাল মজুমজারের সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে নতুন শিল্পবোধের জন্ম দেয়। আহসানের ভাষায়, 'মোহিতলালের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং তাঁর কবিতার মাধ্যমে একটি নতুন প্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁর বলিষ্ঠতা, ঔদার্য, নাটকীয় ভঙ্গি এবং তীব্র গতিবেগ আমাকে মুগ্ধ করে।' (২০০৩ক : ১৬)। মোহিতলালের কণ্ঠে তাঁর 'কালাপাহাড়' কবিতাটির আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন আহসান।

সৈয়দ আলী আহসানের লেখালেখির শুরু স্কুলজীবনেই। ১৯৩৭ সালে ঢাকার আর্মানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে প্রথম কবিতা লেখেন তিনি। বাংলা কবিতার এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের হাতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল একটি ইংরেজি কবিতা। আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত *সৈয়দ আলী আহসান : মনীষার মুখ* গ্রন্থভুক্ত একটি সাক্ষাৎকারে আলী আহসান জানিয়েছেন, "প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন ইংরেজিতে পঞ্চপার্বিক আয়ামবিক ছন্দে। নাম 'দি রোজ'।

ছাপা হয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিনে। কবি মতিউল ইসলাম তখন আমাদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন আর অম্বিকারচরণ এম ই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে ঢাকার সাপ্তাহিক 'চাবুক' পত্রিকায় আমার নামে ছেপে দেন।" (২০০৩খ : ৯৭)। আলী আহসান ১৯৩৮-১৯৪৭ কালপর্বে সেই সময়ের খ্যাতিমান এবং উদীয়মান শিল্পস্রষ্টাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি প্রথম কলকাতা যান ১৯৩৬ সালে। ১৯৪৫-৪৭ কালপরিসরে তিনি ছিলেন 'পুরোপুরি কলকাতাবাসী'। কাজী আফসারউদ্দিন আহমদের সংযোগসূত্রে কলকাতায় তিনি একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তিনি ঘনিষ্ঠ হন ফররুখ আহমদ, গোলাম কুদ্দুস, শওকত ওসমান, মনিরউদ্দিন আহমদ, মতিউল ইসলাম, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহসান হাবীব, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল হোসেন, জয়নুল আবেদীন ও সিকানদার আবু জাফরের সঙ্গে। এই কালপর্বেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে *মাসিক মোহাম্মদী*, *সওগাত*, *নবযুগ*, *পরিচয়* প্রভৃতি পত্রিকায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'তখনকার দিনে সমৃদ্ধমান এবং সম্ভ্রান্ত রুচির পত্রিকা' *পরিচয়ে* 'সম্ভবত ১৯৪১ কি ৪২ সালে' 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' নামে সৈয়দ আলী আহসানের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তাঁকে পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদানে অবদান রেখেছিল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় দক্ষতা লাভের পর তিনি যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পান, তখন থেকেই তিনি ইংরেজি ভাষার আধিপত্য আবিষ্কার করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের স্কুল ছিল ইংরেজ-শাসিত স্কুল। হেডমাস্টার ছিলেন একজন ইংরেজ। তাঁর নাম ছিল টি. জে. কলিন্স। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইংরেজ ড. মাইকেল ওয়েস্ট। আমি ছোটবেলায় ইংরেজি ভাষা ও উচ্চারণের প্রতাপের মধ্যে মানুষ হয়েছি।' (২০০৩ক : ৬৫-৬৬)। যে 'শৃঙ্খলা এবং সম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে' বাস করতেন আহসান, তাতে ইংরেজির প্রতাপ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ তিনি স্কুলজীবনেই শেষ করেছিলেন। সেইসঙ্গে ব্রেট হার্ট, ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি বের্গসঁ, তুর্গেনিভ, ল্যাম্ব প্রমুখ শিল্পস্রষ্টার লেখার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি সৈয়দ আলী আহসানের আগ্রহের সূত্রপাত স্কুলজীবনেই। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার প্রেমে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের *রাজর্ষী* উপন্যাসের একটি অংশ পাঠ্যপুস্তকভুক্ত হওয়ায় পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন আহসান। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রচনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আলী আহসানের শ্রদ্ধার নিদর্শন তাঁর ভাষায়ই উদ্ধৃত করা যাক :

> স্কুলে থাকতেই সম্ভবত ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছিলাম। সে অসুস্থতার সংবাদে আমার এবং আমাদের সহপাঠীদের ব্যাকুলতার অবধি ছিল না। আমরা কয়েকজন মিলে শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রামও পাঠিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কুশল সংবাদের জন্য। আরোগ্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন, তার নাম 'প্রান্তিক'। যে কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, কথার উপরে কথা আজীবন সাজিয়ে চলেছি, এবার কিন্তু থামাতে হবে। বাক্যের মন্দির চূড়া গেঁথে কত অসাধ্য সাধন করেছি ভাবছি কিন্তু এখন মনে হয় কোন কিছুই করা হয়নি, অকস্মাৎ সব থেমে যাওয়ার আভাষ পেলাম। সে বয়সেই মনে হত এই বিরাট এবং বিপুল সৌন্দর্য সাধক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে আমাদের কি হবে? তখন আবেগ ছিল প্রচুর, যুক্তি এবং বিবেচনা ততটা প্রবল ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রকে আমরা কখনও হারাব এটা ভাবিনি। (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৩ক : ১৪-১৫)

সৈয়দ আলী আহসান শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই খ্যাতিমান শিল্পব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পারিবারিক পরিমণ্ডল এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবহে তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেন। অল্প বয়সেই অনেকগুলো ভাষায় তিনি দক্ষতা লাভ করেন যা তাঁর সাহিত্যচর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছে। আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দখল তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি হিন্দি ভাষা রপ্ত করেন। ফলে বিভিন্ন ভাষার মৌলিক সাহিত্যের রসাস্বাদন তাঁর পক্ষে সহজতর হয়। শৈশব কৈশোরের এই অভিজ্ঞতা ও অর্জনই তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছে, শিল্পসাহিত্য জীবনেরই অনিবার্য অংশ।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

সৈয়দ আলী আহসানের কর্মজীবনের শুরু প্রাইভেট টিউশনি দিয়ে। আহসান লিখেছেন, 'এম. এ. পাশ করার পর কলকাতায় কর্মজীবন আরম্ভ করি প্রাইভেট টিউশনি দিয়ে। এম. এ. পরীক্ষার্থিনী বেনারসের একটি হিন্দু মেয়েকে সপ্তাহে তিনদিন পড়াতাম, মাসে একশ' টাকা করে পেতাম। তখন আমি কলকাতায় একটি মেসে থাকতাম। এই একশ' টাকাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।' (২০০৩ক : ৬০)। ১৯৪৪ সালে হুগলীতে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে তিনি কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি যোগ দেন অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রে প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগেই তিনি চলে আসেন ঢাকা রেডিওতে। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের রিডার ও অধ্যক্ষ পদে যুক্ত হন। ১৯৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কোর একটি সেমিনারে ইউনেস্কো সেক্রেটারিয়েটের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং তিনি কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এবছর তিনি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১ মার্চ তিনি আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এ বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯৭৭ সালের ২৬ জুন তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৮০ সালে চারুকলা ইন্সটিটিউটে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে আহসান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন।

সৈয়দ আলী আহসান বিভিন্ন সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কলেজজীবনে তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নজির আহমদ নিহত হলে তাঁর স্মরণে প্রকাশিত 'নজির আহমদ' নামক পুস্তকটি তিনি সম্পাদনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসেবে আলী আহসান ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের 'উদ্দেশ্য ছিল আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যিক পুনর্জাগরণের আদর্শে ভবিষ্যতের পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ আনয়ন করা। ইসলামের প্রবহমাণ ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করা, অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অংগীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামজীবনকে আরো বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা– এই তিন লক্ষ্যে সংসদের আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৮০)। এই সংসদ সংশ্লিষ্টতা আলী আহসানের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যকর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে ১৯৪৫ সালে মহাকবি কায়কোবাদকে সংবর্ধিত করা হয়। এবছরই আলী আহসান সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। ১৯৪৮ সালে আবদুল গনি হাজারীর সঙ্গে ঢাকার আর্ট ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি ১৯৫০ সালে জয়নুল আবেদীনকে সভাপতি করে ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামে একটি শিল্প আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এবছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনের সাহিত্য অধিবেশনে কাব্য শাখার সভাপতিত্ব করেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তান পি.ই.এন-এর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৫৪ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পি.ই.এন পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। আহসান কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি জেনারেল হন। ১৯৫৯-এ আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম-এর পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে Islam in the Modern World শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৬১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী

মিলনায়তনে ঢাকার তেরজন শিল্পীর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলায় এটিই ছিল প্রথম শিল্প প্রদর্শনী যেখানে শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং শিল্পী হামিদুর রহমানের চিত্র প্রদর্শিত হয়। এ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন, "১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষ প্রচেষ্টায় ঢাকায় নাট্য উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় আশকার ইবনে শাইখের 'রক্তপদ্ম', ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম', সৈয়দ আলী আহসানের 'ইডিপাস রেক্স'-এর বাংলা অনুবাদ, সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান', আমেরিকার 'মেইন মাসক' থিয়েটার গ্রুপের 'আওয়ার টাউন' এবং মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। নাট্য উৎসবটি ঢাকার নাট্যমোদী মহলে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।" (২০০৪ : ২৭১)। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আয়োজনে 'ভাষা সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়, যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। এই অনুষ্ঠানে তিনি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিল কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম। এবছর তাঁরই উদ্‌যোগে বাংলা একাডেমী বাংলা সন তারিখ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তিন বছরের নিরলস পরিশ্রমে বাংলা সনের একটি বৈজ্ঞানিক বর্ষপঞ্জি প্রণীত হয়। বাংলা বানান সংস্কারের উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন তিনি। বাংলা একাডেমী যে কমিটি গঠন করে তার সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। এই কমিটির সদস্য ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাৎ, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুহাম্মদ ওসমান গনি, মুহাম্মদ ফিরদৌস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অশীতিবর্ষ উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানো হয়। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে তিনি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে *পাণ্ডুলিপি* নামক সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। 'এ সময়ে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত ফরাসি কবি ও ফরাসি একাডেমির সদস্য পিয়ের ইমান্যুয়েল বাংলাদেশের বাস্তুহারা বুদ্ধিজীবীদের অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ইমান্যুয়েল তাঁকে লেখেন নিউইয়র্কের শেফার্ড স্টোনের সহায়তায় তাঁর জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে। জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন। এই অর্থ বিতরণের জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি ছিলেন জাস্টিস এস. এ. মাসুদ এবং সদস্য ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, ডক্টর এ. আর. মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, সুশীল ভদ্র ও সুনীল মুখার্জি।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০৪ : ২৭১-৭২)। জুলাই মাসে আহসান বাংলাদেশ বিষয়ে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে ড. প্রবোধচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সৈয়দ আলী আহসান রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সেপ্টেম্বরে জয়প্রকাশ নারায়ণের আহ্বানে তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেন তিনি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েও আহসান বাংলাদেশ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট কলকাতা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন। এই সময় বাংলাদেশ সরকার ন্যাশনাল একাডেমী অব আর্টস এন্ড ক্র্যাফটস প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ গ্রহণ করে। সৈয়দ আলী আহসানকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির পরিকল্পনা অনুসারে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ এপ্রিল বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত কমিটির আহ্বায়ক হন সৈয়দ আলী আহসান। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সমন্বিত বাংলা একাডেমী'।

সৈয়দ আলী আহসান বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। সাহিত্যবিষয়ক নানা বিশ্বসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তিনি, অনেক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ২৮তম আন্তর্জাতিক পি.ই.এন সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরের বছর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় টোকিওতে। এই সম্মেলনেও পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে তিনি ম্যানিলায় যান এবং ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিনোজ-এ বক্তৃতা করেন। একই বছর তিনি হংকং গমন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, বৈরুত

বাগদাদ, ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা, কায়রো সহ নানা শহর পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৯ সালের ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত ৩০তম পি.ই.এন কংগ্রেসে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। ১৯৬০ সালের জুন মাসে পশ্চিম বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে আহসান পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন, ডুসেলডর্ফ, লিসবন, দক্ষিণ আমেরিকার রিয়ো ডি জেনিরোতে যান। সেখানে আন্তর্জাতিক পি.ই.এন সম্মেলনে যোগ দেন। এরপর বার্লিন হয়ে 'হাঙ্গেরিয়ান রাইটার্স ইন এক্সাইল' নামক দেশত্যাগী হ্যাঙ্গেরীয় লেখকদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে লিডারশীপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আমেরিকা যান। এসময় তিনি ভ্রমণ করেন নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, মিসিগান, ইন্ডিয়ানা, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জেলস, উইলিয়ামস, নিউঅরলিন্স, বোস্টন, প্যারিস প্রভৃতি শহর। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে তিনি আবার যান ম্যানিলায়, অংশগ্রহণ করেন এশীয় পি.ই.এন সম্মেলনে। ১৯৬৩-তে প্যারিসে 'বুলভার্ড হোমসানে' কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ সময় তিনি লন্ডন এবং বৈরুত গমন করেন। এবছর আহসান তেহরানে অনুষ্ঠিত শিশুসাহিত্য বিষয়ক বিশেষ পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১৬ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন। এবছরের জুলাই মাসে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে তিনি জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই সফরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট, হাইডেলবার্গ, মিউনিখ, টুবিঙ্গো, স্টুটগার্ড, ওয়েস্ট বার্লিন, হামবুর্গ প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেন। ১৯৭৫ সালে ভারতের নাগপুরে বিশ্বহিন্দী সম্মেলন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার, বুলগেরিয়ার জাতীয় সাহিত্য ও লিপি দিবসের অনুষ্ঠান, মস্কোয় অনুষ্ঠিত ২৫তম প্যালেনারি এ্যাসেম্বলি অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ইউনাইটেড এসোসিয়েশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তিনি যোগ দেন জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশনে। ১৯৭৮ সালে তিনি বৃটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে লন্ডন এবং কুয়েত সরকারের আমন্ত্রণে কুয়েত গমন করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থার আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুর যান। ১৯৮০-৮১ সালে তিনি ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৮৩-তে তিনি কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ভারত গমন করে। এই দলের প্রধান হিসেবে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৯৭ সালে আবার তিনি আমেরিকা সফর করেন। সৈয়দ আলী আহসানের বিদেশভ্রমণের এই তালিকায় তাঁর ব্যক্তিগত ভ্রমণসমূহ যুক্ত করলে এই তালিকা আরো দীর্ঘ হবে। শিল্প-সাহিত্যে নিবেদিত এই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের বিদেশ ভ্রমণে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করেছে।

সৈয়দ আলী আহসান শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য গবেষণায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন তিনি, অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ, আবার মৌলিক সাহিত্যকর্মেও অনলস সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন। *নজরুল ইসলাম* গ্রন্থে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের শক্তির মৌলপ্রান্ত নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ও অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন *কবি মধুসূদন* গ্রন্থটি। '১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত আলাওলের *পদ্মাবতী* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি মালিক মুহম্মদ জায়েসীর *পদুমাবৎ* ও আলাওলের *পদ্মাবতী*-র পাঠ নির্ধারণ, তুলনামূলক পাঠ সমালোচনা, মূলের অনুবাদ, বিস্তৃত টীকা এবং উভয় কাব্যের কাব্যরস ও অলঙ্কার পর্যালোচনা করেন। এ বছর তিনি সম্পাদনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবদ কাব্য* এবং দুটি প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?* ও *বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ*।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০৪ : ২৭১)। ১৯৭০ সালে সৈয়দ আলী আহসানের *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৭৩ সালে সম্পাদনা করেন মধ্যযুগের কাব্য *মধুমালতী*। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা* গ্রন্থটিও রবীন্দ্র-গবেষণায় উজ্জ্বল অবদান রাখে। একই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর *কাব্যসমগ্র*। ১৯৭৫

সালে প্রকাশিত হয় *Essays on Bengali Literature*। ১৯৭৬ সালে *জার্মান সাহিত্য : একটি নিদর্শন* প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালে শিল্পকলা একাডেমী থেকে তাঁর *শিল্পবোধ ও শিল্প-চৈতন্য* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। একই বছর প্রকাশিত হয় *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটির ষষ্ঠ সংস্করণ।

সৈয়দ আলী আহসানের মৌলিক কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৪৪), *অনেক আকাশ* (১৯৫৯), *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৯৬২), *সহসা সচকিত* (১৯৬৬), *উচ্চারণ* (১৯৬৮), *আমার প্রতিদিনের শব্দ* (১৯৭৪), *সমুদ্রেই যাব* উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত কাব্যগ্রন্থসমূহের *ইকবালের কবিতা* (১৯৫৩, আবুল হোসেন ও ফররুখ আহমদ সহযোগে), *উইলিয়াম মেরিডিথের কবিতা*, *হুইটম্যানের কবিতা* (১৯৬৫), *ইভান গলের কবিতা*, *আধুনিক জার্মান কবিতা* উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ সালে তিনি গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের *ইডিপাস* নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসানের অন্যান্য গ্রন্থ– '*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ*, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মধ্যযুগ*, *যখন সময় এলো* (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ), *জীবনের শিলান্যাস* (আত্মজীবনী), *জিন্দাবাহারের গলি* (উপন্যাস), *স্রোতবাহী নদী* (শৈশব জীবন), *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ* (শিল্পতত্ত্ব), *আধুনিক বাংলা কবিতা*, *মোজাদ্দে আল্‌ফ সানী : তাঁর মক্‌তুবাত*, *হে প্রভু আমি উপস্থিত*, *আল্লাহুর অস্তিত্ব*, *১৯৭৫* (স্মৃতিকথা), *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, *বিশ্বসাহিত্য এবং আনুষঙ্গিক রচনাবলী*, *আমার জীবনে নারী*, *আমেরিকা : আমার দৃষ্টিতে* (ভ্রমণকাহিনী)।' (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৯ : ৬৩২)। এই গ্রন্থ তালিকা থেকে আলী আহসানের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বহুমাত্রিকতা অনুধাবন করা যায়।

সৈয়দ আলী আহসানের সৃষ্টিকর্মের তালিকা যেমন দীর্ঘ তেমনি তার স্বীকৃতি, সম্মাননা ও পুরস্কারের তালিকাও কম বড় নয়। ১৯৬৮ সালে তিনি বাংলা একাডেমী কবিতা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালের কবির ৬০তম জন্মদিনে সংবর্ধিত হন তিনি। ১৯৮৭ সালে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পান। ১৯৮৯ সালে তিনি লাভ করেন জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান। ১৯৯২ সালে ফরাসী সরকার তাঁকে Officer De Lordre Des Des Letters-এর সনদ প্রদান করে। সৈয়দ আলী আহসান একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, মাইকেল মধুসূদন সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেন। ২০০১ সালে তিনি অর্জন করেন রোটারী ইন্টারন্যাশনাল-এর 'পল হ্যারিস পদক'। সৈয়দ আলী আহসান ২০০২ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

সৈয়দ আলী আহসান ১৯৪৬ সালের ৭ জুলাই কমর মুশতারীকে বিবাহ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ তাঁর প্রথম সন্তান সৈয়দা নাজ কমরের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ সৈয়দা কমর জাবিনের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ আলী কাযেমের জন্ম হয়। ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ আলীউল আমীন। (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৯ : ৬২৮)। ২০০২ সালের ২৫ জুলাই ভোর বেলা সৈয়দ আলী আহসানের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ আলী আহসানের কর্মজীবনের পরিসর যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত, তেমনি শিল্পসাহিত্যের নানা শাখায় তিনি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি যেমন দেশে ও বিদেশে খ্যাত, তেমনি শিল্পস্রষ্টা হিসেবেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তাঁর নানা কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের জন্ম দিলেও তিনি নিজের মতো করে কাজ করে গেছেন। নিজের কর্মকাণ্ড কিংবা অবস্থান সম্পর্কেও তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকার বা ব্যক্তিগত রচনায় খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি যা বিশ্বাস করেন, তাঁর প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত রচনা *আমার সাক্ষ্য* গ্রন্থের 'প্রাসঙ্গিক মন্তব্য' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন :

> আমার কর্মজীবনে...বিচিত্র পালাবদল ঘটেছে। যার ফলে নানাবিধ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বন্ধু পেয়েছি, অনেক শত্রুও পেয়েছি। উভয় দিক রক্ষা করে চলার স্বভাব আমার কখনো ছিল না। আমার সকল সিদ্ধান্ত ছিল সুস্পষ্ট। এর ফলে আমার পক্ষে-বিপক্ষে অনেকে দাঁড়িয়েছে। পক্ষের শক্তিরা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণত নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু বিপক্ষের শক্তিরা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ হয়। আমার বিপক্ষের শক্তিরাও উচ্চকণ্ঠ ছিল এবং আছে। (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৩ক : ৭)

Dhaka University Institutional Repository

আহসান তাই অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজটি নিজের মতো করে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর কাজের পরিমাণ বিশাল বলেই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়েও তীব্রতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিল্পস্রষ্টা সৈয়দ আলী আহসানকে পাঠ করেই তাঁর শক্তি ও স্বকীয়তার জায়গাটি শনাক্ত করা যাবে।

সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি

সৈয়দ আলী আহসান সাহিত্যের সকল শাখায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও কবিতার সান্নিধ্যেই তিনি সবচেয়ে সচল-সবল-স্বতঃস্ফূর্ত। 'সৈয়দ আলী আহসান তাঁর অনেক পরিচয়ের মধ্যে যে কবি হিসাবেই বিশিষ্ট, এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমি মনে করি তাঁর এই পরিচয়কে প্রাধান্য দিলে তাঁর অন্য সকল উল্লেখযোগ্য দিদ্ধিকে খাটো করা হয় না।'– জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর (১৯৮৫ : ২০১) এই মন্তব্য যথার্থ বলেই আমরা মনে করি। কবিতার চেয়ে তাঁর গদ্যের পরিমাণ অধিক হলেও তাঁর গদ্যের সিংহভাগই দখল করে আছে কবিতা। কবিতার হৃৎস্পন্দনই তাঁর জীবনের স্পন্দন। জীবনকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে চান নি তিনি। কবিতা এবং কবিতা-বিষয়ক গদ্যরচনায়ই মগ্ন থাকে নি আহসান, সাহিত্য-সম্পর্কিত যে কোন আলাপচারিতায় তিনি কবিতার প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে ভক্ত-অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি, যা মুদ্রিত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক ও সাহিত্য পত্রিকায়। আহসান প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের সংকলনও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। সেই সাক্ষাৎকারসমূহে সৈয়দ আলী আহসানের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। সেইসব আলাপচারিতায় মনোনিবেশ করলে আমরা লক্ষ করব, বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের বিচিত্র বিষয়ে কবির বিবেচনা প্রকাশিত হলেও ঘুরেফিরে এসেছে কবিতার প্রসঙ্গ। সেখানে নিজের কবিতার স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য, গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের বর্তমান গবেষণায় সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার আধার ও আধেয় সম্পর্কে আলোকপাত সীমাবদ্ধ থাকায় আমরা কবিতা-বিষয়ে আহসানের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। কবি আবদুল হাই শিকদার *সৈয়দ আলী আহসান : মনীষার মুখ* গ্রন্থে বিভিন্ন দৈনিক ও সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত আহসানের সাক্ষাৎকারের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছেন। সেই গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সৈয়দ আলী আহসানের সাহিত্যভাবনা ও শিল্পচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত কয়েকটি মন্তব্য এখানে উপস্থাপন করছি :

ক. সাহিত্য জীবনের অন্তঃসার। জীবনের, জীবন-যাপনের, জীবনের বিশ্বাসের, জীবনের অভিঘাতের এবং আনন্দের চরমতম বিকাশ। আমি আমার আগ্রহে এবং আকাঙ্ক্ষায় জীবনকে যেভাবে অনুভব করেছি আমি তারই স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছি কখনো বেদনায়, কখনো আনন্দে। এ প্রচেষ্টার শেষ নেই। (২০০৩খ : ১০২)

খ. আমি জীবনকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি সততা ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। এই সততা ও বিশ্বাস জীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, প্রেম ও অহমিকার সঙ্গে জড়িত, আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে জড়িত। এক সময় আমি প্রেমের তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম। সে তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে শক্তি সাধন পদ্ধতি এবং বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি আমি পরীক্ষা করেছি। এসব কারণে আমার কবিতার মধ্যে দেহের কথা এসেছে। কিন্তু অবশেষে হৃদয়ের কথাটি প্রাধান্য পেয়েছে। বলেছি যে, হৃদয়কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আবার হৃদয়ের স্পর্শ ছাড়া দেহের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয় অর্ঘটি জীবনের সব থেকে মূল্যবান, একথা আমি বলেছি। এখানেই আত্মার কথা এসেছে। বিশ্বাসের কথা এসেছে। ... কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন আমার কবিতায় মানুষের কথা নেই। কিন্তু শুধু একটি অবয়ব নিয়েই তো মানুষ নয়। অথবা পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়েই মানুষ নয়। মানুষের একটি পরিচয় এবং যেটিকে আমি প্রধান পরিচয় বলে মনে করি, সে হচ্ছে তার অন্তরাত্মার পরিচয় এবং চৈতন্যের পরিচয়। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েও মানুষের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়। এই উদ্‌ঘাটন করার মধ্য দিয়েই আমি জীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং জীবনবিমুখ নই। আমার কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি অতলস্পর্শী বিশ্বাস আছে, সে বিশ্বাস মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তার আত্মার চৈতন্য সম্পর্কে। (২০০৩খ : ১২১-২২)

গ. একজন কবি তাঁর নিজের সম্পর্কিত সত্যকে অনুসন্ধান করে চলে। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি আসে, রমণী আসে, ইতিহাস আসে এবং অধীত বিদ্যার উল্লেখ আসে। এ সমস্ত কিছুই কবিতার শরীর নির্মাণ করে এবং এগুলোর মধ্যেই অন্তর্লোককে আবিষ্কার করতে হয়। এ অনুসন্ধানের কখনো শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের

একেবারে শেষ মুহূর্তে দিনের প্রথম সূর্য এবং শেষ সূর্যের কথা বলেছেন। বলেছেন, এ সূর্য যে কি তার সন্ধান তিনি করেছেন কিন্তু কখনো তিনি উত্তর খুঁজে পাননি।

একজন কবির কাছে এ অনুসন্ধানটাই সবচেয়ে মহৎ কর্ম। আমি আমার মতো আমার নিজস্ব ইচ্ছার পটভূমিতে আমার পরিচয়কে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি। এ অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। মূলতঃ কবিতার মধ্যে আপন অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া এটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেননা এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নয়। যেখানে হিসাব মেলাতে হয় এবং হিসাব মিললে আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে হিসাব কখনো মেলে না। কখনো কবি ইতিহাসের নিগূঢ়তম সংঘর্ষের মধ্যে, কখনো সাম্প্রতিক জীবনের কোলাহলের মধ্যে এবং কখনো ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মধ্যে আপন চিত্তের অন্তর্লীন অনুভবগুলোকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন। এই অনুসন্ধান কর্মটাই কবিতার একমাত্র দায়ভাগ। (২০০৩খ : ১৫০-৫৬)

সৈয়দ আলী আহসান বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় তাঁর কবিস্বভাব এবং শিল্পমানসের স্বাক্ষর রেখেছেন। *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথকে' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কবি বলেছেন, 'তুমি আমার আকাশ/এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর'। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে তিনি স্বরচিত কবিতার মতো মুক্তির সীমাহীন আকাশ হিসেবে দেখেছেন। কবিতায় তিনি এই মুক্তির আনন্দকেই খুঁজে বেড়াতে চেয়েছেন। এই কবিতায় শেষে সৈয়দ আলী আহসান বলছেন :

একাকী অনেক তারার রহস্যের মতো
অথবা রাগিণীর মতো সমস্ত রমণী
এবং প্রখর পাহাড় বৈশাখের মেঘের মতো
তাই তো আমার কথার উপরে কথা
সাজিয়ে চলার পৃথিবীতে
তুমি শেষহীন আকাশ
এবং অনেক সজীবতায় হৃদয়ের নীলাম্বর ॥ ('রবীন্দ্রনাথকে'/একক সন্ধ্যায় বসন্ত)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি 'কথার উপরে কথা' সাজানোর স্বাধীনতা অন্বেষণ করছেন। রবীন্দ্রনাথের রূপকল্পে সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় নিজেকে মেলে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। একই কাব্যগ্রন্থের 'কবিতা' শীর্ষক রচনায় আহসানের কাব্যভাবনার প্রকাশ লক্ষ করার মতো। একটি সাক্ষাৎকারের একালের কবিদের সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 'কবিতা শুধুমাত্র আবেগের অনুসঙ্গী নয়, কবিতা জ্ঞান ও বুদ্ধির সহচর। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে তরুণ কবিকুল আবেগের উচ্ছলতায় তরলভাবে প্রবাহিত কখনো বা তাৎক্ষণিক শ্রেণীসংগ্রামী তাছাড়া অনবরত পুরস্কৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রচারধর্মী। এ অবস্থায় যথার্থ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাদের তরুণ কবিরা জ্ঞানকে কবিতার জন্য প্রয়োজন বোধ করেন না, কবিতা লিখবার জন্য যে পাঠচর্চার প্রয়োজন তা তাদের নেই।' (২০০৩খ : ১০১)। এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করি 'কবিতা' শীর্ষক রচনায়। কবিতা কি, কবিতা কীভাবে হয়ে ওঠে এবং কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশার ব্যাকরণ কীভাবে চিহ্নিত হতে পারে, তার একটি স্পষ্ট পথরেখা নির্দেশ করেছেন কবি। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

অনুভূতি না থাকলে তমসার পাত্র ভরি
লাঞ্ছনায়-গ্লানিতে; কিন্তু মনে রাখতে হবে
আশ্চর্য আবেশে আত্মা থেকে প্রস্ফুটিত হবে
জীবন-ধর্ম– যথার্থ কাব্যের যা উপাদান।
আপনি কি সমাজের ত্রুটি শোধরাতে চান?
তা' হ'লে কবিতা না লিখে প্রবন্ধ লিখুন না,
না হয় বক্তৃতা করুন, কি হয় দেখুন না?
এগুলো সাময়িক ব্যাপার, আপনি বা আমি
ক্ষণকালের জন্য যার হয়তো অনুগামী,–

য'াকে আমরা অতিক্রম নিশ্চয়ই করবো;
কিন্তু হঠাৎ জাগ্রত আলোয় পথ চল্‌বো,
পৌছাবো অনুভূতির স্পৃহা আর সাধনায়
কাব্য শিখরে– হৃদয়-বেদনার অনুজ্ঞায়। ('কবিতা'/একক সন্ধ্যায় বসন্ত)

উচ্চারণ কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান শিল্পসাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন। বিশেষ করে কবিতা বিষয়ে তাঁর অভিব্যক্তি এই কাব্যে খুবই স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। '*উচ্চারণ* শুধু কবিতার বই নয় কবিতার ফাঁকে ফাঁকে যে বিস্ময় বেদনা ও অবলোকনের অন্তরালে ভাষা বঙ্কিম হয়ে ওঠে, ভারাক্রান্ত, দরবিগলিত ও দয়ালু তার মর্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।' (আল মাহমুদ ২০১২ : ৩২)। *উচ্চারণ*-কে 'সৈয়দ আলী আহসানের আত্মকথন তথা আত্মকেন্দ্রিক আত্মদর্শনের কাব্য' বলে উল্লেখ করেছেন মহীবুল আজিজ। (১৯৯৯ : ১৯১)। *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যেও কবির আত্মচৈতন্যের শিল্পসংহতি লক্ষ করেছেন তিনি। টানা গদ্যে লেখা *উচ্চারণে*র কবিতাবলিতে আলী আহসান কবি ও কবিতার আন্তঃসম্পর্কের গতিবিধি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কবিতা কীভাবে মানুষের অনুভূতির গভীরদেশে প্রবেশের পথ নির্মাণ করে নেয়, তারই অনাবিল উচ্চারণে কবিতাগুলো অনাস্বাদিত দীপ্তি লাভ করেছে। ২০-সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন, 'দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন, আস্বাদন এবং সকল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে চিত্তের মনন-কৃত্য সম্মিলিত হয়ে যে উপলব্ধিকে জাগ্রত করে তাই হল একজন সফলকাম কবির অবলোকন।' কবির সাধনার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি গৌতম বুদ্ধের সাধনার কথা স্মরণ করেন : 'চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার কথা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন। কবির কাছে এ শুভ নিমিত্ত হচ্ছে অকস্মাৎ বিস্মিত নয়নে পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার।' পৃথিবীর সৌন্দর্য যখন কবির চেতনার রঙে রাঙা হয়ে ওঠে, তখনই শব্দের শরীরে আশাতীত আনন্দের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোয় পরিচিত পৃথিবীও আমাদের কাছে অন্যরকম মনে হয়। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক :

ক. আমরা যখন শব্দে আমাদের সকল ইচ্ছা এবং প্রয়োজনকে তুলে ধরবার চেষ্টা করি, তখন বোধকে দৃষ্টির সীমায় টেনে আনি। দৃশ্যগোচর না হয়ে কোনও বস্তুই উপলব্ধির সম্পদ হতে পারে না। তাই দৃশ্যগোচরকেই আমরা দেখি না, অদৃশ্যকেও আমরা দেখি, শ্রুতিগ্রাহ্যকেও আমরা নয়নে নির্ণয় করি। (২৩-সংখ্যক কবিতা)

খ. কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য স্মৃতির সঞ্চয় একটি অসম্ভব নিরুদ্ধতা। কিন্তু কবি অন্তত সময় এবং কালের বিস্তারের মধ্যে বাস করেন, তাই তাঁকে বেদনার অনুকম্পন আবিষ্কার করতে হয়। এ-বেদনা স্মৃতির মধ্যে যতটা বিকশিত, জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ততটা প্রবাহিত নয়। প্রভাতের অরুণশ্রীর সুন্দরতার মতো, সমস্ত প্রাচীন বেদনা কবির চিত্তে নতুন উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় জাগ্রত হয়। (৩৩-সংখ্যক কবিতা)

গ. কবিতায় যে মনের পরিচয় আমি দিয়েছি তাকে যদি কেউ অমর্যাদা করে বলে যে, আমি মনকে সর্বত্র দিয়েছি এবং অবিশেষ করেছি, তাহলে আমি সত্যিই আহত হই। কবিতা তো আমার খেলা নয়, আমার অবসরের আনন্দ নয়– কবিতা আমার বেদনা এবং উপলব্ধির তারা। (৪২-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু একজন শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে অথবা উপলব্ধিতে জাগে, যা তাকে বেদনা দেয় এবং যা তার সামনে সমস্যার মতো, শিল্পী তার সম্মুখীন হবেন এবং এভাবেই জীবনের সঙ্গে তিনি সংগ্রামে রত হবেন। কোনও কিছুকে না হারিয়ে, কোনও কিছুকে অস্বীকার না করে, নির্যাতন সহ্য করে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার কুশলতাকে নির্মাণ করে একজন শিল্পী মহৎ হবেন। যারা শিল্পকে গুরুতর মূল্য দিয়েছে কিন্তু জীবনকে দেয়নি, তাদের পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু মহৎ শিল্পী তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা জীবনের প্রতিটি বিরাট সমস্যার সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তাঁরা সকলের সঙ্গে এক হয়ে তাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেন, তাদের সময় এবং কালের সকল সংঘর্ষকে লক্ষ্য করেন এবং সর্বত্র নিজেদের স্বাক্ষর রাখেন। তাই তাঁরা সকল কালের মানুষের অনেক নিকটে। (৫২ সংখ্যক কবিতা)

ঙ. মনের বিশেষ ইচ্ছা যদি দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত না হতে চায়, যদি আনন্দের সংস্থান কর্মকুশলতায় পরিস্ফুট না হয়ে সাহিত্য বা শিল্পকর্মে জাগ্রত হয় এবং সেক্ষেত্রে সংসারযাত্রায় যদি বিপুল অকুশলতা দেখা দেয়, তাহলে সংসারের

সংগতি কামনা না করে শিল্পকেই আমি প্রাধান্য দেব। আমার স্বস্তি আমার সাহিত্যে, কবিতায়, প্রেমে এবং হৃদয়ের পরিচর্যায়। (৫৫-সংখ্যক কবিতা)

সৈয়দ আলী আহসানের *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে তাঁর শিল্পদর্শনের মৌল প্রবণতাটি চিহ্নিত করা যায়। শিল্পের মাধ্যমে তিনি নিজেকে জানতে চান এবং জানাতে চান। মানব জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরটিকে তিনি অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চান। সেইসঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্গত স্বরূপটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চান তিনি। কবি যখন বলেন, 'আমার স্বস্তি আমার সাহিত্যে, কবিতায়, প্রেমে এবং হৃদয়ের পরিচর্যায়', তখন তিনি সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য উন্মোচন করতে চান। সৃষ্টি কখনোই প্রেম ও হৃদয়ের পরিচর্যা ব্যতিত সার্থক হতে পারে না এবং সৃষ্টির আনন্দ ব্যতীত প্রেমের শক্তি ও সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভব নয়– এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন লক্ষ করি সৈয়দ আলী আহসানের রচনায়। এমনকি হৃদয়ের সজীবতাও সৃষ্টির আনন্দ ব্যতীত সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সকল সৃষ্টির মধ্যে কবিতার সান্নিধ্যেই তিনি সবচেয়ে সচল-উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত। তাই তিনি বলেন, 'কবিতা তো আমার খেলা নয়, আমার অবসরের আনন্দ নয়– কবিতা আমার বেদনা এবং উপলব্ধির তারা।' এই বেদনা ও উপলব্ধির তারকারাজির মধ্যেই আহসানের শিল্পভাবনা ও জীবনদৃষ্টির ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ব্যাকরণটি চিহ্নিত হয়ে যায়।

সৈয়দ আলী আহসানের গদ্যে এবং কবিতায় যেমন তাঁর কবিস্বভাব ও শিল্পচৈতন্যের মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের শিল্পসমালোচকবৃন্দও আহসানের কবিপ্রতিভার প্রকৃতি ও প্রবণতা চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতাকে তিনি কীভাবে নির্মাণ করেন, কবিতার কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী এবং কবিতার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কসূত্র রচনার মাধ্যমে আহসান কীভাবে নিজের অন্তর্গত শিল্পসত্তার স্বরূপ উন্মোচন করেন, সে-বিষয়ে প্রতিভাবান কবি এবং সমালোচকবৃন্দের বিবেচনাও আহসানকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমরা মনে করি। তাই সৈয়দ আলী আহসানের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকজন শিল্পসমালোচকের মন্তব্য উপস্থাপন করা হল :

ক. অভিজাত মানস বিদগ্ধ মনের প্রায় সমার্থক। এই মনে রসসৃজনের একমাত্র প্রেরণাই হল শিল্পশুদ্ধতা। সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষত্ব এই যে, শিল্পবোধের সঙ্গে জীবনশীলতার সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন।...বস্তুত একপক্ষে সমাজ ও সময় এবং অন্যপক্ষে চিরন্তনতা ও শব্দরূপময়তা এবং পাদপীঠে সমন্বিত করার প্রয়াস সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনেরই একটি হৃতপ্রাপ্ত ফল। সৈয়দ আলী আহসান এই সাম্প্রতিক পুনরাবৃত্ত ফলশ্রুতিরই রূপকার। (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৪ : ৪৮৬)

খ. আলী আহসান নির্লিপ্ততার কবি, নিগগ্নতার কবি, ধ্যানের কবি, প্রশান্তির কবি, সৌন্দর্য-সুরাগের কবি।...আনন্দই তাঁর লক্ষ্য, অবিমিশ্র আনন্দ। আমাদের এই সর্বগ্রাসী নিরানন্দের জগতে আমরা এই আনন্দের কবিকে সম্বর্ধনা জানাই। দেহাশ্রয়ী তাঁর এই আনন্দ, উপলব্ধির বিশুদ্ধতায় পেগ্যান গ্রীকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই আনন্দবাদী পেগ্যানিজেম তাঁকে ব্যতিক্রমী কণ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর দেহবন্দনায় রিরংসার আমেজ নেই, সদয়-সচকিত আনন্দের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১৯৮৫ : ২০২)

গ. তিনি মনে করেন, কোনো কবি যখন তার রচনা তৈরি করেন তখন তার কাছে কবিতার প্রতিটি লাইনই হৃদয় মথিত করে নির্দিষ্ট একটি অর্থেই রচনাকারীর তুষ্টি বিধান করতে থাকে। পাঠককেও কবির উদ্দিষ্ট অর্থই গ্রহণ করতে হবে। তার আদেশে চালিত হতে হবে। উপমা ও প্রতিতুলনা ভাগ করে নিতে হবে কবির সাথে। এ কাজ এককভাবে শুধু কবিতার দ্বারা সম্ভব না হলে পাঠককে শরণ নিতে হবে কবির ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার। যা করতে গিয়ে কবি অভিনব ও অনুকরণযোগ্য একটি পদ্ধতির চিন্তা করেছেন। (আল মাহমুদ ২০১২ : ৩২)

ঘ. তিনি মননজীবী বটে; কিন্তু তাঁর কবিতা যুক্তিগ্রথিত নয়, বরং আবেগের পারম্পর্যে রচিত। বুদ্ধি লুকিয়ে আছে জ্যামিতির মতো আড়ালে, এবং অনুভূতি প্রধান হ'য়ে উঠেছে, অনুভূতি অবলম্বন করেছে স্বভাবতই নিসর্গকে। বঙ্গভূমির এই ছড়ানো নিসর্গ :–আকাশ, বৃষ্টি, গাছ, নদী ঘাস :–এই সমস্ত থেকে তাঁর কবিতা উৎসারিত।...তিনি সবকিছুই দর্শন নিরীক্ষণ ও অবলোকন করেছেন হৃদয় দিয়ে। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৪ : ২৬৪)

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *কাব্য-সমগ্রে*র ভূমিকায় বলেছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি এ সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বিশেষ বিশেষ অনুভূতির উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে সত্য ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে।' (১৯৭৪ : ২০)। একজন শিল্পস্রষ্টার স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতাই তাঁর ব্যক্তিত্বখচিত শিল্পের দর্পণে স্ফটিকসংহতি লাভ করে এবং সেই দর্পণে দৃষ্টি দিয়ে একজন সৃজনশীল পাঠক নিজেকেই দেখে নিতে চান। সেই দেখার দৃষ্টির বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্রষ্টার আন্তরিক অভিব্যক্তির দীপ্তিতে সৃষ্টির অন্তর্গত সত্য অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। সৈয়দ আলী আহসান কবিতার জন্য অনেক পথ হেঁটেছেন এবং সঙ্গত কারণেই তাঁর সেই 'পথে পথে পাথর ছড়ানো'। কবিতার পাঠক হিসেবে তাঁর হাত ধরে সেই পথে হারিয়ে যেতে যেতে আমাদের চেতনার চত্বরে হয়তো ছড়িয়ে পড়বে ঝর্নার গান। 'আত্মার উপলব্ধির কথা অনেকে উচ্চারণ করেন এবং প্রয়োজনবোধে গিরিগুহায় অবস্থানের কথা বলেন কিন্তু জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে অন্ধকারে কি আত্মাকে পাওয়া যাবে?' কিংবা 'যারা শিল্পকে গুরুতর মূল্য দিয়েছে কিন্তু জীবনকে দেয়নি, তাদের পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না।'– এই বিশ্বাসে অবিচল সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় শিল্পের দর্পণে জীবনকে দেখার প্রয়াস হয়তো ব্যর্থ হবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়-বৈচিত্র্য

কবিতার বিষয়ান্বেষণে পাঠকের বাস্তববুদ্ধির প্রকাশ স্পষ্ট হলেও, বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনার সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায়ই সৃষ্টি হয় কবিতা, এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়-গৌরবে কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে না। 'কবিতা বিষয়বস্তুতে বাস করে না, করে প্রতিভাবানের চিত্তে; তাই একমাত্র কবি-প্রতিভাবানই শুধু বস্তুবিষয়ভাবনাকে পরিণত করতে পারেন কবিতায়।' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯২ : ১০৯)। কোন মহিমান্বিত অনুষঙ্গ যদি স্রষ্টার কবিত্ব কিংবা কৃতিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলে সেই অনুষঙ্গ কবিতার জন্য যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি কবির জন্যও তা কোন সম্মানজনক সাহিত্যিক প্রতিশ্রুতি রচনা করে না। তবুও কবিতা নিরবলম্ব শৈল্পিক উদ্ভাসন নয়। 'আজকের দিনের এই মানসিক অপব্যয়িতার বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে জীবনে আনন্দের স্পর্শ আনতে মানুষকে বৈচিত্র্যের সন্ধান করতে হয়, –জীবনকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে দেখার অভিলাষী হয় সে। সাহিত্যই সে-দায়িত্ব পালন করে। আর সে সাহিত্য জীবনের বস্তুমূল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।' (আজহার ইসলাম ১৯৮৯ : ১৯৩)। সাহিত্য জীবনের অনুকৃতি না হলেও জীবনকে অন্যরকম করে দেখার অভিপ্রায় থেকেই একজন শিল্পস্রষ্টার অকৃত্রিম আত্মনিবেদন। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য যে কোন সৃষ্টিই মূলত শিল্পসাহিত্যের পরিধিবহির্ভূত। তাই জীবনের সকল অনুষঙ্গেই তাঁর আত্মখচিত অভিজ্ঞান শৈল্পিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করতে চায়। এই সক্রিয়তা থেকেই প্রস্তুত ও পরিস্ফুট হয় একজন শিল্পীর বৈষয়িক পরিমণ্ডল ।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় সংহত হয়েছে জীবন ও জগতের নানা অনুষঙ্গ। কবিতায় তিনি ইন্দ্রিয়ের কর্মপরিধিকে প্রসারিত করার বিচিত্র আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। আবার ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব কিংবা উপলব্ধিকেও স্বাগত জানিয়েছেন কবি। আহসান নিজেকে ইন্দ্রিয়সচেতন কবি হিসেবেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। মনন এবং স্বপ্নকেও সঙ্গী করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে কবির স্বীকারোক্তি :

> আমি আমার স্পর্শের অনুভূতি, দৃষ্টির অনুভূতি, স্বাদ ও শ্রবণের অনুভূতিকে শব্দে বহমান করবার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি যাতে আমি যা চোখে দেখেছি, কানে যা শুনেছি এবং আমার বুদ্ধি, আবেগ ও অধীত বুদ্ধি যেন আমার শব্দে একটি

> সংরাগে উচ্চকিত হয়। শব্দ যখন নির্বাচন করেছি, বক্তব্যের প্রতিভাষ হিসাবে যথাযথ বাণী যখন আবিষ্কার করেছি তখন আমার বুদ্ধি শুধু সক্রিয় থাকেনি, নিশ্চয়ই আমার দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং স্বপ্ন একই সঙ্গে জাগ্রত ছিল। (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭৪ : ১৮)

যে জীবন তিনি যাপন করেছেন সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পে তিনি তারই প্রতিভাস নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাই জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্রেই নানা বিষয়কে তিনি শব্দবন্দি করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, 'দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং সকল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে চিত্তের মনন-কৃত্য সম্মিলিত হয়ে যে উপলব্ধিকে জাগ্রত করে তাই হল একজন কবির সফলকাম অবলোকন।' (১৯৭৪ : ২০০)। জীবনকে উদ্‌যাপনের প্রয়োজনে যে সকল অনুষঙ্গে তাঁর সংলেপ সাধিত হয়েছে, তার সঙ্গে 'চিত্তের মনন-কৃত্য সম্মিলিত হয়ে' কবি সৈয়দ আলী আহসানকে উপলব্ধির কোন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে, এই পর্যায়ে আমরা তারই অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হব।

প্রেম

প্রেম জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ বলেই কবিতার রাজ্যে প্রেমের দখলনামা সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত। প্রেমকে আনন্দ নামে অভিহিত করেন কেউ কেউ, কখনো আবার ভালোবেসে এরই নাম দেওয়া হয় বেদনা। শিল্পসাহিত্যে জীবনকেও আনন্দ-বেদনার দোলাচল হিসেবে দেখানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেই অর্থে প্রেমকে জীবনেরই সমার্থক অভিধা হিসেবে দেখা যেতে পারে। অন্তত জীবননিষ্ঠ কবি এবং কবিতার পাঠকের কাছে প্রেম ও জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। জীবনের যাবতীয় আনন্দ-বেদনা যখন ধীরে ধীরে মুদ্রারাক্ষসদের দখলে চলে যাচ্ছে, তখনও প্রেমহীন পৃথিবী কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। মানুষের জীবনে প্রেম আসে, কখনো নীরবে, কখনো পুরো পৃথিবীকে জানান দিয়ে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে প্রেম যেভাবেই আসুক না কেন, প্রেমের অনুভবকে তিনি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে স্বস্তি পান। এই ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে জীবনের সজীবতাও সুপ্রকাশিত। সৈয়দ আলী আহসানও যেহেতু কবিতায় জীবনেরই গান গেয়েছেন, তাই তাঁর সৃষ্টিকর্মেও প্রেম বিচিত্র অবয়বে উপস্থিত এবং এর আস্বাদন কিংবা উদ্‌যাপনেও আন্তরিক ছিলেন তিনি। কবি যখন বলেন, 'যেদিন আমার জন্য প্রেম থাকবে না, যেদিন চিত্ত পুরোনো স্মৃতিকে নিয়েই শুধু অসচল জলাশয় হবে, সেদিনই আমার অস্তিত্বের শেষ। সেদিনের সর্বনাশকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই না। আজ আমি তাপহীন শীতল অন্ধকারকে কাম্য ভাববো না, আজ মধুর উষ্ণতায় অনুভব করবো যে এখনও আমার অনেক কথা বলবার আছে, এখনও ভালোবাসার একটি বিনয়াবর্তে দু'টি বাহুকে ব্যবহার করতে পারি।' (১৯৭৪ : ২২৭)– তখন প্রেম ও জীবন একই সমতলে এসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *উচ্চারণ* কাব্য সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "কাব্য হিসেবে 'উচ্চারণ' ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি।" (২০০৩খ : ১০৯)। *উচ্চারণ* পাঠকের হাতে না-পৌঁছানোকে তিনি ব্যবসায়িক অসাফল্য হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু আলী আহসানের কবিতার স্পন্দন অনুধাবনের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই পরীক্ষামূলক কাব্য প্রক্রিয়ায় আহসান নিজেকেই উপলব্ধি এবং উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাই আহসানের কবিতার বিষয় ও শিল্পপ্রসঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তির ধরন অনুধাবনের জন্য আমাদের বারবার এই কাব্যের শরণ নিতে হবে। এমনকি তাঁর জীবনবোধের ব্যাকরণটি বোঝার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের কাছে ফিরতে হবে বারবার। আহসানের ভাষায়, "আমি 'উচ্চারণ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আমার একান্ত অনুভূতিগুলোকে বাঙলায় করতে চেয়েছি।" এই গ্রন্থে প্রেম সম্পর্কেও তাঁর ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করি। আহসানের সমগ্র কাব্য-পরিচর্যায় প্রেমের স্বরূপ-স্বভাব কীভাবে চিহ্নিত হয়েছে, এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিতায় প্রবেশের আগে আমরা *উচ্চারণে* মুদ্রিত প্রেমিক আলী আহসানকে এক ঝলক দেখে নিতে চাই :

> ক. আমি যাকে চাই তাকে পরিপূর্ণরূপে চাই– কল্পনার বিস্তারের মধ্যে চাই, স্বপ্নের অনির্ণেয়তার মধ্যে চাই এবং স্পর্শের উষ্ণতার সমৃদ্ধির মধ্যে চাই। ঘাসের পাতায় শিশিরের মতো অথবা সন্ধ্যার আকাশে লালমেঘের মতো সে যেন একান্তভাবে আমার এমন ইচ্ছায় আমার সকল জাগরণ আজ কম্পিত। তাকে তমালের অন্ধকার বলে ভাবতে চাই, পাখির আশ্রয়ের নিভৃত শান্তি বলে ভাবতে চাই, নিস্তরঙ্গ সলিলে অবগাহনের শীতল বিশ্রামের পরিচর্যা বলে

ভাবতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মতো অনাবৃত শরীরের আনন্দিত উপভোগ বলে ভাবতে চাই। আমার আকাঙ্ক্ষায় তার শরীরের রেখায় হৃদয়ের নিবেদন পুষ্পিত হয়ে উঠুক। (১২-সংখ্যক কবিতা)

খ. প্রিয়তমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে একজন পুরুষ সমগ্র বিশ্বকে ভুলে যায়, সে তখন তার নিভৃতের এবং বাইরের সব কিছুকেই একাকার করে ভুলে যায়। এ-ভাবেই চরম অন্তরঙ্গতায় আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ময়ে আমরা কখনও কখনও জেগে উঠি। আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব হচ্ছে আনন্দের অভাবের, যন্ত্রণার, অপকৌশলের, স্বার্থপরতার। এর মধ্যে প্রেমের দীপমালা জ্বালিয়ে পুরুষ এবং রমণী যুগ যুগ ধরে মুক্তির সন্ধান করেছে এবং মিথুনের সম্মোহনে দ্বৈতবোধের অপসারণ ঘটিয়ে অন্তহীন আনন্দের উপঢৌকন এনেছে। এ-ভাবেই অনবরত নতুন নতুন জন্মের উৎসব; এ-ভাবেই জীবনের উত্তাপ জাগে আমাদের শরীরে, প্রকৃতিতে এবং সর্বত্র; এ-ভাবেই ছায়াকে অতিক্রম করে, স্বপ্নকে অতিক্রম করে বিপুল ধ্যানের পুলকের মধ্যে আমাদের চমৎকৃত জাগরণ। (১৫-সংখ্যক কবিতা)

গ. কাউকে আমার যদি ভালো লাগে এবং সে ভালোলাগাটুকুকেই সে যদি সম্মান দেয়, কিন্তু সেখানে নিজের ভালোলাগাকে যুক্ত না করে, তা হলে আমার গৌরব কোথায়? যদি অনবরত এ-সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে আমার ইচ্ছার কারণে তার সম্মতি, আমার আনন্দের জন্য তার উপাদানসংগ্রহ এবং প্রার্থিত এবং আমন্ত্রিত বলেই তার আগমন, তা হলে কি আমি প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সফলকাম? উভয়ের সম্মিলিত ব্যঞ্জনায় যেখানে নিবেদন পরিচ্ছন্ন, পরিপূরক আকাঙ্ক্ষায় যেখানে প্রেমের সার্থকতা, তাকে আনন্দিত করবো এবং আমাকে সে সমৃদ্ধ করবে, এ-সহযোগিতার সম্ভাবনায় যেখানে আকর্ষণের যথাযথ তাৎপর্য সেখানে একটি মাত্র পক্ষ থেকে চিরদিন প্রেমের শব্দ উচ্চারিত হবে, তা কি কখনও হয়? (১৭-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. অনেক রমণী আমি দেখেছি যারা অনবরত পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন, বিপরীত সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায়-হাসিতে-বিলাসে প্রতিদিন সময় হারান। এদের পক্ষে কারো প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর নয়, কেননা একনিষ্ঠ হলে অনেক সহচরের সঙ্গ-কামনার মোহ হারাতে হয়, অথচ প্রকাশ্যে হয়তো একজনের একাগ্র নিবেদনকেও উপভোগ করেন। এ-উপভোগকে সত্যিকার স্বীকৃতি ভেবে কত পুরুষ যে দিশাহারা হয় তার হিসেব নেই। আর রমণী তখন নানা বর্ণের পুষ্প চয়ন করেন, অনেক পাখির কাকলি শোনেন এবং রাজহংসীর মতো এক তরঙ্গ থেকে অন্য তরঙ্গে যাত্রা করেন। (৩৮-সংখ্যক কবিতা)

সৈয়দ আলী আহসান ফরাসি কবিদের রচিত বিশেষ এক ধরনের কাব্য-প্রক্রিয়া– যেখানে 'জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র অনুভূতি কবিরা স্বাক্ষরিত করেন অনেকটা গদ্যের আদলে', তারই অনুসরণে– *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলি রচনা করেছেন। প্রেম ও প্রেমাস্পদ বিষয়ে তাঁর ভাবনা এই কাব্যের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ধরা পড়েছে। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ নিবেদনের পক্ষপাতী। তাঁর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যে-কোন ধরনের ব্যবধানই তাঁর কাছে অসহনীয়। এবং প্রাপ্তির আনন্দকে তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা আবিষ্কার করেন। এভাবে বিচিত্র অনুষঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রেমের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের উন্মোচন ঘটে এবং এই-প্রক্রিয়ায় প্রেমিকার বিস্তীর্ণ হৃদয়পটকে অধিকার করে পুষ্পিত হতে চান কবি। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রিয়তমার সান্নিধ্যে মানুষের বদলে যাওয়ার ব্যাকরণটি মুদ্রিত হয়েছে। আহসান প্রেমকে কেবল উপভোগ কিংবা উদ্‌যাপনের ব্যাপার হিসেবে দেখতে চান নি, বরং উপলব্ধির অনুঘটক হিসেবে কল্পনা করেছেন। প্রেমের উপস্থিতিতে মানুষ নিজেকে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ পায়। কবি মনে করেন, প্রেমের মাধ্যমেই পৃথিবীর জন্মমৃত্যুর ধারা অব্যাহত থাকে। প্রেম মানুষকে ছায়ার আড়াল ভেঙে কায়ার নিকটবর্তী করে তোলে, স্বপ্ন থেকে মানুষকে নিয়ে যায় ধ্যানের দেশে। এই ধ্যান তাকে পৌঁছে দেয় উপলব্ধির নতুন প্রদেশে, যেখানে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ প্রয়োগ সাধিত হতে পারে, যেখানে প্রেম জীবনেরই নতুন নাম হিসেবে নন্দিত হয়। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি প্রেমকে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। 'যদি আর-কারে ভালোবাসো ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,/তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।'– রবীন্দ্রনাথের (১৯৭০ : ৩২৬) এই শর্তহীন সমর্পণে আহসানের স্বস্তি নেই। তিনি প্রিয় মানুষটির কাছে তাঁর অনাবিল অভিপ্রায়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রত্যাশা করেন। এক পক্ষের জলাঞ্জলি থেকে উৎসারিত যে প্রেম, তা থেকে মানবিক 'আকর্ষণের যথাযথ তাৎপর্য' অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়

বলে মনে করেন আহসান। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আলী আহসান ভালোবাসায় একনিষ্ঠ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, একনিষ্ঠতার অন্যতম অন্তরায় মোহ। মোহমুক্তির জন্য কবি প্রেমকেও একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলায় সংস্থাপনের পক্ষপাতী। দুজনের পরিচয়ের অন্তর্নিহিত অভিঘাতকেও তিনি বিচার-বিবেচনার নিরীখে দেখতে চেয়েছেন। প্রেমিক পুরুষ হিসেবে কবি নারীর বহুমুখিনতাকে চিহ্নিত করেছেন এবং এর ফলে পুরুষের জীবনে নেমে আসা বিপর্যয়েরও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। স্বার্থমগ্ন নারীর প্রজাপতির মতো বিচিত্র বর্ণের পুরুষ ফুলের বুকে শিহরন ছড়িয়ে দেওয়ার নাম প্রেম নয়– এই কথাটিকেই কবি নানা উপমা-রূপকের আশ্রয়ে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, প্রেমহীন জীবন মানেই অসহায়ত্বকে আলিঙ্গন করা। তাই অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, 'মানুষের চরম অসহায়তা তখনই হয় যখন সে অনুভব করে যে কেউ তাকে ভালোবাসছে না। যে নিঃশ্বাসে আমাদের জীবন সচেতন তা প্রেমের নিঃশ্বাস, যে অন্ন গ্রহণ করছি তাও প্রেমে অভিষিক্ত। সর্বমুহূর্তের জন্য এ প্রেমকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তখন শূন্যতায় ভীত না হয়ে মমতাবোধে অবসরকে সম্পূর্ণ করব।' (৪৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)। সর্বাবস্থায় প্রেমকে গ্রহণ করার এই আহ্বান দুঃখ-সুখের দোলায় প্রবাহিত ও প্রসারিত এই জীবনকে উদ্‌যাপনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সৈয়দ আলী আহসানের অনেক কবিতায়ই নারী ছলনাময়ী হিসেবে চিহ্নিত ও চিত্রিত হয়েছে। পুরুষের চোখে নারীর চিরন্তন সৌন্দর্যের অনুধাবন কিংবা সঙ্গ-সুখ আস্বাদনে তিনি যেমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি নারীর ছলনার জালে জড়িয়ে নাজেহাল প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসও তাঁর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় আমরা যে প্রেমিক-পুরষদের দেখি, তারা দুঃখের গভীর থেকে সুখ সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। এই দুঃখের অন্যতম কারণ নারীকে চিনতে না-পারা, কিংবা চিনেও রমণীয় ছলনার সঙ্গীতে আন্দোলিত হওয়ার প্রলোভনকে পরিহার করতে না পারার ব্যর্থতা। *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা লক্ষ করা যাক :

যদি ব্যর্থকাম কোনও রমণী
তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়,
ভুল কথায়,
সত্যের অপলাপে,
শুধু স্নায়ুর চরিতার্থতায়,
এবং অতি সাধারণ হয়ে
তুমি যদি শঙ্কিত হও–
তা হলে সার্থকতা হারিয়ে,
ঝিনুকের আবরণে,
অন্ধকার মুক্তার মতো,
তুমি চিরকাল চিহ্ন-সুপ্ত,
একাকী ॥ (২২-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

সৈয়দ আলী আহসানের *অনেক আকাশ* কাব্যগ্রন্থের কতিপয় কবিতায় প্রেমের প্রতিভাস নির্মিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রেমের কবিতার নায়িকারা রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের মতোই অধরা আবহ রচনা করে। স্পর্শের অভাবেই যেন তাঁর উচ্চারণ অনেক বেশি আবেগঘন ও আন্তরিক। দৃশ্যমান নানা অনুষঙ্গে সমীকৃত করে কবি প্রেমের প্রগাঢ়তার পরিস্ফুটন ঘটান। 'তোমাকে ধরা যায় না' কবিতায় অধরা অনুভবকে 'কিশলয়গুচ্ছে প্রবহমাণ স্রোতোধারা'র সঙ্গে তুলনা করেন কবি। তবু তারই দেহে তাঁর দেহভার অবনমিত হয় এবং এই অবনমনের শিহরন ছড়িয়ে পড়ে প্রেয়সীর 'চক্ষু এবং একান্তভাবে মুখমণ্ডলে'। কবি কল্পনা করেন, প্রেয়সীর মৃত্যুকালেও তিনি তার কণ্ঠের গান হয়ে বেজে উঠবেন। এই গান মৃত্যুহীন প্রেমের রূপকল্প হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়। পলাতকার প্রেমের শেষ দৃশ্য কবি চিত্রিত করেছেন এইভাবে :

তবুও তুমি পলায়নপরা
তোমাকে ধরা যায় না

যেমন ধরা যায় না স্রোতেধারাকে,
মৎস্যশিশুকে, চড়ুই পাখিকে। ('তোমাকে ধরা যায় না'/*অনেক আকাশ*)

'তোমার মৃত্যুর শেষে' কবিতায় হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার প্রতি কবির ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদিত। প্রেমহীন জীবনের অন্ধকারে কবির দীর্ঘশ্বাস মুদ্রিত হয়েছে কবিতাটিতে। অবশ্য এই অন্ধকারকেও কবি উপভোগ্য করে তুলেছেন। কবির বিবেচনায় 'দীপ্তিময় সেই অন্ধকার– যে দীপ্তি/নিশীথে জাগে/তন্দ্রাহত বিহ্বল নয়নে।' শয্যাশায়ী প্রেমিকার ওষ্ঠের স্পন্দন কবির মনে শিহরন তোলে। কারণ 'চুম্বন-পিপাসু/ওষ্ঠ/স্বাদ পায় সহস্র রাত্রির'। কবি যে প্রেমিকার কথা বলেন, সেই নায়িকা অতীত দিনের, অর্থাৎ মৃত। সেই মৃত প্রেমিকার 'নয়ন ছিলো নীলিমায় মেঘের মতন'। সেই নয়নের ভাষায় কবি ভালোবাসার ছবি দেখেছিলেন। 'নায়িকা' শিরোনামে তিনটি কবিতা লিখেছেন কবি। এই কবিতাত্রয়ে কবি তাঁর নায়িকাকে দেশকালের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। বলা যায়, কবির স্বদেশও এখানে প্রেমিকার রূপে কবির কাছে ধরা দিয়েছে। আবার নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবেও এর একটি গ্রহণযোগ্য পাঠ নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

সৈয়দ আলী আহসান 'তোমার দেহের তীরে' শীর্ষক কবিতায় নায়িকার দৈহিক লাবণ্যের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছেন। কবিতার শুরুতেই আমরা এমন এক রাতের ছবি মূর্ত হতে দেখি যে রাতে দুজনের প্রাণের স্বপ্ন দেহের বন্দরে এসে সমর্পিত হয়েছিল। কবি যখন বলেন, 'আশ্লেষ নিঃশ্বাস ঘন উরু আর বক্ষ উপাধান/শ্বাপদ-সঙ্কুল হ্রদে মৃত্যুই প্রধান'– তখন শারীরিক উদ্ভাসনই প্রধান হয়ে ওঠে। আবার কবি যখন নায়িকার নৈকট্যকে অস্বীকার করেন, তখনও তার নিবিড় সান্নিধ্য লাভের প্রবল অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়। সারাক্ষণ অতল কুয়াশায় মজ্জমান প্রেমিক বেঁচে থাকার স্বদেশ হিসেবে নায়িকতার দেহের তীরেই নোঙর করার বাসনা ব্যক্ত করেন। টোকিওর আসাকুসায় ঘটে যাওয়া কোন মধুময় স্মৃতিকেই কবি এই কবিতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

দেহের বিপনী যদি কামনায় মূর্ছিত মলিন
দীপ্তি শেষে ক্লান্তি জাগে মৃত্যুর মতন
নির্জীব রক্তের স্রোতে মনে হয় স্বপ্ন মরে গেছে
তাইতো তোমাকে চাই পূর্ণপ্রাণ সূর্যের মতন

এখানে মলিন মৃত্যু উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের শেষ
তোমার দেহের প্রান্তে একমাত্র বাঁচবার দেশ। ('তোমার দেহের তীরে'/*অনেক আকাশ*)

'তোমাকে' শীর্ষক তিনটি কবিতায় প্রেম ও প্রেমিকা বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের বিবেচনা শব্দবন্দি হয়েছে। প্রেয়সীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, সময়ের বিচিত্র আঘাত-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তিনি প্রেম ও প্রেয়সীর স্বপ্নকল্পনায় মগ্ন হন। কখনো আবার প্রেয়সীর দেহের বর্ণনায় তিনি তাকে একটি বিচিত্র ও সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে দেখেন যেখানে ফসলের সম্ভাবে তিনি পুলকিত হন। এই দেশে সাগরের তরঙ্গ ধ্বনিত হয় এবং এই ধ্বনির সঙ্গে কবির আলাপের অভিব্যক্তির সংলেপ সাধিত হয়। 'যুগল কুম্ভ বক্ষসায়রে বিমূর্ছিত' কবির দেহভাবনার প্রকাশও এতে লক্ষ করা যায়। আবার প্রেয়সীর সান্নিধ্য থেকেই কবি লাভ করেন শব্দ-সহযোগে তাঁর অন্তর্গত উচ্চারণকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার অনুপ্রেরণা। এই কবিতাত্রয়ে প্রেমিকা যেন কবির শিল্পসঙ্গী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কিংবা বলা যায়, কবিতা ও প্রেমিকার যুগল মূর্তিই যেন নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তিনটি কবিতা থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. হৃদয় ছুঁয়েই তখন জীবন চিরন্তন
হঠাৎ জেগেই দেখি জীবনের মধ্যযাম,
ওষ্ঠে তখন চুম্বন-মায়া আকিঞ্চন,
আমার জীবনে চির-স্বাক্ষর তোমার নাম ॥ ('তোমাকে : এক'/*অনেক আকাশ*)

খ. তোমাকে পাবার ইচ্ছা আমার অসহনীয়,
নয়নে তোমার চিহ্নিত রাখি দিবস-যামি,
তোমার দৃষ্টি তারার রাজ্যে অতুলনীয়,

Dhaka University Institutional Repository

আমার কাম্যে তুমি প্রিয়তমা আমার আমি ॥ (‘তোমাকে : দুই’/*অনেক আকাশ*)

গ. সুকৌশলে যুগ্মদেহে অনিবার্য তাৎপর্য জেগেছে,
সমুদ্রের পর্বতের প্রান্তরের সব সমারোহ,
বিকশিত পুষ্পতনু বিচলিত আনন্দ চেয়েছে–
মিলন-দ্বন্দ্বের রাত্রে কি আশ্চর্য প্রাণের সম্মোহ ॥ (‘তোমাকে : তিন’/*অনেক আকাশ*)

‘নূতন স্বাদ’ শীর্ষক কবিতায় কবি যে জীবনের সন্ধান পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে যৌবনের দাবানল। বৃদ্ধের আকাশে কীভাবে ‘উরু-পুষ্ট লাঞ্ছনা’ ডানা মেলে, তারই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে। সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল কবি ‘পরিচিত নীবি উন্মোচন’ কিংবা ‘অনাস্বাদ জড়িত’ নতুন নারীর প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি চান তাঁর প্রিয়তমা অসঙ্কোচে নিজেকে উন্মোচন করবে, কারণ তিনি সাগর-মন্থনে দেব-দানবের মিলন প্রত্যাশা করেন। শরীরের অনাবিল আদান-প্রদানেই প্রেমের প্রকৃত প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন কবি। প্রেমের স্বর্গীয় অনুভব সঞ্চারের নামে শরীরের দাবি-দাওয়া উপেক্ষা করার মাধ্যমে বাস্তব পৃথিবীর প্রেমের অসম্মান এখানে অপ্রতাশিত। তাই কবির আশ্রয় শয্যায় তিনি কামনা করেন প্রেয়সীর ‘কম্পমান বক্ষ-উপাধান’। তিনি জানেন, আকাঙ্ক্ষার যে দাহে দগ্ধ হচ্ছেন কবি, তা তাঁর একার নয়। তাই পৃথিবীর সকল যুবার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নিজের বুক প্রেয়সীর শর-নিক্ষেপণে রক্তাক্ত করেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

পরিচিত গৃহলক্ষ্মী সঞ্জীবিত তোমার ছায়ায়
চুম্বন-প্রয়াস মধ্যে কম্পমান তোমার আশ্লেষ,–
হঠাৎ রাত্রির তীরে সাড়া জাগে শিরায় শিরায়
আমার নিজের মত দেহ-স্বাদে তোমাকে নিলাম!

অন্ধকারে যুবা আমি– কম্পমান শিখা কামনার,
মার্জার-নয়ন যেন– তীক্ষ্ণরেখ উদ্যত সজীব;
দিবাভাগে আচ্ছাদন মূহ্যমান কত সভ্যতার–
হৃদয়-তরঙ্গগুলি রাত্রিযোগে তোমাকে দিলাম! (‘নূতন স্বাদ’/*অনেক আকাশ*)

জাপানোর প্রাচীন ‘নোহ’ নাট্য-পদ্ধতিতে রচিত ‘জুলায়খা’ শীর্ষক কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান ইউসুফ-জুলেখার সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রেমের অতৃপ্তিতে জুলেখার আত্মা কীভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, এই কবিতায় সেই ছবি ফুটে উঠেছে। পুরোহিত যখন পরম প্রভুর কাছে শান্তির জন্য আরাধনায় মগ্ন, তখনই ছায়ামূর্তি ধারণ করে জুলেখার আত্মা এসে উপস্থিত হয়, যে আত্মা ‘অতৃপ্তিতে লাঞ্ছিত পীড়িত’। কবি কোরাসের কণ্ঠে জানিয়েছেন : ‘জুলেখা বিচিত্র-রূপা-সর্বক্ষেত্রে অস্থির চঞ্চল,/য়ুসুফে কামনা করি দৃষ্টি তার হয়েছে সজল।’ স্বপ্নে দেখা ইউসুফকে জুলেখা তাঁর আপন ইচ্ছের রঙে রাঙাতে পারেন নি। তাই তাঁকে এখনো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে হয় : ‘বেদনায় মূহ্যমান নারী-চিত্ত এখনো কাতর।’ এই জুলেখাই আবার ফিরে এসেছে ‘সঙ্কেত’ শীর্ষক কবিতায়। এখানে আমরা যে জুলেখার দেখা পাই, তিনি যৌবন হারিয়ে বিপন্ন, বিধ্বস্ত। এই কবিতায় ‘নীল ঝরোকার পাশে রাত্রি কাটে বৃদ্ধা জুলেখার’।

‘প্যারিসের চিঠি’ কবিতায়ও আলী আহসানের নারী ও প্রেমভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই কবিতায়ও আমরা দেখতে পাই ‘আনন্দিত মর্মরের রমণীরা আবেশে নিশ্চল’। এই কবিতায় প্যারিসকেই কবি নারীর অবয়বে কল্পনা করেছেন। নারীকে দেখার যে দৃষ্টি তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অর্জন করেছেন, তার প্রকাশ লক্ষ করি কবিতাটিতে :

তোমার ওষ্ঠের কাছে
        কবে ওষ্ঠ নেমেছিলো
        শীর্ণ পথ অন্ধকার ঘরে?
অথবা বৃষ্টির দিনে কান পেতে

শুনেছি তোমায়?
অথবা সমুদ্র যেন উপাধান
তোমার বুকের,
অথবা সর্বস্ব দিয়ে সর্বকাল
তোমারেই পাওয়া– (প্যারিসের চিঠি'/*অনেক আকাশ*)

এই কবিতাটিতে কবির মন স্বদেশে ও বিদেশে পরিভ্রমণ করলেও এই দুই অবস্থানের মেলবন্ধন করতে গিয়ে কবি নারী-পুরুষের সম্পর্কের আদলকেই আদর্শ হিসেবে ভেবেছেন। তাই তিনি বলেছেন, 'ধ্রুবের একটি তারা আমাদের মিলিত শিখায়/একটি সমুদ্র স্রোতে দুই দেহ এক হ'য়ে যায়।' এই মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা যে দৈহিক অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ করি, তা তাঁর অন্যান্য প্রেমের কবিতার মতোই একটি মানবীর ছবি মনে করিয়ে দেয়। এই কাব্যের 'একাকী' শীর্ষক কবিতায় নিঃসঙ্গ নায়কের 'সব কিছু মুছে দিয়ে কামনারে নিশ্চিহ্ন করেছে' বলে কবি উল্লেখ করলেও তাঁর নায়ক অনুভব করে 'রেশমের মতো সেই মসৃণ দেহের তাপ'। আরো কয়েকটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি যেখানে সৈয়দ আলী আহসানে প্রেম বিচিত্র অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে :

ক. "কার সাড়া শুনি আজ? কে তুমি এখানে?"
"আত্মবিস্মৃতির পথে আমি আজ তুমি।"
যেহেতু তুমিই আমি, তাই আজ আমন্ত্রণ
বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রাত্রে গৃহ অভ্যন্তরে। ('সাড়া'/*অনেক আকাশ*)

খ. হঠাৎ অবাক হ'য়ে দেখি– হৃদয় সরিয়ে
আমরা দু'জন পাথরের প্রতিভাস মাত্র ॥ ('হৃদয় সরিয়ে'/*অনেক আকাশ*)

গ. আমার সামর্থে রাত্রে পুরুষের পূর্ণতায় নারী
পুষ্পপ্রাণা হ'ল। যৌবনা নেফেরতিতি রিরংসার
ক্ষুব্ধতায় সোনার পালঙ্ক থেকে নীচে নেমে এলো। ('কায়রো'/*অনেক আকাশ*)

সৈয়দ আলী আহসান *অনেক আকাশ*-এর বিভিন্ন কবিতায় নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বিবেচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রেম কেবল মানুষের মনকেই রাঙিয়ে তোলে না, তা মানুষের শরীরেও শিহরন ছড়িয়ে দেয়। এই শিহরনকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় বারবার দৈহিক সংশ্রবের প্রসঙ্গ আসে। এমনকি নারীদেহের স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়েও তাঁর উচ্চারণ সাবলীল। এই কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিসমূহ পাঠ করলে বোঝা যায়, দেহোত্তীর্ণ প্রেমের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নি কবি। প্রেয়সীর মনের সৌন্দর্য দৈহিক অবকাঠামোর মধ্যেই তিনি অন্বেষণ করেছেন। কবি তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবেসেছেন 'রক্তমাংশসহ'। তাই দৈহিক সংরাগ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ বিভিন্ন কবিতায় লক্ষ করা যায়।

একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান আপন-সত্তার সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত থেকেছেন। এই সংলিপ্তির মধ্যে প্রেম এসেছে, প্রকৃতি এসেছে, আবার জন্মভূমির সৌরভ ও সৌন্দর্য তাঁর চেতনায় আলোড়ন তুলেছে। প্রথম কবিতায়ই তিনি 'সমস্ত সুন্দরকেই দৃষ্টির তারায় পাব'– এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। 'আমি আনন্দের নীলে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম' বলে যে আনন্দলোকে পরিভ্রমণ করেছেন কবি, সেখানে প্রেম ও প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতি সঙ্গত কারণেই অসম্ভব। 'কৃষ্ণচূড়া : এক' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেছেন, 'আমার স্মৃতির ইতিহাস/যৌবনের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া।' এই যৌবনের দৃষ্টিতে দেখা কবির পৃথিবীতে প্রেয়সীর আনাগোনাও টের পাওয়া যায়। তবে *অনেক আকাশ* কাব্যের মতো এই গ্রন্থেও নায়িকার ছদ্মবেশে এসে কবির হাত ধরেছে কবিতা। 'হৃদয়–এক' কবিতায় যে 'তুমি'কে আমরা লক্ষ করি, সেই 'তুমি' তাঁর কবিতার মতোই সুন্দর। তাই না-লেখা কবিতার মতো তাঁর প্রেয়সীও কেবল স্মৃতির জানালায় এসে দাঁড়ায়। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

সেদিন নদীতে রূপায় ঝিল্‌মিল্
মাছের মতো আনন্দ

Dhaka University Institutional Repository

তোমার চোখ আমার চোখে
অনেক রাজধানীর পথ হেঁটে
নদীতে মেঘে গাছের পাতায়
পাখি আর ফুলে
তোমাকে পেয়েছিলাম। ('হৃদয়- এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

কবির এই 'তুমি' কখনো স্বদেশের মতো মহিমান্বিত, কখনো কবিতার মতো সুন্দর, আবার কখনো-বা প্রেয়সীর মতো প্রাণবন্ত। 'তুমি নেই আমি নেই– একটি সম্মিলিত/অতল নির্ভাবনা/হৃদয় দেহ হ'য়ে মাধুর্যে সূর্য আনলো' বলে কবি যে আক্ষেপ করেন কিংবা স্বস্তির সম্মোহন রচনা করেন, তা আমাদের মনে প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনা জাগায়। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!'– জীবনানন্দের (১৯৯৮ : ১৫৭) এই উচ্চারণে বিরহ-উদ্‌যাপনের যে আনন্দ আছে, আলী আহসান সেই মহিমান্বিত বেদনার দেশেই পাঠককে আমন্ত্রণ জানান। 'হৃদয়– দুই' শীর্ষক কবিতায় এই বেদনার প্রকাশ আরো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট : 'আমি শুধু নিমজ্জিত বেদনায়/আনন্দকে পেলাম।' 'হৃদয়– তিন' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন, আনন্দের যে আশ্চর্য সঞ্চারে কবি জীর্ণ ও বিচলিত, তা থেকে কিছুতেই তাঁর মুক্তি নেই। কবির এই আনন্দ যেন প্রেমের সমার্থক শব্দ হিসেবেই নন্দিত হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান হৃদয়কেও দৈহিক অবয়বে দেখতে চান। হৃদয়ের বিচিত্র কর্মকাণ্ড দৈহিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু দৈহিক সংশ্রবে মানুষের তৃষ্ণা মেটে না, বরং ক্রমাগত বেড়েই চলে। মানুষ তবুও জেনে শুনে প্রেমের বাঁশি কিংবা বিষের পাত্র হাতে তুলে নেয়। কবির ভাষায় :

তোমার হৃদয় ওষ্ঠের কাছে
চুম্বন হয়ে এলো
আমার হৃদয় তবু পিপাসায়
একাকার একাকার
একটি পাখির ছোঁয়া লেগে আজ
উতরোল উতরোল
হৃদয়-দেহের গান শেষ হল–
সংশয় সমাচার
আমার আবেগ অধীরতা-ভীরু
কোলাহল কলরোল
নিভৃতে ব্যাকুল তোমার হৃদয়
উন্মুখ হয়ে এলো। ('তোমার হৃদয় আমার হৃদয়'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

'তোমাকে দিলাম' শীর্ষক কবিতায় কবি যা-কিছু দিতে চান তার একটি দীর্ঘ তালিকা হাজির করেছেন। দেওয়ার যে ব্যথা কবির বুকের ভেতর বেজে চলেছে, নেওয়ার মানুষটি সেই অনুভবে সাড়া দিচ্ছে কি-না, তার কোন খবরই কবি আমাদের জানান নি। কবির এই 'তুমি' হয়তো কবি নিজেই, কিংবা তাঁর কবিতা। কিন্তু এই তুমির মধ্যে তাঁর মনের মানুষকে আবিষ্কার করাও অসম্ভব নয়। 'রাত্রির সমস্ত তারা', 'সমস্ত প্রাণ গান', 'অশেষ আকাশ', 'ত্রিভুবন সঞ্চয়', 'জীবনের স্বাদ', 'কামনার সংশয়'– এইসব দেওয়ার পর কবি উচ্চারণ করেন, 'তোমাকে দিলাম দুই দেহ মিলে/সমুদ্র কলগান।' এই 'দুই দেহ'-প্রসঙ্গে আমরা কবির সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমার মুখও দেখতে পাই। কবি যাকে জন্ম-মৃত্যুর অভিচারে আমন্ত্রণ জানান, যাকে অন্তরালের সমস্ত কথা খুলে বলতে চান, যার প্রজাপতি-দেহে কবি ছড়িয়ে দেন নির্মম অবসাদ এবং যাকে 'অতীত যুগের শঙ্কিত উপচারে' অভিসিক্ত করতে চান, তাঁর প্রতি কবির প্রেমের গভীরতাও অনুভব করা সম্ভব। 'এক মুঠো' কবিতায় আলী আহসান প্রেমের অন্য একটি দিক তুলে ধরেন, যেখানে প্রেম ও ঘৃণার যুগলছবি মুদ্রিত হতে দেখি। এই কবিতায় কবি পাথর হয়ে প্রেয়সীর হৃদয়ের জলে ঢেউ তুলতে চান। এই ঢেউ কেবল তো প্রেমের তীরেই ফিরে আসে না, কখনো কখনো তা ঘৃণার বন্দরেও নোঙর করে। তবুও কবির মন জুড়ে থাকে প্রেয়সীর

দেহের বৈভব। 'দেহেতে বিভব অনেক/কামনার অনেক সবুজ'– এই উচ্চারণে কবির দেহবাসনার প্রকাশ স্পষ্ট হলেও, তিনি ভোলেন না, প্রেমের উল্টো পৃষ্ঠার অনেকটা জায়গা দখল করে আছে ঘৃণা :

আমাদের প্রথম কথা–
বিশ্বাস নিষ্ঠারতি
তাইতো অবাক হলাম
মিথ্যায় জাগ্‌লে দেখে
তবু আজ বাহুর বেড়ায়
তোমারেই স্বর্গ দিলাম
কি করি, উপায়তো নেই
ঘৃণাতেই প্রেমের স্বীকার। ('এক মুঠো'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

সৈয়দ আলী আহসান 'ভাবনাগুলো' শিরোনামে তিনটি কবিতা লিখেছেন। এই তিনটি কবিতায়ই আমরা প্রেম ও প্রেমাস্পদের উপস্থিতি লক্ষ করি। প্রথম কবিতায় কবি ফুল আর ধূপের কোন বিনিময় নেই বলে উল্লেখ করেছেন। 'চিরায়ত মৌলিক সবুজ হলুদ সূর্যে'র নিচে কবি অনুভব করেন 'একটি উষ্ণ নিশ্বাস যুবতী রমণীর'। এই রমণীর কুয়াশায় একদিন হারিয়ে গিয়েছিলেন কবি। এই হারিয়ে যাওয়ার রমণীয় অনুভবকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি। এই তিনটি কবিতায়ই প্রেম এসেছে স্মৃতির হাত ধরে। সেই হাতের ছোঁয়া কবির ভাবনায় যে আলোড়ন তুলেছে, কবিতায় তারই পরিচয় দিয়েছেন কবি। তিনটি কবিতা থেকেই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. সেদিন ভেবেছিলাম
তোমার মাথার চুলগুলি
আমার আঙুলের খেলায় সাড়া দেবে ('ভাবনাগুলো : এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

খ. সুখী শহরে সন্ধ্যা নেমেছিলো
শান্ত অপ্রেমী মেয়ের আশ্রয়ের মতো ('ভাবনাগুলো : দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

গ. তোমার চোখ বন্ধ কর
তোমার চোখ পাথরের মতো
নির্মল নিঃশব্দ শান্ত ('ভাবনাগুলো : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ণাঙ্গ প্রেমের কাব্য *সহসা সচকিত*। এই কাব্যের প্রতিটি কবিতাকে আলাদা কবিতা হিসেবে যেমন পাঠ করা যায়, তেমনি সমগ্র কাব্যের ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন কবি। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিকে আমরা এই কাব্যের ভূমিকা হিসেবে পাঠ করতে পারি। কবির নারী–ভাবনার স্মারক হিসেবেই আমরা এই কবিতাটিকে গ্রহণ করতে চাই। *সহসা সচকিত*-এর প্রথম কবিতার কোন নাম নেই। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোকে তিনি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। ভূমিকা-কবিতাটিতে কবি প্রেম ও প্রেমিকা বিষয়ে তাঁর কিছু বিবেচনা উপস্থাপন করেছেন। প্রেমহীন জীবনে শ্রাবণ নেই, নেই আগ্রহের প্লাবন। প্রেমিকার চোখে কবি খুঁজে পেয়েছেন আনন্দের দীপ। তাঁর মতে, প্রেয়সীর চোখের সাগরে স্বপ্ন-বাসর রচনার মধ্য দিয়েই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কবি যে রাজ্যের শুভ সংবাদে অনুপ্রাণিত, সেই রাজ্য 'অবিসংবাদ কামনালীন'। সেই রাজ্যেরই এক উজ্জ্বল রমণীর প্রতি কবির উচ্চারণ :

যেখানে তোমার অধরের শিখা
যেন প্রহেলিকা দীপ্ত গান,
সেখানে কথারা কৌতুক সহ
আনে দুঃসহ অনভিমান;
যেখানে শব্দ ওষ্ঠের তাপে
বিগলিত কাঁপে মদিরা যেন,
সেখানে বাতাসে সচকিত কাল

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ পাতাল তরল যেন।

এই কবিতায় কবির নায়িকারা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সীমানা অতিক্রম করে সর্বকালের নারীমূর্তিরূপে অধিষ্ঠিত। তাই কবিকে স্মরণ করতে হয় মধ্যযুগের নারীদের কথা, যাদের লতার মতো দেহ পুরুষকে জড়িয়ে ধরে। এই নারীদের 'বুকের প্রসাদ লীলার কমল/লঘু চঞ্চল কম্পমান'। তাদের কটিদেশ ক্ষীণ, যা একমুঠো ফুলের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য গুরুভার কটিবিশিষ্ট নারীদের কথাও বলছেন কবি, যা তাঁর ভাষায় 'নিয়ম বা বিধি অতিক্রম'। প্রাচীন কাব্যের নারীদের কথা কবি স্মরণ করেছেন এইভাবে :

প্রাচীন কাব্যে উরু-সংযোগ
যেনবা অমোঘ দ্বিদল ফুল,
অরণ্যে যেন একাকী মৃগের
পদচিহ্নের রূপ অতুল;
সেখানে পুরুষ সূর্য সমান
রূপ অম্লান অসংশয়,
সেখানে রাজ্য মধুর প্লাবনে
সর্ব-স্মরণে অদেয় নয়।

নারীর দৈহিক লাবণ্য যুগে যুগে শিল্পসাহিত্যে যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে এই কবিতায় তারই একটা সংহত অবয়ব দিয়েছেন কবি। নারী-হৃদয়ের বিচিত্র পাঠও যুগে যুগে নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন আমাদের শিল্পস্রষ্টারা, কিন্তু আলী আহসান সেইদিকে তেমন দৃষ্টি দেন নি। এমনকি পূর্বালোচিত কাব্যগ্রন্থদ্বয়েও আমরা নারী-হৃদয়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কবির মগ্নতা লক্ষ করি নি। তাঁর কবিতার সমুদয় নারীকে প্রেয়সীর দৃষ্টিতে পাঠ করলে ভুল করা হবে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার জীবনে রমণী একটি প্রেরণাদায়িনী শক্তি। এই রমণীর মধ্যে আমি মাতা, ভগ্নী, কন্যা এবং প্রিয়তমা সকলকেই গণ্য করি।' (২০০৩খ : ১৪২)। নারীর এই বিচিত্র পরিচয়কেই তিনি কবিতায় রূপায়িত করেছেন, কিন্তু নারীর প্রেয়সী পরিচয়টিই তাঁর প্রেমের কবিতার প্রধান অবলম্বন এবং দেহের ভেতর দিয়ে নারীকে দেখার প্রতিই তাঁর আগ্রহ অধিক। তবে *সহসা সচকিত* কাব্যে নারীর নান্দনিক অবয়বের সঙ্গে নারীমনের বিচিত্র দিকেও মনোনিবেশ করেছেন কবি। এ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের স্বীকারোক্তিও স্পষ্ট :

> আমার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই কিছু না কিছু প্রেমের কবিতা আছে এবং 'সহসা সচকিত' পুরোটাই প্রেমের কবিতার বই। পরস্পর সংঘবদ্ধ অনেকগুলো কবিতার মধ্য দিয়ে এখানে কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে একজন নায়ক আছে একং পরকীয়া নায়িকা আছেন। অন্য একজন পুরুষকেও এর মধ্যে দেখা যায়। এই তিনজন মিলে প্রেমের একটি ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে দেহকামনার কথা আছে। চিত্তের ব্যাকুলতার কথা আছে এবং বিরামহীন আসক্তির কথা বলা হয়েছে। একজন পাঠক যদি গভীরভাবে এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করেন, তাহলে তিনি এর মধ্যে প্রেমের একটি গভীর পরিচর্যা পাবেন। কিন্তু যৌনতাকে দর্শনীয় রূপে পাবেন না। আমি তন্দ্রাভিলাসী নই। আমি দেহ উপভোগকে শিল্পের একটি সূক্ষ্ম পরিচর্যায় রেখেছি এবং কখনও তাকে যৌনাচারে পর্যবসিত হতে দেইনি। ওটাই আমার স্বভাব ও আনন্দ। আমার প্রেমের কবিতাকে গ্রহণ করতে হলে আমার মানসিকতার মধ্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে কি নেই তা অনুসন্ধানের চাইতে কি আছে তা জানার প্রয়োজন বেশি। (২০০৩খ : ১৫৪)

কবির উপরিউক্ত মন্তব্যের আলোকে তাঁর *সহসা সচকিত* কাব্যের নিবিড় পাঠে স্বস্তি বোধ করা কঠিন। আক্ষরিক অর্থেই এই কাব্যের কবিতাসমূহে 'চিত্তের ব্যাকুলতার কথা আছে এবং বিরামহীন আসক্তির কথা বলা হয়েছে', কিন্তু যৌনতাকেও আমরা কখনো কখনো 'দর্শনীয় রূপে' উপস্থিত হতে দেখি। তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় আমরা বারবার বক্ষ-প্রসঙ্গে 'উপাধান'-এর ব্যবহার লক্ষ করি। এই উপমায় শৈল্পিক লাবণ্যের চেয়ে যৌন আবেদনই প্রবল হয়ে ওঠে। *সহসা সচকিত*-এর কবিতাসমূহ পাঠ করার সময়ও আমরা কবিকে নারীদেহের নানা অনুষঙ্গে আবর্তিত হতে দেখি। কয়েকটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে :

ক. তোমাকে এখন হৃদয় দিলাম,

শিশিরের ফুল মুঠোয় নিলাম,
দুইটি তারায় একটি দীপ্ত বাণী (১-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

খ. দেহের সাড়ার কিছু না পেয়েই,
কামনার ফুল চোখে না দেখেই,
অপূর্ব স্বাদে হৃদয় আমার
তৃপ্তির তীরে ঘুমন্ত ॥ (২-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

গ. করনখে যার রক্ত-কুসুম
হৃদয়ের শোভা অবিনয়ে শেষ,
সে কি ক'রে জানে কোন জিজ্ঞাসা
আমারে আকুল ক'রে?
কোন সমুদ্রে আমার কণ্ঠ
উচ্ছ্রিত কলগান?
কোন্ গণনায় সকল রাত্রি
বিরলে মূহ্যমান? (৭-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

গ. পূর্ণতা যার কাম্য প্রদীপ
সে নয় উপমা সুন্দরের,
কামনার দাহ দেহে যার নেই
স্বাগত সে নয় আনন্দের। (৯-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঘ. অনুষঙ্গকে জড়িয়ে ধ'রেই
হৃদয় আমার দেহের ছায়া,
এ-হৃদয় যদি তোমাকে দিলাম–
করপুটে নেব তোমার কায়া। (১৮-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঙ. তোমার ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ
সঙ্গীতে যেন মুখরিত,
মসৃণ ত্বকে রাত্রির স্নেহ
যেন বা মুক্তা বিগলিত;
অবাধ খুশিতে মন যেন সোনা,
চুলের ছায়ায় কত আনাগোনা,
প্রতিবেশী চোখ সূর্য ছড়ায়
কত ইঙ্গিত সচকিত।...
হীরক-সময় মনের অতীতে
রাত্রিতে আজ তুমি শ্রাবণ,
অগাধ পুষ্প তোমার শরীর
অসম্ভবের যেন প্লাবন,
যৌথ মিলনে মৃত্তিকা-কণা
উপমা বিলোপে অনন্যমনা,
যন্ত্রের জয়ে যে দেহ কঠিন
সে দেহ হারায় উদ্ভাবন। (১৯-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

সৈয়দ আলী আহসান *সহসা সচকিত* কাব্যের শরীরী-উদ্ভাসন সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, তা তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহ এবং *সহসা সচকিত*-পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রেমাশ্রয়ী কবিতাবলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। মন দেওয়া-নেওয়ার কথা তিনি বলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই মনে প্রবেশের পথ তিনি অন্বেষণ করেন

নায়িকার শরীরের ভেতর। ফলে নারীদেহের নানা অঙ্গের উপস্থিতি তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। এমনকি দেহ শব্দটির ব্যবহার তাঁর কবিতায় চোখে পড়ার মতো। কামনা, বাসনা, ওষ্ঠ, ত্বক, বক্ষ, চুল, চুম্বন ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় মাত্রায় বেশি। ফলে 'যৌনতাকে দর্শনীয় রূপে পাবেন না' বলে কবি যে দাবি পেশ করেন, সচেতন পাঠকের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য যৌনতাকে পরিহার করার পক্ষে তিনি ছিলেন না। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'যৌনাবেগ জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। জীবনের প্রয়োজনে যৌনতাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি।' (২০০৩খ : ১৩৭)। তাঁর কবিতার মধ্যে 'প্রেমের একটি গভীর পরিচর্যা' নিশ্চয়ই লক্ষ করা যায়, কিন্তু সেই প্রেম নিষ্কাম, দেহনিরপেক্ষ মানসিক বৃত্তির বেশে উপস্থিত হয় না। দেহ ও মনের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি কবিতায় প্রেমকে আবাহন কিংবা উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর সমগ্র প্রেমের কবিতা সম্পর্কেই আমাদের এই বিবেচনা কার্যকর হতে পারে।

প্রকৃতি

সৈয়দ আলী আহসান শৈশব থেকেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুলক বোধ করতেন। আত্মজীবনীতে তার বিস্তর নজির উপস্থাপন করেছেন তিনি। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ হতেন কবি। 'নদীর তীর ছিল ফাঁকা। কিছু কিছু গাছ ছিল, প্রধানতঃ বাবলা গাছ। বছরের কোন কোন সময় সে গাছগুলোর গা বেয়ে স্বর্ণলতা ছড়িয়ে থাকতে দেখতাম।'– আলী আহসানের (২০০৩ক : ২১) এই মন্তব্যে প্রকৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় মেলে। একই স্মৃতিচারণে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সকাল বেলার দৃশ্য ছিল আরও সুন্দর। সূর্যকিরণ যখন ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ত তখন ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমাদের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে লাল শাপলা ফুটত, সূর্যকিরণে সেই শাপলা ফুল দেখতে খুব ভাল লাগত। প্রকৃতিদত্ত আবরণের বিচিত্রতায় পৃথিবী যে কত সুন্দর এবং কত মহিমাময় তা শৈশবে আমি যেভাবে বুঝেছি বড় হয়ে ঠিক সেভাবে অনুভব করিনি।' (২০০৩ক : ২২)। বড় হয়ে প্রকৃতি-বিষয়ে তাঁর অনুভব যে পাল্টে গেছে, তাঁর কবিতাও তারই সাক্ষ্য দেয়। যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'দি রোজ'-এ আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্নাত হতে দেখি : 'বাগানে ফুটিয়াছে গোলাপের ফুল/তুলে নিয়ে বলিলাম অতি সুকুমার।' এই কবিতা তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। এর অনুবাদ করেছেন কবি মতিউল ইসলাম। পরবর্তী জীবনে পুরোপুরি প্রকৃতি-নির্ভর কবিতা তিনি খুব বেশি লেখেন নি। অন্য অনুষঙ্গকে প্রবল ও প্রাণবন্ত করার সহায়ক হিসেবে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে তিনি পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। বিশেষ করে তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা মনোরম দৃশ্যকে ধারণ করেছেন তিনি। বাবার কাছ থেকে শৈশবে শিখেছেন, 'এই যে নদী, এই যে মাটি এবং এই যে আশোপাশের লোকালয় সব বিধাতার সৃষ্টি।' বিধাতার এই সৃষ্টিসম্ভারে তিনি অবগাহন করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই অবগাহন কেবল তাঁর ক্লান্তি নিবারণে অবদান রেখেছে। দেহের ক্লান্তি মুছে নিয়ে তিনি যে সৃষ্টির পথে প্রবেশ করেছেন, সেখানে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। এই বড় মানুষকে বরণ করেই তিনি তাঁর কবিতার চরণ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। মানবচৈতন্যের বিশেষ কোন প্রবণতার সহায়ক কিংবা পরিপূরক হিসেবে প্রকৃতির কাছেও হাত পেতেছেন তিনি। প্রকৃতি তাঁর হাতে যা-কিছু দিয়েছে, তিনি তা অবলীলায় গ্রহণ করেছেন, গ্রহণের আনন্দকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির গুণকীর্তণে স্বস্তি বোধ করেন নি কবি।

সৈয়দ আলী আহসান একটি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, যে-সমস্ত চিন্তা উপলব্ধি বা বিষয় তাঁকে অনুপ্রাণিত করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অনুষঙ্গ হল প্রকৃতি। (২০০৩খ : ১৪২)। একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে প্রকৃতির প্রকৃত অবয়বটি তাঁর কাছে অধরা ছিল না। প্রকৃতির কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি, আবার প্রকৃতিকেও তিনি ধারণ করেছেন তাঁর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে শিল্পসাহিত্যবিষয়ক কথোপকথনে আলী আহসান তাঁর প্রকৃতি-চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, পাহাড়, নদী, সমুদ্র তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও কবিতাগুলোকে আমরা প্রকৃতির প্রশস্তিমূলক কবিতা বলতে চাই না। প্রকৃতির আড়ালে জীবনের একটি গভীরতর অর্থ ও উপলব্ধির দিকে যাত্রা করেছেন কবি। সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ *সৈয়দ আলী আহসান : মনীষার মুখ* থেকে সংগৃহীত নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক :

ক. আজ জীবনের এ প্রান্তে এসে মনে পড়ছে ঐ দিনের কথা খুব করে, নদী ও প্রকৃতি মানুষের [মানুষকে] লালন করে। নদী অনবরত সামনের দিকে, মানুষের সম্ভাষণ নিয়ে ধায়।...আমিও নদীর প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করছি। নদী যেন আমাকে প্রবাহিত করে। আমি রাত্রির অজস্র জোনাকির দিকে। রাত্রির আকাশ আমার দিকে আলো বিচ্ছুরণ করে। আমি নিঃসীম নীলিমার অন্তহীনতা অবলোকন করি। রাত্রির আকাশ এবং রাত্রির নদী আমাকে সচকিত করে। আমি বিস্ময়ের আতিশয্যে নিজেকে বিভাসিত করি। (২০০৩খ : ৭১)

খ. নদী আমাকে চিরকাল আকুল করেছে। যারা আমার কবিতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন তারা দেখবেন আমার কবিতায় নদী এবং সমুদ্র প্রবলভাবে এসেছে। আমি পৃথিবীর বহু সমুদ্র উপকূলে গিয়েছি এবং সেখানকার তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেলিত হয়েছি। এই যে সমুদ্র এবং নদীর অনবরত প্রবাহ এবং বিক্ষুব্ধতা এবং অনাবিল নিশ্চিন্ততা এটাই আমার জীবনকে আকুল করেছে এবং অস্তিত্বের অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। (২০০৩খ : ১২৭)

গ. আমাদের সমুদ্রের, পর্বতের, দ্বীপের, চা-বাগানের, গ্রামের বিস্তীর্ণ জীবন পড়ে রয়েছে। গভীর জীবনবোধ প্রয়োজন সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য। (২০০৩খ : ১৯০)

উদ্ধৃতিসমূহে আহসান প্রকৃতির সান্নিধ্যে সতেজ, সরাগ ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। প্রকৃতি তাঁর 'জীবনকে আকুল করেছে এবং অস্তিত্বের অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে'। প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে 'সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য' যে জীবনদৃষ্টি এবং শৈল্পিক নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা অর্জন করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কেবল বাইরের বিষয় হিসেবে উল্লেখ কিংবা বিশ্লেষিত হয় নি, তা কবির চেতনার স্পর্শে হয়ে উঠেছে জীবনেরই অনিবার্য অংশ। *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন :

> আমার দৃষ্টির সীমায় হয়তো কখনও পর্বত, কখনও সাগর, কখনও প্রান্তর, কখনো অনেক যাত্রী। এ-সব কিছু কখনও আলোকিত, কখনও অনির্ণেয়। আমি সাধারণ মানুষের ইচ্ছের যন্ত্রণা নিয়ে দৃষ্টিকে শুধু সম্মুখে প্রসারিত করে প্রতিদিন কালক্ষয় করেছি। যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে, তখন পিঙ্গল মৃত্তিকায় কুয়াশা নেমে আসে। আমি জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাই এবং নিস্তব্ধ প্রহরের কণ্ঠস্বর শুনবার চেষ্টা করি। (১৯৭৪ : ১৮৭)

দৃষ্টিসীমার সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ফলে কবির জীবনযাত্রায় প্রকৃতি যোগ করেছে নতুন মাত্রা। প্রকৃতিকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছেন তিনি। এই বোঝাপড়ার মধ্যে নিজেকেই নানাভাবে আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষণীয়। জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা তো কেবল তাঁর বাসগৃহের সঙ্গে বাইরের সংযোগসাধন নয়, তা কবির অন্তরমহলের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগের পথকেও সুগম করে দেয়।

*উচ্চারণে*র ভূমিকায় আলী আহসান প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার যে আরাম ও আনন্দ সম্পর্কে কথা বলেছেন, এই গ্রন্থভুক্ত কবিতায়ও আমরা তার পরিচয় পাই। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের প্রকৃতি-প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে এই গ্রন্থের প্রকৃতি-প্রবণতা তুলে ধরতে চাই। কারণ, তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, *উচ্চারণ*কে আমরা আহসানের স্বীকারোক্তিমূলক কাব্যপ্রয়াস হিসেবে দেখতে চাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাঠ করা যাক :

ক. যে পাখি প্রত্যহ ডানা মেলে আকাশে উড়ল এবং যাকে কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না, আমাদের প্রতিদিনের ঊষায় ঘুম ভেঙে তাকেই প্রত্যহ উড়ে যেতে দেখি। (২-সংখ্যক কবিতা)

খ. পল্লীতে আমরা কি পাই? বাধাহীন দৃষ্টির আকাশকে পাই, উন্মুক্ত প্রান্তর পাই, বিশৃঙ্খল অরণ্যের অন্ধকার পাই এবং এ-সকলের সঙ্গে চিত্তের নিভৃতলোকের আর্তিকে পাই। নগরে পরিচয়হীন প্রতিদিনের দেখার মধ্যে যে সংযম, কর্মের দ্রুততার মধ্যে অন্তরের যে অনুদ্ঘাটন, পল্লীতে তা নেই। পল্লীতে মিলনে, বিরোধে, অসম্ভ্রমে, যন্ত্রণায় এবং তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার কোলাহলের মধ্যেও মানুষের চিরায়ত স্বাক্ষর আছে। তাই অকস্মাৎ পল্লীপথে চলতে চলতে আমি যেন নতুন পৃথিবীর সৌরভকে পেলাম। এ-সৌরভ সিক্ত মাটিতে ঝরা-পাতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কাশফুলের বন্যার মধ্যে আলোকিত হয়েছে এবং নতুন বসন্তে আমের মুকুলের মাদকতায় গ্রাহ্য হয়েছে। (৩২-সংখ্যক কবিতা)

গ. এ বছর বসন্ত যেন এসেছে খুব বেশি সাড়া শব্দ করে। ফলে ফুলে, পাতায় এবং সুগন্ধে তার পদধ্বনি শুনছি। আম গাছের কচি পাতায় রোদের ছবিগুলি, দুপুরবেলায় কোকিলের ডাক, দালানের ছাদের কার্ণিশে সন্ধ্যাবেলায় একাকী একটি কাকের বসে-থাকা, রাত্রিশেষে লঘুস্পর্শে একটু শীতলতার প্রবাহ, কৃষ্ণচূড়ায় আগুনের শিখার মতো অনেক ফুল, সময়ের মধ্যে উদাস বিস্তার অনবরত আমার কাছে বসন্তের কথা বলছে। (৩৬-সংখ্যক কবিতা)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পৃথিবীতে কত অবস্থায় আলো জাগে, অন্ধকার নামে, নদীতে কত তরঙ্গ ফুল হয়, শুকনো পাতায় কত বাতাস গান হয়, কত গাছ পাখিকে আশ্রয় দিয়ে সময়কে স্থবির করে। আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি চিরকালের আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত দেখতে চেয়েছি– সে আকাঙ্ক্ষা হল একটি অসম্ভব প্রেমের মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করা, কখনও পাখি হয়ে, কখনও ফুল হয়ে, লতা হয়ে, নদী হয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে যে অন্ধকার নেমেছে সে-অন্ধকার হয়ে, কিন্তু চিরকাল পৃথিবীর মানুষের মমতা ও আনন্দকে গ্রহণ করে। (৪২-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. গাছের নুতন সবুজে যমন আনন্দের লীলা যে আনন্দের পারম্পর্য নেই, যুক্তি নেই, কোনও কাল নেই– বিগত, বর্তমান বা আগামী, তেমনি একটি দুটি কাকের সঙ্গে আমার যে সময়টুকু কাটলো তাতে আমার চিত্তের জন্য একটি শান্ত পরিতৃপ্তি পেলাম। ('৪৮-সংখ্যক কবিতা)

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, প্রকৃতির সান্নিধ্যে তিনি কেবল আরামই বোধ করেন না, প্রকৃতিই তাঁকে অন্তর্জগতের অন্দরমহলে প্রবেশের পথ রচনা করে দেয়। প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর দিকে কবির এই বিস্ময়ের আড়াল সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস অপ্রকাশিত হয়। এই সৃষ্টিরহস্যের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির জগৎ সম্পর্কেও নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছে যান। পল্লীর প্রতি কবির যে পক্ষপাত, সেও প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে সারল্য ও সৌন্দর্য উপভোগের বাসনা থেকেই উদ্ভূত। প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ গাছের প্রতি কবির মুগ্ধতা কোন দিনই কমে নি। একটি প্রবন্ধে কবি বলেছেন :

> এখনও আমার গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। গাছকে আমার অনেক নিকটের মনে হয়। ছোট ছোট গাছের দিকে আমি তাকাই না। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, বৃক্ষের ছায়াতলে বসে ত্যাগী পুরুষরা মুক্তির স্বাদ পান। এ কথায় বৃক্ষকে মর্যাদার স্থান দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষ শৈশবে যে বৃহৎ বৃক্ষটিকে দেখে, মৃত্যুর সময় একই অবস্থায় সে বৃক্ষটিকে দেখে থাকে। সুতরাং মানুষ তার জীবনের সাক্ষ্য হিসেবে বৃক্ষকেই রেখে যায়, তাই বৃক্ষের এত মর্যাদা। (২০০৪ : ৯০-৯১)

সৈয়দ আলী আহসানের ৬০তম জন্মদিনে প্রকাশিত *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থে* আলী আহসানকে নিবেদিত কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যায় যেখানে প্রকৃতি সম্পর্কে আহসানের বিবেচনার সারবস্তু সম্পর্কে কবিবৃন্দের স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে আহসানের সম্পর্কের গতিবিধি বিষয়ে তাঁর অনুজ কবিবৃন্দের অভিব্যক্তিতে তাঁর প্রকৃতি-অনুধ্যান মূর্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি :

ক. তুমি সেই স্রোতধারা, ভাষার ঐশ্বর্যে বেগবান
বয়ে আনো, প্রকৃতি ও মানুষের অন্বয় আবেশে
জটিল সম্পর্কে দাও প্রাঞ্জলতা, ...(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৮৫ : ৩৫৮)

খ. রূপময়ী পৃথিবীকে আবিষ্কার করেছ
তোমার মাতৃভূমির অনিন্দ্য লাবণ্যে–
সবুজে আর নীলিমায়– ...(মোহাম্মদ আলী ১৯৮৫ : ৩৬১)

গ. তোমার সমর্থনে যেখানে পাথরও পুষ্পলোভা
দৃষ্টির ফোঁড়ে
অনাবাদী শস্যক্ষেত্র শোনায় কবির
বীজ বপনের উপাখ্যান
সমুদ্র-আহ্বান যেখানে তিমির নিশ্বাস নেয় এক
প্রাকৃতিক আনন্দ ফোয়ারায়
প্রাজ্ঞ পাখিদের ভাষা হয় যেখানে
শ্রবণযোগ্য কোন শ্রেষ্ঠ অনুবাদ
আর নদী হয় ভাষার বিপক্ষে কোন সহজ ডাকনাম। (ত্রিদিব দস্তিদার ১৯৮৫ : ৩৬৪)

আলী আহসানের জীবন ও শিল্পের গভীরে প্রকৃতির প্রতিধ্বনি বিষয়ে উপরিউক্ত কবিবৃন্দের মূল্যায়ন থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রকৃতি আহসানের কবিতার উপাদানমাত্র নয়, তা তাঁর জীবনেরই অনিবার্য অংশ। প্রকৃতির স্নেহ ও সেবায় বেড়ে

ওঠা আহসান প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান নি, বরং প্রকৃতির ছায়ায় বসেই জীবন ও জগতের নানা বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন।

অনেক আকাশ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের কোন কবিতায়ই প্রকৃতি তাঁর প্রধান অবলম্বন নয়। অন্য অনুষঙ্গের সহায়ক উপাদান হিসেবে কবিতাগুলোতে প্রকৃতি এসেছে। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে জড়িয়ে ধরে নি, কিংবা বলা যায়, জড়িয়ে ধরতে চান নি কবি। বরং প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁর মনে যে প্রশান্তি কিংবা পবিত্রতা এসেছে, সেই মনকে তিনি নিমগ্ন রাখতে চেয়েছেন প্রিয় মানুষের অন্তর্জগতে আসন রচনা করার প্রেরণা হিসেবে। প্রেমের কবিতায় প্রকৃতির ব্যবহার কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ প্রেমকে উদ্‌যাপনের জন্য মানুষকে প্রকৃতির আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়। সেই আমন্ত্রণে প্রকৃতি প্রধান হয়ে ওঠে না, প্রেমের আনন্দযাপনের পরিধিই কেবল তাতে বিস্তৃত হয়। নিচের দৃষ্টান্তসমূহ পাঠ করা যাক :

ক. যেখানে গাছের পাতা ঝরে গেছে সেখানে অথবা
যেখানে নদীর স্রোত মিশে গেছে সমুদ্র-সীমায়
অথবা যেখানে পাখি বাতাসের পাখায় ভেসেছে– ('উন্মুখ দেহের প্রাণ')

খ. আরও ঊর্ধ্বে, আরও দূরে।
আকাশ যেখানে মেশে শুভ্র মেঘ লঘু নীলিমায়
বিচূর্ণিত দিনগুলি শ্বেত মেঘে উড়ে চলে যায়।
সমুদ্রের স্বচ্ছ ঢেউ বলাকার বিস্তারের মত–
এ-সমুদ্র শুভ্র মেঘ দিগন্ত বিস্তৃত ইতস্ততঃ
মৃত্তিকার ক্ষুদ্র প্রাণ হঠাৎ এ ঊর্ধ্বলোকে উঠতে চেয়েছে
আরও ঊর্ধ্বে– আরও দূরে– ('আরও ঊর্ধ্বে, আরও দূরে')

গ. দিগন্ত-বিস্তৃত-শূন্য নির্বিকার উদাসীন দেশ,
নির্বিকার সমভাবে সঙ্কটে, বিলয়ে, কভু
উচ্ছ্বাসে বা কখনো মৃত্যুতে।
এ-দেশেতে উদাসী আকাশ,
মেঘ-শূন্য নীলাভ্র-সম্ভব,
অথবা সবুজ গুল্ম কন্টকে কঠিন,
অথবা তারকা-পুষ্প রক্ত-দীপ্ত হাস্যে উদাসীন–
এ-দেশ দিগন্তে গত, শূন্য-শীর্ণ তীক্ষ্ণ উদাসীন ॥ ('সিন্ধুর মরুমধ্যে')

ঘ. এখানে আমার অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া
বাংলাদেশের বৃষ্টিকে পেলাম–
এখানে শীতে বরফ পড়ে
এক সময় গাছের পাতা হলুদ হ'য়ে ঝরে পড়ে
কিন্তু এখন বর্ষাসজল সবুজ শান্তিতে–
প্লেনের জানালার শার্সিতে বৃষ্টি–
দরজা দিয়ে নেমে আসতে বৃষ্টিতে চোখ ভিজেছে
আমার হৃদয় ভিজেছে ॥ ('আঙ্কারায় বৃষ্টি')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে এতে প্রকৃতিকীর্তনই প্রধান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমগ্র কবিতার আলোকে এই কবিতাংশ আমাদেরকে প্রকৃতির প্রাণপ্রাচুর্যে আবাহন করে না। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গাছের পাতা, নদীর স্রোত কিংবা পাখির গান হৃদয়ের আদান-প্রদানকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। 'প্রত্যূষের সমারোহে অথবা রাত্রির নিঃশেষে' কবি যে স্বপ্নের বন্দরে নোঙর করার প্রত্যাশা রাখেন, যে 'নতুন দেশের' জন্য তাঁর অন্তর হাহাকার করে, সেখানে

প্রাকৃতিক প্রসন্নতা প্রেমের মুহূর্তগুলোকে আরামদায়ক করবে– এই অনুষঙ্গে প্রকৃতির শরণ নেন কবি। উদ্ধৃতি-খ কবির উদ্ভ্রান্ত মনকে কাব্যরূপ দিয়েছে। 'নির্জীব প্লাবন-সিক্ত তৃণাকীর্ণ প্রান্তরের ভাষা' কবি বুঝে নিতে চান বলেই কেবলই ঊর্ধলোকে ধাবিত হচ্ছে তাঁর মন। আকাশের মেঘ এবং সমুদ্রের ঢেউ কবির অস্থিরতার রূপকল্পে উদ্ভাসিত। মাটির ক্ষুদ্র প্রাণ হিসেবে ওপরের দিকে কবি এই দৃষ্টিপাতের অন্যরকম তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। প্রাকৃতিক উপাদানের উল্লেখ থেকে এটুকু অনুমান করা সম্ভব যে, মাটির সংস্পর্শ ব্যতিত সুখের অন্য কোন দিগন্ত নেই। এই কবিতায় 'কোথায় সে-মৃত্তিকার বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রস--আলো?'– এই উচ্চারণ আমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে প্রাণিত করে। 'সিন্ধুর মরুমধ্যে' কবির অসহায় আর্তনাদ গ-সংখ্যক উদ্ধৃতির মর্মকথা। মরুভূমির বিরাণ বাস্তবতাকে জীবন্ত করে তোলার অভিপ্রায়ই কবির উদ্দিষ্ট। এই কবিতায় তাঁর মরুভূমির উল্টোচিত্র আঁকতে গিয়ে কবি তাঁর জন্মভূমির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন : 'এ-মুহূর্তে পূর্ববঙ্গে গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বলেছে,/কাকলি-বন্যায় বুঝি উচ্চকিত সব গৃহাঙ্গন।' এই কবিতায় কবিমনের রিক্ততাই বোধকরি মরুভূমির রূপকে উপস্থাপিত হয়েছে। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও কবির জন্মভূমির প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ এসেছে স্মৃতির হাত ধরে। আঙ্কারার বৃষ্টি কবিকে পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশে। আঙ্কারার বৃষ্টি নয়, কবির হৃদয়কে ভিজিয়েছে বাংলাদেশের স্মৃতি।

একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্যগ্রন্থেও সৈয়দ আলী আহসান প্রাকৃতিক-অনুষঙ্গে কবিচৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতির রূপ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও নানা রকম পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই পরিবর্তনের রূপায়ণে প্রকৃতিই তখন কবির অন্যতম সহায় হিসেবে উপস্থিত হয়ে থাকে। শেষ বিকেলের একখণ্ড মেঘ যখন কবির চোখে পলাশগুচ্ছ হয়ে ওঠে, তখন পাঠক হিসেবে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, এই রক্তপলাশের রঙ কবির চেতনারই প্রতিনিধিত্ব করে, যা কবিকে উপহার দেয় 'নিমজ্জিত আনন্দের অপরাহ্ণ'। নিচের উদাহরণটি পাঠ করা যাক :

একদিন বিকেল-আকাশের মেঘকে
পলাশগুচ্ছ বলে ভুল করেছিলাম
সেদিন হৃদয় নিশ্চিন্তে চোখ মেলে
আকাশকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছিলো
কখনও পলাশ কখনও রজনীগন্ধা
কখনও বা শুধু সাদা মেঘ
হঠাৎ হয়তো বা নরম বরফের ফেনা
সবকিছু মিলে একটি নিমজ্জিত আনন্দের
অপরাহ্ণ ('বিকেল-আকাশের মেঘ')

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সৈয়দ আলী আহসানের প্রকৃতি-নির্ভর পূর্ণাঙ্গ কবিতা খুব বেশি নেই। প্রকৃতি তাঁর কবিতার মৌল ভাবকে বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠায় অবদান রাখে। তবে, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যের 'কৃষ্ণচূড়া : এক' শীর্ষক কবিতাটিকে প্রকৃতির প্রশস্তিসূচক কবিতা হিসেবে পাঠ করা যায়। যদিও প্রাকৃতিক ঋদ্ধির পথ ধরে তিনি তাঁর যৌবনের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতাকে ধারণ করতে চেয়েছেন এবং সেই অনুষঙ্গে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহনের আনন্দ উপভোগের প্রয়াস পেয়েছেন, তবু কবিতাটিতে গাছের পাতা ও কৃষ্ণচূড়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয়। পুরো কবিতাটি উদ্ধৃত করছি :

আমার কাছে সুপ্রচুর আকাশ
মুঠোয় ভরা শিমুল ফুলের মতো রোদ
হঠাৎ বাতাসে বাতাসে আনন্দে মতো
ঐশ্বর্য

গাছের পাতায় সবুজ রাত্রি
আর নদীতে নদীতে অফুরন্ত বিশ্রামের নীল
উজ্জ্বল লতায় সমর্থিত অনেক গাছ

আমার স্মৃতির ইতিহাসে
যৌবনের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া। ('কৃষ্ণচূড়া : এক')

সৈয়দ আলী আহসান এই কাব্যে জন্মভূমির মহিমা কীর্তন করে তিনটি কবিতা লিখেছেন। তিনটি কবিতায়ই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি কবির মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। পূর্ব-বাংলার শ্যামল ছায়ায় বসে কবি অবলোকন করেছেন, জীবনের আরাম ও আনন্দ প্রকৃতির উদার দানেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে 'আশ্চর্য শীতল নদী' কবির জন্য বয়ে আনে শান্তি ও প্রাচুর্যের অনুভব, তার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাই পূর্ব-বাংলা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে 'একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' হিসেবে, সবুজ পাতার ঘনিষ্ঠতায় কবি খুঁজে পেয়েছেন 'একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জে'র প্রতিশ্রুতি। মধ্যরাতে গাছের পাতায় যখন বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টির শব্দ কবিকে সৃষ্টির আনন্দে অভিভূত করে। কবি তখন 'স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায়' কবিতার জন্মবৃত্তান্ত এঁকে দেন। তিনটি কবিতা থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. আমার পূর্ব-বাংলা কি আশ্চর্য
শীতল নদী
অনেক শান্ত আবার সহসা
স্ফীত প্রাচুর্যে আনন্দিত
একবার কোলাহল, অনেকবার
শান্ত শৈথিল্য
আবার অনেকবার স্তিমিত কণ্ঠস্বরের
অনবরত বন্যা
কতবার বক আর গাঙশালিক
একটি কি দু'টি মাছরাঙা
অবিরত কয়েকটি কাক
বাতাসে বাতাসে প্রগলভ কাশবন
ঢেউ-ঢেউ নদী প্রচুর কথার
কিছু গাছ আর নারকেল শন পাতার
ছাওনির ঘর নিয়ে
এক টুকরো মাটির দ্বীপ ('আমার পূর্ব-বাংলা : এক')

খ. আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল

অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ ('আমার পূর্ব-বাংলা : দুই')

গ. আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাত্রে গাছের
পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো
কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা–
এক সময় বাঁশির সুর
যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙ্গে
অনবরত কোমল কোলাহলে
স্বপ্নের মত পাতায় পাতায়
শব্দকে দেখি ('আমার পূর্ব-বাংলা : তিন')

সৈয়দ আলী আহসান *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যের অনেক কবিতায়ই প্রকৃতির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। সবুজের সান্নিধ্য তাঁকে সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাই গাছের কথা ভাবতেই তিনি পাতার হাতছানিকে প্রশ্রয় দেন। আর বৃষ্টির জলকে ছড়িয়ে দিতে চান পাহাড়ে, অরণ্যে। যে আকাশ তাঁর নিজস্ব নীলের স্বপ্নে বিভোর, সেখানে পাখিদের আনাগোনাও কবির অভিপ্রায়কেই পল্লবিত করে। নিঃসঙ্গতার বিধ্বংসী কিংবা বিপজ্জনক অবয়ব নেই তাঁর কবিতায়।

বরং সঙ্গহীনতাকে তিনি ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন ফুল-পাখি-পাহাড়-নদীর সৌরভ ও স্নিগ্ধতায়। এইসব প্রাকৃতিক অনুষঙ্গেই কবির 'আনন্দ যেন বর্ণ আর বিন্যাসে কুঙ্কুম'। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক :

ক. পাইনের বনে ঘাসের গন্ধ
অল্প আকাশ দেখা
সবুজের স্রোতে দেহ মেলে দিয়ে
সময়ের উতরোল
গাছের পাতারা প্রজাপতি হ'য়ে
গানে সুরে একাকার ('তোমার হৃদয় : আমার হৃদয়')

খ. বৃষ্টির পৃথিবী একা যেন এক আদিম সম্ভার
হঠাৎ পাহাড় যেন একমাত্র অরণ্যে আকাশে।

একটি দুইটি পাখি সজীবতা পালকে ও ঘাসে
আমার আনন্দ যেন বর্ণ আর বিন্যাসে কুঙ্কুম। ('বৃষ্টি')

গ. ডানা-মেলে-দেওয়া দুপুরের রোদে
আমি যখনই একটি চিল বা কাককে
দেখি
তখন তাদের নিশ্চিন্ততায় আমি
দেখি একাকীত্বের উজ্জীবন ('একাকী')

সহসা সচকিত সৈয়দ আলী আহসানের একমাত্র প্রেমের কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে কবির প্রেম সম্পর্কিত ধারণা যেমন পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েছে, সেইসঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে। প্রেয়সীর দৈহিক প্রাচুর্যের বয়ান প্রকৃতির অনুষঙ্গেই প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে কাব্যটিতে। কেবল শারীরিক উদ্ভাসনের সহায়ক হিসেবেই প্রকৃতির উল্লেখ সীমাবদ্ধ থাকে নি, সেইসঙ্গে প্রেমাস্পদের প্রাণের স্পন্দনকেও তিনি নানা প্রাকৃতিক সক্রিয়তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনেক কবিতায় প্রেমিকার ও কবিতার সমান্তরাল কিংবা সমার্থক অভিব্যক্তিও ধরা পড়েছে। প্রেয়সীর দৈহিক সংশ্রবকে কবিমনে যে আলোড়ন অনুভূত হয়েছে, তারও প্রকাশ বিচিত্র প্রাকৃতিক গতিবিধির আলোকে চিত্রিত করেছেন কবি। কবি তাঁর প্রিয়তমাকে যখন হৃদয় উৎসর্গ করেন, তিনি অনুভব করেন, তাঁর দুই হাত যেন শিশিরের ফুলে স্নাত হচ্ছে। আবার প্রেয়সীর 'বুকের দুটি তারা দেখে' আপ্লুত হন তিনি এবং নিজের দেহে মেখে নেন শিশিরের রেণু। তাই তিনি তাঁর দয়িতার কাছে বলেন, 'যদি ফুল হও, যদি পাখি হও,/নদীর প্রবাহে যদি বা উধাও,/যদি আকাশের অঞ্চল হ'য়ে/আবরণে ঢাকো আমারে।' (২-সংখ্যক কবিতা)। আবার এই আবরণ উন্মোচনের কাজটিও তিনি প্রকৃতির বিশেষ কোন অনুষঙ্গে সম্পন্ন করতে চান। তাপিত হৃদয়ের অনুরণনকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে কবির 'আকাশ মেঘ আর ছায়া এবং বাতাস'কে তাঁর চিন্তার দোসর করে নেন। এই কাব্যে প্রকৃতির আনাগোনা উল্লেখ করার মতো হলেও, কোন কবিতায়ই প্রকৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই। বরং প্রেম ও প্রেমিকার দৈহিক লাবণ্য ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেশি হিসেবেই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি প্রবেশ করেছে। প্রেম ও প্রেয়সীর সক্ষমতা, সক্রিয়তা কিংবা স্বচ্ছলতা প্রকাশের প্রয়োজনে তাঁর কবিতায় প্রকৃতির এই আনাগোনা অপ্রত্যাশিত কিংবা আরোপিত নয়, বরং অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবেই কাব্যদেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। *সহসা সচকিত* কাব্যের কয়েকটি কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

ক. জীবন কি শুধু গাছের পাতায়
চড়ুইয়ের চোখে, কাকের পাখায়,
মাছের চকিত গতিবিধি নিয়ে
অপার নদীতে অবগাহন?
বিরলে সময় যখন অশেষ
অবলুপ্তিতে আঙিনা বিদেশ,

Dhaka University Institutional Repository

অভিসারগত তমালের তলে
প্রার্থনাসহ সম্মোহন? (৩-সংখ্যক কবিতা)

খ. নববসন্তে আম্রমুকুল
পথের ধূলারে করেছে ব্যাকুল,
বাতাসে কেঁপেছে খেজুরের পাতা
প্রকৃতিতে সাড়া আকুলতার,
স্বপ্ন-সারথী অসীম আকাশে
ছড়ালো শেফালী কুশলতার। (৫-সংখ্যক কবিতা)

গ. পপ্‌লার গাছ শীর্ণ পাথর
সোনার পাতায় ঢেকেছে ভাষা,
পুষ্প হারিয়ে গাছের প্রশাখা
শীতের বাতাসে হারালো আশা ॥ (২০-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. মনে হল যেন বৃষ্টি পড়লো
গাছের পাতায়,
অবাক অশান্ত পাখির ডানায়,
বিদায়ের কথা যখন সহসাা
বলতে যেয়ে
এক দৃষ্টিতে দেখলে আমাকে
পাপড়ি-খোলার শব্দে তখন
কাঁপলো বাতাস,
আকাশের তারা মাটির পাথর
শেষ শব্দটি শুনবে বলে
অন্ধকারের মেখলা হবার ইচ্ছায়
যেন বিবর্তিত। (৩২-সংখ্যক কবিতা)

আমার প্রতিদিনের শব্দ কাব্যের বেশকিছু কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের হৃদয়কে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতির অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রাণের সান্নিধ্য লাভ করা কঠিন। আলী আহসানের কবিতায় আমরা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পরিচয় মুদ্রিত হতে দেখি, তখনো জীবনের সজীবতার স্মারক হিসেবে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের অনুবর্তন লক্ষ করি। যুদ্ধ তো কেবল জনজীবনকেই বিপন্ন করে না, তা প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততাকেও বিপর্যস্ত করে। তাই আহসানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতায় আমরা অসুস্থ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের ছবি আঁকতে দেখি। কখনো আবার মনুষ্যত্বের পরাভবকে তিনি চিত্রিত করেছেন বিষণ্ন প্রকৃতির আড়ালে। এই কাব্যগ্রন্থের নামকবিতার ২-সংখ্যক অনুচ্ছেদ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

বিষণ্ন নির্জনতা যেখানে চিরদিন রাজত্ব করে
এবং লম্বা ঘাস বসে থাকে সিঁড়ির ফাটলে
চাঁদ, সূর্য, শীত, গ্রীষ্ম এবং তুষার
যেখানে দেয়ালের রং মুছে দেয়
কয়েকটি ইঁদুর যখন ছুটোছুটি করে
তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়–
এ-পরিত্যক্ত অট্টালিকায় কে বাস করতো?
একটি সাপ তখন কোনো উত্তর না দিয়ে
সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়– ('আমার প্রতিদিনের শব্দ : ২')

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে অগণিত পরিত্যক্ত বাড়ির একটি সাধারণ ছবিই যেন এই কবিতায় ধারণ করেছেন কবি। তিনি প্রত্যাশা করছেন জন্মভূমির জন্য তাঁর চোখ সমুদ্রের নীলকে ধারণ করবে, আর তাঁর বাহুতে প্রবাহিত হবে 'পাহাড় থেকে ঠিকরে-পড়া সূর্যের আলো'। মুক্ত স্বদেশের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত সত্তার মাটিতে ফেলে দিতে চান, 'ছায়ারা যেভাবে শুয়ে থাকে মাটিতে/সেভাবে সব ইচ্ছাই যদি মাটিতে/শরীর গড়ে' ('তা হলেইতো আমি জয়ী'), তাহলে সময়ের পরীক্ষায় তিনি বিজয়ী পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন– এই বিশ্বাসে কবি অটল। তিনি যখন বিজয়ের আনন্দকে শব্দবন্দি করতে চান, তখন তাঁর প্রিয় বৃক্ষরাজিকে মাথা উচু করে দাঁড় করিয়ে দেন। আবার হতাশায় মজ্জমান কবির ম্লান অভিব্যক্তির ধারক হিসেবে কবিতায় চিত্রিত হয় ছিন্নমূল বৃক্ষের বেদনা। 'দেশে ফেরার পর' শীর্ষক কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান বলছেন, 'যদি আম গাছের পাতায় সাড়া জাগে/ছিন্নমূল উৎপাটিত বৃক্ষের মতো/তার সমস্ত আশা/অন্ধকারের নীরবতায় হারিয়ে গেল।' আলী আহসানের কবিতায় প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনা প্রকৃতির অনুষঙ্গেই সবচেয়ে লক্ষভেদী হয়ে ওঠে। একটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

হয়তো আগামী জন্মে
(যদি জন্মান্তর থাকতো)
আমি গাছের পাতা হ'তাম
অথবা পাতার মতো প্রজাপতি
কিন্তু এখন অন্ধকার রাত্রির
নিশ্চিন্ততায়
অনেক প্রাণের নিবিড়তায়
আমি একখণ্ড পাথর
আকাশে মাটিতে প্রকৃতির ঋদ্ধিতে
অজস্র প্রাণের নিবিড়তায়
এবং ঘনিষ্ঠতায়
আমি পাতা অথবা পাখি
অথবা গান না হ'য়ে
একখণ্ড পাথর হয়েছি ॥ ('অনেক ঘনিষ্ঠতায়')

সৈয়দ আলী আহসান নিজেকে 'চিরকাল সবুজের প্রগাঢ়তার মধ্যে' পেতে চেয়েছেন। তাঁর চেতনার চত্বর জুড়ে 'সবুজের বন্যা অথবা বৃষ্টি অথবা কোলাহল' জেগে ছিল। *উচ্চারণে*র ৬৪-সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন, 'বিপুল অরণ্যের একটি প্রজাপতি/আমাকে ঢেকে ফেললো,/এবং আমি যেন তখন ঘাসের একটি পাতা।' এই রকম অজস্র অনুভবের স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় উপস্থিত। এই শ্যামল বাংলার প্রকৃত সন্তান যিনি, তাঁকে তো প্রকৃতির সন্তান হতে হয়। জাপানি কবি জুন তাকামী মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জেনে প্রতিদিনই মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনেছেন। আলী আহসান তাকামীর এই অপেক্ষার ছবি এঁকেছেন এইভাবে : 'প্রতিদিন গাছের পাতা এবং ফুল ঝরে পড়তে দেখেছে, অসংখ্য প্রজাপতির মৃত্যু দেখেছে, মাটিতে সাকের বোতল উপুড় করে ঢেলে দিয়ে দেখেছে কি করে মাটি সবকিছু শুষে নেয়।' (৮৩-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)। মাটি যা-কিছু শোষণ করে, তা বৃক্ষের শরীরে পুষ্টি ছড়িয়ে দেয় বলেই মাটির কাছাকাছি থাকার আনন্দ, আলী আহসানের ভাষায়, জীবনকে উপলব্ধি ও উদ্‌যাপনের আনন্দ। 'যেমন করে পাইনের সবুজের মধ্যে আমার চোখ ডুবে যায় তেমনি করে মৃত্যুর মধ্যে আমি ডুবে যেতে চাই।'– জুন তাকামীর এই অনুভব আহসানের কবিতায় অভিনন্দিত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু-জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকৃতির এই অনাবিল আত্মীয়তা সৈয়দ আলী আহসানের কবিতারও একটি উজ্জ্বল অনুষঙ্গ।

সময়-সমাজ-রাজনীতি

একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার অনুভব ও উপলব্ধির নান্দনিক নির্মাণ কালের চিহ্নকে ধারণ করেই কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে সময় ও সমাজের দর্পণ হিসেবে দেখার যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তা মূলত শিল্পের স্বভাবেরই সদর্থক

স্বীকৃতি। শিল্পসাহিত্যে আমরা স্রষ্টার স্বকালের অবিকল উপস্থাপন প্রত্যাশা করি না। একজন কবি তাঁর কালের সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁর অনুভবের বিস্তৃত বিশ্বে তাঁর কালের নানা ঘটনার আলোড়ন ও আন্দোলন টের পান এবং সঙ্গত কারণেই তিনি সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। সেই সক্রিয়তায় তিনি বাস্তবসত্যের চেয়ে শিল্পসত্যের দিকেই তাঁর পক্ষপাত দেখান। তাই তিনি কোন ঘটনার অবিকল উপস্থাপনে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন না। ঘটনার সারবস্তু কিংবা বিশেষ কোন অভিঘাতকে তিনি তাঁর সারস্বত অভিব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেন, যার ফলে কালের হুজুগ কেটে গেলেও কবিতায় বিম্বিত ভাব কিংবা বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায়ও আমরা তাঁর কালের প্রতিধ্বনি শুনতে পাব। সময়ের সঙ্গে সম্পর্কসেতু রচনার মাধ্যমেই তিনি তাঁর পাঠককে পল্লবিত করেন। সময় ও সমাজের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যতীত শিল্পের বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিপত্তি বিষয়ে অনবধানতা কিংবা অনাগ্রহ হয়তো প্রদর্শন করা সম্ভব, কিন্তু রাজনীতি মানুষের অমোঘ নিয়তি। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে রাজনীতির ঢেউ তাই সৃজনশীল মানুষকেও প্লাবিত করে। সেই প্লাবনের প্রভাব কবিতার দেহ-মনেও কখনো কখনো অমোচনীয় চিহ্ন রেখে যায়। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়।

একজন সৃজনশীল মানুষকে কালসচেতন না হলে চলে না। কালের যাত্রার ধ্বনি তিনি শুনতে পান এবং সেই ধ্বনিকে শব্দমাধ্যমে অবয়ব দিতে চান। 'একটি নিষ্ঠুর দ্রুততায় বর্তমানে সময়ের যে প্রবাহ সে-সময়ের মধ্যে বসতি করে আমি যদি আমার ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে না পারি তাহলে পৃথিবীকে কিছুই তো দিতে পারবো না।'– সৈয়দ আলী আহসানের (১৯৭৪ : ১৯৫) এই উচ্চারণে আত্মোপলব্ধির তীব্র তৃষ্ণার প্রয়াস যেমন প্রকাশিত, তেমনি সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে তাঁর সচেতন দৃষ্টির পরিচয়ও মুদ্রিত। বর্তমানে বাস করেও তিনি অতীতের দিকে বহুদূর দৃষ্টি প্রসারিত রাখেন, আবার ভবিষ্যতের আহ্বানে তাঁকে সাড়া দিতে হয়। সময়ের বিভাজন কবিকল্পনায় কখনো কখনো হয়তো-বা উপেক্ষিত হয়, কিন্তু সময়ের নিকটতম প্রতিবেশি হিসেবে এর যাবতীয় খোঁজখবরই তাঁকে রাখতে হয়। শিল্পের মাধ্যমে একজন স্রষ্টার যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তার অন্যতম দায়িত্ব সংযোগসাধন। স্বকাল থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শিল্পস্রষ্টার পক্ষে মহাকালের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বর্তমানের পরিসর ছোট হওয়ায় তিনি বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে নেন এবং ভবিষ্যতের আকাশেই তিনি মুক্তির আনন্দ খুঁজে বেড়ান। 'বিদেশে প্রুস্ত, জয়েস, পাউন্ড, এলিয়ট, ফকনার, এঁরা– আধুনিক সাহিত্যে সময় ও অনুভূতির সম্মিলিত গতিধারায় এক নতুন সম্ভাবনার আবিষ্কার করেছেন।'– আলী আহসানের (১৯৭৪ : ১৪) এই উপলব্ধির সারবত্তা-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলে মনে হয়। তাই তিনি তাঁদের অনুভবের সারাৎসারকে সূত্রাবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১. সময় একটি অনুভূতকাল। সময় আমাদের চিন্তায় নয়, আমরা সময়ের মধ্যে বিকশিত। আমাদের মনোবিকাশ সময়কে নিয়ে।
২. আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মে আমাদের সম্পূর্ণ অতীতের প্রভাব রয়েছে। আমাদের চরিত্র এবং কর্ম সর্বপ্রকার বিগত সত্তার দ্বারা লালিত।
৩. আমাদের চেতনা হচ্ছে স্মৃতি, আমাদের মন হলো স্মৃতি, তাই আধুনিক কাব্য এবং উপন্যাস প্রধানতঃ আত্মব্যাখ্যা।
৪. আমরা নিঃশেষ না হয়ে পরিবর্তিত হই, যতোদিন আমরা জীবিত থাকি, প্রতিমুহূর্তেই আমদের পরিবর্তন আসে, কিন্তু আমদের অস্তিত্বে সর্বক্ষণ একইভাবে জড়িয়ে থাকে সময় এবং স্মরণ। আধুনিক সাহিত্যিক তাই ঘটনা, চিন্তা এবং আবেগের স্রোতোধারায় চরিত্রের জীবন নির্মাণ করেন। (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭৪ : ১৫-১৫)

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় আমরা সময়-সম্পর্কিত উপরিউক্ত বিবেচনারই প্রতিফলন লক্ষ করি। 'সময়ের মধ্যে বিকশিত' কবির আত্মখচিত অভিব্যক্তির রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ের বিচিত্র প্রয়াস তাঁর কবিতায় উপস্থিত। সময় ও স্মরণের আন্তঃসম্পর্ক রচনার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিশেষ করে তাঁর প্রেমের কবিতায় আমরা বারবার সময়ের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। 'যখন সময় যন্ত্রণা নিয়ে হৃদয়ে নামে', তখনই তিনি প্রেম ও প্রেমাস্পদের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। জীবনের বিকল্প হিসেবেও তাঁর কবিতায় সময় এবং স্রোতের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

আশ্চর্য বিন্যাসে পথ

জীবনের সেই স্রোত টানে,
রাত্রিদিন অবিরত
উচ্চকিত সুরে আর গানে
স্পষ্ট দিন সর্বকাল
রাত্রি নেই আশ্লেষ গোপন,
সব স্বপ্ন ক্ষয় হয়
পদক্ষেপে চেয়ে দেখি
বিজয় তোরণ– ('প্যারিসের চিঠি'/*অনেক আকাশ*)

এই যে স্বপ্নের হাত ধরে জীবনের স্রোতের সঙ্গে কবির বোঝাপড়ার চেষ্টা, তা মুখ্যত সময় ও জীবনের যৌথ প্রযোজনায় প্রতিষ্ঠিত। কবি যখন অতিক্রান্ত যৌবনের জন্য আক্ষেপ করেন, তখনো দ্রুতগামী সময়কে নিজের নাগালের মধ্যে রাখতে না পারার আক্ষেপ-উৎসারিত :'স্বপ্ন আছে অতীতের– আচ্ছন্ন এ বর্তমানে/অতিক্রান্ত দিবসের রেশ।' ('সঙ্কেত'/*অনেক আকাশ*)। কবিতায় তিনি সময়ের খণ্ডিত অবয়ব নির্মাণ করলেও বিচূর্ণ ভাব কিংবা অভিব্যক্তির সমগ্রতায় আমরা সময়ের প্রবহমাণতারই পরিচয় মুদ্রিত হতে দেখি। কবি যখন বলেন, 'আমার স্মৃতির ইতিহাস/ যৌবনের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া।' ('কৃষ্ণচূড়া : এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)–তখন স্মৃতির পোশাকে সময়েরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যৌবনের চোখে কৃষ্ণচূড়ার আভা সেই কবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই স্মৃতি কিংবা স্মরণ থেকে কবি তাঁর সমগ্র যৌবনের ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সংযোগসেতু নির্মাণের যে প্রয়াস তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়, তাতে সময়ের অখণ্ড অবয়বটি আবিষ্কার করার চেষ্টা চোখে পড়ে। কোন একটি অনুভব-উপলব্ধির বিশেষ স্তরকে পঙ্ক্তিভুক্ত করার চেষ্টায়ও তিনি সময়েরই দ্বারস্থ হন। নিচের উদাহরণটি পাঠ করা যাক :

আমার আগুন সকাল বেলাকার ফুলের মতো লাল
ভেজা-ঘাসে পা ফেলার মতো–
তাপহীন বিনীত শীতের মতো–
স্মরণের সম্ভার নিয়ে বেঁচে থাকা। ('ভাবনাগুলো : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

উদ্ধৃতাংশে আমরা লক্ষ করি, কবি বর্তমানের শিশির ভেজা ঘাসে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান, আবার 'স্মরণের সম্ভার' থেকে তিনি অতীতের প্রযোজনীয় পৃষ্ঠাগুলোও পাঠ করে নেন। এই প্রয়াস, আমাদের বিবেচনায়, তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনারই কুললক্ষণ। তাই তাঁর সমগ্র রচনায় সময়ের অভিক্ষেপ অন্বেষণ না-করে আমরা তাঁর *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই, যা থেকে কবির কালচেতনার চরিত্রটি চিহ্নিত হতে পারে :

ক. সময়ের গতিবিধিতে আমরা কখনও কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে বাস করি না কিন্তু একটি অচল স্তব্ধতার মধ্যে বাস করছি ভেবে আমাদের সৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলি। নিরবধি পৃথ্বীতে যে বিপুলা কালের মধ্যে আমাদের সর্বস্ব প্রবাহিত, সে-কালের কল্পনা কি একটি কাল্পনিক খণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ধরা পড়ে? অনন্ত কালের অসম্ভব এবং অশেষ বিস্তারের মধ্যে মানুষ হিসেবে আমার সাড়া তখনই অতুলনীয় যখন আমি সমস্ত সময়ের সঙ্গে মিশ্রিত– অতীত এবং আগামীর সঙ্গে। আমার চিন্তায় বর্তমান বলে কোনও বস্তু নেই। একটি স্তব্ধ নিশ্চলতা কল্পনা করতে পারলে বর্তমানকে কল্পনা করা সম্ভবপর হত। কিন্তু যেখানে অলস মধ্যাহ্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাও কর্মসাধনাহীন নিশ্চল নয়, অথবা বিশ্রামের ইচ্ছায় অবসর-যাপনও কোনও সত্যিকার কর্মবিরতি নয়, সেখানে বর্তমান মুহূর্ত বলে কোনও কিছু থাকতে পারে কি? (৭-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

খ. একটি নিষ্ঠুর দ্রুততায় বর্তমানে সময়ের যে প্রবাহ সে-সময়ের মধ্যে বসতি করে আমি যদি আমার ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে না পারি তাহলে আমি পৃথিবীকে কিছুই তো দিতে পারবো না। (৯-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

গ. সময়ের চৌকাঠে পা রেখে
পিছনে ফিরে তাকাবার
অবসর থাকবে না– (৩১-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

গ. আমি আমার আসক্তির

Dhaka University Institutional Repository

শেষ বিকেলে
সময়কে খোলা পাতার মতো
উড়িয়ে দেবো। (৩১-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

যে সময়ের অভিঘাত আলী আহসানের কবিমনকে পল্লবিত করেছে, সেই অভিঘাতের শিল্পায়নে সেই সময়ও কবিতায় অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। শিল্প, জীবন কিংবা স্বদেশের প্রয়োজনে যখন যেখানে তিনি অবস্থান করেছেন, সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে তিনি পঙক্তিভুক্ত করেছেন। বিদেশ ভ্রমণের নানা বৃত্তান্তে তাঁর কবিতা যেমন লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা, তেমনি স্বদেশকে অন্বেষণ ও উপলব্ধির নির্যাসকেও কবিতায় স্থান দিয়েছেন তিনি। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ে কবির উপলব্ধির কাব্যিক প্রয়াসকে আমরা বিবেচনা করতে পারি। *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যগ্রন্থে আলী আহসান যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি কবিতায় এমনভাবে ধারণ করেছেন, যা পাঠককে সেই সময়ের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এই কবিতাসমূহে স্বদেশচিন্তার স্বাক্ষর স্পষ্ট হলেও কবির কালচেতনা এতে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর যে-কোন কাব্যগ্রন্থেই আমরা কবিতার প্রসবলগ্নের পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পাব। প্রবহমাণ সময়ের স্রোতে সাঁতার কেটেও আমরা যেমন সময়ের অভিক্ষেপ ভুলে থাকি, তেমনি কবিতায় লেপ্টে থাকা সময়ের চিহ্নও প্রায়শ অস্পষ্ট এবং অধরা থেকে যায়। কিন্তু কবিতার নিবিড় পাঠে সেই সময়কেও আমরা এক রকম করে দেখে নিতে পারি। সেই সময়ে কবি যে অপার আনন্দ কিংবা অপরিসীম বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন, সেই নিমজ্জনের অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁকে কালোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় 'ব্যক্তি আমি'র উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও সমাজমানসের পরিচয় তাতে অপ্রকাশিত নয়। 'একজন কবি যখন কবিতা লিখেন তখন তিনি সমাজহিতৈষণার জন্য কবিতা লিখেন না, তিনি কবিতার জন্যই কবিতা লিখেন।'– আলী আহসানের (২০০৩খ : ১৬৬) এই মন্তব্যে কবিতার সমাজহিতৈষী ভূমিকার বিরোধিতা থাকলেও কবিতায় সমাজসম্পৃক্ততা সবসময় সচেতন প্রয়াস হিসেবে উপস্থিত হয় না। 'আমি মনে করি কবিতা কবির বিশেষ অভিপ্রায়কে বহন করে, তার চৈতন্যের দ্বারোদ্ঘাটন করবে এবং তার কুণ্ঠা ও বাস্তবতাকে প্রদর্শন করবে।'– আহসানের এই বিবেচনা সন্দেহাতীতভাবে সমর্থনযোগ্য, কিন্তু যে চৈতন্যের উন্মোচনে তাঁর কাব্যিক প্রয়াস পরিচালিত হয়, তার সঙ্গে সমাজের সংযোগসূত্র অদৃশ্য কিংবা অপ্রকাশিত হলেও অধিকাংশ সময়ই তা অবিচ্ছিন্ন থাকে। সমাজকে যদি ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব নির্মাণের সূতিকাগার বলি, তাহলে স্রষ্টার ব্যক্তিগত উপলব্ধির গভীরদেশেও সমাজের নানা অনুষঙ্গের অনুবর্তন অবশ্যম্ভাবী। 'কবিতায় ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, কল্পনা, দর্শনচিন্তা সমাজজীবনের অন্তঃসারকে আত্মস্থ করেই হয়ে ওঠে প্রাণময়, ব্যঞ্জনাময়। তাই কবি যেমন সমাজের বরপুত্র, কবিতাও তেমনি সমাজাশ্রিত চেতনার শব্দ-প্রতিধ্বনি।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৮৯ : ১৩)। আলী আহসানের কবিতার প্রধান অবলম্বন মানুষ এবং স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক মানুষ। তাই মানুষের কণ্ঠস্বরে সমাজের অন্তর্বাস্তবতাও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু সমাজকে সমাজ আকারে পাঠ করার প্রয়াস তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে। এমনকি সমাজসচেতনতা বিষয়ে স্পষ্ট কোন বক্তব্য কিংবা অবস্থান প্রকাশের বিপক্ষেই ছিলেন তিনি। কবির সমাজমানস অন্বেষণের প্রয়াসকেও তিনি ভালো চোখে দেখেন নি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'একজন কবি সমাজসচেতন কিংবা সমাজসচেতন নয়, এ অনুসন্ধানটি অর্থহীন।' (২০০৩খ : ১৫৮)। কিন্তু কবির অন্যবিধ পরিচয়ের মধ্যে তাঁর সামাজিক পরিচয় এবং কবিতায় এর প্রভাব অনুসন্ধানের মাধ্যমে কবিকেই একরকম করে পাঠ করা হয়। আমাদের বিবেচনায় সেই পাঠেরও গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে। এই উপলব্ধি সৈয়দ আলী আহসানকে তাড়িত করে নি– একথাও বলা যাবে না। তাই অন্য একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শুনি : 'একজন কবির সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।' (২০০৩খ : ১৭০)। তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যের সারবস্তু বোধকরি এই যে, কবির সামাজিক পরিচয় কবিতায় শৈল্পিক সংহতি লাভ না করলে তা কবিতার জন্য স্বাস্থ্যকর নয় এবং কবির জন্য তা কোন সুখকর বার্তা বহন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় উচ্চারিত 'আমি'র মধ্যে সর্বদাই একক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠস্বর মুদ্রিত থাকে না। আমিও কখনো কখনো একটি বিশেষ শ্রেণি, গোষ্ঠি কিংবা সমাজের প্রত্যাশা-স্বপ্ন-সম্ভাবনার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। একইভাবে একক কণ্ঠস্বরে প্রচারিত অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তি-আক্ষেপ-আর্তনাদও সমাজমানসের মর্মবেদনাকে ধারণ করতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে সেই ব্যক্তির সমাজমানসের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন অন্বেষণের চেষ্টায় কবিতার গতি ও গন্তব্যের বহুরৈখিক প্রবণতার প্রমাণ মেলে। কবিতার সরল পাঠে যে অর্থের বা ভাবের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব, সেখানে 'আমরা' শব্দের শরীরে বহুজনের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়। অবশ্য প্রেমের কবিতায় যে 'আমরা'র উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেখানে পাঠকের প্রত্যাশার সীমা দুই ব্যক্তিতে এসে ঠেকে যায়। 'সাধারণ মানুষের ইচ্ছার যন্ত্রণা নিয়ে দৃষ্টিকে শুধু সম্মুখে প্রসারিত করে প্রতিদিন কালক্ষয়' করেছেন যে কবি, তাঁর কবিতায় সমাজজীবনের সমৃদ্ধি কিংবা সার্থকতা, সংঘাত কিংবা সংকটের উপস্থিতি না থেকে পারে না। তাই আমাদের বিবেচনায়, সৈয়দ আলী আহসানের *উচ্চারণ* কাব্যের আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বহুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সন্নিহিতের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবিক ব্যবস্থাকে সমাজ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত হাজির করছি :

ক. আমরা চিত্তে যে অবস্থাকে লালন করতে চাই, আমাদের প্রতিদিনকার গতিবিধিতে তারই চরিত্র প্রতিফলিত হয়। যদি এ-সত্যকে স্বীকার করি যে আমাদের একান্ত নিভৃত ইচ্ছাতেই আমরা কখনও বেদনার্ত অথবা কখনও আনন্দিত, তা হলে বেদনা-বিস্মৃতির জন্য সহানুভূতি যাচঞা করবো না, অথবা আনন্দের সামাজিক বিস্তারের জন্য উচ্চকিত হব না। (৩-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

খ. বর্তমান পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই আত্ম-সচেতন, একপ্রকার স্পর্শহীন নিরপেক্ষতার মধ্যে আমরা বাস করি যেখানে আমাদের অভিজ্ঞতাও আমাদের নয়, যেখানে আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সকলের একজন। আমরা অন্য সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, আমি এক নেতিবাচক শূন্যতায় বিভিন্ন ঘটনা এবং কারণের শাসনে আপনাকে পরিচালিত করছি। (১৬-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

গ. কবি অনন্ত সময় এবং কালের বিস্তারের মধ্যে বাস করেন, তাই তাঁকে বেদনার অনুকম্পন আবিষ্কার করতে হয়। এ-বেদনা স্মৃতির মধ্যে যতটা বিকশিত, জীবনের বর্তমান বা ভবিষ্যতের সঙ্গে ততটা প্রবাহিত নয়। প্রভাতের অরুণশ্রীর সুন্দরতার মতো, সমস্ত প্রাচীন বেদনা কবির চিত্তে নতুন উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় জাগ্রত হয়। (৩৩-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ঘ. সমৃদ্ধির পৃথিবীতে, সমাজে নিয়মিত পথযাত্রায়, পরিমাপসহ বাক্যালাপের বন্ধ্যাত্বে এবং সহনশীলতার অভাবের নিঃস্বতায় আমরা হৃদয়কে হারিয়ে ফেলেছি। (৩৭-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ঙ. আমরা এ-পৃথিবীতে প্রকৃতি, ঘটনা, ইতিহাসের বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করি। আমাদের একাকী কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের চিন্তা ও আমাদের মানসলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের বিচিত্র প্রতিবিম্ব। কণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনি, দৃষ্টিতে গৃহীত প্রচ্ছায়া, চিন্তার জন্য চিত্তে স্মৃতির অবলম্বন– আমাদের সঙ্গে ধরিত্রীর বিভিন্ন সম্পর্কেই বিকাশ।...এ-জীবনে আমাদের যে উপার্জন তা আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কেরই সঞ্চয়। (৩৯-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা সৈয়দ আলী আহসানের সামষ্টিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ করি। ব্যক্তিমানুষের অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গে সমাজের নিবিড়সংযোগের কথাই উল্লেখ করেছেন কবি। 'আমরা অন্য সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।'– এই উচ্চারণে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার প্রতিও কবির সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্বতায় নিমগ্ন হয়ে মানুষের সমাজসম্পর্কের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা কবির বিবেচনায়, হৃদয়হীনতারই নামান্তর। 'এ-জীবনে আমাদের যে উপার্জন তা আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কেরই সঞ্চয়।'– কবির এই উপলব্ধিতে মানুষ ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। আলী আহসানের কবিতায় সমাজসম্পর্কের উল্লেখ তেমন চোখে না পড়লেও, এই সম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি।

সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় রাজনীতির উজ্জ্বল উপস্থিতি কিংবা রাজনৈতিক সক্রিয়তায় স্বস্তি বোধ করতেন না। তাই বলে কবিতার খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ থেকে তিনি রাজনীতিকে বিদায় জানান নি। তিনি উপলব্ধি করেছেন,

রাজনীতিমুক্ত জীবনের অবস্থিতি যেমন অসম্ভব, তেমনি কবিতাকেও রাজনীতিবর্জিত শিল্পমাধ্যম হিসেবে দেখার চেষ্টায় শিল্পস্রষ্টার অদূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। হুমায়ুন আজাদ যথার্থই বলেছেন, 'এখন এমন কোনো কবি পাওয়া যাবে না, যাঁর রচনা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিরহিত; স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এখন সকলের কবিতায়ই ঢোকে রাজনীতি।' (১৯৯২ : ১০৮)। কিন্তু রাজনীতি যেখানে শিল্পের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, সেখানে রাজনীতির প্রতি বিমুখ হওয়া একজন প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল কবির পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। রাজনীতিকে কবিতার সতীত্ব হরণকারী অনুষঙ্গ হিসেবে দেখার প্রয়াস নতুন নয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কবিতার বিশুদ্ধতা বিনষ্টের জন্য রাজনীতিকে দায়ী করার প্রয়াস নিরীহ কিংবা নিরপেক্ষ নয়। এই বিবেচনার পেছনেও কাজ করে এক ধরনের রাজনীতি, যাকে কবিতার রাজনীতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই রাজনীতির পেছনে ইন্ধন সরবরাহ করে শিল্প-বিষয়ক দ্বিবিধ ধারা– শিল্পের জন্য শিল্প এবং জীবনের জন্য শিল্প। সঙ্গত কারণেই আমরা সেই বিতর্কে অবতীর্ণ হব না। কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গের অবস্থিতিতে কবিতার স্বাস্থ্যহানীর কারণ বিষয়ে আমরা কবি-সমালোচক হুমায়ুন আজাদের বিবেচনা ও বিশ্লেষণকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই :

> কবি যখন বিশুদ্ধ কবিতা রচনায় বসেন, তখন তিনিই থাকেন প্রধান, অন্য কারো কথা ভাবতে হয় না তাঁকে। তিনি শুধু আপন ভাবনাবেদনা একান্ত আপনভাবে বিন্যস্ত করেন কবিতারূপী আঙ্গিকে, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কবিতা রচনার সময় আপন অন্তর জগৎ থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয় বাইরে, মুখোমুখী হতে হয় বাহ্যজগৎ ও ঘটনার, যার পাত্রপাত্রী বিশাল জনসমাজ।
>
> তপস্বীর জন্যে বন আর কবির জন্যে অন্তর খুব চমৎকার বাসস্থান, যার বদল ঘটলে স্বস্তি নষ্ট হ'তে পারে খুবই। রাজনীতি বিষয়ে কবিতা রচনার জন্যে কবিকে বাইরে আসতে হয় অন্তর্লোক থেকে, নিজেকে মেলাতে হয় জনসাধারণের সাথে। তিনি নিজের বোধের সাথে মেশান জনমণ্ডলির বোধ, বা বিশেষ শ্রেণীর কামনাবাসনা, এবং অনেক সময় নিজের বোধের ওপর চাপিয়ে দেন সমাজের দাবিকে। (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯২ : ১০৯)

সৈয়দ আলী আহসান বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার কাব্যিক অভিব্যক্তির প্রয়াসকেই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে রাজনীতি কবির অন্তর্জগতের উষ্ণতা, অস্থিরতা ও উপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত, কবিতায় সেই রাজনীতির যাতায়াতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং কবিতায় তার প্রভাব বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি যে কথা বলেছেন, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা খুবই প্রাসঙ্গিক :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে আমি এম. এন. রায়ের র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যুক্ত হই। যে দু'জন আমাকে এই রাজনৈতিক অঙ্গনে টেনে এনেছিলেন তাঁরা ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং প্রাণগোপাল পাল। মাঝে মাঝে মরহুম আবুল হাশেমের মুসলিম লীগ কর্মকাণ্ডে আমি যোগ দিয়েছি। এরপর পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি। আমার কবিতায় গৌণভাবে এগুলোর প্রভাব পড়েছে। আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং চিন্তা সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু সাহিত্য কখনও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের অস্ত্র হবে না। (২০০৩খ : ১৪২-৪৩)

ওপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটির প্রতি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই। 'রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং চিন্তাকে' 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' স্বাগত জানিয়েছেন তিনি, কিন্তু কবিতাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি অভিনন্দন জানাতে চান নি। রাজনৈতিক আচরণ ও উচ্চারণে কবিতার শৈল্পিক সংহতি বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেছেন কবি। কিন্তু এর জন্য তিনি রাজনীতিকে দায়ী করতে চান নি। কবির সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব একজন সমাজকর্মী কিংবা রাজনীতিবিদের মতো হবে না– একজন নিষ্ঠাবান শিল্পী হিসেবেই তাঁর সক্রিয়তার স্বাক্ষর রাখবেন তিনি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রগতি-কবিতার প্রবল ধারায় যাঁরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে সত্যিকার শিল্পের অবয়ব দিতে পেরেছেন, তাঁরা আলী আহসানের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি আয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করেছেন তিনি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সৈয়দ আলী আহসান কবিতা ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের ধরনটিকে যেভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তার কয়েকটি নজির এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. কবিতা একটি শিল্প। প্রেরণা, সাধনা এবং অনুশীলন ছাড়া কেউ কবি হতে পারেন না। কবিতায় রাজনীতি থাকতে পারে, কিন্তু কবিতা রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হতে পারেনা। বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক চেতনা থেকে কবিতা তৈরি হতে পারে; যেমন বিষ্ণু দে-র কবিতা অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক কোলাহল, সন্ত্রাস এবং দস্যুবৃত্তিকে অবলম্বন করে কবিতা লেখা যায় না। (২০০৩খ : ১১০)

খ. অনেকে আধুনিক সময়ের রাজনীতিতে কবিতার অধিকার আছে বলে মনে করেন। কিন্তু রাজনীতি যেখান দলগত অভিপ্রায় মাত্র, সেখানে রাজনীতির কবিতা দলীয় সংস্কারের গ্লানিতে আচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য। আমি রাজনৈতিক কবিতাকে কবিতা বলে মনে করি না। একটি পণ্ডশ্রম বলে মনে করি। (২০০৩খ : ১৫০)

গ. একটি দেশের অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সাহিত্যকে প্রভাবিত করে না কিন্তু বিশেষ কোন ঘটনা প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের দেশের রাজনীতিটা দলগত দেশগত নয়। সুতরাং দেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের কোন যোগ নেই। (২০০৩খ : ১৭৭)

ঘ. সাহিত্যের বিষয় হিসেবে রাজনীতি আসতে পারে। দলীয় রাজনীতি এবং বিশ্বরাজনীতিতে সাহিত্য আসবে। আসলে, রাজনীতির চক্রবৃত্তে মানুষের প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়ে তুললে তা-ই সাহিত্য হয়। তবে বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি চর্চা নেই বললেই চলে। প্যালেস্টাইনি সাহিত্য পড়। দেখ রাজনীতি এবং সাহিত্যের কি গাঢ় সম্পর্ক। (২০০৩খ : ২০৬)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে কবিতায় রাজনীতির উপস্থিতি বিষয়ে আলী আহসানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ সংহত ও সুস্পষ্ট। কবিতার রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন তিনি। তাই কবিতাকে তিনি রাজনৈতিক অস্ত্রের ভূমিকায় দেখতে চান না। যে রাজনীতিকে তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন তা সাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনীতি বা বিশ্বরাজনীতি নয়। দলীয় রাজনীতির কদর্য অধ্যায় সম্পর্কে একজন কবিকে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রাজনীতি কীভাবে কবিতার পুষ্টি সরবরাহে অবদান রাখতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি প্যালেস্টাইনের সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনীতি এবং সাহিত্যের সম্পর্কের প্রগাঢ়তায় শক্তিশালী কবিতা সৃষ্টি না হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি দায়ী করেছেন বাংলাদেশের সুস্থ রাজনীতি-চর্চার অভাবকে। শিল্পসাহিত্যে বিদ্রোহ কিংবা প্রতিরোধের উচ্চারণ, তাঁর মতে, জীবনের সক্ষমতা, সজীবতা কিংবা সচলতারই স্মারক। এর অভাবে জীবনে যে স্থবিরতা নেমে আসে, তা মৃত্যুরই নামান্তর। একটি দৃষ্টান্ত হাজির করা যাক :

> কেউ কোনও বিদ্রোহ ঘোষণা করে না, সব কিছুকেই নিশ্চিতে স্বীকার করে। পাথরের মতো এ-স্থবিরতা একটি জাতির ললাটে যখন নির্দেশ-পালনকারীর চিহ্ন এঁকে দেয়, তখন সে-জাতি ভাবতে ভুলে যায়, সকল প্রকার উদ্ভাবনার কৌশল হারিয়ে ফেলে। যাতনা নেই, অন্তর্দাহ নেই, বিক্ষোভের অস্থিরতা হারিয়ে নিস্তরঙ্গ সলিলে চিরকাল অবগাহন করছি। যে নির্জীব মৌনতা আমাদের গ্রাস করেছে তা আমাদের মন থেকে প্রত্যাশা সরিয়ে দিয়েছে, অভিমান সরিয়ে দিয়েছে। (২৬-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিরোধ, প্রত্যাখ্যান– এই শব্দাবলি একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠির গতি ও গন্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া অর্জিত কিংবা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আলী আহসানের কবিতায় এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার খুব বেশি না-হলেও একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। কবিতাকর্মী হিসেবে শিল্পের দাবিদাওয়ার প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছেন তিনি। শিল্পের সঙ্গে কবি জীবনের সম্পর্ক রচনার চেষ্টা করেছেন। কবিতায় জীবনের রূপায়ণ যাঁর উদ্দিষ্ট, তাঁর কবিতায় রাজনীতির উপস্থিতিও অনিবার্য। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্বাস্তবতার সঙ্গে বহির্বাস্তবতার বিরোধ কিংবা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই তাঁর মনোজগতে সৃষ্টির বেদনা জেগে ওঠে। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা সেই বেদনারই আনন্দময় নান্দনিক উপস্থাপন। তাই সেখানে কখনো সতর্কভাবে, আবার কখনো অতর্কিতে সময়-সমাজ-রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বিচিত্র বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

মধ্যবিত্ত মন

সৈয়দ আলী আহসান যে কালখণ্ডে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেই কালখণ্ড ঐতিহাসিক কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দকে শ্রেণিসচেতনতায় সপ্রতিভ করে তুলেছিল। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক

দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কবিতা রচনার মাধ্যমে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তার ঢেউ আলী আহসানের হৃদয়কে স্পর্শ করলেও, কবি হিসেবে তিনি সেই শ্রেণিসংগ্রামের সাহিত্যিক প্রয়াসকে স্বাগত জানান নি। তিরিশের কবিদের প্রদর্শিত পথেই তাঁর শিল্পযাত্রা, যদিও জীবনদর্শন এবং শিল্পস্বভাবের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত অবয়ব নির্মাণে তৎপর ছিলেন তিনি। যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, তাতে অনিবার্যভাবেই প্রতিভাসিত হয়েছে স্বকালের কণ্ঠস্বর। তাই নির্মিত শিল্পদর্শনেও শিল্পীর জন্মলগ্নের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার কিছু চিহ্ন থাকার কথা, যা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য এবং অমোছনীয়। 'আমি রাজনৈতিক কবিতাকে কবিতা বলে মনে করি না।'– আলী আহসানের এই উচ্চারণে কবিতাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা স্পষ্ট হলেও, কবিতার রাজনীতি বিষয়ে তাঁর অবস্থান কিংবা অভিজ্ঞান কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল না। 'আমি সাধারণ মানুষের একজন হয়ে, তাদের সৌভাগ্য এবং বিনয়ে, তাদের অসহায়তা এবং শ্রমে তাদেরই একজন হতে চেয়েছি।'– আলী আহসানের (২০০৩ক : ৫৯) এই উচ্চারণে সবাইকে, বিশেষ করে শোষিত শ্রমজীবী মানুষকে আপন করে নিয়ে তাদের একজন হয়ে ওঠার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। যদিও তিনি বলেছেন, 'হতে চাওয়া আর যথার্থ হওয়া অন্য কথা'। হতে না-পারার কারণ হিসেবে মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংগ্রামে অংশ নিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের দিন বদলের মিছিলে যোগ দেন নি তিনি, কিন্তু শিল্পকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে জীবনের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনীয়তাকে কবিতায় ধারণ করতে কুণ্ঠিত হন নি তিনি। তাই শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আলী আহসানের শিল্পকর্মে তার কিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলা প্রগতি-কবিতার যাঁরা উজ্জ্বল অবতার, তাঁদের কারো কারো কবিতার বৈষয়িক সংহতি এবং শৈল্পিক ঋদ্ধির প্রশংসা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। 'বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক চেতনা থেকে কবিতা তৈরি হতে পারে; যেমন বিষ্ণু দে-র কবিতা অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।'– আলী আহসানের এই মন্তব্যে সাম্যবাদী চেতনাপুষ্ট সফল কবিতার প্রতি সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর প্রিয় কবি টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস; প্রিয় ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি, জেমস জয়েস-এর সঙ্গে দুইজন বাঙালি লেখকের নাম করেছেন– অজিত দত্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। আলী আহসানের ভাষায় : 'বাংলা ভাষার যে কজন কবি পরিচয়ের বৃত্তে এসেছিলাম তাঁরা হচ্ছেন অজিত দত্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা উভয়েই নম্রতায় এবং সৌজন্যে আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্নের পৃথিবীতে সাময়িকভাবে মুগ্ধতার যে নির্মিতি অজিত দত্তের কবিতায় তার একটি সুন্দর পরিচয় পেয়েছিলাম।' (২০০৩খ : ৯৯)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়ও আমরা মধ্যবিত্তের সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতার রূপায়ণ লক্ষ করি। কবিতায় মধ্যবিত্তের জীবনযাপন এবং সংগ্রামের রূপায়ণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। আহসানের প্রিয় কবিদের তালিকায় যাঁদের নাম যুক্ত হতে দেখি, তাতে বোঝা যায় মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট ছিল না। যদিও প্রগতি-কবিতায় যে অর্থে সাম্যবাদী চেতনা প্রচার, প্রসার এবং কার্যকর করার প্রয়াস দেখা যায়, সৈয়দ আলী আহসান সেই অর্থে সাম্যবাদকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু এই চেতনার প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থে মগ্ন থাকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন কবি। যে রীতিনীতি ও বিধিবিধান মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে, তা প্রত্যাখ্যানের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, স্বার্থপরতায় মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়। তাই তিনি এমন কোন কাজকে সমর্থন করেন না যা অন্যের জীবন ও সম্পদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাঁর এই অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই সাম্যবাদী চেতনাপুষ্ট নয়, মানবিক মূল্যবোধ এবং শৈল্পিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি এই বোধে অভিসিক্ত। 'আমাদের স্বকালের মানবসংস্থা হিসেবে আমাদের স্বজাতির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আলী আহসান সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে অক্ষম, অসহায় ও যাঞ্চাতুর আর্তনাদে ফেটে পড়া তাঁর রুচি ও মেজাজ অনুযায়ীই সম্ভব নয়– অভিজাত মনের এই ন্যূনতম অহঙ্কার তাঁরও আছে। তিনি বরং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বদেশের মানুষগুলোর সম্পূর্ণতা ও উন্নতিবিধানের উপায় নির্ধারন করতে চেয়েছেন পরোক্ষে।' (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৪ : ৪৮৮)। স্বকালের স্বদেশ ও মানুষের কল্যাণবোধে ঋদ্ধ ছিলেন আলী আহসান কিন্তু এই বোধ কার্যকর করার জন্য যে সক্রিয়তা প্রয়োজন, আমাদের মধ্যবিত্তের শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মধ্যেও এর অভাব বরাবরই লক্ষ করা গেছে। স্বার্থসর্বস্ব মানুষের

বিরুদ্ধে কবির এই অবস্থানকে সেই অর্থে মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ ও সুবিধাবাদী আচরণের বিপক্ষে– একথা বলা যেতে পারে। যদিও মধ্যবিত্ত শব্দটির ব্যবহার করেন না তিনি, কিন্তু চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তিনি এই শ্রেণিকেই সংশোধন করতে চান। তাঁর কাব্যিক প্রয়াস প্রকৃত অর্থে কবির আত্মশুদ্ধির অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত। ব্যক্তিগত জীবনে এবং কবিজীবনের সকল প্রয়াসকে সামনে রেখে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই একজন সক্রিয় সদস্য। তাই তাঁর আত্মশুদ্ধির প্রয়াসকে মধ্যবিত্তের প্রকৃত পথনির্দেশের অভিপ্রায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। আলী আহসানের *উচ্চারণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপন করছি :

ক. ধর্মের অনুশাসনকে দুর্বলের অনুরাগ বলে উড়িয়ে দিয়ে, সমাজের অকুশল নিষ্ঠুরতাকে নির্দয় ব্যবস্থা ভেবে, চিত্তের অনুরাগকে জীবনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের পরাগ করতে চাই। (৩৫-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

খ. মানুষ যখন নিষ্ঠুর হয় তখন সে মিথ্যাকে গ্রহণ করে, যখন সে স্বার্থপর হয়ে অন্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তখন সে পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবমাননা ঘটায়। তখন জীবনের যথাতথ্যকে অস্বীকার করে কর্মানুবন্ধনকে শিথিল করে যে-জীবনকে সে নির্মাণ করে সে-জীবনে জীবনের অস্বীকার আছে, অঙ্গীকার নেই। (৩৯-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

গ. আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বার্থপ্রতিষ্ঠা নয় অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠার নামে কত মানুষ নিশ্চিত অবিচলতায় অন্যের ক্ষতি সাধন করছে। সকলেই প্রায় ভাবে, জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব পাবার উপায় হল অন্যের প্রতিষ্ঠাকে ভিত্তিহীন করানো। সমমর্যাদার এবং সম্ভব হলে অধিকতর মর্যাদার সকলকে কৌশল ও কপটতায় ক্ষেত্রচ্যুত করতে পারলে যেন স্বস্তি পাওয়া যায়, এমন একটি চিন্তা অনেকের মনেই বাস করে। সুতরাং অধিকার লাভের জন্য জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনের কঠিন পথে না চলে অন্যের অধিকারকে অপহরণ করবার একটি মলিন কর্মে প্রায় সকলেই নিযুক্ত। জীর্ণ আবরণের মতো কল্যাণ-বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে, অসুস্থ মানসিকতায় মানুষের সহায়তার জন্য অগ্রসর না হয়ে, শুধু স্বার্থ-চেতনায় পথ-চলায় বিপদ আছে। তখন আনন্দকে আড়াল করে একটি গ্লানি ও অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করবো, যেখানে কেবলমাত্র অনুভূতিহীন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিপাতের স্বাক্ষর আছে। (৪০-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ঘ. মহৎ শিল্পী তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা জীবনের প্রতিটি বিরাট সমস্যার সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তাঁরা সকলের সঙ্গে এক হয়ে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন...। (৫২-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আলী আহসান স্বার্থমগ্নতা এবং সুবিধাবাদী বিবেচনার বিপক্ষে তাঁর অবস্থানের কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন কবি। যে সামাজিক বিত্তের মধ্যে আমরা বেড়ে উঠি, তাতে বহুমাত্রিক নিষ্ঠুরতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি এই নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা পরিহার করে চিত্তের বিশুদ্ধ বিকাশকেই অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতি-খ স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে কবির অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরায়। ব্যক্তিগত বিবরে বাস করে ব্যক্তিস্বার্থে নিমজ্জিত হলে জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না। কবি বিশ্বাস করেন, মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের বেদনা ও বিপর্যয়ের সঙ্গী হলেই মানুষের বেঁচে থাকা সার্থক হতে পারে। গ-সংখ্যক উদাহরণের মূল্য বক্তব্যও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। আত্মপ্রতিষ্ঠার নামে অন্যের ক্ষতিসাধনের হীন প্রবৃত্তি থেকে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা হারিয়ে ফেলে। 'শুধু স্বার্থ-চেতনায় পথ-চলায় বিপদ আছে।'– আলী আহসানের এই মন্তব্যে দুঃসময়ে মানুষের পাশে না-দাঁড়ানোর মতো বিমানবিক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে।

আলী আহসান জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বিত্তের প্রতি প্রলুব্ধ ছিলেন না। ঐশ্বর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন নি তিনি। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমার মা জন্মসূত্রে বিপুল বিত্তের অধিকারী ছিলেন। মায়ের বড় এক ভাই এবং এক বোন ছিলেন। শৈশবে ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং বড় বোন দুটি সন্তান রেখে অল্প বয়সে মারা যান।' (২০০৩ক : ৬০)। বিধিমতে, আহসানের মা সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হওয়া সত্ত্বেও এই বিপুল সম্পদের মোহ ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে স্বামীর কর্মস্থলে চলে আসেন। আহসান বলেছেন, 'বাবা দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং আমার মায়ের তুলনায় তার কোন ঐশ্বর্য ছিল না বললেই হয়। মা আমার বাবার শূন্য সংসারে এসে সে সংসারকেই জীবনের অনুকূল করে তোলেন।' (২০০৩ক : ৬০)। বিত্তের প্রতাপ কখনোই আলী

আহসান অনুভব করেন নি। কিন্তু বিত্তবানদের অমানবিক কর্মকাণ্ডে হতাশ হতেন তিনি। কখনো কখনো তিনি এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন। তিনি এমন সমাজের কথা বলেছেন, যেখানে মানুষের মূল্যবোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটবে এবং কোন মানুষের অধিকার কিংবা স্বার্থ অন্যের হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত হবে না। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই তিনি মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছেন এবং মানুষের অধিকারকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার চল্লিশের কবিতার প্রধান প্রবণতাকে সামনে রেখে তাঁর এই স্বপ্ন কিংবা প্রত্যাশাকে কালধর্মের প্রভাব বলাও বোধকরি অসঙ্গত হবে না।

উদ্বাস্তুবোধ

আধুনিক যন্ত্রনির্ভর এবং পুঁজিশাসিত জীবনবাস্তবতায় ঘরের সঙ্গে মানুষের সংযোগহীনতার বিচিত্র কারণ বিদ্যমান। কিন্তু শিল্পসাহিত্যে আমরা যে উদ্বাস্তুবোধের প্রকাশ লক্ষ করি, তার কারণ সব সময় স্পষ্ট নয়। এমনকি কারণহীন উদ্বাস্তুবোধের বহিঃপ্রকাশও শিল্পের নানা শাখায় লক্ষ করা যায়। সৃজনশীল এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষ অকারণ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়, বলা যায় বিষণ্ণতাকে যত্নের সঙ্গে লালন করতেও ভালোবাসেন কেউ কেউ। এই বিষণ্ণতার ঢেউ মানুষকে যে বিরান প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, সেখানে ঘর নেই, ঘরের স্বপ্ন কিংবা সম্ভাবনাও নেই। বিষণ্ণতা থেকেই মানবমনে জন্ম নেয় নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গ নীড়েরই আরেক নাম হয়তো ঘরহীনতা। মানুষ যে-রকম একটি ঘরের মধ্যে অসংখ্য ঘরের অস্তিত্ব অনুভব করে, সেইভাবে অগণিত গৃহের আহ্বানকে উপেক্ষা করে শূন্যতার দিকে ধাবিত হয়েও স্বস্তিবোধ করে কখনো কখনো। সৈয়দ আলী আহসানও অকারণ নিঃসঙ্গতা কিংবা বিষণ্ণতার হাত ধরে ঘর ছেড়েছেন। এই ঘরছাড়ার আনন্দ কিংবা বেদনার যে রূপায়ণ আমরা তাঁর কবিতায় লক্ষ করি, সেখানে উদ্বাস্তুবোধের প্রকাশও অস্পষ্ট নয়।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় উদ্বাস্তুবোধের অনুকূল অনুষঙ্গ অস্তিত্বহীনতা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা, গন্তব্যহীনতা ইত্যাদির উল্লেখ পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। এইসব প্রসঙ্গ কখনো কখনো নেতিচিন্তার উন্মোচক হিসেবে উপস্থিত, আবার কখনো তা কবির সৃজনপ্রতিভার সহায়ক বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। অনিকেত-ভাবনার বিচ্ছুরণ তাঁর কবিতায় অভিনন্দিত হলেও, তাঁর সৃষ্টির আনন্দকে উসকে দেয় যে গভীরতর বেদনা, এর সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে তিনি সচেতন। জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্বের গহ্বর থেকে উঠে আসে যে বিচ্ছিন্নতা, তাকে উপেক্ষা কিংবা আড়াল করার মধ্যে মানুষের প্রতারক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে বলেই মনে করেন কবি। তাই তাঁর কবিতায় বিম্বিত উদ্বাস্তুবোধের উল্টোপিঠে সুস্থ সুন্দর ও আলোকিত জীবনের অনুভব স্পষ্ট। কষ্টের কষ্টিপাথরে তিনি জীবনের যাথার্থ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা যাক :

ক. অকস্মাৎ একদিন নিঃসঙ্গ একাকী আমি
স্বপ্ন ভুলিলাম
তোমার দীপ্তির রাগ কোথায় মিলালো! ('একাকী'/*অনেক আকাশ*)

খ. একাকী হাসিয়া উঠি বিষণ্ণ বাতাসে। ('তোমার মৃত্যুর শেষে'/*অনেক আকাশ*)

গ. দিগন্ত-বিস্তৃত-শূন্য নির্বিকার উদাসীন দেশ,
নির্বিকার সমভাবে সঙ্কটে, বিলয়ে, কভু
উচ্ছ্বাসে বা কখনো মৃত্যুতে। ('সিন্ধুর মরুমধ্যে'/*অনেক আকাশ*)

ঘ. নিদ্রাহীন রাত্রে কভু এক হাতে দরজা খুলেছি
হঠাৎ হাওয়ায় আমি শূন্যঘর কাঁপতে দেখেছি। ('সঙ্কেত'/*অনেক আকাশ*)

ঙ. দৃষ্টিতে জাগ্রত তাঁর সমস্ত পৃথিবী, তবু অনস্তিত্বে লীন
অনির্ণেয় রূপ তার মৃত্যুক্লিন্ন মানুষের হৃদয়ের তীরে– ('প্রমাণ'/*অনেক আকাশ*)

চ. বিদেশে আজ আমার জন্মদিন
সংসার-বন্ধনে নিশ্চিন্ত অবকাশ-বিহীন

গোত্রহীন আমি একা। এই দিনে এ-জীবন
রাত্রির নিবিড়ে আনে নাই কোনই স্মরণ ॥ ('চিঠি'/*অনেক আকাশ*)

ছ. তুমি আমাকে হৃদয় দিয়েছ
যে-হৃদয় জাগলো অনেক
অন্ধকার রাত্রে
অস্পষ্ট কুয়াশায় একাকী যাত্রীর মতো ॥ ('হৃদয়– দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

জ. তখন তোমার চিন্তা সঙ্গীহীন পাখির ডানায়
সমুদ্রের জলে ভিজে অকস্মাৎ আমারে জাগালো ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঝ. সমস্ত অধিকার-লিপ্সা থেকে মুক্ত
না স্বর্গের না কোনো কিছুর
ভালোবাসার আশ্রয় থেকেও ('ভাবনাগুলো : এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঞ. আমার হৃদয় একাকী তারার মতো
আকাশের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সুকুমার ('ভাবনাগুলো : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ট. তখন তাদের নিশ্চিন্ততায় আমি
দেখি একাকীত্বের উজ্জীবন
আমি তাই আশ্চর্যরূপে একাকী। ('একাকী'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঠ. আর আমার একাকী বিসর্জিত দেহ
আকুল হয় আকাশকে পাবার জন্য ॥ ('প্রার্থনা'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ড. একাকী আমার আশা-নিরাশায়
প্রাচীন কাব্য স্মরণীয় ॥ (১১-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার আবহ-সঞ্চারী কাব্যপঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত আরো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আলী আহসানের নৈঃসঙ্গ্যচেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব। এই নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা থেকেই তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে উদ্বাস্তুবোধ। কোন কোন উদ্ধৃতিতে নিঃসঙ্গতা কিংবা বিচ্ছিন্নতাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন কবি। কিন্তু এই উপভোগের আনন্দের ভাঁজে ভাঁজে জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্তি কিংবা নৈরাশ্যের বেদনাও ধরা পড়েছে। জীবনের প্রতি গভীর মমত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও এই বিরহ কিংবা বিষণ্নতাকে পাঠ করা যায়। কিন্তু এই মমত্বের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘশ্বাসকে তিনি যখন কাব্যে রূপায়ণের চেষ্টা করেন, তা থেকে আমরা কবির বাস্তুহীনতার হাহাকারও মূর্ত হতে দেখি।

সৈয়দ আলী আহসানের অনেক কবিতায়ই আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাই যা প্রকৃত অর্থে উদ্বাস্তুবোধেরই স্মারক। মৃত্যু রবীন্দ্রসাহিত্যে যে আরাম, সৌন্দর্য কিংবা সমৃদ্ধির আবহ সঞ্চার করে, আলী আহসানের কবিতায় সেই মৃত্যুর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনেরই অন্যরকম উন্মোচন কিংবা অবলোকন হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু আহসানের কাছে মৃত্যু মানে জীবনের জরুরি ও যৌক্তিক দাবিসমূহের অসম্পূর্ণতা কিংবা অস্বীকৃতি। এই মৃত্যুবোধ তাঁকে আশ্রয়হীন ও অবলম্বনশূন্য হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই তাঁর মৃত্যুচিন্তা-আশ্রয়ী কবিতায় আমরা কবির উদ্বাস্তুবোধের বেদনা মুদ্রিত হতে দেখি। এই বেদনাকে উদ্‌যাপনের চেষ্টা করেছেন কবি, কিন্তু এই উদ্‌যাপনের আড়ালে গন্তব্যহীন যাপিত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার ছায়াপাত পাঠককে আচ্ছন্ন করে। আমাদের বিবেচনায় এই আচ্ছন্নতা আশ্রয়হীনতার জঠর থেকে উৎসারিত। মৃত্যু-প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত এবং মৃত্যুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রণীত কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. তোমার মৃত্যুর শেষে অন্ধকার
উচ্চকিত হ'ল ('তোমার মৃত্যুর শেষে'/*অনেক আকাশ*)

খ. মোহিত যৌবন আজ উচ্চকণ্ঠে মৃত্যুকামী যেন
নির্যাতিত দেহ-মূল– অন্ধকার হঠাৎ লোলুপ। ('নায়িকা : তিন'/*অনেক আকাশ*)

গ. এখানে মলিন মৃত্যু উদ্ভ্রান্ত জীবনের শেষ
তোমার দেহের প্রান্ত একমাত্র বাঁচবার দেশ। (‘তোমার দেহের তীরে’/*অনেক আকাশ*)

ঘ. ভালোবাসবার মৃত্যু– পরিচিত নীবি উন্মোচন?
অথবা নতুন নারী অনাস্বাদ জড়িত যেখানে? (‘নূতন স্বাদ’/*অনেক আকাশ*)

ঙ. আমি এই যাত্রাপথে জীবন না মৃত্যুতে অধীর?
নিঃসংশয় যাত্রা শুরু ঊর্ধলোকে আরও বহু দূরে ॥ (‘আর ঊর্ধে, আরও দূরে’/*অনেক আকাশ*)

চ. অসম্ভব নির্যাতনে আমি মৃত্যুকেই
সত্য মানলাম ॥ (‘হৃদয়– এক’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ছ. তোমকে দিলাম জন্মের সাথে
মৃত্যুর অভিচার (‘তোমাকে দিলাম’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

জ. মৃত্যুর নিদ্রার মতো শঙ্কিত অতলে
আমার প্রহরগুলি মোম হ’য়ে গলে (‘ঈদ’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঝ. আমি আশ্চর্যরূপে একাকী
সংসারের সাহিত্যে কোনোদিন
নায়ক হ’লাম না
কর্মে সর্বমুক্ত জটিলতায় অনুপস্থিত
আনন্দের সূর্য বা বেদনার রাত্রি হ’লাম না
কাল এবং পরিসরের বিস্তারে
একাকী একটি তারার মতো
অপরিসীম আকাশের নিমগ্নতায়
মৃত্যুর নিশ্চিন্ততায় অমোঘ (‘একাকী’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঞ. তুমি জেগে থাকো সর্বসময়
চেতনা হারাই আমি তো একা,
ঘুমের বিলোপে অবচেতনায়
মৃত্যুর সাথে হঠাৎ দেখা ॥ (১৭-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা কবির উপলব্ধির যে প্রান্তের কাব্যিক সংহতি লক্ষ করি, তাতে জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ স্পষ্ট। এই ভালোবাসার উষ্ণতা কবিকে মনে করিয়ে দেয় প্রেমহীন জীবনের অন্তহীন বেদনার কথা এবং তিনি ভোলেন না, মৃত্যুর শীতল হাত একদিন কবিকে স্পর্শ করবে। সেই স্পর্শের বেদনা কবির অন্তর্গত নীড়ের স্নিগ্ধতাকে ম্লান করে দিতে চায়। কবি চান ঘরের সঙ্গে বিচ্ছেদ–অযোগ্য সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ থাকতে, কিন্তু বাস্তবের বিচিত্র অভিঘাত তাঁকে মনে করিয়ে দেয়, এ অসম্ভব। সেই ‘অসম্ভবের পাথার পেরিয়ে’ জীবনের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান অনুভব করেন, নির্ভরতার প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতিসমূহের সারা গায়ে অজস্র ফাটল, যেখানে জন্ম নেয় ঘরহীন, গতিচ্যুত ও গন্তব্যরহিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস।

ধর্মীয় অনুষঙ্গ

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের অনুবর্তন পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতিতে কবিতার বলিষ্ঠতা যুক্ত হতে পারে বলে মনে করিন তিনি। আলী আহসান বলেছেন, ‘ধর্মীয় আবেগ কবিতাকে অনেক সময় বলিষ্ঠ করে। ধর্মীয় আবেগের প্রেরণায় মহৎ কবিতাও হতে পারে। ধর্মীয় আবেগের উচ্ছলতায় কবিতার একটা ভাবাবহও নির্মিত হতে পারে।’ (১৯৬৯ : ২৫)। উদাহরণ হিসেবে কবি ইংরেজি কবিতার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন, উল্লেখ করেছেন টি এস এলিয়ট এবং এডিথ সিটওয়েলের কথা বলেছেন, কারণ আধুনিকতার যাবতীয় অনুষঙ্গের নিবিড় পরিচর্যা সত্ত্বেও ‘জীবন সম্পর্কে যে বিশ্বাসের দ্বারা এঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সে বিশ্বাস হচ্ছে ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে প্রগাঢ়তম উপলব্ধির পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন সে উপলব্ধি জেগেছিল এই কারণে যে, তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ের গ্রন্থ প্রচুর পাঠ করেছেন।’ আলী আহসান ইসলাম ধর্মের প্রতি

গভীর অনুরাগবশত প্রচুর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্মে তার প্রভাবও লক্ষ্যযোগ্য। শিল্পস্রষ্টা হিসেবে এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থানও খুবই স্পষ্ট। কবির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতা মুখ্যত ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আশ্রয়েই শিল্পরূপ পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর উন্মেষ-পর্বের কবিতাবলিকে কাব্যসমগ্রের অন্তর্ভুক্ত না করলেও আমাদের বিবেচনায় এই সৃষ্টিকর্মের ভেতর দিয়ে কবির মানসগঠন ও শিল্পবোধের ব্যাকরণটি স্পষ্ট হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে আহসান *কাব্য-সমগ্রের* ভূমিকায় বলেছেন :

> একসময় অর্থাৎ আমার কাব্য-কর্মের সূত্রপাতে আামি ইসলামী বিষয় অবলম্বন করে কবিতা লিখবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। ইসলামী বিষয় অর্থাৎ উন্মেষ যুগের ইসলামের ভাবাবহ। এই ভাবাবহকে কবিতার শব্দের মাধ্যমে প্রকাশমান করবার জন্য প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু পারিবারিক সূত্রে আরবী-ফারসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকলেও ব্যক্তিগত শিক্ষাকর্মের মধ্যে আরবী-ফারসীর উপর আমার কোনও অধিকার জন্মায়নি। তাই মূলতঃ আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনি-মাধুর্যে সচকিত হয়ে আমি কিছুসংখ্যক কবিতা লিখেছিলাম। কিন্তু বিদেশী শব্দগুলো আমার কবিতায় নতুন তাৎপর্যে বহমান হয়নি, উপরন্তু শব্দগুলোর নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি। তাই সে সময়কার কবিতাগুলো আমি পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহণ করিনি। ...ইসলামী বিষয়ক কবিতা আমি লিখেছিলাম আমার ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সকালের মধ্যে। সে সময়কার সর্বশেষ সাহিত্য প্রয়াস আমার ছিল দোভাষী পুঁথি অবলম্বন করে লেখা 'চাহার দরবেশ' কবিতা। এই কবিতার ক্ষেত্রে আমি আধুনিক কালকে আমার বিবেচনায় আনবার চেষ্টা করেছিলাম। (১৯৭৪ : ১৫-১৬)

উন্মেষ–লগ্নের অসম্পন্নতার স্মারক হিসেবে এ পর্যায়ের কবিতাসমূহ কবির *রচনা-সমগ্রের* অন্তর্গত না হলেও এ সম্পর্কে সাঈদ-উর রহমানের মত হচ্ছে, আলী আহসানকে অনুধাবনের জন্য ঐ অবহেলিত প্রয়াসকেও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন, কারণ ঐগুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে সেকালের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সন্ধান কিছুটা পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, 'কবিতাগুলো প্রধানত ইসলাম বিষয়ক। বিভিন্ন ইসলামী উপকথাকে অবলম্বন করে তিনি সেকালে বাংলা সাহিত্যের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।' (২০০১ : ১৮১)। আলী আহসানের কবিতায় ইসলামী ভাবাবহের অনুরণন কিংবা আররি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কেবল তাঁর পারিবারিক ধর্মীয় পরিমণ্ডলের প্রতিফল– একথা সর্বৈব সত্য নয়। জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক-বিষয়ে যিনি অতি সচেতন তাঁর কবিতার জীবনবিচ্ছিন্ন পাঠ স্বাস্থ্যকর হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স একজন শিল্পস্রষ্টার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা মনে করি। তাই এ সময়ের শিল্পকর্মকে স্বীকৃতি না দেওয়া কিংবা গ্রন্থভুক্ত না করার মধ্যে কবির সাহিত্যিক রাজনীতির আভাস খুবই স্পষ্ট। কেবল কবিতায় কেন, গদ্যেও তিনি ইসলামী আদর্শের আত্তীকরণকে ইতিবাচক অর্থেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এর পরিচর্যায়ও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে কবি মৌলবাদী কি-না এর জবাবে কবি বলেছেন, তিনি কোনবিচারেই মৌলবাদী নন, কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসকে গভীরভাবে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ধর্ম-বিষয়ে সচেতনতা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং এই সচেতনতার জন্য তিনি মুসলমানকে কোরআন পাঠের পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : 'আমার নিজের জীবনে আমি সকল ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। ইসলামের বাইরে যে ধর্ম বিষয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছি তা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। আমার বিভিন্ন গদ্য রচনার মধ্যে এবং কবিতাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।...সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোরআন শরীফ হচ্ছে আমার জীবনের পথ নির্দেশক এবং আমার সাহিত্যকর্মের প্রেরণা।' (২০০৩খ : ৬৭)। জীবন ও সাহিত্যকর্মের প্রেরণা যার ধর্মগ্রন্থ, তাঁর কবিতায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ কোন অর্থেই আরোপিত নয়। তাই ধর্মাশ্রয়ী কবিতাবলি বর্জন করে গ্রথিত কাব্যসমগ্রে আহসানের সামগ্রিক সাহিত্যিক অবয়বটি মুদ্রিত হওয়াও অসম্ভব। 'সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তানে নতুন ধারার সাহিত্যের উপাদান হিসেবে পুথি সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিৎ সামনে রেখে তিনি সাহিত্যকে এই ধারায় পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।' (নিতাই দাস ১৯৯৩ : ২০৮)। এই ধারায় রচিত *চাহার দরবেশে* কবি পুরাতন কাহিনীর আদলে তাঁর স্বকালের পরাধীন বাংলার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় অনুষঙ্গে নির্মিত *চাহার দরবেশ*-এর স্রষ্টা হিসেবে তিনি কখনো সঙ্কোচ বোধ করেছেন

বলে মনে হয় না। অন্য একটি সাক্ষাৎকারে এই গ্রন্থ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'সেই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে একটি কথা বুঝা যায় যে, আমরা ইসলামের কথা বললেও আমাদের সামনে যে হিন্দু লেখকরা ছিলেন তারা এগুলো অস্বীকার করতে পারেননি। তারাও গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলাম। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে আস্তিক্যবাদকে তুলে ধরবার জন্য।' (২০০৩খ : ১৪)। কবির স্বকালের হিন্দু শিল্পস্রষ্টাদের কাছেও যা সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল, সেই কবিতাবলিই যখন তার স্রষ্টার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়, তখন বোঝা যায় কবি হয়ে ওঠার পথে ধর্মের অনুবর্তনকে তিনি প্রতিবন্ধকতা হিসেবেই দেখেছেন। আবার সমগ্র জীবনের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পৃক্ততার কারণে সেই সম্মোহন থেকেও তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। কবির প্রাথমিক কাব্যরূপ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আশরাফ কবিতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গের উপস্থিতিকে স্বাগত না জানালেও তিনি দাবি করেছেন, আলী আহসান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমসাময়িকতার উর্ধে উঠতে পেরেছেন। আলী আহসান 'সাময়িক সমাজচেতনার অন্তরীক্ষে যে চিরন্তন ভাববোধ সক্রিয় রয়েছে তার সন্ধান পেয়েছেন' বলে মত দিয়েছেন তিনি। 'কবি তখনই সত্যিকার কাব্য রচনা করেন যখন তিনি সাময়িক ঘটনাবলীর ভিতরে প্রবিষ্ঠ হয়ে তার মধ্য থেকে যে চিরন্তন মানবিক সত্যের বিকাশ হয় তার সন্ধান পান এবং কাব্যে তা বিধৃত করে প্রকাশ করতে পারেন।'– সৈয়দ আলী আশরাফের (১৯৮৫ : ২৬৭) এই বিবেচনা যৌক্তিক বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু আলী আহসানের কবিতায় 'ইসলামী ভাবধারার উৎসমূল' কেবল 'সাময়িক সমাজচেতনা' থেকে উৎসারিত– এই মন্তব্যে সায় দেওয়া কঠিন। আলী আহসানের কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা-শেষে এই ক্ষেত্রে কবির অবদানকে অনুধাবনের তিনটি সূত্র নির্দেশ করেছেন সৈয়দ আলী আশরাফ : ক. ফজলুল হক হলে ছাত্র সংসদের আয়োজনে মুসলমানেরদের তমদ্দুনকে হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র উল্লেখ করে মুসলমানের ঐতিহ্যকে শিল্পে সংস্থাপনের পরামর্শ দিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য প্রদান, খ. ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দকে তৎপর হওয়ার আহ্বান, এবং গ. ভাষার শরীরেও মুসলমানিত্ব আরোপের প্রয়োজনে আরবি-ফারসি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং পুথির রূপকল্পকে আধুনিক অবয়বে উপস্থাপনের প্রয়াস। (১৯৮৫ : ২৭০)। এই সূত্র-নির্দেশে কবির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির স্বরূপ যথার্থভাবেই চিহ্নিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সৈয়দ আলী আহসানের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার মতো না হলেও বিশ শতকের চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক উত্তাপ তাঁর শরীরে লেগেছে এবং তা কবির মনের রসায়নকেও বদলে দিয়েছে। মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগণের যে আহ্বান উচ্চারিত হয়েছিল, আলী আহসানের তরুণ মন তাতে প্রাণিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ফররুখ আহমদের ভূমিকাও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জানিয়েছেন, মুসলিম ঐতিহ্য এবং ইসলামী আদর্শে কাব্য রচনার প্রেরণাসঞ্চারে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় অনুসন্ধানের আহ্বানে সৈয়দ আলী আহসানের আত্মদান উল্লেখ করার মতো। (১৩৭২ : ২০৯)। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পাকিস্তানি দেশপ্রেমে প্রাণিত হয়ে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন অনেক কবি। সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তান আন্দোলনের ধারায় আত্মনিবেদিত কবিবৃন্দের মিছিলে আন্তরিকভাবেই যুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামী আদর্শ ও দেশপ্রেমকে এই ফ্রেমে বেঁধে নতুন ধরনের কবিতা রচনায় মন দিয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তানি সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হবে তার যে ইশতেহার তৈরি করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান এবং ফররুখ আহমদ, তা থেকে সেই সময়ের সাহিত্যকর্মীদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অনুধাবন করা যাবে। সৈয়দ আলী আহসানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকেই সেই ইশতেহারের মূল কথাগুলো উপস্থাপন করছি :

ক. বাঙালি মুসলমানদের সংসার অর্থাৎ সমাজ জীবনে যে সমস্ত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে।

খ. আমাদের গ্রামীণ জীবনে অর্থাৎ লোক-জীবনে যে সমস্ত লোককাহিনী প্রচলিত আছে অথবা লোকসংস্কার, সেগুলোকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য নির্মাণের প্রয়াস পেতে হবে।

গ. দোভাষী পুঁথি যেগুলো এখনও গ্রামবাংলার মানুষকে প্রভাবিত করে এবং গৃহে গৃহে পঠিত হয় সেই দোভাষী পুঁথি অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।

ঘ. ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. বাঙালি মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবন-আকাঙ্ক্ষা এবং চৈতন্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। (২০০৩ক : ১৮)

এই ইস্তেহারেই ধর্মশাসিত দেশপ্রেম এবং পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের মন জোগাতে গিয়ে আলী আহসান রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম বর্জনের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই বক্তব্য সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ব্যাখ্যা এইরকম : 'সম্ভবত তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানের প্রতি আমাদের যে উত্তাল যুক্তিহীন আবেগ ছিল সে আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিতর্কিত কথাগুলো লেখা হয়েছিল। কথাগুলো এই পাকিস্তানের আদর্শ এবং সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকব।' (২০০৩ক : ১৮)। এই বক্তব্য পরবর্তীকালে তাঁর জন্য 'কাল হয়' বলে স্বীকার করেছেন তিনি। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করেন নি আহসান, বরং রবীন্দ্রসাহিত্যের রহস্যোদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছেন। সেইসঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তি এবং চৈতন্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে সমাজজীবনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ, লোকজীবন-লোককাহিনি পুনরুজ্জীবনের সাহিত্যিক প্রয়াস, দোভাষী পুথি অবলম্বনে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণের ধারার সঙ্গেও তাঁর সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় নি।

সৈয়দ আলী আহসানের *রচনা-সমগ্রে* গ্রথিত কবিতা থেকেই আমরা তাঁর কাব্যের বৈষয়িক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চাই। তাই তাঁর কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের প্রয়োগ নির্দেশে আমরা কবির *রচনা-সমগ্রের* কবিতাবলিকেই বিবেচনায় আনব এবং লক্ষ করার চেষ্টা করব, তাঁর উন্মেষ-পর্বের প্রবণতাসমূহকে স্বীকরণের মাধ্যমে কবি কীভাবে তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের কিংবা পরিণত পর্বের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত অবয়বটি নির্মাণ করতে পেরেছেন। বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আমরা আলী আহসানের বিভিন্ন কাব্য থেকে কয়েকটি ধর্মাশ্রয়ী পঙ্‌ক্তি উপস্থাপন করছি :

ক. বিশ্বাসের জন্য চাই অভিচার-মন্ত্র আর আশ্চর্য
লক্ষ্মণ–
আমরা সঙ্কেত চাই! বন্যাবেগে সৌন্দর্যে তাহার
নীল ঝরোকার পাশে রাত্রি কাটে বৃদ্ধা জুলেখার;
অথবা সে ফেরাউন নদী-মধ্য পথ আর
মৃত্যু তার নীল-দরিয়ার;
মৃত-প্রাণ জেগে উঠে কবরের পরিসর হতে
নতুন সমাধি তার উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যায় ('সঙ্কেত'/*অনেক আকাশ*)

খ. ...আকাশের তারা হ'ল। সে নামের গূঢ় রহস্যের
অঙ্কুরে উদ্গাত হ'ল মুসার সিনাই। ('নাম'/*অনেক আকাশ*)

গ. আমার শুধু প্রতিবাদের যুক্তি আছে,
সম্মোহিত একাকারে মৃত্যুর সম্মোহন আছে
কিন্তু আদমের প্রথম পুত্রের মতো
মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার
কৌশল নেই– ('সময় পেলাম না'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ঘ. 'এখন পৃথিবীতে প্রথম প্লাবনের নূহ যদি ফিরে আসেন
এবং আবার একটি প্লাবন দেখেন–
তিনি আর নৌকো খুঁজে পাবেন না।' ('গতরাত্রে রাত্রির নগর'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে ধর্মীয় অনুষঙ্গ আধুনিক জীবনের দ্বিধাজীর্ণ ও জটিল বাস্তবতার রূপায়ণে প্রযুক্ত হয়েছে। ইসলামী ভাবাবহের ওপর পূর্ণাঙ্গ সমর্পণ এতে নেই, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি কবির অনুরাগ পূর্বাপর বহমান থেকেছে। ইসলামী অনুষঙ্গ অবলম্বন করে রচিত কবিতায় কবির স্বকালের চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াসও লক্ষ করা যাবে কোন কোন

কবিতায়। *অনেক আকাশ* কাব্যের ‘জুলায়খা’, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যের ‘ঈদ’ প্রভৃতি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ

সৈয়দ আলী আহসান শিল্পসাহিত্য বিশেষত কবিতাকে কাব্যরচনার রসদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁর এমন কবিতার সংখ্যা কম নয়। আলী আহসানের কবিস্বভাব ও শিল্পদৃষ্টির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তার কিছু পরিচয় উপস্থাপন করেছি। তাঁর শিল্প-বিষয়ক কিংবা কবিতাশ্রয়ী কবিতার এক তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবিতা তাঁর কাছে শব্দের অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শব্দকে কত বিচিত্র ভাবে ধারণ, বরণ ও উপস্থাপন করা যায় এবং এই শব্দ-স্থাপনায় কবির অন্তর্গত অবয়বটি কীভাবে সুন্দর-সাবলীল-স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তারই নান্দনিক নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন কবি। তাঁর কবিতায় শব্দ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছেই অর্থবহ অনুরণন সঞ্চার করে না, বরং ছড়িয়ে পড়ে নানা ইন্দ্রিয়ে এবং তা কখনো কখনো কবির কাছে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতারও স্মারক হয়ে ওঠে। *আমার প্রতিদিনের শব্দ* থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. আমার ভাষার শব্দ
সময়ের অন্ধকারকে প্রকাশ করবার জন্য
আহত শরীর নিয়ে উদ্ভ্রান্ত
রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্য, সৌভাগ্য এবং আনন্দ থেকে
সে বঞ্চিত
হতশ্রী আমার শব্দ আজ সমস্ত ক্ষুব্ধ ইচ্ছার
উপমা হতে চাচ্ছে–
আমার প্রতিদিনের শব্দ। (‘আমার প্রতিদিনের শব্দ : ২’)

খ. আমার সব তুচ্ছ আশা যদি
শব্দের সৈকতে নামে,
যদি আমার পরিপূর্ণ দৃষ্টি
একটি শস্যকণার আবরণকে
বিদীর্ণ করে,
এবং আমার নীরবতা
তোমার হৃদয়ে উদ্ভাবনা জাগায়,
তা হলেইতো আমি জয়ী–
একটি অকালকে ফেলে দিয়ে
নতুন প্রত্যুষের লগ্নকালে একজন
বিজয়ী পুরুষ। (‘তা হলেইতো আমি জয়ী’)

গ. তবুও বেঁচে আছি–
আবার নতুন গতিবিধির সাড়া শুনবো
শব্দে ও কথার
অবিরাম অরণ্যে। (‘বেঁচে থাকা’)

এভাবেই শব্দ অর্থাৎ কবিতা আলী আহসানের কাব্যের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় বৈষয়িক-অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। কবিতার শরীরে হেলান দিয়ে শব্দের চৈতন্যের আকাশ দেখার এই আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য একটি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত অবসর রচনা করে নেন কবি। জীবনের সকল অনুভবকেই তিনি শব্দের হৃদ্‌পিণ্ডে ছড়িয়ে দিতে চান। তাঁর মতে, প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার হাতে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল অনুষঙ্গই শিল্প হয়ে উঠতে পারে। জীবনের নিবিড় পাঠক হিসেবে আলী আহসান শব্দের অন্তর্গত ঐশ্বর্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই কবিতার শব্দাবলি তাঁর উপলব্ধির নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় অবলম্বিত অনুষঙ্গসমূহের খণ্ডিত উপস্থাপনের মাধ্যমেই কবি হিসেবে তাঁর অখণ্ড কিংবা সমগ্র অবয়বটির একটা রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতায় যেহেতু জীবন-সম্পর্কিত কোন কিছুই উপেক্ষিত নয় এবং জীবনকে যেহেতু কোন পরিকল্পনার ফ্রেমে আবদ্ধ রাখা যায় না, সেহেতু আমাদের আলোচনায় আলী আহসানের কবিতার বিবেচিত বিষয়সমূহের চেয়ে আমাদের বিবেচনা ও বিশ্লেষণের বাইরে থাকা ভূখণ্ডের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত– একথা স্বীকার করতেই হয়। তবু ধারণা করি, আমাদের আলোচনার বিন্দু বিন্দু জলের শরীর থেকে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার বৈষয়িক সিন্ধু সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকরণ

কবিতার বিষয় ও প্রকরণের আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ে বিচিত্র বিবেচনা ও বিতর্ক সচেতন পাঠকসমাজ ও সমালোচকবৃন্দকে বিচলিত, বিক্ষুব্ধ কিংবা বিধ্বস্ত করলেও কাব্যতীর্থে একটির অভাবে অন্যটিও বিপন্ন বোধ করে। কবিতা শিল্প বলেই তা নকল অর্থাৎ বানিয়ে তোলা। কিন্তু এই বানিয়ে তোলা কিংবা নির্মিত সত্য ও সুন্দরের সবটুকু অধিকার করার চেষ্টাও প্রায়শ ব্যর্থ হয়ে যায়। তবু এই চেষ্টার চারপাশে আশা-জাগানিয়া মন্ত্রের উজ্জ্বল ও অন্তহীন অভিসার। বিষয় ও শৈলীর শান্তিপূর্ণ দাম্পত্যের মাঝখানে কে অধিক শক্তিশালী এবং কার আধিপত্যে কোন রচনা সার্থক শিল্প হয়ে ওঠে– এই বিতর্ক বোধকরি শান্তিহর তৃতীয়পক্ষ, যা কেবলই ক্লান্তিকর ও কষ্টকল্পিত সংশয়ের জন্ম দিয়ে থাকে। বিষয়ের অভিনবত্বে কোন রচনা কবিতা হয়ে উঠলে সেই কবিতা কালোত্তীর্ণ হওয়ার কথা নয়। কারণ, "প্রসঙ্গের সরসতা পারদধর্মী; বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘন-ঘন ওঠা-নামা করে যে শুধু বিষয়বস্তু নিয়েই কথা হ'লে একযুগের সাহিত্য অন্যযুগে প্রায়ই পড়া যেত না।...কালসংকটে যে-কোনো একটি সমাধানের ইঙ্গিতে অনেক পাঠকেরই মন নেচে ওঠে, কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারণে। অনেক সময় কোনো ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে আমরা এও ভুলে যাই যে বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয় না, কলাকৌশলই শব্দসমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে, এবং কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ।" (বুদ্ধদেব বসু ১৯৯৭ : ৮৬)। সমালোচকের এই মন্তব্যে কবিতায় বিষয়ের কর্মপরিধি নির্ধারণের চেষ্টায় সততার স্বাক্ষর স্পষ্ট হলেও প্রকরণকে বিষয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দুই পক্ষের প্রতিই কিঞ্চিত অবিচার করা হয়েছে বলে মনে হয়। বুদ্ধদেবের এই মন্তব্যে 'কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ' উল্লেখ করায়, প্রকরণকাঠামো তার যৌক্তিক পরিধি অতিক্রম করে গেছে। আমাদের বিবেচনায়, সার্থক কবিতার আধার ও আধেয় পরস্পরকে অতিক্রম করে না, বরং তারা একে অপরের আলিঙ্গন–প্রত্যাশী। তাই একটি সার্থক কবিতার জন্মবৃত্তান্ত অনুধাবন এবং এর তৃপ্তিদায়ক আস্বাদন এই দুই পক্ষের স্বাস্থ্যকর সম্মিলনেই সম্ভব হতে পারে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি, বিষয়ের রঙ্গমঞ্চে প্রকরণের অনুপ্রবেশ বিশেষ কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা করে না। একইভাবে শৈলীর সভা-সমাবেশেও প্রসঙ্গের প্রতিরোধহীন পায়ের শব্দ শোনা যায়। একটি সাক্ষাৎকারে সৈয়দ আলী আহসান কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন এইভাবে :

> কবিতার আঙ্গিক এবং বিষয় ওতপ্রোতভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। আঙ্গিকের ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়ের বিবেচনায় আঙ্গিকের রূপ পাল্টায়। আঙ্গিকটি আধার মাত্র নয়, যার মধ্যে বিষয়কে ধারণ করবে। আঙ্গিক হচ্ছে বিষয়গত অভিব্যক্তির রূপকল্প। (২০০৩খ : ১৬০-৬১)

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার বৈষয়িক বিস্তৃতি আলোচনায় তাই আমরা কখনো কখনো কবির উপস্থাপনশৈলীর কোন কোন অনুষঙ্গকেও প্রশ্রয় দিয়েছি। এই পর্যায়ে কবির প্রকরণকাঠামোর প্রকৃতি ও পরিসর নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। কাব্যবিষয়ের ছুটি মঞ্জুর করে এর করণকৌশলের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি কিংবা স্বরূপ চিহ্নায়নের চেষ্টায় কবিতার প্রকৃত পাঠ প্রতিহত হয় বলেই আলী আহসানের কবিতার শৈলী ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণের সঙ্গতি কিংবা সংস্থিতি নিরূপণের দিকেও আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত থাকবে।

গঠনবৈশিষ্ট্য

বাংলা কবিতায় সৈয়দ আলী আহসানের কণ্ঠস্বর ব্যতিক্রমী ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। 'প্রথম থেকেই আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার নিজস্ব কবিভাষা আবিষ্কার করতে। এই যাত্রা সহজ ছিল না।'– আলী আহসানের (২০০৩খ : ১৩৩) এই উচ্চারণে কবি হয়ে ওঠার নিরলস সাধনায় নিমগ্ন একজন আলী আহসানের মুখচ্ছবিই ভেসে ওঠে। শিল্পসাধনায় সিদ্ধিলাভের কোন সরল কিংবা সংক্ষিপ্ত পথ নেই। সেখানে নানা পথের প্রলোভন তাঁকে বিভ্রান্ত করে। সতর্কতার সঙ্গে সেই পথেই চলতে হয় তাঁকে, যে পথ গন্তব্য–অভিমুখী। পথের ক্লান্তিতে আলী আহসান হতোদ্যম হন নি। 'ইসলামী ভাবাবহকে প্রমাণ করবার জন্য শুরুতে আরবি-ফারসি শব্দ' ব্যবহারে তিনি অতৃপ্তই থেকে গেছেন। তাই তিনি নতুন আবহ ও নতুন শব্দভাণ্ডারের সন্ধান করেছেন। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় :

> বাংলা কবিতার শব্দ ভাণ্ডার থেকে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে আমি প্রধানত শব্দ নির্বাচন করেছি। এই শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির ইচ্ছা এবং অনুজ্ঞার ভাষা আমি গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমার কবিতার ভাষার এমন একটি রূপ ফুটে উঠেছে যা একান্তই আমার, কোনক্রমেই অন্য কারও নয়। (২০০৩খ : ১৩৩)

শব্দের শক্তি ও সম্ভাবনাকে আপন ইচ্ছের অনুকূলে সংস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায় কিংবা প্রস্তুতিপর্বের কবিতাবলি বিবেচনার বাইরে রাখলে একথা নিশ্চিত করেই বলা যাবে যে, অভিধান অন্বেষণের মাধ্যমে অপ্রচল শব্দের সমাবেশে তিনি তাঁর অভিব্যক্তিকে দুরতিক্রম্য করে তোলেন নি। তাঁর কবিতার উপস্থাপনকৌশল সরল, অনেকাংশেই তা আমাদের কথনভঙ্গির অনুরূপ, কিন্তু শব্দের অন্তর্গত দোলায় পুরো পঙ্‌ক্তির মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য ও চলিষ্ণুতা অনুভূত হয় যা পরবর্তী পঙ্‌ক্তির জন্য পাঠককে প্রলুব্ধ করতে থাকে। এমন এক মাধুর্যের দীপ্তি তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত, যা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের শরীরেই অনাস্বাদিত আবহ এনে দেয়। আত্মকথনের ভঙ্গিতেই নিজের ভাবকে বাণীবদ্ধ করেন তিনি, তাতে বিস্তারের অতিকথন নেই, এমনকি তীব্র সংশ্লেষণজাত জটিলতাও অনুপস্থিত। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পরিশীলিত শব্দভাণ্ডারই তাঁর প্রধান পুঁজি, যদিও ভাব কিংবা আবেগকে দূরসঞ্চারী করার প্রয়োজনে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের পরিত্যক্ত শব্দকুঞ্জের ধুলোমলিন পুষ্পমঞ্জরিকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি :

> হৃদয়কে কভু নয়নে অথবা দেহে,
> স্নায়ুভাবে কভু বিচলিত সত্তায়,
> উন্মুখ ক'রে ভেবেছি কাউকে দেব
>   কিন্তু তখন সূর্যের তাপে হঠাৎ আশঙ্কায়
>   সর্বহৃদয় সচকিত হ'য়ে সহসা বিলীন হ'ল। (১-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের হৃদয়, কভু, নয়ন, সর্বহৃদয়, এমনকি দেহ শব্দটিও আমাদেরকে রাবীন্দ্রিক আবহের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই কবিতার শেষ পর্যায়ে যখন কবি বলেন, 'শান্ত বাতাসে তুমিই নির্ঝরিণী', তখনও আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারি না। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'তোমাকে আমার হৃদয় দিলাম/শিশিরের ফুল মুঠোয় নিলাম/দুইটি তারায় একটি দীপ্ত বাণী ॥'–তখন এই দেহ শিশিরের জলে স্নাত হয়ে একান্তভাবেই সৈয়দ আলী আহসানের হয়ে ওঠে।

একজন কবির সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌলসত্যটি উদ্ঘাটিত কিংবা উদ্ভাসিত হয়। কবির ভাষাভঙ্গি তাঁর ভাবের অনুগামী না হলে ভাব ও ভাষার সহাবস্থান স্বাস্থ্যকর হয় না। কবিতার ভাষা অনেকাংশে বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলা যায়, বিষয়বস্তুই একজন শিল্পস্রষ্টার প্রকাশভঙ্গির নিয়ন্ত্রক কিংবা নির্দেশক। এ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসান একটি সাক্ষাৎকারে 'সাহিত্যের ভাষা কি হওয়া উচিত?'–এমন এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন :

> আমাদের সাহিত্যে বর্তমানে পরিশীলিত চলতি বুলি ব্যবহৃত হয়। সাধু বাংলা এখন আর ব্যবহার হয় না। তবে কখনও কখনও আমরা সংলাপে আঞ্চলিক বুলি ব্যবহার করি। কবিতায়ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের দেশে সাহিত্যের একটি ভাষা গড়ে উঠেছে যা আমাদের শিক্ষিতজনের মুখের ভাষা থেকে গড়ে উঠেছে। তাই বলে তা দৈনন্দিন সংসার ও সমাজকর্মের ভাষা নয়। সাহিত্যের ভাষা কি হবে তার নির্দেশনা সাহিত্যের বিষয়বস্তুই ঠিক করবে। বিষযবস্তুই তার ভাষাকে গড়ে তোলে এবং একটি বিশেষ প্রকৃতির ভাষার শাসন নির্মাণ করে। (২০০৩খ : ১৪১)

সৈয়দ আলী আহসান *কাব্য-সমগ্রে*র ভূমিকায় বলেছেন, "অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থ থেকে আমার কবিতাগুলো নিজস্ব একটি বাণীভঙ্গি পেয়েছে।" (১৯৭৪ : ২০)। এই বাণীভঙ্গি বিশ শতকের তিরিশের দশকের কাব্যাদর্শের আশীর্বাদপুষ্ট হলেও 'ত্রিশের ধারাকেই তাঁর কাব্যের নিশ্চিত স্থিরীকৃত উৎস হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কখনো পুরোপুরি সম্ভব হয় নি। ফলে তাঁর সমসাময়িক কবিদের মত ত্রিশের পর্যায়ের কোনো না কোনো মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর আত্মস্থ সংযোগ ঘটেনি। ক্রান্তিকালের অস্থিরতায় তিনি যেন আগে থাকতেই অসংলগ্ন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমসায়িক অনেক উৎক্ষেপ ছুঁয়ে গেছেনই শুধু– মানসিক কিংবা চেতনাগত দিক থেকে এই যুগাদর্শ সামগ্রিকভাবে তাঁর মনের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে স্থায়ী হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত।' (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৪ : ৪৭৮)। এই নিরাশ্রয়ী শিল্পচৈতন্যই তাঁর মনে জন্ম দিয়েছে আত্মচিহ্নিত একটি কণ্ঠস্বরের অন্বেষণস্পৃহা। আমরা মনে করি *অনেক আকাশ* কাব্যে আলী আহসানের সেই অন্বেষণ-প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। *অনেক আকাশ* কাব্যের 'তোমাকে ধরা যায়না' কবিতার 'তুমি'কে যদি কবির কাব্যচেতনার প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে আমরা লক্ষ করব, এক অধরা শিল্পসৌন্দর্যের পেছনে ছুটে চলেছেন কবি। এই সৌন্দর্য স্রোতোধারার মতো, মৎস্যশিশুর মতো, চড়ুই পাখির মতো কেবলই পালিয়ে বেড়ায়। তবু কবির অপ্রতিহত প্রত্যয় : 'আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে'। এই গানের আয়নায় কবিতার মুখ দেখা অসম্ভব নয়। *অনেক আকাশ* এবং *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যের গঠনস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের মূল্যায়ন ও মন্তব্য থেকে আলী আহসানের পরিণত পর্বের কাব্যসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো অনুধাবন করা সম্ভব :

> 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসানের উপজীব্য বহুধাবিস্রস্ত। পরিশীলিত মন ও প্রতিশ্রুতিশীল মেধার পরিচয় এতে বিধৃত থাকলেও সুনিশ্চিত সংস্থানে কোথাও তিনি স্থির নয়। ভিত্তিগত প্রতিষ্ঠা সংস্থাপিত নয় এ-গ্রন্থে। নির্দিষ্ট মনোভঙ্গি, বিষয়চেতনা, জীবনদৃষ্টি এবং মেজাজনির্ভর আঙ্গিকের প্রত্যয়ী ও স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশের অভাব রয়েছে এতে। সে হিসেবে একজন সম্ভাবনাশীল কবির প্রথম গ্রন্থ বলতে যা বোঝায় এ বই ঠিক তাই, তার বেশি কিছু নয়। এ-পর্যায়ে সৈয়দ আলী আহসান অন্বেষাকাতর। মনোগত ঠাঁইয়ের খোঁজে উদ্গ্রীব, উড্ডীন পাখির মতই তিনি যেন অস্থির এতে। কিন্তু এই বিচার 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত'-এর বেলায় খাটে না। (১৯৯৪ : ৪৭৯)

প্রথম কাব্যের যে সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান, দ্বিতীয় কাব্যে এসে আলী আহসান তার অধিকাংশই অতিক্রম করতে পেরেছেন। এই কাব্যে এসে কবি 'অবলীলায় সঞ্চরণের উপযোগী ভিত্তি পেয়ে গেছেন– বিষয় বক্তব্য এবং বহিঃপ্রকাশের সঙ্গত যোগাযোগ ঘটে গেছে'। অর্থাৎ বিষয় ও শৈলীর বোঝাপড়ায় কবির উচ্চারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সৈয়দ আলী আহসান কবিতার শরীর নির্মাণ করেন অনেকগুলো টুকরো ছবিকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে। কখনো কখনো জুড়ে দেওয়ার দায়িত্বটুকু তিনি পাঠকের ওপর ছেড়ে দিতে চান। অর্থাৎ পাঠকের সৃজনশীলতার প্রতি আস্থা রাখেন তিনি। তাঁর কবিতা পাঠকের নানা ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন প্রেরণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দেখা কেবল চোখের দেখা নয়, তাতে প্রাণের উপস্থিতিও টের পাওয়া যায়। *উচ্চারণ* কাব্যের ২০-সংখ্যক কবিতায় আলী আহসান বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> একটি দর্শন তখনই সম্পন্ন হয় যখন চিত্ত, নয়ন-প্রসাদ, রূপ এবং আলোক এ-কয়টি প্রত্যয় সম্মিলিত হয়। নয়ন-প্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে চিত্ত অক্ষম, আবার চিত্তের উপলব্ধি ছাড়া নয়ন একাকী রূপ দর্শন করতে পারে না। শুধুমাত্র নয়নকে আশ্রয় করে স্মৃতি–অস্মৃতি, কুশল-অকুশল, কোনও কর্মই হয় না। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং সকল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে চিত্তের মনন-কৃত্য সম্মিলিত হয়ে যে উপলব্ধিকে জাগ্রত করে তাই হল একজন কবির সফলকাম অবলোকন।
> চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার কথা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন। কবির কাছে এ-শুভ নিমিত্ত হচ্ছে অকস্মাৎ বিস্মিত নয়নে পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার। (১৯৭৪ : ২০০)

এই কবিতায় একজন কবির দেখার দৃষ্টি সম্পর্কে আলী আহসানের বিবেচনা শিল্পসংহতি লাভ করেছে। এই বিবেচনার আড়াল থেকে তাঁর কবিতার করণকৌশল সম্পর্কেও একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব। চোখের দেখা ও অন্তরের দেখার সম্মিলন ঘটাতে গিয়ে কবি অনুভববেদ্য অনুষঙ্গকেও একটি দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেন। কবি বিশ্বাস করেন, কোন ইচ্ছা-অনুভব-উপলব্ধিকে আমরা যখন শব্দে ধারণ করি, তখন তার একটি অবয়ব নির্মিত হয়ে যায় এবং তা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। 'আমরা যখন শব্দে আমাদের সকল ইচ্ছা এবং প্রয়োজনকে তুলে ধরবার চেষ্টা করি, তখন বোধকে দৃষ্টির সীমায় টেনে আনি। দৃষ্টিগোচর না হয়ে কোনও বস্তুই উপলব্ধির সম্পদ হতে পারে না। তাই দৃষ্টিগোচরকেই আমরা দেখি না, অদৃশ্যকেও আমরা দেখি, শ্রুতিগ্রাহ্যকেও আমরা নয়নে নির্ণয় করি।' (১৯৭৪ : ২০৩)। আবার দৃশ্যমান বস্তুর স্বরূপ কিংবা সৌন্দর্য চিহ্নিত করতে গিয়েও কবি তাকে বিশেষ কোন অনুভবের পাশে স্থাপন করেন। ক্রমাগত 'ভেতর-বাহিরে' আসা-যাওয়ার মাধ্যমে পাঠকের দেখার ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তার অনুভবের চত্বরেও তা উর্বরতা ছড়িয়ে দেয়। ফলে সেখানে নতুন ফসলের আঘ্রাণ ও আনন্দ অনুভূত কিংবা সঞ্চারিত হয়। আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আলী আহসানের একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতার নিবিড় পাঠে অবতীর্ণ হওয়া যাক :

> হঠাৎ সময়ে সাড়া
> যেন এক মোমের পুতুল–
> হঠাৎ যেনবা গান
> ঐশ্বর্যের অনেক মুকুল;
>
> একটি কোমল রেখা
> রক্তাম্বর শরীরে আলোক–
> কথা যেন বারম্বার
> উচ্ছলিত চৈতন্যের শ্লোক।
>
> চঞ্চল হৃদয় নিয়ে
> অবিরল একটি পাখি
> এক সঙ্গে ডানা মেলে
> যেন এক পুষ্পের কোরক ॥ (১২-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

উপরিউক্ত কবিতার শুরুতেই কবির আহ্বানের প্রতি কেউ একজন সুবিচার করেছেন– এই রকম একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এই সাড়ার একটি অবয়ব দিতে চান কবি। তাই মোমের পুতুলের আগমন ঘটে কবিতায়। এতেও তৃপ্ত নন কবি, সেই সাড়া তাঁর কাছে গানের মতো বেজে ওঠে এবং এই গানের ঐশ্বর্য অজস্র মুকুলের শরীরে সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় স্তবকে একটি রেখার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং সেই রেখা যেন কার রক্তাম্বর শরীরে আলোক সঞ্চার করে। তাই কথা তার অর্থের সীমা অতিক্রম করে কবির চেতনায় শ্লোকের মতো বেজে ওঠে। তৃতীয় স্তবকে কবি-হৃদয়ের চাঞ্চল্য নিয়ে আমরা কয়েকটি পাখিকে উপস্থিত হতে দেখি। তারা একসঙ্গে আকাশে ডানা মেলে দেয়। এই ডানা বিস্তারের দৃশ্যে কবি দেখতে পান পুষ্পের কোরক। সব মিলে পাঠকের সামনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, তা খুবই স্পষ্ট– একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। কিন্তু এই ছবি আঁকতে গিয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন কবি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাব-চিন্তা-কল্পনাকে তিনি ভেঙেচুরে নানা বস্তুর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং বস্তুজগতের স্পর্শে সেই ভাব-চিন্তা-কল্পনা সজীব-সরাগ-সপ্রতিভ হয়ে পাঠকের প্রাণের কাছে গানের মতো বেজে উঠছে। চঞ্চল হৃদয়ের কয়েকটি পাখির আড়ালে বসে কবি নিজেকে মেলে দিচ্ছেন পাঠকের চৈতন্যে– এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাঠককে প্রাণিত করেন তিনি এবং এভাবেই কবির হৃদয় হয়ে ওঠে এক অনাবিল পুষ্পের কোরক।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার কুললক্ষণ ভাব, চিন্তা বা কল্পনাকে দৃশ্যের সীমায় নিয়ে এসে এর অন্তর্গত সৌরভ ও সৌন্দর্যকে তাঁর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতায় সংস্থাপন করা। বিচিত্র অনুভব ও অনুষঙ্গকে তিনি কাব্যদেহে ধারণ করতে চান এবং সবকিছুরই একটা আবয়বিক সংস্থিতি বা চিত্রধর্মী রূপ সৃজনের প্রয়াস পান। *কাব্য-সমগ্রের* ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন :

> আমি আমার একটি বিশেষ দেখাকে অনেকগুলো দেখার সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দ পাই এবং শব্দের অনুষঙ্গে তার একটি আবহ নির্মাণ করি। এভাবেই একটি দেখা বিশেষ হয়ে উঠে এবং একটি দৃশ্যমানতায় পরিপূর্ণ হয়। শুধুমাত্র একটি দেখাকেই যে অনেক দেখার আনন্দের সঙ্গতির মধ্যে আবিষ্কার করি তাই নয়। অনেক সময় কোনও একটি চিন্তা বা উপলব্ধি বা স্মৃতি দৃশ্যমান বস্তুর রূপকল্পে উপস্থাপিত করি।...
>
> যা কিছু আমি দেখেছি এবং দেখেছি বলেই যেগুলোর একটি চিত্রকল্প আমার স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে, সে-সব স্মৃতিপটগুলো বিশেষ উপলব্ধি ব্যাখ্যার জন্য দৃশ্যগোচর তাৎপর্য নিয়ে শব্দের সাহায্যে উন্মোচিত হয়েছে। (১৯৭৪ : ১৯-২০)

এই বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে কবির অবলম্বন বর্ণনাত্মক কিংবা বিশ্লেষণাত্মক ভাষাভঙ্গি, যার মাধ্যমে কবির 'চিন্তা বা উপলব্ধি বা স্মৃতি দৃশ্যমান বস্তুর রূপকল্পে উপস্থাপিত হয়'। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় চিন্তা-উপলব্ধি-স্মৃতির চিত্রায়ণ অনুধাবনের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ...তবু এই মৃত্যু আজ
প্রস্ফুটিত আলোকের মতো আমার নিকটে, আর
কম্পমান বৃক্ষের শিখরে। ('সঞ্চয়'/*অনেক আকাশ*)

খ. মুঠোয় ভরা শিমুল ফুলের মতো রোদ
হঠাৎ বাতাসে ভাসে আনন্দের মতো
ঐশ্বর্য ('কৃষ্ণচূড়া : এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

গ. তোমার দেহ ইউকেলিটাস
গাছের মতো
বাতাসের দোলায় শিহরিত
সচকিত একটি তরঙ্গ ('হৃদয়– দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঘ. তবুও হৃদয় শীত-সকালের নিশ্বাসের মতো
এবং আকাশে বিমর্ষ মেঘের অপেক্ষার মতো। ('হৃদয়– তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঙ. বিশীর্ণ দিন হলুদ পাতায়
বিকেলের রোদে মুর্ছিত হ'ল
যৌবন-অভিমান ॥ (১৩-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

চ. একটি নিগূঢ়তম বাণী সবুজের ঐকতান হয়ে আমার অস্তিত্বের চেতনা হল। (৫১-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ছ. ছিন্নমূল উৎপাটিত বৃক্ষের মতো
তার সমস্ত আশা
অন্ধকারের নীরবতায় হারিয়ে গেল। ('দেশে ফেরার পর'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

আলী আহসান উপলব্ধি কিংবা অনুভবের শিল্পরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বাস্তবতায় পরিভ্রমণ করার পরিশ্রম স্বীকার করে নেন। এই ভাব কিংবা কল্পনার একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেন তিনি। যে-বিষয়ে তিনি পাঠকের মনোযোগ প্রত্যাশা করেন, সেই বিষয়কে কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি পাঠকের মনকে নানা অনুষঙ্গে সংস্থাপনের চেষ্টা

করেন এবং এর মধ্যে তিনি একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে চান। *উচ্চারণ* কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'আমি সাধারণ মানুষের ইচ্ছার যন্ত্রণা নিয়ে দৃষ্টিকে শুধু সম্মুখে প্রসারিত করে প্রতিদিন কালক্ষয় করছি।' (১৯৭৪ : ১৮৭)। কবির দৃষ্টি শুধু সামনের পৃথিবীতেই সত্য কিংবা সুন্দরের অন্বেষণ করেনি, তাঁর দৃষ্টি অন্তরের গভীরদেশেও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু অন্তরের ধনকে অন্দরের ঐশ্বর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি কবি, সেই ঐশ্বর্যের অনুরূপ সমৃদ্ধির সন্ধান করেছেন তিনি, যা তাঁর কবিতায় তৃপ্তিদায়ক অনুভব সঞ্চারে সক্ষম। আলী আহসানের কবিতা থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে তারই পরিচয় বিধৃত।

শব্দ

সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় শব্দের শক্তি ও সম্ভাবনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। শব্দের শরীরে তিনি অভিনব দীপ্তি সঞ্চার করেন যা তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকে আভিধানিক পরিবৃত্তির বাইরে পরিভ্রমণে প্রাণিত করে। আলী আহসান নিজেই বলেছেন, একজন কবির চৈতন্যের উষ্ণতায় 'শব্দ তার নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করে অর্থ-শক্তি লাভ করে...ধ্বনির সাহায্যে বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে।' (১৯৮৯ : ২২)। তাঁর মতে, 'শব্দের কিছু অর্থ ধারণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ।' (১৩৭৫ : ৩)। একজন কবি বিষয় ও প্রকরণের নানাবিধ নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেও শব্দই তাঁর শেষ অবলম্বন, যা তাঁকে শিল্পীর সম্মান ও স্বীকৃতি এনে দেয়। শব্দকে আত্মখচিত অনুভব ও উপলব্ধির ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কবি। কবিতায় শব্দ-নির্বাচন কিংবা শব্দ-সজ্জার অন্তর্নিহিত শক্তির সবটুকু পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয় না। এমনকি একটি শব্দ যে অনুভবের দ্যোতক হিসেবে কবির কাছে ধরা দেয়, তা পাঠকের কাছে অন্য উপলব্ধির উন্মোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অর্থাৎ শব্দের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অর্থের আধিপত্য কবিতায় স্বীকৃত নয়। যে শব্দটি একটি বিশেষ পরিস্থিতির স্মারক হিসেবে কাব্য-ইমারতের অনিবার্য অংশ হয়ে যায়, অন্য পরিস্থিতিতে তা পাঠককে পৌঁছে দেয় ভিন্ন দিগন্তে। শব্দের গতি ও দীপ্তি বিষয়ে কবির সচেতন প্রয়াস শব্দকে তার অর্থের প্রাচীরে আবদ্ধ করে না, বরং তাতে যুক্ত করে বিচিত্র অর্থের ইঙ্গিত। 'শব্দের অভিধানগত অর্থকে অতিক্রম ক'রে ইঙ্গিতময় রসনিষ্পত্তির দিকে কবির লক্ষ থাকে ব'লে শব্দব্যবহারে তাকে রূপদক্ষ হতে হয়।' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ২৯৮)। সৈয়দ আলী আহসানের শব্দ-ভাবনার ভারকেন্দ্রে আমরা এই ইঙ্গিতময়তার অনাবিল আভাস লক্ষ করি। এ বিষয়ে কবিতার পাঠক কিংবা সমালোচক আলী আহসানের মন্তব্য :

> ক. কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রশ্নটা প্রথমে আসে, তারপরে উচ্চারণগত ধ্বনির বিশিষ্টতা এবং অবশেষে শব্দের অর্থবহন করবার ক্ষমতা। কবিতা যখন আমরা পাঠ করি তখন সঙ্গে সঙ্গেই এ বিশিষ্টতাগুলো আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেই আমরা কবির শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে ক্রমশঃ অবহিত হই। (২০০১ : ২০)
>
> খ. কবি যখন শব্দকে ব্যবহার করেন, তখন তিনি সে শব্দের সম্ভাবনার কথা ভাবেন এবং শব্দটির গ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু এবং সে কতটুকু সত্যকে অবলম্বন করে থাকতে পারবে তা বিবেচনা করেন। তিনি শব্দের দ্বারা বস্তুকে চিহ্নিত করেন, ভাবকে গ্রহণযোগ্য করেন এবং জটিলতাকে বিকল করেন। (২০০১ : ৯৭)

সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় বারবার শব্দের প্রসঙ্গ তোলেন। শব্দ এবং কবিতার একটি সমার্থক রূপকল্প নির্মাণ করার চেষ্টা করেন কবি। তিনি যখন শব্দের দর্পণে নিজের মুখ দেখতে চান, তখন কবিতায় নিজের অন্তর্গত ঐশ্বর্য উন্মোচনের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের মতে, আলী আহসানের কবিতায় শব্দানুষঙ্গের অনুবর্তন 'শব্দই কবিতা'– এই শিল্পধারণার স্মারক হিসেবে গৃহীত হয়েছে, যা বস্তুজগৎ ও শিল্পজগতকে শব্দজগতের চিরন্তনতার মধ্যে সংস্থাপনের অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত। (১৯৯৪ : ৪৮৬)। অনুভব ও উপলব্ধির সবটুকু শব্দের শরীরে ঢেলে দিয়ে আলী আহসান শিল্পের উষ্ণতায় উজ্জীবিত হন। সেই অর্থে তাঁর শব্দ-ভাবনা শিল্প-ভাবনারই প্রতিভূ হয়ে ওঠে। সৈয়দ আলী আহসানের কয়েকটি কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

ক. একদিন আশ্চর্য উষ্ণতায়
শব্দের ঐশ্বর্য পেয়েছি
অতি পরিচিত শব্দ হঠাৎ সমুদ্র হয়েছে

এবং আমার সমস্ত আগ্রহ
চিলের মতো ডানা মেলেছে ('রবীন্দ্রনাথকে'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

খ. সব মুছে দিয়ে শব্দের মোহে
চিত্ত সহসা মূর্ছিত–
বিশ্রামহীন তোমার কাকলী
আমার হৃদয়ে সচকিত ॥ (৪-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

গ. সম্ভ্রম নিয়ে চিত্ত-শাসন
বুদ্ধির কথা শুধু আবরণ,
শব্দ শতধা বিস্তার পেয়ে
যুক্তির সাথে ভাষার খেলা। (৫-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঘ. শব্দ এবং অর্থ যেমন
একক সত্তা গ্রথিত ভাষা
তরঙ্গ সাথে সাগরে যেমন
নির্ণেয়হীন ব্যাকুল আশা– (২৩-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঙ. আমার শব্দ কবিতার কথা
তোমার শব্দ চোখের আলো,
রেখা-বন্ধনে কাকলী অধীর
সূর্য-প্রদীপ তুমিই জ্বালো– (৩০-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

চ. আকাশ ছুঁয়েছে যখন আমার
শব্দ সকল
মনের কথাটি প্রকাশ করবে
এই ইচ্ছায় মাটির তৃণের
কাঁপলো সবুজ, (৩২-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আলী আহসানের বিচিত্র অনুভবপুঞ্জ কবিতার শব্দের মতো সুন্দর ও দূরসঞ্চারী হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় যখন প্রেমের আবেগ ও আনন্দ সংহত হয়, তখন সেই সংহতি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকে দান করে অসাধারণ দ্যুতি ও গতি। কবির প্রেমিকার অবয়বও কখনো কখনো শব্দের মতোই মধুর ও মুখর মনে হয়। এমনকি বাংলাদেশের রূপ এবং হৃদয়কেও তিনি শব্দের মুকুরে মুদ্রিত হতে দেখেছেন :

এবং সমস্ত শব্দের একাগ্রতায়
আমার পূর্ব-বাংলা
একাকী একটি বৃষ্টি-রাত্রের শব্দে মতো
আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো। ('আমার পূব-বাংলা : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

উচ্চারণ কাব্যেও সৈয়দ আলী আহসান শব্দ-বিষয়ে তাঁর ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করেই তিনি শিল্পের নিকটাত্মীয়। গঠনগত কারণেই *উচ্চারণে* বিম্বিত কবির শব্দ-চিন্তা অনান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো স্পষ্ট এবং লক্ষ্যাভিমুখী। ফরাসি ভাষার বিশেষ ধরনের গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় রচিত এ কাব্য সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, এ জাতীয় কাব্যে 'জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র অনুভূতি কবিরা স্বাক্ষরিত করেন অনেকটা গদ্যের আদলে। এর মধ্যে অনেকটা তীব্রতা থাকে।' (২০০৩খ : ১৩৪)। এ কাব্যে কবির ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের অনুরণন স্পষ্ট, সেইসঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আলী আহসান নিজের ভাবনাও অনেকটা খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি। *উচ্চারণ* কাব্যে শব্দ সম্পর্কেও তিনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। *উচ্চারণ* থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

ক. মানবকণ্ঠ নিঃসৃত উচ্চারিত ধ্বনির কোনও আরম্ভ নেই, মধ্যযাম নেই, শেষ নেই। সৃষ্টির কোন্ উষালগ্নে প্রথম শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো আমরা জানি না। শুধু সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সময় এবং কালের বিপুল পরিধিতে অনবরত শব্দচূর্ণের অট্টরোল শুনতে পাই, যেখানে আমার শব্দকণাগুলো ছড়িয়ে দিই এবং আপনাকে নিঃশেষ করে আনন্দিত হই। (৬-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

খ. শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ককে সাগরের সঙ্গে তরঙ্গের সম্পর্ক বলে তুলসী-দাস ব্যাখ্যা করেছেন। সাগরের বিক্ষোভ, অনবরত প্রবাহ, উদ্বেল উচ্ছলতা আবার কখনও কখনও সহসা শান্তি, তরঙ্গ-বৈচিত্র্যে ধরা পড়ে। শব্দের তাৎপর্যও তেমনি তার বিন্যাস-বৈচিত্র্যের কারণে নব-নব অর্থবহতার মধ্যে ধরা পড়ে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ কতবার বিমুগ্ধ চিত্তের কলগান বহন করেছে, কতবার মানুষের আর্তনাদকে উন্মোচিত করেছে, কতবার আনন্দের অর্থহীন কাকলীকে বাতাসে এবং আকাশে ছড়িয়েছে, এবং কতবার যে বাককুণ্ঠতার স্মারক হয়ে উঠেছে তা কেউ জানে না। আমরা শুধু জানি যে শব্দ সর্বদাই অর্থের মধ্যে পল্লবিত, সমুদ্র যেমন তরঙ্গের মধ্যে বিগলিত এবং প্রাণ-সঞ্চয় যেমন নিঃশ্বাসের মধ্যে সঞ্চারিত ॥ (২১-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

গ. শব্দ উচ্চারণের চেষ্টায় আমি যে
আগুন জ্বালিয়েছি,
সে আগুনের তাপে আমি হীরকখণ্ড হলাম
কিন্তু আকাশের তারা হতে পারলাম না। (৬৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ঘ. বুদ্ধিমানেরা যেন শব্দের বশংবদ। একজন যখন বুদ্ধিদীপ্ত কতগুলো কথা উচ্চারণ করেন, সংলাপী সঙ্গী তখন শব্দ-উচ্চারণে অধিকতর কুশলী হতে চান। (৬৬-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

সৈয়দ আলী আহসানের শব্দসচেতনতা আমাদের সমালোকবৃন্দেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শব্দের আর্থপরিধি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কবির অবদান অপরিসীম বলেই মনে করতেন আলী আহসান। কাব্য-সমালোচক হিসেবে আলী আহসান যেমন কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন, তেমনি কবি হিসেবেও শব্দের কাছেই সমর্পিত হয়েছেন তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় *এই ভাই* কাব্যের 'উত্তরপক্ষ' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন, 'যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,/শব্দ আমাদের ব্রহ্ম।' (২০০৩ : ২/১৭১)। আলী আহসান– সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা তাঁর সমকালের অন্য প্রগতিশীল কবিবৃন্দের মতো– কবিতায় জোর গলায় কথা বলেন নি, তবে শব্দের ওপর জোর দিয়েছেন। 'শব্দ আমাদের ব্রহ্ম' এ জাতীয় উচ্চারণও আলী আহসানে অনুপস্থিত, কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত শব্দকে ব্রহ্মের মতোই শক্তিশালী উপাদান হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের বিবেচনা প্রণিধানযোগ্য :

> সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় শব্দেশ্বরবাদীদের একজন। আমাদের সমকালে কবিতায় শব্দের উপরে এতো উপর্যুপর গুরুত্ব আর কেউ দেননি। ফিরে ফিরে বার বার তিনি শব্দ ব্যবহারে নতুন সম্ভাবনা ও তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন। বেশী দিন আগে নয় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ৩১ শে মে, ১৯৫৩ সালে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।" (মুখবন্ধ, "সংবর্ত") শব্দের উপর এতখানি গুরুত্ব তিরিশের আর কোনো কবি দেননি;– জীবনানন্দের বিশ্বাস ছিল উপমার উপরে। আসলে, যে যাই বলুন, শব্দনীড় সব কবিরই আশ্রয় এবং আধুনিক কবিমাত্রেই শব্দকে অর্থপাশ থেকে যথাসাধ্য মুক্ত করে নতুন অর্থবিভা দান করতে সতত সচেষ্ট। সৈয়দ আলী আহসানের শব্দ ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই নির্বাচিত, তাঁর অনেকগুলি প্রিয় শব্দের ক্রমাগত আবৃত্তির মধ্য দিয়ে একটি নিজস্ব আবহমণ্ডল তিনি তৈরি করে নেন সহজেই, তাঁর শব্দ প্রয়োগে স্বোপার্জিত মুদ্রার স্বাক্ষর স্পষ্ট, শব্দের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিতও করেছেন তিনি, কিন্তু, আমার বিবেচনায়, সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার জোর পড়েছে অন্যখানে, তাঁর কেন্দ্রে ও প্রসারে আছে শ্রবণের অনুভূতি– কেবল অনুভূতি– স্পর্শের অনুভূতি, দৃষ্টির অনুভূতি, স্বাদ ও শ্রবণের অনুভূতি। (১৯৮৫ : ২৫৮)

সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের শরীরে 'স্পর্শের অনুভূতি, দৃষ্টির অনুভূতি, স্বাদ ও শ্রবণের অনুভূতি' ছড়িয়ে দেওয়ার কথা *সহসা সচকিত* কাব্যের একটি কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন : 'এ-কবিতা বিরলের, একান্ত সময়ের,/শ্রবণের শব্দের, নাসিকার আঘ্যাণ,/অপাঙ্গ দৃষ্টির, কুসুমিত বক্ষের,/অথবা তো চিত্তের মোহগত আহ্বান।'

(২২-সংখ্যক কবিতা)। আলী আহসান শব্দের বিশুদ্ধতা-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কখনো কখনো এই সচেতনতা কবিতার ভাবগত পরিমণ্ডলকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে মনে হয়। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'শব্দের বিশুদ্ধতার দিকে তাঁর নজর তীক্ষ্ণ এবং এ-কারণেই কৌলিন্যবোধের মাত্রাতিরিক্ততা কখনো কখনো তাঁর কবিতাকে বড় বেশি কৃত্রিম করে তুলেছে।' (২০১০ : ১৫০)। সমালোচকের এই অভিযোগ কবির প্রথম পর্যায়ের কবিতাবলি সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং এ সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তিও আমরা উল্লেখ করেছি। 'যেখানে তিনি পরিবেশনির্ভর, স্বদেশচেতনায় জাগ্রত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল, সেখানে তাঁর ভাষা হয়েছে অকৃত্রিম আনন্দময় এবং স্নিগ্ধতামণ্ডিত।'– মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর (২০১০ : ১৫০) এই মন্তব্যে আমরা পরিণত আলী আহসানকে খুঁজে পাই। শব্দ প্রায়শই আলী আহসানের কবিতায় জীবনের সমার্থক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রণবেশ সেনের মন্তব্য :

> শব্দ আর জীবন, জীবন আর শব্দ, তাঁর কাছে একই মুকুরে মুখ দেখে, এবং একই সংগে। সেইজন্যই তিনি তাঁর প্রেমিকাকে অনায়াসেই বলতে পারেন– "তুমি আমার অনবরত কথা বলার আনন্দ" এবং এতেও আটকে থাকেন না তিনি। তাঁর অনুভূতির গভীরতায় প্রেমিকা ও শব্দ মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায়। হ'য়ে যায় ব'লেই তাঁকে বলতে হয়, "তুমি আর আমি একটি নয়নে, শব্দ এবং অর্থ যেমন, বারিধি এবং কল্লোল যেন এক ইচ্ছার করপুটেই। চোখের বাষ্পে পৃথিবী হারিয়ে তোমাকে দিলাম আপনাকেই"– এটা কিন্তু একটা বিরল অভিজ্ঞতা, শব্দকে এমন রক্তমাংসের শরীরে দেখা। (১৯৮৫ : ৯৫-৯৬)

আলী আহসানের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও পরিণত পর্বে এসে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দকেই আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন, একটি শব্দ কেবল আভিধানিক অর্থকেই ধারণ করে না, শব্দের একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-লৌকিক ঐতিহ্য থাকে, যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতীত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ঐশ্বর্য উন্মোচিত হয় না। 'বিদেশী শব্দগুলো আমার কবিতায় নতুন তাৎপর্যে বহমান হয়নি, উপরন্তু শব্দগুলোর নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি।'– এভাবেই তিনি তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন। *কাব্য-সমগ্রের* ভূমিকায় এই সীমাবদ্ধতার কারণ আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি :

> আরবী–ফারসী শব্দের যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য কবিতার ছন্দে এবং প্রবহমানতায় প্রভাব বিস্তার করেছে তার সঙ্গে বাংলা শব্দের ধ্বনির সাযুজ্য ছিলো অর্থাৎ বাংলা শব্দের যে ধ্বনি সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম তার সঙ্গে যেসব আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনিগত সীমাবদ্ধতা ছিলো আমি সে-সমস্ত আরবী–ফারসী শব্দই ব্যবহার করেছি। সে-সব শব্দ তাদের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক রূপকল্পে এবং ব্যঞ্জনায় আমার কাছে উপস্থাপিত হয়নি। সে-সব শব্দের নিজস্ব ভাষাগত অর্থের বিস্তার এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। (১৯৭৪ : ১৬)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে সৈয়দ আলী আহসানের শব্দ-চেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। একটি শব্দের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত না থাকলে, সেই শব্দের শরীরে কবির অনুভূতির নির্যাস স্বতন্ত্র মাত্রায় উদ্ভাসিত হয় না বলেই মনে করেন তিনি। তাই তিনি কবিতার শব্দ নির্বাচনে অভিজ্ঞতার বাইরে না গিয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকেই অবলম্বন করেছেন। বিদেশি শব্দের প্রতি বিমুখ ছিলেন কবি– একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না, কিন্তু সেইসব বিদেশি শব্দের মধ্যেই তিনি তাঁর বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন, যেসব শব্দাবলি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কিংবা আত্মীকৃত হয়ে আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অলঙ্কার

কবিতায় আমরা জীবনেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির রূপায়ণই কেবল কবিতার উদ্দেশ্য নয়, তাতে প্রাত্যহিক জীবনেরও নানা অনুষঙ্গের অনুরণন লক্ষ করা যায়। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ আমাদের প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যবহৃত শব্দের মতোই, এবং কবিতার ভাষা মানুষেরই ভাষা। পরিচিত শব্দের ওপর নির্ভর করেই একজন কবিকে তাঁর কাব্যসৌধ নির্মাণ করতে হয়। তবুও কবিতার ভাষাকে কবিতার মতোই সুন্দর করে তোলার বিচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস দেখান একজন প্রতিভাবান কবি। এই সৌন্দর্যের কারণ অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করা যাবে, যা শিল্পবোধসম্পন্ন পাঠকের কাছে শেষ পর্যন্ত অসম্পন্ন বলেই প্রতীয়মান হবে। আপাতত দুইটি কারণ উল্লেখ করা যাক– ক. তিনি যা বলছেন তা কেবল তথ্য বা বক্তব্যই পরিবেশন করে না– তা পাঠককে বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু উপহার দিতে চায়, এবং খ. তিনি যেভাবে বলছেন- যেভাবে শব্দকে বিন্যস্ত করছেন, যেভাবে বাক্যের বাঁক বদলে দিচ্ছেন, তার আলোড়ন বা আন্দোলন কেবল পাঠক কিংবা শ্রোতার কানকেই সচকিত করে না, তা প্রাণের গভীরেও অনুরণন সঞ্চার করে। এই যে কানের ভেতর দিয়ে প্রাণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা– এই চেষ্টায় কবির অন্যতম সহায় অলঙ্কার। নারী-দেহে অলঙ্কার ধারণে কেবল নারীর দৈহিক বা বাহ্যিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, সেই সৌন্দর্যের দীপ্তি নারীর অন্তরের নানা তন্ত্রীতেও আঘাত করে এবং তা সঙ্গীতের মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে চায়। কবিতায় নারীর আধিপত্যের মৌল কারণ নিশ্চয়ই নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম কিংবা ঘৃণা থেকে উৎসারিত নয়– নারীর দৈহিক ও মানসিক গড়নও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। নারীকে দেখা, জানা কিংবা অধিকার করার অন্তহীন প্রয়াসের মতোই একজন কবি কবিতার জন্য ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেন। এ কারণেই বোধকরি কবির চোখে কবিতা নারীর মতো কিংবা নারী কবিতার মতো হয়ে ওঠে। কবিতায় অলঙ্কারের অনুসন্ধান সেই অর্থে কেবল কবিতার শারীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়– এর ভেতর দিয়ে কবিতার অন্তরের উষ্ণতাও অনুধাবন করা যায়।

শব্দালঙ্কার

সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি শব্দালঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাঁর কবিতা পাঠকের সকল ইন্দ্রিয়ের কাছেই শৈল্পিক আবেদন জানায়, কিন্তু তাঁর দর্শনেন্দ্রিয়ই সবচেয়ে সতেজ ও সক্রিয় এবং তিনি পাঠকের দেখার চোখকেই প্রথম প্রাণিত করতে চান। শব্দালঙ্কারকে যেহেতু শব্দের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং কবিতার পাঠে শব্দই নানা মাত্রা নিয়ে উন্মোচিত হতে থাকে, তাই শব্দালঙ্কার সৃষ্টির দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন কবি। শব্দালঙ্কার শব্দ পরিবর্তনে অক্ষুণ্ন থাকে না। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি কাব্যদেহের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতায় সন্নিহিত থাকে যে, শব্দালঙ্কারও শব্দের পরিবর্তনে তার দীপ্তি হারায় এবং তা কেবল কবিতার দৈহিক লাবণ্যই নয়, কবিতার অর্থগত অভিব্যক্তিকেও প্রতিহত করতে পারে। একটি সফল কবিতার প্রতিটিই শব্দই ওই কবিতার জন্য অপরিহার্য মনে হয়। কবির উদ্দেশ্য যেহেতু কেবল ভাব বা অভিব্যক্তির উন্মোচন নয়, তা দেখার কিংবা অনুভবের নতুন দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চায়, সেহেতু সার্থক অলঙ্কারও সেই কবিতার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

অনুপ্রাস

অনুপ্রাস কবিতায় ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে। অনুপ্রাসের উপস্থিতিতে কাব্যপঙ্ক্তির শব্দাবলি সঙ্গীতের মতো আলোড়িত কিংবা আন্দোলিত হয়। এই অলঙ্কার একটি শব্দের পাশে অন্য একটি শব্দকে এমনভাবে সংস্থাপিত করতে চায় যে, কবির অনুভবের শৈল্পিক উপস্থাপনের জন্য ওই শব্দটিই যেন আবশ্যক কিংবা অপরিহার্য এবং তখন ব্যবহৃত শব্দের বিকল্প কোন শব্দ কল্পনা করতেও পাঠকের কষ্ট হয়। আলী আহসানের কবিতায় অনুপ্রাসের সচেতন প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অনুপ্রাসের আরোপিত প্রয়োগ কাব্যদেহের জন্য অস্বাস্থ্যকর বলেই মনে করেন তিনি। ফলে তাঁর কবিতার সাধারণ পাঠে অনুপ্রাসের উপস্থিতি প্রায় টেরই পাওয়া যায় না– সচেতন অন্বেষণের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব নির্দেশ করতে হয়। অনুপ্রাসের যথেচ্ছ প্রয়োগে কবিতার ভাষায় যে কাব্যিক স্বরের আগমন ঘটে, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিবৃন্দ সচেতনভাবেই তা পরিহার করতে চেয়েছেন। আলী আহসানের এই সচেতনতা তাঁর কবিস্বভাবেরই অন্তর্ভূত হওয়ায় অনুপ্রাসের আধিক্য কিংবা স্বল্পতা বিষয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন নি। তিনি কাব্যদেহের সৌন্দর্য বিষয়ে যেমন সচেতন, তেমনি অলঙ্কারের আতিশয্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছেন। অনুপ্রাসের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা আলী আহসানের কবিতা থেকে কয়েকটি অনুপ্রাস-আশ্রিত পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

অন্ত্যানুপ্রাস

ক. তোমার দেহের বর্ণনা আমি কি করে করি,
কত বিচিত্র সম্ভার নিয়ে একটি দেশ,
যেখানে বৃক্ষ শাখায় শাখায় পুষ্প ভরি,
কত আলাপের ইতিহাস নিয়ে কথার শেষ। ('তোমাকে : দুই'/*অনেক আকাশ*)

খ. ধ্রুবের একটি তারা আমাদের মিলিত শিখায়
একটি সমুদ্র এসে দুই দেহ এক হ'য়ে যায়। ('প্যারিসের চিঠি'/*অনেক আকাশ*)

গ. এগুলো সাময়িক ব্যাপার, আপনি বা আমি,
ক্ষণকালের জন্য যার হয়তো অনুগামী,– ('কবিতা'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঘ. অবাধ খুশিতে মন যেন সোনা,
চুলের ছায়ায় কত আনাগোনা, (১৯-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঙ. তখন একটি কবিতাতো নয়
রক্তে যখন আকুল বিনয়– (৩১-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

চ. কখনো পুষ্প– রক্তপদ্ম তুমি
তোমার শরীর– সচকিত বনভূমি ('নিমগ্ন মৈনাক : ২'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কবি চরণের শেষের ধ্বনিসাম্য রক্ষা করেছেন। করি–ভরি, দেশ–শেষ, শিখায়–যায়, আমি-গামী, সোনা-গোনা, নয়-বিনয়, তুমি–ভূমি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ। কবিতায় অন্ত্যমিল সৃষ্টির কাজে এই অলঙ্কার সাহায্য করে বলেই একে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয়ে থাকে। অন্ত্যমিল অক্ষুণ্ন রেখে সৈয়দ আলী আহসান খুব বেশি কবিতা লেখেন নি। কিন্তু এই অলঙ্কার প্রয়োগে কবির সফলতার প্রমাণ হিসেবে ওপরের উদাহরণগুলোই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

বৃত্ত্যনুপ্রাস

সৈয়দ আলী আহসান এক বা একাধিক ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কাব্যদেহে সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। একই ব্যঞ্জনের একাধিক অবস্থিতির ফলে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাসে কবিতায় যে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়, তা কানের কাছে সুখকর অনুরণন সৃষ্টি করে এবং প্রাণের গভীরেও ছড়িয়ে দেয় তৃপ্তিদায়ক অনুভব। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

ক. প্রথম পুষ্পের মতো জীবনের স্বপ্নের
সম্ভার ('তোমার মৃত্যুর শেষে'/*অনেক আকাশ*)
[প, ম, এবং র ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

খ. সূর্যের প্রসঙ্গে এসে সে আমার উত্তর-সাধিকা। ('নায়িকা : এক'/*অনেক আকাশ*)
[স-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

গ. তখন তোমার চিন্তা সঙ্গীহীন পাখির ডানায়
সমুদ্রের জলে ভিজে অকস্মাৎ আমারে জাগালো ॥ ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
[ত, ন, র, ম এবং জ-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঘ. সুখী শহরে সন্ধ্যা নেমেছিলো
শান্ত অপ্রেমী মেয়ের আশ্রয়ের মতো ('ভাবনাগুলো : দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
[স, ম এবং র-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঘ. কোন্ গান দেখ তুমি অসময়ে অবারণ? (২২-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
[ন এবং ম-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঙ. প্রিয়-প্রত্যাশী অভিসারে অভিমানে
ঘটাবে সমন্বয় ॥ (২৭-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

Dhaka University Institutional Repository

[প, স/শ,ভ এবং ম-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

চ. অনিবার্য অন্ধকারের দৃষ্টিহীনতার স্বাক্ষর (৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

[ন, দ/ধ, স, ক, এবং র-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ছ. একটি অসম্ভব শূন্যতায় সময়ের অতল, (৫৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

[স/শ,ম, ব/ভ এবং ত-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

জ. তখন আমার শব্দে নতুন বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটুক– ('আমার প্রতিদিনের শব্দ : ৪'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

[ত, ন, শ/স, ম এবং র-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি]

ঝ. ঘাসের অরণ্যে নীল সবুজের অন্তরে প্রভাত, ('বিদেশে সমুদ্র-তীরে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

[স, র, ন এবং ত-ধ্বনির অনুপ্রাস]

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সৈয়দ আলী আহসান একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর কবিতার শরীরে দীপ্তি সঞ্চার করেছে। শব্দেশ্বরবাদী শিল্পস্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃত আলী আহসান তাঁর পাঠককে অভিধান-নির্ভর করে তোলেন না, পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলিকেই তিনি এমনভাবে সজ্জিত করেন যাতে পাঠকের শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ ও সচকিত হয়। বৃত্ত্যনুপ্রাস-আশ্রয়ী শব্দ-সন্নিবেশে সৃষ্ট কাব্যপঙ্ক্তিতে আত্মখচিত চেতনার আলোকসম্পাতের মাধ্যমে আলী আহসান পাঠকের প্রাণে প্রবেশের পথ করে নিয়েছেন।

ছেকানুপ্রাস

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ছেকানুপ্রাসও অনুপস্থিত নয়। যুক্তব্যঞ্জন কিংবা একত্রে অবস্থিত স্বতন্ত্র-স্বরের দ্বারা গ্রথিত একাধিক ব্যঞ্জন দু'বার আবৃত্তির মাধ্যমে কবি পঙ্ক্তিমধ্যে এক ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি করেন, যা কর্ণকুহরে আঘাত করেই স্তব্ধ হয়ে যায় না, পৌঁছে যায় পাঠক-শ্রোতার প্রাণের গভীরেও। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করি :

ক. দীপান্তর, লোকালয়, স্বপ্ন-ভ্রান্ত অনেক অতীত ('নূতন স্বাদ'/*অনেক আকাশ*)

[ন এবং ত যুক্তভাবে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে]

খ. এ-সমুদ্র শুভ্র মেঘ দিগন্ত বিস্তৃত ইতস্ততঃ ('আরও উর্ধে, আরও দূরে'/*অনেক আকাশ*)

[স এবং ত ধ্বনি যুগ্মভাবে দুবার উচ্চারিত]

গ. এবং আনন্দের মতো সমস্ত বিস্তার ('হৃদয়– তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

[স এবং ত যুগ্মভাবে দু'বার ধ্বনিত]

ঘ. প্রসারিত অতলান্ত ক্লান্তিহীন বিপুল উল্লাসে ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

[ন এবং ত ধ্বনি যুগ্মভাবে দু'বার ব্যবহৃত]

ঙ. অপূর্ব স্বাদে হৃদয় আমার/তৃপ্তির তীরে ঘুমন্ত ॥ ('২-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

[দ্বিতীয় পঙক্তিতে ত এবং র বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে দু'বার উচ্চারিত]

চ. রূপহীন কোনো ঘন নিকুঞ্জে/অযাচিত যত পুষ্প কুঞ্জে, (২৩-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

[ঞ এবং চ যুগ্মভাবে দু'বার ধ্বনিত]

ছ. অন্তিমের দিকে সমান্তরাল পথ-যাত্রায় (১-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

[ন এবং ত যুগ্মভাবে দু'বার ব্যবহৃত]

জ. আমার হৃদয় যেন রক্তসিক্ত একটি গোলাপ। (৫৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

[ক এবং ত যুক্তভাবে দু'বার ধ্বনিত]

ঝ. না হলে কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা থাকতো। ('রবীন্দ্রনাথকে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

[ক ও ছ-ধ্বনি বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে তিনবার উচ্চারিত]

ওপরের উদাহরণগুলোতে সৈয়দ আলী আহসান যুক্তব্যঞ্জনের আশ্রয়ে এবং ভিন্নস্বর-সমন্বয়ে গ্রথিত একাধিক ব্যঞ্জন ব্যবহার করার মাধ্যমে বৃত্ত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছেন। পাঠক-শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সচকিত করার এই কৌশল আলী আহসানের কবিতাকে শ্রুতিমধুর করেছে।

শ্রুত্যনুপ্রাস

সৈয়দ আলী আহসান বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনের সমবায়ে শ্রুত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছেন। বাংলা বর্ণমালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় ধ্বনি এবং তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে চতুর্থ ধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলে বৃত্ত্যনুপাসের সৃষ্টি হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. ব ভ : বক্ষের বৃন্তের ছায়া প্রহরকে করেছে গভীর (তোমার দেহের তীরে'/*অনেক আকাশ*)

খ. ক খ : অন্ধকারে যুবা আমি– কম্পমান শিখা কামনার (নূতন স্বাদ/*অনেক আকাশ*)

গ. ব ভ : ...পলাশগুচ্ছ বলে ভুল করেছিলাম ('বিকেল-আকাশের মেঘ'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঘ. প ফ : পরিচিত ফুল, সমুদ্র এবং পাহাড় ('রবীন্দ্রনাথকে'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঙ. প ফ : আমার পায়ের কাছে বর্শা ফেলে মৃত্যুর বিলাসে ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

চ. ক খ : করনখে যার রক্তকুসুম, (৭-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ছ. চ ছ : চতুর কাকলি ছড়ার মতো (১৬-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

জ. দ ধ : আমি বেদনা থেকে অধিকতর বেদনায় (৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ঝ. ক খ : নারকেল শাখা যখন কাকের পাখা ('তোমাকে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ওপরের উদাহরণগুলোতে উচ্চারণ-স্থানের ঐক্যের ভিত্তিতে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছেন কবি। দৃষ্টান্ত-ক্রমের পরে আমরা নির্দেশ করেছি, কোন ধ্বনির সঙ্গে কোন ধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। একই স্থান থেকে উচ্চারিত হলেও ঘোষ-অঘোষ এবং অল্পপ্রাণতা-মহাপ্রাণতার ব্যবধান বিদ্যমান থাকায় এ জাতীয় অনুপ্রাসের অনুরণনটা অন্য রকম। পাঠক-শ্রোতার কাছে শ্রুত্যনুপ্রাস অধিকতর মনোযোগ দাবি করে।

অর্থালঙ্কার

সৈয়দ আলী আহসান কাব্যদেহের সৌন্দর্য বিষয়ে খুবই যত্নশীল। কবিতার জন্য তিনি এমন সব শব্দের সন্নিবেশ ঘটান, যা কেবল কবির অনুভবের বাহক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেই শব্দাবলি কবির অনুভবকে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করে। শব্দের দৃশ্যমান কিংবা শ্রবণসম্ভব অনুরণনকে তিনি যেমন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তেমনি শব্দের অন্তর্গত শক্তির দিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। ব্যবহৃত শব্দের আর্থবৈশিষ্ট্য কবির অভিজ্ঞতার সারাৎসারকে স্বীকরণ করে অন্য মাত্রায় উদ্ভাসিত হয় বলেই কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশার সীমা অনির্ধারিতই থেকে যায়। অর্থালঙ্কারের ব্যবহারে কবির বক্তব্য সীমা-অতিক্রমী গতি ও দ্যুতি লাভ করে। আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত অর্থালঙ্কারের নানা অনুষঙ্গের প্রবণতা থেকে কবির শিল্পস্বভাবের ব্যাকরণটি চিহ্নিত হতে পারে।

উপমা

উপমার ব্যবহারে কবির উপলব্ধি কেবল স্পষ্টই হয় না, কখনো কখনো এর উপস্থিতিতে তাঁর অনুভব বিস্তৃত অবয়বও লাভ করে থাকে। কবির চিন্তা ও কল্পনার সবটুকু কবিতায় মুদ্রিত হয় না। এমনকি কাব্য-ধৃত অনুভবের পূর্ণাঙ্গ অনুধাবনও পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। শব্দের আশ্রয়ে কবি কখনো চিন্তা ও কল্পনাকে সংহতি দিতে চান, আবার কখনো-বা ছড়িয়ে দিতে চান দৃশ্যমান ও অনুভববেদ্য নানা অনুষঙ্গে। উপমার আশ্রয়ে কবির অনুভববিশ্ব ছড়িয়ে পড়তে চায় এবং ছড়িয়ে যাওয়া চিন্তাকে এক বিন্দুতে এনে ভাবের গভীরদেশে আলোকসঞ্চারের চেষ্টায়ও কবিকে উপমার শরণ নিতে হয়। এই ছড়িয়ে দেওয়া কিংবা সন্নিহিত করার উদ্দেশ্যই কবির স্বপ্নকল্পনার চারপাশে বিচিত্র অনুভব ও অনুষঙ্গের সন্নিবেশ ঘটে। সৈয়দ আলী আহসান উপমা-ব্যবহারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি সবকিছুকেই দর্শনযোগ্য করে তুলতে চান, কিন্তু মানুষের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রতিও তিনি অবিচার করেন না। আলী আহসান অন্তর্লোকের অনুভবসম্ভব নানা মানবিক বৃত্তিগুলোকেও দর্শন-যোগ্য করে তুলতে চান। একটি সাক্ষাৎকারে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 'আমার কবিতার মধ্যে বিচিত্র প্রকৃতির চিত্ররূপ ধরা পড়েছে– কখনও একের পর এক দৃশ্যপট উন্মোচন।' (২০০৩খ : ৮০)। এই দৃশ্যপট নির্মাণের প্রয়োজনেই ক্রমাগত উপমা-সৃজন করেন কবি। 'উপমাই কবিত্ব'– সৈয়দ আলী আহসান জীবনানন্দের এই অভিব্যক্তিকেই যেন শিরোধার্য করেছেন। উপমার মালা গাঁথেন কবি, সেই মালার প্রতিটি ফুলকেই

তিনি তাঁর আত্মখচিত অনুভবের দ্যোতক করে তোলেন। উপমার আশ্রয়েই কবি তাঁর অন্তর্গত ঐশ্বর্যের শিল্পরূপ দিতে চান। *উচ্চারণ* কাব্যের একটি কবিতায় আলী আহসান উপমার প্রতি তাঁর দুর্বলতাকে চমৎকার শিল্পসংহতি দিয়েছেন। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করছি :

তুমি অনবরত উপমায়
আমার সময়ের রাজ্যে ঐশ্বর্য–
একদা অনেকত গাছের পাতায়
বাতাসের নিঃশ্বাস,
শীতের সকালে আমার দৃষ্টির কুয়াশা,
কবিতায় ছন্দ নির্মাণের উৎসাহ,
অন্ধকারে শুধু সুগন্ধে সুগন্ধে পুষ্পচয়ন,
কখনও বৃষ্টি নামলো বলে
নদীতে অনেক ছোট ছোট কথা।
উন্মুক্ত সাগরে
সময়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে
তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ রেলাভূমিতে
তোমার নামের স্মরণে
যে-মুহূর্তে আমি ভাষাহীন,
তখন জীবন, স্বপ্ন এবং রাত্রির নয়নে,
বেদনা ও অশ্রুর সঞ্চয়ে,
অনবরত উপমায়
তোমাকে পেলাম ॥ (৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

উপরিউক্ত কবিতাটি থেকে আলী আহসানের উপমানির্মাণকৌশল অনুধাবন করা যায়। অনবরত উপমায় তিনি তাঁর অনুভব ও উপলব্ধিকে গেঁথে রাখতে চান। এই কবিতায় আমরা যে 'তুমি'কে পাই তা কবির প্রেয়সী হলেও সেই প্রেয়সী উপমার সৌন্দর্য ও সৌকর্যেই উদ্ভাসিত। আমাদের বিবেচনায় এই কবিতায় উপমার মালা গেঁথে 'তোমাকে পেলাম' বলে যে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন, কবির সেই প্রেয়সীর দর্পণে আমরা তাঁর কবিতারই মুখ দেখতে পাই।

'অনবরত উপমায়' সৈয়দ আলী আহসান 'কবিতায় ছন্দ নির্মাণের উৎসাহ' লাভ করেন। উপমার ব্যবহারে কোন ধরনের জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন না কবি। কারণ তিনি উপমার সাহায্যে ভাব ও কল্পনায় গতি-সঞ্চার করতে চান। অধরা অনুভবকে তিনি ছুঁয়ে দেখার আনন্দ দিতে চান। উপমার শ্রেণিভিত্তিক আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আলী আহসানের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উপমার উদাহরণ দিচ্ছি :

অনেক আকাশ

ক. জেনেছি– উটের পায়ে ভেঙে-পড়া কাঁকরের মতো
জীর্ণ হয়ে ঝরে গেল সব স্বপ্ন, সমস্ত বিশ্বাস। ('উন্মুখ দেহের প্রাণ')
খ. প্রথম পুষ্পের মতো জীবনের স্বপ্নের/সম্ভার ('তোমার মৃত্যুর শেষে')
গ. চঞ্চল একটি পাখি স্রোতের মতন
অথবা মাছের মতো কোথায় হারায়
অথবা ওষ্ঠের শেষে গানের মতন
হৃদয়ে জাগ্রত তবু চিরদিন কোথাও তো নেই। ('নায়িকা')
ঘ. ঝড়ের পাখার মতো কোথা থেকে মুছে গেল রাতের প্রহর, ('জুলায়খা')
ঙ. সীন নদী স্রোতোহীন,
সেতুবন্ধ– বলয়ের মতো,

অনেক ভাষার কথা
তীরে তীরে পা-ফেলার মতো–
পুরানো বইয়ের পাতা
ঘাড় নুয়ে শব্দ শুনে শুনে। ('প্যারিসের চিঠি')

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

ক. মুঠোয় ভরা শিমুল ফুলের মতো রোদ
হঠাৎ বাতাসে আনন্দের মতো
ঐশ্বর্য ('কৃষ্ণচূড়া : এক')

খ. তবুও হৃদয় শীত-সকালের নিঃশ্বাসের মতো
এবং আকাশে বিমর্ষ মেঘের অপেক্ষার মতো। ('হৃদয় : তিন')

গ. সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি ('আমার পূর্ব-বাংলা : দুই')

ঘ. এবং ঘটের মতো হৃদয় ভ'রে ওঠা
এবং দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য
একাকী অনেক তারার রহস্যের মতো
অথবা রাগিণীর মতো সমস্ত রমণী
এবং প্রখর পাহাড় বৈশাখের মেঘের মতো ('রবীন্দ্রনাথকে')

ঙ. এখন প্রতিবিম্বিত ফুলের মতো বাঁচা
চাঁদের আলোর মতো
কোনো কিছুকে অধিকার করা নয় ('ভাবনাগুলো : এক')

সহসা সচকিত

ক. যদি মুছে যায়
শিশিরের মতো
আমাদের সংলাপ (৬-সংখ্যক কবিতা)

খ. পৃথিবীতে সরল ঘাসের মতন
উদ্গত পরিধির;
শেষ ইচ্ছার আকাশের মতো
উদার অনেক দূর, (৮-সংখ্যক কবিতা)

গ. তাপিত বারির বাষ্পের মতো/তোমার বক্ষে সাড়া অবিরত, (১৭-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. সকল শরীর ধানের মতন আবেগে আবেশে কম্পিত; (২৪-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. তার চেয়ে ভালো স্মৃতি-সঞ্চয়ে
ফলের মতন অনুভূতির,
মৃণালের মতো অনেক অতলে
চেনা–অচেনার উভয় তীর– (২৬-সংখ্যক কবিতা)

উচ্চারণ

ক. ঘাসের পাতার শিশিরের মতো অথবা সন্ধ্যার আকাশে লালমেঘের মতো সে যেন একান্তভাবে আমার এমন ইচ্ছায় আমার সকল জাগরণে আজ কম্পিত। তাকে তমালের অন্ধকার বলে ভাবতে চাই, পাখির আশ্রয়ের নিভৃত শান্তি বলে ভাবতে চাই, নিস্তরঙ্গ সলিলে অবগাহনের শীতল বিশ্রামের পরিচর্যা বলে ভাবতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মতো অনাবৃত শরীরের আনন্দিত উপভোগ বলে ভাবতে চাই। (১২-সংখ্যক কবিতা)

খ. ...তখন তার অনাবৃত দেহ অশেষ উপলব্ধির মতো এবং উষ্ণতায় নিশীথে বিপুল অন্ধকারে একটিমাত্র প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মতো। (১৩-সংখ্যক কবিতা)

গ. ঝিনুকের আবরণে,
অন্ধকার মুক্তার মতো,
তুমি চিরকাল চিহ্ন-লুপ্ত,
একাকী ॥ (২২-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. সেখানে ক্রমশঃ স্বপ্নের মতো,
দয়িতার নিদ্রাহীন দৃষ্টির মতো,
একটি পাখির বিশ্রামের মতো,
তোমার চিন্তা একটি একাগ্র তপস্যা হয়ে
আমাকে আচ্ছন্ন করলো। (২৮-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. কেমন এক কৌতুহলের মতো, জানালার আড়াল থেকে সচকিত দৃষ্টিপাতের মতো, ফাল্গুনের মোহ-মুকুলিত সকাল বেলায় আমি একটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজকে জাগরিত করলাম। (৩৬- সংখ্যক কবিতা)

আমার প্রতিদিনের শব্দ

ক. করাতে সেগুন কাঠের গন্ধ
চোখের মেঘের মতো সিমেন্টের ধুলো
গাছের পাতা ছুঁয়ে দিনের আলো
নতুন জন্মের মতো সমস্বর। ('প্রতিজ্ঞা')

খ. গাছের বাকলের মতো
অনেক বছরের রেখাগুলো
যার মুখে, ('দেশে ফেরার পর')

গ. কাঁপবে বাতাসে
মাটি থেকে মুক্ত সমুদ্র-গুল্মের
গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়ের মতো
এবং সম্ভবতঃ লবণের কণার মতো। ('সমুদ্র')

ঘ, যেখানে পাখি নদীর মতো/নারী মেঘের মতো
এবং দৃষ্টি অনেক গাছের পাতা ('নিশ্চেতন অস্তিত্ব)

ঙ. প্রণয় যদিবা দ্বীপের মতন একাকী হয়,
অথবা পাহাড়ে তুষারের মতো মৃত্যুময়
যখন শব্দ উপলের মতো বৌদ্ধগান
তখন আমার নির্ণেয় দিন
বন্যার মতো চুল। ('তোমাকে')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, আলী আহসান উপমা-নির্মাণের মাধ্যমে অন্তর্গত অনুভবকে পাঠকের দৃষ্টির সীমায় নিয়ে আসতে চান। আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য নানা বস্তুকেও মানবিক সংবেদনার সঙ্গে তুলনা করে কবি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। মালোপমা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের কৃতিত্ব অসাধারণ। একটি বস্তুকে নানাভাবে দেখেও তৃপ্ত হন না তিনি, এমনকি একই অনুভবের বহুমাত্রিক উপস্থাপনের পরও তাঁর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে অচরিতার্থতার অনাবিল বেদনা। কবির সৃজনপ্রতিভার স্পর্শে এই বেদনা আনন্দের অধিক উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষায় কবি তুলনার মাধ্যমে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সংশয় বা দ্বিধার দোলাচল অবস্থাকে প্রশ্রয় দেন কবি। কবিপ্রতিভার স্পর্শে দ্বিধার ঘায়ে দুই পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান বেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরো ঘনিষ্ঠ ও গভীরতর রূপ লাভ করে। উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে উপমেয় ও উপমানের আত্মীয়তা আরো সুদৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository

হয় বলেই কবির অভিব্যক্তি লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ করব, অনুভূতির চিত্রায়ণে কবির প্রয়াসকে তা দান করেছে শৈল্পিক সংহতি। কবি সবকিছুর একটা দৃশ্যময় অবয়ব দিতে চান। সেই অবয়ব নির্মাণের প্রয়োজনেই তিনি অন্তরের জিনিসকে বাইরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন এবং বাইরের পৃথিবীকে অন্তরের উর্বর চত্বরে স্থাপন করেন। এই দুইয়ের সংযোগ-সেতু হিসেবে উৎপ্রেক্ষা পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

অনেক আকাশ

ক. সমুদ্রের দীপ্ত কলোল্লাস, দূরাগত হয়ে যেন
রাত্রির বিবরে আজ তুলেছে/গুঞ্জন। ('তোমার মৃত্যুর শেষে')

খ. হৃদয়ে দেহের শোভা স্নায়ু বিগলিত
পদ্মার প্লাবনে যেন বিচলিত তটভূমি সেই। ('নায়িকা : এক')

গ. অন্ধকারে যুবা আমি– কম্পমান শিখা কামনার,
মার্জার নয়ন যেন তীক্ষ্ণরেখ উদ্যত সজীব; ('নূতন স্বাদ')

ঘ. এ-জীবন যেন কোনো তৃষ্ণাহীন বক্র উক্তি, ('জুলায়খা')

ঙ. আশ্চর্য এ-অনুভূতি– এই ছায়া, শব্দমাত্র এই,–
শব্দের পশ্চাতে যেন দৃষ্টির সে নির্ভরতা নেই– ।
স্বপ্নের স্বরূপ যেন, হয়তো তা প্রার্থনার ফল– ('জুলায়খা')

চ. কৃষ্ণচুলের প্রবাহ বাহুতে, প্রগলভ ফুল বন্যা নেমেছে যেন ('নায়ক-নায়িকা')

ছ. তোমার এ-নিদ্রা যেন স্বপ্নহীন, বিরতি-বিহীন;
বিক্ষোভ মুছিয়া গেছে, আমি আজ গতানুগতিক
শীতল বাতাসে যেন ঘুম ভেঙে জাগিয়াছি
নিষ্কাম পুরুষ। ('একাকী')

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

ক. স্বচ্ছ নির্মল গাছের-পাতায় মুক্তা
ছোট ছোট ফুল যেন অনেক তারা
যেন বককন্যাদের চোখের পানি
যেন নিটোল নখের উপর শুক্তির
স্বচ্ছতা ('আমার পূর্ব-বাংলা : তিন')

খ. অতল আগ্রহ নিয়ে অশ্বারোহী সমুদ্র সৈনিক
আমার পায়ের কাছে বর্শা ফেলে মৃত্যুর বিলাসে ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল')

গ. ধরে নাও তোমার আকাশ
অথবা তোমার আলো
হৃদয়ের চতুর্দিকে
যেন বা পাথর হ'লো ('একমুঠো')

ঘ. বৃষ্টির পৃথিবী একা যেন এক আদিম সম্ভার
হঠাৎ পাহাড় যেন একমাত্র অরণ্যে আকাশে। ('বৃষ্টি')

ঙ. বরফ পাথর যেন দু'চোখের বিস্তারিত ঘুম
একক সন্ধ্যায় যেন বৃষ্টিস্বচ্ছ সব উপহার। ('বৃষ্টি')

সহসা সচকিত

ক. প্রতিবাদহীন অসহায় মন
যেন দায়হীন অচলতা (৫-সংখ্যক কবিতা)

খ. অতিরঞ্জনে মধ্যবয়সী
যেনবা পঁচিশ হ'ল

এবং সহসা যৌবন-দেহলীতে,– (৭-সংখ্যক কবিতা)

গ. নিটোল দ্রাক্ষা তোমার কপোল
এবং বক্ষে উদ্বোধন–
উপাধান যেন চিরাশ্রয়ের
তরঙ্গ যেন বরণীয়, (১১-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. অবাধ খুশিতে মন যেন সোনা,
চুলের ছায়ায় কত আনাগোনা (১৯-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. মনে হয় যেন দূরের কথার শুধু কুশলের লঘু সমাচার, (২৫-সংখ্যক কবিতা)

উচ্চারণ

ক. যে-শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো, যে-শব্দ উচ্চারিত হল এবং যে-শব্দ উচ্চারিত হবে সবাই যেন একই অনিঃশেষ কলকণ্ঠের বন্যাধারা। (২-সংখ্যক কবিতা)

খ. আদিম গুহার নির্জনতায় সত্য-আবিষ্কারের যে যন্ত্রণা, তাও একপ্রকার কারাকক্ষের যন্ত্রণা, বর্তমানে কর্মের অনিবার্যতায় অবসর-কামনায় যে পিপাসা তাও যেন এক অসহায় বন্ধনের নির্যাতন। (১০-সংখ্যক কবিতা)

গ. স্মৃতির মৌমাছিগুলো
কালো চুলের খোঁপা হ'য়ে
দৃষ্টিকে ঢেকে দেবে। (৩১-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. পল্লীপথে চলতে চলতে আমি যেন নতুন পৃথিবীর সৌরভকে পেলাম। (৩২-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. মনে হলো যেন যৌবন তার শেষ অনুরাগের চিহ্ন আমার কপালে তিলকের মতো রেখে গেল। (৩৬-সংখ্যক কবিতা)

চ. আজ সকাল বেলায় আমার অতীত যেন মুছে গেল এবং প্রতিমুহূর্তে ভবিষ্যৎ যেন শিশিরবিন্দুর মতো ঝরে পড়লো। আমার পৃথিবী যেন প্রত্যাবর্তনহীন দ্বীপান্তর। (৪১-সংখ্যক কবিতা)

ছ. তা যেন তোমার মনে
রক্তিম ইচ্ছার বন্যা ছড়ায় ॥ (৭৮-সংখ্যক কবিতা)

আমার প্রতিদিনের শব্দ

ক. যখন কথা বলি
মনে হয়–
একটি ছোট্ট পাথর রাত্রির নীরবতাকে
শাসন করছে। ('দেশে ফেরার পর')

খ. মনে হয় কত অতলে গাছের শিকড়
নেমে গেছে ('বিশ্রাম')

গ. তার চোখের পাতা স্বপ্নে ভারী হয়েছে
যেন তা অবিচল নিদ্রার গবাক্ষ, ('সমুদ্র')

ঘ. যেখানে অন্ধকার যেন কখনও
শেষ হয় না। ('কলকণ্ঠের অতীতে')

ঙ. ক্রমান্বয়ে বিচলিত তরল শিলা
মৃত্যুতে গত হ'য়ে
শীতল শান্ত পৃথিবীর ত্বক হ'ল, ('কলকণ্ঠের অতীতে')

চ. বক্ষের দুইটি বৃন্ত/হৃদয়ের দু'টি চোখ যেন ('ব্যঞ্জনা')

ছ. অতল তরঙ্গ যেন বিস্ময়ের/নিতম্ব মেখলা ॥ ('ব্যঞ্জনা')

জ. আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য যেন এক সুর-সঙ্গতি
স্মৃতির অপূর্ণতায় আমি যেন
সমুদ্রের একটি ঢেউ ('অনবরত : ৩')

ঝ. মৃগরাজ-ক'টি সুন্দর মনোহর
ভেঙে পড়ে যেন উর্ধ্বগিরির ভারে, ('নিমগ্ন মৈনাক : ৩')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়ে আলী আহসান এই দুইয়ের নৈকট্যের গ্রগাঢ়তাকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। এই নৈকট্যের কল্পনায় দূরবর্তী দুইটি বস্তু কিংবা অনুষঙ্গ একে অন্যের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন, তার স্বরূপ অনুধাবনে পাঠককেও সৃজনশীল হয়ে উঠতে হয়। কবির উৎপ্রেক্ষা নির্মাণের প্রধান প্রবণতা, অদৃশ্য কিংবা অনুভবসম্ভব অনুষঙ্গকে দৃশ্যমান বস্তুর সন্নিকট করে তোলা। এর ফলে আলী আহসানের কবিতা চিত্ররূপময় ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

রূপক

রূপকের অন্তর্নিহিত অর্থের অনুধাবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকের কল্পনাপ্রতিভা ও সৃজনশীলতার ওপর নির্ভরশীল। কবির অন্তর্গত অনুভবের সারাৎসার রূপকে স্ফটিকসংহতি লাভ করে। 'আত্মআবিষ্কারের সাধনা যেখানে আধুনিকতার মূলমন্ত্র, সেখানে রূপক নিঃসন্দেহে অন্তর্গত প্রেরণার দ্যোতক। এ কারণে আমরা দেখবো আধুনিককালে রূপক বহির্জাগতিক জীবনব্যবস্থা থেকে ক্রমশঃ সরে কবির নিজস্ব অন্তর্রাজ্যে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিককালে রূপকের জটিলতার কারণও এইখানে।' (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০২)। সৈয়দ আলী আহসান উপমেয় ও উপমানের ব্যবধান মুছে দিয়ে অনুভবকে শৈল্পিক সংহতি দান করেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দকে আভিধানিক অর্থের পরিধি থেকে মুক্ত করে কবি তাতে চিন্তা ও কল্পনার সারাৎসার আরোপ করেন। ফলে একটি শব্দকেই কখনো কখনো অনেক অনুচ্চারিত শব্দের দায়িত্ব পালন করতে হয়। শব্দ-প্রয়োগে অধিকতর মিতব্যয়ী হতে গিয়েই আলী আহসান রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত রূপক কেবল কবির বক্তব্যকেই সংহতি দেয় না, তা কবির অনুভব কিংবা উপলব্ধির শরীরে সৌন্দর্য সঞ্চার করে। আবেগের বিস্তারকে প্রশ্রয় না দিয়ে আবেগের সংযত অবয়ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন কবি। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

অনেক আকাশ

ক. শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদে মৃত্যুই প্রধান– ('তোমার দেহের তীরে')
খ. দ্বীপান্তর, লোকালয় স্বপ্ন-ভ্রান্ত অনেক অতীত– ('নূতন স্বাদ')
গ. নিম্নে দিক-চিহ্নহীন সুপ্তিমগ্ন মেঘের প্রান্তর ('আরও উর্ধে, আরও দূরে')
ঘ. ঘনকৃষ্ণ মেঘলোকে কল্লোলিত করিতে চেয়েছ– ('সঞ্চয়')
ঙ. দিগন্ত-বিস্তৃত-শূন্য নির্বিকার উদাসীন দেশ, ('সিন্ধুর মরুমধ্যে')
চ. অন্তর্হিত দৃষ্টি হতে পিঙ্গল-রক্তিম-নীল বর্ণ সমারোহ, ('প্রমাণ')
ছ. প্রান্তর-স্বভাব নিয়ে আমি শুধু আশ্রয় হারাই। ('ইস্তাম্বুল')

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

ক. আমার চেতনার ধনধান্য
এবং অন্ধকারের প্রদীপ ('আমার পূর্ব-বাংলা : তিন')
খ. তুমি শেষহীন আকাশ
এবং অনেক সজীবতায় হৃদয়ের নীলাম্বর ('রবীন্দ্রনাথকে')
গ. সব দিন মুছে দিয়ে কুমারী রৌদ্রের তাপে চোখ মেলে চাই ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল')
ঘ. বিলাস-শান্তিতে এলো প্রলয়ের ঝড় ॥ ('বৈশাখ– করাচীতে')
ঙ. ডানা-মেলে-দেওয়া দুপুরের রোদ ('একাকী')

সহসা সচকিত

ক. শিশিরের ফুল মুঠোয় নিলাম, (১-সংখ্যক কবিতা)
খ. জীবনের নীলে স্বপ্নে প্রলয়,

প্রজাপতি-লঘু সময়ের ক্ষয়, (৩-সংখ্যক কবিতা)

গ. চেনা-অচেনার নব আয়োজন
মানস-পুতুলে নির্মাণ ক'রে যাব। (৭-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. সংশয় নিয়ে শীতের সকাল
কুয়াশা-করাঙ্গুলির অকাল, (১৩-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. দেহ-দেহলীতে প্রদীপ জালিয়ে
ভুলে যাই ভয় আবরণের; (২১-সংখ্যক কবিতা)

চ. রেখা-বন্ধনে কাকলি অধীর
সূর্য-প্রদীপ তুমিই জ্বালো– (৩০-সংখ্যক কবিতা)

উচ্চারণ

ক. তাইতো নিঃশেষিত শব্দ-মেখলায়,
অন্তিমের দিকে সমান্তরাল পথ-যাত্রায়, (১-সংখ্যক কবিতা)

খ. নয়ন-প্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে চিত্ত অক্ষম, (১৯-সংখ্যক কবিতা)

গ. নতুন কথার উদ্ভাবনার মতো
বিস্ময়ের মেখলা ছড়িয়ে
আমাকে ভাসিয়ে নিতো। (২৯-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. তাইতো প্রেমের উচ্ছলতায় আমার তোমার সকলের চোখে বাণীর প্রদীপ জ্বেলে একটি আকুলতার রাজ্য নির্মাণ করি, (৪৫-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. সেখানে অন্ধকার আলোর অবশেষে
অনবরত হৃদয়ের প্রজাপতি,– (৫৪-সংখ্যক কবিতা)

চ. ইচ্ছার ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তরঙ্গ তুলেছিলে। (৭৭-সংখ্যক কবিতা)

ছ. নদীর অবিরাম যাত্রায়
তোমাকে স্মৃতির মেঘমালা করে, (৮১-সংখ্যক কবিতা)

আমার প্রতিদিনের শব্দ

ক. আমার সব তুচ্ছ আশা যদি/শব্দের সৈকতে নামে, ('তা হলেইতো আমি জয়ী')

খ. তার সমস্ত আশা
অন্ধকারের নীরবতায় হারিয়ে গেল। ('দেশে ফেরার পর')

গ. যখন সন্ধ্যায় কণ্ঠস্বরে ঝড় উঠলো, ('কলকণ্ঠের অতীতে')

ঘ. তখন একটি নীরব রমণী
জন্ম-সাধনাহীন রিরংসার উত্তাপে
একটি অরণ্যে আমাকে ডাকলো ('সময় পেলাম না')

ঙ. সমস্ত গান নিদ্রার তরঙ্গে ভেসে
রাত্রির আকাশে এবং
স্নায়ুর শিথিলতায়
ছড়িয়ে দেয়। ('সম্পন্ন মানুষ এবং গান')

চ. কখনো পুষ্প– রক্তপদ্ম তুমি
তোমার শরীর সচকিত বনভূমি ('নিমগ্ন মৈনাক : ২')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে সৈয়দ আলী আহসানের রূপকনির্মাণকৌশল অনুধাবন করা সম্ভব। তাঁর কবিতায় উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার যেমন প্রচুর, তেমনি রূপকেরও বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপমেয় ও উপমানের সহাবস্থানে তাঁর কবিতার ভাষায় যেমন সংহতি এসেছে, তেমনি কবির ভাবের উপস্থাপনও সংযত এবং শৈল্পিক মাত্রা লাভ করেছে।

সমাসোক্তি

সৈয়দ আলী আহসান বিষয় বা উপমেয়র ওপর বিষয়ী বা উপমানের ব্যবহার আরোপ করে পাঠকের ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তার সীমা অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। সাধারণ মানুষের বস্তুনিষ্ঠ চিন্তায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর যে স্বভাব চিহ্নিত হয়ে থাকে, একজন সৃজনশীল মানুষের কল্পনাপ্রতিভা সেই স্বভাবের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চায়। এই অতিক্রমণের অভিপ্রায় থেকেই কবিতায় ব্যবহৃত চেতন, অচেতন, মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণির ওপর অন্য কোন প্রাণির বা বস্তুর স্বভাব আরোপিত হয়। আলী আহসানের বাংলা কবিতায় সমাসোক্তির প্রকৃতি অনুসন্ধান করলে আমরা লক্ষ করব, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাণীর ওপর প্রাণীর স্বভাব বা সক্রিয়তা আরোপ করেছেন। ফলে কবিতার ভাষায় যেমন সজীবতা এসেছে, তেমনি ভাবের শরীরেও তা যোগ করেছে অন্যরকম দীপ্তি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ক. জীর্ণ হয়ে ঝরে গেল সব স্বপ্ন, সমস্ত বিশ্বাস। ('উন্মুখ দেহের প্রাণ'/*অনেক আকাশ*)

খ. বিচূর্ণিত দিনগুলি শ্বেতমেঘে উড়ে চলে যায়। ('আরও ঊর্ধে, আরও দূরে'/*অনেক আকাশ*)

গ. সূর্যের সোনা তব কুন্তলে খেলুক উর্মিদোল– ('নায়ক-নায়িকা'/*অনেক আকাশ*)

ঘ. মৃতপ্রাণ জেগে ওঠে কবরের পরিসর হতে ('সঙ্কেত'/*অনেক আকাশ*)

ঙ. ভূমধ্যসাগর দেখে দুই চোখে নীলের উজাড় ('ভূমধ্যসাগর'/*অনেক আকাশ*)

চ. সবুজ গাছ আমার কাছে প্রদীপ হয়েছিলো ('বিকেল-আকাশের মেঘ'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ছ. আমার আনন্দে তোমার সমস্ত দেহ/হৃদয় হোল ('হৃদয়– এক'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

জ. এক সময় কানে কানে কথা সচকিত বাতাস ('আমার পূর্ব-বাংলা : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঝ. হৃদয়ের অন্তর্দাহে সমস্ত গান যদি পাখি হয় ('উপমা'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ঞ. তখন তোমার চিন্তা সঙ্গীহীন পাখির ডানায়
সমুদ্রের জলে ভিজে অকস্মাৎ আমারে জাগালো ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

ট. অর্থবিহীন তোমার কথায়/বিপুলা পৃথিবী মেঘ হয়ে যায়, (৪-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঠ. নব বসন্তে আম্রমুকুল/পথের ধূলারে করেছে ব্যাকুল, (৫-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ড. মেঘ আর ছায়া এবং বাতাস/সর্ব সময়ে সময় হারিয়ে/শুধু অবিরত চিন্তিত, (১০-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঢ. আমার কামনা দৃষ্টি ছুঁয়েই/গোপন গুহায় প্রদীপ হয়, (১৬-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ণ. তখন কথার প্রজাপতিগুলি/গোপন পাতার আড়ালে থামে, (২৬-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ত. কখনও বৃষ্টি নামল বলে/নদীতে অনেক ছোট ছোট কথা। (৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

থ. আমার আকাঙ্ক্ষায় তার শরীরের রেখায় হৃদয়ের নিবেদন পুষ্পিত হয়ে উঠুক। (১২-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

দ. যে নির্জীব মৌনতা আমাদের গ্রাস করেছে তা আমাদের মন থেকে প্রত্যাশা সরিয়ে দিয়েছে, অভিমান সরিয়ে দিয়েছে। (২৬-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ধ. তোমার চিন্তা একটি একাগ্র তপস্যা হয়ে/আমাকে আচ্ছন্ন করলো। (২৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

ন. স্বপ্নের বৃষ্টি ছড়িয়ে/একটি উজ্জ্বল শীতল/স্পর্শ পেলাম–(৩০-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

প. তোমার চোখের কামনা বিনয়ে অর্ঘ্য হয়েছে ('তোমার সঙ্গে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ফ. আমাদের দেশের ধূলিকণা কি/ন্যায়বিচারের দাবি জানাবে না? ('দেশে ফেরার পর'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ব. অবিশ্বাসে পাথরের টুকরোগুলো/শব্দ করলো ('সময় পেলাম না'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ভ. আমার মলিন ধূলায়/স্বপ্নের রেখাঙ্কন ছিলো,/অশ্রুবিন্দু প্রজাপতি হয়েছিল ('বেঁচে থাকা'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ম. হৃদয়ের উষ্ণতায় যদিবা নক্ষত্র কোনো/পাতা হতে চায় ('বিদেশে সমুদ্র-তীরে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে সৈয়দ আলী আহসান সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন বিশেষ কোন দৃশ্য কিংবা অনুভবকে কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন, তখন সমাসোক্তির আশ্রয়ে বর্ণনাকে সংকুচিত করতে চেয়েছেন। অচেতন কিংবা বিমূর্ত অনুভবকে সচেতন ও মূর্ত অনুষঙ্গের সক্রিয়তার সমীপবর্তী করায় পুরো কবিতার ভাব কেবল সংহতই হয় নি, তাতে সজীব আবহ সঞ্চারিত হয়েছে। এভাবেই সমাসোক্তির আশ্রয়ে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর কবিতা ভাব কিংবা অভিব্যক্তিকে সজীব-সবল-সপ্রাণ করে তোলেন।

অন্যাসক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অন্যাসক্ত অলঙ্কারে জড় বস্তুর ওপর সজীব ও সপ্রাণ অনুষঙ্গের ক্রিয়ার পরিবর্তে কেবল বিশেষণ আরোপিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান অন্যাসক্তের আশ্রয়ে জীব ও জড়ের মধ্যেই কেবল বন্ধন রচনা করেন নি, বিমূর্ত কিংবা অধরা অনুভবকেও দৃশ্যমান করে তুলতে চেয়েছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আলী আহসান কবিতায় নয়নের প্রসাদ প্রত্যাশা করেছেন। নয়নকে তৃপ্ত করেই তিনি চিত্তের নিকটবর্তী হতে চান। কারণ, তাঁর মতে, 'নয়ন-প্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে চিত্ত অক্ষম, আবার চিত্তের উপলব্ধি ছাড়া নয়ন একাকী রূপ দর্শন করতে পারে না।' (১৯৭৪ : ২০০)। এ প্রসঙ্গে তিনি গৌতম বুদ্ধের সাধনার কথা স্মরণ করেছেন যিনি 'চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার কথা' বলেছেন। কবি 'বিস্মিত নয়নে পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার' করতে চেয়েছেন। নয়নের তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করার এই শৈল্পিক প্রয়াস থেকেই কবি অনবরত অন্যাসক্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন, যা তাঁর কবিতার পাঠককে দৃষ্টির আনন্দ থেকে চিত্তের প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. প্রসারিত আকাশের সীমাহীন অন্ধ/অন্ধকারে ('তোমার মৃত্যুর শেষে'/*অনেক আকাশ*)
খ. হৃদয়ের রক্ত জ্বলে নিদ্রাহীন রাত্রির সমীপে ('নায়িকা : এক'/*অনেক আকাশ*)
গ. অকস্মাৎ সেই আজ উরু-পুষ্ঠ লাঞ্ছনা চেয়েছে ('নূতন স্বাদ'/*অনেক আকাশ*)
ঘ. বেদনায় আলোকিত এই সুর কে করে নির্ণয়? ('জুলায়খা'/*অনেক আকাশ*)
ঙ. নিষ্ঠুর একাকী রাত্রে আকাশে তাকাও– ('প্যারিসের চিঠি'/*অনেক আকাশ*)
চ. আকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত সমস্ত সময় ('বিকেল-আকাশের মেঘ'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
ছ. বাতাসের দোলায় শিহরিত সচকিত একটি তরঙ্গ ('হৃদয়– দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
জ. শিহরিত তটপ্রান্তে ঐক্যতানে আমারে জড়ালো– ('যখন অনেক কথা বলা শেষ হল'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
ঝ. তোমাকে দিলাম প্রজাপতি-দেহে নির্মম অবসাদ ('তোমাকে দিলাম'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
ঞ. তাপহীন বিনীত শীতের মতো– ('ভাবনাগুলো : তিন'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
ট. নিমেষে সরল ঘাসের মতো/উদ্‌গত পরিধির, (৮-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
ঠ. প্রতিবেশী চোখ সূর্য ছড়ায়/কত ইঙ্গিতে সচকিত (১৯-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
ড. অবিচল তাপে সূর্য সাড়ায়/ধনধান্যের কত প্রদীপ; (২৪-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
ঢ. বিস্ময়ের মেখলা ছড়িয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিতো। (২৯-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)
ণ. নিষ্ঠুর পাথর এবং অর্থহীন কীট-পতঙ্গের দুয়ারে (৩০-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)
ত. একটি উজ্জ্বল শীতল স্পর্শ পেলাম– (৩০-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)
থ. সমুদ্রের বিষণ্ণ মাছগুলো তোমাকে দেখবে– (৭৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)
দ. একটি গন্ধের প্রসন্ন সময়/বাতাসে ছড়ায়। ('সৌন্দর্য'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)
ধ. স্নিগ্ধ অন্তরালে মৃত্যুর জন্য– /প্রতীক্ষা ('কলকণ্ঠের অতীতে'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)
ন. যা'র আহত স্মৃতি ক্লান্ত ঢেউয়ের মতো/ভেঙ্গে যায়। ('সম্পন্ন মানুষ এবং গান'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, সৈয়দ আলী আহসান অপ্রাণ কিংবা অচেতন বস্তুর ওপর চেতনের গুণ আরোপ করেছেন। যা কিছু কেবলই অনুভবসম্ভব, কবি তাদের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান সজীব অনুষঙ্গে প্রযুক্ত বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। বিশেষণরাশির এই স্থান-বিচ্যুতির ফলে কবির অনুভব পাঠকের চিত্তকেও সৃজনশীল করে তোলে। আলী আহসান অন্যাসক্ত অলঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর চারপাশের দৃশ্যমান বাস্তবতা এবং কল্পিত ও অনুভূত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সংযোগ-সেতু নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা অলঙ্কারে সজ্জিত হলেও তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত অলঙ্কার তাঁর কবি-ভাষারই একটা সাধারণ প্রবণতা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর কবিতার অলঙ্কার কবিতার ভাবের অনুকূল হওয়ায় তা ভাষার শরীরে স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হয় না। কবিতার ভাবকে তিনি সজীব সপ্রাণ করে তুলতে চান বলেই নানা অলঙ্কারে তিনি কবিতার ভাষাকেও সহজ স্বতঃস্ফূর্ত রাখতে চেয়েছেন। আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত অলঙ্কার কবিচৈতন্যের উষ্ণতায় শৈল্পিক সংহতি লাভ করেছে।

চিত্রকল্প

সৈয়দ আলী আহসানের অধিকাংশ কবিতাই চিত্ররূপময়। তিনি কবিতায় নানা অলঙ্কারের সন্নিবেশে উপলব্ধিকে দৃশ্যময় করে তুলতে চান এবং সেই দেখা কেবল চোখের দেখায় সম্পন্ন হয় না, তাতে প্রাণের অংশগ্রহণও অনিবার্য হয়ে ওঠে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'চিত্রকল্পের মৌল ধর্মই হলো প্রত্যক্ষতা এবং স্বতন্ত্র কোনো অলংকার না হলেও চিত্রকল্পের অবস্থান উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তির নানা বৃত্তে। কবিতায় চিত্রকল্পের প্রবেশ অনিবার্য এবং এর অধিকার সুবিস্তৃতও।' (২০০৫ : ৭৯)। আলী আহসান বলেছেন, 'আমার কবিতার মধ্যে আমি আমার ভাষার, শব্দের অধিকারকে নির্মাণ করতে চেয়েছি।' (২০০৩খ : ৮০)। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রণোদনা থেকেই তিনি শব্দের সন্নিবেশে অনুভব ও উপলব্ধিকে পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো করে উপস্থাপন করতে চান। পাঠকচৈতন্যে কবির একটি ছবিই অনেকগুলো ছবি হয়ে উঠতে চায়। কেবল চোখের দেখায় সেই ছবির রূপ, রস ও রহস্যের পূর্ণাঙ্গ উন্মোচন সম্ভব হয় না। কবির কল্পিত কিংবা প্রস্তাবিত ছবি পাঠকের সৃজনপ্রতিভার স্পর্শ প্রত্যাশা করে। সেই স্পর্শের শিহরনেই একজন পাঠক কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি থেকে গ্রহণ করেন কবি-মনের নানা প্রান্তে লুকিয়ে থাকা অভিজ্ঞতার সারাৎসার। কবির চেতনার সঙ্গে একাত্ম হন তিনি, অবচেতনের নানা অনুষঙ্গও তাঁর কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। এমনকি কবি-মনের অচেতন অংশের দিকেও সৃজনশীল পাঠকের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। কবি যে দার্শনিক অভিব্যক্তিকে কবিতায় রূপ দিতে চান, তারও একটা অবয়ব অনুধাবনের চেষ্টা করেন পাঠক। এই অনুধাবন কেবল একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় না বলেই প্রতিভাবান পাঠক তাঁর নানা ইন্দ্রিয়কে সজাগ-সরাগ-সচকিত করে তোলেন।

আলী আহসান কবিতায় যে শব্দপ্রতিমা নির্মাণ করেন, সেই প্রতিমা পাঠকের প্রাণের কাছে কখনো গানের মতো, কখনো ঘ্রাণের মতো, কখনো স্পর্শের মতো অনুভব নিয়ে আসে। *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্য প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে আলী আহসান বলেছেন, 'মূল সত্যটা হচ্ছে শব্দকে গ্রহণ করে আমি প্রতিবাদকে বাঙ্ময় করতে চাই। চিত্রকল্পের মধ্যে ঘাস আছে, দেয়ালের ফাটল আছে, ভাঙা সিঁড়ি আছে, সাপ আছে, অন্ধকার আছে, আবার রুদ্ধকক্ষের মধ্যে বিদ্যুতের বাতি আছে। এই চিত্রকল্পগুলো একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর আশ্রিত হয়। কিন্তু আমার চেতনাকে প্রকাশ করার জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয়েছে।' (২০০৩খ : ৮০)। কবির এই মন্তব্য থেকে চিত্রকল্প বিষয়ে তাঁর ভাবনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। তাঁর কবিতা মূলত তাঁর চেতনারই চিত্রায়ণ। কবির কোন কোন কবিতায় চেতনার চারপাশে তাঁর অবচেতন ও অচেতনের অভিজ্ঞতাও সংহত হতে চায়। তখন তা চিত্রের সীমানা ভেঙে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। 'সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় সাধারণ চিত্রকল্প, ইন্দ্রিয়জ চিত্রকল্প, মানবিক চিত্রকল্প, সমষ্টিগত চিত্রকল্প, আগন্তুক চিত্রকল্প, সমন্বিত চিত্রকল্প, বৃহৎ চিত্রকল্প, ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্প, সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প, পরাবাস্তব চিত্রকল্প, মৃত্যু বিষয়ক চিত্রকল্প, ঐতিহ্যবিষয়ক চিত্রকল্প অর্থাৎ তাঁর চিত্রকল্পে তিনি বিশ্বভাবনাকে মূর্ত করেছেন।' (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১৯৮)। সৈয়দ আলী আহসানের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

অনেক আকাশ

ক. শীতল বাতাস যেন সচকিত তীক্ষ্ণ
স্পর্শ নিয়ে
হৃদয়েরে করেছে তুহিন। অকস্মাৎ
বিকশিত
পুষ্পের মতো জীবনের স্বপ্নের
সম্ভার
অন্তরালে নির্যাতিত হ'ল। ('তোমার মৃত্যুর শেষে')

খ. দুটি চোখে রাত্রিশেষ– নির্যাতিত তবুও নির্ভয়,
ধ্রুবের একটি তারা আমাদের মিলিত শিখায়
একটি সমুদ্র স্রোতে দুই দেহ এক হ'য়ে যায়। ('প্যারিসের চিঠি')

গ. রুক্ষতায় হাওয়া লাগে, জেগে ওঠে সমস্ত প্রান্তর

বালুকা-শিশুরা মিলি মৃত্তিকার মেঘ গড়ে তোলে, ('সিন্ধুর মরুমধ্যে')

ঘ. অন্ধকার বন হ'তে উজ্জ্বল ব্যাঘ্রের মত দীপ্ত প্রলম্ফনে,
অদৃশ্য সে সত্তা হ'তে রূপাতীত জেগে ওঠে আলোকে
প্রখর–
আলোর স্ফুলিঙ্গ যেন– প্রবাহিত তরঙ্গেতে বিমিশ্রিত
প্রাণ। ('প্রমাণ')

ঙ. হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি– হৃদয় সরিয়ে
আমরা দু'জন পাথরের প্রতিভাস মাত্র ॥ ('হৃদয় সরিয়ে')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, কবি শব্দ-সমবায়ে বিচিত্র সব ছবি নির্মাণ করতে চাইছেন। এই ছবির নানা স্তরে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ তাদের পরিতৃপ্তির রসদ খুঁজে পেতে চায়। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতির চিত্রকল্পটি উৎপ্রেক্ষা-নির্ভর। এখানে শীতল বাতাসের অনুভবসম্ভব অস্তিত্বটিকে কবি এমন তীক্ষ্ণতা দিয়েছেন যার স্পর্শে হৃদয় তুহিন হয়ে যায়। বাতাসকে হাতে নিয়ে নেড়ে দেখা সম্ভব না হলেও তুষারের প্রসঙ্গে একটি অবয়ব কল্পনা করে নেওয়া যায় এবং তা দৃষ্টির সীমায় চলে আসে। এই উদ্ধৃতিতে জীবনের সম্ভার যখন পুষ্পের রূপকল্পে উপস্থিত হয়, তখন জীবনের অর্জনসমূহকেও আমরা নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ পাই এবং জীবনের একটা ঘ্রাণও আমাদের মোহিত করে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে চোখের উপমান হিসেবে ধ্রুবতারার উপস্থিতিতে কবির মিলন-প্রত্যাশা চিরন্তন হয়ে ওঠে। সমুদ্রের স্রোত যখন দুইটি দেহের মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যবধান মুছে দিয়ে এক দেহে রূপান্তরিত করে, তখন সেই ঢেউ কেবল আমাদের দৃষ্টি এবং স্পর্শের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। আমরা স্রোতের শব্দ শুনতে পাই, ঢেউয়ের আঘাতে আমাদের শরীর ভিজে যায় এবং মনের গভীরদেশেও আমরা তার অভিঘাত অনুভব করি। উদ্ধৃতি গ-এ হাওয়ার জেগে ওঠা সমস্ত প্রান্তরেই প্রাণের স্পর্শ ছড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া বালুকা-শিশুদের মেঘ হয়ে ওঠার দৃশ্য অসাধারণ যা পাঠকের চেতনার চত্বরেও বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে চায়। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবির সত্তা বনের অন্ধকার ভেদ করে উজ্জ্বল বাঘের মতো আস্ফালন করে ওঠে। অর্থাৎ, আত্মার একটি দৃশ্যমান অবয়ব এখানে নির্মাণ করেন কবি। এই সত্তাকেই কবি প্রবাহিত তরঙ্গের মতো স্পর্শযোগ্য করে তোলেন। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে হৃদয়ের রূপকল্পে পাথরের উপস্থিতিতে হৃদয় দৃষ্টির সীমায় চলে আসে, হৃদয়কে স্পর্শ করার সুযোগ হয় এবং মনোবেদনার গভীরতাও এই পাথরের উপমানে পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। এভাবেই *অনেক আকাশ* কাব্যে ছবির আড়ালে কবি তাঁর অনুভূতির উন্মোচন ঘটান, যা আমাদের অনুভব ও ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে।

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

ক. গাছের পাতায় সবুজ রাত্রি
আর নদীতে নদীতে অফুরন্ত বিশ্রামের নীল
উজ্জ্বল লতায় সমর্থিত অনেক গাছ ('কৃষ্ণচূড়া : এক')

খ. জান্‌লা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে আছি
প্রজাপতির মতো বাতাস
আর পাখিদের ঘুমের মতো
নিম গাছের পাতায় অল্প অল্প রোদ ('হৃদয় : তিন')

গ. এখানে আমার পৃথিবী অনেক
রূপময়ী
এখানে নদীর মতো এক দেশ
শান্ত, স্ফীত, কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিণী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ব-বাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী ॥ ('আমার পূর্ব-বাংলা : এক')

ঘ. গ্রীষ্মের রাত্রিতে তোমাকে দেখা
একটি দ্বীপের মতো
নির্বিরোধ অলসতায় অনুত্তাপ দেহ ('উপমা')

ঙ. ডানা-মেলে-দেওয়া দুপুরের রোদে
আমি যখনই একটি চিল বা কাককে
দেখি
তখন তাদের নিশ্চিন্ততায় আমি
দেখি একাকীত্বের উজ্জীবন ('একাকী')

একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্য থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে সৈয়দ আলী আহসান চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। উদ্ধৃতি-ক রাত্রির শরীরে গাছের পাতার সবুজ মেখে নিয়েছে। এমনকি বিশ্রামের শরীরও জলের গভীর থেকে নীলকে শোষণ করেছে। রাত্রি এবং বিশ্রাম কেবল অনুভবের সীমায় আবদ্ধ না থেকে তা আমাদের দৃষ্টিকেও সৃষ্টিশীল করে তোলে। গাছের শরীরে উজ্জ্বল লতার বিস্তার গাছের সৌন্দর্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাতাস হয়ে উঠেছে প্রজাপতির মতো, আর ঘুমের শরীরে পাখির মতো ডানা জুড়ে দিয়েছেন কবি। ফলে বাতাস ও ঘুমের অনুভবসম্ভব পরিধি অতিক্রম করে তা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কেও সচকিত করে। নিম গাছের পাতায় যে রোদের বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন কবি, তা আমাদের চেতনায়ও উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়। উদ্ধৃতি-গ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ছবির মতো করে উপস্থাপন করেছে। এই ছবি কেবল চোখের দেখায় সম্পন্ন হয় না, তা সকল ইন্দ্রিয়ের কাছেই তার আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করে। নদীর উপমানে বাংলাদেশকে দেখার মধ্য দিয়ে এ দেশের শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছবি যেমন ভেসে ওঠে, তেমনি মানুষের জীবনের গতিশীলতার কথাও আমাদের মনে আসে। বিচিত্ররূপিণী বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আমরা যে ছবি দেখতে পাই সেই ছবি আমাদের অনুভবের বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচনের প্রণোদনা সঞ্চার করে। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি যাকে দ্বীপের মতো করে গ্রীষ্মের রাত্রিতে অবলোকন করছেন সেই দ্বীপ বিচ্ছিন্নতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই যে দেহ আলস্যে নিরুত্তাপ, তা বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ভারাক্রান্ত। একটি দ্বীপের উপমানে বেদনার এই রূপায়ণ চমৎকার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও এই বিচ্ছিন্নতা কিংবা একাকীত্বের বেদনা ধরা পড়েছে। 'ডানা-মেলে-দেওয়া দুপুরের রোদে' একটি নিঃসঙ্গ চিল কিংবা কাকের আকাশে উড়ে বেড়ানোর মধ্যে কবির নৈঃসঙ্গ্যই যেন মূর্ত হতে দেখি।

সহসা সচকিত

ক. তখন হৃদয় নদী হতে চায়
পাখি হতে চায় নিমের শাখায়,
মুক্তার মতো বৃষ্টিধারার
ছবি হতে চায় প্রত্যহ, (৫-সংখ্যক কবিতা)

খ. কাল শেষ হয় গাছের শাখায়
বিশীর্ণ দিন হলুদ পাতায়
বিকেলের রোদে মূর্ছিত হ'ল
যৌবন-অভিমান ॥ (১৩-সংখ্যক কবিতা)

গ. আঁচল সরালে যে প্রদীপ কাঁপে
তার দু'টি শিখা তাপের মতো,
সে-তাপে তোমার দেহের গ্রন্থি
তনু সঞ্চারে মূর্ছাহত; (১৮-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. নাভিমূল ছুঁয়ে দেহের রাত্রি
কাম্য অশেষ যখন যাত্রী,

সূর্যের নীচে বরফের মতো
হৃদয়ে তখন তরলতা। (১৯-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. গন্ধরাজের বিকাশের মতো
ঢেউগুলো ভেঙে পুষ্প হয়,
বিমুগ্ধ-শোভা নাগকেশরের
তোমার শরীরে অভ্যুদয়। (২৬-সংখ্যক কবিতা)

সৈয়দ আলী আহসানের সহসা *সচকিত কাব্য* থেকে গৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, চিত্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে কবি তাঁর অনুভবের বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে হৃদয়ের প্রতিমান হিসেবে নদী, পাখি এবং বৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন কবি। এতে হৃদয়ের সজীবতা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি হৃদয়ের কথাগুলোও পাখির গানের মতো প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সময়কে গাছের শাখায় বসিয়ে দেন কবি এবং সময় অতিবাহিত হওয়াকে গাছের পাতার ঝরার সঙ্গে তুলনা করেন। এই সময়ের মতোই মানুষের যৌবন চলে যায়। ফলে সময়ের চলে যাওয়ার দৃশ্য আমাদের চোখেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর যৌবনকে চমৎকার চিত্রকল্পে উপস্থাপন করেছেন কবি। স্তনের কম্পনকে অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা করে সেই উষ্ণতায় প্রদৃপ্ত হয়েছেন তিনি। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও নারীর যৌবনকেই উপজীব্য করেছেন কবি। যৌবনের উষ্ণতায় হৃদয়ের বিগলনকে কবি সূর্যের নীচে বরফের গলে যাওয়ার দৃশ্যে ধারণ করেছেন। এখানে যৌবনের অনুভবকে দৃশ্যে ধারণ করেছেন কবি। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আলী আহসান শরীরের সৌন্দর্যকে গন্ধরাজের বিকাশের সঙ্গে তুলনা করে সেই সৌন্দর্যের দীপ্তি নদীর ঢেউয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে এই উদ্ধৃতিতেও আমরা নারী-দেহের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিকে নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে দেখি।

উচ্চারণ

ক. যখন প্রেমের কথাগুলোও
শিশিরের মতো ঝরে ঝরে
প্রথম রৌদ্রের দৃষ্টি ছুঁয়ে
নিঃশেষ হল (১-সংখ্যক কবিতা)

খ. সূর্যের কপোল ছুঁয়ে
একটি চিরকালের প্রেমের কথা
মেঘে মেঘে লাল এবং নীলে
একটি বিস্মিত বেদনার মতো
আমাকে আকুল করলো। (৩০-সংখ্যক কবিতা)

গ. অনেকগুলো রূপোর টাকা
চাঁদের আলোতে ঝরে-পড়ার মতো
তোমার কথার আনন্দে
আমি চঞ্চল হয়েছিলাম। (৩১-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. তোমাকে বিব্রত করবো না ভেবে
আমি তখন
একটি আলোর চিহ্নের মতো
কোনো শব্দ না করে
ফুলের উপর বসতাম। (৭০-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. যখন সকালের বাতাস
হাতের পিঠ, চিবুক, কপাল ছুঁয়ে
পাখির কাকলি হচ্ছিলো (৭৫-সংখ্যক কবিতা)

উচ্চারণ কাব্যেও আলী আহসান চমৎকার কিছু চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি তাঁর চিন্তা ও কল্পনার নানা স্তরে আলোক প্রক্ষেপণের চেষ্টা করেছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি যখন প্রেমের কথাগুলোকে শিশিরের মতো ঝরে পড়তে দেখেন, তখন সেই শিশিরের জলে আমাদের শরীর ও মন দুই-ই আর্দ্র হয়ে যায়। কথাগুলোকে আমরা দেখে নিতে পারি, এর স্পর্শের অনুভবও আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু 'রৌদ্রের দৃষ্টি ছুঁয়ে' শিশিরের বিলিন হওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়ার মতোই আমাদের কথাগুলোও এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। এভাবেই কথার শারীরিক অবয়ব নির্মাণ করেন কবি। খ এবং গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও কবি কথার শরীরে নানা রঙের পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি আলোর চিহ্নের মতো শব্দের শরীরে আরোহণ করেন এবং নিঃশব্দে ফুলের ওপর আসন রচনা করেন। ফুলের ওপর শব্দের অবয়ব নিয়ে বসার এই দৃশ্য চমৎকার এবং চিত্রকল্প হিসেবে এই দৃশ্য পাঠকের মনের গভীরে অনুরণন সঞ্চার করে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাতাসের যাতায়াতকে কবি দৃশ্যে ধারণ করতে চেয়েছেন। বাতাস যখন 'হাতের পিঠ, চিবুক, কপাল ছুঁয়ে' যায় তখন তার আবেদন আমাদের নানা ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে। আর বাতাস যখন পাখির কাকলি হয়, তখন বাতাসের ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা গানের ভেতর দিয়ে আমাদের প্রাণের ভেতর প্রবেশ করে।

সৈয়দ আলী আহসান *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যে অসাধারণ কিছু চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লেখা কবিতাগুলোকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মর্মস্পর্শী কিছু ছবি এঁকেছেন যা কবির মনন ও আবেগ-সংরাগে হয়ে উঠেছে শিল্পসফল চিত্রকল্প। এই কাব্যে আবেগকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন কবি। স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা কবিতাগুলোতেও আবেগ ও চিন্তা চিত্রকল্পে সংহত হয়েছে।
আমার প্রতিদিনের শব্দ কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. যখন কথা বলি
মনে হয়
একটি ছোট্ট পাথর রাত্রির নীরবতাকে
শাসন করছে। ('দেশে ফেরার পর')

খ. ছিন্নমূল উৎপাটিত বৃক্ষের মতো
তার সমস্ত আশা
অন্ধকারের নীরবতায় হারিয়ে গেল। ('দেশে ফেরার পর')

গ. সব সৌন্দর্যই একটি নিমীলিত
বীজের মতো
কখনও লতা হবে–
কখনও হয়তো অনেক
শাখার গাছ ॥ ('সৌন্দর্য')

ঘ. তারপর তাকে আর দেখা যাবেনা
শুধু তার চুল বিশৃঙ্খল
কাঁপবে বাতাসে
মাটি থেকে মুক্ত সমুদ্র-গুল্মের
গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়ের মতো
এবং সম্ভবতঃ লবণের কণার মতো। ('সমুদ্র')

ঙ. আমি পলায়নের চেষ্টায়
একান্তে অনন্যনির্ভরতা চেয়ে
শুধু এক কল্পনার আকাশকে
পেলাম–
যেখানে পাখি নদীর মতো

নারী মেঘের মতো
এবং দৃষ্টি অনেক গাছের পাতা ('নিশ্চেতন অস্তিত্ব')
চ. শীতল অন্ধকারে আমার সময় যেন
প্রাচীন স্তম্ভের মতো
যার তলদেশে অনির্ণেয় বুদ্বুদ– ('আমার সময়')

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আলী আহসানের চিত্রকল্প নির্মাণ-কৌশল ধরা পড়েছে। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, কবির কথা একটি ছোট্ট পাথরের রূপকল্পে উদ্ভাসিত। পাথরের অবয়বে কথাকে নির্মাণ করার এই কৌশল অসাধারণ। কবির কথা যখন রাত্রির নীরবতা ভেঙে দেয়, তখন কথার শক্তিই শুধু অনুভূত হয় না, রাত্রির শরীরে কথা-রূপ পাথরের আঘাতে আমরা রাত্রির রক্তাক্ত শরীরও অনুভব করি। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষ করছি, কবির আশা উৎপাটিত বৃক্ষের উপমায় মুদ্রিত। কবি যখন আশাহত হৃদয়কে বৃক্ষের পতনের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন হৃদয় ও আশার একটি স্পর্শযোগ্য অবয়ব পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কবি যাবতীয় সৌন্দর্যকে নিমীলিত বীজের উপমায় চিত্রিত করেন। এই বীজ যখন লতার মতো বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে কিংবা গাছের শাখার মতো আকাশে হাত বাড়ায় তখন সৌন্দর্য ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতির নায়িকা যখন চোখের আড়াল হবে, তখনো তার বিশৃঙ্খল চুলের বন্যায় ভেসে যাবেন কবি। চুল যখন শেকড়হীন সমুদ্র-গুল্মের উপমায় নির্মিত হয়, তখন চুল সমুদ্রের বিস্তৃতির মতোই কবির চৈতন্যকে অধিকার করে নেয়। সমুদ্রের অনুষঙ্গে তার লবণাক্ত জলের স্মৃতিতেও আচ্ছন্ন হন কবি। তাই তিনি লবণের কণার মতোই জলের গভীরে দয়িতার চুলের স্পর্শ অনুভব করেন। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমরা একজন পলায়নপর মানুষের দেখা পাই যে কেবল কল্পনার আকাশে আশ্রয় অন্বেষণ করেন। আকাশ এই কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত যার আশ্রয়ে কবি চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। 'সৈয়দ আলী আহসান আকাশকে বিবেচনা করেছেন ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসেবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাদান রোদ ও বাতাসের মতোই আকাশ এক অফুরন্ত প্রণোদনার উৎস।' (সরকার আমিন ২০০৬ : ৬২)। কবি পলায়নপর মানুষের চোখে যে পাখির ছবি দেখেন সেই পাখি নদীর উপমায় উদ্ভাসিত এবং নারীকেও তিনি মেঘের মতো কল্পনার আকাশে ভেসে যেতে দেখেন। কিন্তু দৃষ্টি যখন বৃক্ষের উপমায় চিত্রিত হয়, তখন সেই দৃষ্টিতে শ্যামল বাংলার প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি মুদ্রিত হতে দেখি। উদ্ধৃতি চ-এ কবি সময়কে প্রাচীন স্তম্ভের অবয়ব দিয়েছেন। কিন্তু সেই স্তম্ভের তলদেশে কবি দেখতে পান 'অনির্ণেয় বুদ্বুদ'। সময়কে স্তম্ভের মতো থমকে দাঁড়াতে দেখলেও সময়ের গভীরদেশে কবি কল্পনা করেন প্রবহমাণ সমুদ্রের গতি ও দীপ্তি।

সৈয়দ আলী আহসান চিত্রকলার একজন বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন। স্কুলজীবনে ছবি আঁকার চেষ্টা করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হন। কিন্তু চিত্রকর্ম এবং চিত্রশিল্পীদের প্রতি বরাবরই তিনি প্রবল আগ্রহ অনুভব করেছেন। দেশি-বিদেশি বিখ্যাত চিত্রকলা বিষয়ে তিনি খোঁজখবর রেখেছেন এবং এ বিষয়ে লেখালেখিও করেছেন। চিত্রকলার প্রতি তাঁর এই আগ্রহের প্রভাব তাঁর কবিতায়ও লক্ষ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "চিত্রকলার মধ্যে যেমন 'কিউবিজম' পদ্ধতি আছে, 'ল্যান্ডস্কেপ' পদ্ধতি আছে, আবার 'পরাবাস্তববাদী' পদ্ধতি আছে, এগুলোর সবকিছুই আমার কবিতার আঙ্গিক নির্মাণে সহায়তা করেছে।" (২০০৩খ : ৮০)। ফরাসি চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর কবিতার মিল আছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। অর্থাৎ, চিত্রধর্মিতা তাঁর কবিতার একটি সাধারণ প্রবণতা। এই চিত্রের গভীরে তিনি তাঁর মনন ও আবেগের এমন এক শৈল্পিক সংস্থান সৃষ্টি করেন, যা কেবল চিত্র নয়, চিত্রের অধিক এক অনুভবে পাঠককে আপ্লুত করে। তাঁর শব্দাশ্রয়ী শিল্পকর্মে আবেগ সদর্থক প্রণোদনা সঞ্চার করেছে। কারণ তাঁর আবেগ চিন্তা ও বুদ্ধির সংমিশ্রণে শিল্পসহায়ক হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, 'আবেগ যদি চিন্তার দ্বারা সমর্থিত না হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত না হয়, তবে সে-আবেগ কুহেলিকাই সৃষ্টি করতে পারে– জীবনের সম্ভাবনা জাগায় না। তাই শুধুমাত্র আবেগের উপর নির্ভরশীল যে-সব কবিতা তাতে কোনও বিস্ময় নেই।' (১৯৭৪ : ১৯৯)। এই বিস্ময়সূচক শৈল্পিক অভিব্যক্তির জন্যই আলী আহসানের কবিতায় নির্মিত চিত্রকল্পসমূহ বিশেষ ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত।

প্রতীক

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি কবির অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়ে নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। কবিতার শব্দ অভিধানের শাসন উপেক্ষা করে কবিচিত্তের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কবির উপলব্ধির সারাৎসার যখন শব্দের শরীরে দীপ্তি সঞ্চার করে, তখন তা পাঠকের চৈতন্যে তৃপ্তিদায়ক আবহ ছড়িয়ে দেয়। কবির বিশেষ অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি যখন কোন শব্দকে অবলম্বন করে মূর্ত হতে চায় তখন শব্দের শরীরে দূরসঞ্চারী দ্যুতি সঞ্চিত হতে থাকে। প্রতীক কবিতার পাঠককে কবির অভিজ্ঞতার নিকটবর্তী করে তোলে। 'অভিজ্ঞতা যখন কবিহৃদয়ের অনুভূতিতে দানা বেঁধে ওঠে তখন প্রকাশে তার স্বরূপাভাস মেলে এবং বিভিন্ন বিচিত্র প্রক্ষেপ থেকে এ স্বরূপের বিশ্লেষণও চলতে পারে। তবে এ বিশ্লেষণের সত্যমিথ্যা বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা খুব বেশী জরুরী নয়, তার চেয়ে বরং জরুরী হচ্ছে প্রতীকের ঘন গভীর রহস্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা।' (আহমদ কবির ১৯৭৪ : ১০০)। এই রহস্যের উন্মোচনে কবিকে পাঠকের সৃজনপ্রতিভার ওপর নির্ভরশীল হতেই হয়। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৯ : ২৮) যখন প্রতীকের গভীর রহস্যে জাল ফেলে শূন্যতা, শামুক, মুক্তা কিংবা আশ্চর্য উদ্ভিদ তুলে আনতে চান, তখন বুঝতে পারি, প্রতীকের অন্তর্গত ঐশ্বর্যের অনুধাবনে পাঠককেও কবিপ্রতিভার সমান্তরালে অগ্রসর হতে হয়।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকও 'বিশেষ কোন অর্থে আবদ্ধ নয়'। তা আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে 'ভাষা ও ভাষ্যের সমতল থেকে গভীর তাৎপর্য ও ইঙ্গিতময়তার দিকে' নিয়ে যায়। প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলী আহসানের একটি ব্যক্তিত্বচিহ্নিত পরিমণ্ডল লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থেই বিশেষ কিছু প্রতীকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আলী আহসানের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ থেকে তাঁর জীবনবোধ এবং শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কেও একটি ধারণা লাভ করা যায়। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু প্রতীকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

অনেক আকাশ

ক. তুমি মৃত্যুর পথে নেমে যাবে
আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে ('তোমাকে ধরা যায়না')

খ. জেনেছি সূর্যের সাক্ষে কিছু নেই আশ্বাসের মতো
জীর্ণ হয়ে ঝরে গেছে সব স্বপ্ন, সমস্ত বিশ্বাস। ('উন্মুখ দেহের প্রাণ')

গ. বন্ধুর পার্বত্য দিন– শবরী বালিকা
বল্কলে ঢেকেছে কটি– হৃদয় নিটোল
নয়নে আশ্চর্য মেঘ– মেঘ নয়, সূর্যের সায়র
পদ্মার প্লাবনে যেন বিচলিত তটভূমি সেই। ('নায়িকা : এক')

ঘ. বিশুষ্ক নদীর তীরে হৃদয়কে মূর্ছিত পেয়েছি–
হঠাৎ যৌবনগত মুহূর্তের এ কী দাবানল! ('নূতন স্বাদ')

ঙ. জুলেখা বিচিত্র-রূপা-সর্বক্ষেত্রে অস্থির চঞ্চল,
য়ূসূফে কামনা করি দৃষ্টি তার হয়েছে সজল। ('জুলায়খা')

চ. পুরানো প্রহরগুলি বসন্ত-আকাশে আজ
এক ঝাঁক পাখি যেন মেঘের মতন। ('একাকী')

ছ. সমস্ত নামের সত্য আদমের নাম মাহাত্ম্যের
বিজ্ঞাপিত হ'ল যাহা সৃষ্টির পূর্বাহ্নে অন্ধকারে ('নাম')

জ. অন্ধকার বন হ'তে উজ্জ্বল ব্যাঘ্রের মতো দীপ্ত প্রলম্ফনে, ('প্রমাণ')

ঝ. আমরা দু'জন পাথরের প্রতিভাস মাত্র ॥ ('হৃদয় সরিয়ে')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে কতিপয় শব্দ কিংবা অনুষঙ্গ প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'মৃত্যু' কেবল জীবনাবসানের আবহ রচনা করে না, প্রিয় মানুষের অনুপস্থিতি, বিচ্ছিন্নতা কিংবা ভুলে যাওয়াকেও কবি মৃত্যুর রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন। কবি তাঁর প্রিয়তমার ওষ্ঠে যে 'গান' ছড়িয়ে দিয়েছেন তা কবির সৃষ্টিকর্মেরই প্রতীক। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'সূর্যে'র মধ্যে আমরা দেখতে পাই আমাদের দিনযাপনের নানা আনন্দ-বেদনার ছবি। উদ্ধৃতি গ-এর 'বন্ধুর পার্বত্য দিন' প্রতিকূল বাস্তবতার প্রতিভাস হিসেবে চিত্রিত। এই উদ্ধৃতির 'শবরী বালিকা'র মধ্যে আমরা কেবল

চর্যাপদের নায়িকার ছবিই দেখছি না, শবরীর দর্পণে পৃথিবীর সকল প্রেমিকার চিরন্তন অবয়বটিই আমাদের মনে পড়ে। এখানে 'মেঘ' দুঃসময়ের স্মারক, আর 'সূর্যে'র প্রতীকে আমরা মুদ্রিত হতে দেখি কবির আলোকিত সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'বিশুষ্ক নদী' কবির নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তোলে এবং 'দাবানল' হয়ে ওঠে কবির অন্তর্গত যন্ত্রণার প্রতীক। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'জুলেখা' ও 'ইউসুফে'র কণ্ঠে আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের অচরিতার্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। উদ্ধৃতি চ-এর 'পাখি' কবিমনের প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। ছ-সংখ্যক উদ্ধৃতি 'আদম' নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। উদ্ধৃতি জ-এর 'অন্ধকার' এবং 'উজ্জ্বল ব্যাঘ্র' যথাক্রমে মানবপ্রবৃত্তির জাগরণ এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার প্রতিভাস মুদ্রিত। ঝ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'পাথর' কবিমনের অকথিত কথার গভীরে লুকিয়ে থাকা পুঞ্জিভূত বেদনার অবয়ব হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

ক. আমার স্মৃতির ইতিহাস
যৌবনের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া। ('কৃষ্ণচূড়া : এক')

খ. স্খলিত শিশিরবিন্দু তোমার
মৃত্যু আনলো ('হৃদয়– এক')

গ. প্রজাপতির মতো বাতাস
আর পাখিদের ঘুমের মতো
নিম গাছের পাতায় অল্প অল্প রোদ ('হৃদয়– তিন')

ঘ. আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল ('আমার পূর্ব-বাংলা : দুই')

ঙ. এবং আমার সমস্ত আগ্রহ
চিলের মতো ডানা মেলেছে ('রবীন্দ্রনাথকে')

চ. পাথরের সম্মোহনে নিঃশেষ
আমি এখন একান্তে সময় হারাই– ('ভাবনাগুলো : তিন')

ছ. আমার আগুন সকাল বেলাকার ফুলের মতো লাল ('ভাবনাগুলো : তিন')

আলী আহসানের *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্য থেকে সংগৃহীত ওপরের দৃষ্টান্তসমূহের কিছু শব্দ প্রতীক হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃতি ক-এর 'কৃষ্ণচূড়া' ফুলের আর্থপরিধি অতিক্রম করে যৌবনের উজ্জ্বল-উদ্দাম-প্রাণবন্ত সময়ের স্মারক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই কৃষ্ণচূড়া যৌবনের রঙিন স্বপ্নের কথাও মনে করিয়ে দেয়। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতির শিশিরবিন্দু ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতীক। এই উদ্ধৃতির 'মৃত্যু' অনুষঙ্গও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের প্রতীক হিসেবে গৃহীত। উদ্ধৃতি গ-এর 'প্রজাপতি', 'পাখি' এবং 'রোদ' যথাক্রমে সুন্দর, স্বাধীন এবং আলোকিত আগামীর প্রতিভাস রচনা করে। উদ্ধৃতি ঘ-এর 'তমাল' কেবল একটি বৃক্ষ নয়, এর মধ্য দিয়ে কবি সবুজ শ্যামল বৃক্ষশোভিত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তমালের প্রসঙ্গে লোকপুরাণের রাধা-কৃষ্ণের কথাও নিশ্চয়ই পাঠকের মনে পড়বে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'চিল' কবির স্বাধীন চিন্তার স্মারক হিসেবে কল্পনার আকাশে ডানা বিস্তারের অভিপ্রায়কে ধারণ করে এবং এই স্বাধীনতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে আন্তরিক অবগাহনের আনন্দে উজ্জ্বল। চ-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'পাথর' প্রতীক আলী আহসানের কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। পাথরের রূপকল্পে কবি তাঁর বেদনাকে যেমন শিল্পসংহতি দিয়েছেন, তেমনি প্রিয় মানুষের কঠিন হৃদয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। উদ্ধৃতি ছ-এর 'আগুন' কবির অন্তর্গত তীব্র বাসনার প্রতীক এবং যে 'লাল'কে কবি ফুলের উপমায় চিত্রিত করেছেন সেই লালও কবির অভিপ্রায়ের রক্তাক্ত অবয়বকে ধারণ করে আছে।

সহসা সচকিত

ক. নদী আর পাখি এবং রাতের
শান্ত বাতাসে তুমিই নির্ঝরিণী,– (১-সংখ্যক কবিতা)

খ. তোমার বুকের দুটি তারা দেখে,
শিশিরের রেণু দেহে দেহে মেখে, (২-সংখ্যক কবিতা)

গ. অভিসারগত তমালের তলে
প্রার্থনাসহ সম্মোহন? (৩-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. বিশ্রামহীন সে-কথার নদী
হঠাৎ পদ্ম আবরণ। (৪-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. চঞ্চল হৃদয় নিয়ে
অবিরল কয়েকটি পাখি– ((১২-সংখ্যক কবিতা)

চ. আদিম গুহায় অন্ধকারের
প্রথম নয়ন শঙ্কিত। (১৫-সংখ্যক কবিতা)

ছ. উষালগ্নের পাখির মতন
আমার চোখেও কুয়াশা বয় ॥ (২৩-সংখ্যক কবিতা)

সহসা সচকিত কাব্য থেকে গৃহীত ওপরের দৃষ্টান্তসমূহে আলী আহসান কতিপয় শব্দ কিংবা অনুষঙ্গকে প্রতীকী তাৎপর্য দান করেছেন। উদ্ধৃতি ক-এর নির্ঝরিণী সুন্দর, সচল, আরাম ও আনন্দদায়ক অনুভূতির স্মারক। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ‘তারা’র অবয়বে কবি তাঁর প্রিয়তমার স্তনের সৌন্দর্য চিত্রিত করেছেন। এই উদ্ধৃতির ‘শিশিরের রেণু’ও কবির দৈহিক সংরাগে উজ্জ্বল। উদ্ধৃতি গ-এর ‘তমাল’ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার ছবি মনে করিয়ে দেয়। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ‘নদী’ প্রেয়সীর সঙ্গে কবির অন্তহীন কথকতার আবহ রচনা করেছে। উদ্ধৃতি-ঙ এবং ছ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ‘পাখি’ কবি-হৃদয়ের সুন্দর স্বপ্নগুলোকে আকাশে ওড়ার শক্তি সরবরাহ করেছে। উদ্ধৃতি চ-এর ‘অন্ধকার’ যখন আদিম গুহা থেকে উঠে আসে, তখন তা প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে।

উচ্চারণ

ক. যেখানে আমার অস্তিত্ব
অনিবার্য অন্ধকারের দৃষ্টিহীনতার স্বাক্ষর, (৪-সংখ্যক কবিতা)

খ. কখনও বৃষ্টি নামলো বলে
নদীতে অনেক ছোট ছোট কথা। (৮-সংখ্যক কবিতা)

গ. আদিম গুহার নির্জনতায় সত্য-আবিষ্কারের যে যন্ত্রণা, তাও একপ্রকার কারাকক্ষের যন্ত্রণা, বর্তমানে কর্মের অনিবার্যতায় অবসর-কামনায় যে পিপাসা তাও যেন এক অসহায় বন্ধনের নির্যাতন। (১০-সংখ্যক কবিতা)

ঘ. কখনও সবুজ, কখনও পাহাড়ের
কম্পিত ছায়ার অতল,
কখনও সন্ধ্যার তরল আগুন (২৯-সংখ্যক কবিতা)

ঙ. এবং আমাকে
মৃতদেহের মতো বরফের পাথর করলে? (৩৪-সংখ্যক কবিতা)

চ. তখন আনন্দকে আড়াল করে একটি গ্লানি ও অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করবো, যেখানে কেবলমাত্র অনুভূতিহীন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিপাতের স্বাক্ষর আছে। (৪০-সংখ্যক কবিতা)

সৈয়দ আলী আহসানের *উচ্চারণ* কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে ওপরের উদ্ধৃতিসমূহ। উদ্ধৃতি ক-এর ‘অন্ধকার’ আলী আহসানের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত একটি প্রতীক। কবির অন্তর্গত অভিপ্রায়সমূহ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে কবি অন্ধকারের শরণ নিয়েছেন। উদ্ধৃতি খ-এর বৃষ্টি আরাম, আনন্দ ও প্রশান্তির স্মারক হিসেবে গৃহীত। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ‘পিপাসা’ আভিধানিক অর্থ অতিক্রম করে কবির ইচ্ছে ও কল্পনার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠকচৈতন্যে অন্যরকম আলোড়ন সঞ্চার করে। উদ্ধৃতি ঘ-এর ‘আগুন’ কবির সৃজনপ্রতিভার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতির ‘পাথর’ প্রতীকটি বহুবার ব্যবহার করেছেন কবি যা কখনো প্রতিবন্ধকতা, কখনো স্তব্ধতা,

আবার কখনো অনুভূতিহীন মানুষের নিষ্প্রাণ অবস্থার প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। চ-সংখ্যক উদ্ধৃতি 'ক্ষুধার্ত' শব্দটির শরীরে আলী আহসান প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের ভোগলিপ্সু বাস্তবতা অঙ্কন করেছেন।

আমার প্রতিদিনের শব্দ

ক. হতশ্রী আমার শব্দ আজ সমস্ত ক্ষুব্ধ ইচ্ছার
উপমা হতে চাচ্ছে–
আমার প্রতিদিনের শব্দ। ('আমার প্রতিদিনের শব্দ : ২')

খ. আমার সব তুচ্ছ আশা যদি
শব্দের সৈকতে নামে, ('তা হলেইতো আমি জয়ী')

গ. সবুজকে স্পর্শ করতে যেয়ে
করাঙ্গুলি মানুষের রক্তে লাল হলো। ('প্রতিজ্ঞা')

ঘ. তোমার চোখের কামনা বিনয়ে অর্ঘ্য হয়েছে
এবং তোমার সঙ্গে একাকী আমি–
আনন্দের উপঢৌকনে একটি প্রস্ফুটিত শতদল ॥ ('তোমার সঙ্গে')

ঙ. একটি ছোট্ট পাথর রাত্রির নীরবতাকে
শাসন করছে। ('দেশে ফেরার পর')

চ. অবিশ্বাসে পাথরের টুকরোগুলো
শব্দ করলো
আমি শঙ্খ ঝিনুকে নাম লিখবার
সময় পেলাম না। ('সময় পেলাম না')

ছ. যখন সকল আশাই মোমের মতন গলে,
তখন তোমার পথ হবে ঘাস
নরম পাথর যেন। ('তোমাকে')

জ. আমি পাতা অথবা পাখি
অথবা গান না হ'য়ে
একখণ্ড পাথর হয়েছি ॥ ('অনেক ঘনিষ্ঠতায়')

আমার প্রতিদিনের শব্দ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে সৈয়দ আলী আহসান প্রতীক নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধিকে শিল্পসংহতি দিয়েছেন। আলী আহসানের এই কাব্যের নামকরণের মধ্যে এক ধরনের প্রতীকী আবহ সঞ্চারের চেষ্টা আছে। কবির প্রতিদিনের শব্দ প্রকৃত অর্থে তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। শিল্পকর্মের প্রতীক হিসেবে শব্দের ব্যবহার আলী আহসানের একটি লক্ষ্যযোগ্য প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উদ্ধৃতি ক এবং উদ্ধৃতি খ-এর শব্দও কবির শিল্পকর্মের স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি গ-এর 'সবুজ' এবং 'লাল'-এর ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লাল রক্তের কথা স্মরণ করেছেন এবং এই দুই রঙের সম্মিলনে বাংলাদেশের পতাকার ছবিটিই পাঠকের মনে ভেসে ওঠে। উদ্ধৃতি ঘ-এর 'শতদল' শব্দটি কবির চৈতন্যের স্পর্শে অসাধারণ প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে কবির অন্তর্গত সৌন্দর্যভাবনার উন্মীলন শতদল শব্দটির আশ্রয়ে শৈল্পিক সংহতি লাভ করেছে। উদ্ধৃতি ঙ, চ, ছ এবং জ-এর পাথর শব্দটিকে কবি প্রতীকী তাৎপর্য দিয়েছেন। আমরা লক্ষ করছি, কোন উদ্ধৃতিতেই পাথর শব্দটি আভিধানিক অর্থে আবদ্ধ থাকছে না, বরং তা কবির ক্ষুব্ধ হিয়ার বিপন্ন অবস্থাকে তুলে ধরছে। এভাবেই কবির অভিজ্ঞতার সারাৎসারকে ধারণ করে শব্দ একটি বিশেষ অনুভব বা উপলব্ধির প্রতিভূ হয়ে ওঠে, যা কেবল অর্থের আধিপত্যকে অস্বীকার করে কবির উপলব্ধির প্রতিনিধিত্ব করে।

আলী আহসান মিথ-পুরাণের জগৎ এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে নানা চরিত্রকে কবিতায় আবাহন করেছেন, যারা প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কখনো কখনো লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকধর্ম, রূপকথার চরিত্রও কবিব্যক্তিত্বের স্পর্শে

প্রতীক হয়ে উঠেছে। ইউসুফ-জুলেখা, আদম, নেফেরতিতি, স্ফিংস, ইউলিসিস, রাধা-কৃষ্ণ, হর বা শিব, নূহ নবী, হযরত মোহাম্মদ, বৃত্র, ইন্দ্র ইত্যাদি পৌরাণিক, ধর্মীয় কিংবা লৌকিক চরিত্র এবং কিছু পৌরাণিক বা ধর্মীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন কবি, যা বিশেষ অবস্থায় প্রতীকী মাত্রা লাভ করেছে। আলী আহসানের কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পুরাণ

মানব-ইতিহাসের কালপরম্পরাগত ধারা পুরাণের আশ্রয়ে প্রবাহিত হয় বলেই শিল্পসাহিত্যে তা মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। পুরাণ-চেতনা একজন শিল্পস্রষ্টাকে ঐতিহ্যসংলগ্ন হতে প্রাণিত করলেও পুরাণকাহিনির অবিকল উপস্থাপন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং পৌরাণিক আবহে তাঁর স্বকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতারই রূপায়ণ ঘটান। আধুনিক শিল্পসাহিত্যে পৌরাণিক অনুষঙ্গের অনুবর্তন প্রকৃত অর্থে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানকে পাঠ করারই শৈল্পিক প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃত।

সৈয়দ আলী আহসান পৌরাণিক অনুষঙ্গকে তাঁর জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পস্বভাবের অনুকূলে উপস্থাপন করেছেন। মিথ-পুরাণের পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে কবি তাঁর স্বকালের নানা সমস্যা, সঙ্কট ও সম্ভাবনাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর অনেক কবিতায় আমরা লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোককাহিনি, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস, লিজেন্ড ইত্যাদি অনুষঙ্গেরও অনুবর্তন লক্ষ করি। তাঁর কবিতার পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচনাসূত্রে আমরা এইসব অনুষঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

আলী আহসান তাঁর প্রস্তুতিপর্বে কবিতায় ইসলামী উপকথাকে অবলম্বন করেছেন। নানা ধর্মকাহিনির আলোকে স্বকালের বিক্ষুব্ধ বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি। তাঁর *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* গ্রন্থে আমরা লক্ষ করি, মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে যে-সকল নবী-রাসুলকে প্রেরণ করেছেন, আলী আহসান তাঁদের অনেককেই তাঁর কবিতায় আবাহন করেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আমরা এই কাব্যের একটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> যেখানে চলেছ সে মাটিতে একদিন
> প্রবালের মতো সফেদ পানিতে তরল সোনার ঢেউ ওঠে রঙ্গীন,
> ইসমাঈলের নখের আঘাতে জাগে আবে জমজম
> প্রবল পয়োধি সিক্ত করলো প্রশান্ত জঙ্গম
> সরু সুর যত খেজুর পাতারে দোলা দেয় শবনম।
> কওসর ভরা কাঁখের কলস টলে
> বেদুঈনী কার চোখের কোণায় সোনার স্বপ্ন জ্বলে
> কচি বাচ্চার জান তর হল এক ফোঁটা পানি পিয়া
> আম্মা হাজেরা মুছলো চোখের পানি
> বেদনার দিন হাসির ছোঁয়ায় করে ওঠে টলমল
> জুলমৎ ঘিরে আলো নামে সন্ধানী।
>
> খঞ্জর তুলি আব্বা ইব্রাহীম
> কচি বাচ্চারে বুকে নিয়ে কাঁদে
> চোখে কাপড়ের ঠুলি
> তেয়মা-তেবুকে সাত সাগরের নীলে
> কে যেন বুলালো বেদনার কালো তুলি। (‘মক্কা মোয়াজ্জমার পথে’/*চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, আলী আহসান কুরআনের কাহিনির আলোকে কবিতা রচনা করেছেন। ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইলের আত্মদানের মহিমা কীর্তন করেছেন কবি। একই সঙ্গে কারবালার কাহিনিকে এই কবিতায় বর্তমান বাস্তবতায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মমতে, পবিত্র জলের উৎস আবে জমজমের কথা বলেছেন কবি,

সেই সঙ্গে কারবালার যুদ্ধে পানির অভাবে হাজেরা এবং তাঁর শিশুপুত্রের করুণ অবস্থাও তুলে ধরেছেন। আলী আহসানের পরিণত পর্বের কাব্যচর্চায় ইসলামী অনুষঙ্গের প্রয়োগ হ্রাস পেলেও একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাই তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই, ইউসুফ নবী এবং জুলেখার কথা, পৃথিবীর প্রথম মানব আদম এবং তাঁর পুত্রদের কথা, নূহের প্লাবনের কথা ইত্যাদি অনুষঙ্গ। পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহারে আলী আহসান উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই কুরআনের ঘটনা ও চরিত্র যেমন তিনি অবাধে গ্রহণ করেছেন, তেমনি *রামায়ণ-মহাভারতে*র নানা ঘটনা এবং চরিত্রের উপস্থিতিও তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে প্রতীচ্য পুরাণের প্রতিও আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি। কখনো কখনো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন থেকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রকে বর্তমান বাস্তবতায় উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সৈয়দ আলী আহসানের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু পৌরাণিক-অনুষঙ্গ আশ্রয়ী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. জুলেখা বিচিত্র-রূপা-সর্বক্ষেত্রে অস্থির চঞ্চল,
  য়ূসূফে কামনা করি দৃষ্টি তার হয়েছে সজল। (‘জুলায়খা’/*অনেক আকাশ*)

খ. নীল ঝরোকার পাশে রাত্রি কাটে বৃদ্ধা জুলেখার; (‘সঙ্কেত’/*অনেক আকাশ*)

গ. আচ্ছাদিত হে পুরুষ, কোন্ পথে তব পথ হেরার গুহায়? (‘সঙ্কেত’/*অনেক আকাশ*)

ঘ. সমস্ত নামের সত্য আদমের নাম মাহাত্ম্যের
  বিজ্ঞাপিত হ’ল যাহা সৃষ্টির পূর্বাহ্নে অন্ধকারে (‘নাম’/*অনেক আকাশ*)

ঙ. ...যৌবনা নেফেরতিতি রিরংসার
  ক্ষুব্ধতার সোনার পালঙ্ক থেকে নীচে নেমে এলো। (‘কায়রো’/*অনেক আকাশ*)

চ. গতকাল গীর্জার পিরামিডে ইতিহাসে জেগেছি
  একদিকে বিকৃত-নাসা স্ফিংস, অন্যদিকে তিনটি
  উচ্চশীর্ষ বিপুল পরিধির ত্রিভুজ। প্রহরায়
  স্ফিংসের অনেক যুগ কেটেছে সৌন্দর্যে নয়, তবে
  অনেক ভয়াবহতার ইতিহাস আপনাকে স্বাক্ষরিত
  রেখেছে। (‘ত্রিভুজ’/*অনেক আকাশ*)

ছ. তিমিরাঞ্চল মুক্ত হয়ে ইউলিসিস ফিরে আসুক
  দেহ আর হৃদয়ের আকুলতার মধ্যে। (‘প্রার্থনা’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

জ. অভিসারগত তমালের তলে
      প্রার্থনাসহ সম্মোহন? (৩-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

ঝ. কিন্তু আদমের প্রথম পুত্রের মতো
    মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার
    কৌশল নেই– (‘সময় পেলাম না’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ঞ. হরের ডম্বরু হ’য়ে যার ক’টি
    একমুঠো হয়
  ক্ষীণমধ্যা সে-নায়িকা মধ্যযুগে
    কবিতার সুর, (‘ব্যঞ্জনা’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ট. এখন পৃথিবীতে প্রথম প্লাবনের নূহ যদি ফিরে আসেন
      এবং আবার একটি প্লাবন দেখেন
        তিনি আর নৌকো খুঁজে পাবেন না। (‘গতরাতে রাত্রির নগর’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ঠ. পূর্ণকাম দেবতার একি গান
      একি সুর
  অন্ধ মৃত্তিকায় পুষ্পিত বৃক্ষ-শোভা
  আলো, অন্ধকারের মৌল উপাদান
  জন্ম

বৃত্রাসুর একত্রিত করলো
দৃপ্ত বিশৃঙ্খলায় সব কিছু (‘সম্পন্ন মানুষ এবং গান’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

ড. আস্বাদের বাণপ্রস্থ নিশাশেষে হঠাৎ বিদায়
বিদেশে সমুদ্র-তীরে ঊষাকাল একদা এখন। (‘বিদেশে সমুদ্র-তীরে’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আলী আহসান পুরাণকাহিনি থেকে বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনার চূর্ণিত উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর স্বকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনির পুনর্বয়ান তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজস্ব কবিস্বভাব ও শিল্পচৈতনার আলোকে তিনি পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ইউসুফ এবং জুলেখার প্রেম কাহিনি অবলম্বনে কবি একালে প্রেমের অচরিতার্থতার বেদনার চলচ্ছবি এঁকেছেন। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও আমরা ইসলামী ধর্মকাহিনির জুলেখাকে ফিরে আসতে দেখি। উদ্ধৃতি গ-এ ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদের ধর্মসাধনা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থান হেরা পর্বতকে অবলম্বন করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এ ইসলাম ধর্মমতে, পৃথিবীর প্রথম মানব আদমকে স্মরণ করেছেন কবি। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতির নেফেরতিতিকে কবি কেবল সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করেন নি, গ্রীসের রানী এবং Pharaoh Akhenaten-এর স্ত্রী নেফেরতিতির ভেতর কবি রিরংসার মূর্তিও অবলোকন করেছেন। আলী আহসান বার্লিনের Staatlieche Museum-এ সংরক্ষিত এই প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যকে পৌরাণিক তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন। চ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয় পুরাণের স্ফিংসকে আলী আহসান তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন। প্রাচীন মিশরে প্রত্যেক মন্দিরের সামনে স্ফিংসের মূর্তি স্থাপনের রীতি ছিল। ‘মিশরের পুরাণে স্ফিংকস হলেন জ্ঞানদেবী। মানুষের আহার্য যোগানোর ভারও তাঁর হাতে। মিশরীয় পুরাণে স্ফিংক্স পক্ষহীন। তাঁর দেহের উর্ধ্বাংশও নারীর মতো এবং নিম্নাংশ সিংহের।’ (ফরহাদ খান ২০০১ : ১৪০)। গীর্জার পিরামিড থেকে ইতিহাসের পাঠ নিতে গিয়ে আলী আহসান স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর দিতে না-পারা মানুষের করুণ পরিণতির কথাই হয়তো এই কবিতায় বলতে চেয়েছেন। গ্রীক পুরাণের খ্যাতিমান বক্তা ও বীর ইউলিসিসকে আলী আহসান ছ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে উপস্থাপন করেছেন। ইথাকার রাজা অডিসিউসের রোমান নাম ইউলিসিস। কেবল বীরত্ব ও বাগ্মীতার জন্যই বিখ্যাত নন তিনি, কূটকৌশলেও তিনি ছিলেন অনন্য। তিনিও হেলেনের পাণিপ্রার্থী ছিলেন। ট্রয়যুদ্ধের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। হোমারের *অডিসি* মহাকাব্যে ইউলিসিসের নানা দুর্যোগ উপেক্ষা করে দেশে ফেরার যে দুঃসাহসী অভিযানের বর্ণনা আছে, ইউলিসিস-অনুষঙ্গে আলী আহসান সেই কাহিনি স্মরণ করেছেন। জ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ‘অভিসারগত তমালের’ অনুষঙ্গে কবি লোকপুরাণের অন্তর্ভুক্ত রাধা-কৃষ্ণের কথা স্মরণ করেছেন। উদ্ধৃতি ঝ-এ পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের সঙ্গে তাঁর প্রথম পুত্রের মতো মৃত্যুকে আবিষ্কারের কৌতূহলকে কবিতায় ধারণ করেছেন কবি। ঞ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকপুরাণের শিবকে স্মরণ করেছেন কবি। শিবের হাতের ডম্বরু তুলে দিয়ে তিনি মধ্যযুগের নায়িকাদের দৈহিক অবয়ব উন্মোচন করতে চেয়েছেন। ট-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আলী আহসান ইসলাম ধর্মমতে, আল্লাহুর প্রেরিত পুরুষ নূহের শরণ নিয়েছেন। অবাধ্য মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ যে ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ঝড় থেকে বাঁচার জন্য কিছু মানুষ ও প্রাণি জোড়ায় জোড়ায় সেই নূহের নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু আলী আহসান এই কবিতায় বলেছেন, বর্তমানে মানবসৃষ্ট যে দুর্যোগ, তা থেকে বাঁচার জন্য কোন নৌকো একালের পুণ্যবান মানুষের জন্য অপেক্ষা করে নেই। ঠ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রবল পরাক্রমশালী অসুর বৃত্রকে উপস্থিত হতে দেখি। অনাসৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দানব বৃত্রের নাম এই কবিতায় উচ্চারণ করলেও পৃথিবীকে ফুলে ফসলে পরিপূর্ণ করার জন্য যে দেবতা বৃষ্টি উপহার দেন তাঁকেও পরোক্ষভাবে স্মরণ করেছেন কবি। আলী আহসানের ভাষায় ইন্দ্র ‘পূর্ণকাম দেবতা’। ড-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বানপ্রস্থ-প্রসঙ্গে কবি সংসারত্যাগের কথা বলেছেন। ‘প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করে বনে বসবাসের নাম বানপ্রস্থ। ব্রহ্ম-চর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস– এই চার প্রকার আশ্রম।’ (সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪০৮ : ৩৩২)। সৈয়দ আলী আহসান মানব জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে পদার্পণের স্মারক হিসেবে বাণপ্রস্থের শরণ নিয়েছেন।

সৈয়দ আলী আহসান মিথ-পুরাণের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে তাঁর শিল্প-সহচর হিসেবে গ্রহণ করে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের শিল্পকর্মের সম্পর্ক-সেতু রচনা করেছেন। বিপর্যস্ত বর্তমানের নানা অনুষঙ্গকে তিনি যখন অতীতের ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে স্থাপন করেন, তখন তা স্বকালের বৃত্ত অতিক্রম করে ভবিষ্যতকে স্পর্শ করার শক্তি লাভ করে। আলী আহসান বলেছেন 'অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– এক কথায় লোক-লোকান্তর কবির কথকতায় একসঙ্গে যদি উন্মুখর হয় তাহলেই কবিতার বিজয় আসন্ন।' (২০০১ : ১৩৫)। তাঁর কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ সময়ের এই ত্রিকালযজ্ঞে সমর্পিত হওয়ার পথকে সুগম করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাসমূহে মানুষের চিরন্তন অভিব্যক্তিই সংহত হয়েছে যা যুগে যুগে মানুষের আশা ও আনন্দ, দুঃখ ও দীর্ঘশ্বাসকে নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত করে। আলী আহসানের কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের অনুবর্তন কবির শিল্পস্বভাবের অনুকূল আবহে উপস্থাপিত হওয়ায় তিনিও কালোত্তীর্ণ শিল্পীর সম্মান ও স্বীকৃতি প্রত্যাশী।

ছন্দ

কবিতার ভাষা যতই মানুষের কথনকৌশলের নিকটবর্তী হোক না কেন, কবিতার ভাষা কবিতারই ভাষা। মানুষের সাধারণ কথোপকথন থেকে একটা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর দূরত্ব বজায় রেখেই কবিতা মানুষের নিকট-বন্ধু হতে চায়। এই দূরত্বের বিবিধ কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও প্রধানতম কারণ হিসেবে কবিতার ছন্দকে দায়ী করা যেতে পারে। ছন্দ কেবল কবিতা শনাক্তকরণের সূত্র নয়, এর মাধ্যমে কবিকেও চিনে নেওয়া সম্ভব। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন, 'আমার বিবেচনায় কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য; এবং মূল্যনির্ণয় যেহেতু মহাকালের ইচ্ছাধীন আর অর্থগৌরবের আবিষ্কর্তা অনাগত সমধর্মী, তাই সমসাময়িক কাব্যজিজ্ঞাসার নির্বিকল্প মানদণ্ড ছন্দোবিচার।' (১৯৯৫ : ৩০৬)। কবিতার ছন্দ আলোচনায় ছন্দের ব্যাকরণ-নিষ্ঠ পরিকাঠামো– অর্থাৎ, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, মিশ্রছন্দ, গদ্যছন্দ ইত্যাদি– অস্বীকার কিংবা উপেক্ষা করলেও সার্থক ও শিল্পোত্তীর্ণ কবিতায় একটা বিশেষ ছন্দের দোলা অনুভূত না-হয়ে পারে না। একে কবিতার ছন্দ না-বলে কবির ছন্দও বলা যেতে পারে। আমরা যখন কোন গদ্য-কবিতা পাঠ করি, তাও ঠিক সরল-সাধারণ গদ্যের মতো না-হয়ে অন্যরকম একটা সুর ও স্বরের আধিপত্য আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে। এ কারণেই কবিতার সঙ্গে ছন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের প্রথিতযশা কবি ও কাব্যসমালোচকবৃন্দ মোটামুটি একমত হয়েছেন বলা যায়। আবেগ ও বুদ্ধির রসায়নে কাব্যের জন্ম হলেও কবিতার জন্মরহস্য ঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উন্মোচিত হয় না। এই রহস্যের অবগুণ্ঠনে কবি, কবিতা ও পাঠকের আন্তঃসম্পর্ক শিথিল হয় না, বরং কবিতার কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে কবিতার সঙ্গে পাঠকের এবং কবিতা-সূত্রে কবির সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক-সেতু দিনে দিনে সুদৃঢ়ই হয়ে থাকে।

সৈয়দ আলী আহসান কবিতার শরীরকে ভারমুক্ত রাখতে চেয়েছেন। কবিতায় শব্দ-ব্যবহারে এবং বাক্যগঠনে মানুষের সাধারণ কথনকৌশলেরই নিকটবর্তী থাকতে চেয়েছেন তিনি। তবু তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করি বিশেষ ছন্দস্পন্দের অনুরণন। অর্থাৎ কবিতার ভাবকে তিনি এমন এক শৈল্পিক আবহে উপস্থাপন করেন, যা পাঠক-চৈতন্যে ঢেউ তুলতে সক্ষম। এই ঢেউকেই আমরা কবির ছন্দ বলতে চাই। এই ছন্দ একজন কবিকে অন্য কবি থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ছন্দের খোঁজ পেতে হলে একজন কবিকে প্রচলিত ছন্দকাঠামোর নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একটি সাক্ষাৎকারে কবিতায় ছন্দের গুরুত্ব-বিষয়ে আলী আহসান যে মন্তব্য করেছেন, তাঁর কবিতার ছন্দশৈলি আলোচনা-প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য :

> কবিতা যেহেতু শিল্প, সুতরাং তার গঠন প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে হয়। এই গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছন্দের ভূমিকা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ছন্দের অর্থ কিন্তু প্রথাগত ছন্দময়তা নয়, ছন্দ হচ্ছে ধ্বনির বিস্তার এবং আবর্তজনিত একটি স্পন্দন। যাকে আমরা গদ্য কবিতা বলি তার মধ্যে অনিবার্যভাবে ছন্দ প্রকরণ লুকিয়ে থাকে, বিশেষ করে পয়ারের বিন্যাসটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায়।...গদ্যে কখনও স্বরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্তিক ভঙ্গি আসবে না। গদ্য একমাত্র পয়ারের প্রশান্ত অগ্রসরমানতাকে ধারণ করে থাকে। তাছাড়া আরেকটি কথা আছে চিত্রকলায় যেমন আকৃতি ভাঙবার একটি কৌশল আছে কিন্তু সেখানে আকৃতিকে জেনেই আকৃতি ভাঙা হয়ে থাকে, কবিতায় তেমনি আকৃতি জেনেই

> আকৃতি ভাঙতে হবে। কবিতার জন্য ছন্দ হচ্ছে প্রথম পাঠ। একজন কবি ছন্দের ব্যাকরণকে জানবেন এবং জানার পরেই ব্যাকরণের শাসন অগ্রাহ্য করতে পারবেন, কিন্তু তার পূর্বে নয়। (২০০৩খ : ১৬১-৬২)

সৈয়দ আলী আহসান কবিতার ভাব কিংবা বক্তব্যের ওপর ছন্দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে কবিতার জন্য অস্বাস্থ্যকর মনে করতেন। তাঁর কবিতায় ছন্দ বক্তব্যের মেজাজকে অনুসরণ করেছে। তাঁর মতে, কাব্যের বহিরাবরণ হবে এর অন্তর্গত শক্তির অনুগামী। শব্দের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সঙ্গীতময়তার সর্বোচ্চ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসজ্জার দিকে যত্নবান ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় ছন্দের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানে আমরা কবির এই প্রবণতারই প্রকাশ লক্ষ করব।

অক্ষরবৃত্ত

সৈয়দ আলী আহসান অক্ষরবৃত্তের গতি ও গভীরতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা রয়েছে। অক্ষরবৃত্তের পর্ববিন্যাসেও কখনো কখনো স্বাধীন থেকেছেন তিনি। বিশেষ করে প্রথম পর্বের ৮ মাত্রা অক্ষত রেখে কবি পরবর্তী পর্বের মাত্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। ৮.১০ মাত্রার পর্ববিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ১০ মাত্রাকেও দুইটি পর্বে বিভক্ত (৪+৬) করে নিয়েছেন। পূর্ণ পর্বের সঙ্গে অপূর্ণ পর্বের সন্নিবেশে তাঁর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় প্রবহমাণতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. এ-সমুদ্রে মনে হয় | কাপড়েও | রঙ লাগে বুঝি–	৮.(৪).৬
হৃদয়তো ছুঁয়ে যায় | ভিজে যায় | নীল ছায়া মেখে	৮.(৪).৬
আকাশের ছবি ভাসে–| এ-আকাশ | একেবারে নীল–	৮.(৪).৬
আকাশের ছায়াতেই | এ-সমুদ্র | চিরকাল নীল	৮.(৪).৬
	(‘ভূমধ্যসাগর’/*অনেক আকাশ*)
খ. বরফ পাথর যেন | দু’চোখের | বিস্তারিত ঘুম	৮.(৪).৬
একক সন্ধ্যায় যেন | বৃষ্টিস্বচ্ছ | সব উপহার	৮.(৪).৬
	(‘বৃষ্টি’/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
গ. আমার স্বপ্নের মধ্যে | বনভূমি | সুগন্ধ চন্দন,	৮.(৪).৬
আমার হৃদয় যেন | রক্তসিক্ত | একটি গোলাপ।	৮.(৪).৬
	(৫৮-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)
ঘ. সেখানে হৃদয় ছিলো | হয়তো বা আকাশের | মতো	৮.৮.২
যেখানে মেঘের ঢেউ | যেন সত্য সমুদ্রের | ঢেউ	৮.৮.২
অনেক বর্ণের চোখে | একটি বর্ণের রেখা | ছুঁয়েছে হঠাৎ	৮.৮.৬
কুয়াশায় কুয়াশায় | সব কিছু স্বপ্ন হ’য়ে | সত্য হ’য়ে জাগে ॥	৮.৮.৬
	(‘একাকী’/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

গদ্যছন্দ

সৈয়দ আলী আহসান গদ্যছন্দে কবিতা রচনা করতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবহমাণ পয়ারের শক্তি ও সম্ভাবনা থেকেই তিনি গদ্যছন্দের গতি ও যতি-স্বাধীনতা লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, ‘পয়ারের আশ্চর্য ক্ষমতা প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার বন্ধনকে মেনে নিয়ে একটি বিস্ময়কর প্রবহমাণতা নির্মাণ করেছিলেন। গদ্যছন্দের আদিরূপ এর মধ্যেই নিহিত।’ (২০০৩খ : ১৬১)। স্বরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্তিক ভঙ্গির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে ‘পয়ারের প্রশান্ত অগ্রসরমানতাকে’ স্বীকরণ করেই গদ্যছন্দের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। আলী আহসান গদ্যছন্দের কবিতায় নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনো বিদেশি ভাষার বিশেষ কোন সাহিত্যরীতি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পস্রষ্টাদের অনুসরণে তিনি গদ্যছন্দে নতুনত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর *উচ্চারণ* কাব্যের নাম করা যায়। ফরাসি ভাষায় রচিত বিশেষ ধরনের কাব্য যেখানে ‘জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র অনুভূতি কবিরা স্বাক্ষরিত করেন অনেকটা গদ্যের আদলে’, তা আলী আহসানকেও

অনুপ্রাণিত করেছে। ফরাসি কবি "রোজার কাইওয়ার-এর 'পাথর' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ" আলী আহসানের অনুপ্রেরণা উৎস। তাঁর স্বীকারোক্তি : "আমার 'উচ্চারণ'-এর কবিতাগুলোর কয়েকটি কবিতার ভঙ্গি কাইওয়ার রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ।" (২০০৩খ : ১৩৪)। *উচ্চারণ* কাব্যে আলী আহসানের শিল্প ও জীবনভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট হলেও তাতে শৈল্পিক অনুরণন অনুপস্থিত নয়। বিশেষ করে গদ্যের শরীরে তিনি যে ছন্দস্পন্দ সঞ্চার করেছেন, বাংলা কবিতায় তা যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই গদ্যছন্দে রচিত। ৫৮, ৫৯, ৭৩ সংখ্যক কবিতাগুলো শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। ৫৯ সংখ্যক কবিতা মিলযুক্ত গদ্যে রচিত। আলী আহসানের গদ্যছন্দ সাধারণ কথ্যভঙ্গির অনুরূপ হলেও শব্দসজ্জায় তাঁর সতর্কদৃষ্টির কারণেই তাতে সৃষ্টি হয় অনাস্বাদিত সঙ্গীতময়তা। এই সঙ্গীতধর্মিতাকে আমরা তাঁর কবিতার একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। তাঁর কবিতায় গদ্যছন্দের প্রবহমাণতা ও সঙ্গীতময়তা অনুধাবনের প্রয়োজনে আমরা তাঁর তিনটি কাব্য থেকে তিনটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা উপস্থাপন করছি :

ক. তোমাকে ধরা যায় না
যেমন ধরা যায় না কিশলয় গুচ্ছে প্রবহমান
স্রোতোধারাকে

যখন তোমার উপর আমার দেহভার
অবনমিত হয়
তুমি শিহরিত হও আমাকে দেখে

তুমি একান্ত আমার
যেমন চক্ষু একান্তভাবে মুখমণ্ডলের

তুমি মৃত্যুর পথে নেমে যাবে
আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে

তবু তুমি পলায়নপরা
তোমাকে ধরা যায় না
যেমন ধরা যায় না স্রোতোধারাকে,
মৎস্যশিশুকে, চড়ুই পাখিকে। ('তোমাকে ধরা যায় না'/*অনেক আকাশ*)

খ. বৈশাখের অপরিসীম রৌদ্রে
কৃষ্ণচূড়ার ঐশ্বর্য
আমার প্রত্যহে কর্মের যন্ত্রণায়
প্রয়োজনের প্রতিষ্ঠা
সার্থকতার কল্পনায় অতুল নিষ্ঠার
নীলাম্বর

হঠাৎ অবাক আলোকিত আকাশ
কৃষ্ণচূড়ার ফাঁকে ফাঁকে
এক গুচ্ছ আলোকিত স্বপ্ন। ('কৃষ্ণচূড়া : দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

গ. স্বর্ণকুম্ভের মতো বিভাসিত যার কুচযুগল, একটি তরঙ্গের আবেশে সে-রমণী পুষ্পিত ফলবান বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। এখানে রমণী সৃষ্টি ও সজীবতার প্রতীক। মনে হয় তার পদস্পর্শে বৃক্ষমূল কম্পিত হয়েছে এবং সকল শাখা পুষ্পিত হয়েছে। এক সময় প্রাচীন ভারতে বসন্ত উৎসবের কালে যুবক-যুবতীরা শালবৃক্ষের পুষ্প চয়ন করতো। মিথুনের প্রতীকরূপে সে-যুগেই আমরা বৃক্ষকে আলিঙ্গনরতা রমণীমূর্তিকে পেয়েছি যার নিম্নদেহ-ভাগ উন্মুক্ত ও প্রসারিত। (১৪-সংখ্যক কবিতা/*উচ্চারণ*)

স্বরবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান স্বরবৃত্ত ছন্দে খুব বেশি কবিতা লেখেন নি। কবির ভাব বা অভিব্যক্তির শিল্পায়নে স্বরবৃত্তের দ্রুত-লয়ের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি কবি। তবু তাঁর যে স্বল্পসংখ্যক স্বরবৃত্ত-আশ্রিত কবিতা রয়েছে তা থেকেই বোঝা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তাঁর প্রস্তুতি পর্বের কাব্যগ্রন্থ *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা*-তে একটিও স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা নেই। পরবর্তী পর্যায়ে *সহসা সচকিত* কাব্যের দুইটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা ছাড়া উল্লেখ করার মতো স্বরবৃত্ত ছন্দের কোন কবিতা নেই। *সমুদ্রেই যাব* কাব্যে এসে আবার তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে আবার একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা লেখেন। তিনটি কবিতা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. একটি স্মৃতির | উচ্চারণে	৪.৪
কাম্য হ'ল | সব জীবন,	৪.৩
একটি কথার | রোমন্থনে	৪.৪
চন্দ্রকলার | উজ্জীবন	৪.৩
	('২৮-সংখ্যক কবিতা'/*সহসা সচকিত*)
খ. অবাক হ'ল | সমুদ্র তীর	৪.৪
অনেক পায়ের | পদক্ষেপ,	৪.৩
আকাশ যখন | উচ্ছলতায়	৪.৪
তারায় তারায় | চমৎকার;	৪.৩
	(২৯-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
গ. তুমি যখন | কারো উপর | দৃষ্টি রাখ	৪.৪.৪
বিকল হয়ে | অবাক হয়ে	৪.৪
তার নয়নে | স্বপ্ন নামে | অজস্রতায়।	৪.৪.৪
সে তো তখন | ধৈর্য হারায় | প্রহর কারায়	৪.৪.৪
ভৃঙ্গ সম | কটির দিকে | হাতটি বাড়ায়	৪.৪.৪
অলৌকিকের | ইচ্ছেগুলো	৪.৪
এদিক ওদিক | সেদিক ছড়ায় ॥ ৪.৪	
	('তুমি'/*সমুদ্রেই যাব*)

মাত্রাবৃত্ত

সৈয়দ আলী আহসানের *উচ্চারণ* কাব্য ছাড়া প্রত্যেক কাব্যেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা লক্ষ করা যায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অতি-নিরূপিত রূপকেই ব্যবহার করেছেন কবি। অর্থাৎ, তিনি পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রা রেখেছেন এবং তাঁর অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যায়হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। আলী আহসানের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দাশ্রয়ী কবিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. যখন সময় | যন্ত্রণা নিয়ে | হৃদয়ে নামে	৬.৬.৫
তখন তোমায় | দুইটি নয়নে | প্রবোধ আঁকা,	৬.৬.৫
তখন তোমার | চিন্তায় যেন | স্বপ্ন নামে,	৬.৬.৫
তখন তোমার | দুই বাহু যেন | আবেশ-শাখা	৬.৬.৫
	('তোমাকে : এক'/*অনেক আকাশ*)
খ. তোমাকে দিলাম | জন্মের সাথে	৬.৬
মৃত্যুর অভি | সার	৬.২
তোমাকে দিলাম | অন্তরালের	৬.৬
সমস্ত সং | বাদ	৬.২
	('তোমাকে দিলাম'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
গ. সে কি সময়ের | হঠাৎ সাড়ায়	৬.৬
এ-মুহূর্তের | চেতনা হারায়?	৬.৬
বলয়ের মতো | অনারম্ভের	৬.৬

অবলেষহীন | উদ্বোধন?	৬.৫
	(৩-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)
ঘ. গাছের শিকড় | অনেক অতলে | আছে	৬.৬.২
অথবা পাথর | তটপ্রান্তের | সাড়া	৬.৬.২
গান হয়ে তারা | বেজে উঠতেই | পারে	৬.৬.২
এখানে যখন | সব হারাবার | তাড়া;	৬.৬.২
	(নিমগ্ন মৈনাক'/*আমার প্রতিদিনের শব্দ*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, মাত্রাবৃত্তের অতিনিরূপিত পর্ব-বিন্যাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। পর্ববিন্যাসের ক্ষেত্রে মধ্য-খণ্ডনের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সৈয়দ আলী আহসান 'অভিসার' এবং 'সংবাদ' শব্দ দু'টিকে মধ্যখণ্ডনের মাধ্যমে মাত্রাবৃত্তের পর্ববিন্যাস করেছেন।

মিশ্রছন্দ

সৈয়দ আলী আহসানের মিশ্রছন্দে লেখা কবিতার সংখ্যা খুবই কম। মিশ্রছন্দে একই কবিতায় একাধিক ছন্দের মিশ্রণ থাকায় এ জাতীয় কবিতা-পাঠে ছন্দের আলোড়ন বা আন্দোলন স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ এক ছন্দের একটি পঙ্ক্তি থেকে অন্য ছন্দে-রচিত পঙ্ক্তিতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কেবল পাঠকের কানেই নয়, তা প্রাণেও ভিন্নতর দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই ছন্দে আলী আহসান স্বস্তিবোধ করতেন না বলে মনে হয়। নিচের দৃষ্টান্ত দুটোতে মিশ্রছন্দের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো :

ক. যার অঙ্গ | দরশনে | কনক শ্যামল	৪.৪.৪ [স্বরবৃত্ত]
রত্ন জিনি | নখদন্ত | অধর নির্মল	৪.৪.৪ [স্বরবৃত্ত]
অথবা রূপের ভারে | দেহ বিচলিত	৮.৬ [অক্ষরবৃত্ত]
কোথায় তা'র প্রমাণ | কোথায় তা'র আলো	৮.৭ [অক্ষরবৃত্ত]
আমি শুধু | নিমজ্জিত | বেদনায়	৪.৪. [স্বরবৃত্ত]
আনন্দকে | পেলাম	৪.৪.২ [স্বরবৃত্ত]
	('হৃদয়– দুই'/*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)
খ. শরীর তোমার | তরঙ্গ হয়	৬.৬ [মাত্রাবৃত্ত]
সুর বাজাতেই | আমি ব্যাকুল,	৪.৪ [স্বরবৃত্ত]
দুই বাহু দিয়ে | সেতু-বন্ধন–	৬.৬ [মাত্রাবৃত্ত]
ছন্দ-সাড়ায় | আমি আকুল,	৪.৪ [স্বরবৃত্ত]
	(৩০-সংখ্যক কবিতা/*সহসা সচকিত*)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দুটোর প্রথমটিতে স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্তের মিশ্রণ লক্ষ করি। স্বরবৃত্তের ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্বের সঙ্গে অপূর্ণ পর্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন কবি। একইভাবে অক্ষরবৃত্তের পর্ব বিন্যাস ৮.৬ এবং ৮.৭ রেখেছেন। উদ্ধৃতি খ-এর মাত্রাবৃত্তে ৬ মাত্রা এবং স্বরবৃত্তে ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্বে স্তবকটি সম্পন্ন করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান গদ্যছন্দকেই তাঁর ভাব বা অভিব্যক্তির শৈল্পিক রূপায়ণে অধিকতর নির্ভরশীল ভেবেছেন। এই ছন্দের তাঁর কৃতিত্ব সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। বিশেষ করে পঙ্ক্তির পর্ববিন্যাসের মাধ্যমে বিশেষ আবর্তে পাঠককে আন্দোলিত করার পরিবর্তে শব্দকে বিশেষ সজ্জায় বিন্যস্ত করার মাধ্যমে শব্দের ধ্বনিময়তার সর্বোচ্চ উৎসারণের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আলী আহসান ভাবের ওপর ছন্দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেন নি। ভাবের বিকাশ কিংবা বিস্তারের সহায়ক হিসেবেই তিনি কবিতায় ছন্দকে স্বাগত জানিয়েছেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলির অন্তর্গত সুর কবিতায় অনুসৃত ছন্দের বাঁধাধরা কাঠামোর কারণে যাতে প্রতিহত না হয় সেই দিকে যত্নবান ছিলেন কবি। তাই গদ্যছন্দের 'বন্ধনহীন-গ্রন্থি'তেই সৈয়দ আলী আহসানের অন্তর্গত অবলোকন অধিকতর শিল্পসংহতি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলাদেশ বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অসঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত মুছে না-যেতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল থাবায় বিধ্বস্ত হয়েছে পুরো পৃথিবী। এর অভিঘাতে বাংলাদেশের হৃদয়ও রক্তাক্ত হয়েছে, দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বিপন্ন হয়েছে এদেশের মানুষ। একই সঙ্গে মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃসময়কে পুঁজি করে বিত্তের পাহাড় গড়েছে এক সুবিধাবাদী শ্রেণি। বৃটিশ শাসনের অবসানকল্পে শান্তিপ্রিয় মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রক্তপাত, এই বিভেদকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে দেশভাগ এবং বিভাগোত্তর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন চল্লিশের দশককে নানাভাবে নাজেহাল করেছে। সঙ্গত কারণেই এই ভূখণ্ডে বেড়ে ওঠা এই দশকের কবিবৃন্দের মানসগঠনকেও তা প্রভাবিত করেছে। কবিতার জন্মভূমি চিহ্নিত করার যে-কোন আয়োজনেই আমরা কবির মনোভূমির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখি। মনের গতিপ্রকৃতি নির্দেশের প্রয়াস পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং মনোরহস্যের অকূল পাথারে পাড়ি জমানোর অর্থই হল গন্তব্যের প্রলোভনকে প্রশ্রয় না-দেওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যান করা। তবু কবি ও কবিতার জন্মরহস্য উন্মোচনে আমরা কবির স্বকালের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির নানা দিগন্তে পরিভ্রমণের প্রয়াস পাই। কবিতাপাঠের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবেই আমরা এই ভ্রমণের আরাম ও আনন্দকে উদ্‌যাপন করতে চাই। একজন কবিকে জানার ও বোঝার আয়োজন যতই ব্যাপক ও বিচিত্র হোক না কেন, পাঠকের সব পথ অবশেষে সেই কবির কবিতায় এসেই মিশে যায়। কবিতার গতি ও গন্তব্য নির্দেশক একটি অব্যর্থ পথের স্বরূপ অনুধাবনের অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত এই যে বিভিন্ন পথ, বিচিত্র আয়োজন, তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিবিড় বলেই পাঠকের এই পথ চলা কবিতার মতোই সুন্দর, সুখকর ও ক্লান্তিহীন।

একই কালখণ্ডে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হলেও ব্যক্তিভেদে মানসগঠনের ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহণ অসম্ভব নয়। কারণ বাইরের পৃথিবী একজন শিল্পস্রষ্টার অন্তর্জগতের মনস্তাত্ত্বিক মিথস্ক্রিয়ায় স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, যদিও এই প্রতিক্রিয়ার গভীর প্রদেশে একটি ঐক্যের স্পন্দন টের পাওয়া যায়। আবার একই বিষয় বা ঘটনার কাব্যিক উপস্থাপনেও ব্যক্তিচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্যখচিত অবয়বটি মুদ্রিত হয়ে যায় এবং তার গভীরে কবির স্বকালের স্বরূপটিও অচিহ্নিত থাকে না। কারণ কবিতায় বিষয়ের চেয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়ে থাকে। চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল চারজন কবিব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসানের মানসগঠনের বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্বকালসংলগ্নতাপ্রসূত কিছু সাধারণ প্রবণতাও আমরা লক্ষ করেছি, যার ভিত্তিতে আমরা তাঁদের চিন্তা ও কল্পনার গভীরতলশায়ী সমবায়ী স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছি।

পিরোজপুরের শংকর পাশায় কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা আহসান হাবীবকে একাডেমিক পাঠ অসম্পন্ন রেখেই কলকাতায় পাড়ি জমিয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ফলে তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রবল উদ্বাস্তুবোধের, যে বোধ তাঁকে শেকড়-সন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে, যদিও প্রত্যাশিত গৃহের সন্ধান কোনদিনই তিনি পান নি। কলকাতা ও ঢাকা মিলিয়ে হাবীবের প্রায় পুরো জীবনটিই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কেটেছে। পত্রিকার বিচিত্র মেজাজের মালিকপক্ষ এবং নানা বয়স ও চিন্তার সহকর্মী ও পত্রিকাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। স্বল্পভাষী ও আত্মমগ্ন আহসান হাবীব জনসম্পৃক্ততাসূত্রেই মানুষকে নিবিড়ভাবে পাঠ করার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। প্রতিকূল বাস্তবতায় নিজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পৃথিবী নির্মাণের প্রয়োজনেই কাব্যচর্চায় নিমগ্ন থেকেছেন তিনি। সময়কে অনুকরণ কিংবা অস্বীকারের চেয়ে স্বীকরণেই তিনি অধিকতর স্বস্তি বোধ করেছেন এবং এই আত্মখচিত পথেই তাঁর কবিতায় বিম্বিত কালের কোলাহল-প্রসূত অনুভবপুঞ্জ কালোত্তীর্ণ উচ্চারণ হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে।

ফররুখ আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে। পুলিশ ইন্সপেক্টর পিতার পরিবারে স্বচ্ছলতা থাকলেও মাতৃহারা ফররুখের জীবনের আশৈশব সঙ্গী ছিল নিঃসঙ্গতা। শৈশবে যে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছেন তার প্রভাব আমৃত্যু তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল। কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি, যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সম্পন্ন হয় নি তাঁর। জীবনের প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন এবং জীবন থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন ব্যক্তিজীবন এবং কবিজীবনের প্রকৃত শিক্ষা। ফররুখ ছিলেন আপাদমস্তক ঐতিহ্যমগ্ন শিল্পস্রষ্টা। নিজের শেকড়কে স্বদেশ ও স্বজাতির সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত করতে চেয়েছেন তিনি এবং শেকড়ের পরিচর্যায়ও তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। আধুনিক জীবনচেতনা ও শিল্পপ্রকৃতি তাঁর আয়ত্তে থাকলেও আধুনিকতার নামে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা কিংবা বিষণ্নতার সমর্থক ছিলেন না তিনি। যে অতৃপ্তি ছিল তাঁর সৃজনশীল হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা, তার উৎস কবির অন্তর্লোকই, কিন্তু সেই অন্তর্জাত অচরিতার্থতার বেদনায় কবির স্বকাল উপস্থিত। এক নতুন জীবন ও জগতের প্রত্যাশা প্রকাশিত তাঁর কবিতায়। যে ভাবকে আশ্রয় করে তিনি গন্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন, তাতে পুরাতনের নানা উপাদান নতুন অবয়বে উপস্থাপিত এবং এই উপস্থাপনার ভাষাও অভিনব। ফররুখ আহমদের ঐকান্তিক প্রয়াসেই এই নতুন ভাষা-কৌশলের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি। মানুষের প্রতি অনাবিল ও অকৃত্রিম ভালোবাসার শক্তিতেই তিনি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বাগেরহাট জেলার আড়ুয়াডাঙ্গা গ্রামে আবুল হোসেনের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা। বাবার বদলির কারণে নানা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন তিনি। বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের শিক্ষাজীবন তাঁর সমগ্র জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কবির মানসগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। কৃষ্ণনগরের যে ভাষা তিনি রপ্ত করেছিলেন, তার প্রভাব কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, কবিতায়ও অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। আবুল হোসেনেরও কর্মজীবনের শুরু কলকাতায়। পরবর্তী-পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র সংস্থা, রেডিও ও টেলিভিশন, জনসংযোগ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কাজ করেছেন। জীবনকে সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি এবং কবিতাকেও সহজ-সরল অবয়বে পাঠকের সামনে হাজির করতে চেয়েছেন। অভিজ্ঞতার প্রকাশকে

শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কবিতার ভাষাকে তিনি কেবল মানুষের মুখের ভাষার নিকটবর্তীই করেন নি, শব্দ ও বাক্যকে ভেঙে নির্মাণের একটি আত্মখচিত ধারা রপ্ত করেছেন তিনি।

সৈয়দ আলী আহসান জন্মগ্রহণ করেছেন মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সুফি পরিবারে। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন তিনি। কোরআন শিক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। পারিবারিকসূত্রেই তিনি একাধিক ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। শৈশবের পল্লি-প্রকৃতি ত্যাগ করে আট বছর বয়সেই তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পন্ন হয়। মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যে ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। শিক্ষা জীবনে তিনি খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এর প্রভাব কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, তাঁর শিল্পসাধনায়ও লক্ষ করা যায়। তিনি শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই খ্যাতিমান শিল্পব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পারিবারিক পরিমণ্ডল এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবহে তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন তিনি যা তাঁর সাহিত্যচর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছে। সৈয়দ আলী আহসানেরও কর্মজীবনের শুরু কলকাতায়। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেছেন, উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। কবিতার হৃৎস্পন্দনই তাঁর জীবনের স্পন্দন, জীবনকে তিনি কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবেন নি। আলী আহসানের স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতাই তাঁর ব্যক্তিত্বখচিত শিল্পের দর্পণে স্ফটিকসংহতি লাভ করেছে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভিন্নতর বাস্তবতা যেমন প্রত্যেকের শিল্পসাধনার স্বতন্ত্র পথনির্দেশ করেছে, তেমনি শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের প্রকৃতিও তাঁদের মানসভুবনকে ভিন্ন দ্রাঘিমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যে চেতনার রঙে তাঁদের কল্পবিশ্বে বাস্তবের প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে, সেই চেতনার ভিত্তিভূমিতেও তাঁদের শৈশব-কৈশোরের নানা ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস তাঁদের প্রত্যেকের শিল্পকর্মে লক্ষ করা গেলেও জীবন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য কবিতার অন্তর ও অবয়ব সম্পর্কেও তাঁদেরকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রাণিত করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের আড়ালেও সময় তাঁদের প্রত্যেকের সৃজনবিশ্বে রেখে গেছে অমোচনীয় চিহ্ন, যার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার একটি সাধারণ রূপরেখা নির্মাণ করা সম্ভব।

কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডলে বিচিত্র বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যুগপ্রভাব চল্লিশের দশকের প্রত্যেক কবিকেই সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের অনুবর্তী করে তুলেছে। সময়-সমাজ-রাজনীতি-সচেতনতা এই দশকের কবিতার একটি সাধারণ কুললক্ষণ, যদিও এই দশকের বাংলাদেশের কোন কবিকেই সমাজসংস্কারক শিল্পস্রষ্টা কিংবা রাজনীতি-অধিকৃত কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাঁদের কবিতায় আমরা যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গের অনুরণন লক্ষ করি, তা জীবনের স্পন্দনকে ধারণ করার প্রয়াস থেকেই উৎসারিত। কবিতায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ স্বাস্থ্যকর কিংবা শিল্পসম্মত কি-না, এই বিবেচনা বিস্তর বিতর্কসম্ভব হলেও চল্লিশের অধিকাংশ কবিই কবিতাকে নিরীহ আরাম ও আনন্দ যাপনের সৌখিন অনুষঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। তাঁদের প্রত্যেকের কাব্যসাধনারই একটি নিজস্ব রাজনীতি আছে, যে রাজনীতির গভীরে তাঁদের জীবনবোধ ও শিল্পচৈতন্যের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ব্যাকরণটি প্রোথিত।

আহসান হাবীব সহজ-সুন্দর-সংগত জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন, যদিও বাস্তবের অভিঘাতে বারবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বিক্ষত হয়েছেন তিনি। কবিতাই তাঁর সেই বেদনার একমাত্র দোসর। কবিতার সান্নিধ্যেই তিনি সবচেয়ে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। জীবনের নানা অনুভব ও অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতার প্রধানতম অবলম্বন। অনুভবের বিচিত্র জগতকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। দৃশ্যমান পৃথিবীর নানা অনুষঙ্গও তাঁর চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাঁর কবিতার হৃদস্পন্দনকে সচল রেখেছে। একজন জীবননিষ্ঠ কবি হিসেবে আহসান হাবীব মানবিক সত্তা ও সম্পর্কের সকল দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কেবল দৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতিই যত্নশীল ছিলেন না তিনি, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মেলবন্ধন রচনার প্রয়াসও তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। তিনি ছিলেন নির্বিরোধ, স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ। নিজেকে আড়াল করার কাজটি তিনি আমৃত্যু সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। প্রবল জনস্রোতেও কবি নিজের চারপাশে একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে নিয়ে নিবিড় নৈঃসঙ্গ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। কেবল প্রকৃতির কাছেই তাঁর প্রকাশ ছিল সহজ-স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত। জীবন ও

প্রকৃতির মেলবন্ধনে তাঁর কবিতায় সৃষ্টি হয় এক স্বতন্ত্র স্বরগ্রাম, যার সদর-অন্দরে আমরা আহসান হাবীবেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কবিতায় সময় ও সমাজের উপস্থিতি-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন তিনি। সমাজের মানুষকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন বলেই তাতে সমাজের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহেরও ছায়াপাত ঘটেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা-বিষয়েও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর সৃজনকর্মে উপস্থিত। সময় ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি স্বকালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিবিধ প্রসঙ্গে নিজের উপলব্ধির সারাৎসারকে শব্দবন্দি করেছেন। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে নির্মিত হয়েছে আহসান হাবীবের মানসভুবন, সেখানে অনিবার্যভাবেই সমাজকাঠামোর বিভাজন-বিভক্তির ছায়াপাত ঘটেছে। তাই তাঁর কবিতায় শ্রেণিচৈতন্যের প্রভাবও অনুপস্থিত নয়। কবির ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যেও তাঁর স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তাই তাঁর উদ্বাস্তুবোধের গভীরেও আমরা স্বকালের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কবিতায় তিনি বাস্তবকে কল্পনার দিকে ঠেলে দেন না, অপরিসীম কবিত্বশক্তির প্রভাবে কবি কল্পনাকে বাস্তবের দিকে টেনে আনেন। আহসান হাবীবের কবিতা তাঁর যাপিতজীবন থেকে উৎসারিত বিচিত্র ও অনাস্বাদিত অভিজ্ঞানেরই আত্মখচিত অনুরণন, যা পাঠকের জীবনবোধে যোগ করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা।

ফররুখ আহমদের জীবনদর্শনই তাঁর কাব্যসাধনার প্রধানতম নিয়ন্ত্রক শক্তি। কিন্তু তাঁর কবিতা জীবনাদর্শের প্রচারপত্র নয়। কবিতার ভাব ও রূপকল্পের গভীরে তাঁর বিশ্বাসের স্ফুরণ স্বতঃস্ফূর্ত ও শৈল্পিক। সুস্থ, সুন্দর ও আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের শরণ নিয়েছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পাদর্শের সমান্তরালে প্রসারিত হয়ে তাঁর সামনে মেলে ধরেছিল মুক্তির নতুন দিগন্ত। মানুষের জীবনযাপনে ধর্মের প্রভাব প্রবল বলেই ধর্মীয় অনুষঙ্গের অবাধ ব্যবহারে ব্যক্তিত্বচিহ্নিত তাঁর কবিতা। ফররুখের কবিতায় নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণসম্ভূত রোমান্টিক যোগাযোগের চেয়ে মানুষের জীবন-রহস্য উন্মোচন এবং এই রহস্যাবৃত জীবনের শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কিত বিবেচনাই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। তাঁর কবিতায় বিধ্বস্ত ও বিপন্ন বর্তমান মুদ্রিত এবং সেই বৈরী বাস্তবতায় মানুষের জীবনে যখন ছন্দপতন ঘটেছে, তখন তা প্রকৃতির প্রাণেও আঘাত হেনেছে। অনেক ক্ষেত্রেই কবি প্রাকৃতিক অস্বস্তির রূপকল্পে মানুষের অন্তরের রক্তক্ষরণের ছবি এঁকেছেন। ফররুখের কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি তাই জীবনের স্বরূপ অনুধাবনেরই সদর্থক প্রয়াস। ফররুখের রাজনীতিসচেতনতাও প্রকৃত অর্থে কবির সময় ও সমাজ-সম্পৃক্ততারই ফল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে তিনি যে কাব্যাদর্শ সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাও কবির তীব্র স্বকাল-সংলগ্নতা এবং সমাজ-সম্পৃক্ততা থেকেই উৎসারিত। ফররুখের কবিতায় আমরা শোষণের স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হতে দেখি, তেমনি শোষিতের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়াসও লক্ষ করি। শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন তিনি, সবার জন্য একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণের পথে যে-সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার পরিচয়ও ফররুখের কবিতায় উপস্থিত। পুথিসাহিত্য থেকে কাহিনি-সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ফররুখ আহমদ নতুন যুগের সাহিত্যসৃজনের প্রয়াস পেয়েছেন। কেবল পুথিসাহিত্য নয়, আরব্যোপন্যাস এবং ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর সাহিত্যকর্মের পুনর্নির্মাণেও প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। কোরআনের অনেক ঘটনাকেও তিনি কবিতার উপজীব্য করেছেন। অনেক কালোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টার জীবন ও কর্ম অবলম্বনে কবিতা লিখেছেন তিনি। ইকবালের জীবনবোধ ও সাহিত্যকর্ম ফররুখ আহমদের জীবনভাবনা ও শিল্পদৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ধর্মকে কেবল পারলৌকিক প্রশান্তি ও পরিত্রাণের উপায় হিসেবে না দেখে ধর্মাদর্শে সমর্পণের মাধ্যমে ইহলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব বলেই বিশ্বাস করেন তিনি। তাই কবি মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের সমান্তরালে কবিতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন। আদর্শহীন সমাজব্যবস্থায় বিপন্ন মানুষের দীর্ঘশ্বাস দেখেছেন কবি এবং মানুষের বিদীর্ণ আত্মায় প্রশান্তির পরশ হিসেবে ধর্মাদর্শে সমর্পিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছে ধর্মহীনতা মনুষ্যত্বহীনতারই নামান্তর। মূল্যবোধের অপমৃত্যুর মর্মন্তুদ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ফররুখ। তাই তিনি শিল্পসাধনার মাধ্যমে জীবন ও জগতের স্বরূপ-সম্পর্ক অনুধাবন করতে চেয়েছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন সৃষ্টিই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। ইসলামী অনুষঙ্গ অবলম্বনে মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবনই ফররুখ আহমদের সমগ্র কাব্য-সাধনার প্রেক্ষণবিন্দু।

আবুল হোসেনের কবিতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ উপস্থিত। কবিতার বিষয়কে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন নি তিনি, বরং কবিতাকে কবিতা হয়ে ওঠার যাবতীয় আয়োজনকে নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় বিম্বিত প্রেম সরব, সবল ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেমের আনন্দ তাঁর কবিতায় অভিনন্দিত হয়েছে, বেদনাকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। বিরহের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সম্পর্কেও তাঁর ভাবনা ইতিবাচক। কবিতায় তিনি স্বাভাবিক প্রেমকেই অন্তরের উষ্ণতা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতেই তিনি তাঁর প্রেমিকার পায়ের চিহ্ন এঁকেছেন, তাতে স্বর্গের সৌরভ কিংবা মহিমা কীর্তনের প্রয়াস নেই। তাঁর কবিতায় প্রেম কখনো নারীর অবয়বে, কখনো কবিতার রূপকল্পে হাজির হয়েছে। কবি বেদনার সঙ্গেও বন্ধুত্ব রচনা করতে চেয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ অন্বেষণের অভিপ্রায় তাঁর কবিতায় পুষ্টি জুগিয়েছে। প্রকৃতি সব সময় তাঁর কবিতায় আরামদায়ক অনুভবের দ্যোতক নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। রাজনৈতিক অনুষঙ্গে আবুল হোসেনের সক্রিয়তা উল্লেখ করার মতো নয়। সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। তাই তাঁকে বরাবরই কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হয়েছে। তবুও জীবনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে গিয়ে এবং সেই পাঠের অভিজ্ঞতাকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করতে গিয়ে তিনি স্বকালের ঘাটে ঘাটে নোঙর করেছেন, সমাজের ভাঁজ খুলে তার ভেতরের বৈভবে পুলকিত হয়েছেন এবং বৈনাশিক প্রবণতায় ব্যথিত হয়েছেন। এমনকি অস্থির ও অসুস্থ রাজনীতিকেও তিনি তাঁর কবিতার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসন দেন নি। এই দশকের বাংলা কবিতার প্রতিনিধিত্বশীল ধারা প্রগতিকবিতার প্রবল স্রোতে গা ভাসান নি আবুল হোসেন, কিন্তু তার ঢেউ এসে তাঁকেও স্পর্শ করেছে কখনো কখনো। মূল্যবোধের বিপর্যয়ের রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি মধ্যবিত্তের জীবন-মানসের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্তের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গিয়ে নিজের দিকেই ফিরে তাকিয়েছেন। তিনি কবিতায় ব্যঙ্গের ছলে মধ্যবিত্তকে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলসহ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। শিক্ষাজীবনে এবং চাকুরির প্রয়োজনে নানা জায়গায় অবস্থানের কারণে তাঁর মধ্যে প্রবল উদ্বাস্তুবোধের জন্ম নিয়েছে। ফলে কোথাও শেকড় প্রোথিত হয় নি তাঁর। দেশভাগ কবির শিল্পের ভূখণ্ডেও ফাটল ধরিয়েছে, যা কবির মনে উদ্বাস্তুবোধের জন্ম দিয়েছে। এই শেকড়হীনতা তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যে নিক্ষেপ করেছে। এই নিঃসঙ্গতা থেকেও তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে উদ্বাস্তুবোধের যার প্রকাশ তাঁর কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় জীবন ও জগতের বিচিত্র অনুষঙ্গের সংহত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। ইন্দ্রিয়ের কর্মপরিধিকে প্রসারিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব কিংবা উপলব্ধিও তাঁর কবিতায় উপেক্ষিত হয় নি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে ইন্দ্রিয়সচেতন কবি হিসেবে তিনি স্বীকৃত, সম্মানিত। কবিজীবনের শুরুতে ধর্মীয় অনুষঙ্গে নিমজ্জিত হলেও অল্প সময়েই তিনি সেই পথ পরিহার করে পূর্ববর্তী কবিবৃন্দের নির্দেশিত পথকেই শিরোধার্য করেছেন। তাঁর কবিতার রাজ্যে প্রেমের দখলনামা সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত। প্রেমকে তিনি জীবনেরই সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মন দেওয়া-নেওয়ার কথা তিনি বলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই মনে প্রবেশের পথ তিনি অন্বেষণ করেন নায়িকার শরীরের ভেতর। দেহ ও মনের মিথস্ক্রিয়ায় তিনি কবিতায় প্রেমকে আবাহন কিংবা উদ্‌যাপন করেছেন। মানবচৈতন্যের বিশেষ কোন প্রবণতার সহায়ক কিংবা পরিপূরক হিসেবে প্রকৃতির কাছেও হাত পেতেছেন তিনি। আলী আহসান সবুজের প্রগাঢ়তায় প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন। এই শ্যামল বাংলার প্রকৃত সন্তান যিনি, তিনি প্রকৃতিরও সন্তান– এই বিশ্বাসের প্রতিফলন তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, মাটি যা-কিছু শোষণ করে, তা বৃক্ষের শরীরে পুষ্টি ছড়িয়ে দেয় বলেই মাটির কাছাকাছি থাকার আনন্দ জীবনকে উপলব্ধি ও উদ্‌যাপনেরই আনন্দ। সময়ের সঙ্গে সম্পর্কসেতু রচনার মাধ্যমেই তিনি পাঠককে পল্লবিত করতে চেয়েছেন। সময় ও সমাজের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যতীত শিল্পের বৈতরণী পার হওয়া অসম্ভব বলেই রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিপত্তি বিষয়ে সচেতন ছিলেন তিনি। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে রাজনীতির ঢেউ তাঁকেও প্লাবিত করেছে। সেই প্লাবনের প্রভাব তাঁর কবিতার দেহ-মনেও কখনো কখনো অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। তিনি এমন সমাজের কথা বলেছেন, যেখানে মানুষের মূল্যবোধের

স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটবে এবং কোন মানুষের অধিকার কিংবা স্বার্থ অন্যের হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত হবে না। চল্লিশের কবিতার প্রধান প্রবণতাকে সামনে রেখে তাঁর এই স্বপ্ন কিংবা প্রত্যাশাকে কালধর্মের প্রভাব বলাই সঙ্গত। তাঁর কবিতায় উদ্বাস্তুবোধের অনুকূল অনুষঙ্গ অস্তিত্বহীনতা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা, গন্তব্যহীনতা ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষ করার মতো। অনিকেত-ভাবনার বিচ্ছুরণ তাঁর কবিতায় অভিনন্দিত হলেও, তাঁর সৃষ্টির আনন্দকে উসকে দেয় যে গভীরতর বেদনা, তার সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে তিনি সচেতন। তাই তাঁর কবিতায় বিম্বিত উদ্বাস্তুবোধের উল্টোপিঠে সুস্থ, সুন্দর ও আলোকিত জীবনের অনুভব স্পষ্ট। শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে বিস্তর কবিতা লিখেছেন তিনি। শব্দ অর্থাৎ কবিতা তাঁর কাব্যের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় অনুষঙ্গ। জীবনের সকল অনুভবকেই তিনি কবিতার হৃদ্‌পিণ্ডে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার হাতে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল অনুষঙ্গই শিল্প হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন তিনি। সেই অর্থে আলী আহসানের কবিতায় আমরা জীবনকেই নানাভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি।

চল্লিশের কবিবৃন্দের স্বকালমগ্নতার গভীরেও প্রত্যেকের আত্মখচিত অভিজ্ঞান ধরা পড়েছে। প্রেম, প্রকৃতি, সময়-সমাজ-রাজনীতি, মধ্যবিত্তের সংকট ও সীমাবদ্ধতা, উদ্বাস্তুবোধ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে প্রত্যেকেই কবিতা লিখেছেন, কিন্তু এইসব বিষয়কে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় মূল্যবোধ ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ধর্মাদর্শে সমর্পণের প্রয়াস লক্ষ করা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারা আর অব্যাহত থাকে নি। আহসান হাবীব ও আবুল হোসেনের কবিতায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো নয়। চল্লিশের প্রত্যেক কবিই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কবিতার উপজীব্য করেছেন, কিন্তু জীবন ও শিল্পের সম্পর্ক নির্দেশে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বিবেচনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ এই দশকের প্রত্যেক কবিকেই নাড়া দিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁদের জীবনবোধের ব্যক্তিগত ব্যাকরণ অনুযায়ী এইসব ঘটনায় সাড়া দিয়েছেন। বৈষয়িক পরিমণ্ডল বিবেচনায় চল্লিশের কবিবৃন্দ একটি সমবায়ী কাব্যভুবনের বাসিন্দা হলেও জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রত্যেক কবিই স্বতন্ত্র পথে সেই কাব্যভুবনে প্রবেশ করতে চেয়েছেন।

কবিতার বিষয় নির্বাচনে যেমন চল্লিশের কবিবৃন্দ সমসাময়িক ঘটনাবলিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেও জীবনবোধের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং মানুষের চিরন্তন অনুভূতির প্রকাশেও পরিচালিত হয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে, তেমনি কাব্যদেহকে সুন্দর ও সংহত করার প্রয়োজনেও তাঁরা ব্যক্তিত্বখচিত শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা কবিতার করণকৌশলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করেই তাঁরা নির্মাণ করেছেন নিজস্ব কবিভাষা। একজন কবি কী বলছেন তার মধ্যে তাঁর আত্মখচিত অবয়বটি সব সময় মুদ্রিত থাকে না, কিন্তু কীভাবে বলছেন, কোন্ কৌশল অবলম্বনে বলার কথাটিকে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করছেন, সেখানেই কবির আপন স্বভাবের বিশেষ ব্যাকরণটি সুপ্রকাশিত। শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থেকেও একজন শিল্পীর চেতনাজগতের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব। বিশেষণের আধিপত্য থেকে তাঁর অভিজাত মানসতার পরিচয় যেমন পরিস্ফুট হয়, তেমনি ক্রিয়াপদের আধিক্য থেকে কর্মযজ্ঞে বিশ্বাসী শিল্পীর সক্রিয়তার ধরনটি চিহ্নিত হয়ে যায়। কবিতার দেহ ও আত্মার সহাবস্থান স্বাস্থ্যকর হলেই তা শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। তাই একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা কাব্যাত্মার সুখ ও স্বস্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে কাব্যদেহের সৌন্দর্য ও সংহতি রক্ষায়ও যত্নবান হয়ে থাকেন।

আহসান হাবীব ভাবকে বিবিধ রূপকল্পে সংহতি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, ব্যবহার করেছেন নানা প্রতীকী শব্দবন্ধ। তাঁর গঠনবৈশিষ্ট্যে জনসম্পৃক্তির প্রভাব স্পষ্ট। শেষ পর্যায়ে কবি শিল্প ও জীবনের সম্পর্ককে নানা রূপকল্পে ধরার চেষ্টা করেছেন। শব্দের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়াতে চেয়েছেন তিনি। এই সান্নিধ্যের উষ্ণতাই তাঁর গঠকৌশলের অন্যতম কুললক্ষণ। আহসান হাবীব মনে করেন, অলঙ্কারের আধিক্য এবং উপমার যথেচ্ছ ব্যবহারে কবিতার প্রবহমাণতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং অপরিমিত অলঙ্কার-আশ্রয়ী কবিতার প্রগলভ উচ্চারণে সৃষ্টির অন্তর ও অবয়ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপমা নির্মাণে কবির গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি ধরা পড়েছে। উপমা ব্যবহারে তিনি খুবই মিতব্যয়ী। আহসান হাবীবের অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রান্ত উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যের সেতুবন্ধ রচনায় কবির উৎপ্রেক্ষা-নির্ভরতা

চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। তাঁর উৎপ্রেক্ষায় আবেগের চেয়ে চিন্তা ও মনীষার দীপ্তিই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। অল্পকথায় চিন্তার গভীরতলস্পর্শী অনুভবকে শব্দবন্দি করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। কবি রূপকের শরণ নিয়ে কল্পনার রূপ ও লাবণ্যকে শব্দ-শরীরে গেঁথে দিয়েছেন। আহসান হাবীবের মিতব্যয়ী-মানসতাই তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সারাৎসারকে রূপক-আশ্রয়ী করে তুলেছে। আত্মখচিত অভিজ্ঞতাকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। কেবল নিষ্প্রাণ বস্তুকে সপ্রাণ ও গতিশীলই করেন নি তিনি, উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার, আচরণ বা স্বভাব আরোপ করে তাঁর উপলব্ধিকে অভিনব করে তুলেছেন। ভাবনাকে প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন জড় বা অপ্রাণিবাচক বস্তুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য কিছু বিশেষণ। আহসান হাবীব চিত্রকল্পকে কেবল মানুষের ইন্দ্রিয়ের সীমায় আবদ্ধ না রেখে তা অনুভবের বিস্তৃত ভুগোলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কবিতার ভাষাকে তিনি কথ্যভঙ্গির সমীপবর্তী রাখতে চেয়েছেন। তাই তাঁর চিত্রকল্প দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিচিত্র অনুষঙ্গেই অধিকতর সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতীক কাব্যদেহে যেমন লাবণ্য সঞ্চার করেছে, তেমনি কবিতার ভাষা লাভ করেছে অসাধারণ গতি ও দীপ্তি। পুরাণ-প্রসঙ্গের রূপান্তরের ফলে তাঁর কবিতা কাল–অতিক্রমী শিল্পের অবয়ব পেয়েছে। পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সীমারেখা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। হাবীব প্রচলিত ছন্দের পর্ববিভাজনের নিরূপিত কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছেন কখনো কখনো, যা তাঁর কবিতাকে কথ্যভঙ্গির নিকতবর্তী করে তুলেছে। কবিতা ও কথ্যভঙ্গির মধ্যে তিনি অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল তুলে দেন নি। বাংলা ছন্দের নিরূপিত পরিমণ্ডলে চলতে চলতেই কখনো-বা তিনি এই তিন ছন্দের শাসন উপেক্ষা করে গদ্যছন্দে প্রবেশ করেছেন, আবার গদ্যকবিতার শরীরে তিনি জুড়ে দিয়েছেন নিরূপিত ছন্দের দোলা। মিশ্র ছন্দের ব্যবহারে আহসান হাবীব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ফররুখ আহমদের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও ঘনিষ্ঠ বলেই কবিতায় তিনি এমন কোন প্রাকরণিক কাঠামোর শরণ নেন নি যা তাঁর বক্তব্যের গতি ও গভীরতাকে প্রতিহত করে। তাঁর কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের উপস্থিতি প্রবল এবং কবিতার শরীর নির্মাণেও তিনি ইসলামী আবহ অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। কবিতার ভাষাকে তিনি বিষয়ের অনুকূলে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ এবং শব্দ ব্যবহারে তিনি সর্বদাই বিষয়ের স্বভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফররুখ অন্তরের জগতকে প্রকাশ করার উপযোগী একটি কবিভাষা নির্মাণ করে নিয়েছেন। সে-ভাষা তাঁর উপলব্ধির সীমাকে প্রসারিত ও প্রাণবন্ত করেছে। তাঁর কাব্যে প্রচুর অলঙ্কার তুলনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ বস্তুর মধ্যে সম্পর্কসূত্র রচনার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উপমা প্রকৃত অর্থে তাঁর কবিস্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। ফররুখ কবিতায় উপমার চেয়ে উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে অধিকতর সিদ্ধহস্ত। কবিতার ভাবকে সুদৃঢ় এবং লক্ষ্যভেদী করার দিকে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষাও কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই বেশি মূল্য দিয়েছে। অধিকাংশ উৎপ্রেক্ষায় ফররুখ পাঠকের কল্পনাপ্রতিভার চেয়ে তার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছেন। রূপক নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর কবিভাষায় যে রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়েছে, পাঠকের সৃজনভাবনায় তা যোগ করেছেন ভিন্নতর দ্যোতনা। ফররুখ বাক্‌চিত্রকে চিত্রকল্পে রূপান্তরের চেয়ে কবিতার ভাব ও অভিব্যক্তির একটি সুনির্দিষ্ট বৃত্ত নির্মাণ করতেই অধিকতর উৎসাহী। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হন নি কবি, বক্তব্যের সারাৎসারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কখনো কখনো চিত্রকল্পের ত্রিবিধ গুণধর্ম– অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা এবং আবেগ-কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতায় যে জগতের প্রত্যাশা প্রতিভাত, তা রোমান্টিক কবিকল্পনারই উদ্ভাসন এবং সেই জগৎ নির্মাণের প্রয়োজনেই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে বিশেষ কিছু প্রতীকের ওপর। একইসঙ্গে তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে বেশ কিছু অভিনব প্রতীক। ফররুখ আহমদ কবিতায় এমন কিছু প্রতীকের ব্যবহার করেছেন যেগুলো বাংলা কবিতায় বহুল ব্যবহৃত এবং এই প্রতীকসমূহ তাঁর কবিতায় বিশেষ কোন দ্যোতনা সঞ্চার করেছে বলে মনে হয় না। কবিকল্পনার অবয়ব কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে তিনি বারবার প্রতীকের পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। প্রতীক-নির্ভরতা ফররুখের কবিতার গঠনকৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য কুললক্ষণ। তাঁর কবিতায় বিম্বিত মিথ-পুরাণের জগতেও কবির অতৃপ্তি ও অচরিতার্থতার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

বেদনা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামের স্বর্ণযুগের নানা চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহে। মুসলমান সাহিত্যস্রষ্টাদের কালোত্তীর্ণ শিল্পসম্পদ থেকেও বিবিধ ঘটনা ও চরিত্রের শরণ নিয়েছেন তিনি, যা তাঁর কবিতায় মিথিক আবহ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। কিংবদন্তির বিস্তৃত পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেছেন কবি, যা তাঁর কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ-পুরাণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের অনুকূল নয় বলেই রামায়ণ, মহাভারত কিংবা গ্রিক পুরাণের প্রতি আগ্রহ দেখান নি তিনি। ফররুখের কবিতায় গদ্য-পদ্যের ব্যবধান বিমোচনের কোন প্রয়াস নেই, বরং এই দুইয়ের মধ্যে একটি প্রবল পাঁচিল তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। তিনি প্রবলভাবে ছন্দমগ্ন হলেও কবিতার ওপর ছন্দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেন নি তিনি। ছন্দ তাঁর কবিতার ভাবের অধীনে থেকেই আপন স্বভাবে বিকশিত হতে চেয়েছে। কথাকে ছন্দে গেঁথেই ফররুখ আহমদ অনুভবপুঞ্জকে লক্ষ্যাভিমুখী করতে চেয়েছেন।

আবুল হোসেন পূর্বসূরি কোন কবিকে প্রত্যাখ্যান করেন না, স্বকালের কোন কবি কিংবা কাব্যান্দোলনে সমর্পিত হতে চান না, কবিতায় নিজেকেই খুঁজে ফেরেন তিনি। গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য দেয়াল রাখতে চান নি তিনি। কবিতার ভাষাকেও তিনি দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতার বাইরের কোন কাব্যিক আবহে বেঁধে রাখতে চান নি। নাগরিক জীবনের চালচিত্রই তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন এবং এই জীবনকে রূপায়ণের উপযুক্ত ভাষাভঙ্গিও তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য প্রবণতা নিরাভরণ শব্দসজ্জার সহজ-সরল-স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাঁর কবিতায় বিম্বিত আভরণহীনতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় নানা অলঙ্কারের উপস্থিতি। 'উপমার আলোজ্বলা পথে'ই তিনি অধিকতর সবল-স্বতঃস্ফূর্ত। শব্দের খেলায় উপমার সাহচর্য বেশ উপভোগ করেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় কষ্টকল্পিত উপমার উপস্থিতি কম। আবুল হোসেনের কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষায় অভিজ্ঞতার স্ফুরণ যেমন স্পষ্ট, তেমনি অভিজ্ঞতার শিল্পায়নে তাঁর প্রযত্ন প্রয়াসের স্বাক্ষরও এতে সুপ্রকাশিত। উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে কবির উপলব্ধির জগৎ যেমন সংহতি লাভ করেছে, তেমনি তাঁর সৌন্দর্যচেতনাও পেয়েছে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা। তাঁর কবিতায় প্রযুক্ত রূপকও তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত। রূপকের ব্যবহারে তাঁর কবিতার ভাষা সংহত অবয়ব লাভ করলেও তা সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাধারণ কথনকৌশলেরই অনুগামী। ভাষার সংক্ষিপ্ত অবয়ব তাঁর কবিতায় কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করে না, বরং কবিতায় বর্ণিত ভাব, বিষয় কিংবা রূপকল্পের অন্তর্গত শক্তি ও সৌন্দর্যে তা ভিন্নতর দ্যুতি ও গতি সঞ্চার করে। কবিতায় তিনি যে ছবি আঁকেন, তার আবেদন কেবল দৃষ্টির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সৌরভ ও সৌন্দর্য পাঠকের নানা ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। চিত্রকল্পকে তিনি কেবল কবিতার বাহ্যিক সজ্জা হিসেবে দেখেন নি, চিত্রকল্প তাঁর অভিব্যক্তির অনিবার্য অংশ হিসেবেই পরিস্ফুট। প্রতীকের ব্যবহারে আবুল হোসেনের কবিতার ভাষা সংহত অবয়ব লাভ করলেও সেই সংহতিকে জটিল কিংবা দুর্বোধ্য বলা যাবে না। প্রতীক-নির্ভর কবিতা রচনায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। পুরাণের চেয়ে লোককথা-লোকগল্পের ভগ্নাংশ কিংবা চরিত্রের উল্লেখে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রথিতযশা শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদানকেও তিনি মিথিক আবহে উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহও তাঁর কবিতাকে দান করেছে ভিন্নতর দীপ্তি। ইসলামের নানা অনুষঙ্গ এবং মুসলিম সংস্কৃতির উজ্জ্বল ও ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন তিনি, যা কবির স্বকালের স্বদেশকে তুলে ধরে। আবুল হোসেন মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থেকে অতীতের অর্জনকে স্বীকরণের মাধ্যমে কবিতায় বিম্বিত বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি কবিতার ভাব ও ভাষাকে ছন্দেই গেঁথেছেন এবং গ্রন্থনপ্রক্রিয়ায় বাংলা ছন্দের নিরূপিত বৈশিষ্ট্যসমূহই তাঁর অবলম্বন। আবেগের অবিকল উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন বলেই বোধকরি কথ্যভঙ্গির আনুগত্য করেছেন তিনি এবং এই ভঙ্গির শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর গদ্যকবিতায়। তবে মিশ্র ছন্দে আবুল হোসেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সৈয়দ আলী আহসানের উপস্থাপনকৌশল সরল, অনেকাংশেই তা কথনভঙ্গির অনুরূপ। আত্মকথনের ভঙ্গিতেই নিজের ভাবকে বাণীবদ্ধ করেন তিনি, তাতে বিস্তারের অতিকথন কিংবা তীব্র সংশ্লেষণজাত জটিলতা অনুপস্থিত। চল্লিশের কবিবৃন্দের মধ্যে তিনিই অধিকতর শব্দসচেতন। শব্দ এবং কবিতার একটি সমার্থক রূপকল্প নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কবি। তিনি যখন শব্দের দর্পণে নিজের মুখ দেখতে চান, তখন কবিতায় নিজের অন্তর্গত ঐশ্বর্য উন্মোচনের অভিব্যক্তিই

প্রকাশিত হয়। আলী আহসানের দর্শনেন্দ্রিয়ই সবচেয়ে সতেজ ও সক্রিয় এবং কবিতায় তিনি পাঠকের দেখার চোখকেই প্রথম প্রাণিত করতে চান। তাই তিনি কাব্যদেহকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেন। উপমা-ব্যবহারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সবকিছুকেই কবি দৃষ্টির সীমায় নিয়ে আসতে চান, এমনকি অন্তর্লোকের অনুভবসম্ভব নানা মানবিক বৃত্তিগুলোকেও দর্শন-যোগ্য করে তুলতে চান তিনি। উপমার মালা গাঁথেন কবি, সেই মালার প্রতিটি ফুলকেই তিনি তাঁর আত্মখচিত অনুভবের দ্যোতক করে তোলেন। উপমার আশ্রয়েই কবির অন্তর্গত ঐশ্বর্যের শিল্পরূপ অধিকতর সবল-স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষায় অনুভূতির চিত্রায়ণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যা তাঁর কবিতায় দান করেছে শৈল্পিক সংহতি। অনুভূতির দর্শনসম্ভব অবয়ব নির্মাণের প্রয়োজনেই তিনি অন্তরের জিনিসকে বাইরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন এবং বাইরের পৃথিবীকে অন্তরের উর্বর চত্বরে স্থাপন করেন। এই দুইয়ের সংযোগ-সেতু হিসেবে উৎপ্রেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মতো রূপকের বহুল ব্যবহারও তাঁর কবিতার একটি লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমেয় ও উপমানের সহাবস্থানে নির্মিত রূপকে তাঁর কবিতার ভাষায় সংহতি এসেছে এবং কবির ভাবের উপস্থাপনও সংযত এবং শিল্পসম্মত অবয়ব লাভ করেছে। চিত্ররূপময়তা আলী আহসানের কবিতার প্রধানতম কুললক্ষণ। কবির অনুধাবন কেবল একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় না বলেই প্রতিভাবান পাঠক তার নানা ইন্দ্রিয়কে সজাগ-সরাগ-সচকিত করে তোলে। আলী আহসানের কবিতায় চেতনার চারপাশে কবির অবচেতন ও অচেতনের অভিজ্ঞতাও সংহত হতে চায় বলেই তা চিত্রের সীমানা ভেঙে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক পাঠকের চিন্তা ও কল্পনাকে ভাষা ও ভাষ্যের সমতল থেকে গভীর ইঙ্গিতময়তার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ থেকে কবির জীবনবোধ এবং শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কেও একটি ধারণা লাভ করা যায়। মিথ-পুরাণের পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে স্বকালের নানা সমস্যা, সঙ্কট ও সম্ভাবনাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতায় লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোককাহিনি, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস, লিজেন্ড ইত্যাদি অনুষঙ্গেরও অনুবর্তন লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক অনুষঙ্গে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– সময়ের এই ত্রিকালযজ্ঞে সমর্পিত হওয়ার পথকে সুগম করেছেন তিনি। পৌরাণিক অনুষঙ্গের অনুবর্তন কবির শিল্পস্বভাবের অনুকূল আবহে উপস্থাপিত হয়েছে। গদ্যছন্দই আলী আহসানের প্রধানতম অবলম্বন। ভাবের বিকাশ কিংবা বিস্তারের সহায়ক হিসেবেই তিনি কবিতায় ছন্দকে স্বাগত জানিয়েছেন। কবিতার অন্তর্গত সুরকে ছন্দের বাঁধাধরা কাঠামো দ্বারা প্রতিহত না করে গদ্যছন্দের 'বন্ধনহীন-গ্রন্থি'তেই তিনি মুক্তির আনন্দ অন্বেষণ করেছেন।

কবিতার বিষয় ও প্রকরণের আন্তঃসম্পর্ক প্রগাঢ় বলেই বৈষয়িক পরিমণ্ডলের বৈসাদৃশ্য এর করণকৌশলেও বৈচিত্র্য এনেছে। আবার একই বিষয়ের কাব্যিক অনুরণনে শিল্পস্রষ্টাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে কবিতার আবয়বিক পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতা শব্দ-নির্ভর শিল্পমাধ্যম হলেও কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলি কবির অন্তর্গত অনুভব ও উপলব্ধির প্রতিনিধিত্ব করায় আত্মখচিত ব্যক্তিচৈতন্যের উষ্ণতায় তাতে সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনার উৎস অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে কবির মানসগঠন ও জীবনবোধের ব্যাকরণ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয়। স্বকালের নানা অভিঘাত কবিতার বৈষয়িক বিত্তেই কেবল পরিবর্তন আনে নি, তা কাব্যদেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও পরিবর্তনের ছাপ রেখে গেছে। সঙ্গত কারণেই এই পরিবর্তন ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তির অন্তর্জগতের জটিল রসায়নে একই ঘটনার ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হয়েছে এবং সৃজনশীল কবিব্যক্তিত্বের সক্রিয়তায় নির্মিত অবয়বেও সংঘটিত হয়েছে লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন। এভাবেই কবিতার অন্তর ও অবয়বের নিবিড় আত্মীয়তায় নির্মিত হয়েছে চল্লিশের কবিবৃন্দের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত কবিতার ভুবন।

কবির সৃজনবিশ্বে সাময়িক প্রসঙ্গের অবস্থিতি অস্বাস্থ্যকর নয়। স্বকালের নানা ঘটনার অভিঘাতকে তিনি এমন ভাব ও রূপকল্পে নির্মাণ করেন, যেখানে চিরকালের কণ্ঠস্বরটিও মুদ্রিত হয়ে যায় এবং এভাবেই মহত্তম শিল্পকর্ম স্বকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে চিরকালীন আভিজাত্যে উদ্ভাসিত হয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিবৃন্দ তীব্রভাবে স্বকালসংলগ্ন হলেও তাঁরা চিরন্তন মানবিক সংবেদনার সঙ্গেও একাত্ম থেকেছেন। তাঁদের সৃষ্টির সৌরভ সীমাহীন আকাশে সুবিস্তৃত এবং তাতে সার্বজনীন ও চিরকালীন অনুভব-উপলব্ধি স্ফুরিত হলেও স্বদেশের মাটি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেই

কবিতার ফুল ফুটিয়েছেন তাঁরা। মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে কাব্যচর্চা করেছেন বলেই তাঁদের বাণী পাঠকের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণের গভীরে পৌঁছে যায়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রগতির যে প্রবল স্রোত বহমান ছিল, এই ভূখণ্ডের প্রতিনিধিত্বশীল কবি হিসেবে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায়ও তাঁর নানা চিহ্ন বিদ্যমান, যদিও প্রগতি-কবিতার মূল ধারার সঙ্গে একাত্ম হন নি তাঁরা। শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রত্যয় তাঁদেরকেও তাড়িত করেছে, কিন্তু সেই স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সফল বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে সে-সময়ের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা যে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, সেই মিছিলের অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা। মানবিক মূল্যবোধ থেকেই তাঁরা নিপীড়িত জনতার শোষণ ও বঞ্চনার ছবি এঁকেছেন এবং শোষক ও সুবিধাবাদী শ্রেণির চরিত্র উন্মোচন করেছেন। রাজনৈতিক আদর্শ-তাড়িত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় তাঁদের কবিতায় অনুপস্থিত। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির শিল্পায়নে তাঁদের সৃষ্টিকর্ম বিশেষ ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। সেইসঙ্গে স্বকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক বাস্তবতাকেও তাঁরা কবিতায় ধারণ করেছেন। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় তাই আমরা সেই সময়ের বাংলাদেশের হৃদয়কেই উন্মোচিত হতে দেখি এবং তাঁদের স্বকালের স্বদেশী দর্পণেই ভেসে ওঠে সেকাল-একাল–ভাবীকালের বাংলাদেশের মুখচ্ছবি ।

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

আহসান হাবীব

রাত্রিশেষ	:	*আহসান হাবীব রচনাবলী* ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১-৫৪
ছায়াহরিণ	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৫-৯৮
সারা দুপুর	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৯-১৪২
আশায় বসতি	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৩-১৮৭
মেঘ বলে চৈত্রে যাবো	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৯-২৪২
দু'হাতে দুই আদিম পাথর	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক–আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৩-২৯৬
প্রেমের কবিতা	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৯৭-৩৪০
বিদীর্ণ দর্পণে মুখ	:	আহসান হাবীব রচনাবলী ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪১-৩৭৬

ফররুখ আহমদ

সাত সাগরের মাঝি : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১-৪৯

সিরাজাম মুনীরা : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. পৃ. ৫১-১১১

নৌফেল ও হাতেম : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১৩-১৭২

মুহূর্তের কবিতা : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭৩-২২৭

হাতেম তা'য়ী : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২২৯-৪৬৬

অনুস্বার : *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৮৫-৫৩৭

আবুল হোসেন

নববসন্ত : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৫-১০০

বিরস সংলাপ : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০১-১৫২

হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৩-১৯৭

দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯৯-২৪৩

এখনও সময় আছে : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৪৫-৩০৪

আর কিসের অপেক্ষা : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩০৫-৩৩৯

রাজকাহিনী : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৪১-৩৭২

কালের খাতায় : *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন* (সম্পাদক : মনজুরে মওলা), গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৭৩-৪২০

সৈয়দ আলী আহসান

চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা : *কবিতা সমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪৩-৩০৮

অনেক আকাশ : *কাব্য-সমগ্র*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩-৮৩

একক সন্ধ্যায় বসন্ত : *কাব্য-সমগ্র*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৮৫-১৩১

সহসা সচকিত : *কাব্য-সমগ্র*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৩৩-১৮১

উচ্চারণ : *কাব্য-সমগ্র*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৮৩-২৭২

আমার প্রতিদিনের শব্দ : *কাব্য-সমগ্র*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৭৩-৩৩৪

সমুদ্রেই যাব : *কবিতা সমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৭৭-২৩২

খ. সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৩৯৫), *কল্লোল যুগ*, সপ্তম মুদ্রণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৩৩৮), *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, জয়ন্তী উৎসর্গ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫), *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অনু হোসেন (১৯৯৬), *বাংলাদেশের কবিতা প্রসঙ্গে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০০৭), *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৫), পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

(১৯৮৮৮), পৌরাণিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অমরেন্দ্র গণাই (১৯৮৪), *অলংকার ও কবিতা*, বর্ণালী, কলকাতা

অমলেন্দু বসু (১৩৭৯), *সাহিত্যচিন্তা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

(১৯৭১), *সাহিত্যলোক*, জেনারেল, কলকাতা

অরুণকুমার সরকার (১৯৮১), *তিরিশের কবিতা ও পরবর্তী*, প্যাপিরাস, কলকাতা

অরুণ ভট্টাচার্য (১৩৬৫), *কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৯১), *ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনীরাগে*, প্রতিভাস, কলকাতা

অশোক কুমার মিশ্র (২০০২), *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা [১৯০১–২০০০]*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশোক মিত্র (১৯৮৯), *কবিতা থেকে মিছিলে ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্যাপিরাস, কলকাতা

অশ্রুকুমার শিকদার (১৩৯২), *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

(১৩৯৮), *চোখের দুটি তারা : দুই বাংলার কবিতা*, প্যাপিরাস, কলকাতা

(১৯৯৩), *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৯), *সংস্কৃতির ভাঙা সেঁতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আজহার ইসলাম (১৯৮৯), *সাহিত্যে বাস্তবতা*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আজীজুল হক (১৯৮৫), *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মুক্তধারা, ঢাক

(১৯৮৮), *ফররুখ আহমদ*, জীবনী গ্রন্থমালা ১৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯০), *পুনর্বিবেচনা*, সৃজনী প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা

(১৯৯৩), *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৩), *করতলে মহাদেশ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা

(১৯৯৪), *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০০১), *ছন্দ*, অবসর, ঢাকা

[সম্পাদক] (২০০৭), *আবুল হোসেনের ব্যঙ্গকবিতা*, সূচীপত্র, ঢাকা

আবিদ আনোয়ার (১৯৯৭), *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১), *শিল্পীর রূপান্তর, আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী* (সম্পাদক : আনিসুজ্জামান এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবুল হোসেন (২০০৩), *আমার এই ছোট ভুবন*, অবসর, ঢাকা

(২০০৫), *আর এক ভুবন*, অবসর, ঢাকা

(২০০৮), *আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতা*, সূচীপত্র, ঢাকা

(২০১০), *আবুল হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন* (সম্পাদক : তারেক মাহমুদ), সূচীপত্র, ঢাকা

(২০১৩), অপরাহ্ণের স্মৃতি, সূচীপত্র, ঢাকা

আল মাহমুদ (২০১২), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, আদর্শ, ঢাকা

আহমদ কবির (১৯৯৫), *রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক*, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা

আহমেদ মাওলা (২০০৭), *চলিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০), *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভূমিকা*, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৮৩), *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (সম্পাদক : আবদুল কাদির), ১ম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ, (১৪০৬), *স্বপ্ন-প্রতীক*, অনুবাদ– অরূপরতন বসু, দীপায়ন, কলকাতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯৮১), *কবিতার রূপ-রূপান্তর*, উচ্চারণ, কলকাতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সরদার ফজলুল করিম (২০০১), *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

ক্ষুদিরাম দাস (১৯৯৪), *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, পরিমার্জিত দে'জ প্রথম সংস্করণ, কলকাতা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪), *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০১০), *কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নান্দনিক, ঢাকা

গোলাম মঈনউদ্দিন (১৯৮৫), *কবি ফররুখ আহমদ : ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম (১৯৮৬), *কবিতা : উপভোগ ও মূল্যায়ন*, নবার্ক, কলকাতা

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯৭৮), *রবীন্দ্রনাট্যে চিত্রকল্প*, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা

জহর সেনমজুমদার (১৯৯৮), *বাংলা কবিতা : মন ও মেজাজ*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৭৬), *শব্দের সীমানা*, মুক্তধারা, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৮), *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), ৩য় পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

(২০০২), *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

জীবেন্দ্র সিংহরায় (১৯৮৭), *কল্লোলের কাল*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

জুলফিকার মতিন (১৯৯৬), কবিতার দেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৭), *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০০৬), *কবির সুন্দর, কবিতার সুন্দর*, প্রতিভাস, কলকাতা

তারাপদ মুখোপাধ্যায় (১৩৮০), *আধুনিক বাংলা কাব্য* (প্রথম পর্ব), সপ্তম মুদ্রণ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

তারেক রেজা (২০০৯), *কবিতা : কালের কণ্ঠস্বর*, গ্লোব লাইব্রেরি প্রা. লি. ঢাকা

(২০১০), *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০১২), *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নান্দনিক, ঢাকা

(২০১২, *কবিতার মন-মর্জি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

তুষার দাশ (১৯৮৫), *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৮৮), *আহসান হাবীব*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

দিলারা হাফিজ (২০০২), *বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯২), *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (২০১০), *কবির দর্শন*, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৩), *বাংলা ছন্দ : বিকাশ রূপ ও রীতি*, রত্নাবলী, কলকাতা

(২০০৫), *আধুনিক বাংলা কবিতা : স্বরূপে রূপে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নরেন বিশ্বাস (১৯৮৮), *অলঙ্কার-অন্বেষা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কালিকলম, ঢাকা

নাজিব তারেক (১৯৯৬), *কবিতার চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নিতাই দাস (১৯৯৩), *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৭৭), *ছন্দ পরিক্রমা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৮), *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

ফজলুল হক সৈকত (২০০২), *তিরিশোত্তর কাব্যধারা ও আহসান হাবীবের কবিতা*, কল্লোল বুক সেন্টার, ঢাকা

ফরহাদ খান (২০০১), *প্রতীচ্য পুরাণ*, পুনর্মুদ্রণ, প্রতীক, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৫), *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০০৩), *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বলরাম মণ্ডল(১৯৯৩), *পুরাণ বিচিত্রা*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

বার্ণিক রায় (১৯৭৬), *প্রতীক অরণ্য*, প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা

(১৩৭৮), *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

বারীন্দ্র বসু (১৯৮৭), *কবিতা, আধুনিক ও আধুনিকতা কবিতা*, রত্নাবলী, কলকাতা

(১৯৯২), *বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাঙলা কবিতা*, কার্ষ্ণি-রাধেয়, কলকাতা

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮১), *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বিনতা রায়চৌধুরী (১৯৯৭), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (২০০৯), *কবিতায় বাক্‌প্রতিমা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা

বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৩৯৮), 'আহসান হাবীবের কবিতা : পরিণতির পরম্পরা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* (সম্পাদক : মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৩), *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৪), *আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৯৭), *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

(২০০২), *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, অনন্যা, ঢাকা

(২০০৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রথম আজকাল সংস্করণ, ঢাকা

বিষ্ণু দে (১৯৯৭), *রুচি ও প্রগতি*, *বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ* (সম্পাদক : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯), *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিশার্স দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা

(১৯৬০), *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

(১৯৬৬), *দেশান্তর*, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

(১৯৭৪), *মহাভারতের কথা*, এম সি সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

(১৯৮১), *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা

(১৯৮৩), *আধুনিক বাংলা কবিতা*, পুনর্মুদ্রণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

(১৯৯১), *সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, তৃতীয় মুদ্রণ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা

(১৯৯৭), *কালের পুতুল*, তৃতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা

(১৯৯৯), *কালিদাসের মেঘদূত*, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

(২০০১), *প্রবন্ধ সংকলন*, পঞ্চম সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (১৯৯২), *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৯), *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

(২০১৩), *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

মঞ্জুভাষ মিত্র (১৯৮৬), *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব*, নবার্ক, কলকাতা

মধুসূদন চক্রবর্তী (১৯৮২), *বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা (১৯৪১-১৯৭১)*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৯৫), *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী*, *মধুসূদন : কাব্যসমগ্র* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মারুফ রায়হান (১৯৯৩), *মুখোমুখি*, প্রেরণা প্রকাশনী, ঢাকা

মাসুদুল হক (২০০৮), *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাহবুব সাদিক (১৯৯১), *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৩), *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাহবুবা সিদ্দিকী (১৯৯৪), *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজচেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাহবুবুল হক (২০০৫), *তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩), *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ মতিউর রহমান (২০০৮), *ফররুখ প্রতিভা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, হেরা পাবলিকেশন্স, ঢাকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯৯৫), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী* [সম্পাদক-সৈয়দ আবুল মকসুদ], প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৬৭), *সাহিত্যের নবরূপায়ণ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৭৯), *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

(১৯৮৫), *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ (১৯৭৮), *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, মুক্তধারা, ঢাকা

(১৩৭২), *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (১৯৮৯), *কবিতা ও সমাজ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

[সম্পাদক] (১৯৯৩), *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০০২), *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (১৯৭১), *আধুনিক কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭৬), *ছন্দ*, প্রথম খণ্ড (সম্পাদক : প্রবোধচন্দ্র সেন), তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

(১৩৮৪), *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

(১৩৮৯), *বিচিত্র প্রবন্ধ*, তৃতীয় সংস্করণ,পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

(১৯৭১), গীতবিতান-১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা

(২০০৬), *কণিকা*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, এতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(২০০৬), *ঘরে-বাইরে*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, এতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(২০০৬), *সাহিত্য*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(২০০৬), *যোগাযোগ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

(২০০৬), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(২০০৬), *কালান্তর*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

(২০০৬), *জন্মদিনে*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(২০০৬), *স্ফুলিঙ্গ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

রশীদ করীম (১৯৯২), *অতীত হয় নূতন পুনরায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রাবেয়া মঈন (১৯৯২), *কবি সৈয়দ আলী আহসান : প্রভায় বৈভবে*, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ (১৯৮২), *শব্দ আর সত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা

(১৩৮৭), *ছন্দের বারান্দা*, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

(১৩৭৮), *নিঃশব্দের তর্জনী*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৬৩), *উপমা কালিদাসস্য*, নব সংস্করণ, কলকাতা

শহীদ ইকবাল (২০০৮), *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, চিহ্ন, রাজশাহী

(২০১৩), *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস* (১৯৪৭-২০০০), রোদেলা, ঢাকা

শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৭০), *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা

(২০০২), *মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহমদ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

শিখা দত্ত (২০০২), *আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৩৮০), *আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

শ্যামলকুমার ঘোষ (১৩৯৪), *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, বইঘর, কলকাতা

শ্রীশচন্দ্র দাশ (১৯৯২), *সাহিত্য-সন্দর্শন*, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা

সমর সেন (১৯৭৮), *বাবুবৃত্তান্ত*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা

(১৩৮৮), *সমর সেনের কবিতা*, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, সিগনেট প্রেস কলকাতা

সরকার আমিন (২০০৬), *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৬), *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশনী, কলকাতা

(১৯৮৪), *আলো-আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সাঈদ-উর রহমান (২০০১), *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(২০০১), *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন* ১৯৪০-১৯৮২, অনন্যা, ঢাকা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য (২০০২), *সংগীতে সুন্দর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সালাহউদ্দীন আইয়ুব (১৯৯৯), *সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৮৬), *শ্রেণী সময় ও সাহিত্য*, মুক্তধারা, ঢাকা

সুকুমার সেন (২০০২), *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৪), *জসীমউদ্দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০০৮), *কবি ফররুখ আহমদ*, তৃতীয় মুদ্রণ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৩৭৬), *নারদের ডায়রি*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা

(১৯৮৭), *আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন*, অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা

(১৯৮৪), *অক্ষরে অক্ষরে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

(১৯৯৩), *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

(২০০০), *কেন লিখি*, (সম্পাদিত, প্রণব বিশ্বাস সহযোগে), প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলকাতা

(২০০৩), *কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়* (সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী), তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

(২০০৩), *এই ভাই, সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯২), *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়*, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা

(১৯৯৬), *আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

সুস্নাত দাশ (১৯৮৯), *ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২০০৪), *কাব্যবিচার*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সৈকত আসগর (১৯৯৩), *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫), *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৩), সতত স্বাগত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

(১৯৮৯), *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০০১), *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, গতিধারা, ঢাকা

(২০০২), *আধুনিক বাংলা কবিতা*, *গতিধারা*, ঢাকা

(২০০৩ক), *আমার সাক্ষ্য*, ঝিঙেফুল, ঢাকা

(২০০৩খ), *সৈয়দ আলী আহসান : মনীষার মুখ* (সম্পাদক : আবদুল হাই শিকদার), ঝিঙেফুল, ঢাকা

(১৩৭৫), *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, বইঘর, চট্টগ্রাম

(২০০৪), *বিচিত্র প্রবন্ধ*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৯২), *কতিপয় প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

স্বপন সেনগুপ্ত (২০০৪), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা

হরপ্রসাদ মিত্র (১৩৬৩), *সাহিত্যের নানা কথা*, কলকাতা

হায়াৎ মামুদ (১৯৮৭), *সোমেন চন্দ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪), *আধুনিক কবি ও কবিতা*, *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী ১* (সম্পাদক : রফিকউল্লাহ খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হায়দার আকবর খান রনো (২০০৩), *মার্কসবাদের প্রথম পাঠ*, বর্তমান সময়, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৪০), *আধুনিক বাংলা কবিতা*, কবিতা ভবন, কলকাতা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫), *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৯২), *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
হোসেনউদ্দীন হোসেন (১৯৯৪), *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Adam Schaff(1963), *A Philosophy of Man*, Lawrence and Wishart, London

Arthur Rimbaud (1974), *A Season in Hell*, *the Illuminations*, trans. by Enid Rhodes Paschel, New York, Oxford University Press

Renewellek & Austin Warren (1985), *Theory of Literature* (reprinted), USA.

C.D. Lewis (1947), *A Hope For Poetry*, 18th Ed.Oxford. Basil-Blackwell.

(1968), *The Poetic Image*, Jonathan Cape, London.

C. M. Bowra (1954), *The Heritage of Symbolism*, Mavmillan and Co. Ltd. London

Charles Norman [edited] (1965), *Poets on Poetry*, first free press paperback edition

Cristopher Caudwell (1958), *Illution and Reality*, Lawrence and Wishart, London, Reprinted

Debiprassad Chatterjee [edited] (1945), *Modern Bengali Poems*, Signet Press, Calcutta

Douglas Bush (1969), *Mythology and the Romantic Tradition in English Poetry*, Harvard University

Herbert Read (1950), *Collected Essays in Literary Criticism*, second edition, Reprinted, MCMLiv, Faber & Faber Ltd. London.

Heinrich Zimmer (1962), *Myths and Symbols in India Art and Civilization*, edited by Joseph Campbell, New York; Harper Torch Books, The Bollingen Library

I. A. Richards (1960), *Practical Criticism,* Pelican Books, London

Lillian Feder (1971), *Ancient Myth in Modern Poetry*, Princeton University Press, Princeton

M. H. Abrams (1997), *A Glossary of Literary Terms, Reprinted, Macmilan Indian Limited,* New Delhi.

Maud Bodkin (1971), *Archetypal Patterns in Poetry*, Oxford Paperback

Maurice Nadeau [trans.] (1964), *The History of Surrealism*, Jonathan Cape, London

Philip Wheelwright (1976), 'Poetry, Myth, and Reality'. An essay in the book *Twentieth Century Criticism : The Major Statements* [Ed.] William J. Handy & Max Westbrook, Indian Edition

Stephen J. Brown (1927), *The Word of Imagery*, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London

Stephen Spender (1965), *The Struggle of the Modern*, University Paperbacks, London.

T. S. Eliot (Mcmlxvii), *The Use of Poetry And The Use of Criticism*, Faber & Faber [paper-back]

T. S. Eliot (1971), `Ulysses, Order and Myth' The Dial LXXV (1923), as quoted in Lillian Feder's *Ancient Myth in Modern Poetry*, Princeton.

William J. Handy & Max Westbrook [Ed.] (1976), *Twentieth Century Criticism : The Major Statements*, Indian Edition. Life & Light Publishers, New Delhi.

ঘ. সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ

অজয় রায় (২০০২), 'রণেশদা, রণেশ দাশগুপ্ত ও রাজনীতি', *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

অনুপম হায়াৎ (১৯৮৭), 'একটি অসমাপ্ত সাক্ষাৎকার ও কিছু কথা', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (২০১১), 'শব্দ পুরাণ, মুখচ্ছদ', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা

আনওয়ার আহমদ (১৯৮৭), 'হাবীব ভাই প্রতিশোধ নিলেন', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক-রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

আবদুল আহাদ (১৯৮৮), 'প্রেমিক ফর্‌রুখ', *ফর্‌রুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল কাদির (১৯৮৮), কবি ফররুখ : দুই সমীক্ষা', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল গফুর (১৯৮৮), 'আতিথ্যে উদার আদর্শে নিরাপোষ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

(১৯৮৮), 'ফর্‌রুখ-মানস : তাঁর কবিতা', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৫), 'সৈয়দ আলী আহসান', *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

(১৯৮৮), 'কবিতা', *বাংলাদেশের সাহিত্য* (সঙ্কলন উপবিভাগ কর্তৃক সঙ্কলিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৯৫) [সম্পাদক], *ফর্‌রুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(২০১১ক), *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট* (সম্পাদক : জুনান নাশিত), মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা

(২০১১খ), 'আমাদের প্রথম আধুনিক কবিতার বই', *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট* (সম্পাদক : জুনান নাশিত), মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা

(২০০৭) [সম্পাদক], *আবুল হোসেনের ব্যঙ্গ কবিতা*, সূচীপত্র, ঢাকা

আবদুল হক (১৯৮৮), 'ফররুখ আহমদ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল হাই শিকদার [সম্পাদক] (২০০৩), *সৈয়দ আলী আহসান : মনীষার মুখ*, ঝিঙেফুল, ঢাকা

আবদুস সাত্তার (১৯৮৮), 'অভ্রভেদী চোখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আব্দুল হালিম চৌধুরী (১৯৮৮), 'ফর্‌রুখের গান', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবু কায়সার (১৯৮৭), 'আহসান হাবীব চলে গেলেন', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯৮৭), 'প্রয়াত বন্ধু কবি আহসান হাবীব', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

আবু রুশ্‌দ্‌ (১৯৮৭), 'আহসান হাবীব', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৮৮ক), 'মর্যাদাবোধের প্রতীক ফররুখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

(১৯৮৮খ) 'ব্যতিক্রমী শিল্পী', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবুল ফজল (১৯৮৮), 'তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবুল হাশেম (১৯৮৮), 'আমার ছাত্র ফররুখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবুল হোসেন (১৯৮৭), 'আহসান হাবীব', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

(২০১০), *আবুল হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন* (সম্পাদক : তারেক মাহমুদ), সূচীপত্র, ঢাকা

আহমদ ছফা (১৯৮৮), 'কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আহমদ রফিক [সম্পাদক] (১৯৯৫), *আহসান হাবীব রচনাবলী* ১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৮৭), 'আহসান হাবীবের কবিতা : কয়েকটি সূত্র', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৮), "মন্ত্রপড়া অন্তরাল' : মিথ্-পুরাণের সন্ধানে", *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে* (সম্পাদক : তরুণ মুখোপাধ্যায়), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

খালেদ হোসাইন (২০১১), 'বাংলা কবিতায় ছন্দ', *বাংলা ছন্দের মানচিত্র* (সম্পাদক : খালেদ হোসাইন এবং মুজিবুল হক কবীর), অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯৬৫), *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়), ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা

জুলফিকার মতিন (১৯৯৯), 'বাংলা কবিতা : রূপ-রূপান্তর', *একুশের প্রবন্ধ* ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৮৮), 'ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

(১৯৮৫), 'কবি সৈয়দ আলী আহসান', *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

(২০১১), *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট* (সম্পাদক : জুনান নাশিত), মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা

জুনান নাশিত [সম্পাদক] (২০১১), *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা

তারেক রেজা [সম্পাদক] (২০১২), *শ্রেষ্ঠ কবিতা : সমর সেন*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৮৫), 'ঋণাঙ্কনে মখমল নিবেদন', *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

দাউদ হায়দার [সম্পাদক] (১৯৮৫), 'ভূমিকা', *বাংলাদেশের কবিতা*, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা

দিলীপ মজুমদার [সম্পাদক] (১৯৮৬), *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা

ধনঞ্জয় দাশ [সম্পাদক] (২০০৩), *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [সম্পাদক] (১৯৯১), *বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

প্রণবেশ সেন (১৯৮৫), ' উৎসেরও উৎস সন্ধানী', *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

ফখ্‌রুজ্জামান চৌধুরী (১৯৮৮), 'আকাশের শাহীন তিনি', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ফাইজুস সালেহীন (১৯৮৮), 'ফররুখ-মানস : তাঁর কবিকৃতি', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মনজুরে মাওলা [সম্পাদক], ২০১০, *কবিতা সমগ্র : আবুল হোসেন*, নবযুগ, ঢাকা

মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯৮৮), 'ঐতিহ্যের রূপকার ফর্‌রুখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মহীবুল আজিজ (১৯৯৯), *আবহমান বাংলা* (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

মাহমুদুল হক (১৯৮৭), 'প্রথম সম্পাদক', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

মাফরুহা চৌধুরী (১৯৮৭), 'কবি আহসান হাবীব : কথা ও চিত্র', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

মাশুক চৌধুরী (১৯৮৭), 'কবি আহসান হাবীব', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯৮৮), 'এক বিস্ময়কর নায়ক', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মুহিউদ্দীন খান (১৯৮৮), ‘স্বপ্নরাজ্যের দুঃসাহসী সিন্দাবাদ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আলী (১৯৮৫), ‘সৈয়দ আলী আহসান : কবিকে’, *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৮৫), ‘সৈয়দ আলী আহসান’, *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ (১৯৮৮), ‘ফররুখের কবিতা : তাঁর শিল্পরূপ, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

(২০০৪), ‘সৈয়দ আলী আহসান’, *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব* (সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম, সাঈদ-উর রহমান এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ আজরফ (১৯৮৮), ‘অনমনীয় ফর্‌রুখ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম [সম্পাদক] (১৯৭১), *আধুনিক কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৮৮ক), ‘অনন্য পুরস্কার’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

(১৯৮৮খ), ‘ফররুখের আকাঙ্ক্ষা’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

রোকনুজ্জামান খান (১৯৮৭), ‘আমার প্রিয় হাবীব ভাই’, *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক–রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০১১), ‘একজন প্রকৃত আধুনিক কবির প্রোফাইল’, *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট* (সম্পাদক-জুনান নাশিত), মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা

শামসুল হুদা চৌধুরী (১৯৮৮), ‘আপোষহীন ফর্‌রুখ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৮৮), ‘ফররুখের অভিনবত্ব’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু (১৯৮৮), ‘আব্বাকে যেমন দেখেছি’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সিকদার আমিনুল হক (১৯৮৭), ‘আহসান হাবীব : অক্ষয় তাঁর গৌরব’, *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৮৭), ‘আহসান হাবীবের গৃহানুসন্ধান’, *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

(১৯৮৮), ‘চলে গেছেন অপরাজেয়’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সুধীরচন্দ্র সরকার [সংকলক] (১৪০৮), *পৌরাণিক অভিধান*, অষ্টম মুদ্রণ, এম সি সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

সেলিম আল দীন (১৯৮৭), ‘শ্বেত কুসুম’, *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৮৮), ‘তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯৮৫), ‘সৈয়দ আলী আহসানের প্রাথমিক কাব্যরূপ’, *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মাহমুদ শাহ কোরেশী), সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি-১৯৮৫, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯), ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের সাহিত্য’, *আমাদের সাহিত্য* (সম্পাদক : সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(১৯৮৭), ‘কবি আহসান হাবীব’, *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা

(১৯৮৮), ‘ফররুখ আহমদ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৮৮), ‘কাল-সচেতন ফর্‌রুখ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ (১৯৮৮), ‘আমার ভাই ফর্‌রুখ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (১৯৮৮), ‘সংসারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হাসান আবদুল কাইয়ুম (১৯৮৮), ‘আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফর্‌রুখ’, *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ঙ. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ

আহমদ রফিক (২০১৩), ‘চল্লিশের কবিতা : ‘স্বভাবে স্বরূপে’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাকা

আহসান হাবীব (১৯৮৩), *সচিত্র সন্ধানী*, ২৪ জুলাই, ঢাকা

ঊষা গওহর (২০১২) [ফেব্রুয়ারি], ‘আহসান হাবীব : প্রেমের কবিতা’, *উলুখাগড়া*, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুলফিকার মতিন (১৯৯৯), ‘বাংলা কবিতা : রূপ-রূপান্তর’, *একুশের প্রবন্ধ* **১৯৯৯**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্‌ কাদেরী (২০১১), ‘আহসান হাবীবের সারাদুপুর : সময়ের শিল্পরূপ’, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : নূরুর রহমান খান), বর্ষ ৪৮ ॥ সংখ্যা ৩ ॥ জুন ২০১১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৩৯৮), ‘আহসান হাবীবের কবিতা ” পরিণতির পরম্পরা’, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* (সম্পাদক : মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ), শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (২০০৯), ‘বাংলাদেশের কবিতা ভাষারূপ’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৩, জুন ২০০৯, ঢাকা

মজিদ মাহমুদ (২০১৩), ‘চল্লিশের বাংলা কবিতা : প্রেমে ও বিপ্লবে’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাকা

মনজুরুল হক (২০০৯), ‘বাংলাদেশের কবিতা’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৩, জুন ২০০৯, ঢাকা

মহীবুল আজিজ (২০১০), ‘আমাদের কবিতায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক– সাজ্‌জাদ আরেফিন, সংখ্যা ৪, অক্টোবর ২০১০, ঢাকা

মাসুদুল হক (২০১৩), ‘চল্লিশের দশকের কবিতা’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাক

মিজানুর রহমান খান (১৯৯১), ‘আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ’, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), বর্ষ : ৩৪ সংখ্যা : ৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৩৯৮), ‘চল্লিশের দশকের কবিতা’, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), বর্ষ ৩৫ ॥ সংখ্যা ১ ॥ কার্তিক ১৩৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(২০০৪), ‘সৈয়দ আলী আহসান’, *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব* (সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম সাঈদ-উর রহমান বিশ্বজিৎ ঘোষ), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (২০১০), ‘পঁচিশ বছরের কবিতা’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৪, ঢাকা সৈয়দ শোয়েব শাহরিয়ার (২০১২) ‘আহসান হাবীব বিস্তৃত জীবনের মহান কীর্তনিয়া’, *উলুখাগড়া*, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন), ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৯), ‘পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতা : একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৩, জুন ২০০৯, ঢাকা

সৌভিক রেজা (২০১৩), ‘মানবিক ভালোবাসা থেকে উৎসারিত কবিতা’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাকা

হায়াৎ মামুদ (২০০৯), ‘আমাদের রাজনৈতিক কবিতা ও সমাজবাস্তবতা’, *নান্দীপাঠ* (সম্পাদক : সাজ্‌জাদ আরেফিন), সংখ্যা ৩, জুন ২০০৯, ঢাকা